KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Serial No : KLMLGK 2087	Place of Publication :
Collection : KLMLGK	Publisher :
Title : বহুবর্ণিম	Size : 5.5" x 8.5" 13.97 x 21.59 c.m.
Vol. & Number : 2/2-32	Year of Publication : ফাল্গুন - চৈত্র
	Condition : Brittle / Good
Editor :	Remarks :

CD Roll No. KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/৩/১ টামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বিষয়।

	পৃষ্ঠা।
অজ্ঞাতদান (কবিতা)	৩৭৫
অতৃপ্তি (কবিতা)	৫১০
অত্যুক্তি	৩৭৬
অবকাশ	৩৩৮
অভিজ্ঞানশকুন্তলের অঙ্কান্তর্গত কালবিশ্লেষণ	৬৩৭
অভীষ্ট (কবিতা)	২১২
অমূর্ত্ত ও মূর্ত্ত	৪০৭
অশোক (কবিতা)	৫৬৯
অশ্রান্ত (কবিতা)	৫১০
আচার্য্য বসুর আর একটি আবিষ্কার	৬৪৭
আর কত আয় (কবিতা)	৯১
আরো একটি কথা	৪৮
আলোচনা—	
দুর্ভিক্ষের মূল কারণ	৩৩৯
রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম্মনীতি	৩৯৭
আহ্বান (কবিতা)	৪৫৫
উৎসব (কবিতা)	৫৮৭
কথা (কবিতা)	৫৬৫
কল্পনা-সম্বল (কবিতা)	৩৬০
কৃতজ্ঞতা (কবিতা)	৫১০
খেলা (কবিতা)	১১৯
গোধূলি (কবিতা)	৬০৩
গৌড়ের পূর্ব্বকাহিনী	৬২
গ্রন্থ-সমালোচনা	৫৬, ১০৬, ১৬৪, ২১৯, ৩৪১, ৪০০, ৬২২
"চিরদিন"	৪৯৪
চীনকাহিনী	৫৮২

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
চীনেম্যানের চিঠি	১৫১
চোখের বালি	৯, ৭১, ১২০, ১৯০, ২৩৬, ৩৩৮, ৩৬০
জনশূন্য পৃথিবী	৬৪৩
জাগরণ (কবিতা)	৩৫৫, ৫৯৩
জামাইষষ্ঠী	১০১
জীবনলক্ষ্মী (কবিতা)	৫৬৯
ঝরণাতলা (কবিতা)	৬৩৫
তুলনা (কবিতা)	১৬৪
তৈলবট	৪২১
তোমার বিহনে (কবিতা)	৩০
দর্পহরণ	৬১৩
দান (কবিতা)	২১১
দুঃখে সুখ (কবিতা)	৪৪
দুর্ব্বলের অপরাধ (কবিতা)	৩১৮
দুর্ভাগা (কবিতা)	[illegible]
দুর্ভিক্ষের মূল কারণ	৩৩৩
দ্বিধা	৩৯৯
দ্বৈতরহস্য	৬২১
দ্রাবিড় সভ্যতা	৪০০
ধর্ম্মের সরল আদর্শ*	৫২৮
নবপরিণয় (কবিতা)	৫৬৬
নববর্ষ	৩১
নববর্ষে	১
নববর্ষের গান (কবিতা)	৬১
নববিকাশ (কবিতা)	১২০
নারী	৪৬৮
নাসপাতির গান	৪৪১
পঞ্চগৌড়েশ্বর জয়ন্ত	১৩২

* এই পৌষ বোলপুর শান্তিনিকেতনে সম্পাদককর্ত্তৃক পঠিত।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
পঞ্চ পাল-নরপাল	২১২
পথিক-(কবিতা)	৪৪৪
পনেরো-আনা	৫১২
পরনিন্দা	৪০৩
পরিচয় (কবিতা)	৪৫৫
পাত্রির কঙ্কাল	৫০১
পূজা (কবিতা)	৫৯৩
পূর্ণতা (কবিতা)	৫৬৬
পৃথিবীর উৎপত্তি	২
প্যারাসেল্‌সাস্	৩২৫, ৩৪৭
প্রকাশ (কবিতা)	১৬৩
প্রতীক্ষা (কবিতা)	৪৪০
প্রশ্ন—	
দ্রাবিড় সভ্যতা	৪০০
প্রাচীন ভারতের ব্যাপ্তি	৪৫০
প্রাণী ও উদ্ভিদ	৩৯২
প্রার্থনা (.কবিতা)	৪৫৪
প্রেম (কবিতা)	৫৮৮
ফোটোগ্রাফি	৬৪৭
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য	১৬৫
বন্ধনলেশ (কবিতা)	২১২
বসন্ত (কবিতা)	৫৮২
বসন্তযাপন	৬৩১
বাঁচিবার তৃষা	৬০৪
বাজে কথা	২৭১
বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস	৫৪৬
বিদেশী বন্ধু	১০৯
বিদ্যাপতি-প্রসঙ্গ	৮২
বিপরীত (কবিতা)	২১১
বিশ্বদোল (কবিতা)	৪৭৭

বিষয়। পৃষ্ঠা।

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিসর্জ্জন (কবিতা)	৩২৫
বুদ্ধদেবের পাখী (কবিতা	৫৬৯
বেলুচি-মুলুক	৬৫৪
বোগ্‌দাদে ভারতবর্ষীয় চিকিৎসক	২৯৩
ব্যাকরণ	৩৭২
ব্রাহ্মণ	১৩৬
ভারতবর্ষের ইতিহাস	২২১
ভারতে আব্দালি	৯২
ভ্রম (কবিতা)	৬৪৬
মন্ত্র	৩৯৫
মরণ (কবিতা)	২৫৫
মহাকাব্যের লক্ষণ	৪৭৯
মা ভৈ	৩৪৩
মাল্যদান	৬৬৪
মিলন (কবিতা)	৪৫৬
মুক্ত পাখীর প্রতি (কবিতা)	৪০১
যবন	২৪৬
যযাতি-কেশরী	৪৬২
রংমহল বা মোগল-বাদশাহের অন্তঃপুর	২০
রঙ্গমঞ্চ	৪৫৯
রচনা (কবিতা)	৫৬৮
রাজতরঙ্গিণী	৩০৫
রাজা গণেশ	৫৯৪
রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম্মনীতি	৩৯৭
লক্ষ্মী-সরস্বতী (কবিতা)	৫৬৫
শকুন্তলা	২৭৫
শিবপূজা	৫৭৪, ৬২৩
শুক্র-সন্ধ্যা (কবিতা)	২৯০
শুভক্ষণ (কবিতা)	৩০৪
শেষকথা (কবিতা)	৪৪৯

ভবসিংহ রাজা হন। তিনিও অল্পকাল রাজত্ব করেন এবং তাঁহার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দেবসিংহ পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

এই ভবসিংহ এবং দেবসিংহের সভাও কবি বিদ্যাপতি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার গীতের মাধুর্য্যসৌরভ তখন চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতেছিল। দেবসিংহের পুত্র শিবসিংহ পূর্ব্ব হইতেই এই কবির গুণপক্ষপাতী ছিলেন। এজন্য তিনি পিতার মৃত্যুর পর রাজপদ পাইয়াই (১৩২৪ শকাব্দে) কবির কবিত্বের মর্য্যাদাস্বরূপ তাঁহাকে বিসপী (বর্ত্তমান নাম বিস্‌ফী বা বিস্‌পী) গ্রামখানি দান করেন। কবি বিদ্যাপতি শব্দশাস্ত্র, অলঙ্কার, দর্শন এবং স্মৃতিশাস্ত্রে বিশেষ সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর স্বাভাবিকী উচ্চকবিত্বশক্তির ফলে কাব্যালোচনাতেই তাঁহার সমধিক অনুরাগ ছিল। রাজা শিবসিংহও যেমন সাহসী ও যেমন তেজস্বী, তেমনই সুরসিক কাব্যামোদীও ছিলেন। এজন্য তাঁহার সময়েই কবির প্রকৃত গুণগৌরব চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হয়। স্বীয় সুরম্য হর্ম্ম্যতলে বসিয়া প্রবলপরাক্রান্ত মোগলসম্রাট্ পর্য্যন্ত সে গুণগৌরবে মুগ্ধ ও চমকিত হইয়াছিলেন। কবি বিদ্যাপতি প্রসিদ্ধ পক্ষধরমিশ্রের সমসাময়িক এবং সমপাঠী, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। উভয়ে যে সমসাময়িক, তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে সমপাঠী কি না, সে পক্ষে সংশয় আছে।

কেহ কেহ বলেন, কবি ১৩২৩ শকাব্দে বিস্‌ফীগ্রাম লাভ করেন, কিন্তু মৈথিল পণ্ডিতের প্রমাণে তাহা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। তবে আমি যখন এ বিষয়ে তেমন অনুসন্ধান করিতে পারি নাই, তখন উভয় মতেরই উল্লেখমাত্র করিয়া অগত্যা 'সুধীভির্বিভাব্যম্' বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি। বিশেষত এশ্রেণীর সমালোচনায় সামান্য এক বৎসরের পার্থক্যটা বিশেষ ক্ষতিকর বলিয়া বোধ হয় না।

এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, কবি বিদ্যাপতি রাজা কীর্ত্তিসিংহ, ভবসিংহ, দেবসিংহ এবং তৎপুত্র শিবসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে যে, রাজা শিবসিংহের সময়ে কবির বয়স যৌবনের শেষসীমায় বা প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইতেছিল। আমাদের মনে হয়, কবি ১২৮০ ও ১২৯০ শকের মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা শিবসিংহের পর রাণী লছিমার রাজত্বকালে কবি তাঁহার উপদেশকরূপে রাজসভায় বিদ্যমান ছিলেন। রাণী লছিমার পর তাঁহার দেবর পদ্মসিংহ মিথিলার রাজা হন। ইঁহার সময়েও কবি রাজার সভাপণ্ডিতরূপে নিজ কবিত্বের মাধুর্য্যে জনগণকে মুগ্ধ করিতেছিলেন। পদ্মসিংহের পর তাঁহার পত্নী বিশ্বাসদেবী মিথিলার রাণী হন। ইঁহার সভাতেও আমরা বিদ্যাপতিকে দেখিতে পাই, তবে তখন তিনি জীবনের শেষসীমায় উপনীত।

আমাদের বোধ হয়, কবি প্রায় অশীতিবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। কারণ যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, রাজা শিবসিংহ ৩বৎসর, রাণী লছিমা ৫বৎসর, তৎপরে পদ্মসিংহ ১বৎসর এবং তৎপত্নী বিশ্বাসদেবী ১২বৎসর রাজত্ব করেন।

সুতরাং এখানেই আমরা ৩+৫+১+১২ =২১বৎসর কবিকে রাজসভায় দেখিতেছি। আবার ইতঃপূর্ব্বে কীর্ত্তিসিংহ, ভবসিংহ এবং দেবসিংহের সভাতেও আমরা কবিকে দেখিয়াছি। যদিও সেই রাজ্যকাল বেশী ব্যাপক হয় নাই, তথাপি তাহা অতিকম হইলেও মোট বোধ হয় ৫।৬ বৎসর হইবে। তাহা হইলেই প্রায় ৩০বর্ষকাল কবি রাজসভাতেই কার্য্য করিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, কবি ৭৩ কি ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগত হন। অতএব এরূপ মনে করা যাইতে পারে যে, কবি ২০ কি ২৫ বৎসর বয়সে রাজসভায় প্রবেশ এবং জীবনের শেষ ১০।১৫ বৎসর ধর্ম্মচিন্তায় অতিবাহিত করেন। আমরা এ সমস্ত আনুমানিকভাবেই বলিতেছি; কারণ, এ বিষয়ে কোন সুদৃঢ় প্রমাণ আমাদের হস্তগত হয় নাই।

কবি যে সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি "পুরুষপরীক্ষা" নামে একখানি গদ্যপদ্যময় গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে ৪টি পরিচ্ছেদ এবং ৪৪টি গল্প আছে। ইহাতে অসাধারণ কৌশলে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতির অবতারণা করা হইয়াছে; তাহা হইতে কবির ঐ সকল শাস্ত্রে পারদর্শিতা সম্যক্ উপলব্ধ হয়। পুস্তকখানি সুকুমারমতি বালকবৃন্দের শিক্ষার্থে রচিত, কিন্তু উৎকট আদিরসের অবতারণা থাকায়, তাহাদিগের পাঠের উহা সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে।

'লিখনাবলী' নামে আর একখানি পত্রলিখনপ্রণালীশিক্ষার পুস্তকও নাকি বিদ্যাপতি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহাতে গুরুজন ও অন্যান্য কাহাকে কি ভাবে পত্র লিখিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। পত্রলিখনপ্রণালী যে একটা শিক্ষণীয় বিষয় এবং তাহা তখনকার সময়েও যে বেশ জানা ছিল, এই পুস্তকই তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে।

কবি 'কীর্ত্তিলতা' নামে আর একখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। ইহা রাজা কীর্ত্তিসিংহের সময়ে প্রথম প্রণীত এবং তদীয়নামানুসারেই উহার নামকরণ হইয়াছে। ইহাতে নাকি কীর্ত্তিসিংহ ও তদীয় অন্যান্য বংশধরগণের কীর্ত্তিকাহিনী ও রাজ্যশাসনপ্রণালী প্রভৃতির বিবরণ শার্দ্দূলবিক্রীড়িতাদি ছন্দে বর্ণিত আছে। [illegible] পাঠ করিলে ঐ সব রাজগণের একটা ধারাবাহিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। আমি ঐ পুস্তক দেখি নাই, তবে শুনিয়াছি, উহা এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। মৈথিল পণ্ডিত ঐ পুস্তকের একটি শ্লোকের ভাব আমাকে বলিয়াছিলেন। তাহা রাজা পদ্মসিংহের বিষয়ে লিখিত। ভাবটি এইরূপ :—

"রাজা পদ্মসিংহ বৃহস্পতির ন্যায় বিদ্বান্, রামের ন্যায় চরিত্রবান্, যমের ন্যায় প্রতাপশালী, বসুমতীর ন্যায় ধীর, সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর এবং বলির ন্যায় দাতা ছিলেন। ভগবান্ যেন উৎকর্ষের সর্ব্বপ্রকার উপাদান হইতে সারাংশ সংগ্রহ করিয়াই তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।"

'কীর্ত্তিলতা'য় অন্যান্য নরপতিগণের সকলের চরিত্রই বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু লছিমাদেবীর রাজত্বসম্বন্ধে কবি কোন বর্ণনাই

করেন নাই। কারণ লছিমাদেবীর রাজত্বকালে বিদ্যাপতিই রাজত্বনীতির প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন এবং সমস্ত প্রধান প্রধান রাজকার্য্যের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান তিনিই করিতেন। সুতরাং তাঁহার উভয়সঙ্কট হইয়াছিল,—প্রশংসা করিলেও আত্মপ্রশংসা করা হয়, আবার নিজের নিন্দাই বা নিজে কেমন করিয়া করিতে পারেন; এই বিবেচনাতেই বোধ হয় কবি লছিমাদেবীর বর্ণনায় বিরত হইয়াছেন।

'কীর্ত্তিলতা' গ্রন্থখানি যদি প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অনুসন্ধান করিয়া সংগ্রহ করিতে পারেন এবং সংগ্রহ করিয়া তাহা মুদ্রিত করেন, তবে তাহা হইতে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্বের উদ্ধার হইতে পারে।

পদ্মসিংহের মহিষী রাণী বিশ্বাসদেবী এক জন আদর্শমহিলা ছিলেন। সংস্কৃতশাস্ত্রে ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর ইনি ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া অনুক্ষণ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানেই জীবন ব্যয় করিয়াছিলেন। দীনদরিদ্রের প্রতি ইঁহার জননীস্নেহ সততই উদ্বুদ্ধ ছিল। ইনি নানাস্থানে সুবৃহৎ দীর্ঘিকাদি খনন করাইয়া প্রজাবর্গের জলকষ্ট দূর করিয়াছিলেন। ইঁহার সে সকল কীর্ত্তি এখনও বিদ্যমান আছে। ইহার সাধারণ নাম বিশুলি ছিল। নিজনামে ইনি বিশোলিনামক গ্রাম স্থাপন করেন। বিদ্যাপতি বিশ্বাসদেবীকে বধূরাণী বলিতেন। ইহার আদেশে বিদ্যাপতি 'শৈবসর্ব্বস্বসার' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত পুস্তকে বিশ্বাসদেবীর সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে :—

"যিনি ক্ষীরসমুদ্র হইতে লক্ষ্মীর ন্যায়, গুণযুক্ত বিশ্বপ্রখ্যাত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; যিনি মহারাজ পদ্মসিংহের প্রিয়তমা মহিষী; যিনি ধর্ম্মকর্ম্মের একমাত্র সীমাস্বরূপিণী; যিনি পতির সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বিশাল মিথিলা শাসন করিতেছেন; যিনি চরিত্রে অরুন্ধতীর ন্যায়; সেই বিশ্বাসদেবী জয়যুক্তা হউন।

যিনি ইন্দ্রের শচীর ন্যায় সমুজ্জলগুণবতী; যিনি মহাদেবের গৌরীর ন্যায়; যিনি কন্দর্পের রতির ন্যায় স্বভাবমধুরা; যিনি রামের সীতার ন্যায়; যিনি বিষ্ণুর লক্ষ্মীর ন্যায়; যাঁহার নীতি বিশ্ববিখ্যাত; এতাদৃশী দ্বিজেন্দ্রতনয়া পদ্মসিংহ রাজার পরমা প্রেয়সী বিশ্বাসদেবী ভূমণ্ডলে রাজত্ব করিতেছেন।

ভূমণ্ডলে কত-কত দাতা ছিলেন ও অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। কিন্তু আর কেহই বিশ্বাসদেবীর ন্যায় প্রথিতযশা নহেন। যাঁহার স্বর্ণময়-তুলাপুরুষ-মহাদান প্রভৃতি সংসারে অতুলনীয়।

যিনি নিত্য দেবদ্বিজের নিমিত্ত ঐশ্বর্য্য দান করিয়া সম্পদের সার্থকতা করেন; যিনি ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞা এবং প্রতিদিন চন্দ্রচূড়ের আরাধনায় নিমগ্নচিত্তা; যিনি স্বয়ং বিদুষী ও বিদ্যাপতিকে আদেশ প্রদান করিয়া এই 'শৈবসর্ব্বস্বসার' গ্রন্থ রচনা করাইয়া বিশ্ববিখ্যাত কীর্ত্তি লাভ করিতেছেন।"

এতদ্ব্যতীত কবি 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'-নামক আরও একখানি স্মৃতিপুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছেন, শুনা যায়।

আর কোনও সংস্কৃতপুস্তক এই কবির লেখনী হইতে প্রসূত হইয়াছিল কি না,

আমরা জ্ঞাত নহি; কিন্তু এ সকল গ্রন্থের রচনায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় যথেষ্ট থাকিলেও, যেজন্য কবি আজ ভুবনবিশ্রুত অমরতা লাভ করিয়াছেন, সে তাঁহার রাধাকৃষ্ণবিষয়িণী সুমধুর পদাবলী। যদি কবির অমৃতনিষ্যন্দিনী লেখনীর মুখে এই পবিত্র প্রেমমন্দাকিনীর উৎপত্তি না হইত, তাহা হইলে ঐ সকল সংস্কৃতগ্রন্থরাজি তাঁহাকে আজ পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখিতে সমর্থ হইত কি না, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ। এরূপ অমরত্ব, এরূপ সম্মান, এরূপ গৌরব যে তিনি লাভ করিতে পারিতেন না, ইহা বোধ হয় আমরা নিঃসন্দেহেই বলিতে পারি। সে সমস্ত পদাবলীর কবিত্ব ও মাধুর্য্যের আলোচনার স্থান এ প্রবন্ধে হইতে পারে না; আর মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তিও তাহার উপযুক্ত নহে। প্রসিদ্ধ কবিগণ যে পদাবলীর কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন, তাহার গুণমাধুর্য্যের সমালোচনা করিতে যাওয়া এ অধম লেখকের পক্ষে বাতুলতামাত্র।

অন্তরের ভাববিকাশ বাহিরে এমন সুন্দর নৈপুণ্যের সহিত যিনি করিতে পারেন; হৃদয়ের প্রত্যেক স্তর উদ্ঘাটিত করিয়া তাহার রহস্য যিনি চিত্রপটের ন্যায় পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে পারেন; প্রত্যেক অশ্রু, প্রত্যেক হাস্যচ্ছটা, প্রত্যেক উৎকণ্ঠা, প্রত্যেক পরিতৃপ্তি একটি একটি আহরণ করিয়া যিনি সাহিত্যের মধুভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া রাখিতে পারেন; তাঁহার সে স্বর্গীয় প্রতিভার সম্যক্ গৌরবরক্ষা সাধারণ ক্ষমতার কর্ম্ম নহে। আর এ কথাও বলিতে হয় যে, সেই সব কবিতার নিগূঢ় রসমাধুর্য্য, তাহার সহজ-স্বচ্ছ পবিত্রতা, তাহার অন্তর্নিহিত মহাভাব উপভোগ করাও সাধারণ পাঠকের সাধ্যাতীত। সুতরাং বাহুত বিদ্যাপতির কবিতা দুইএকবার পড়িয়াই যাঁহারা তাহা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছেন মনে করিয়া তাহার সমালোচনায় অগ্রসর হন, তাঁহাদিগেরও সেটা অতিসাহসিকতা এবং অনেকটা ধৃষ্টতার পরিচয় মাত্র।

কবি রাধাকৃষ্ণপদাবলী ব্যতীত মৈথিলভাষায় শৈব পদাবলীও রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও মাধুর্য্যে বড় কম নহে। মৈথিল পণ্ডিত মহাশয় একটি পদ গান করিয়া আমাকে শুনাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার বিন্দুবিসর্গও আমার মনে নাই। এই শৈব পদাবলী বঙ্গে প্রচলিত নাই, তবে মিথিলায় ইহার বিশেষ প্রচলন আছে। কবি শেষবয়সে নাকি এই শৈব পদাবলী গান করিতে বড় ভালবাসিতেন। কথিত আছে যে, কবি যখন ভাবাবেশে বিভোর হইয়া এই সকল পদ ভক্তিরসোচ্ছ্বাসের সহিত গান করিতেন, তখন স্বয়ং মহাদেব ছদ্মবেশে ভক্তের এই কীর্ত্তন শুনিতে আসিতেন। এই প্রবাদ হইতেই উহার মাধুর্য্যের সরল-সুন্দর স্বাভাবিক বিকাশ উপলব্ধিগোচর হইবে।

কবি বিদ্যাপতি এবং রাণী লছিমা সংক্রান্ত একটি কুৎসিত প্রবাদ সাধারণ্যে প্রচলিত আছে। মৈথিল পণ্ডিত মহাশয় বলেন, উহা একান্ত অশ্রদ্ধেয়; কবি বড় আদিরসপ্রিয় ছিলেন, আর লছিমাদেবীর কাব্যাধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন, তাহাতেই বোধ হয় এই কলঙ্ককথার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। বিশেষত

মহাকবি ভবভূতির অভ্রান্ত ভাষায় ইহাও বলা যায় যে—

"যথা রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জ্জনো জনঃ।"

আমরাও মৈথিল পণ্ডিতের উক্তির অনুমোদন করি। নতুবা শিবসিংহের ন্যায় একজন প্রভাবশালী তেজস্বী নরপতি যে নিজ মহিষীর এরূপ ব্যভিচার জ্ঞাত থাকিয়াও কবিকে স্বীয় রাজসভায় স্থান দিয়াছিলেন, তাঁহার শিরশ্ছেদ করেন নাই, ইহা আমাদের নিকট একান্ত অশ্রদ্ধেয়। ভারতবর্ষের লোকে স্ত্রীর ব্যভিচার যেরূপ দোষাবহ—যেরূপ অসহনীয় বোধ করে, অন্য কোন দেশে এত করে কি না, জানি না। সামান্য ব্যক্তিরাও যখন এরূপ স্থলে আইনের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া, ভার্য্যা ও উপপতি, উভয়ের অন্যতর বা উভয়েরই শিরশ্ছেদ করিয়া থাকে, তখন শিবসিংহ নিজে রাজা এবং বীরপুরুষ হইয়া যে অবিচলিতচিত্তে যশ-উদ্ভাসিত স্বকীয় শুভ্র কুলে এ কলঙ্ককালিমা লেপন করিতে দিয়াছিলেন, এ কথা আমাদের কোনক্রমেই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

মুসলমান-আক্রমণ-কালে রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় রাণী লছিমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার কবি বিদ্যাপতির উপরেই অর্পিত ছিল, সুতরাং রাণী তাঁহার সহিত পলায়নে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমরা তো ইহাতে কবির বিশ্বস্ততারই সমধিক প্রমাণ পাইতেছি। নিতান্ত বিশ্বস্ত লোক না হইলে আর তাহার হস্তে কেহ নিজ স্ত্রীপরিবারের ভার অর্পণ করে না; কবির প্রতিও রাজার তাদৃশ বিশ্বাস না থাকিলে, তিনি এরূপ ভার অর্পণ করিবেন কেন? রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে কতদূর ভালবাসিতেন, কতদূর বিশ্বাস করিতেন, উল্লিখিত ঘটনায় আমরা তাহারই পরিচয় পাই। আমাদের বিশ্বাস, কবিও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ধর্ম্ম ও বিশ্বস্ততা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। মুসলমানদিগের সহিত রাজা শিবসিংহের বহু যুদ্ধবিগ্রহ হয়, সেজন্য অনেকসময় রাজাকে রাজধানী হইতে দূরে নিরুদ্দিষ্ট অবস্থায় থাকিতে হইত। সুতরাং রাজকার্য্যের পরামর্শ প্রভৃতির জন্য কবিকে অনেকসময় রাণী লছিমার সন্নিহিত হইতে হইত, কিন্তু তাহাতে অন্য কোন নীচ অসদভিসন্ধি ছিল না।

কবি বিদ্যাপতি একজন প্রেমের সাধক,—পবিত্র সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন। আর শুনিতে পাওয়া যায়, রাণী লছিমাও কমলার ন্যায় অসাধারণরূপলাবণ্যশালিনী ছিলেন; সেজন্য তাঁহার প্রতি কবির অন্তরের একটা আকর্ষণ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা যে সর্ব্বথা কামগন্ধশূন্য, তাহার মধ্যে যে মানবীয় রক্তমাংসসম্ভূত প্রেম-বিলাসের কণামাত্রও ছিল না, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন প্রমাণ বা হেতুই আমরা দেখি না।

রাজা শিবসিংহের ব্যবহারই আমাদের পক্ষে প্রবল প্রমাণ বলিয়া বোধ করি। লছিমাদেবীকে না দেখিতে পাইলে কবির কবিত্ব নাকি স্ফূর্ত্তি পাইত না, আবার তাঁহাকে দেখিবামাত্র কবির প্রেম-উৎস উথলিয়া শতধারে কবিত্বস্রোত ছুটিয়া বাহির হইত, এরূপ প্রবাদেরও অনেকে উল্লেখ করেন। ইহা কতদূর সত্য, তাহা আমরা অবগত নহি।

দিল্লীর বাদশাহ একবার কোন অপরাধে রাজা শিবসিংহকে কারারুদ্ধ করেন। কবি

তখন দিল্লীতে যাইয়া স্বীয় কবিত্বপ্রভাবে বাদশাহকে মুগ্ধ করিয়া রাজার উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন, এইরূপ কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে। ইহা অতিরঞ্জিত বা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

কথিত আছে, কবি আপনার অন্তিমসময় জানিতে পারিয়া পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর সলিলে স্বীয় পাপরাশি বিধৌত করিয়া তাঁহার অঙ্কেই তনুত্যাগ করিবার মানসে যাত্রা করেন। পরে গঙ্গা হইতে দুইক্রোশ দূরে থাকিতে তিনি বলেন, "আমি মায়ের জন্য এতদূর আসিলাম, আর মা আমার জন্য এই পথটুকু আসিবেন না?" ভক্ত সন্তান মায়ের স্নেহপরীক্ষার্থ অভিমান করিয়া বসিয়া রহিলেন, আর অগ্রসর হইলেন না। কিন্তু প্রাণের আহ্বান শুনিয়া জগজ্জননী কি স্থির থাকিতে পারেন? তিনি ভক্তির বশীভূত, সুতরাং একরাত্রির মধ্যেই সেই-স্থানে গঙ্গার শুভাগমন হইল। কবিও তখন ভক্তিপুলকিত দেহে পবিত্র গঙ্গাস্তব গান করিতে করিতে মায়ের পূত অঙ্কে স্বদেহ বিসর্জ্জন করিয়া মোক্ষলাভ করিলেন। এইরূপ প্রবাদও প্রচলিত আছে, কবি যেখানে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তথায় গঙ্গাগর্ভের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

আজকাল বিদ্যাপতির বংশধরগণ, শুনিয়াছি, বিসফীগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিতেছেন, কিন্তু বিদ্যাপতির বাসস্থানের চিহ্ন এখনও নাকি সেখানে বিদ্যমান আছে। কবি নিজে তথায় একটি শিবস্থাপন করিয়াছিলেন। শিবমন্দির এবং তৎপাদদেশ-চুম্বিতা কমলানাম্নী এক স্বল্পতোয়া সরিৎ আজও সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে মন্দিরটি, শুনিতে পাই, যত্নাভাবে প্রায় ভগ্ন-দশায় পতিত। ইহা যদি সত্য হয়, তবে দেশের তাহা দুরপনেয় কলঙ্ক বলিতে হইবে। মৈথিলগণের এবং বঙ্গীয়গণের কবির সে শেষস্মৃতি রক্ষার জন্য উপযুক্ত আয়োজন করা কর্ত্তব্য। মিথিলার প্রথিতযশা ধার্ম্মিকবর দ্বারবঙ্গাধিপতির গোচরীভূত হইলে বোধ হয় আর এ বিষয়ের জন্য কোনই বেগ পাইতে হইবে না।

কবি বিদ্যাপতির সম্বন্ধে যে সব তথ্য আমি জানিতে পারিয়াছিলাম, সংক্ষেপে তাহা সুধীজনের নিকট নিবেদন করিলাম। ইহাতে কবির বিষয়ে অনেক নূতন কথা আছে। সে সকল এবং পূর্ব্বশ্রুত দুইএকটি বিষয় ও তাহাদের উপর আমার যাহা বক্তব্য, তৎ-সমস্তের সমবায়ে এই প্রবন্ধ গঠিত হইল। ইহার সকল কথা সত্য কি না, বলিতে পারি না; তবে আমার বিশ্বাস, সত্যও যে অনেক-গুলি ইহার মধ্যে না আছে, তাহা নহে।*

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

* প্রবন্ধটির সঙ্কলন শ্রাবণমাসে হইলেও, পারিবারিক ও অন্যান্য নানারূপ কার্য্য নিবন্ধন ইহা মুদ্রিত করিতে কোনও পত্রিকায় দেওয়া হয় নাই। যাহা হউক, গত ভাদ্রমাসের এডুকেশন গেজেটে উদ্ধৃত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার কোন প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, সুনিপুণ প্রত্নতত্ত্বদর্শী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হর-প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বিদ্যাপতিসম্বন্ধে যে সব তথ্য জানিয়া আসিয়াছেন, তাহার অনেকস্থলে আমার সংগৃহীত বিষয়ের সহিত ঐক্য আছে। ইহা হইতে বুঝিতেছি যে, আমার সংগ্রহের মধ্যে অনেকগুলিই সত্য। এজন্য সানন্দে ইহা পাঠকগণসমীপে উপস্থিত করিলাম।—লেখক।

আয় দুঃখ, আয়।

(১)

আয় দুঃখ, আয়!
হৃদয়-কমলাসনে, বসাইব সযতনে,
প্রীতিপুষ্প দিব তব উপহার পায়;
আয় দুঃখ, আয়!

বিরহ-মথিত সুধা মিটাইবে তব ক্ষুধা,
লাগিবে নয়ন-জল তব অর্চ্চনায়;
আয় দুঃখ, আয়!

(২)

সাধিয়া দেখেছি সুখ, ভরে না তাহার বুক,
জীবন যৌবন দিয়ে তবু না কুলায়,
তবু হায়, হায়!

সর্ব্বস্ব করিয়া পণ, পাই নাই তার মন,
চির-অপরাধি-মত নত তার পায়!
আয় দুঃখ, আয়!

(৩)

বুকের শোণিত পিয়ে, কি গেল আমারে দিয়ে?
রেখে গেল চিরদিন ব্যাকুল ব্যথায়,—
চির-পিপাসায়!

দীপ্তি নিয়ে গেল সুখ, ধূমিত নির্ব্বাণমুখ—
প্রদীপের মত করি রাখিয়া আমায়;
আয় দুঃখ, আয়!

(৪)

চাহি না ক্ষণিক আলো, চির অন্ধকার ভালো,
বিশ্বব্যাপী প্রেমে তার সব ডুবে যায়;
আলো কেবা চায়?

চাহি না বাসন্তী-হাসি, চাঁদের জ্যোৎস্না-রাশি,
এতটুকু মেঘে যার লাবণ্য লুকায়,
আয় দুঃখ, আয়!

(৫)

বর্ণহীন—রূপহীন, আপনাতে চিরলীন,
আমি চাই অনুত্তম নিবিড় নিশায়,—
মগ্ন মহিমায়!

সে ত ভেদ নাহি জানে, আত্ম-পর বুকে টানে,
সে মম দুঃখের মূর্ত্তি—নমি তার পায়।
আয় দুঃখ, আয়!

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

ভারতে আব্দালী।

নাদির শাহ ও আহম্মদ শাহ আব্দালীর নাম খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইঁহাদিগের জন্য ভারতবাসীকে যেরূপ বিড়ম্বনাভোগ করিতে হইয়াছে, সেরূপ বোধ হয়, আর কাহারও জন্য করিতে হয় নাই। ক্রূরতায় ইঁহাদিগের মধ্যে কেহই ন্যূন ছিলেন না। ভারতবর্ষের ভাগ্যবিপ্লবে ইঁহারা উভয়েই সমান সহায়তা করিয়াছিলেন। বরং সে বিষয়ে আব্দালীর কার্য্যকারিতা অধিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কারণ, নাদির শাহের দিল্লী আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ফলে ভারতে জীর্ণপ্রায় মোগল-সাম্রাজ্যের ভিত্তি সমধিক শিথিল হইয়া পড়ে ও মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুশক্তির সাম্রাজ্য-বিস্তারের পথ পরিষ্কৃত হয়; কিন্তু আব্দালীর আক্রমণে ভারতের হিন্দু ও মোসলমান উভয়বিধ শক্তিই ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হয় এবং পাশ্চাত্যশক্তির প্রতাপ ক্রমশ এ দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করে। এই কারণে আব্দালীর ভারতাক্রমণ আমাদিগের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। এই ঘটনার সময় ও কারণ নির্দ্ধারণই বর্ত্তমান প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ভারতীয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সময়-নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে প্রায়ই বৈদেশিক ইতিহাসলেখকের মুখের দিকে তাকাইতে হয়। মোসলমান তওয়ারিখ-লেখকগণ ও তাঁহাদিগের গ্রন্থের ভাষান্তর-কারী ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ যে ঘটনার যে সময় ও কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সঙ্গত

হউক, অসঙ্গত হউক, তাহাই আমাদিগকে অনেকস্থলে শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হয়। কারণ, হিন্দুর লিখিত অব্দনির্ণয়মূলক ভারতেতিহাস একপ্রকার দুর্লভ। যদ্যপি সৌভাগ্যক্রমে, কোনও ঘটনার দেশীয় ভাষায় লিখিত হিন্দুপক্ষীয় ঐতিহাসিক বিবরণ কোনও স্থানে আবিষ্কৃত হয়, তথাপি ইংরাজ ইতিহাসলেখকগণ তাহার যথোপযুক্ত সমাদরে অগ্রসর হন না। হিন্দুবিজেতা মোসলমানদিগেরই বর্ণনায় তাঁহারা সমধিক আস্থা-প্রকাশ করিয়া থাকেন। কাজেই হিন্দু-পক্ষের বক্তব্য বিষয় সাধারণ পাঠকের নিকট অপরিজ্ঞাত থাকিয়া যায়। এরূপ অবস্থায় আব্দালীর ভারতাক্রমণের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ ঘটনার সময় ও কারণ সম্বন্ধে হিন্দুমতের আলোচনা ইতিহাস-জিজ্ঞাসু পাঠকের নিকট নিতান্ত অপ্রীতিকর হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

খৃষ্টীয় ১৭৪৮ অব্দে আহম্মদ শাহ আব্দালী প্রথমবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তিনি প্রথমত ইরাণের সম্রাট্ নাদির শাহের জনৈক প্রসিদ্ধ সেনানী ছিলেন। নাদিরের মৃত্যুর পর আফগানেরা ইরাণের অধীনতা অস্বীকার করিয়া আব্দালীকে তাঁহাদিগের সম্রাট্‌পদে বরণ করেন। আব্দালী তাতার-জাতীয় ছিলেন। গিল্‌জী ও দুরাণী জাতির উপর তাঁহার বিশেষ আধিপত্য ছিল। তাঁহার সেনাদলে ঐ-দুই-জাতীয় সৈনিকের সংখ্যাধিক্য ছিল বলিয়া সেকালের হিন্দুদিগের নিকট তিনি প্রধানতঃ "দুরাণী" ও "গিল্‌চি" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

আব্দালীর প্রথম ভারতাক্রমণ বিফল হইলেও ভারতবাসী তাঁহার সর্ব্বনাশকরী শক্তির আংশিক পরিচয় পাইয়াছিলেন। এই ঘটনায় দিল্লীর রাজপুরুষদিগের হৃদয়েও বিলক্ষণ আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। নাদির শাহের আক্রমণ ও ওমরাহদিগের আত্ম-বিগ্রহাদির জন্য দিল্লীর অবস্থা তৎকালে যেরূপ শোচনীয় হইয়াছিল, তাহাতে, আব্দালী যথোপযুক্ত শক্তি-সঞ্চয় করিয়া পুনর্ব্বার ভারতে প্রবেশ করিলে, তাঁহাকে বাধা দেওয়া যে বাদশাহী সৈন্যের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে না, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। দিল্লীর মোসলমান সামন্তগণের মধ্যেও বিদ্বেষাগ্নি প্রজ্বলিত থাকায় ভারতে সর্ব্বত্র মোসলেম-শক্তির প্রতাপ খর্ব্ব হইয়াছিল। সুতরাং আব্দালীর আক্রমণ-নিবারণের জন্য হিন্দুশক্তির আশ্রয়প্রার্থনা মোসলমানের পক্ষে আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রদেশে হিন্দুশক্তি পূর্ণবিকাশ লাভ করিয়াছিল। ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজী মহারাষ্ট্রজাতির হৃদয়ে যে স্বদেশোদ্ধার-বাসনার বীজ উপ্ত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এই সময়ে বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা আপনাদিগের জন্মভূমিকে বিধর্ম্মীর অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করিয়া সমগ্র ভারতে হিন্দুশাসন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। মহাপুরুষ রামদাস স্বামী * তাঁহাদিগকে "দেশের ম্লেচ্ছভাব দূরীভূত" করিয়া আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষে "মহারাষ্ট্রধর্ম্ম ও মহা-

* রামদাস-স্বামী মহারাষ্ট্রাজ্যসংস্থাপক ছত্রপতি শিবাজীর ধর্ম্মোপদেষ্টা গুরু ছিলেন। রাজনীতি-বিষয়েও তিনি শিবাজীকে ও তাঁহার সামন্তবর্গকে নানাপ্রকার উপদেশ দান করিতেন। ভারতে হিন্দুসাম্রাজ্য-

রাষ্ট্রসাম্রাজ্যের বিস্তার" করিতে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করা এই সময়ে তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষার ও হিন্দুসাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষায় তাঁহারা একপ্রকার উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। নাদিরশাহ দিল্লী লুণ্ঠন করিয়াছেন শুনিয়া বাজী রাও স্বীয় ভ্রাতা চিমাজীকে ১৭৩৯ খৃঃ ২৩শে জিল্‌হেজ (মার্চ্চ) তারিখে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই মহাভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ঐ পত্রের একস্থলে বলিতেছেন,—

"সম্প্রতি তোহমস্ত কুলী খাঁ (নাদির শাহ) বাজী জিতিয়াছে বটে; কিন্তু সমস্ত হিন্দুজাতি সাহস ও অধ্যবসায় প্রকাশ করিলে এবং আমরা সমস্ত দাক্ষিণাত্য সেনা সহ অগ্রসর হইলে, ভারতে হিন্দুগণের "বাদশাহী" (সাম্রাজ্য) প্রতিষ্ঠিত হইবে,—এইরূপ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।" *

এইরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য মহারাষ্ট্রীয়েরা তখন হিন্দুশক্তির কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিলেন। এই কারণে দিল্লীর রাজপুরুষদিগকে আব্দালীর আক্রমণ হইতে হিন্দুস্থান বা উত্তর-ভারত রক্ষার নিমিত্ত মহারাষ্ট্রশক্তির সহায়তাপ্রার্থী হইতে হয়। (১৭৫০ খৃঃ অঃ)

এই সাহায্যপ্রার্থনার বিস্তারিত বিবরণ কোন বৈদেশিক ইতিহাসলেখকের গ্রন্থেই বিশদরূপে বর্ণিত হয় নাই। এ বিষয়ে মহারাষ্ট্রীয়গণের লিখিত বৃত্তান্তই আমাদিগের প্রধান অবলম্বন। ভারতের অপরাপর প্রদেশের হিন্দুগণ যেরূপ ইতিহাসরচনায় বিমুখ, সৌভাগ্যক্রমে মহারাষ্ট্রবাসীরা সেরূপ নহেন। তাঁহারা স্বদেশীয় ভাষায় আপনাদিগের জাতীয় ইতিহাস যথাসম্ভব বিশদরূপে লিখিয়া রাখিয়াছেন। সেই সকল ইতিহাস-গ্রন্থ "বখর" নামে অভিহিত। মারাঠী গদ্যে রচিত এইরূপ ৪২খানি বখর এপর্য্যন্ত উপলব্ধ ও মুদ্রিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন সেকালের সরদার ও জাইগীরদারদিগের লিখিত অনেক চিঠিপত্র ও দলিল-সনন্দও তাঁহাদিগের বংশধরগণের ও পুণার পেশওয়েদিগের দপ্তরে অদ্যাপি অবিকৃত অবস্থায় সযত্নে রক্ষিত আছে। মহারাষ্ট্রদেশের উদ্যমশীল কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ বিভিন্ন পরিবারের প্রাচীন দপ্তর অনুসন্ধান করিয়া তন্মধ্য হইতে এপর্য্যন্ত প্রায় দুইসহস্র ঐতিহাসিক কাগজপত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। ঐ সকল বখর ও পত্রাদি পাঠ করিলে খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর ঐতিহাসিক ঘটনানিচয়ের হিন্দুপক্ষীয় বিবরণ বহুলপরিমাণে অবগত হওয়া যায়।

আব্দালীর আক্রমণ নিবারণের জন্য দিল্লীর দরবার হইতে মহারাষ্ট্রশক্তির নিকট যে সাহায্যপ্রার্থনা করা হয়, তাহার বিবরণ মহারাষ্ট্রীয় দপ্তরের কাগজপত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল কাগজপত্রের মধ্যে

সংস্থাপন না করিলে হিন্দুধর্ম্মের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে না, এই তত্ত্ব তিনি প্রথমে মহারাষ্ট্রজাতিকে শিক্ষা দেন। তিনি যেরূপে শিবাজীকে হিন্দুরাজ্যস্থাপনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ সাহিত্যপত্রের ৯ম বর্ষের ১১শ সংখ্যায় বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে মহারাষ্ট্রজাতির অভ্যুদয়ের প্রধান কারণ কি, তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে স্বামিজীর জন্ম ও ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়।

* সমগ্র পত্রখানি ও এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য পত্র মৎসংগৃহীত "বাজীরাও"নামক গ্রন্থের ১৩৯—৪০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

দিল্লীর বাদশাহের স্বাক্ষরিত একখানি অহদনামার (-করারনামার) যে অনুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, আব্দালীর দমনের জন্য বাদশাহ, মহারাষ্ট্রীয়দিগকে ৫০লক্ষ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে অগ্রিম ত্রিশলক্ষ টাকা পেশওয়ে বালাজী বাজী রাওয়ের প্রসিদ্ধ সেনানী মহ্লার রাও হোলকর ও জয়াজী রাও শিন্দের (সিন্ধিয়ার) হস্তে প্রদত্ত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন মুলতান, পঞ্জাব, খটা ও ভকর* —এই চারিটি সুভার রাজস্ব এবং হিসার, সম্বল, মুরাদাবাদ ও বদাউন প্রভৃতি মহালের চৌথ আদায় করিবার স্বত্বও আব্দালীর দমনার্থে রক্ষিত সৈন্যের ভরণপোষণের ব্যয়নির্ব্বাহকল্পে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দান করা হইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, এই করারনামার বলে মহারাষ্ট্রীয়েরা মথুরা, আজমীর, সম্বর ও নারনোল প্রভৃতি প্রদেশের ফৌজদার ও মুতালিক এবং অকবরাবাদের সুভেদার পদ অগ্রিম-পুরস্কারস্বরূপ পাইয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আব্দালীর ভারতাক্রমণের আশঙ্কা, মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতাপ ও দিল্লীর দরবারের দুর্ব্বলতা কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এই অহদনামার সর্ত্তগুলি পাঠ করিলে তাহা স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রাধিপ শেষ বাজী রাও রাজ্যভার-বহনে অসমর্থ হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তে সমগ্র রাজ্য সমর্পণপূর্ব্বক যেরূপ অবসরগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে হীনবল দিল্লীর বাদশাহ আব্দালীর ভয়ে উত্তর-ভারতের অধিকাংশ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। রোহিলারা এই সময়ে অযোধ্যা-প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়া ছারখার করিতেছিল; এই কারণে তাহাদিগের দমনের ভারও পূর্ব্বোক্ত করারনামায় স্বাক্ষরকালে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে গ্রহণ করিতে হয়।

এই অহদনামার সর্ত্ত পালনের জন্য ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র-সেনানী শিন্দে ও হোলকর রোহিলাদিগের দমনার্থ প্রথম অভিযান করেন। রোহিলা-সমর শেষ হইতে না হইতে ভারতে আব্দালীর দ্বিতীয়বার শুভাগমন হয়। শিন্দে ও হোলকরকে লইয়া দিল্লীশ্বরের উজীর সফদরজং তাঁহার প্রতিরোধার্থ যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই ভীরু বাদশাহ পঞ্জাবপ্রদেশ দান করিয়া আব্দালীকে বিদায় করিলেন। ইহার পর দক্ষিণাপথে যে সকল গোলযোগ উপস্থিত হয়, তাহার জন্য ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয়েরা আব্দালীর হস্ত হইতে পঞ্জাবপ্রদেশ উদ্ধার করিবার অবসর পান নাই।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারিমাসে পেশওয়ে রঘুনাথ রাও, মহ্লার রাও হোলকরকে সঙ্গে লইয়া, পঞ্জাব-উদ্ধারের জন্য যাত্রা করিলেন। ইহার পূর্ব্বে দুইবার (একবার ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে ও একবার তৎপরবর্ত্তী বর্ষে) তিনি উত্তর-ভারতে অভিযান করিয়াছিলেন। সেই অভিযানের ফলে রাজপুতনা, দিল্লী ও রোহিলখণ্ড অঞ্চলে মহারাষ্ট্রীয়দিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৫৬ সালে কর্ণাটক লইয়া পেশওয়েরা বিশেষ ব্যস্ত

* শেষোক্ত স্থান-দুইটি সিন্ধুপ্রদেশের অন্তর্গত।

ছিলেন। কাজেই পঞ্জাব-উদ্ধারের কথা সে বৎসর আর উঠিল না।

এদিকে দিল্লীশ্বরের নূতন উজীর মীর শাহব উদ্দীন গাজী অবসর পাইয়া পঞ্জাব উদ্ধার করিলেন। পঞ্জাব হস্তচ্যুত ও তত্রত্য সুভেদার উজীরের হস্তে লাঞ্ছিত হওয়ায় আব্দালী দিল্লীশ্বরকে শিক্ষা দিবার জন্য পুনর্ব্বার যুদ্ধসজ্জা করিতে লাগিলেন। দিল্লীর কর্ত্তৃপুরুষেরা তখন বিলাস-ব্যসনে এরূপ মগ্ন ছিলেন যে, আব্দালীর শতদ্রু উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা এই অভিনব বিপদের কোনও সংবাদ রাখিবার অংসর প্রাপ্ত হন নাই। কাজেই দুরাণী সম্রাট্ দিল্লী, মথুরা প্রভৃতি প্রদেশ অনায়াসে লুণ্ঠন করিতে সমর্থ হন।

ইংরাজ ইতিহাস-লেখকেরা এই ঘটনার যে সময়নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার সহিত হিন্দুলেখকগণের নির্দ্দিষ্ট সময়ের বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মহারাষ্ট্র-ইতিহাসলেখক কাপ্তেন গ্রাণ্ট্ ডফ্ বলিয়াছেন,—১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে মথুরা, আগ্রা প্রভৃতি সহর লুণ্ঠিত হইতেছিল, এমন সময়ে আব্দালীর সৈন্যমধ্যে মহামারী উপস্থিত হওয়ায় তিনি স্বদেশে প্রতিগমন করিতে বাধ্য হন এবং ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ভারতে পুনরাগমন করেন। কিন্তু এ মতের অনুকূল প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক কীনের মতে মথুরা প্রভৃতি লুণ্ঠনের পর আব্দালী ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে উপস্থিত হন। এই শেষোক্ত মত সত্য হইলে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি পাণিপথে যে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই-মাসেই সংঘটিত হইত। * অন্তত হিন্দুপঞ্চীয় প্রমাণে বিশ্বাস-স্থাপন করিলে এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। পশ্চাল্লিখিত বিবরণ পাঠ করিলে পাঠকগণ আমাদের উক্তির মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

বলিয়াছি, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে রঘুনাথ রাও পঞ্জাব-উদ্ধারের জন্য উত্তর-ভারত-অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৪ই ফেব্রুয়ারি তিনি মালবের অন্তর্গত ইন্দোরে উপস্থিত হন। তাহার দুইদিন পরে তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা পেশওয়ে বালাজী বাজী রাওকে এ বিষয়ে যে পত্র লিখেন, তাহার প্রয়োজনীয় অংশ এ স্থলে অনূদিত ও উদ্ধৃত হইল।—

॥ ৯ ॥

অপতাবৎ রঘুনাথের সাষ্টাঙ্গে নমস্কার। নিবেদন, তারিখ ২৬শে জমাদিলাওল (১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৭৫৭ খৃঃ) পর্য্যন্ত সমস্ত কুশল জানিবেন। ২৪শে তারিখে ইন্দোরে উপস্থিত হইয়াছি। অতঃপর বুচ করিয়া দিল্লী-অভিমুখে অগ্রসর হইব। আব্দালী দিল্লীতে আসিয়াছে। কাজেই চতুর্দ্দিগস্থ রাজন্যমণ্ডলী, জমিদার ও হিন্দুস্থানীদিগের নজর ফিরিয়াছে। এক্ষণে বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য না করিয়া, দেশজয় বা অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিলে, তাহা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। যখন আব্দালী পর্য্যুদস্ত হইবে, তখন সকলেই নম্রতা অবলম্বন করিবে। কিন্তু আব্দালীকে পরাভূত করিবার উপযোগী সৈন্য অদ্যাপি সংগৃহীত হয় নাই। * * * * * * * * *

(*) ফৌজ আসিয়া না জুটিলে অগ্রসর হওয়া যায় না। টাকা পাইতে লোকের বিলম্ব হইয়াছে। কাজেই অনেকে পশ্চাতে রহিয়াছে। যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অগ্রে টাকা পাইয়াছেন, তাঁহারাও এখন আসেন নাই। সে যাহা হউক, একমাস কি দেড়মাসের মধ্যে সকলেই আসিয়া মিলিত হইবে। ততদিনে আব্দালীর সহিত সাক্ষাৎকার ঘটিবে। যদি সে দিল্লীতে থাকে অথবা এ দিকে আসে, তবে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। যদি এ দেশ ত্যাগ করিয়া বিলাতের (আফগানরাজ্যের) দিকে চলিয়া যায়, তাহা হইলে ২।৩ মাস যুদ্ধ ঘটিবে না। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে, পূর্ব্ব বাদশাহ আলমগীর সানীকে (সানীর শীষকে) দিল্লীর সিংহাসন ও খান খানানকে উজীরের পদ দান করিয়া সে নিজের নামে "খুতবা" পাঠ করাইয়াছে। দেখা যাইক, অতঃপর সে কি করে। এক্ষণে সমস্ত রাজন্যবর্গের ও সুজাতদ্দৌলা প্রভৃতির "রাজকারণ" (রাজনীতিক কার্য্যসূত্র) তাহারই হস্তে আছে। কিন্তু এখনও কেহ তাহার সহিত গিয়া সাক্ষাৎ করেন নাই। জাঠেরা ইতোমধ্যে যুদ্ধারম্ভ করিয়াছে। সম্প্রতি ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার (আব্দালীর) সৈন্যদল বিশাল ও দুর্দ্ধর্ষ। তাহাদিগের পরাজয়সাধন করিতে বিপুল আয়োজন আবশ্যক। অতএব যদি দত্তরাকে (দত্তাজী শিন্দেকে) শীঘ্র এ দিকে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে সৈন্যসংগ্রহ সহজেই হইবে। * * *

(শেষাংশ ছিঁড়িয়া গিয়াছে।)

রঘুনাথ রাওয়ের এই স্বহস্তলিখিত পত্র পাঠ করিলে জানা যায় যে, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারির কিছুদিন পূর্ব্বে আব্দালী দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য সম্রাট্ ও উজীরকে পদচ্যুত ও স্ব স্ব পদে তাঁহাদিগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সুতরাং কীন্-মহোদয় এই ঘটনার যে সময় নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহা ভ্রমপূর্ণ, ইহা অনায়াসে বোধগম্য হয়। পক্ষান্তরে এই প্রসঙ্গে গ্রাণ্ট্ ডফ্ যে বলিয়াছেন, রঘুনাথ ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের শেষ মালবে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এই পত্রের তারিখ দেখিলে তাহাও সত্য বলিয়া স্বীকার করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ‡

সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে আব্দালী দিল্লীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে কীন্-মহোদয়ের উক্তি স্পষ্টার্থ ব্যঞ্জক নহে। তাঁহার A Sketch of the History of Hindusthan নামক গ্রন্থে সেপ্টেম্বর-মাসের পূর্ব্বে আব্দালীর দিল্লীপ্রবেশের স্পষ্ট নির্দ্দেশ না থাকিলেও নিম্নোদ্ধৃত অংশে সে কথা

* দুই একখানি ভিন্ন অধিকাংশ মারাঠী বখর ও ঐতিহাসিক কাগজপত্রে এই যুদ্ধের কাল পৌষ শুক্লা অষ্টমী বুধবার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তদনুসারে ইংরাজী ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঐতিহাসিক গ্রাণ্ট্ ডফ্, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্, কীন্, ম্যালিসন্ প্রভৃতির মধ্যে কেহ ৬ই, কেহ ৭ই, কেহ ৮ই, কেহ ১৪ই ও কেহ বা ১৭ই জানুয়ারি পাণিপথের শেষ যুদ্ধের তারিখ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কীন্ মহোদয় তাঁহার History of Hindustan নামক গ্রন্থে ১৪ই ফেব্রুয়ারি ও Madhava Rao Sindhia নামক গ্রন্থে পুরাতন পঞ্জিকা অনুসারে গণনা করিয়া ১৭ই জানুয়ারি স্থির করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রে আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট "পৌষ শুক্লা অষ্টমী বুধবার" এই তারিখই সমধিক পরিচিত। যেরূপেই গণনা করা যাউক, ১৪ই জানুয়ারি ভিন্ন অন্য কোনও তারিখেই শুক্লা অষ্টমী ও বুধবার হয় না। অধিকাংশ মোসলমান লেখকের মতে ৬ই জমাদিলাওর যুদ্ধের তারিখ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি মোসলমানদিগের ৬ই জমাদিলাওর ছিল। সুতরাং ঐ তারিখই পাণিপথের শেষ যুদ্ধের তারিখ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

(*) এইখানে সৈন্যের হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার অধিকাংশ ছিঁড়িয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে যে কয়টা সংখ্যার উল্লেখ আছে, তাহা একত্র করিলে ২০।২২ হাজার সৈন্যের হিসাব পাওয়া যায়।

† 'রাজকারণ' শব্দের সংস্কৃত বা বঙ্গীয় ভাষায় কোনও প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় রাজনীতিসংক্রান্ত বিবিধ কার্য্য ও ভাব প্রকাশকল্পে এই শব্দের ভূরি ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ইংরাজী ভাষায় political necessity, political advantage, state policy, state craft, kingly policy, political proposal, political connection প্রভৃতি বিবিধ ভাব প্রকাশের জন্য মারাঠী ভাষায় 'রাজকারণ' শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে।

‡ Vide Grant Duff's History of the Marathas p. 309. [Ed. 1873 Bombay.]

প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের ৩৪২ পৃষ্ঠায় আব্দালীর মথুরালুণ্ঠনের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—They (আফগান-সৈন্য) then returned to Delhi having suffered much from the heat, and that unfortunate capital was plundered systematically for two months from September to November 1757. এই গ্রন্থকারের Downfall of the Moghul Empire নামক গ্রন্থের উল্লেখ আরও অস্পষ্ট। প্রাগুক্ত গ্রন্থে returned পদের প্রয়োগ থাকায় যে তথ্য সূচিত হইয়াছে, শেষোক্ত গ্রন্থে তাহাও সূচিত হয় নাই। এই গ্রন্থে দিল্লীর সম্বন্ধে পশ্চাল্লিখিত উক্তির অধিক আর কিছুই নাই,—All conceivable form of misery prevailed (at Delhi) during the two months which followed the entry of the Abdali, 11th September 1757, exactly one hundred years before the last capture of the same city by the avenging force of the British Government during the great Mutiny. p. 39. ইহার পর বাদশাহ প্রভৃতির পদচ্যুতি ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। ফলত এ সকল ব্যাপার সেপ্টেম্বরের বহুপূর্ব্বে—জানুয়ারির শেষে বা ফেব্রুয়ারির প্রারম্ভেই সংঘটিত হইয়াছিল। রঘুনাথ রাওয়ের পত্রই যে এ বিষয়ের একমাত্র প্রমাণ, তাহা নহে। কৃষ্ণ জোশী-নামক এক ব্যক্তি দিল্লী হইতে এই সময়ে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাও এ স্থলে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হইতে পারে। তাঁহার পত্র ১২ই রজব (২রা এপ্রিল ১৭৫৭) তারিখে পুণায় উপস্থিত হয়। সেই পত্রের অংশবিশেষের অনুবাদ এইরূপ,—

"পাঠান (আব্দালী) দিল্লীতে আসিয়া আমীরদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ও প্রজাদিগের প্রতি ঘোর অত্যাচার করে। প্রায় ত্রিশকোটি টাকার ধনসম্পত্তি সংগ্রহপূর্ব্বক সে আপনার পুত্রের হস্তে লাহোরের পথে স্বদেশে পাঠাইয়া দিয়াছে। তাহার পুত্রের সহিত দশসহস্র আফগান-সেনা রক্ষকরূপে গমন করিয়াছে। অতঃপর পাঠান দিল্লী হইতে বহির্গত হইয়া গাজীউদ্দীন, কমরুদ্দীখানের পুত্র (মীরমনু) ও বাঙ্গালার রাজার দূতকে সঙ্গে লইয়া বলভগড়ের নিকট উপস্থিত হয়। তথা হইতে মথুরায় গমন করে। তথায় জাঠদিগের জাঠ ছিল। তাহারা অগ্রসর হইয়া উভয়প্রকারে যুদ্ধ করে। কিন্তু পাঠানের সৈন্যসংখ্যা অধিক ছিল বলিয়া প্রায় তিনহাজার জাঠ শত্রুপক্ষীয় অসির আঘাতে প্রাণত্যাগ করে। অবশিষ্ট দুইসহস্র জাঠ পলাইয়া যায়। তখন পাঠানেরা মথুরা আক্রমণ করে। দুইপ্রহর পর্য্যন্ত নগরলুণ্ঠন ও নাগরিকদিগের হত্যাকার্য্য সংঘটিত হইয়াছিল। অতঃপর অলমশাহের জয়ঘোষণা করিয়া সকলকে অভয়দান করা হয়। এইরূপে তথায় আপনার শাসন প্রবর্ত্তিত ও ২০লক্ষ টাকার ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া পাঠান গোকুল-বৃন্দাবনে লুণ্ঠনোদ্দেশে একদল সেনা প্রেরণ করে। সেইখানে দুইহাজারিহাজার বৈরাগী ও নাগা সন্ন্যাসী ছিল। তাহারা সমবেত হইয়া যুদ্ধ করে। তাহাতে দুইহাজার বৈরাগী ও দুইহাজার পাঠান মরে। ইতোমধ্যে উকিল (দূত) গুণলকিশোর পাঠানকে জানাইলেন যে, বৃন্দাবন ফকিরদিগের স্থান—সেখানে টাকা-কড়ি পাইবার সম্ভাবনা নাই। এই কথা শুনিয়া পাঠান সৈন্যদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ প্রেরণ করিলেন। সেই যুদ্ধে সমস্ত বৈরাগী প্রাণত্যাগ করিয়া গোকুলনাথের রক্ষা করিল। গুণলকিশোর এখনও পাঠানের নিকটেই আছেন।

মথুরা হইতে কুচ করিয়া পাঠান আগ্রার সমীপবর্ত্তী হয়। তখন আগ্রার প্রজারা সহরের বাহিরে

আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করে। পাঠান ৫লক্ষ টাকা লইয়া সন্ধি করিতে প্রস্তুত হইল। সহরবাসীরা তাহাতে সম্মতিপ্রকাশ করিল। কিন্তু টাকা সংগ্রহ করা তাহাদিগের পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। টাকা দিবার যে দিন ধার্য্য হইয়াছিল, তাহা অতীত হইল। তখন পাঠান আগ্রা আক্রমণ ও লুণ্ঠন পূর্ব্বক ছারখার এবং দুর্গ বাহুবলে হস্তগত করিল। গাজীউদ্দীন খান আব্দালীর পক্ষ হইতে দুর্গে প্রবেশপূর্ব্বক উহা অধিকার করিলেন। বাদশাহের নামে সহরে জয় ও অভয় সংবাদ ঘোষিত হইল। পাঠান তথায় ৫।৭ দিন অবস্থানের পর আটক্রোশ অগ্রসর হইয়া ছাউনী করিয়াছে। সেখানে দশদিন হইতে কুড়িদিন পর্য্যন্ত থাকিবে।" * * * *

এই পত্রখানি সম্ভবতঃ মার্চ্চমাসের মধ্যভাগে লিখিত হইয়া থাকিবে, তাই ২রা এপ্রিল তারিখে পুণায় পৌঁছিয়াছে। সুতরাং মার্চ্চমাসের প্রারম্ভেই বৃন্দাবনের বৈরাগীদিগের সহিত আব্দালীর যুদ্ধ হইয়াছিল, বলিতে হইবে। বৃন্দাবনের যুদ্ধের বহুপূর্ব্বে যে দিল্লী লুণ্ঠিত হইয়াছিল, এ কথা এই পত্রে স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে। কাজেই সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীলুণ্ঠনের কথা অশ্রদ্ধেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইল।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-মাসে আব্দালী ভারতে ছিলেন, এরূপ মনে করিবারও কোনও কারণ নাই। ঐতিহাসিক এলফিন্‌ষ্টোন্‌-সাহেবের মতে আব্দালী জুন-মাসে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। প্রকৃতপক্ষে চৈত্রমাসের শেষে বা এপ্রিলের প্রারম্ভেই এই পাঠানপ্রবর স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কারণ, তিনি যখন আগ্রা অধিকার করিতেছিলেন, তখন রঘুনাথ রাও সসৈন্যে উদয়পুরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে তখন ৪০সহস্র সৈন্য ছিল এবং প্রত্যহ নানা স্থান হইতে মারাঠারা আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতেছিলেন। যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া আব্দালীর দর্প চূর্ণ করিবার রঘুনাথ রাওয়ের বিশেষ ইচ্ছা ছিল; কিন্তু মহ্লার রাও হোলকর পথিমধ্যে নানাপ্রকার অকারণ গোলযোগ উপস্থিত করায় তাহা ঘটিয়া উঠিল না। রঘুনাথ রাওয়ের দিল্লী পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আব্দালী স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছিলেন। রঘুনাথ রাও পঞ্জাব পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিবার বাসনাও করিয়াছিলেন; কিন্তু হোলকরের জন্য তাহাও বিফল হইল। অন্তত রঘুনাথ রাও ২০শে সওয়াল (১৯শে জুন) নাগোর-অঞ্চল হইতে পেশওয়ে বালাজী বাজী রাওকে যে পত্র লিখেন, তাহাতে এই কথা প্রকাশ পাইয়াছে। মহ্লার রাওয়ের বুদ্ধিদোষে ও স্বার্থপরতার জন্য যে পাণিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ভাগ্যবিপর্য্যয় হয়, এ কথা ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের অবিদিত নাই।

মহ্লার রাওয়ের কৌশলজাল ভেদ করিয়া জুলাইমাসের প্রারম্ভে রঘুনাথ রাও দিল্লীসহরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি তথায় গিয়া আব্দালীকে দেখিতে পান নাই। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার দিল্লীতে উপস্থিতির বহুপূর্ব্বে যে আব্দালী প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ২৪শে জিকাদ্দ বা শ্রাবণ কৃষ্ণা একাদশী (১২ই জুলাই) তারিখের পত্রে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। আমরা সেই পত্রের প্রারম্ভভাগ এস্থলে অনূদিত করিয়া দিলাম;—

॥ শ্রীশঙ্কর ॥ শ্রীচরণে নিবেদন,—এ বৎসর চৈত্র-বৈশাখ-মাসে সৈন্যদল আসিয়া জুটে। আব্দালী চৈত্র-পর্য্যন্ত মথুরায় ছিল। সেজন্য আমরা নূতন দেশবিজয়াদির কোনও ব্যবস্থা করিতে পারি নাই। অন্তর্ব্বেদী (দোয়াব) প্রভৃতি প্রদেশ হইতে আমাদের যে শাসন উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সথারাম পন্তকে ২হাজার ও বিঠ্ঠলপন্ত, গঙ্গোবা ও অন্তাজী প্রভৃতি সর্দ্দারকে ২০হাজার সৈন্য দিয়া পাঠাইয়াছিলাম। সে সকল প্রদেশে এখন পূর্ব্ববৎ বন্দোবস্ত-ব্যবস্থা হইয়াছে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ—এই দুই মাস আমরা অবসর পাইয়াছিলাম। সেই সময়ের মধ্যে, পূর্ব্বে যে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, তাহা নিবারণ করিয়াছি। * * *

শেষোক্ত বাক্যদুইটি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, বৈশাখমাসের পূর্ব্বেই আব্দালী ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই প্রমাণে কীনের উক্তি সর্ব্বতোভাবেই খণ্ডিত হইতেছে।

আব্দালী ৫০সহস্র সৈন্য লইয়া যখন দিল্লী আক্রমণ করেন, তখন অন্তাজী-মাণিকেশ্বর-নামক জনৈক মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার ৫সহস্র সৈন্য সহ তথায় উপস্থিত ছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে যে অহদনামার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সর্ত্ত-অনুসারে এই মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার পেশওয়ের পক্ষ হইতে দিল্লীর শান্তিরক্ষার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মোগলদিগের প্রাচীন রাজধানী দিল্লী মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারের রক্ষণাধীন হওয়ায় অনেক আমীরের পক্ষে তাহা ঘোরতর অবজ্ঞাজনক বলিয়া বোধ হইয়াছিল। আব্দালীর সহায়তাগ্রহণ ভিন্ন মহারাষ্ট্র-আধিপত্য তিরোহিত হইবে না ভাবিয়া, দিল্লীর অনেক প্রধান ব্যক্তি আব্দালীকে গোপনে অভ্যর্থিত করিতেছিলেন। নজীবখাঁ-নামক প্রসিদ্ধ রোহিলা-সর্দ্দার সেই কারণে বাহুত আব্দালীর বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াও যুদ্ধকালে সসৈন্যে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। অন্তাজী মাণিকেশ্বর তখন প্রমাদ গণিলেন। তিনি তথাপি প্রাণপণে শত্রুর সম্মুখীন হইতে ভীত হন নাই। পূর্ব্বোদ্ধৃত কৃষ্ণ জোশীর পত্রের শেষ অংশে অন্তাজীর বীরত্বের প্রশংসাবাদ পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহার ৫হাজার সৈন্যের মধ্যে ২॥০হাজার নিহত হইলে, তিনি পলায়ন করিতে বাধ্য হন। তাঁহার পুত্রও অশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া রণস্থলে প্রাণত্যাগ করেন। আগ্রায় নারোশঙ্কর ও সমশের বাহাদুর নামে দুই মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার ছিলেন। তাঁহারা আব্দালীকে বাধা দিবার কোনও চেষ্টাই না করিয়া পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করেন। নারোশঙ্করের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার দুর্ব্যবহারের অভিযোগ হইয়াছিল। রঘুনাথ রাওয়ের একখানি পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া তাঁহাকে শাস্তি দিবার সঙ্কল্পের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

৪০সহস্রাধিক সৈন্যসংগৃহীত হইলে রঘুনাথ রাও আব্দালীর বিরুদ্ধে দিল্লী-অভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন। মহ্লার রাও যদি তাহাতে পদে পদে বিঘ্ন উপস্থিত না করিতেন ও আব্দালী আর দুইতিনমাস দিল্লীতে থাকিতেন, তাহা হইলে রঘুনাথ রাওয়ের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিত। যুদ্ধবিদ্যায় রঘুনাথ রাওয়ের যেরূপ অভিজ্ঞতা ছিল, তাহার বিষয় চিন্তা করিলে মনে হয়, যদি সেপ্টেম্বর বা নবেম্বর পর্য্যন্ত আহম্মদ শাহ আব্দালী ভারতবর্ষ ত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে পাণিপথের যুদ্ধের পরিণাম মহারাষ্ট্রীয়দিগের পক্ষে সম্ভবতঃ অশুভকর হইত না।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

জামাই-ষষ্ঠী।

১

এল, এ পাস্ বিরজামোহন যখন নগদ দেড়হাজার টাকার যৌতুকসহ সালঙ্কারা বালিকা-পত্নী সুকুমারীকে বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া যান, তার পর তিন বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শ্বশুর বিনোদলাল বসু মার্চেণ্ট আফিসে প্রৌঢ়বয়স পর্য্যন্ত কেরাণীগিরি করিয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, কন্যার বিবাহোপলক্ষে তাহা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। অতএব এই তিনটা বছর তাঁহার সাম্‌লাইয়া উঠিতে গেল। বলা বাহুল্য, ইহার ভিতর পুত্রাপার্জ্জনে জামাতার যথাসাধ্য তত্ত্ব তল্লাস করিতে তিনি ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু তাহাতে নগদ সোণারূপার সম্পর্ক না থাকাতে বেহাই এবং বেহাইনের মন উঠে নাই।

সস্ত্রীক বিনোদলাল সহজেই নূতন কুটুম্বের বিরাগভাব বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তাহার কোন কারণ অনুমান করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ফলত সেকালে যেমন "পিসিলোকের দুঃখ কেবল পিসিলোকেই বুঝিত, নরলোকে বুঝিত না," একালে তেম্‌নি পাস্‌করা ছেলেদের জনক এবং জননীঠাকুরাণীদের রাগ বিরাগ বুঝিয়া উঠা সচরাচর মনুষ্যবুদ্ধির অতীত। তা সে যেমনই হউক, বিবাহের পর দুইবার বিনোদলাল জামাতাকে ষষ্ঠীবাটার সময় গৃহে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, পড়াশুনার ক্ষতির ওছিলায় বৈবাহিক মহাশয় তাহাতে অমত করেন। কিন্তু ছেলে এবার বি, এ, পাস্ দিয়া আইনের পড়া পড়িতেছে, পূর্ব্বের আপত্তি আর খাটে না। এদিকে গৃহিণী বলিতেছেন যে, তাঁর পুত্রটি যখন ছোট ছোট দুইটা পাস্ দিয়াছিল, তখনই নগদ দেড়হাজার টাকা মর্য্যাদাস্বরূপ গৃহজাত্ হয়। বিরজা এখন আরো একটা বড়গোছের পাস্ দিয়াছে, দুই বছরে বড় আদালতের উকীল হইবে, এখন অন্তত হাজার টাকা দর্শনী না পাইলে তিনি বাছাকে পরের-বাড়ী-মুখো হইতে দিবেন না, তা সে হইলই বা শ্বশুরবাড়ী। শুনিয়া বিরজার বাপ্ রাধাচরণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—"সেইজন্যেই তখন বলেছিলুম, গিন্নি, দুটো বছর অপেক্ষা কর, বি, এ, পাস্‌টা হয়ে যাক্! দেখ না, মধুর ছেলে, সে আমার বিরুর চেয়ে কিসে ভাল? —বরং দেখ্‌তে একটু কাল। তা সে কি এ, পাস্ দিয়ে বিবাহ করাতেই না অলঙ্কার ও বরাভরণ ছাড়া নগদ চারটি হাজার টাকা—ট্যাঁক্‌শালের নতুন আমদানী—মধুমিত্তির সভাস্থলে সেদিন গুণে নিলে!" শুনিয়া গৃহিণী কিছু উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং কুটুম্বগৃহের প্রেরিত দাসীকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "একটা হীরার ভাল আংটি বিরুকে না দিলে, জামাইষষ্ঠীতে তার যাওয়া হইবে না।"

২

বিরজামোহন গ্রীষ্মের ছুটী উপলক্ষে কলি-

কাতা হইতে বাটী আসিবার উদ্যোগে আছেন, এমন সময় সহসা একদিন যুগপৎ শাশুড়ীর অশ্রুসিক্ত এবং শ্যালীদের ব্যঙ্গপূর্ণ দুইখানি চিঠি তাঁহার হস্তগত হইল। শাশুড়ী লিখিতেছেন, "হীরের আংটি কোথায় পাব বাবা? যা কিছু তোমার শ্বশুরের ছিল, সুকু ছোট মেয়ে, তার বিয়েতে খরচ করেচেন। হীরে, তা তুমিই আমাদের হীরে-মাণিক! মাকে একটু বুঝিয়ে বলো বাপ্ আমার!" শ্যালীরা একজোট হইয়া লিখিয়াছিলেন—"কিগো ঘোষ-মোশাই, আবার আংটি-বদল নাকি? না নতুন পাস্ দিয়ে পায়া বেড়ে গেছে? তা ভাই মথুরার রাজতক্তে বসে তোমার হীরে-মতির দরকার হতে পারে, কিন্তু ব্রজধামের দুঃখিনী আমরা, আর আমাদের প্রেমভিখারিণী কিশোরী সুকুমারী, সে বনফুল মাত্র!" মহা অপ্রস্তুতে পড়িয়া ফেরৎ ডাকে বিরজামোহন উত্তর লিখিলেন যে, অঙ্গুরীয়ের কথা শুনিতে তাঁহাদের বোধ হয় ভুল হইয়াছে এবং জামাইষষ্ঠীর সময় নিশ্চয় তিনি শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইবেন। এদিকে কিন্তু রাগ করিয়া বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন, বাপ্-মাকে কোন কথা লিখিলেন না।

বিনোদলালবাবুর বাটী কোন্নগরের অদূরে, প্রত্যহ তিনি ট্রেণে কলিকাতায় যাতায়াত করেন। যথাসময়ে জামাতার চিঠির উত্তর পাইয়া মেয়েরা ভারি খুসী হইলেও, তিনি বুঝিলেন, অতঃপর বেহাই-বেহাইনের সহিত প্রকাশ্য কলহ অনিবার্য্য। লজ্জায় পড়িয়া বিরজা পিতামাতার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই ষষ্ঠীবাটার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু ইহার পরিণাম তাঁহাদের পক্ষে ভাল হইবে না। সাত-পাঁচ ভাবিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি মাসে মাসে টাকা দিবার কড়ারে জামাতার জন্য স্বর্ণকারের দোকানে হীরকাঙ্গুরীয়ের ফরমাইস্ দিলেন এবং বিনয়নম্র ভাষায় বৈবাহিক মহাশয়কে পত্র লিখিলেন যে, তিনি বিরজার জন্য আংটির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সে কথা বিরজামোহনের অগোচর রহিল না। কয়বছর ছাত্রবৃত্তি পাইয়া কিছু টাকা তিনি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তার উপর বন্ধুদের কাছে কিছু ধার করিয়া হ্যামিল্টনের বাড়ী তিনি এক নূতনতর হীরকাঙ্গুরীয়ের অর্ডার দিলেন।

৩

জামাইষষ্ঠীর প্রভাতে হাবড়া হইতে যে ট্রেণখানি বর্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিল, তাহাকে জামাইবাবুদের গাড়ী বলিলে কিছুমাত্র অসঙ্গত হয় না। অন্যান্য কামরার কথা ছাড়িয়া আমরা মধ্যশ্রেণীর একখানি গাড়ীর কথাই এখন বলিতে বসিয়াছি। কেন না, এই ক্ষুদ্র ইতিহাসের নায়ক বিরজামোহন তাহাতে অন্যতম যাত্রী। ঘটনাধীনে নব-বিবাহিত এবং শ্বশুরালয়াভিমুখ ২৫।৩০ জন নবীন যুবাপুরুষ সেই একখানি গাড়ীর বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ অধিকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রায় সকলেরই পরণে কালাপেড়ে কোঁচান ধুতি, মাথায় এলবার্ট টেরি, বুকে বাঁধা কোঁচান চাদর এবং রঙীণ সার্টের বক্ষকোটরে মোটা সোণার চেন ঝুলান। অনেকেরই পায়ে ফুলদার ষ্টকীং এবং কোঁচান চাদরের উপর ফুলের ক্ষুদ্র

তোড়া। কিন্তু বেশভূষায় কতক কতক পার্থক্য থাকিলেও এক বিষয়ে নির্ব্বিশেষ একতা সকলের ভিতর বিরাজ করিতেছিল। সকলেরই মুখে সিগারেট্ অবিশ্রামে ধূমোদ্গার করিয়া সে স্থান "অতিসেব্য" করিয়া তুলিয়াছিল।

কেবল বিরজামোহন এই দলের ভিতর একটু স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। ধূমপানে তিনি তেমন অভ্যস্ত হন নাই এবং উড়ানিতে সার্টের শোভা আবৃত করিয়া নীরবে একমনে "কৃষ্ণচরিত্র" পাঠ করিতে[illegible] ছিলেন। দেখিয়া স[illegible] চসমা-পরিহিত [illegible] শুনিলাম, এই [illegible] য়াছে—[illegible] স[illegible]

প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক এই গাড়ীতে বর্দ্ধমান যাইতেছিলেন। গাড়ী হাবড়া-ষ্টেশন্ পার হইলেই, তিনি একটু নিভৃত কোণ খুঁজিয়া নিদ্রার আয়োজন করিলেন। কিন্তু জামাইবাবুদের দৌরাত্ম্যে লীলুয়ায় ট্রেণ থামিতে না থামিতে তাঁহাকে উঠিয়া বসিতে হইল। দেখিয়া সেই এন্ট্রান্স-ক্লাসে পড়া বাবুটি স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়ের কোথায় যাওয়া হচ্চে? অবশ্য শ্বশুরালয়ে?" প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঈষৎ বিরক্তি[illegible]

ইয়া তাঁর বচনের সার্থকতা আঠার-আনা-রকম করিতে তৎপর হইল।

৪

শ্বশুরালয়ে পৌঁছিয়া বিরজামোহন অন্দরে নীত হইলেন। তথায় প্রশস্ত বারান্দায় তাঁহার উপবেশনের জন্য কার্পেটের আসন বিছান ছিল এবং নিজের ও পাড়ার শ্যালিকা-সম্পর্কীয় সুন্দরীগণ—সংখ্যায় প্রায় দ্বাদশটি—তাঁহার সাদর-সম্ভাষণার্থ সে স্থান আলো [illegible] উরসা করিয়াছিলেন, পাত্রে রাশিরাশি ফল ও মিষ্টান্ন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিরজামোহন প্রথমে আহারে অনিচ্ছাপ্রকাশ করায় বড় শ্যালী ও ঠাকুরাণীদিদিদের কাছে শুনিতে পাইলেন যে, একটা-কিছু তাঁকে খাইতেই হইবে, হয় মিষ্টান্ন, না হয় কর্ণমর্দ্দন! কাজেই তিনি আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। মিছরির পানা মুখে দিবামাত্র বুঝিলেন, সেটা খড়-ভিজান জলমাত্র; পান্‌তুয়ার ভিতর ছুঁচ, রসগোল্লায় আলপিন্! বিরজার দুর্দ্দশা [illegible]খিয়া শ্যালিকাদের আনন্দের সীমা রহিল [illegible]লহরী বহির্বাটীতে [illegible] শাশুড়ী-ঠাকু-[illegible]মাতার উদ্ধার [illegible]বা-

আহার্য্যে আর কোন তঞ্চক ছিল না। তবে পিঁড়ির নীচে সুপারি রক্ষিত হওয়ায় বসিবার সময় জামাতা-বাবাজীর পা একবার পিছলাইয়া গিয়াছিল বটে।

সন্ধ্যার পর বৈঠখানায় যে গীতবাদ্যের মজ্‌লিস্ বসিল, বিরজা তাহাতে হার্ম্মোনিয়ম্ বাজাইয়া শ্যালকদের সাধুবাদ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ৯টার পর আহারান্তে যখন তিনি শয়নগৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন সত্যসত্যই মনে হইতেছিল, বরটি যেন চোরটি!

৫

শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া কিছু সন্দিগ্ধচিত্তে বিরজামোহন তাহার চারিদিক্ চাহিয়া দেখিতেছিলেন। আড়িপাতার দৌরাত্ম্যের কথা তাঁহার শোনা ছিল, দোর-জানালার প্রাচুর্য্যে কক্ষটি তাহার উপযোগী দেখিয়া কিছু সঙ্কোচের সহিত তিনি শয্যায় প্রবেশ করিলেন। বিবাহের পর একবারমাত্র বালিকা পত্নীর সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল, দুই বৎসরে সে দেখিতে কেমন ও কত-বড়টি হইয়াছে, তাহা মনে করিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় আপাদ-মস্তক-অবগুণ্ঠিতা কিশোরী আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল এবং শয্যায় বসিয়া বিরজামোহনের করস্পর্শ করিল। বিরজা বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, কোন কথা না বলিয়াই বালিকা তাঁহার অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় পরাইতে ব্যস্ত। শ্যালিকারা গৃহের বাহিরে যে অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাহা মৃদু অলঙ্কারশিঞ্জিতে বুঝা যাইতেছিল। কিন্তু আংটি-পরান শেষ হইলে বিরজামোহনের মনে হইল, এখন লজ্জা করিলে নিতান্তই সেই চিঠির তামাসায় তাঁহাকে হারি মানিতে হয়। হ্যামিল্‌টনের বাড়ীর হীরকাঙ্গুরীয় রুমাল হইতে খুলিয়া তিনিও বালিকার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিলেন।

প্রকোষ্ঠের উজ্জ্বলালোকে দ্বার এবং জানালার ছিদ্রপথ দিয়া শ্যালিকারা এই অঙ্গুরীয়বিনিময় দেখিলেন এবং একযোগে হাসিয়া উঠিলেন। বিরজামোহন মহা অপ্রস্তুত হইয়া দেখিলেন, আংটি পরিয়া অবগুণ্ঠিতা মাথার কাপড় ফেলিয়া দিয়াছে এবং সে যেই হৌক, কিন্তু সুকুমারী নহে! বধূরূপী বালক হাসিয়া বলিতেছিল—"কেমন জামাইবাবু, সুকুদিদি সেজে কেমন তোমায় ঠকিয়েচি!"

দুয়ার খোলা পাইয়া ঠাকুরাণীদিদি ও শ্যালিকার দল আর একবার বিরজামোহনকে লইয়া পড়িলেন। তাঁহার উপহৃত অঙ্গুরীয় সুকুমারীকে পরাইতে পরাইতে সকলেই মুক্তকণ্ঠে উহার কারুকার্য্যের প্রশংসা করিতেছিলেন। অঙ্গুরীয়শীর্ষে ক্ষুদ্র তিনটি মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছিল। একজন হীরকখণ্ড দেখাইয়া মধ্যবর্ত্তী যুবাপুরুষকে প্রলুব্ধ করিতেছিল। কিন্তু যুবার মুগ্ধদৃষ্টি লজ্জা-বিনতা কিশোরীতে তন্ময়, অথচ বামহস্তভঙ্গীতে মনে হইতেছিল, অমূল্য হীরকখণ্ড ঘৃণায় তিনি প্রত্যাখ্যান করিতেছেন!

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

রেজেষ্টারী-দর্পণ। পাকুড়ের সব্‌রেজিষ্ট্রার শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। পঞ্চম সংস্করণ। মূল্য ॥০ আট আনা।

আমাদের এইরূপ ধারণা আছে যে, লোকে আইনের মর্ম্ম-বিবৃতির পুস্তকের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া কার্য্য করা অপেক্ষা ব্যবসায়ীর পরামর্শ লইয়া কার্য্য করা অধিকতর শ্রেয় ও নিরাপদ্ মনে করে। এবং তাহারা যে ঠিকই বুঝে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আইন প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যে স্থলে আইনের পরিবর্ত্তন হয় নাই, সে স্থলেও দেখা যায় যে, নজিরের দ্বারা আইনের অর্থের পরিবর্ত্তন হয়; কেন না, কথার মর্ম্ম সকলে একইরূপ বুঝে না; এবং ইংরেজের আদালতে আইন অপেক্ষা নজিরের প্রভাব অধিক। এরূপ অবস্থায়, এই পুস্তকখানি পাঠ করিলেই যে, রেজেষ্টরি-বিষয়ে সাধারণ লোকের পক্ষে উকীল-মোক্তারের দ্বারস্থ হওয়া বন্ধ হইবে, এমন কথা বলা চলে না। তবে, আমরা এ কথা অনায়াসেই বলিতে পারি যে, রেজষ্টরী আইনের, এবং সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য কয়খানি আইনের, সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম বেশ্ সরল ভাষায় এবং প্রাঞ্জলভাবে এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাঁহারা রেজেষ্টরি আইনের মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য এই পুস্তক অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহাদের এই বিষয়ে একটা মোটামুটি জ্ঞান নিশ্চয়ই জন্মিবে। এই পুস্তকের যখন পঞ্চম সংস্করণ হইয়াছে, তখন ইহা যে আদৃত হইয়াছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। গ্রন্থকারের পরিশ্রম প্রশংসনীয়।

লক্ষ্মী মা। লক্ষ্মী বউ। লক্ষ্মী মেয়ে। শ্রীবিধুভূষণ বসু কর্ত্তৃক প্রণীত। প্রত্যেকের মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

এই তিনখানি ক্ষুদ্র পুস্তক, স্ত্রীপাঠ্য গার্হস্থ্য উপন্যাস। উপন্যাসের বৈচিত্র্য এগুলিতে কিছুই নাই, এবং থাকিবার প্রয়োজনও ছিল না। যে উদ্দেশ্যে লিখিত, তাহা সফল হইয়াছে। বালিকাদিগের নীতি-শিক্ষার হিসাবে এই পুস্তক-তিনখানি ভালই হইয়াছে। চরিত্র একটিমাত্র; তাহাকেই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় স্থাপন করিয়া তিনখানি উপন্যাস হইয়াছে—মা, বউ এবং মেয়ে, তিনটিই লক্ষ্মী বটে; এবং এই তিনটির মধ্যে যে-কোনটি বয়স ও অবস্থা ভেদে অপরের স্থানের অধিকারিণী। সাহিত্যিক গুণপনা কিছু নাই। কিন্তু এই তিনখানি পুস্তকের বিশেষ প্রশংসা এই যে, এগুলিকে আমরা অকুণ্ঠিতভাবে মাতা, ভগিনী, স্ত্রী ও কন্যার হাতে অর্পণ করিতে পারি। আজকালকার বাঙ্‌লা উপন্যাসের হিসাবে ইহা বড় কম প্রশংসার কথা নহে।

এই পুস্তকগুলিতে পূর্ব্ব-বঙ্গের বাক্যব্যবহার-প্রণালীর পরিচয় অনেকস্থলে পাইয়াছি; তাহা পরিহার করিতে পারিলে ভাল হইত।

যুগল-প্রদীপ। উপন্যাস। শ্রীননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

এই উপন্যাসখানির মূল কল্পনা অতি উপাদেয়, অতি সুন্দর। বৈদেশিক দুইচারিখানি উপন্যাসে ও নাটকে এইরূপ এবং ইহার অপেক্ষাও উচ্চতর কল্পনা দেখিয়াছি বটে; কিন্তু আমাদের ভাষায় এই প্রণালীর কল্পনা, বোধ হয় প্রথম দেখিয়াছিলাম, বঙ্কিমবাবুর 'যুগলাঙ্গুরীয়ে'; আর দেখিলাম, সমালোচ্য উপন্যাসে।

সুদক্ষ হস্তে এই সুন্দর মূল কল্পনা অতি উপাদেয়, অতি আদরণীয়, পরম সুন্দর উপন্যাসে পরিণত হইতে পারিত। ননিলালবাবুর হাত বড় কাঁচা; তাই এমন সুন্দর কল্পনাও তাঁহার হাতে মাটি হইয়া গিয়াছে।

প্রথমেই, রামধন সরকারের পাঠশালার চিত্র নিতান্ত অস্বাভাবিক। যতই দুরন্ত হউক না কেন, গুরুমহাশয়ের 'সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রা' করিতে পারে, এমন ছাত্র ভূ-ভারতে কখন জন্মে নাই। বিশেষত রামধন সরকারের মতন গুরুমহাশয়; যাহার সম্বন্ধে গ্রন্থকার নিজেই লিখিয়াছেন—"সাক্ষাৎ শমন-সদৃশ বেত্রধারী রামধন সরকারের ছাত্রগণের আর্ত্তনাদধ্বনিত পাঠশালা।" তার পর, অন্নপূর্ণার হাতেখড়ি—এটা কি ব্যাপার? বেটাছেলের হাতেখড়ি হইত এবং হয় বটে—আমাদেরও একদিন হইয়াছিল—কিন্তু মেয়েছেলের হাতেখড়ির কথা এই প্রথম শুনিলাম; তাহাও আবার পাঠশালায় গিয়া!

চরিত্রচিত্রণে গ্রন্থকার নিতান্ত অপটু। 'সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ চন্দ্রচূড় তর্করত্ন' সন্ন্যাস-গ্রহণ-কালে ভ্রাতাকে আদেশ করিয়া গেলেন যে, অন্নপূর্ণার বিবাহের দুইদিন পূর্ব্বে যুগল-প্রদীপের অভ্যন্তরস্থ লিপিখানি, একছত্রও নিজে না পড়িয়া, একটি অক্ষরও অপরকে না দেখাইয়া, তাহার মাতার হস্তে—অবস্থাবিশেষে, অন্নপূর্ণারই হস্তে—দিতে হইবে। এ আদেশে এইরূপ বুঝায়, যেন বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজন পণ্ড করাই চন্দ্রচূড়ের উদ্দেশ্য ছিল। ইহাতে চন্দ্রচূড়ের 'সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদত্ব' ত প্রকাশ হওয়া দূরের কথা, বরং বুদ্ধির হীনতা—বুঝ মস্তিষ্কের বিকৃতিও—প্রকাশ পায়। মদনমোহন চূড়ামণি একটি আস্ত আহাম্মক এবং নির্ব্বোধের শিরোমণি। তাহার প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক কার্য্যে, এই আহাম্মকি দেদীপ্যমান। ফরমায়েশী বোকা ব্যতীত আর কাহাকেও এমন লোকে ঠকাইতে পারে না। অথচ বিজ্ঞ, সংসারাভিজ্ঞ হরমোহন দত্তকে এবং ডাকাইত নরেন্দ্রনাথকে এই আহাম্মক অবলীলাক্রমে ঠকাইল। অন্নপূর্ণা চিরদিন অমরনাথকে স্বামি-রূপেই ভাবিয়া আসিয়াছেন, তাহাকে স্বামি-রূপে পাইবার জন্য না করিয়াছেন, এমন কাজ নাই। সেই অন্নপূর্ণা নিজের বংশ-পরিচয় পাইয়াই যে অমরনাথের সঙ্গে মাতা-পুত্র-সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন—ইহা হাস্যজনক। এমন আরও অনেক আছে, কিন্তু সকল নির্দ্দেশ করিবার স্থান আমাদের নাই।

উপন্যাসখানির গঠনও ভাল হয় নাই। দস্যু নরেন্দ্রনাথকে ইহার মধ্যে আনিয়া ঢুকাইবার কি যে প্রয়োজন ছিল, তাহা

বুঝিতে পারিলাম না। উপন্যাসের বিকাশ ও পরিণতির জন্য সিপাহীবিদ্রোহ ও আউট্‌রাম-সাহেবের অবতারণা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

তবে, এ কথা বলিতে পারি যে, পুস্তকখানির কাগজ ভাল, ছাপা ভাল, এবং ভাষাও অনিন্দনীয়।

গান। শ্রীবিহারিলাল সরকার বিরচিত। মূল্য ॥০ আট আনা।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে বিহারী বাবু সুপরিচিত। 'বিদ্যাসাগর', 'শকুন্তলা-রহস্য,' 'ইংরেজের জয়' প্রভৃতি লিখিয়া বিহারী বাবু আশানুরূপ যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। গানের পুস্তক প্রকাশের উদ্যম তাঁহার এই প্রথম। অন্তত বিহারী বাবুর রচিত গানের পুস্তক ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখি নাই।

প্রথম উদ্যম হউক, ইহা প্রশংসার্হ হইয়াছে। এই গানগুলি পড়িতে বসিয়া কয়েকটি বিষয়ে স্বতই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রথমেই চক্ষে পড়ে, অকপট হৃদয়ানুভূত ভক্তি। একটা কিছু রচনা করিতে হইবে বলিয়া যে কোন গান রচিত হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না—বেশ্ বুঝা যায় যে, সংগীতগুলি ভক্তিপূর্ণ চিত্তের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস। এক স্থলে, পাদ-মন্তব্যে (foot-note) দেখিলাম, কিছুদিন পূর্ব্বে বিহারী বাবুর পুত্রবিয়োগ ঘটে, এবং তদুপলক্ষে রচিত কয়েকটি সংগীত এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এরূপ দুর্ব্বিপাকেও বিহারী বাবুর ভক্তি অচলা। প্রিয়জন-বিয়োগে মানুষ ভগবানেও অবিশ্বাসী হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত সংসারে বিরল নহে। কিন্তু বিহারী বাবুর ভক্তি কিছুতেই টলে না। পুত্রবিয়োগে, অতিমাত্র ব্যথিত হৃদয়েও, বিহারী বাবু বলিতেছেন—

—"ব্যথাহারী বলে হরি!
ভালবাস কি হে ব্যথা দিতে?
ব্যথা দিয়ে তাই কি হে,
চাহ ব্যথা ঘুচাইতে?" ইত্যাদি।

সমস্ত গানটা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইলাম। আন্তরিক ভক্তির ইহার অপেক্ষা অধিক প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

বিহারী বাবুর অনুকূলে আরও একটা কথা বলিবার আছে। তিনি ভক্ত, এবং বোধ হয় বৈষ্ণব; কিন্তু গোঁড়া নহেন—যেমন কীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন, তেমনি আগমনী, বিজয়া ও শ্যামা-সংগীত রচনা করিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা গেল যে, তিনি বৈষ্ণব বটেন, কিন্তু নেড়ানেড়ীর দল—দেশের দুর্ভাগ্যবশত আজকাল যে দলের কিছু প্রাদুর্ভাব দেখা যায়—সে দলভুক্ত নহেন। অতএব বিহারী বাবুকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। তিনি যদি আজকালকার হুজুগে বৈরাগী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারিতাম না; কেন না, তাহা করিলে আমরা পাপভাক্ হইতাম।

নির্জ্জলা খাঁটি সাহিত্যের হিসাবে এই পুস্তকের বিচার হওয়া কর্ত্তব্য নহে; সুতরাং তাহা আমরা করিলাম না। তবে বিহারী বাবুকে একটা অনুরোধ করিতে পারি। এই সকল গানের দুই-একটা সুরসংযোগে সুগায়কের মুখে শুনিলে আমরা আপ্যায়িত হইব। সংগীত, কেবল কথায় সার্থক হয় না। সুরসংযোগে সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন. কলকাতা-৭০০০০৯

বঙ্গদর্শন।

বিদেশী বন্ধু।

১

একটি বিশাল হ্রদ। ঐ তাহার উত্তরতীরে সুরেন্দ্রধনুরচ্ছিন্ন দৈত্যজঙ্ঘার ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ শৈলশ্রেণী,—স্তূপাকার, বিশৃঙ্খল,—কোথাও তরুপুঞ্জে ধূসর, কোথাও নগ্নতায় বিকট, কোথাও হ্রদগর্ভে অবগাঢ়, কোথাও বা বিজনভীম ঊর্দ্ধে উচ্ছ্রিতশির। আপনাদের অবশ্য একটা কোন দেশ অনুমান হইতেছে—তা অনুমানই করুন, আমি কিন্তু এখন কিছু বলিব না। আরও চাহিয়া দেখুন—পশ্চিমদিকে শৈলশ্রেণী যেন নামিয়া গিয়াছে।—ঐ একটি উপত্যকা। ওখানে মানুষের বসবাস আছে। ঐ দেখুন, উপত্যকা হইতে এখানে-সেখানে-ভগ্ন সোপানশ্রেণীর ন্যায় শিলাদেহ হ্রদে অবতরণ করিতেছে এবং তাহার ঊর্দ্ধভাগে একটি সঙ্গতাকার শিলাগঠন ধূধূ দেখা যাইতেছে। ঐ একটি বাড়ী। ঐ বাড়ীতে অনেকে সাধ করিয়া গিয়া বাস করিয়া থাকে। স্থিরবদ্ধ তরঙ্গা[illegible]য় পাহাড় যখন অধীরতাড়িত [illegible]মুখীন হয় এবং আপন বক্ষে নিষ্পেষিত ব্যালোল ফেনরাজিকে মালতীমালার ন্যায় ধারণ করে—সেই নেত্রহর দৃশ্যটিমাত্রের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ঐ-দেশীয় বহু যাত্রীকে ঐ অঞ্চলে আকর্ষণ করিয়া আনিত।

২

হ্রদের দক্ষিণতীরে একটি সহর। এখানে আমি বিদ্যার্থী হইয়া প্রবাসী। ঐ দেশের একজন অধ্যাপকের কাছে আমি পড়িতাম। 'এমার্সন' যে রূপান্তরনিয়মে 'অমরত্বে' হইতে পারে, সেই রূপান্তরনিয়মে আমার অধ্যাপককেও 'পিতৃত্বে' বলা যাইতে পারে। কিন্তু এ সংস্কৃতনামের বারবার আবৃত্তি ছাড়িয়া শুধু 'অধ্যাপক'নামেরই আশ্রয় লইব। আমার পণ্ডিতমহাশয়ের এরূপ একটি গৌরবাখ্যা ছিলও বটে।

আমাদের অধ্যাপকের একটি দুরন্ত পুত্র ছিল; অথবা সে-দেশীয় সকল যুবাই আমাদের কাছে অল্পাধিক দুরন্ত বলিয়া বোধ হয়। অধ্যাপকের সম্পত্তির অধিকারী ঐ একমাত্র পুত্র। কিন্তু কখনও সে পড়া-

শুনায় মন দিত না। এই যুবার এইরূপ একটি নাকি বিশেষত্ব ছিল। এক-পাল কুক্কুর লইয়া সে নাকি আমাদের পূর্ব্ব-প্রদর্শিত উপত্যকায় শীকার করিয়া বেড়াইত; আশেপাশে সমস্ত পর্ব্বতমালা তাহার কুক্কুরের চীৎকারে প্রতিধ্বনিত হইত। এই মাতৃহীন যুবক সঙ্কল্প করিয়াছিল, বিবাহ করিবে না। সেজন্য অধ্যাপকের কোনও ক্ষোভ ছিল না; কিন্তু তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের পুত্র ওরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকিবে, ইহাতেই তাঁহাকে কষ্ট দিত। বিদ্যালাভের উপর অধ্যাপকের একটি অসঙ্গত আস্থা ছিল—যাহা দার্শনিকেরই উপযুক্ত। এই দুটি পিতাপুত্রের সম্বন্ধ সেই দেশের সাধারণ পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ হইতে কিছু অন্যরূপ ছিল। এ সব কথা প্রথম অধ্যাপকের মুখেই জানিতে পাই।

অধ্যাপক মানুষটি বড়ই সরল প্রকৃতির—সহৃদয়তা একরূপ অল্পই দেখিয়াছি। কিছু-দিন তাঁহার কাছে পড়িতেই তিনি আমাকে তাঁহার গৃহে গিয়া বাস করিতে আহ্বান করিলেন, আমি ভয়ে ও আনন্দে অধ্যাপকের গৃহে স্থান লইলাম। কয়েকদিন যাইতেই অধ্যাপক আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"যুবক, আমার কথা শুন; আমার একটি দুরন্ত পুত্র কিছুদিন হইল ভ্রমণে গিয়াছিল; তাহার সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ সমাধা করিয়া আজই সন্ধ্যায় সে ফিরিতেছে। তোমার ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হইয়াছি, কিন্তু তাহার সহিত আরও বিবেচনা করিয়া চলিবে। অবশ্য তোমাদের বাসকক্ষ পরস্পরের নিকটে নহে এবং তুমি অধ্যয়নশীল,—অল্পই দেখা হইবে—তবু বলিয়া রাখিলাম। সে কাহারও সঙ্গে মিশিতে চাহে না। পড়াশুনার একরূপ বিরোধী। অত্যন্ত রাগী—হার্কিউলিসের মত গায়ে জোর! তবু"—(এইখানে ঠিক কথা ক'টি তুলিয়া দিই) "Yet the dog has a heart, he has a heart I am sure—an honest rascal."

সেইদিনই সন্ধ্যার সময়ে কে আমার কামরার কাছের সিঁড়িটি দিয়া গট্‌গট্ করিয়া উঠিয়া আসিতেছে। আমি যে দোতলাঘরে থাকিতাম, ঠিক তাহার ঊর্দ্ধে তেতলায় অধ্যাপক বাস করিতেন। তাঁহার কক্ষে যাইবার সিঁড়ি আমার কক্ষের দরজা মেলিতেই বারাণ্ডার বাঁ দিকে দেখা যাইত। আমি পদশব্দ শুনিয়াই, বারাণ্ডায় বাহির হইয়া অন্যমনস্কভাবের ভাণ করিয়া একখানি পুস্তক হস্তে দাঁড়াইয়া রহিলাম। সর্ব্বাঙ্গ লম্বা কোর্ত্তায় ঢাকিয়া এক-পা এক-পা দৃঢ়ভাবে ধাপে ধাপে ফেলিয়া কে একজন উঠিতেছে। তাহার পশ্চাতে তিস্‌তিস্ তিস্‌তিস্ আরও কতকগুলি শব্দ শোনা গেল। এই-ই অধ্যাপকের পুত্রবর। সহসা উপরে না গিয়া সে আমার দিকেই আসিল এবং পাঁচ-সাতটা কুক্কুরে বারাণ্ডাটি যেন ভরিয়া গেল। রাঙারাঙা বিশৃঙ্খল চুল, জল্‌জল্ চক্ষু, অযত্নকর্ত্তিত গুম্ফশ্মশ্রু—একটা প্রকাণ্ড ধব্‌ধবে শাদা হাত সে আমার দিকে বাড়াইয়া দিল। আমি প্রস্তুত ছিলাম না—শেক্‌হ্যাণ্ড করিলাম। ইতিমধ্যে কুক্কুরেরা কেহ পশ্চাতের দু'পা ভাঙিয়া গম্ভীরভাবে প্রভুর দিকে চাহিয়া বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়াই পুচ্ছ নাড়িতে

কোনটা কোনটা আমার এবং সেই ভদ্রলোকের গায়ে উঠাউঠি করিতে আরম্ভ করিল। যুবা হাসিয়া বলিলেন, "আপনি সেই ভারতবর্ষীয় ছাত্র? এক্ষণি আসিতেছি, ক্ষমা করিবেন।"

আমি কিছু উত্তর না করিতে করিতেই কুক্কুরপাল সঙ্গে যুবক উপরে উঠিয়া গেল। আমি একটু বিরক্তিমিশ্র বিস্ময় অনুভব করিতে লাগিলাম—ভারতবর্ষীয় ছাত্র বলিয়া যুবক হাসিল কেন? উপহাস? কিন্তু তাহার করমর্দ্দনের ভাবটি বড় সৌহার্দ্দ জানাইয়াছে ত! না, প্রতারিত হইলাম? ভাবিতে ভাবিতে কামরায় প্রবেশ করিয়া গিয়া বসিলাম। চাকর আলো দিয়া গেল। আজ তাহাকে "ড্যাঙ্ ঘু" দিতে ভুলিয়া গেলাম—অন্যমনস্কভাবে বসিয়া থাকিলাম। যেন একটু কষ্ট হইতে লাগিল। কতদূর হইতে আসিয়াছি—কোথায় স্নেহ! কোথায় ভালবাসা! বাড়ীর কথা মনে পড়িল, বাঙ্‌লার অনেক যুবকের মূর্ত্তি উঠিয়া মিলাইয়া গেল—অজানত চক্ষুপ্রান্তে অশ্রু বিগলিত হইল বুঝি!—ইতিমধ্যে সেই বিশৃঙ্খল মূর্ত্তি, একগাল হাসিয়া আমার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে হাস্যে কোন সন্দেহ আর থাকে না। যুবা জিজ্ঞাসা করিলেন:—

"আপনি কি এখনি আবার আপনার ঐ গ্রন্থে ডুব দিবেন? (আমার টেবিলে তখন একটিমাত্র প্রকাণ্ডকায় এমার্সনের গ্রন্থাবলী ছিল—সেইটি দেখাইয়া) ডুব দিলে শীঘ্রই আপনাকে ভাগিয়া উঠিতে হইবে। ইণ্ডিয়ান্ হইলেও আপনার আপেক্ষিক গুরুত্ব ঐ গ্রন্থজিনিষটির তুলনায় কম হইবে।" আমার অধ্যাপক আমার আগমনবার্ত্তা সবিস্তারে তাঁহার পুত্রকে লিখিয়াছিলেন, তথাপি প্রথম সাক্ষাতেই এত উপহাস কেন? যা হউক, সহজেই আত্মসংবরণ করিলাম, বিশেষত তাহার মুখভাবটি আমাকে বড়ই আকৃষ্ট করিতেছিল। আমি বলিলাম:—

"আমি সম্প্রতি এমন-কোন ডুবের চেষ্টা দেখিব না, তবে আপনার সঙ্গে একটা আলাপের মধ্যে ডুব দিবার ইচ্ছা আছে—যদি আপনার রুচিকর হয়।" কথাটা বড় সসঙ্কোচে বলিলাম।

"তবে আসুন না, আমাদের ডিনার আজ একত্র করিয়া লওয়া যাক। টেবিলে একঘণ্টা বেশ আলাপ চলিবে—তার পরেও আমার আপত্তি নাই,—সমস্তরাত্রি চলিলেও আমি পৃষ্ঠভঙ্গ দিব না—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ"—একটা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। আমি ভাবিলাম—বাঃ, এই কি মেশামিশি না করিবার মত লোক? না, আমিই বিদেশী চরিত্রে প্রতারিত হইতেছি? বলিলাম, "চলুন, সাহ্লাদে যাইতেছি।" পাশেই আমাদের ভোজনাগার। অধ্যাপকও আসিয়া ডিনারে যোগ দিলেন।

৩

পূর্ব্বরাত্রের ডিনারে আমাদের বন্ধুত্ব কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে। রবার্টের সরলতা দেখিয়া তাহার পিতাও একরূপ বিস্ময়মিশ্র আনন্দ লাভ করিলেন। আমি বিশেষ আনন্দিত হইলাম।

পরদিন সকালবেলায় আমি অধ্যাপকের সঙ্গে পড়াশুনা করিতেছিলাম। গ্রীক্

দর্শন ও ভারতীয় দর্শন—এই দুয়ের তুলনা ও আলোচনা চলিতেছিল। এইরূপ আলোচনার সময়ে বুড়া অধ্যাপকের ভাব দেখিলে আপনারা আশ্চর্য্য হইতেন—এবং তাঁহার চরিত্রটি বুঝিয়া লইতে পারিতেন। বুড়া আলোচ্য বিষয়টির মধ্যে এতদূর মগ্ন হইয়া যাইতেন যে, আর কিছুই তাঁহার বোধ থাকিত না। সেদিন ক্ষণে ক্ষণে তিনি চট্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেছিলেন এবং জোরে পকেটের মধ্যে হাত প্রবেশ করাইয়া দিতেছিলেন—মধ্যে মধ্যে যখন "O flight of human thought" কথাটি প্রতি পদাংশের উপর জোর দিয়া একরূপ উচ্চ ও কর্কশ স্বরে উচ্চারণ করিতেছিলেন, তখন শরীরটিকে আরও ঊর্দ্ধ করিবার জন্য জুতার অগ্রভাগটুকুর উপরমাত্র ভর করিয়া দাঁড়াইতেছিলেন। সেই বিরলকেশ, পক্বশ্মশ্রু, হাস্যে ডগমগ মুখটি, সেই দীর্ঘ কৃষ্ণচ্ছদ, এবং সেই কালো পোষাকের উপর সামে-ঝুলান দুখানা বড় বড় হাতের অঙ্গুলিবদ্ধ, জোর-করিয়া-যতদূর-সম্ভব প্রসারিত অবস্থা, কখনো হাত-দুটির পশ্চাতে অঙ্গুলিবদ্ধ অবস্থা আমার আজও অবিকল মনে পড়িতেছে। সেইদিন প্রভাতেই গ্রীকদর্শনপ্রসঙ্গে সক্রেতিসের ব্যক্তিগত জীবনের কথা উঠিল। প্লেটোর Symposium বা 'ভোজ'নামক গ্রন্থে আপনারা মাতাল আল্‌কিবায়েডিসের মুখে উচ্ছ্বসিত আবেগে সক্রেতিসের চরিত্র-বর্ণন পাঠ করিয়াছেন বোধ হয়। অধ্যাপক সেই বর্ণনা অবলম্বন করিয়া Symposium-এর সেই ভাগটি একরূপ অভিনয় করিয়া দেখাইতেছিলেন। 'Then rushed in Alcibiades' এই বলিয়া তিনি দৌড় দিয়া কামরার এক ধার হইতে আর এক ধারে ছুটিলেন; টেবিলের উপর কনুই ভর করিয়া (যেমন অ্যাল্‌কিবায়েডিস্ করিয়াছিল) গল্‌গল্ গল্‌গল্ করিয়া, কখনো গ্রীকে, কখনো ইংরাজীতে, বলিয়া যাইতে লাগিলেন।

"Then he took off his shoes and walked upon the snows" এই বলিয়া ঠিক আপনার জুতা-জোড়াটি খুলিয়া একধারে গিয়া আড়ষ্টমূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তাঁহার এই দৌড়াদৌড়িতে কাচের কয়েকটা টিউব্ পড়িয়া গেল—সেদিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই—আমার লক্ষ্য থাকিলেও, অভিনয়ে এতদূর আকৃষ্ট হইতেছিলাম যে, সেদিকে যাইতে পারিলাম না। আমাকে যেন যাদু করিয়া বসাইয়া রাখিত, হাত-পাটি নাড়িবার পর্য্যন্ত সাধ্য থাকিত না।

এইরূপ যাদুমন্ত্রে অধ্যাপক আমাকে শিখাইতেন, তাঁহার কথা বলিতে আরম্ভ করিলে আমার আর থামিবার জো থাকে না। যাক্, সেদিন পড়া সাঙ্গ করিয়া আমার কামরায় গিয়া দেখি, দরজার দিকে প্রকাণ্ড পিঠ দিয়া কে একজন বসিয়া আছে। একটা প্রকাণ্ড মাথা, একমাথা চুল!

পদশব্দে রবার্ট ফিরিয়া চাহিল।

"তোমরা অভিনয় করিতেছিলে?" রবার্ট কখন্ যেন উপরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

আমি। হাঁ, অধ্যয়নের প্রকৃষ্ট উপায় অভিনয়।

রবার্ট। (হাসিয়া) আমিও গ্রীকে বক্তৃতা করিতে পারি।

আমি। বেশ ত।

রবার্ট। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ বিশ্বাস করিলে? তুমি বড় সহজেই বিশ্বাস কর দেখিতেছি। এখানকার যুবাদের দলে মিশিয়াছ?

আমি। বড় বেশী নহে। কাল শুধু তোমার দলে।

রবার্ট। আমি এখানকার নহি।

আমি। তবে কোথাকার?

রবার্ট। Across the lake of the valley. হ্রদের পরপারে—ঐ উপত্যকার।

আমি। শীকারে বৎসরের কতমাস কাটাও?

রবার্ট। সারা বৎসর।

এই বলিয়া রবার্ট গম্ভীর হইয়া বসিল। বলিল, "আমি আজই উপত্যকায় যাইব, আমাকে স্মরণ রাখিও।"

আমি। তুমি কি দীর্ঘ বিদায় লইতেছ?

রবার্ট। না, আমাকে তোমার প্রাণের কাছে রাখিও।

এই বলিয়া দুটা বড় বড় হাত বাড়াইয়া দিল। আমি প্রীতিপূর্ণ বিস্ময়ে বইগুলি ম্যাটিংএ ধপ্ করিয়া ফেলিয়া, হাতদুটি একত্র করিয়া আমার দুটি হাতে চাপিয়া ধরিলাম। রবার্ট আমাকে টানিয়া পার্শ্বের চেয়ারে বসাইল এবং আমার একটি বাহু তাহার বুকের উপর লইল। আমার চক্ষু প্রীতিতে বিস্ফারিত হইল। একি? এ দেশে আসিয়াও কি আমার এমন যুবা মিলিল? অনেকক্ষণ আলাপ চলিল। আমি আলাপান্তে বিস্ময়ে-প্রীতিতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিলাম—সেদিন আর পড়া হইল না। তিনচারিদিন ধরিয়া শীকারের আয়োজন চলিল। এই তিনদিনে আমাদের বন্ধুত্ব দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে লাগিল। চতুর্থদিনে রবার্ট যখন চলিয়া গেল, মনে হইল, যেন আবাল্যের একটি প্রিয়সঙ্গী হারাইয়াছি—অথচ নূতন বন্ধুত্বের মাধুর্য্যই যে হৃদয়কে সুখ এবং পীড়া দিতে থাকিল, তাহা কিন্তু বুঝিতে পরিলাম।

রবার্টের সঙ্গে আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছে। তাহার হৃদয় কি মিষ্ট, কি উদার, কি উন্নত, কি সরল!

"সরলয়োঃ সখি সখ্যমনাবিলম্।" বিদেশ, বিজাতীয় ভাষা, কই কিছুতেই ত প্রাণের পথরোধ করিতে পারিল না! কিছুতেই ত আমাদের যৌবনসুন্দর হৃদয়ের মুখে দাঁড়াইতে পারিল না।

আমার পড়াশুনা, অধ্যাপকের সঙ্গে বিজ্ঞানচর্চ্চা—সর্ব্বত্রই বরার্টের কথা আনিতাম। অধ্যাপক একদিন হাসিয়া বলিলেন, "দুটা বিপরীত প্রকৃতির গাছ যেমন কলমে জোড়া লাগে, তোমরা সেইরূপ মিলিয়াছ। আমি এতদূর আশা করি নাই, কিন্তু (হাসিতে হাসিতে) জান ত, He is an honest rascal, an honest rascal—more honest than I understand. আমি উৎসাহসহকারে বলিতাম, "এ দেশে উহার মত দ্বিতীয় যুবক আর নাই।" অধ্যাপক হাসিয়া বলিতেন, "That's youth, that's youth—Ah golden." এই বলিয়াই অন্যকাজ বা পড়া আরম্ভ করিতেন।

এই একটি কৌতুক! আমি বুড়াকে কখনো এইরূপ goldenএর মত বিশেষহীন বিশেষণগুলিকে পূর্ণ করিতে শুনি নাই। বিশেষণ বিশেষ্যের অপেক্ষা না করিয়াই হাঁটু ভাঙিয়া পড়িয়া যাইত। যাক্ সে কথা।

এইদিন রবার্ট আর একবার শীকার সাঙ্গ করিয়া ফিরিয়াছে। সারাদিন মৈত্রীর উৎসবে, নানা আলাপে কাটিয়া গেল। আজি যেন রবার্ট মাঝে মাঝে একটু উতলার ভাব ধারণ করিতেছিল—তাহার দৃষ্টি ক্ষণে ক্ষণে অনির্দ্দিষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। এ কথা আমার কাছে বরং শেষে, স্মৃতিতে উপস্থিত হইয়াছিল এবং এখন মনে পড়িতেছে; তখন তত লক্ষ্য করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। রাত্রে রবার্ট আমাকে ডাকিয়া লইয়া চৌতল কক্ষে বসিল। ডিনারের পর তখন আটটা রাত্রি হইবে। কার্পেটের ম্যাটিংএ আলো পড়িয়াছে। কেদারাগুলি যেন বুড়ামানুষের মত বসিয়া-বসিয়াই ঘুম দিতেছে। রবার্টের মায়ের একটি বৃহৎ ছবি ঠিক আমাদের মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া যেন আমাদের মৈত্রীসুন্দর আলাপ শুনিতেছে এবং প্রীতির হাস্য হাসিতেছে। ঐ সুন্দর স্নেহময় মুখখানি মনে মনে কত পূজা করিয়াছি। রবার্টের দুটি বেহালা বক্ষের বক্রখাতে অন্ধকার জমাইয়া যেন এক এক জোড়া বিকটমর্দ্দিত গুম্ফ প্রদর্শন করিয়া, আমাদের নিকটেই দেয়ালে দুলিতেছে। সেই নীলাভামিশ্র আলোকে সকল নির্জীব বস্তুকেই সজীবের মত বোধ হইতেছিল। আমরা দেয়ালের কাছে আসিয়া বসিয়াছি। এই রবার্টের শয়নগৃহ। ঘরটি বেশ বড়। আস্‌বাব্ স্বল্প।

রবার্ট কেদারার এক ডানার উপর শরীরার্দ্ধ হেলাইয়া, পিঠ ঠেকাইয়া বসিল এবং দুটি হাতে আমার গলদেশ আকর্ষণ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "তুমি কি বোধ কর আমাকে সম্পূর্ণরূপ জানিতে পারিয়াছ? আমার হৃদয়ের সব কথা জানিয়াছ?"

আমি। সব কথা কে জানে? তবে বহুদূর জানিয়াছি।

রবার্ট। Fool!

এই বলিয়া একটু মৃদু হাসিল, আবার গম্ভীর হইয়া বলিতে আরম্ভ করিল—

"আচ্ছা মনে কর মিনার্ভার একটি শ্বেত-প্রস্তরমূর্ত্তি আছে।"

রবার্ট আজ থামিয়া থামিয়া কথা বলিতেছিল, অন্যান্য দিনের ন্যায় গল্‌গল্ বেগে নহে। আমি বলিলাম, "বেশ, তার পর?"

রবার্ট। মনে কর পরমা সুন্দরী।

আমি। বেশ।

রবার্ট। তুমি তাহাকে ভাল বাসিয়া জীবন কাটাইতে পার না?

এই বলিয়া রবার্ট ঘুরিয়া-বসিয়া আমার বাহু তাহার বাহুতে জড়াইয়া লইল এবং অঙ্গুলিগুলি আমার অঙ্গুলিগুলিতে বদ্ধ করিয়া করতল একটু জোরে পিষ্ট করিল—আবার বলিল, "একটি পরমসুন্দরী মূর্ত্তিকে হৃদয় দিয়া জীবন কাটাইতে পার না?"

একি অদ্ভুত প্রশ্ন? আমি বিস্মিতস্বরে

তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলাম, "প্রস্তর-মূর্ত্তি? না।"

রবার্ট। মনে কর, সে যদি চলিতে পারে; তার অঙ্গ যদি গোলাপের ন্যায় কোমল হয়; তার কেশ যদি পবনের ক্ষমতার বাহিরে না থাকে; তার চক্ষুর গোলাপী পাতা যদি ওঠে-নামে; তার নাসিকা হইতে যদি হৃদয়ের উত্থানপতনের অনুগামী লঘুনিশ্বাস বাহির হয়; (আমার দৃষ্টি এতক্ষণ কেবলি বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া তাহার অনির্দ্দিষ্ট দৃষ্টির উপর স্থাপিত হইতেছিল) তার চক্ষুর দৃষ্টি যদি কোমল, মধুর, উজ্জ্বল, হাস্যে দীপ্ত, করুণায় সজল হয়—হর্ষচঞ্চলতা অপেক্ষা বরং করুণ গাম্ভীর্য্যই ব্যঞ্জিত করে; তার ওষ্ঠাধরের গোলাপ যদি ভয়ের শীতবাতে কম্পিত এবং সুখের অরুণস্পর্শে হাস্যে প্রস্ফুট হইয়া উঠে; তার বাহু যদি রোমীয় দীর্ঘচ্ছদ পরিহার করিয়া আধুনিক ল্যাভেণ্ডার-বস্ত্রে আবৃত হয়"—

বাধা দিয়া আমি আমার বিস্ময় গোপন করিয়া, উপহাসস্বরে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম—

"তুমি দেখি আর ডুম্‌স্‌ডের পূর্ব্বে থামিতেছ না—থাম থাম—সংক্ষেপে বল না কেন—সে যদি পরমা সুন্দরী একটি আধুনিক কন্যা হয়!—হাঁ, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাকে ভালবাসিয়া জীবন কাটাইতে পারি"—বলিয়াই আমার বোধ হইল, যেন উপহাস বড় রূঢ় হইয়াছে। রবার্টের দৃষ্টি তখনও অনির্দ্দিষ্ট। সেই অনির্দ্দিষ্ট তরলসুন্দর দৃষ্টিটি ঘুরিয়া আসিয়া আমার চক্ষুর উপর স্থাপিত হইল। সেই দুর্জ্ঞেয়-গভীর দৃষ্টি দেখিয়া আমার মুচ্‌তা আমি বিশেষরূপে অনুভব করিতে লাগিলাম, আমার কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে আমার কল্পনাতে একটি প্রেমকাহিনী জাগ্রত হইয়া উঠিল—রবার্টের হৃদয়ের একভাগ যেন একটি কোন স্বপ্নময়—সৌন্দর্য্যময় কক্ষে অবতরণ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল—তাহার তরল দৃষ্টি রহস্যে অতিমাত্র নিগূঢ়ভাব ধারণ করিল। উৎফুল্ল হইয়া অর্দ্ধস্পষ্টস্বরে বলিয়া উঠিলাম, "কত সুন্দর! কত সুন্দর!" রবার্টেরও যেন একটা চিন্তা অপগত হইল। নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে সে বলিতে লাগিল—

"যাক্ যাক্! তুমি এখানকার যুবকদের ভাল করিয়া জান? এমন খাপাপ জীব আর কোথাও পাইবে না। তাহাদের মুখের উপর থুথু ফেলিতেও আমার ঘৃণাবোধ হয়"—(ক্রমেই স্বর চড়িতেছিল) "তাহাদের ভালবাসা সব খেলা, কুপ্রবৃত্তি, উচ্ছৃঙ্খলতা"—(হঠাৎ বাহু ছাড়াইয়া লইয়া দুই করতলে এক সশব্দ আঘাত করিয়া) "এইজন্যই ইহাদিগকে আমি কুক্কুরের ন্যায় দেখি—কথাও বলি না". (সহসা উঠিয়া-দাঁড়াইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে, আমিও সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলাম)—"বালিকাগুলিই কি ভাল? সেগুলিকেও খারাপ করিয়া তুলিয়াছে! সহরে কথনো, কখনো থাকিও না—ঐ উপত্যকার গ্রামে গিয়া গৃহস্থাপন কর। কথা! কেবলি কথা! কথা বন্ধ করিয়া দাও,—হাজার-এক বিপদ্ অন্তর্ধান করিবে। কথা না থাকিলে হৃদয়ের অনুভবশক্তি প্রখর হয়, সর্ব্বাঙ্গে হৃদয় ফুটে!"—আবার আসিয়া বসিল। কিন্তু একি? এ কোন্

রহস্য? আমি রবার্টের বাহুর উপর করতল ন্যস্ত করিয়া কহিলাম, "একি? রবার্ট, একি?"

রবার্ট এবার—যেন উত্তেজনা অপগত হইল—আমার দিকে ফিরিয়া, কিছুক্ষণ পরে হাসিয়া বলিল, "The sweetest story."

আমি। খুলিয়া বলিতে আপত্তি আছে কি?

রবার্ট। আপত্তি! দূর!

এই বলিয়া আমার স্কন্ধে বাহু তুলিয়া দিল এবং বলিতে আরম্ভ করিল। ধীরে ধীরে রবার্ট তাহার sweetest story প্রকাশিত করিল। ধীরে ধীরে তাহার মনের দ্বার খুলিয়া একটি বিচিত্র, মনোহর হৃদয়-পক্ষী আমার দৃষ্টিপথে উৎপতিত হইল। আমি রবার্টের পুণ্যস্পর্শ অনুভব করিতেছি বলিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলাম। ঘরে গিয়াও সারারাত সেই অদৃষ্ট উপত্যকার কথা, তাহার মধ্যে একটি বিদেশি-ভাবের গ্রামের কথা, নূতন-রকম গৃহপ্রাঙ্গণ, গৃহশ্রীর কথা, একটি প্রস্তরহর্ম্যের মধ্যস্থিত একটি সৌম্যা সুন্দরীর কথা ভাবিতে থাকিলাম। ভাবিতে থাকিলাম, ঐ উপত্যকায় কেমন একটি অজ্ঞাত গ্রাম আছে; তাহার উদ্যানে উদ্যানে কিরূপ ফলের গাছ, ফুলের গাছ, শুধু ছায়ার গাছ; রাঙা-রাঙা কুর্ত্তি পরিয়া বালিকারা সকালবেলায় তরুচ্ছায়ায় দুগ্ধ দোহন করিতে থাকে, কেমন গুন্‌গুন্ করিয়া তাহাদের মনিবগৃহের সুন্দরী কন্যার গুণের কথা জল্পনা করে—আমার এই প্রবলহৃদয় বন্ধুটি কিরূপে তাহার হৃদয়টি ঐ বালিকার প্রেমস্পর্শে অবনমিত করিয়াছে। কেমন সে একদিন শীকারে গিয়াছিল—যাত্রার সেই মাহেন্দ্রমুহূর্ত্তে অদৃশ্য পরীগণ কি তাহার কণ্ঠে বরমাল্য নিক্ষেপ করিয়াছিল? অশ্বের সুন্দর গ্রীবাটি বাঁকাইয়া টানিয়া সেদিন কি রবার্ট ঐ দ্রদৃষ্ট পশুর নেত্রে এক অপূর্ব্ব প্রসন্নতা দেখিতে পাইয়াছিল? কেমন করিয়া আমার বন্ধুর রুধিররঞ্জিত শীকারলব্ধ হরিণীটিকে গ্রামের পথ দিয়া বন্ধুর সেই শিবিরে লইয়া যাইতেছিল—তখন কেমন একটি পুরাতন গাড়িতে একটি সুন্দরী ধনিকন্যা বায়ুসেবন করিতেছিল—হঠাৎ সেদিন রক্তাপ্লুত মৃগীর দৃশ্য দেখিয়া তাহার প্রাণে কিরূপ আঘাত লাগিল,—কেমন করিয়া কি মধুর ভাষায় করুণা প্রকাশ করিল!. বিদেশিনীর মস্তকে টুপি! কিরূপ বেশভূষা! গৌরকপোল কিরূপে করুণচক্ষের পল্লবচ্ছায়ায় ছায়াভারাক্রান্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রবার্ট মোহিত হইয়া গেল। ঘোড়া হইতে নামিয়া শীকার কিশোরীর চরণে রাখিয়া আর প্রাণিহিংসা না করিতে মনে মনে সঙ্কল্প করিল। কিশোরী কিরূপ মৃদুমৃদু হাসিয়া তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার মুখপানে তাকাইল! সে এই সহরাগত ভদ্রলোকটির সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া রবার্টকে তাহাদের ভবনে আহ্বান করিল! রবার্ট পটগৃহ ভাঙিয়া সেই উপত্যকার ভবনে আশ্রয় লইল! রবার্টের নূতন জীবন আরম্ভ হইল। এই এমিলিই বা কিরূপ?—কে জানে কিরূপ! মুহুর্মুহু হাস্য করে, অথচ কথা বলে না—এ কিরূপ! তিনদিন যায়, চারদিন যায়, তাহার ভ্রাতা সমস্ত আদর-অভ্যর্থনা করে—অথচ এমিলির কেন

কথা নাই? রবার্ট কাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও ভয় পাইতেছে, কেবল একটি গভীর রহস্যের অপেক্ষা করিয়া প্রতিদিন হৃদয়ে গুরুভার অনুভব করিতেছে। এমিলি নীরব! এই নীরবতাহেতুই তাহার প্রতি-অঙ্গের যেন একটি ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা আছে। তাহার দৃষ্টিতে যেন সুর উঠে—কখনো গভীর করুণ, কখনো বা হাহাত্রস্ত! তাহার গ্রীবার ভঙ্গীতে, মস্তকের হেলনেই অনুনয়, অনুমোদন, অঙ্গীকার সুব্যক্ত হয়—কথায় যেন এরূপ হইত না। হৃদয় হইতে একটি ভাব কথায় রচিত হইয়া আসিতে আসিতে যেন অর্দ্ধেক কৃত্রিম হইয়া যায়, কিন্তু ভঙ্গীতে যেন অতি সহজেই দুলিয়া উঠে। এমিলি যেন নীরবতার মধ্যে ডুব দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রবার্ট কখনো বা দেখিল, ছায়ান্ধকার বাতায়নে এমিলি দাঁড়াইয়া আছে—বাড়ীর চারিটিধার ছায়াসুপ্ত, নীরব পুরাতনত্বের অঙ্গুলিচিহ্নিত—নীরব প্রস্তরমূর্ত্তিটি যেমন নীরবতার অতল সমুদ্রের মধ্যে ডুব দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে—যেখান হইতে কখনও আর তাহাকে তোলা যাইবে না—দেখিতে দেখিতে দেখা যায়, যেন তাহার অঙ্গুলির চিরস্থির ভঙ্গীটি হইতে তাহার কেশরেখাটি অবধি, তাহার মসৃণোজ্জ্বল দেহভাতি অবধি, কোন-না-কোন গভীর ভাব ব্যক্ত আছে—এমিলিও বুঝি সেইরূপ। সেই নীরবের উপর আবার চলিত লতাটির ন্যায় গতিচাঞ্চল্য। উড়ু-উড়ু চুল, চক্ষুর গোলাপী পাতার ওঠা-নামা, চক্ষুতারকার সুগভীর প্রকাশ, ওষ্ঠাধরের হাসি, শরীরের মৃদুলতা, বাহুর আন্দোলন! একি বিচিত্র রূপ! রবার্ট এইজন্যই বুঝি আজ মিনার্ভার মূর্ত্তির কথা আনিতেছিল। ** তার পর? তার পর রবার্ট কেমন করিয়া পঞ্চমদিনে এই পিতৃমাতৃহীনা বালিকাকে বিজন কক্ষতলে রাত্রিতে আত্মসমর্পণ করিল! রহস্যের বাঁধ আর হৃদয়কে ফিরাইতে পারিল না। এমিলি কিরূপ কিছুক্ষণ তাহার থরথরকম্পিত বক্ষের উপর রবার্টের হস্তটি চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়া সহসা ছাড়িয়া দিয়া ছুটিয়া গেল—একখণ্ড কাগজে কি লিখিয়া আনিয়া, রবার্টের সম্মুখে টেবিলে রাখিয়া, হাঁটু ভাঙিয়া পড়িল—তাহার উরু জড়াইয়া ধরিয়া অধীরভাবে চুম্বন করিতে লাগিল। রবার্ট ত্রস্তব্যস্ত হইয়া তাহাকে উঠাইতে গেলে, সে কেবল অশ্রুপূর্ণদৃষ্টিতে কাগজটি দেখাইয়া দিল—রবার্ট কাগজ দেখিতে অগ্রসর হইলে, এমিলি কেমন করিয়া ছুটিয়া গিয়া এক কোণে দুই হাত আড়ষ্টভাবে পার্শ্বে লম্বিত করিয়া দাঁড়াইল! তখন তাহার চক্ষু কিরূপ দীপ্ত, তাহার বদনমণ্ডলের প্রতি-রেখা কিরূপ উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল—শ্বাস কিরূপ ঘনঘন বহিতেছিল! রবার্ট পড়িয়া দেখিল, কাগজখানিতে লেখা রহিয়াছে—"I am dumb!" "আমি বোবা!" বোবা? এমিলি যেন নিস্তব্ধতার অতল সমুদ্রে ডুবিয়া গেল! তাহার প্রতি-অঙ্গে যেন অগাধজলভেদী রশ্মি একটি নিগূঢ় রহস্য সমর্পণ করিল! যতক্ষণ রবার্ট চাহিয়া দেখিতেছিল, ততক্ষণ এমিলির হৃদয় কিরূপ নির্দ্দয় বেগে কাঁপিতেছিল, তাহার মস্তকের কেশরাজি বুঝি কণ্টকের মত দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল! কিন্তু স্বর্গ আর প্রেম এক!

রবার্ট স্বর্গীয়! রবার্ট বলিয়া উঠিল, "Speech is trifling! that of the tongue—রসনার কথা অকিঞ্চিৎকর!" সহসা দুই-জনেই ছুটিল, অর্দ্ধপথে আলিঙ্গনে বদ্ধ হইল! —এমিলির হৃদয় কি বেগে আবার কাঁপিয়া উঠিল—ঝর্‌ঝর্ ঝর্‌ঝর্ অশ্রু নামিয়া গেল! রবার্ট স্বর্গীয় আনন্দে মুগ্ধ হইয়া রহিল। উভয়ে সন্নিহিত কৌচে গিয়া বসিল! আলি-ঙ্গনে,নিঃশব্দতায় হৃদয়ের উপর হৃদয় কাঁপিতে থাকিল, বাহু বাহুতে জড়িত হইল, ওষ্ঠ ওষ্ঠে বদ্ধ হইল,—অবশেষে বুঝি নিদ্রা দুজনকে আপনার স্বপ্নমন্দিরে টানিয়া লইয়া আরও গভীরভাবে দুজনার পরিচয় করাইয়া দিল। কোন প্রথম প্রণয়িযুগলের অজস্র জল্পনায় এরূপ প্রথম পরিচয়,—হৃদয়ে-হৃদয়ে নিগূঢ় আত্মসমর্পণে এরূপ প্রথম পরিচয় আর কোথাও হইয়াছে কি?"

আমি সমস্ত রাত্রি বিস্ময়ে, আনন্দে রবার্টের স্বর্গীয় চরিত্রের ধ্যানে যেন আর ঘুমাইতে পারিলাম না। কেবলি ভাবিতে লাগিলাম, কাহার জীবনের মূল কোথায়? এই বিশৃঙ্খলমূর্ত্তি, অসামাজিক, বিদ্যা-বিমুখ যুবকটিকে কেহই প্রকৃতরূপে জানে না। পিতা ভাবেন, 'an honest rascal'; যুবকেরা ভাবে, 'idiotic'; চাকরবাকর সবাই ভাবে, একজন অশ্রান্ত শীকারী! কিন্তু এই বাগ্‌বিমুখ যুবকের হৃদয়টি কোথায় বিশাল হ্রদের পরপারে, উপত্যকার গ্রামটিতে একটি কেমন সুন্দরী সকরুণা কিশোরীর হৃদয়টি অবলম্বন করিয়া তাহার চারিদিকে ললাট-বেষ্টনী মালার ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া আছে! এই যুবক বিবাহ করিবে না—হায়! সে কথার রহস্য কে জানে! এই যুবক শীকার করিয়া ফিরে—হায় সে কথার মর্ম্ম কে বুঝে! আমি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলাম যে, এমন বন্ধু আমার মিলিয়াছে—এমন রহস্য আমার কাছেই শুধু প্রকাশিত হইয়াছে। আমার চিত্ত সেই বিশাল হ্রদটি পার হইয়া বরাবার সে উপত্যকার অজ্ঞাতগ্রামে উদ্ভ্রান্ত হইল—কখনো বা ভাবিলাম, আমার গ্রামের কল্পনা হয় তো সে গ্রামটির সহিত একেবারেই মিলিবে না।—আবার বাঙ্‌লার কথা মনে হইতে লাগিল। কিন্তু ফিরিয়া ফিরিয়া এই বিদেশী সুহৃদের মাহাত্ম্য, সৌন্দর্য্য এবং রহস্য আমার হৃদয়ে আঘাত করিতে লাগিল। সহসা দুটা-একটা দরজা খুলিবার শব্দ হইল। ভোর? লাফ দিয়া উঠিয়া জানালায় গিয়া দেখি, স্পষ্টই ভোর! ঐ যে বিচিত্র নীল-পোষাকে সুইপার্‌গণ চলিয়াছে। আমার ম্যান্ শীঘ্রই চা লইয়া আসিল। আমি চা সারিয়া হাতমুখ না ধুইয়াই রবার্টের কামরার দিকে উঠিয়া গেলাম। কামরার কাছে যাইতেই শুনি—বেহালা ও গান। দরজা তখনো বন্ধ। জানালা হ্রদের দিকে খোলা, রবার্ট বুঝি রাত্রে আর ঘুমায় নাই। আমি চুপ করিয়া অনেকক্ষণ শুনিলাম—ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া সেই একই গান বারবার গাহি-তেছে। গানটি ধরিলাম, যথা :—

By woodland-bar by ocean-belt
The full south breeze our foreheads fann'd
And lightly rolled round moon and star,
Low music from the magic-land,
By ocean bar by woodland-belt
More fragrant grew the glowing night
While, faint through dark blue air we felt
The breath of some unnamed delight.

Till morning rose and smote from afar
Her elfin harps. Then sea and sky
And woodland-bar and ocean-belt
To one sweet note sang 'th' valley.'

ঐ দেখুন কোথায় হ্রদের উপর ভাসিয়া 'woodland bar, ocean-belt' ছাড়াইয়া প্রভাতীয় সমুদ্রাকাশের গীতসুরে উদ্বোধিত কোন একটি সুন্দর উপত্যকায় রবার্টের চিত্ত অবরোহণ করিতেছে। ঐ সেই বিশাল হ্রদ—কুণ্ডলায়মান কুয়াশার উপর সূর্য্যকিরণ পড়িয়া বোধ হইতেছে, যেন কে এই বিরাট্ কটাহে এই বিপুল জলরাশি উত্তপ্ত করিয়া বাষ্পায়িত করিতেছে!—আজ বাঙ্‌লাদেশে বসিয়াও মনশ্চক্ষে দেখিতেছি, ঐ সেই আন্দোলিত দীর্ঘোর্ম্মিমালা—ঐ দূরে পরপারে সেই উপত্যকাটিকে ক্রোড়ে লইয়া সেই সুরেন্দ্রশরচ্ছিন্ন দৈত্যজঙ্ঘার ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ শৈলরাজি দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

খেলা।

প্রেম যদি খেলা হ'ত ভাল হ'ত তবে,
ভাঙা-গড়া করিতাম নিশ্চিন্তে নীরবে
আপন মনের কোণে! দূরে গেলে তুমি
সংসার হ'ত না মনে শূন্য মরুভূমি,—
কাছে—নাহি কাঁপিতাম সদা আশঙ্কায়,—
সমান মধুর হ'ত মিলন-বিদায়!

প্রেম যদি বসন্তের বায়ুর মতন
হৃদ্‌ত কাঁপায়ে যেত মোর কুঞ্জবন,—
বুঝিতে না পারিতাম চঞ্চল উচ্ছ্বাস
হাসি দিয়ে গেল কিম্বা দিল দীর্ঘশ্বাস!
কম্পমান ক্ষণিকের মর্ম্মর-গাথায়
সমান মধুর হ'ত মিলন-বিদায়!

প্রেম যদি ছায়াতলে হ'ত মোর দোলা,
কখনো বা মনে-করা কখনো বা ভোলা!
সুখে উচ্চে উঠি সুখে নেমে আসি নীচে,
দ্রুত আগে ধেয়ে যাই, দ্রুত ফিরি পিছে!
না থামিয়া সুখে-দুঃখে আশা-আশঙ্কায়
সমান মধুর হ'ত মিলন-বিদায়!

নব বিকাশ।

যেদিন ফুরাবে কাল
সাঙ্গ হবে খেলা,
কোন্ ভাবে দেখা দিবে
আমারে একেলা ?

গোধূলির সন্ধ্যাকাশে
ম্লানরশ্মিজালে ?
তৃতীয়ার ক্ষীণচাঁদ
গগনের ভালে ?

অথবা উষার নব
রবির মতন
আলোকপ্লাবনধারে
ভরিবে ভুবন ?

যেদিন ফুরাবে কাল
সাঙ্গ হবে খেলা
কোন্ ভাবে দেখা দিবে
আমারে একেলা ?

চোখের বালি।

(৪৩)

রাত্রেই মহেন্দ্র শয্যা ছাড়িয়া চলিয়া গেছে শুনিয়া রাজলক্ষ্মী বধূর প্রতি অত্যন্ত রাগ করিলেন। মনে করিলেন, আশার লাঞ্ছনাতেই মহেন্দ্র চলিয়া গেছে। রাজলক্ষ্মী আশাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহেন্দ্র কাল ত্রত্রে চলিয়া গেল কেন ?"

আশা মুখ নীচু করিয়া বলিল, "জানি না মা !"

রাজলক্ষ্মী ভাবিলেন, এটাও অভিমানের কথা। বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি জান না ত কে জানিবে ? তাহাকে কিছু বলিয়াছিলে ?"

আশা কেবলমাত্র বলিল—"না।"

রাজলক্ষ্মী বিশ্বাস করিলেন না। এ কি কখনো সম্ভব হয় ?

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল মহীন্ কখন্ গেল ?"

আশা সঙ্কুচিত হইয়া কহিল—"জানি না।"

রাজলক্ষ্মী অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তুমি কিছুই জান না ! কচি খুকী ! তোমার সমস্ত চালাকি !"

আশারই আচরণে ও স্বভাবদোষেই যে মহেন্দ্র গৃহত্যাগী হইয়াছে, এমতও রাজলক্ষ্মী তীব্রস্বরে ঘোষণা করিয়া দিলেন। আশা নতমস্তকে সেই ভৎর্সনা বহন করিয়া নিজের ঘরে গিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে মনে মনে ভাবিল—"কেন যে আমাকে আমার স্বামী একদিন ভাল বাসিয়াছিলেন, তাহা আমি জানি না এবং কেমন করিয়া যে তাঁহার ভালবাসা ফিরিয়া পাইব, তাহাও আমি বলিতে পারি না।" যে লোক ভালবাসে, তাহাকে কেমন করিয়া খুসি করিতে হয়, তাহা হৃদয় আপনি বলিয়া দেয় ; কিন্তু যে ভালবাসে না, তাহার মন কি করিয়া পাইতে হয়, আশা তাহার কি জানে ! যে লোক অন্যকে ভালবাসে, তাহার নিকট হইতে সোহাগ লইতে যাওয়ার মত এমন নিরতিশয় লজ্জাকর চেষ্টা সে কেমন করিয়া করিবে ?

সন্ধ্যাকালে বাড়ীর দৈবজ্ঞঠাকুর এবং তাঁহার ভগিনী আচার্য্যঠাকরুণ আসিয়াছেন। ছেলের গ্রহশান্তির জন্য রাজলক্ষ্মী ইঁহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। রাজলক্ষ্মী একবার বৌমার কোষ্ঠী এবং হাত দেখিবার জন্য দৈবজ্ঞকে অনুরোধ করিলেন এবং সেই উপলক্ষ্যে আশাকে উপস্থিত করিলেন। পরের কাছে নিজের দুর্ভাগ্য-আলোচনার সঙ্কোচে একান্ত কুণ্ঠিত হইয়া আশা কোনমতে তাহার হাত বাহির করিয়া বসিয়াছে, এমন-সময় রাজলক্ষ্মী তাঁহার ঘরের পার্শ্বস্থ দীপহীন বারন্দা দিয়া মৃদু জুতার শব্দ পাইলেন—কে যেন গোপনে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। রাজলক্ষ্মী ডাকিলেন—"কে ও ?"

প্রথমে সাড়া পাইলেন না। তাহার পর আবার ডাকিলেন—"কে যায় গো !" তখন নিরুত্তরে মহেন্দ্র ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

আশা খুসি হইবে কি, মহেন্দ্রের লজ্জা দেখিয়া লজ্জায় তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। মহেন্দ্রকে এখন নিজের বাড়ীতেও চোরের মত প্রবেশ করিতে হয় ! দৈবজ্ঞ এবং আচার্য্যঠাকরুণ বসিয়া আছেন বলিয়া তাহার আরও লজ্জা হইল। সমস্ত পৃথিবীর কাছে নিজের স্বামীর জন্য যে লজ্জা, ইহাই আশার দুঃখের চেয়েও যেন বেশি হইয়া উঠিয়াছে। রাজলক্ষ্মী যখন মৃদুস্বরে বৌকে বলিলেন, 'বৌমা, পার্ব্বতীকে বলিয়া দাও, মহিনের খাবার গুছাইয়া আনে," তখন আশা কহিল, "মা, আমিই আনিতেছি।" বাড়ীর দাসদাসীদের দৃষ্টি হইতেও সে মহেন্দ্রকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়।

এদিকে আচার্য্য ও তাহার ভগিনীকে দেখিয়া মহেন্দ্র মনে মনে অত্যন্ত রাগ করিল। তাহার মাতা ও স্ত্রী দৈবসহায়ে তাহাকে বশ করিবার জন্য এই অশিক্ষিত

মূঢ়দের সহিত নির্লজ্জভাবে ষড়্‌যন্ত্র করিতেছে, ইহা মহেন্দ্রের কাছে অসহ্য বোধ হইল। ইহার উপর যখন আচার্য্যঠাকুরুণ কণ্ঠস্বরে অতিরিক্ত মধুমাখা স্নেহরসের সঞ্চার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাল আছ ত বাবা"—তখন মহেন্দ্র আর বসিয়া থাকিতে পারিল না;—কুশলপ্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া কহিল, "মা, আমি একবার উপরে যাইতেছি।"

মা ভাবিলেন, মহেন্দ্র বুঝি শয়নগৃহে বিরলে বধূর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে চায়। অত্যন্ত খুসি হইয়া তাড়াতাড়ি রন্ধনশালায় নিজে গিয়া আশাকে কহিলেন, "যাও, যাও, তুমি একবার শীঘ্র উপরে যাও, মহিনের কি বুঝি দরকার আছে!"

আশা দুরুদুরুবক্ষে সসঙ্কোচ পদক্ষেপে উপরে গেল। শাশুড়ির কথায় সে মনে করিয়াছিল, মহেন্দ্র বুঝি তাহাকে ডাকিয়াছেন। কিন্তু ঘরের মধ্যে কোনমতেই হঠাৎ ঢুকিতে পারিল না, ঢুকিবার পূর্ব্বে আশা অন্ধকারে দ্বারের অন্তরালে মহেন্দ্রকে দেখিতে লাগিল।

মহেন্দ্র তখন অত্যন্ত শূন্যহৃদয়ে নীচের বিছানায় পড়িয়া তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া কড়িকাঠ পর্য্যালোচনা করিতেছিল। এই ত সেই মহেন্দ্র, সেই সবই, কিন্তু কি পরিবর্ত্তন! এই ক্ষুদ্র শয়নঘরটিকে একদিন মহেন্দ্র স্বর্গ করিয়া তুলিয়াছিল—আজ কেন সেই আনন্দস্মৃতিতে পবিত্র ঘরটিকে মহেন্দ্র অপমান করিতেছে? এত কষ্ট, এত বিরক্তি, এত চাঞ্চল্য যদি, তবে ও শয্যায় আর বসিয়ো না মহেন্দ্র! এখানে আসিয়াও যদি মনে না পড়ে সেই সমস্ত পরিপূর্ণ গভীর রাত্রি, সেই সমস্ত সুনিবিড় মধ্যাহ্ন, আত্মহারা কর্ম্মবিস্মৃত ঘনবর্ষার দিন, দক্ষিণবায়ুকম্পিত বসন্তের বিহ্বল সন্ধ্যা, সেই অনন্ত অসীম অসংখ্য অনির্ব্বচনীয় কথাগুলি, তবে এ বাড়ীতে অন্য অনেক ঘর আছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র ঘরটিতে আর একমুহূর্ত্তও নহে!

আশা অন্ধকারে দাঁড়াইয়া যতই মহেন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল, ততই তাহার মনে হইতে লাগিল, মহেন্দ্র এইমাত্র সেই বিনোদিনীর কাছ হইতে আসিতেছে; তাহার অঙ্গে সেই বিনোদিনীর স্পর্শ, তাহার চোখে সেই বিনোদিনীর মূর্ত্তি, কাণে সেই বিনোদিনীর কণ্ঠস্বর, মনে সেই বিনোদিনীর বাসনা একেবারে লিপ্ত—জড়িত হইয়া আছে। এই মহেন্দ্রকে আশা কেমন করিয়া পবিত্র ভক্তি দিবে, কেমন করিয়া একাগ্রমনে বলিবে, "এস, আমার অনন্যপরায়ণ হৃদয়ের মধ্যে এস, আমার অটলনিষ্ঠ সতীপ্রেমের শুভ্র-শতদলের উপর তোমার চরণ-দু'খানি রাখ!" সে তাহার মাসীর উপদেশ, পুরাণের কথা, শাস্ত্রের অনুশাসন কিছুই মানিতে পারিল না,—এই দাম্পত্যস্বর্গচ্যুত মহেন্দ্রকে সে আর মনের মধ্যে দেবতা বলিয়া অনুভব করিল না। সে আজ বিনোদিনীর কলঙ্ক-পারাবারের মধ্যে তাহার হৃদয়দেবতাকে বিসর্জ্জন দিল; সেই প্রেমশূন্য রাত্রির অন্ধকারে তাহার কাণের মধ্যে, বুকের মধ্যে, মস্তিষ্কের মধ্যে, তাহার সর্ব্বাঙ্গে রক্তস্রোতের মধ্যে, তাহার চারিদিকের সমস্ত সংসারে, তাহার আকাশের নক্ষত্রে, তাহার প্রাচীর-বেষ্টিত নিভৃত ছাদটিতে, তাহার শয়নগৃহের

পরিত্যক্ত বিরহশয্যাতলে একটি ভয়ানক গম্ভীর ব্যাকুলতার সঙ্গে বিসর্জ্জনের বাদ্য বাজিতে লাগিল।

বিনোদিনীর মহেন্দ্র যেন আশার পক্ষে পরপুরুষ, যেন পরপুরুষেরও অধিক—এমন লজ্জার বিষয় যেন অতিবড় অপরিচিতও নহে। সে কোনমতেই ঘরে প্রবেশ করিতে পারিল না।

একসময় কড়িকাঠ হইতে মহেন্দ্রের অন্যমনস্ক দৃষ্টি সম্মুখের দেয়ালের দিকে নামিয়া আসিল। তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া আশা দেখিল, সম্মুখের দেয়ালে মহেন্দ্রের ছবির পার্শ্বেই আশার একখানি ফোটোগ্রাফ ঝুলান রহিয়াছে। ইচ্ছা হইল, সেখানা আঁচ দিয়া ঝাঁপিয়া ফেলে, টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া আসে। অভ্যাসবশত কেন যে সেটা চোখে পড়ে নাই, কেন সে যে এতদিন সেটা নামাইয়া ফেলিয়া দেয় নাই, তাহাই মনে করিয়া সে আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, যেন মহেন্দ্র মনে মনে হাসিতেছে এবং তাহার হৃদয়ের আসনে যে বিনোদিনীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, সে-ও যেন তাহার জোড়া দুরূর ভিতর হইতে ঐ ফোটোগ্রাফটার প্রতি সহাস্য কটাক্ষপাত করিতেছে!

অবশেষে বিরক্তিপীড়িত মহেন্দ্রের দৃষ্টি দেয়াল হইতে নামিয়া আসিল। আশা আপনার মূর্খতা ঘুচাইবার জন্য আজকাল সন্ধ্যার সময় কাজকর্ম্ম ও শাশুড়ির সেবা হইতে অবকাশ পাইলেই অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নির্জ্জনে অধ্যয়ন করিত। তাহার সেই অধ্যয়নের খাতাপত্র-বইগুলি ঘরের একধারে গোছান ছিল। হঠাৎ মহেন্দ্র অলসভাবে তাহার একখানা খাতা টানিয়া লইয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল। আশার ইচ্ছা করিল, চীৎকার করিয়া ছুটিয়া সেখানা কাড়িয়া লইয়া আসে। তাহার কাঁচা হাতের অক্ষরগুলির প্রতি মহেন্দ্রের হৃদয়হীন বিদ্রূপদৃষ্টি কল্পনা করিয়া সে আর একমুহূর্ত্তও দাঁড়াইতে পারিল না। দ্রুতপদে নীচে চলিয়া গেল—পদশব্দ গোপন করিবার চেষ্টাও রহিল না।

মহেন্দ্রের আহার সমস্তই প্রস্তুত হইয়াছিল। রাজলক্ষ্মী মনে করিতেছিলেন, মহেন্দ্র বৌমার সঙ্গে রহস্যালাপে প্রবৃত্ত আছেন; সেইজন্য খাবার লইয়া গিয়া মাঝখানে ভঙ্গ দিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। আশাকে নীচে আসিতে দেখিয়া তিনি ভোজনস্থলে আহার লইয়া মহেন্দ্রকে খবর দিলেন। মহেন্দ্র খাইতে উঠিবামাত্র আশা ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া নিজের ছবিখানা ছিঁড়িয়া লইয়া ছাদের প্রাচীর ডিঙাইয়া ফেলিয়া দিল এবং তাহার খাতাপত্রগুলা তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইয়া গেল।

আহারান্তে মহেন্দ্র শয়নগৃহে আসিয়া বসিল। রাজলক্ষ্মী বধূকে কাছাকাছি কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন না। অবশেষে একতলায় রন্ধনশালায় আসিয়া দেখিলেন, আশা তাঁহার জন্য দুধ জাল দিতেছে। কোন আবশ্যক ছিল না। কারণ, যে দাসী রাজলক্ষ্মীর রাত্রের দুধ প্রতিদিন জাল দিয়া থাকে, সে নিকটেই ছিল এবং আশার এই অকারণ উৎসাহে আপত্তি প্রকাশ করিতেছিল; বিশুদ্ধ জলের দ্বারা পূরণ করিয়া

দুধের যে অংশটুকু সে হরণ করিত, সেটুকু আজ ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনায় সে মনে মনে ব্যাকুল হইতেছিল।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "একি বৌমা, এখানে কেন? যাও, উপরে যাও!"

আশা উপরে গিয়া তাহার শাশুড়ির ঘর আশ্রয় করিল। রাজলক্ষ্মী বধূর ব্যবহারে বিরক্ত হইলেন। ভাবিলেন,—'যদি বা মহেন্দ্র মায়াবিনীর মায়া কাটাইয়া ক্ষণকালের জন্য বাড়ী আসিল, বৌ রাগারাগি মান-অভিমান করিয়া আবার তাহাকে বাড়ীছাড়া করিবার চেষ্টায় আছে! বিনোদিনীর ফাঁদে মহেন্দ্র যে ধরা পড়িল, সে ত আশারই দোষ! পুরুষমানুষ ত স্বভাবতই বিপথে যাইবার জন্য প্রস্তুত, স্ত্রীর কর্ত্তব্য তাহাকে ছলে-বলে-কৌশলে সিধা-পথে রাখা।'

রাজলক্ষ্মী তীব্র ভর্ৎসনার স্বরে কহিলেন, "তোমার এ কি-রকম ব্যবহার বৌমা? তোমার ভাগ্যক্রমে স্বামী যদি ঘরে আসিলেন, তুমি মুখ হাঁড়িপানা করিয়া অমন কোণে কোণে লুকাইয়া বেড়াইতেছ কেন?"

আশা নিজেকে অপরাধিনী জ্ঞান করিয়া অশ্রুশাহতচিত্তে উপরে চলিয়া গেল এবং মনকে দ্বিধা করিবার অবকাশমাত্র না দিয়া একনিশ্বাসে ঘরের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। দশটা বাজিয়া গেছে। মহেন্দ্র ঠিক সেই সময়ে বিছানার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অনাবশ্যক দীর্ঘকাল ধরিয়া চিন্তিতমুখে মশারি ঝাড়িতেছে। বিনোদিনীর উপরে তাহার মনে একটা তীব্র অভিমানের উদয় হইয়াছে। সে মনে মনে বলিতেছিল, "বিনোদিনী কি আমাকে তাহার এমনি ক্রীতদাস বলিয়া নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখিয়াছে যে, আশার কাছে আমাকে পাঠাইতে তাহার মনে লেশমাত্র আশঙ্কা জন্মিল না? আজ হইতে যদি আমি আশার প্রতি আমার কর্ত্তব্য পালন করি, তবে বিনোদিনী কাহাকে আশ্রয় করিয়া এই পৃথিবীতে দাঁড়াইবে? আমি কি এতই অপদার্থ যে, এই কর্ত্তব্যপালনের ইচ্ছা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব? বিনোদিনীর কাছে কি শেষকালে আমার এই পরিচয় হইল? শ্রদ্ধাও হারাইলাম, ভালবাসাও পাইলাম না, আমাকে অপমান করিতে তাহার দ্বিধাও হইল না?" মহেন্দ্র মশারির সম্মুখে দাঁড়াইয়া দৃঢ়চিত্তে প্রতিজ্ঞা করিতেছিল, বিনোদিনীর এই স্পর্দ্ধার সে প্রতিবাদ করিবে, যেমন করিয়া হউক্ আশার প্রতি হৃদয়কে অনুকূল করিয়া বিনোদিনীকৃত অবমাননার প্রতিশোধ দিবে।

আশা যেই ঘরে প্রবেশ করিল, মহেন্দ্রের অন্যমনস্ক মশারিঝাড়া বন্ধ হইয়া গেল। কি বলিয়া আশার সঙ্গে সে কথা আরম্ভ করিবে, সেই এক অতি দুরূহ সমস্যা উপস্থিত হইল।

মহেন্দ্র কাষ্ঠহাসি হাসিয়া হঠাৎ তাহার যে কথাটা মুখে আসিল, তাহাই বলিল। কহিল—"তুমিও দেখিলাম, আমার মত পড়ায় মন দিয়াছ! খাতাপত্র এই যে এখানে দেখিয়াছিলাম, সেগুলি গেল কোথায়?"

কথাটা যে কেবল খাপ্‌ছাড়া শুনাইল, তাহা নহে, আশাকে যেন মারিল। মূঢ় আশা যে শিক্ষিতা হইবার চেষ্টা করিতেছে,

লাগিল
থাক

গোপন
বিশেষরূপে মহেন্দ্রের।
এতদিন পরে প্রথম সম্ভাষণে ই
কথাটারই অবতারণা করিল, তখন নিষ্ঠুর-বেত্রাহত শিশুর কোমল দেহের মত আশার সমস্ত মনটা সঙ্কুচিত—ব্যথিত হইতে লাগিল। সে আর কোন উত্তর না দিয়া মুখ ফিরাইয়া টিপাইয়ের প্রান্ত ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মহেন্দ্রও উচ্চারণমাত্র বুঝিয়াছিল, কথাটা ঠিক সঙ্গত, ঠিক সময়োপযোগী হয় নাই—কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় উপযোগী কথাটা যে কি হইতে পারে, তাহা মহেন্দ্র কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না। মাঝখানের এতবড় বিপ্লবের পরে পূর্ব্বের ন্যায় কোন সহজ কথা ঠিকমত শুনায় না, হৃদয়ও একেবারে মূক, কোন নূতন কথা বলিবার জন্য সে প্রস্তুত নহে। মহেন্দ্র ভাবিল, 'বিছানার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলে সেখানকার নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে হয় ত কথা-কওয়া সহজ হইবে।' এই ভাবিয়া মহেন্দ্র আবার মশারির বহির্ভাগ কোঁচা দিয়া ঝাড়িতে লাগিল। নূতন অভিনেতা রঙ্গভূমিতে প্রবেশের পূর্ব্বে যেমন উৎকণ্ঠার সঙ্গে নেপথ্যদ্বারে দাঁড়াইয়া নিজের অভিনেতব্য বিষয় মনে মনে আবৃত্তি করিয়া দেখিতে থাকে, মহেন্দ্র সেইরূপ মশারির সম্মুখে দাঁড়াইয়া মনে মনে তাহার বক্তব্য ও কর্ত্তব্য আলোচনা করিতে লাগিল। এমন-সময় অত্যন্ত মৃদু একটা

বাড়ীতেই থাকিবে। তবে ত বৌমা
মিট্‌মাট্ হইয়া গেছে! আমার এমন সোণার বৌকে কি মহীন্ চিরদিন অনাদর করিতে পারে! এই লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া কোথাকার সেই মায়াবিনী ডাইনীটাকে লইয়া কতদিনই বা মানুষ ভুলিয়া থাকিবে?

মা তাড়াতাড়ি কহিলেন, "তা বেশ ত মহীন্!" বলিয়া তখনি চাবি বাহির করিয়া রুদ্ধ ঘর খুলিয়া ঝাড়াঝোড়ার ধুমধাম বাধাইয়া দিলেন। বৌ, ও বৌ, বৌ কোথায় গেল! অনেক সন্ধানে বাড়ীর এক কোণ হইতে সঙ্কুচিতা বধূকে বাহির করিয়া আনা হইল। একটা সাফ জাজিম বাহির করিয়া দাও;—এ ঘরে টেবিল নাই, এখানে একটা টেবিল পাতিয়া দিতে হইবে; এ আলো ত এখানে চলিবে না, উপর হইতে তোমার ল্যাম্প্‌টা পাঠাইয়া দাও!—এইরূপে উভয়ে মিলিয়া এই বাড়ীটির রাজাধিরাজের জন্য অন্নপূর্ণার ঘরে বিস্তৃত রাজাসন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। মহেন্দ্র সেবাকারিণীদের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া গম্ভীরমুখে খাতাপত্রবহি লইয়া ঘরে বসিল এবং সময়ের লেশমাত্র অপব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ পড়িতে আরম্ভ করিল।

ফিরিয়া
যে

গেল।
হাপানি লইয়া সিঁড়িতে
নিশ্বাস লইতেছিলেন। ঘরে
প্রবেশ করিয়াই তিনি বিছানায় বসিয়া
পড়িলেন ও বাক্‌শক্তি ফিরিয়া আসিতেই
ভাঙা গলায় কহিলেন, "বৌ, তোমার রকম
কি? উপরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়াছ যে!
এখন কি এইরকম রাগারাগি করিবার
সময়! এত দুঃখেও তোমার ঘটে বুদ্ধি
আসিল না। যাও নীচে যাও!"

আশা মৃদুস্বরে কহিল—"তিনি একলা
থাকিবেন বলিয়াছেন।"

রাজলক্ষ্মী। একলা থাকিবে বলিলেই
হইল! রাগের মুখে সে কি কথা বলিয়াছে,
তাই শুনিয়া অমনি কি বাঁকিয়া বসিতে
হইবে! এত অভিমানী হইলে চলে না।
যাও, শীঘ্র যাও!

দুঃখের দিনে বধূর কাছে শাশুড়ির আর
লজ্জা নাই। তাঁহার হাতে যে কিছু উপায়
আছে, তাহাই দিয়া মহেন্দ্রকে কোনমতে
বাঁধিতেই হইবে।

আবেগের সহিত কথা কহিতে কহিতে
রাজলক্ষ্মীর পুনরায় অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট হইল।
কতকটা সংবরণ করিয়া তিনি উঠিলেন।
আশাও দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া
লইয়া নীচে চলিল। রাজলক্ষ্মীকে আশা
তাঁহার শয়নঘরে বিছানায় বসাইয়া, তাকিয়া-
বালিশগুলি পিঠের কাছে ঠিক করিয়া দিতে

প্রস্তাবে আশার পা কিছুতেই সরিল
না, সে নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।
রুষ্ট রাজলক্ষ্মী তাহাকে তীব্র ভৎর্সনা করিতে
লাগিলেন। আশা বহুকষ্টে ধীরে ধীরে
দ্বারের কাছে গেল, কিছুতেই আর অগ্রসর
হইতে পারিল না। রাজলক্ষ্মী দূর হইতে
বধূর এই ব্যবহার দেখিয়া বারান্দার প্রান্তে
দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধ ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন।
আশা মরিয়া হইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া
পড়িল। মহেন্দ্র পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া
বই হইতে মাথা না তুলিয়া কহিল,—
"এখনো আমার দেরি আছে—আবার কাল
ভোরে উঠিয়া পড়িতে হইবে—আমি এই-
খানেই শুইব।"

কি লজ্জা! আশা কি মহেন্দ্রকে উপ-
রের ঘরে শুইতে যাইবার জন্য সাধিতে
আসিয়াছিল?

ঘর হইতে সে বাহির হইতেই রাজলক্ষ্মী
বিরক্তির স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি,
হইল কি?"

আশা কহিল, "তিনি এখন পড়িতেছেন,
নীচেই শুইবেন!" বলিয়া সে নিজের
অপমানিত শয়নগৃহে আসিয়া প্রবেশ
করিল। কোথাও তাহার সুখ নাই—

কিন্তু রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "থাক্ বৌমা,
ছেলেদের সুধোকে ডাকিয়া দাও! তুমি যাও,
আর দেরি করিয়ো না!"

আশা এবার আর দ্বিধামাত্র করিল না।
শাশুড়ির ঘর হইতে বাহির হইয়া একেবারে
মহেন্দ্রের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। মহে-
ন্দ্রের সম্মুখে টেবিলের উপর খোলা বই
পড়িয়া আছে—সে টেবিলের উপর দুই পা
তুলিয়া দিয়া চৌকির উপর মাথা রাখিয়া
একমনে কি ভাবিতেছিল। পশ্চাতে পদ-
শব্দ শুনিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিয়া
ফিরিয়া তাকাইল। যেন কাহার ধ্যানে
নিমগ্ন ছিল, হঠাৎ ভ্রম হইয়াছিল, সে-ই বুঝি
আসিয়াছে। আশাকে দেখিয়া মহেন্দ্র
সংযত হইয়া পা নামাইয়া খোলা বইটা
কোলে টানিয়া লইল।

মহেন্দ্র আজ মনে মনে আশ্চর্য্য হইল।
আজকাল ত আশা এমন অসঙ্কোচে তাহার
সম্মুখে আসে না—দৈবাৎ তাহাদের উভয়ের
সাক্ষাৎ হইলে সে তখনি চলিয়া যায়।
আজ এত রাত্রে এমন সহজে সে যে
তাঁহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল, এ বড়
বিস্ময়কর। মহেন্দ্র তাহার বই হইতে মুখ
না তুলিয়াই বুঝিল, আশার আজ চলিয়া
যাইবার লক্ষণ নহে। আশা মহেন্দ্রের
সম্মুখে স্থিরভাবে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন
মহেন্দ্র আর পড়িবার ভাণ করিতে পারিল
না—মুখ তুলিয়া চাহিল। আশা সুস্পষ্ট
স্বরে কহিল—"মার হাঁপানি বড় বাড়িয়াছে,
তুমি একবার তাঁহাকে দেখিলে ভাল
হয়।"

মহেন্দ্র। তিনি কোথায় আছেন?

আশা। তাঁহার শোবার ঘরেই আছেন,
ঘুমাইতে পারিতেছেন না।

মহেন্দ্র। তবে চল তাঁহাকে দেখিয়া
আসি গে।

অনেকদিনের পরে আশার সঙ্গে এই-
টুকু কথা কহিয়া মহেন্দ্র যেন অনেকটা
হাল্কা বোধ করিল। নীরবতা যেন দুর্ভেদ্য
দুর্গপ্রাচীরের মত স্ত্রীপুরুষের মাঝখানে
কালো ছায়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল,
মহেন্দ্রের তরফ হইতে তাহা ভাঙিবার
কোন অস্ত্র ছিল না—এমন-সময় আশা
স্বহস্তে কেল্লার একটি ছোট দ্বার খুলিয়া দিল।

রাজলক্ষ্মীর দ্বারের বাহিরে আশা
দাঁড়াইয়া রহিল, মহেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিল।
মহেন্দ্রকে অসময়ে ঘরে আসিতে দেখিয়া
রাজলক্ষ্মী ভীত হইলেন, ভাবিলেন, বুঝি বা
আশার সঙ্গে রাগারাগি করিয়া আবার সে
বিদায় লইতে আসিয়াছে। কহিলেন, "মহীন্,
এখনো ঘুমাস্ নাই?"

মহেন্দ্র কহিল—"মা, তোমার সেই
হাঁপানি কি বাড়িয়াছে?"

এতদিন পরে এই প্রশ্ন শুনিয়া মার মনে
বড় অভিমান জন্মিল। বুঝিলেন, বৌ গিয়া
বলাতেই আজ মহীন্ মার খবর লইতে
আসিয়াছে। এই অভিমানের আবেগে
তাঁহার বক্ষ আরো আন্দোলিত হইয়া
উঠিল,—কষ্টে বাক্য উচ্চারণ করিয়া বলি-
লেন, "যা, তুই শুতে যা! আমার ও
কিছুই না!"

মহেন্দ্র। না মা, একবার পরীক্ষা
করিয়া দেখা ভাল, এ ব্যামো উপেক্ষা
করিবার জিনিষ নহে।

মহেন্দ্র জানিত, তাহার মাতার হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা আছে, এই কারণে এবং মাতার মুখশ্রীর লক্ষণ দেখিয়া সে উদ্বেগ অনুভব করিল।

মা কহিলেন—"পরীক্ষা করিবার দরকার নাই, আমার এ ব্যামো সারিবার নহে।"

মহেন্দ্র কহিল—"আচ্ছা আজ রাত্রের মত একটা ঘুমের ওষুধ আনাইয়া দিতেছি, কাল ভাল করিয়া দেখা যাইবে।"

রাজলক্ষ্মী। ঢের ওষুধ খাইয়াছি, ওষুধে আমার কিছু হয় না! যাও মহীন্, অনেক রাত হইয়াছে, তুমি ঘুমাইতে যাও!

মহেন্দ্র। তুমি একটু সুস্থ হইলেই আমি যাইব!

তখন অভিমানিনী রাজলক্ষ্মী দ্বারের অন্তরালবর্ত্তিনী বধূকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৌ, কেন তুমি এই রাত্রে মহেন্দ্রকে বিরক্ত করিবার জন্য এখানে আনিয়াছ?"—বলিতে বলিতে তাঁহার শ্বাসকষ্ট আরো বাড়িয়া উঠিল।

তখন আশা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে মহেন্দ্রকে কহিল, "যাও, তুমি শুইতে যাও, আমি মার কাছে থাকিব!"

মহেন্দ্র আশাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া কহিল, "আমি একটা ওষুধ আনাইতে পাঠাইলাম। শিশিতে দুই দাগ থাকিবে—এক দাগ খাওয়াইয়া যদি ঘুম না আসে, তবে একঘণ্টা পরে আর এক দাগ খাওয়াইয়া দিয়ো। রাত্রে বাড়িলে আমাকে খবর দিতে ভুলিয়ো না।"

এই বলিয়া মহেন্দ্র নিজের ঘ[illegible] গেল। আশা আজ তাহার কা[illegible] মূর্ত্তিতে দেখা দিল, এ যেন মহেন্দ্রের পক্ষে নূতন। এ আশার মধ্যে সঙ্কোচ নাই, দীনতা নাই, এ আশা নিজের অধিকারের মধ্যে নিজে অধিষ্ঠিত,সেটুকুর জন্য মহেন্দ্রের নিকট সে ভিক্ষাপ্রার্থিনী নহে। নিজের স্ত্রীকে মহেন্দ্র উপেক্ষা করিয়াছে, কিন্তু বাড়ীর বধূর প্রতি তাহার সম্ভ্রম জন্মিল।

আশা তাঁহার প্রতি যত্নবশত মহেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিয়াছে, ইহাতে রাজলক্ষ্মী মনে মনে খুসি হইলেন। মুখে বলিলেন, "বৌমা, তোমাকে শুতে পাঠাইলাম, তুমি আবার মহেন্দ্রকে টানিয়া আনিলে কেন?"

আশা তাহার উত্তর না দিয়া পাখাহাতে তাঁহার পশ্চাতে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "যাও বৌমা, শুতে যাও!"

আশা মৃদুস্বরে কহিল—"আমাকে এইখানে বসিতে বলিয়া গেছেন।"—আশা জানিত, মহেন্দ্র মাতার সেবায় তাহাকে নিয়োগ করিয়া গেছে, এ খবরে রাজলক্ষ্মী খুসি হইবেন।

(৪৫)

রাজলক্ষ্মী দেখিলেন, সাজগোজ করিয়া আশাকে মহেন্দ্রের কাছে পাঠান বৃথা, কারণ নির্ব্বোধ আশা অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় মনোহরণবিদ্যাতেও অনভিজ্ঞ এবং মহেন্দ্র তাহার প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র করে না। এরূপ স্থলে আশার অনাবশ্যক যাতায়াত দ্বারা মহেন্দ্রকে বিরক্ত না করাই তিনি ভাল জ্ঞান করিলেন।

কিন্তু ছেলে যাহাকে চাহে না এবং ছেলেকে সংসারে যে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না, সে বধূর মর্য্যাদা কিসের? আশা আজকাল প্রাণপণ পরিশ্রমে শাশুড়ির শিক্ষানুবর্ত্তিনী হইয়া বাড়ীর সমস্ত কাজ করে, রুগ্‌ণা রাজলক্ষ্মীকে এখন আর কিছুই ভাবিতে হয় না। কিন্তু তাহার আর সম্মান নাই; নিজের গৃহকার্য্যে আত্মীয়স্বজনের সেবায় যে গৌরব আছে, আশার সম্বন্ধে সেটুকু কেহ যেন স্বীকার করিত না। এই অবস্থায় দাসদাসীরা প্রশ্রয় পাইয়া নিজেদের অপরাধ আশার স্কন্ধে চাপাইতেও কুণ্ঠিত হইত না।

আশা নিজের কাছেই অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছিল। একসময় স্বামীর কাছে অসাধারণ আদর পাইয়া সকলের ঈর্ষাদৃষ্টির ভাজন হইয়া, আজ অকস্মাৎ সম্পূর্ণরূপেই স্বামীর হৃদয় হইতে বহিষ্কৃত হওয়া—তাহার পক্ষে এমন লাঞ্ছনা আর নাই! আশা এত ক্ষুদ্র, তাহার উপরে অদৃষ্টের এত-বড়-একটা প্রকাণ্ড উপহাস বড়ই দুঃসহ।

আবার, বিনোদিনীর কথা যখন একে একে মনে পড়িতে থাকে, তখন নিজের অপরিসীম অন্ধ মূঢ়তায় আশা যেন মাটিতে মিশাইতে চায়। সেই যে একদিন বিনোদিনী তাহাকে যত্ন করিয়া নীলাম্বরী কাপড় পরাইয়া তাহার স্বামীর কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিল; সেদিন তাহার স্বামী হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "আজ কোন্ নিষ্ঠুর, আশাকে আশঙ্কার মত এমন নীলবর্ণ করিয়া দিল?" সেদিনকার আদরে আশা যখন সৌভাগ্য মনে ধারণ করিবার স্থান পাইতেছিল না, তখন কি মহেন্দ্র বিনোদিনীর কথা মনে করিয়া মনে মনে হাসিতেছিল? কবে হইতে তাঁহার সুদিনের অবসান হইয়াছিল, তাহা আশা ঠিক জানিত না,—তাই বিনোদিনীর সহিত মহেন্দ্রের পরিচয়ের পর হইতে কোন্ সোহাগগুলি ছলনা এবং কোন্‌গুলি নহে, তাহা সে নিঃসংশয়ে পৃথক্ করিতে পারিত না। তাই এই সর্ব্বস্বান্তের দিনে যেগুলি তাহার সুখস্মৃতির উপাদান হইতে পারিত, সেইগুলিই তাহার পক্ষে অলস্ত লজ্জার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল।

রাজলক্ষ্মী যখন স্পষ্টই দেখিলেন, আশা মহেন্দ্রের মন বাঁধিতে পারিতেছে না, তখন তাঁহার মনে হইল, "অন্তত আমার ব্যামো উপলক্ষ্য করিয়াও যদি মহেন্দ্রকে থাকিতে হয়, সেও ভাল।" তাঁহার ভয় হইতে লাগিল, পাছে তাঁহার অসুখ একেবারে সারিয়া যায়! আশাকে তাড়াইয়া ওষুধ তিনি ফেলিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন।

অন্যমনস্ক মহেন্দ্র বড়-একটা খেয়াল করিত না। কিন্তু আশা দেখিতে পাইত, রাজলক্ষ্মীর রোগ কিছুই কমিতেছে না, বরঞ্চ যেন বাড়িতেছে। আশা ভাবিত, মহেন্দ্র যথেষ্ট যত্ন ও চিন্তা করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিতেছে না,—মহেন্দ্রের মন এতই উদ্ভ্রান্ত যে, মাতার পীড়াও তাহাকে চেতাইয়া তুলিতে পারিতেছে না। মহেন্দ্রের এত বড় দুর্গতিতে আশা তাহাকে মনে মনে ধিক্কার না দিয়া থাকিতে পারিল না। একদিকে নষ্ট হইলে মানুষ কি সকল দিকেই এমনি করিয়া নষ্ট হয়?

একদিন সন্ধ্যাকালে রোগের কষ্টের

সময় রাজলক্ষ্মীর বিহারীকে মনে পড়িয়া গেল। কতদিন বিহারী আসে নাই, তাহার ঠিক নাই। আশাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌমা, বিহারী এখন কোথায় আছে জান?" আশা বুঝিতে পারিল, চিরকাল রোগতাপের সময় বিহারীই মার সেবা করিয়া আসিয়াছে। তাই কষ্টের সময় বিহারীকেই মাতার মনে পড়িতেছে। হায়, এই সংসারের অটল নির্ভর সেই চিরকালের বিহারীও দূর হইল! বিহারি-ঠাকুরপো থাকিলে এই দুঃসময়ে মার যত্ন হইত—ইঁহার মত তিনি হৃদয়হীন নহেন। আশার হৃদয় হইতে দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

রাজলক্ষ্মী। "বিহারীর সঙ্গে মহীন্ বুঝি ঝগড়া করিয়াছে? বড় অন্যায় করিয়াছে বৌমা! তাহার মত এমন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু মহীনের আর কেহ নাই।"—বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চক্ষুর কোণে অশ্রুজল জড় হইল।

একে একে আশার অনেক কথা মনে পড়িল। অন্ধ মূঢ় আশাকে যথাসময়ে সতর্ক করিবার জন্য বিহারী কতরূপে কত চেষ্টা করিয়াছে এবং সেই চেষ্টার ফলে সে ক্রমশই আশার অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, সেই কথা মনে করিয়া আজ আশা মনে মনে নিজেকে তীব্রভাবে অপমান করিতে লাগিল। একমাত্র সুহৃদ্‌কে লাঞ্ছিত করিয়া একমাত্র শত্রুকে যে বক্ষে টানিয়া লয়, বিধাতা সেই কৃতঘ্ন মূর্খকে কেন না শাস্তি দিবেন! ভগ্নহৃদয় বিহারী যে নিশ্বাস ফেলিয়া এ ঘর হইতে বিদায় হইয়া গেছে, সে নিশ্বাস কি এ ঘরকে লাগিবে না?

আবার অনেকক্ষণ চিন্তিতমুখে স্থির থাকিয়া রাজলক্ষ্মী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "বৌমা, বিহারী যদি থাকিত, তবে এই দুর্দ্দিনে সে আমাদের রক্ষা করিতে পারিত—এতদূর পর্য্যন্ত গড়াইতে পাইত না!"

আশা নিস্তব্ধ বসিয়া ভাবিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সে যদি খবর পায় আমার ব্যামো হইয়াছে, তবে সে না আসিয়া থাকিতে পারিবে না।"

আশা বুঝিল, রাজলক্ষ্মীর ইচ্ছা বিহারী এই খবরটা পায়। বিহারীর অভাবে তিনি আজকাল একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছেন।

ঘরের আলো নিবাইয়া দিয়া মহেন্দ্র জ্যোৎস্নায় জান্‌লার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পড়িতে আর ভাল লাগে না। গৃহে কোন সুখ নাই। যাহারা পরমাত্মীয়, তাহাদের সঙ্গে সহজভাবের সম্বন্ধ দূর হইয়া গেলে, তাহাদিগকে পরের মত অনায়াসে ফেলিয়া দেওয়া যায় না, আবার প্রিয়জনের মত অনায়াসে তাহাদিগকে গ্রহণ করা যায় না,—তাহাদের সেই অত্যাজ্য আত্মীয়তা অহরহ অসহ্য ভারের মত বক্ষে চাপিয়া থাকে। মার সম্মুখে যাইতে মহেন্দ্রের ইচ্ছা হয় না,—তিনি হঠাৎ মহেন্দ্রকে কাছে আসিতে দেখিলেই এমন একটা শঙ্কিত উদ্বেগের সহিত তাহার মুখের দিকে চান যে, মহেন্দ্রকে তাহা আঘাত করে। আশা কোন উপলক্ষ্যে কাছে আসিলে তাহার সঙ্গে কথা কহাও কঠিন হয়, চুপ করিয়া থাকাও কষ্টকর হইয়া উঠে। এমন করিয়া দিন আর কাটিতে চাহে না। মহেন্দ্র দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, অন্তত সাতদিন সে

বিনোদিনীর সঙ্গে একেবারেই দেখা করিবে না। আরো দুইদিন বাকি আছে—কেমন করিয়া সে দুইদিন কাটিবে?

মহেন্দ্র পশ্চাতে পদশব্দ শুনিল। বুঝিল, আশা ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। যেন শুনিতে পায় নাই ভাণ করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আশা সে ভাণটুকু বুঝিতে পারিল,—তবু ঘর হইতে চলিয়া গেল না। পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিল, "একটা কথা আছে, সেইটে বলিয়াই আমি যাইতেছি।"

মহেন্দ্র ফিরিয়া কহিল, "যাইতে হইবে কেন, একটু বসই না।"

আশা এই ভদ্রতাটুকুতে কাণ না দিয়া স্থির দাঁড়াইয়া কহিল—"বিহারি-ঠাকুরপোকে মার অসুখের খবর দেওয়া উচিত।"

বিহারীর নাম শুনিয়াই মহেন্দ্রের গভীর হৃদয়ক্ষতে ঘা পড়িল। নিজেকে একটুখানি সাম্‌লাইয়া লইয়া কহিল—"কেন উচিত? আমার চিকিৎসায় বুঝি বিশ্বাস হয় না?"

মহেন্দ্র মাতার চিকিৎসায় যথোচিত যত্ন করিতেছে না, এই ভর্ৎসনায় আশার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া ছিল, তাই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল—"কই মার ব্যামো ত কিছুই ভাল হয় নাই, দিনে দিনে আরো যেন বাড়িয়া উঠিতেছে!"

এই সামান্য কথাটার ভিতরকার উত্তাপ মহেন্দ্র বুঝিতে পারিল। এমন গূঢ় ভর্ৎসনা আশা আর কখনই মহেন্দ্রকে করে নাই। মহেন্দ্র নিজের অহঙ্কারে আহত হইয়া বিস্মিত বিদ্রূপের সহিত কহিল—"তোমার কাছে ডাক্তারি শিখিতে হইবে দেখিতেছি!"

আশা এই বিদ্রূপে তাহার পুঞ্জীভূত বেদনার উপরে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত আঘাত পাইল, তাহার উপরে ঘর অন্ধকার ছিল, তাই সেই চিরকালের নিরুত্তর আশা আজ অসঙ্কোচে উদ্দীপ্ত তেজের সহিত বলিয়া উঠিল, "ডাক্তারি না শেখ, মাকে যত্ন করা শিখিতে পার!"

আশার কাছে এমন জবাব পাইয়া মহেন্দ্রের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এই অনভ্যস্ত তীব্রবাক্যে মহেন্দ্র নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল। কহিল, "তোমার বিহারি-ঠাকুরপোকে কেন এই বাড়ীতে আসিতে নিষেধ করিয়াছি, তাহা ত তুমি জান—আবার তাহাকে স্মরণ করিয়াছ বুঝি!"

আশা দ্রুতপদে ঘর হইতে চলিয়া গেল। লজ্জার ঝড়ে যেন তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া গেল। লজ্জা তাহার নিজের জন্য নহে। অপরাধে যে ব্যক্তি মগ্ন হইয়া আছে, সে এমন অন্যায় অপবাদ মুখে উচ্চারণ করিতে পারে! এত বড় নির্লজ্জতাকে পর্ব্বতপ্রমাণ লজ্জা দিয়াও ঢাকা যায় না!

আশা চলিয়া গেলেই মহেন্দ্র নিজের সম্পূর্ণ পরাভব অনুভব করিতে পারিল। আশা যে কোন কালে কোন অবস্থাতেই মহেন্দ্রকে এমন ধিক্কার করিতে পারে, তাহা মহেন্দ্র কল্পনাও করিতে পারে নাই। মহেন্দ্র দেখিল, যেখানে তাহার সিংহাসন ছিল, সেখানে সে ধূলায় লুটাইতেছে। এতদিন পরে তাহার আশঙ্কা হইল, পাছে আশার বেদনা ঘৃণায় পরিণত হয়।

ওদিকে বিহারীর কথা মনে আসিতেই বিনোদিনীসম্বন্ধে চিন্তা তাহাকে অধীর করিয়া তুলিল। বিহারী পশ্চিম হইতে ফিরিয়াছে

কি না, কে জানে! ইতিমধ্যে বিনোদিনী তাহার ঠিকানা জানিতেও পারে, বিনোদিনীর সঙ্গে বিহারীর দেখা হওয়াও অসম্ভব নহে! মহেন্দ্রের আর প্রতিজ্ঞারক্ষা হয় না!

রাত্রে রাজলক্ষ্মীর বক্ষের কষ্ট বাড়িল, তিনি আর থাকিতে না পারিয়া নিজেই মহেন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কষ্টে বাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিলেন—"মহীন্, বিহারীকে আমার বড় দেখিতে ইচ্ছা হয়, অনেকদিন সে আসে নাই।"

আশা শাশুড়িকে বাতাস করিতেছিল। সে মুখ নীচু করিয়া রহিল। মহেন্দ্র কহিল, "সে এখানে নাই, পশ্চিমে কোথায় চলিয়া গেছে!"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "আমার মন বলিতেছে, সে এখানেই আছে, কেবল তোর উপর অভিমান করিয়া আসিতেছে না। আমার মাথা খা, কাল একবার তুই তাহার বাড়ীতে যাস্।"

মহেন্দ্র কহিল, "আচ্ছা যাব।"

আজ সকলেই বিহারীকে ডাকিতেছে! মহেন্দ্র নিজেকে বিশ্বের পরিত্যক্ত বলিয়া বোধ করিল।

ক্রমশ।

পঞ্চগৌড়েশ্বর জয়ন্ত।

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতা বিদ্যাস্তোত্তরবাসিনঃ॥"

স্কন্দপুরাণোক্ত বিন্ধ্যোত্তরসংস্থিত পঞ্চগৌড়ের পঞ্চ খণ্ডরাজ্য একদা এক সংযুক্ত সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়া, ইতিহাসে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সে বিপুল প্রাচ্যসাম্রাজ্যের সমৃদ্ধ রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ পর্য্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন সেখানে কেবল বিজন বন;—লতাগুল্মবৃক্ষরাজি দিবালোক আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে! পথ নাই; পথের চিহ্ন পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! কেবল মধ্যে মধ্যে দীঘি, সরোবর, সোপানাবলী,—পুরাতন জননিবাসের আভাস প্রদান করে;—তাহার কালো জলে, কুমুদ-কহ্লার, শৈবালে-শাদ্বলে সৌরভ বিতরণ করিয়া, নীরবে ফুটিয়া নীরবে ঝরিয়া যায়!

চিরদিন এমন ছিল না। পথ ছিল; পথপার্শ্বের যত্নানুপালিত পান্থপাদপ ছায়াবিতরণ করিয়া, শোভার সঙ্গে শান্তিসম্পূজিত বিজয়লক্ষ্মীর গৌরববিস্তার করিত। সে বড় অধিক দিনের কথা নহে। খৃষ্টোত্তর অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহা ভারতবর্ষে সবিশেষ বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল।

খৃষ্টোত্তর ৭৫১ হইতে ৭৮২ পর্য্যন্ত কাশ্মীরাধিপতি মুক্তাপীড় ললিতাদিত্যের পৌত্র রাজাধিরাজ জয়াপীড় বিনয়াদিত্য

কাশ্মীরের রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়া কালনির্ণয়ের সহায়তাসাধন করিয়াছে। তৎকালে গৌড়ান্তর্গত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের পুরাতন রাজ্য জয়ন্ত-নামধেয় নরপতির শাসনকৌশলে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। জয়ন্তের রাজধানীই গৌড়ীয় সংযুক্ত সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধ রাজধানীতে পরিণত হইয়াছিল।

জয়ন্তের পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁহার সংসারললামভূতা দুহিতা কল্যাণদেবীই তাঁহার একমাত্র স্নেহপাত্রী ছিলেন। এই কল্যাণদেবীর সহিত কাশ্মীরাধিপতি জয়াপীড় বিনয়াদিত্যের উদ্বাহ গৌড়-কাশ্মীর-রাজ্যের সখ্য ও গৌড়ীয়-সংযুক্ত-সাম্রাজ্যস্থাপনার মূল। সে কাহিনী উপন্যাসের ন্যায় বিচিত্র; অনেকের নিকট উপন্যাস বলিয়াই পরিচিত। উপন্যাস হইলেও, তাহার সঙ্গে নানা ঐতিহাসিক তথ্য জড়িত হইয়া রহিয়াছে।

মাগধীয় বিপুল সাম্রাজ্যের অধঃপতনকালে উত্তরভারতে যে সকল খণ্ডরাজ্য স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিল, তাহারা সুযোগ পাইবামাত্র এ উহার রাজ্যসীমা অধিকার করিবার জন্য লালায়িত হইত; তজ্জন্য দিগ্বিজয়নামক যুদ্ধযাত্রা সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বদেশের সুশাসনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া স্বরাজ্যে শরীরনিপাত করা রাজধর্ম্ম বলিয়া খ্যাতিলাভ করিত না। রাজার সাহস থাকিলে, অর্থ ও লোকবল থাকিলে, তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া খণ্ডরাজ্যে বিজয়পতাকা নিখাত করিবার জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ধাবিত হইতেন। মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য ইহার পরিচয় দিয়াছিলেন। তৎপৌত্র জয়াপীড়ও এই দিগ্বিজয়লালসার পরিচয় দিতে উৎসুক হইয়া কাশ্মীর ত্যাগ করেন।

জয়াপীড় সারস্বত ও কান্যকুব্জ জয় করিয়া, ক্রমে মিথিলাভিমুখে অগ্রসর হইবেন, এমন সময়ে তাঁহার সেনাদল বিমুখ হইল। তাহারা স্বদেশের সুখশীতল শিলাসঙ্কট ছাড়িয়া সমতল তাপতপ্ত দূরদেশে অগ্রসর হইতে অসম্মত বলিয়া, জয়াপীড় জয়াশায় জলাঞ্জলি দিয়া দেশদর্শনাশায় একাকী ছদ্মবেশে ভ্রমণে বহির্গত হইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে উপনীত হইলেন।

খৃষ্টোত্তর অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গভূমির অবস্থা কিরূপ ছিল, জয়াপীড়ের ভ্রমণকাহিনীতে তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কহ্লণপণ্ডিত তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিয়া নিরস্ত হইলেও, তদ্দ্বারা হিয়ঙ্গের বর্ণিত শতবর্ষ পূর্ব্বের অবস্থার অনুকূল প্রমাণই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে সুশাসন প্রচলিত ছিল; সুখ ছিল; সৌভাগ্য ছিল; জ্ঞানালোচনার জন্য সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা ছিল;—এ কথা হিয়ঙ্গ এবং কহ্লণ উভয়েই স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। জয়াপীড়ের ভ্রমণকালেও বৌদ্ধমন্দিরাদি বর্ত্তমান থাকা সম্ভব; কিন্তু কবি কহ্লণ তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। তিনি কথাপ্রসঙ্গে একটিমাত্র মন্দিরের উল্লেখ করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন;—তাহার নাম কার্ত্তিকেয়মন্দির। দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় পুরাতন ভারতবর্ষের বিবিধ মন্দিরে

অর্চ্চনালাভ করিয়া অধিবাসিবর্গের শৌর্য্য-সমাদরের পরিচয় প্রদান করিতেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজধানীতে তাঁহার সন্দির থাকার উল্লেখ করিয়া কহ্লণপণ্ডিত প্রসঙ্গক্রমে নাগরিক শৌর্য্যের কথাও অভিব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সুখ, শান্তি, জ্ঞান ও বাহুবলে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন যে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, তাহা এই সকল বর্ণনায় বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়। এই কার্ত্তিকেয়মন্দিরে ভরতাচার্য্যনির্দ্দিষ্ট-নাট্যশাস্ত্রানুমোদিত-কলা-প্রয়োগ-দর্শনার্থ নাগরিকগণ সমবেত হইয়া বিশ্রামসময়ে চিত্তবিনোদন করিতেন। জয়াপীড় তথায় যাতায়াত করিতে করিতে কমলানাম্নী অভিনেত্রীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। সে কাহিনী উপন্যাসের মতই বিস্ময়োৎপাদক।

জয়াপীড় কাহাকেও চিনিতেন না; তাঁহাকেও কেহ চিনিত না। তিনি ছদ্মবেশে নগরভ্রমণ করিতেন; ছদ্মবেশে অভিনয়দর্শন করিতেন; ছদ্মবেশেই বিশ্রামার্থ তরুতলে বা শিলাসোপানে উপবেশন করিয়া চিত্তবিনোদন করিতেন। কমলার কলাচাতুর্য্য তাহাকে তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণশক্তির অধিকারিণী করিয়াছিল;—সে শীঘ্রই জয়াপীড়কে ছদ্মবেশধারী রাজা বা রাজপুত্র বলিয়া চিনিয়া ফেলিল! তখন জয়াপীড়কে কমলার আতিথ্যস্বীকার করিতে হইল।

বাহিরে বাহিরে নগরভ্রমণ করিয়া জয়াপীড় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সুখসমৃদ্ধি ও শিক্ষাদীক্ষার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কমলার গৃহে পদার্পণ করিয়া আর এক নূতন জগতে উপনীত হইলেন। কমলা রঙ্গভূমির হাবভাবলীলাময়ী সামান্যা গণিকাদারিকা নহে;—তাহার গৃহ রাজগৃহের ন্যায় প্রকোষ্ঠে, কক্ষে, বাতায়নে, অলিন্দে সুবিন্যস্ত। কমলা সামান্যা বস্ত্রালঙ্কারভূষিতা পণ্যাঙ্গনা নহে;—তাহার গৃহে স্বর্ণসিংহাসন, সুবর্ণখট্টা! কমলা কলালাপচতুরা সুশিক্ষিতা শারিকা নহে;—"অগ্রাম্যাপেশললাপা" পণ্ডিতা! তাহার কথা সংস্কৃত, সে ভাষায় জয়াপীড় মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের শিক্ষানুশীলন এতদূর উন্নত হইয়াছিল যে, বেশ্যাও কথোপকথনে বিশুদ্ধ সংস্কৃতভাষা প্রয়োগ করিত। ইহাতে জয়াপীড় তাহাকে আর বেশ্যা বলিয়া ঘৃণা করিতে পারিলেন না। উভয়ে উভয়ের গুণানুরক্ত হইয়া পড়িলেন।

কমলার গৃহে অবস্থিতি করিবার সময়েও জয়াপীড় পূর্ব্ববৎ ছদ্মবেশে নগরভ্রমণ করিতেন; নদীতটে সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া রজনীমুখে বিশ্রামার্থ কমলামন্দিরে উপনীত হইতেন। এই সময়ে এক আরণ্য সিংহ রাজধানীতে উপনীত হইয়া আতঙ্ক উপস্থিত করিয়াছিল। কেহ তাহাকে ধরিতে বা মারিতে পারিত না; সে সুযোগ পাইলেই নরনারী উদরসাৎ করিত। কথাপ্রসঙ্গে কমলা একদা সেই সিংহভীতির উল্লেখ করিয়া সায়ংকালের পূর্ব্বেই গৃহাগমনের জন্য জয়াপীড়কে অনুরোধ করিলেন। জয়াপীড়ের বীরবাহু বহুদিন ব্যায়ামহীন হইয়া তাঁহাকে রুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গের ন্যায় কষ্টপ্রদান করিতেছিল; তিনি সিংহসংগ্রামের সুযোগ পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। কাহাকেও কিছু না বলিয়া অবসরের

অপেক্ষায় নদীতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা সিংহের সন্ধান পাইয়া তাহাকে নিহত করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অঙ্গক্ষতের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কমলা সে সংবাদ জ্ঞাত হইয়াও প্রকাশ করিতে পারিলেন না। এদিকে নগরে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। সিংহহত্যার জয়োল্লাস রাজভবনে উপনীত হইল, কিন্তু কোন্ বীরপুরুষ এরূপ কার্য্য সম্পাদন করিলেন, কেহ তাহার সন্ধান বলিতে পারিল না। জয়ন্ত সে সন্ধানের জন্য চারিদিকে চর নিযুক্ত করিলেন।

জয়াপীড়ের গুণগ্রাম জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে কন্যাসম্প্রদান করিবেন বলিয়া জয়ন্ত সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু জয়াপীড় ছদ্মবেশে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন শুনিয়া জয়ন্ত সে আশায় হতাশ হইয়াছিলেন। সিংহহত্যার সংবাদে আশা জাগিয়া উঠিল;—ইহা জয়াপীড়ের ন্যায় বীরপুরুষের পক্ষেই সম্ভব বলিয়া জয়ন্তের প্রতীতি হইল। তিনি জয়াপীড়ের সন্ধান করিতে লাগিলেন।

সন্ধান করিয়া জয়াপীড়কে বাহির করিতে বিলম্ব হইল না। তখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন উৎসবময় হইল। নৃত্যগীতবাদ্যোদ্যমে জলস্থল টলমল করিয়া উঠিল। জয়ন্ত জয়াপীড়কে রাজভবনে আনয়ন করিয়া যথাশাস্ত্র কন্যাদান করিয়া মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন। জয়াপীড় এতদিনের পর পুনরায় দিগ্বিজয়সাধনের অবসর প্রাপ্ত হইলেন। শ্বশুরের সেনাদল লইয়া পঞ্চগৌড় পদানত করিয়া শ্বশুরকে সেই সংযুক্ত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া দিলেন।

তখন স্বদেশগমনের সময় উপস্থিত হইল। কল্যাণী স্বামিগৃহে চলিলেন, কমলাও অনুগামিনী হইলেন। এই দুই বঙ্গরমণী কাশ্মীরে উপনীত হইয়া জয়াপীড়রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। ইঁহাদের প্রভাবে কাশ্মীরে এক নবযুগের অভ্যুদয় হইল। কাশ্মীরের সংস্কৃতচর্চ্চা কিছু শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। মহাভাষ্যের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাহা আবার প্রচলিত হইল। জয়াপীড় স্বরাজ্যে পরম পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে অজ্ঞাতবাস করিবার সময়ে জয়াপীড় আলস্যে বা বিলাসে সময় নষ্ট করেন নাই। তিনি যখন স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন লোকে তাঁহার সংস্কৃতব্যাকরণে পাণ্ডিত্য লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইল। কহ্লণপণ্ডিত বলেন, তিনি ক্ষীরস্বামীর নিকট এই সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ক্ষীরস্বামীর নাম রাজতরঙ্গিণীতে উল্লিখিত আছে।

ক্ষীরস্বামী কে? ইতিহাসের অভাবে তাঁহার পরিচয় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি যে অমরকোষের টীকাকার ছিলেন, এখন কেবল সেই কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। পাণিনির ব্যাকরণ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে অধীত ও অধ্যাপিত হইত, তজ্জন্য এ দেশে মহাভাষ্যের বড় গৌরব ছিল। অন্যান্য প্রদেশে বহুপূর্ব্বে পাণিনির ব্যাকরণ ও মহাভাষ্য অপেক্ষা সংক্ষিপ্তসারের সমাদর সংস্থাপিত হইলেও, উত্তরবঙ্গে পাণিনির বিস্তৃত গ্রন্থই অধীত ও অধ্যাপিত হইত। জয়াপীড় তাহা কাশ্মীরে পুনরায় প্রচলিত করায় কাশ্মীরের

সাহিত্যোন্নতি সাধিত হয়। কল্যাণী ও কমলা তাহার মূল।

কল্যাণী ও কমলার নাম অদ্যাপি কাশ্মীর হইতে লুপ্ত হয় নাই। তাঁহারা সে দেশে নিজ নামে নগর ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে যে শৈবমতের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পঞ্চগৌড়েশ্বর জয়ন্ত কতকাল রাজ্যভোগ করেন, তাঁহার অভাবে সে রাজ্য কাহার হস্তগত হয়,—সে সকল কথা এখনও নিঃসন্দেহে নির্ণয় করিবার উপযুক্ত প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু জয়ন্তের সংযুক্ত সাম্রাজ্য যে শৌর্য্যবীর্য্য, সুখসৌভাগ্য ও জ্ঞানগৌরবে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার এই সকল প্রমাণ অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা ধারাবাহিক ইতিহাসের পক্ষে কিছুই নহে; কিন্তু যে দেশের ধারাবাহিক ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার পক্ষে ইহা যৎসামান্য হইলেও, উপেক্ষার বিষয় বলিয়া বোধ হয় না।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

ব্রাহ্মণ।

সকলেই জানেন, সম্প্রতি কোন মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণকে তাঁহার ইংরাজ প্রভু পাদুকাঘাত করিয়াছিল—তাহার বিচার উচ্চতম বিচারালয় পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল—শেষ বিচারক ব্যাপারটাকে তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।

ঘটনাটা এতই লজ্জাকর যে, মাসিকপত্রে আমরা ইহার অবতারণা করিতাম না। মার খাইয়া মারা উচিত বা ক্রন্দন করা উচিত বা নালিশ করা উচিত, সে সমস্ত আলোচনা খবরের কাগজে হইয়া গেছে—সে সকল কথাও আমরা তুলিতে চাহি না। কিন্তু এই ঘটনাটি উপলক্ষ্য করিয়া যে সকল গুরুতর চিন্তার বিষয় আমাদের মনে উঠিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিবার সময় উপস্থিত!

বিচারক এই ঘটনাটিকে তুচ্ছ বলেন—কাজেও দেখিতেছি ইহা তুচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং তিনি অন্যায় বলেন নাই। কিন্তু এই ঘটনাটি তুচ্ছ বলিয়া গণ্য হওয়াতেই বুঝিতেছি, আমাদের সমাজের বিকার দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে।

ইংরাজ যাহাকে প্রেষ্টীজ্ অর্থাৎ তাঁহাদের রাজসম্মান বলেন, তাহাকে মূল্যবান্ জ্ঞান করিয়া থাকেন। কারণ, এই প্রেষ্টীজের জোর অনেক সময়ে সৈন্যের কাজ করে। যাহাকে চালনা করিতে হইবে, তাহার কাছে প্রেষ্টীজ্ রাখা চাই। বোয়ারযুদ্ধের আরম্ভকালে ইংরাজসাম্রাজ্য যখন স্বল্পপরিমিত কৃষকসম্প্রদায়ের হাতে বারবার

অপমানিত হইতেছিল, তখন ইংরাজ ভারতবর্ষের মধ্যে যত সঙ্কোচ অনুভব করিতেছিল, এমন আর কোথাও নহে। তখন আমরা সকলেই বুঝিতে পারিতেছিলাম, ইংরাজের বুট এ দেশে পূর্ব্বের ন্যায় তেমন অত্যন্ত জোরে মচ্‌মচ্ করিতেছে না।

আমাদের দেশে এককালে ব্রাহ্মণের তেমনি একটা প্রেষ্টীজ্ ছিল। কারণ, সমাজচালনার ভার ব্রাহ্মণের উপরেই ছিল। ব্রাহ্মণ যথারীতি এই সমাজকে রক্ষা করিতেছেন কি না এবং সমাজরক্ষা করিতে হইলে যে সকল নিঃস্বার্থ মহদ্‌গুণ থাকা উচিত, সে সমস্ত তাঁহাদের আছে কি না, সে কথা কাহারো মনেও উদয় হয় নাই—যতদিন সমাজে তাঁহাদের প্রেষ্টীজ্ ছিল। ইংরাজের পক্ষে তাঁহার প্রেষ্টীজ্ যেরূপ মূল্যবান্, ব্রাহ্মণের পক্ষেও তাঁহার নিজের প্রেষ্টীজ্ সেইরূপ।

আমাদের দেশে সমাজ যে ভাবে গঠিত, তাহাতে সমাজের পক্ষেও ইহার আবশ্যক আছে। আবশ্যক আছে বলিয়াই সমাজ এত সম্মান ব্রাহ্মণকে দিয়াছিল।

আমাদের দেশের সমাজতন্ত্র একটি সুবৃহৎ ব্যাপার। ইহাই সমস্ত দেশকে নিয়মিত করিয়া ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। ইহাই বিশাল লোকসম্প্রদায়কে অপরাধ হইতে, স্খলন হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। যদি এরূপ না হইত, তবে ইংরাজ তাঁহার পুলিশ ও ফৌজের দ্বারা এত-বড় দেশে এমন আশ্চর্য্য শান্তিস্থাপন করিতে পারিতেন না। নবাব-বাদশাহের আমলেও নানা রাজকীয় অশান্তি সত্ত্বেও সামাজিক শান্তি চলিয়া আসিতেছিল,—তখনো লোকব্যবহার শিথিল হয় নাই, আদানপ্রদানে সততা রক্ষিত হইত, মিথ্যা সাক্ষ্য নিন্দিত হইত, ঋণী উত্তমর্ণকে ফাঁকি দিত না এবং সাধারণ ধর্ম্মের বিধানগুলিকে সকলে সরল বিশ্বাসে সম্মান করিত।

সেই বৃহৎ সমাজের আদর্শ রক্ষা করিবারও বিধিবিধান স্মরণ করাইয়া দিবার ভার ব্রাহ্মণের উপর ছিল। ব্রাহ্মণ এই সমাজের চালক ও ব্যবস্থাপক। এই কার্য্য সাধনের উপযোগী সম্মানও তাঁহার ছিল।

প্রাচ্যপ্রকৃতির অনুগত এইপ্রকার সমাজবিধানকে যদি নিন্দনীয় বলিয়া না মনে করা যায়, তবে ইহার আদর্শকে চিরকাল বিশুদ্ধ রাখিবার এবং ইহার শৃঙ্খলাস্থাপন করিবার ভার কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের উপর সমর্পণ করিতেই হয়। তাঁহারা জীবনযাত্রাকে সরল ও বিশুদ্ধ করিয়া, অভাবকে সংক্ষিপ্ত করিয়া, অধ্যয়ন-অধ্যাপন যজন-যাজনকেই ব্রত করিয়া দেশের উচ্চতম আদর্শকে সমস্ত দোকানদারীর কলুষস্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়া সামাজিক যে সম্মান প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহার যথার্থ অধিকারী হইবেন, এরূপ আশা করা যায়।

যথার্থ অধিকার হইতে লোক নিজের দোষে ভ্রষ্ট হয়। ইংরাজের বেলাতেও তাহা দেখিতে পাই। দেশী লোকের প্রতি অন্যায় করিয়া যখন প্রেষ্টীজ্‌রক্ষার দোহাই দিয়া ইংরাজ দণ্ড হইতে অব্যাহতি চায়, তখন যথার্থ প্রেষ্টীজের অধিকার হইতে নিজেকে বঞ্চিত করে। ন্যায়পরতার প্রেষ্টীজ্ সকল

শ্রেষ্ঠিজের বড়—তাহার কাছে আমাদের মন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মাথা নত করে—বিভীষিকা আমাদিগকে ঘাড়ে ধরিয়া নোয়াইয়া দেয়, সেই প্রণতি-অবমাননার বিরুদ্ধে আমাদের মন ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহ না করিয়া থাকিতে পারে না।

ব্রাহ্মণও যখন আপন কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন কেবল গায়ের জোরে পরলোকের ভয় দেখাইয়া সমাজের উচ্চতম আসনে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না।

কোন সম্মান বিনামূল্যের নহে—যথেচ্ছ কাজ করিয়া সম্মান রাখা যায় না। যে রাজা সিংহাসনে বসেন, তিনি দোকান খুলিয়া ব্যবসা চালাইতে পারেন না। সম্মান যাঁহার প্রাপ্য, তাঁহাকেই সকল দিকে সর্ব্বদা নিজের ইচ্ছাকে খর্ব্ব করিয়া চলিতে হয়। গৃহের অন্যান্য লোকের অপেক্ষা আমাদের দেশে গৃহকর্ত্তা ও গৃহকর্ত্রীকেই সাংসারিক বিষয়ে অধিক বঞ্চিত হইতে হয়—বাড়ীর গৃহিণীই সকলের শেষে অন্ন পান। ইহা না হইলে আত্মস্তরিতার উপর কর্ত্তৃত্বকে দীর্ঘকাল রক্ষা করা যায় না। সম্মানও পাইবে, অথচ তাহার কোন মূল্য দিবে না, ইহা কখনই চিরদিন সহ্য হয় না।

আমাদের আধুনিক ব্রাহ্মণেরা বিনামূল্যে সম্মান-আদায়ের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাদের সম্মান আমাদের সমাজে উত্তরোত্তর মৌখিক হইয়া আসিয়াছে। কেবল তাহাই নয়, ব্রাহ্মণেরা সমাজের যে উচ্চকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, সে কর্ম্মে শৈথিল্য ঘটাতে সমাজেরও সন্ধিবন্ধন প্রতিদিন বিশ্লিষ্ট হইয়া আসিতেছে।

যদি প্রাচ্যভাবেই আমাদের দেশে সমাজরক্ষা করিতে হয়, যদি য়ুরোপীয় প্রণালীতে এই বহুদিনের বৃহৎ সমাজকে আমূল পরিবর্ত্তন করা সম্ভবপর বা বাঞ্ছনীয় না হয়, তবে যথার্থ ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের একান্ত প্রয়োজন আছে। তাঁহারা দরিদ্র হইবেন, পণ্ডিত হইবেন, ধর্ম্মনিষ্ঠ হইবেন, সর্ব্বপ্রকার আশ্রমধর্ম্মের আদর্শ ও আশ্রয়স্বরূপ হইবেন ও গুরু হইবেন।

যে সমাজের একদল ধনমানকে অবহেলা করিতে জানেন, বিলাসকে ঘৃণা করেন, যাঁহাদের আচার নির্ম্মল, ধর্ম্মনিষ্ঠা দৃঢ়, যাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে জ্ঞান অর্জ্জন ও নিঃস্বার্থভাবে জ্ঞান বিতরণে রত—পরাধীনতা বা দারিদ্র্যে সে সমাজের কোন অবমাননা নাই। সমাজ যাঁহাকে যথার্থভাবে সম্মাননীয় করিয়া তোলে, সমাজ তাঁহার দ্বারাই সম্মানিত হয়।

সকল সমাজেই মান্যব্যক্তিরা—শ্রেষ্ঠ লোকেরাই নিজ নিজ সমাজের স্বরূপ। ইংলণ্ডকে যখন আমরা ধনী বলি, তখন অগণ্য দরিদ্রকে হিসাবের মধ্যে আনি না। য়ুরোপকে যখন আমরা স্বাধীন বলি, তখন তাহার বিপুল জনসাধারণের দুঃসহ অধীনতাকে গণ্য করি না। সেখানে উপরের কয়েকজন লোকই ধনী, উপরের কয়েকজন লোকই স্বাধীন, উপরের কয়েকজন লোকই পাশবতা হইতে মুক্ত। এই উপরের কয়েকজন লোক যতক্ষণ নিম্নের বহুতর লোককে সুখস্বাস্থ্য জ্ঞানধর্ম্ম দিবার জন্য সর্ব্বদা নিজের ইচ্ছাকে প্রয়োগ ও নিজের সুখকে নিয়মিত করে, ততক্ষণ সেই সভ্যসমাজের কোন ভয় নাই।

য়ুরোপীয় সমাজ এই ভাবে চলিতেছে কি না, সে আলোচনা বৃথা মনে হইতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ বৃথা নহে।

যেখানে প্রতিযোগিতার তাড়নায় পাশের লোককে ছাড়াইয়া উঠিবার অত্যাকাঙ্ক্ষায় প্রত্যেককে প্রতিমুহূর্ত্তে লড়াই করিতে হইতেছে, সেখানে কর্ত্তব্যের আদর্শকে বিশুদ্ধ রাখা কঠিন। এবং সেখানে কোন একটা সীমায় আসিয়া আশাকে সংযত করাও লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়।

য়ুরোপের বড় বড় সাম্রাজ্যগুলি পরস্পর পরস্পরকে লঙ্ঘন করিয়া যাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, এ অবস্থায় এমন কথা কাহারো মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে না যে, বরঞ্চ পিছাইয়া প্রথম শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িব, তবু অন্যায় করিব না। এমন কথাও কাহারো মনে আসে না যে, বরঞ্চ জলে স্থলে সৈন্যসজ্জা কম করিয়া রাজকীয় ক্ষমতায় প্রতিবেশীর কাছে লাঘব স্বীকার করিব, কিন্তু সমাজের অভ্যন্তরে সুখসন্তোষ ও জ্ঞানধর্ম্মের বিস্তার করিতে হইবে। প্রতিযোগিতার আকর্ষণে যে বেগ উৎপন্ন হয়, তাহাতে উদ্দামভাবে চালাইয়া লইয়া যায়—এবং এই দুর্দ্দান্ত-গতিতে চলাকেই য়ুরোপে উন্নতি কহে. আমরাও তাহাকেই উন্নতি বলিতে শিখিয়াছি।

কিন্তু যে চলা পদে পদে থামার দ্বারা নিয়মিত নহে, তাহাকে উন্নতি বলা যায় না। যে ছন্দে যতি নাই, তাহা ছন্দই নহে। সমাজের পদমূলে সমুদ্র অহোরাত্র তরঙ্গিত ফেনায়িত হইতে পারে, কিন্তু সমাজের উচ্চতম শিখরে শান্তি ও স্থিতির চিরন্তন আদর্শ নিত্যকাল বিরাজমান থাকা চাই।

সেই আদর্শকে কাহারা অটলভাবে রক্ষা করিতে পারে? যাঁহারা পুরুষানুক্রমে স্বার্থের সংঘর্ষ হইতে দূরে আছে, আর্থিক দারিদ্র্যেই যাহাদের প্রতিষ্ঠা, মঙ্গলকর্ম্মকে যাহারা পণ্যদ্রব্যের মত দেখে না, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও উন্নত ধর্ম্মের মধ্যে যাহাদের চিত্ত অভ্রভেদী হইয়া বিরাজ করে, এবং অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া সমাজের উন্নততম আদর্শকে রক্ষা করিবার মহদ্ভারই যাঁহাদিগকে পবিত্র ও পূজনীয় করিয়াছে।

য়ুরোপেও অবিশ্রাম কর্ম্মালোড়নের মাঝে মাঝে এক একজন মনীষী উঠিয়া ঘূর্ণাগতির উন্মত্ত নেশার মধ্যে স্থিতির আদর্শ, লক্ষ্যের আদর্শ, পরিণতির আদর্শ ধরিয়া থাকেন। কিন্তু দুইদণ্ড দাঁড়াইয়া শুনিবে কে? সম্মিলিত প্রকাণ্ড স্বার্থের প্রচণ্ড বেগকে এই প্রকারের দুইএকজন লোক তর্জ্জনী উঠাইয়া রুখিবেন কি করিয়া? বাণিজ্যজাহাজে উনপঞ্চাশ পালে হাওয়া লাগিয়াছে, য়ুরোপের প্রান্তরে উন্মত্ত দর্শকবৃন্দের মাঝখানে সারিসারি যুদ্ধঘোড়ার ঘোড়দৌড় চলিতেছে, এখন ক্ষণকালের জন্য থামিবে কে?

এই উন্মত্ততায়, এই প্রাণপণে নিজশক্তির একান্ত উদ্‌ঘটনে আধ্যাত্মিকতার জন্ম হইতে পারে, এমন তর্ক আমাদের মনেও ওঠে। এই বেগের আকর্ষণ অত্যন্ত বেশি, ইহা আমাদিগকে প্রলুব্ধ করে, ইহা যে প্রলয়ের দিকে যাইতে পারে, এমন সন্দেহ আমাদের হয় না।

ইহা কি প্রকারের? যেমন চীরধারী যে একটি দল নিজেকে সাধু ও সাধক বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা গাঁজার নেশাকে আধ্যাত্মিক আনন্দলাভের সাধনা বলিয়া মনে করে। নেশায় একাগ্রতা জন্মে, উত্তেজনা হয়, কিন্তু তাহাতে আধ্যাত্মিক স্বাধীন সবলতা হ্রাস হইতে থাকে। আর সমস্ত ছাড়া যায়, কিন্তু এই নেশার উত্তেজনা ছাড়া যায় না—ক্রমে মনের বল যত কমিতে থাকে, নেশার মাত্রাও তত বাড়াইতে হয়। ঘুরিয়া নৃত্য করিয়া বা সশব্দে বাদ্য বাজাইয়া, নিজেকে উদ্‌ভ্রান্ত ও মূর্চ্ছান্বিত করিয়া যে ধর্ম্মোন্মাদের বিলাস সম্ভোগ করা যায়, তাহাও কৃত্রিম। তাহাতে অভ্যাস জন্মিয়া গেলে, তাহা অহিফেনের নেশার মত আমাদিগকে অবসাদের সময় কেবলি তাড়না করিতে থাকে। আত্মসমাহিত শান্ত একনিষ্ঠ সাধনা ব্যতীত যথার্থ স্থায়ী মূল্যবান্ কোন জিনিষ পাওয়া যায় না ও স্থায়ী মূল্যবান্ কোন জিনিষ রক্ষা করা যায় না।

অথচ আবেগ ব্যতীত কাজ ও কাজ ব্যতীত সমাজ চলিতে পারে না। এইজন্যই ভারতবর্ষ আপন সমাজে গতি ও স্থিতির সমন্বয় করিতে চাহিয়াছিল। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি যাহারা হাতে-কলমে সমাজের কার্য্যসাধন করে, তাহাদের কর্ম্মের সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল। এইজন্যই ক্ষত্রিয় ক্ষাত্রধর্ম্মের আদর্শ রক্ষা করিয়া নিজের কর্ত্তব্যকে ধর্ম্মের মধ্যে গণ্য করিতে পারিত। স্বার্থ ও প্রবৃত্তির উর্দ্ধে ধর্ম্মের উপরে কর্ত্তব্যস্থাপন করিলে, কাজের মধ্যেও বিশ্রাম এবং আধ্যাত্মিকতালাভের অবকাশ পাওয়া যায়।

য়ুরোপীয় সমাজ যে নিয়মে চলে, তাহাতে গতিজনিত বিশেষ একটা ঝোঁকের মুখেই অধিকাংশ লোককে ঠেলিয়া দেয়। সেখানে বুদ্ধিজীবী লোকেরা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেই ঝুঁকিয়া পড়ে—সাধারণ লোকে অর্থোপার্জ্জনেই ভিড় করে। বর্ত্তমানকালে সাম্রাজ্যলোলুপতা সকলকে গ্রাস করিয়াছে এবং জগৎ জুড়িয়া লঙ্কাভাগ চলিতেছে। এমন সময় হওয়া বিচিত্র নহে, যখন বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চ্চা যথেষ্ট লোককে আকর্ষণ করিবে না। এমন সময় আসিতে পারে, যখন আবশ্যক হইলেও সৈন্য পাওয়া যাইবে না। কারণ, প্রবৃত্তিকে কে ঠেকাইবে? যে জর্ম্মণী একদিন পণ্ডিত ছিল, সে জর্ম্মণী যদি বণিক্ হইয়া দাঁড়ায়, তবে তাহার পাণ্ডিত্য উদ্ধার করিবে কে? যে ইংরাজ একদিন ক্ষত্রিয়ভাবে আর্ত্তত্রাণব্রত গ্রহণ করিয়াছিল, সে যখন গায়ের জোরে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে নিজের দোকানদারী চালাইতে ধাবিত হইয়াছে—তখন তাহাকে তাহার সেই পুরাতন উদার ক্ষত্রিয়ভাবে ফিরাইয়া আনিবে কোন্ শক্তিতে?

এই ঝোঁকের উপরেই সমস্ত কর্ত্তৃত্ব না দিয়া সংযত সুশৃঙ্খল কর্ত্তব্যবিধানের উপরে কর্ত্তৃত্বভার দেওয়াই ভারতবর্ষীয় সমাজ-প্রণালী। সমাজ যদি সজীব থাকে, বাহিরের আঘাতের দ্বারা অভিভূত হইয়া না পড়ে, তবে এই প্রণালী অনুসারে সকল সময়েই সমাজে সামঞ্জস্য থাকে—একদিকে হঠাৎ হুড়ামুড়ি পড়িয়া অন্যদিক্ শূন্য হইয়া যায় না। সকলেই আপন আদর্শ রক্ষা করে এবং আপন কাজ করিয়া গৌরব বোধ করে।

কিন্তু কাজের একটা বেগ আছেই। সেই বেগে সে আপনার পরিণাম ভুলিয়া যায়। কাজ তখন নিজেই লক্ষ্য হইয়া উঠে। শুদ্ধমাত্র কর্ম্মের বেগের মুখে নিজেকে ছাড়িয়া দেওয়াতে সুখ আছে। কর্ম্মের ভূত কর্ম্মী লোককে পাইয়া বসে।

শুদ্ধ তাহাই নহে। কার্য্যসাধনই যখন অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করে, তখন উপায়ের বিচার ক্রমেই চলিয়া যায়। সংসারের সহিত, উপস্থিত আবশ্যকের সহিত কর্ম্মীকে নানাপ্রকারে রফা করিয়া চলিতেই হয়।

অতএব যে সমাজে কর্ম্ম আছে, সেই সমাজেই কর্ম্মকে সংযত রাখিবার বিধান থাকা চাই—অন্ধ কর্ম্মই যাহাতে মনুষ্যত্বের উপর কর্ত্তৃত্ব লাভ না করে, এমন সতর্ক পাহারা থাকা চাই। কর্ম্মিদলকে বরাবর ঠিক পথটি দেখাইবার জন্য, কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে বিশুদ্ধ সুরটি বরাবর অবিচলিতভাবে ধরিয়া রাখিবার জন্য, এমন এক দলের আবশ্যক, যাঁহারা যথাসম্ভব কর্ম্ম ও স্বার্থ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিবেন। তাঁহারাই ব্রাহ্মণ।

এই ব্রাহ্মণেরাই যথার্থ স্বাধীন। ইঁহারাই যথার্থ স্বাধীনতার আদর্শকে নিষ্ঠার সহিত, কাঠিন্যের সহিত সমাজে রক্ষা করেন। সমাজ ইঁহাদিগকে সেই অবসর, সেই সামর্থ্য, সেই সম্মান দেয়। ইঁহাদের এই মুক্তি, ইহা সমাজেরই মুক্তি। ইঁহারা যে সমাজে আপনাকে মুক্তভাবে রাখেন, ক্ষুদ্র পরাধীনতায় সে সমাজের কোন ভয় নাই, বিপদ্ নাই। ব্রাহ্মণ-অংশের মধ্যে সে সমাজ সর্ব্বদা আপনার মনের, আপনার আত্মার স্বাধীনতা উপলব্ধি করিতে পারে। আমাদের দেশের বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণ যদি দৃঢ়ভাবে, উন্নতভাবে, অলুব্ধভাবে সমাজের এই পরমধনটি রক্ষা করিতেন, তবে ব্রাহ্মণের অবমাননা সমাজ কখনই ঘটিতে দিত না এবং এমন কথা কখনই বিচারকের মুখ দিয়া বাহির হইতে পারিত না যে, ভদ্র ব্রাহ্মণকে পাদুকাঘাত করা তুচ্ছ ব্যাপার। বিদেশী হইলেও বিচারক মানী ব্রাহ্মণের মান আপনি বুঝিতে পারিতেন।

কিন্তু যে ব্রাহ্মণ সাহেবের আফিসে নত মস্তকে চাকুরি করে—যে ব্রাহ্মণ আপনার অবকাশ বিক্রয় করে, আপনার মহান্ অধিকারকে বিসর্জ্জন দেয়—যে ব্রাহ্মণ বিদ্যালয়ে বিদ্যাবণিক্, বিচারালয়ে বিচারব্যবসায়ী, যে ব্রাহ্মণ পয়সার পরিবর্ত্তে আপনার ব্রাহ্মণ্যকে বিক্রীত করিয়াছে, সে আপন আদর্শ রক্ষা করিবে কি করিয়া, সমাজ রক্ষা করিবে কি করিয়া, শ্রদ্ধার সহিত তাহার নিকট ধর্ম্মের বিধান লইতে যাইব কি বলিয়া? সে ত সর্ব্বসাধারণের সহিত সমানভাবে মিশিয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবরে কাড়াকাড়ি ঠেলাঠেলির কাজে ভিড়িয়া গেছে। ভক্তির দ্বারা সে ব্রাহ্মণ ত সমাজকে উর্দ্ধে আকৃষ্ট করে না—নিম্নেই লইয়া যায়।

এ কথা জানি, কোন সম্প্রদায়ের প্রত্যেক লোকই কোনকালে আপনার ধর্ম্মকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করে না, অনেকে স্খলিত হয়। অনেকে ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ন্যায় আচরণ করিয়াছে, পুরাণে এরূপ উদাহরণ দেখা যায়। কিন্তু তবু যদি সম্প্রদায়ের মধ্যে আদর্শ সজীব থাকে, ধর্ম্মপালনের চেষ্টা থাকে, কেহ আগে যাক্ কেহ পিছাইয়া

পড়ুক, কিন্তু সেই পথের পথিক যদি থাকে, যদি এই আদর্শের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত অনেকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তবে সেই চেষ্টার দ্বারা, সেই সাধনার দ্বারা, সেই সফলতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দ্বারাই সমস্ত সম্প্রদায় সার্থক হইয়া থাকে।

আমাদের আধুনিক ব্রাহ্মণসমাজে সেই আদর্শই নাই। সেইজন্যই ব্রাহ্মণের ছেলে ইংরাজি শিখিলেই ইংরাজি কেতা ধরে—পিতা তাহাতে অসন্তুষ্ট হন না। কেন? এম্-এ-পাস্-করা মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞানবিৎ চট্টোপাধ্যায় যে বিদ্যা পাইয়াছেন, তাহা ছাত্রকে ঘরে ডাকিয়া আসন হইয়া বসিয়া বিতরণ করিতে পারেন না; সমাজকে শিক্ষাঋণে ঋণী করিবার গৌরব হইতে কেন তাঁহারা নিজেকে ও ব্রাহ্মণসমাজকে বঞ্চিত করেন?

তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবেন, খাইব কি? যদি কালিয়া-পোলোয়া না খাইলেও চলে, তবে নিশ্চয়ই সমাজ আপনি আসিয়া যাচিয়া খাওয়াইয়া যাইবে। তাঁহাদের নহিলে সমাজের চলিবে না, পায়ে ধরিয়া সমাজ তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবে। আজ তাঁহারা বেতনের জন্য হাত পাতেন, সেইজন্য সমাজ রসিদ লইয়া টিপিয়া-টিপিয়া তাঁহাদিগকে বেতন দেয় ও কড়ায়-গণ্ডায় তাঁহাদের কাছ হইতে কাজ আদায় করিয়া লয়। তাঁহারাও কলের মত বাঁধা নিয়মে কাজ করেন; শ্রদ্ধা দেনও না, শ্রদ্ধা পানও না—উপরন্তু মাঝে মাঝে সাহেবের পাদুকা পৃষ্ঠে বহন-করা-রূপ অত্যন্ত তুচ্ছ ঘটনার সুবিখ্যাত উপলক্ষ্য হইয়া উঠেন।

আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণের কাজ পুনরায় আরম্ভ হইবে, এ সম্ভাবনাকে আমি সুদূরপরাহত মনে করি না। এবং এই আশাকে আমি লঘুভাবে মন হইতে অপসারিত করিতে পারি না। ভারতবর্ষের চিরকালের প্রকৃতি তাহার ক্ষণকালের বিকৃতিকে সংশোধন করিয়া লইবেই।

এই পুনর্জাগ্রত ব্রাহ্মণসমাজের কাজে অব্রাহ্মণ অনেকেও যোগ দিবেন। প্রাচীন ভারতেও ব্রাহ্মণেতর অনেকে ব্রাহ্মণের ব্রত গ্রহণ করিয়া জ্ঞানচর্চ্চা ও উপদেষ্টার কাজ করিয়াছেন—ব্রাহ্মণও তাঁহাদের কাছে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

প্রাচীনকালে যখন ব্রাহ্মণই একমাত্র দ্বিজ ছিলেন না, ক্ষত্রিয়-বৈশ্যও দ্বিজসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, যখন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত শিক্ষালাভের দ্বারা ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের উপনয়ন হইত, তখনই এ দেশে ব্রাহ্মণের আদর্শ উজ্জ্বল ছিল। কারণ, চারিদিকের সমাজ যখন অবনত, তখন কোন বিশেষ সমাজ আপনাকে উন্নত রাখিতে পারে না, ক্রমেই নিম্নের আকর্ষণ তাহাকে নীচের স্তরে লইয়া আসে।

ভারতবর্ষে যখন ব্রাহ্মণই একমাত্র দ্বিজ অবশিষ্ট রহিল, যখন তাহার আদর্শ স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য, তাহার নিকট ব্রাহ্মণত্ব দাবী করিবার জন্য চারিদিকে আর কেহই রহিল না, তখন তাহার দ্বিজত্বের বিশুদ্ধ কঠিন আদর্শ দ্রুতবেগে ভ্রষ্ট হইতে লাগিল। তখনি সে জ্ঞানে, বিশ্বাসে, রুচিতে ক্রমশ নিকৃষ্ট অধিকারীর দলে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল চারিদিকে যেখানে গোলপাতার কুঁড়ে,

সেখানে নিজের বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে হইলে একটা আট্‌চালা বাঁধিলেই যথেষ্ট—সেখানে সাতমহল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তুলিবার ব্যয় ও চেষ্টা স্বীকার করিতে সহজেই অপ্রবৃত্তি জন্মে।

প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য দ্বিজ ছিল, অর্থাৎ সমস্ত আর্য্য সমাজই দ্বিজ ছিল—শূদ্র বলিতে যে সকল লোককে বুঝাইত, তাহারা সাঁওতাল, ভিল, কোল, ধাঙড়ের দলে ছিল। আর্য্যসমাজের সহিত তাহাদের শিক্ষা, রীতিনীতি ও ধর্ম্মের সম্পূর্ণ ঐক্যস্থাপন একেবারেই অসম্ভব ছিল। কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি ছিল না, কারণ সমস্ত আর্য্যসমাজই দ্বিজ ছিল—অর্থাৎ সমস্ত আর্য্যসমাজের শিক্ষা একইরূপ ছিল। প্রভেদ ছিল কেবল কর্ম্মের শিক্ষা একই থাকায় পরস্পর পরস্পরকে আদর্শের বিশুদ্ধিরক্ষায় সম্পূর্ণ আনুকূল্য করিতে পারিত। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ হইতে সাহায্য করিত, এবং ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়-বৈশ্যকে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য হইতে সাহায্য করিত। সমস্ত সমাজের শিক্ষার আদর্শ সমান উন্নত না হইলে, এরূপ কখনই ঘটিতে পারে না।

বর্ত্তমান সমাজেরও যদি একটা মাথার দরকার থাকে, সেই মাথাকে যদি উন্নত করিতে হয় এবং সেই মাথাকে যদি ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করা যায়, তবে তাহার স্কন্ধকে ও গ্রীবাকে একেবারে মাটির সমান করিয়া রাখিলে চলিবে না। সমাজ উন্নত না হইলে তাহার মাথা উন্নত হয় না, এবং সমাজকে সর্ব্বপ্রযত্নে উন্নত করিয়া রাখাই সেই মাথার কাজ।

আমাদের বর্ত্তমান সমাজের ভদ্রসম্প্রদায়—অর্থাৎ বৈশ্য, কায়স্থ ও বণিক্ সম্প্রদায়—সমাজ যদি ইঁহাদিগকে দ্বিজ বলিয়া গণ্য না করে, তবে ব্রাহ্মণের আর উত্থানের আশা নাই। একপায়ে দাঁড়াইয়া সমাজ বকবৃত্তি করিতে পারে না।

বৈশ্যেরা ত উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। মাঝে মাঝে কায়স্থেরা বলিতেছেন তাঁহারা ক্ষত্রিয়, বণিকেরা বলিতেছেন তাঁহারা বৈশ্য—এ কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখি না। আকার-প্রকার, বুদ্ধি ও ক্ষমতা, অর্থাৎ আর্য্যত্বের লক্ষণে বর্ত্তমান ব্রাহ্মণের সহিত ইঁহাদের প্রভেদ নাই। বঙ্গদেশের যে কোন সভায় পৈতা না দেখিলে, ব্রাহ্মণের সহিত কায়স্থ, সুবর্ণবণিক্ প্রভৃতিদের তফাৎ করা অসম্ভব। কিন্তু যথার্থ অনার্য্য, অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় বন্যজাতির সহিত তাঁহাদের তফাৎ করা সহজ। বিশুদ্ধ আর্য্যরক্তের সহিত অনার্য্যরক্তের মিশ্রণ হইয়াছে, তাহা আমাদের বর্ণে, আকৃতিতে, ধর্ম্মে, আচারে ও মানসিক দুর্ব্বলতায় স্পষ্ট বুঝা যায়—কিন্তু সে মিশ্রণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই হইয়াছে।

তথাপি, এই মিশ্রণ এবং বৌদ্ধযুগের সামাজিক অরাজকতার পরেও সমাজ ব্রাহ্মণকে একটা বিশেষ গণ্ডী দিয়া রাখিয়াছে। কারণ, আমাদের সমাজের যেরূপ গঠন, তাহাতে ব্রাহ্মণকে নহিলে তাহার সকল দিকেই বাধে, আত্মরক্ষার জন্য যেমন-তেমন করিয়া ব্রাহ্মণকে সংগ্রহ করিয়া রাখা চাই। আধুনিক ইতিহাসে এমনও দেখা যায়, কোন কোন স্থানে বিশেষ প্রয়োজনবশত রাজা

পৈতা দিয়া একদল ব্রাহ্মণ তৈরি করিয়াও লইয়াছেন। বাংলাদেশে যখন ব্রাহ্মণেরা আচারে, ব্যবহারে, বিদ্যাবুদ্ধিতে ব্রাহ্মণত্ব হারাইয়াছিলেন, তখন রাজা বিদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া সমাজের কাজ চালাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ যখন চারিদিকের প্রভাবে নত হইয়া পড়িতেছিল, তখন রাজা কৃত্রিম উপায়ে কৌলীন্য স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণের নির্ব্বাণোন্মুখ মর্য্যাদাকে খোঁচা দিয়া জাগাইতেছিলেন। অপর পক্ষে, কৌলীন্যে বিবাহসম্বন্ধে যেরূপ বর্ব্বরতার সৃষ্টি করিল, তাহাতে এই কৌলীন্যই বর্ণমিশ্রণের এক গোপন উপায় হইয়া উঠিয়াছিল।

যাহাই হউক্, শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াকর্ম্মরক্ষার জন্য, বিশেষ আবশ্যকতাবশতই সমাজ বিশেষ চেষ্টায় ব্রাহ্মণকে স্বতন্ত্রভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়বৈশ্যদিগকে সেরূপ বিশেষভাবে তাহাদের পূর্ব্বতন আচারকাঠিন্যের মধ্যে বদ্ধ করিবার কোন অত্যাবশ্যকতা বাংলা-সমাজে ছিল না। যে খুসি যুদ্ধ করুক্, বাণিজ্য করুক্, তাহাতে সমাজের বিশেষ কিছু আসিত-যাইত না—এবং যাহারা যুদ্ধ-বাণিজ্য-কৃষি-শিল্পে নিযুক্ত থাকিবে, তাহাদিগকে বিশেষ চিহ্নের দ্বারা পৃথক্ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। ব্যবসায়লোকে নিজের গরজেই করে, কোন বিশেষ ব্যবস্থার অপেক্ষা রাখে না—ধর্ম্মসম্বন্ধে সে বিধি নহে; তাহা প্রাচীন নিয়মে আবদ্ধ, তাহার আয়োজন, রীতিপদ্ধতি আমাদের স্বেচ্ছাবিহিত নহে।

অতএব জড়ত্বপ্রাপ্ত সমাজের শৈথিল্যবশতই একসময়ে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য আপন অধিকার হইতেভ্রষ্ট হইয়া একাকার হইয়া গেছে। তাঁহারা যদি সচেতন হন, যদি তাঁহারা নিজের অধিকার যথার্থভাবে গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হন, নিজের গৌরব যথার্থভাবে প্রমাণ করিবার জন্য উদ্যতহন, তবে তাহাতে সমস্ত সমাজের পক্ষে মঙ্গল, ব্রাহ্মণদের পক্ষে মঙ্গল।

ব্রাহ্মণদিগকে নিজের যথার্থ গৌরব লাভ করিবার জন্য যেমন প্রাচীন আদর্শের দিকে যাইতে হইবে, সমস্ত সমাজকেও তেমনি যাইতে হইবে; ব্রাহ্মণ কেবল একলা যাইবে এবং আর সকলে যে যেখানে আছে,সে সেইখানেই পড়িয়া থাকিবে, ইহা হইতেই পারে না। সমস্ত সমাজের এক দিকে গতি না হইলে তাঁহার কোন এক অংশ সিদ্ধিলাভ করিতেই পারে না। যখন দেখিব, আমাদের দেশের কায়স্থ ও বণিক্‌গণ আপনাদিগকে প্রাচীন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সমাজের সহিত যুক্ত করিয়া বৃহৎ হইবার, বহু পুরাতনের সহিত এক হইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং প্রাচীন ভারতের সহিত আধুনিক ভারতকে সম্মিলিত করিয়া আমাদের জাতীয় সত্তাকে অবিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তখনই জানিব, আধুনিক ব্রাহ্মণও প্রাচীন ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইয়া ভারতবর্ষীয় সমাজকে সজীবভাবে, যথার্থভাবে, অখণ্ডভাবে এক করিবার কার্য্যে সফল হইবেন। নহিলে কেবল স্থানীয় কলহ-বিবাদ-দলাদলি লইয়া বিদেশী প্রভাবের সাংঘাতিক অভিঘাত হইতে সমাজকে রক্ষা করা অসম্ভব হইবে, নহিলে ব্রাহ্মণের সম্মান অর্থাৎ আমাদের সমস্ত সমাজের

সম্মান ক্রমে তুচ্ছ হইতে তুচ্ছতম হইয়া আসিবে।

আমাদের সমস্ত সমাজ প্রধানতই দ্বিজ-সমাজ; ইহা যদি না হয়, সমাজ যদি শূদ্র-সমাজ হয়, তবে কয়েকজনমাত্র ব্রাহ্মণকে লইয়া এ সমাজ য়ুরোপীয় আদর্শেও খর্ব্ব হইবে, ভারতবর্ষীয় আদর্শেও খর্ব্ব হইবে।

সমস্ত উন্নত সমাজই সমাজস্থ লোকের নিকট প্রাণের দাবী করিয়া থাকে, আপনাকে নিকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া আরামে জড়ত্ব-সুখভোগে যে সমাজ আপনার অধিকাংশ লোককে প্রশ্রয় দিয়া থাকে, সে সমাজ মরে, এবং না-ও যদি মরে, তবে তাহার মরাই ভাল।

য়ুরোপ কর্ম্মের উত্তেজনায়, প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সর্ব্বদাই প্রাণ পণ দিতে প্রস্তুত—আমরা যদি ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত না হই, তবে সে প্রাণ অপমানিত হইতে থাকিলে অভিমান প্রকাশ করা আমাদের শোভা পায় না।

য়ুরোপীয় সৈন্য যুদ্ধানুরাগের উত্তেজনায় ও বেতনের লোভে ও গৌরবের আশ্বাসে প্রাণ দেয়, কিন্তু ক্ষত্রিয় উত্তেজনা ও বেতনের অভাব ঘটিলেও যুদ্ধে প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকে। কারণ, যুদ্ধ সমাজের অত্যাবশ্যক কর্ম্ম, এক সম্প্রদায় যদি নিজের ধর্ম্ম বলিয়াই সেই কঠিন কর্ত্তব্যকে গ্রহণ করেন, তবে কর্ম্মের সহিত ধর্ম্মরক্ষা হয়। দেশসুদ্ধ সকলে মিলিয়াই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলে মিলিটারিজ্‌মের প্রাবল্যে দেশের গুরুতর অনিষ্ট ঘটে।

বাণিজ্য সমাজরক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক কর্ম্ম। সেই সামাজিক আবশ্যকপালনকে এক সম্প্রদায় যদি আপন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম, আপন কৌলিক গৌরব বলিয়া গ্রহণ করেন, তবে বণিগ্‌বৃত্তি সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়া সমাজের অন্যান্য শক্তিকে গ্রাস করিয়া ফেলে না। তা ছাড়া কর্ম্মের মধ্যে ধর্ম্মের আদর্শ সর্ব্বদাই জাগ্রত থাকে।

ধর্ম্ম এবং জ্ঞানার্জ্জন, যুদ্ধ এবং রাজকার্য্য, বাণিজ্য এবং শিল্পচর্চ্চা, সমাজের এই তিন অত্যাবশ্যক কর্ম্ম। ইহার কোনটাকেই পরিত্যাগ করা যায় না। ইহার প্রত্যেকটিকেই ধর্ম্মগৌরব, কুলগৌরব দান করিয়া সম্প্রদায়-বিশেষের হস্তে সমর্পণ করিলে তাহাদিগকে সীমাবদ্ধও করা হয়, অথচ বিশেষ উৎকর্ষ-সাধনেরও অবসর দেওয়া হয়।

কর্ম্মের উত্তেজনাই পাছে কর্ত্তা হইয়া আমাদের আত্মাকে অভিভূত করিয়া দেয়, ভারতবর্ষের এই আশঙ্কা ছিল। তাই ভারতবর্ষে সামাজিক মানুষটি লড়াই করে, বাণিজ্য করে, কিন্তু নিত্যমানুষটি—সমগ্র মানুষটি শুদ্ধমাত্র সিপাই নহে, শুদ্ধমাত্র বণিক্ নহে। কর্ম্মকে কুলব্রত করিলে, কর্ম্মকে সামাজিক ধর্ম্ম করিয়া তুলিলে, তবে কর্ম্মসাধনও হয়, অথচ সেই কর্ম্ম আপন সীমা লঙ্ঘন করিয়া, সমাজের সামঞ্জস্য ভঙ্গ করিয়া, মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্বকে আচ্ছন্ন করিয়া, আত্মার রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া বসে না।

যাঁহারা দ্বিজ, তাঁহাদিগকে একসময় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয়। তখন তাঁহারা আর ব্রাহ্মণ নহেন, ক্ষত্রিয় নহেন, বৈশ্য নহেন—তখন তাঁহারা নিত্যকালের মানুষ—

তখন কর্ম্ম তাঁহাদের পক্ষে আর ধর্ম্ম নহে, সুতরাং অনায়াসে পরিহার্য্য। এইরূপে দ্বিজসমাজ বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কেই রক্ষা করিয়াছিলেন—তাঁহারা বলিয়াছিলেন, অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে—অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার দ্বারা অমৃত লাভ করিবে। এই চঞ্চলসংসারই মৃত্যুনিকেতন, ইহাই অবিদ্যা—ইহাকে উত্তীর্ণ হইতে হইলে ইহার ভিতর দিয়াই যাইতে হয়—কিন্তু এমন ভাবে যাইতে হয়, যেন ইহাই চরম না হইয়া উঠে। কর্ম্মকেই একান্ত প্রাধান্য দিলে সংসারই চরম হইয়া উঠে; মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, অমৃত লাভ করিবার লক্ষ্যই ভ্রষ্ট হয়, তাহার অবকাশই থাকে না। এইজন্যই কর্ম্মকে সীমাবদ্ধ করা, কর্ম্মকে ধর্ম্মের সহিত যুক্ত করা, কর্ম্মকে প্রবৃত্তির হাতে, উত্তেজনার হাতে, কর্ম্মজনিত বিপুল বেগের হাতে ছাড়িয়া না দেওয়া; এবং এইজন্যই ভারতবর্ষে কর্ম্মভেদ বিশেষ বিশেষ জনশ্রেণীতে নির্দ্দিষ্ট করা।

ইহাই আদর্শ। ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করা এবং মানুষের চিত্ত হইতে কর্ম্মের নানাপাশ শিথিল করিয়া তাহাকে একদিকে সংসারব্রতপরায়ণ, অন্যদিকে মুক্তির অধিকারী করিবার অন্য কোন উপায় ত দেখি না। এই আদর্শ উন্নততম আদর্শ এবং ভারতবর্ষের আদর্শ। এই আদর্শে বর্ত্তমান সমাজকে সাধারণভাবে অধিকৃত ও চালিত করিবার উপায় কি, তাহা আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে। সমাজের সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া কর্ম্মকে ও প্রবৃত্তিকে উদ্দাম করিয়া তোলা—সেজন্য কাহাকেও চেষ্টা করিতে হয় না। সমাজের সে অবস্থা জড়ত্বের দ্বারা, শৈথিল্যের দ্বারা আপনি আসিতেছে।

বিদেশী শিক্ষার প্রাবল্যে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিকূলতায় এই ভারতবর্ষীয় আদর্শ সত্বর এবং সহজে সমস্ত সমাজকে অধিকার করিতে পারিবে না, ইহা আমি জানি। কিন্তু য়ুরোপীয় আদর্শ অবলম্বন করাই যে আমাদের পক্ষে সহজ, এ দুরাশাও আমার নাই। সর্ব্বপ্রকার আদর্শ পরিত্যাগ করাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ—এবং সেই সহজ পথই আমরা অবলম্বন করিয়াছি। য়ুরোপীয় সভ্যতার আদর্শ এমন একটা আল্‌গা জিনিষ নহে যে, তাহা পাকা ফলটির মত পাড়িয়া লইলেই কবলের মধ্যে অনায়াসে স্থান পাইতে পারে।

সকল পুরাতন ও বৃহৎ আদর্শের মধ্যেই বিনাশ ও রক্ষার একটি সামঞ্জস্য আছে। অর্থাৎ তাহার যে শক্তি বাড়াবাড়ি করিয়া মরিতে চায়, তাহার অন্যশক্তি তাহাকে সংযত করিয়া রক্ষা করে। আমাদের শরীরেও যন্ত্রবিশেষের যতটুকু কাজ প্রয়োজনীয়, তাহার অতিরিক্ত অনিষ্টকর, সেই কাজটুকু আদায় করিয়া সেই অকাজটুকুকে বহিষ্কৃত করিবার ব্যবস্থা আমাদের শরীরতন্ত্রে রহিয়াছে; পিত্তের দরকারটুকু শরীর লয়, অদরকারটুকু বর্জ্জন করিবার ব্যবস্থা করিতে থাকে।

এই সকল সুব্যবস্থা অনেকদিনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়া সমাজের শারীরবিধানকে পরিণতি দান করিয়াছে। আমরা অন্যের নকল করিবার

সময় সেই সমগ্র স্বাভাবিক ব্যবস্থাটি গ্রহ করিতে পারি না। সুতরাং অন্য সমাজে যাহা ভাল করে, নকলকারীর সমাজে তাহাই মন্দের কারণ হইয়া উঠে। য়ুরোপীয় মানবপ্রকৃতি সুদীর্ঘকালের কার্য্যে যে সভ্যতাবৃক্ষটিকে ফলবান্ করিয়া তুলিয়াছে, তাহার দুটো-একটা ফল চাহিয়া-চিন্তিয়া লইতে পারি, কিন্তু সমস্ত বৃক্ষকে আপনার করিতে পারি না। তাহাদের সেই অতীত কাল আমাদের অতীত।

কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের অতীত যদি-বা যত্নের অভাবে আমাদিগকে ফল দেওয়া বন্ধ করিয়াছে, তবু সেই বৃহৎ অতীত ধ্বংস হয় নাই, হইতে পারে না,—সেই অতীতই ভিতরে থাকিয়া আমাদের পরের নকলকে বারংবার অসঙ্গত ও অকৃতকার্য্য করিয়া তুলিতেছে। সেই অতীতকে অবহেলা করিয়া যখন আমরা নূতনকে আনি, তখন অতীত নিঃশব্দে তাহার প্রতিশোধ লয়—নূতনকে বিনাশ করিয়া পচাইয়া বায়ু দূষিত করিয়া দেয়। আমরা মনে করিতে পারি, এইটে আমাদের নূতন দরকার, কিন্তু অতীতের সঙ্গে সম্পূর্ণ আপোষে যদি রফা-নিষ্পত্তি না করিয়া লইতে পারি, তবে আবশ্যকের দোহাই পাড়িয়াই যে দেউড়ি খোলা পাইব, তাহা কিছুতেই নহে। নূতনটাকে সিঁধ কাটিয়া প্রবেশ করাইলেও, নূতনে-পুরাতনে মিশ না খাইলে সমস্তই পণ্ড হয়।

সেইজন্য আমাদের অতীতকেই নূতন বল দিতে হইবে, নূতন প্রাণ দিতে হইবে। শুদ্ধভাবে শুদ্ধ বিচারবিতর্কের দ্বারা সে প্রাণসঞ্চার হইতে পারে না। যেরূপ ভাবে চলিতেছে, সেইরূপ ভাবে চলিয়া যাইতে দিলেও কিছুই হইবে না। প্রাচীন ভারতের মধ্যে যে একটি মহান্ ভাব ছিল—যে ভাবের আনন্দে আমাদের মুক্তহৃদয় পিতামহগণ ধ্যান করিতেন, ত্যাগ করিতেন, কাজ করিতেন, প্রাণ দিতেন, সেই ভাবের আনন্দে, সেই ভাবের অমৃতে আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিলে, সেই আনন্দই অপূর্ব্বশক্তিবলে বর্ত্তমানের সহিত অতীতের সমস্ত বাধাগুলি অভাবনীয়রূপে বিলুপ্ত করিয়া দিবে। জটিল ব্যাখ্যার দ্বারা জাদু করিবার চেষ্টা না করিয়া অতীতের রসে হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। তাহা দিলেই আমাদের প্রকৃতি আপনার কাজ আপনি করিতে থাকিবে। সেই প্রকৃতি যখন কাজ করে, তখনি কাজ হয়—তাহার কাজের হিসাব আমরা কিছুই জানি না;—কোনও বুদ্ধিমান্ লোকে বা বিদ্বান্ লোকে এই কাজের নিয়ম বা উপায় কোনমতেই আগে হইতে বলিয়া দিতে পারে না। তর্কের দ্বারা তাহারা যেগুলিকে বাধা মনে করে, সেই বাধাগুলিও সহায়তা করে, যাহাকে ছোট বলিয়া প্রমাণ করে, সে-ও বড় হইয়া উঠে।

কোন জিনিষকে চাই বলিলেই পাওয়া যায় না—অতীতের সাহায্য এক্ষণে আমাদের দরকার হইয়াছে বলিলেই যে তাহাকে সর্ব্বতোভাবে পাওয়া যাইবে, তাহা কখনই না। সেই অতীতের ভাবে যখন আমাদের বুদ্ধি-মন-প্রাণ অভিষিক্ত হইয়া উঠিবে, তখন দেখিতে পাইব, নব নব আকারে, নব নব বিকাশে আমাদের কাছে সেই পুরাতন নবীন হইয়া, প্রফুল্ল হইয়া, ব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাহা শ্মশানশয্যার নীরস ইন্ধন

নহে, জীবননিকুঞ্জের ফলবান্ বৃক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

অকস্মাৎ উদ্বেলিত সমুদ্রের বন্যার ন্যায় যখন আমাদের সমাজের মধ্যে ভাবের আনন্দ প্রবাহিত হইবে, তখন আমাদের দেশের এই সকল প্রাচীন নদীপথগুলিই কূলে-কূলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। তখন স্বভাবতই আমাদের দেশ ব্রহ্মচর্য্যে জাগিয়া উঠিবে, সামসঙ্গীতধ্বনিতে জাগিয়া উঠিবে, ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে জাগিয়া উঠিবে। যে পাখীরা প্রভাতকালে তপোবনে গান গাহিত, তাহারাই গাহিয়া উঠিবে, দাঁড়ের কাকাতুয়া বা গাঁচার কেনারি-নাইটিঙ্গেল্ নহে।

আমাদের সমস্ত সমাজ সেই প্রাচীন দ্বিজত্বকে লাভ করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে, প্রত্যহ তাহার পরিচয় পাইয়া মনে আশার সঞ্চার হইতেছে। একসময় আমাদের হিন্দুত্ব গোপন করিবার, বর্জ্জন করিবার জন্য আমাদের চেষ্টা হইয়াছিল—সেই আশায় আমরা অনেকদিন চাঁদনীর দোকানে ফিরিয়াছি ও চৌরঙ্গী-অঞ্চলের দেউড়িতে হাজ্‌রি দিয়াছি। আজ যদি আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে জাগিয়া থাকে, যদি আমাদের সমাজকে পৈতৃক গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়াই মহত্ত্ব-লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকি, তবে ত আমাদের আনন্দের দিন। আমরা ফিরিঙ্গি হইতে চাই না, আমরা দ্বিজ হইতে চাই। ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ইহাতে যাঁহারা বাধা দিয়া অনর্থক কলহ করিতে বসেন, তর্কের ধূলায় ইহার সুদূরব্যাপী সফলতা যাঁহারা না দেখিতে পান, বৃহৎ ভাবের মহত্ত্বের কাছে আপনাদের ক্ষুদ্র পাণ্ডিত্যের ব্যর্থ বাদ-বিবাদ যাঁহারা লজ্জার সহিত নিরস্ত না করেন, তাঁহারা যে সমাজের আশ্রয়ে মানুষ হইয়াছেন, সেই সমাজেরই শত্রু। দীর্ঘকাল হইতে ভারতবর্ষ আপন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য সমাজকে আহ্বান করিতেছে। য়ুরোপ তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বহুতর ভাগে বিভক্ত-বিচ্ছিন্ন করিয়া তুলিয়া বিহ্বলবুদ্ধিতে তাহার মধ্যে সম্প্রতি ঐক্য সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে—ভারতবর্ষের সেই ব্রাহ্মণ কোথায়, যিনি স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভাবলে,অতি অনায়াসেই সেই বিপুল জটিলতার মধ্যে ঐক্যের নিগূঢ় সরল-পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন? সেই ব্রাহ্মণকে ভারতবর্ষ নগরকোলাহল ও স্বার্থসংগ্রামের বাহিরে তপোবনে ধ্যানাসনে অধ্যাপকের বেদীতে আহ্বান করিতেছে,—ব্রাহ্মণকে তাহার সমস্ত অবমাননা হইতে দূরে আকর্ষণ করিয়া ভারতবর্ষ আপনার অবমাননা দূর করিতে চাহিতেছে। বিধাতার আশীর্ব্বাদে ব্রাহ্মণের পাদুকাঘাতলাভ হয় ত ব্যর্থ হইবে না—নিদ্রা অত্যন্ত গভীর হইলে এইরূপ নিষ্ঠুর আঘাতেই তাহা ভাঙাইতে হয়। য়ুরোপের কর্ম্মিগণ কর্ম্মজালে জড়িত হইয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতির কোন পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না, সে নানা দিকে নানা আঘাত করিতেছে,—ভারতবর্ষে যাঁহারা ক্ষাত্রব্রত, বৈশ্য-ব্রত গ্রহণ করিবার অধিকারী, আজ তাঁহারা ধর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মকে জগতে গৌরবান্বিত করুন—তাঁহারা প্রবৃত্তির অনুরোধে নহে, উত্তেজনার অনুরোধে নহে—ধর্ম্মের অনুরোধেই অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত ফলকামনায়

একান্ত আসক্ত না হইয়া প্রাণ সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হউন্।• নতুবা ব্রাহ্মণ প্রতিদিন শূদ্র, সমাজ প্রত্যহ ক্ষুদ্র এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের মাহাত্ম্য, যাহা অটল পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় দৃঢ় ছিল, তাহা দূরস্থত ইতিহাসের দিক্‌প্রান্তে মেঘের ন্যায়, কুহেলিকার ন্যায় বিলীন হইয়া যাইবে এবং কর্ম্মক্লান্ত একটি বৃহৎ কেরাণী-সম্প্রদায় একপাটি বৃহৎ পাদুকা প্রাণপণে আকর্ষণ করিয়া ক্ষুদ্র কৃষ্ণপিপীলিকাশ্রেণীর মত মৃত্তিকাতলবর্ত্তী বিবরের অভিমুখে ধাবিত হওয়াকেই জীবনযাত্রানির্ব্বাহের একমাত্র পদ্ধতি বলিয়া গণ্য করিবে।

হাতেম তাই।

[Edwin Arnold হইতে]

হাতেম তায়ের এই অপূর্ব্ব আখ্যান
কহিতেছি শুন সবে, করি অবধান।
ছিল তাঁর কৃষ্ণ অশ্ব—কাল' মেঘ যেন—
বজ্রের নিনাদসম তার হ্রেষারব,
মহাবেগে ধায় যবে মরুর মাঝারে
উড়ায়ে প্রস্তরখণ্ড, হেন লয় মনে
ঐ কি শিলাবৃষ্টি ছুটে! সুভগ, সুদর্শ,
তেজীয়ান্ অশ্ব বেগবান্, তার কাছে
পবন কোথায় লাগে—প্রভঞ্জন-বেগে
দৌড়ে ঘোড়া। অশ্বরত্ন সুদুর্লভ হেন!
হাতেম ও তাহার তুরগ গুণগান
রটে দিশি দিশি; রুমের সুলতান-কাণে
গেল সে বারতা। সবে কহে একবাক্যে,
"কেহ দেখে নাই প্রভো! হাতেম-সমান
দানশীল—অশ্ব তার তাহাকেই সাজে।
ঘোড়া আর সওয়ার—দুই সমতুল।"
রুমপতি কহিলা সচিবে, "মন্ত্রিবর,
শুধু মুখের কথায় না হয় প্রত্যয়,
প্রমাণ দেখিতে চাই। হাতেমের দ্বারে
চাহ গিয়া অশ্ববর, যদি সে প্রফুল্ল-
মনে, তার আদরের ধনে বাদশায়
দেয় উপহার, তা হলেই তারে আমি
দাতা বলে' গণি, নহিলে নিশ্চয় জেনো,
সে শুধু লোকের কথা বৃথা আড়ম্বর।
অতঃপর সম্রাট সংবাদ-বাহী দূত,
দশজন সুসজ্জিত রক্ষক-সহায়,
বহুপথ অতিক্রমি' ঝড়-বৃষ্টি-বাতে,
বিষম-দুর্যোগ-মাঝে উত্তরিল তথা
হাতেমের ভাইবন্ধু নিবসে যেথায়;
তৃষাতুর পান্থ আসি নদী-উপকূলে,
হরষ-বিভোর চিতে, উতরে যেমতি।
হাতেমের তাম্বুগুলি মরুক্ষেত্রমাঝে
বিছায়িত সারিসারি, উষ্ট্র-গো-মেষাদি
জন্তুগণ চরিছে সুদূর প্রান্তে সবে।
শস্যহীন সমস্ত ভাণ্ডার, অতিথির
সমাগম অসম্ভব ভাবি, ঘরে ছিল

কিছু না প্রস্তুত। তবু একি চমৎকার!
অভ্যাগতে ভোজের নাহিক অপ্রতুল—
চর্ব্ব্য চোষ্য ভূরি আয়োজন। মাংস-যূস
মিশ্রিত পকান্ন-সাথে, গন্ধে আমোদিত—
পোলাও কাবাব কোর্ম্মা অপর্য্যাপ্ত হেরি
মিষ্টান্ন বিলান সবে আঁচল ভরিয়া,
হাতে হাতে বিতরেন সুমিষ্ট পিষ্টক।
যথেচ্ছ ভোজনে তুষ্ট নিদ্রা যায় সবে
হাতেমের শয্যা'পরে সুখে রাত্রিভোর।

পরদিন প্রাতে উঠি, বুঝি অবসর,
সুলতানের দূত কহে করজোড় করি—
"দাতা-অগ্রগণ্য তুমি অবনীমণ্ডলে!
যে আসে তোমার কাছে কভু নাহি ফিরে
শূন্য হাতে, যাহা চায় পায় সে অমনি;
মুক্তহস্ত, অমায়িক, প্রশস্তহৃদয়,
ধন্য হে হাতেম তাই, ধন্য তব নাম!
শুনিয়া তোমার দানস্তুতি, শুনি আর
বিশ্ব-প্রকীর্ত্তিত তব অশ্ব-গুণগান,
রুমের সুলতান হেথা পাঠালেন মোরে।
সে বল্গাঙ্গ তুরঙ্গম—বর্ণ ঘনশ্যাম,
পবন-বিজয়ী যার গতি—সেই অশ্ব,
সুলতানে প্রসন্নমনে যদি কর দান,
তা হলেই সার্থক তোমার দাতা-নাম,
নহিলে কহেন প্রভু, এই জনরব
শুনি যাহা, অর্থহীন শূন্য কলরব!"

রাজদূত কহে যবে মৃদুমন্দ স্বরে
সম্রাট-সন্দেশ, নমি নম্র নতশিরে,
হাতেম ভাবেন ব'সে শান্ত-স্তব্ধ-ভাবে
গালে হাত দিয়ে, মগ্ন গভীর চিন্তায়;
কহিলা ক্ষণেক পরে গম্ভীর আরবে—
"গত রাত্রে এলে যবে, কুলসখা মোর,
ভাঙিয়া বলিতে যদি প্রভুর আদেশ
অবিলম্বে, পূরাতেম সাধ, কিন্তু এবে
বৃথা আবেদন তব। জানই ত ওহে,
ক-দিন ধরিয়া কত গিয়াছে দুর্যোগ।
তাম্বু আর চরভূমি, তার মধ্যদেশ
ঘোর বরিষার স্রোতে জলে জলময়।
উষ্ট্র-গো-মেষাদি কোন জীবজন্তু আর
খুঁজিয়া না পাই কোন ঠাঁই। এ বিষম
সঙ্কটে কি করি কিছু ভাবিয়া না পাই।
অতিথি শুকায়ে রাখি কহ কোন্ প্রাণে?
আপনার প্রিয়ধনে তাহাদের দানে
পরাঙ্মুখ, মম গৃহে অতিথি যাহারা?
দাতার আদর্শ ঘলে' লোকে মোরে মানে,
কেমনে সে লোকমাঝে রাখি নিজ মান?
শুন তবে—সেই মোর সাধের তুরঙ্গ
জীবনসম্পদ সখা সর্ব্বস্ব আমার!
সেই দুলদুল যার পদরজোমাঝে
আরামে শয়ান থাকি ঘুমাই নির্ভয়ে—
রেশম-কোমলস্পর্শ মুখ! কি করিনু,
কি করিনু হায়! মোর সাধের ঘোটক—
বলিদান দিনু তারে ভোজ্যপকাষ্ঠে
তোমাদের—সুলতানে কহ গে সত্বর।"

দূতবাক্যে গরজি উঠিলা সুলতান—
"অর্দ্ধরুমে বাঁচে যদি দুলদুলের প্রাণ
এই দণ্ডে করি আমি অর্দ্ধরাজ্য দান।"*

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* এই কবিতাটি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে, টেনিসন্ তাঁহার The Falcon নামক ক্ষুদ্র নাটিকার আখ্যানটি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সম্পাদক।

চীনেম্যানের চিঠি।

"জন্ চীনেম্যানের চিঠি" বলিয়া একখানি চটি বই ইংরাজিতে বাহির হইয়াছে। চিঠিগুলি ইংরাজকে সম্বোধন করিয়া লেখা হইয়াছে। লেখক নিজের বিষয়ে বলেন—"দীর্ঘকাল ইংলণ্ডে বাস করার দরুণ তোমাদের (ইংরাজদের) আচার-অনুষ্ঠান-সম্বন্ধে কথা কহিবার কিছু অধিকার আমার জন্মিয়াছে; অপর পক্ষে, স্বদেশ হইতে দূরে আছি বলিয়া আমাদের সম্বন্ধেও আলোচনা করিবার ক্ষমতা খোয়াইয়া বসি নাই। চীনেম্যান্ সর্ব্বত্রই সর্ব্বদাই চীনেম্যান্ই থাকে; এবং কোন কোন বিশেষ দিক্ হইতে বিলাতি সভ্যতাকে আমি যতই পছন্দ করি না কেন, এখনো ইহার মধ্যে এমন কিছু দেখি নাই, যাহাতে পূর্ব্বদেশের মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি বলিয়া আমার মনে কোন-প্রকার ক্ষোভ হইতে পারে।"

ইংরাজিভাষায় লেখকের অসামান্য দখল দেখিলেই বুঝা যায় যে, ইংরাজি-শিক্ষায় ইনি পাকা হইয়াছেন—এইজন্য বিলাতসম্বন্ধে ইনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাকে নিতান্ত অনভিজ্ঞ লোকের অত্যুক্তি বলিয়া গণ্য করা যায় না।

এই ছোট বইখানি পড়িয়া আমরা বিশেষ আনন্দ ও বল পাইয়াছি। ইহা হইতে দেখিয়াছি, এসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে একটি গভীর ও বৃহৎ ঐক্য আছে। চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাণের মিল দেখিয়া আমাদের প্রাণ যেন বাড়িয়া যায়। শুধু তাহাই নহে; এসিয়া যে চিরকাল য়ুরোপের আদালতেই আসামী হইয়া দাঁড়াইয়া তাহার বিচারকেই বেদবাক্য বলিয়া শিরোধার্য্য করিবে, স্বীকার করিবে যে, আমাদের সমাজের বারো-আনা অংশকেই একেবারে ভিৎসুদ্ধ নির্ম্মূল করিয়া বিলাতি এঞ্জিনিয়ারের প্ল্যান্ অনুসারে বিলাতি ইঁটকাঠ দিয়া গড়াই আমাদের পক্ষে একমাত্র শ্রেয়—এই কথাটা ঠিক নহে,—আমাদের বিচারালয়ে য়ুরোপকে দাঁড় করাইয়া তাহারো মারাত্মক অনেকগুলি গলদ্ আলোচনা করিয়া দেখিবার আছে, এই বইখানি হইতে সেই ধারণা আমাদের মনে একটু বিশেষ জোর পায়। প্রথমত ভারতবর্ষের সভ্যতা এসিয়ার সভ্যতার মধ্যে ঐক্য পাইয়াছে, ইহাতেও আমাদের বল; দ্বিতীয়ত এসিয়ার সভ্যতার এমন একটি গৌরব আছে, যাহা সত্য বলিয়াই প্রাচীন হইয়াছে, যাহা সত্য বলিয়াই চিরন্তন হইবার অধিকারী, ইহাতেও আমাদের বল।

সম্প্রতি আমাদের মধ্যে একটা চঞ্চলতা জন্মিয়াছে; আমাদের স্বাধীন শক্তি—আমাদের চিরকালের শক্তি কোন্‌খানে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহাই সন্ধান করিয়া সেইখানে আশ্রয় লইবার জন্য আমাদের মধ্যে একটা

চেষ্টা জাগিয়াছে। বিদেশীর সহিত আমাদের সংঘাত ক্রমশ যতই কঠিন হইয়া উঠিতেছে, স্বদেশকে ততই বিশেষভাবে জানিবার ও পাইবার জন্য আমাদের একটা ব্যাকুলতা বাড়িয়া উঠিতেছে। দেখিতেছি, ইহা কেবল আমাদের মধ্যে নহে। য়ুরোপের সংঘাত সমস্ত সভ্য এসিয়াকেই সজাগ করিতেছে। এসিয়া আজ আপনাকে সচেতনভাবে, সুতরাং সবলভাবে উপলব্ধি করিতে বসিয়াছে। বুঝিয়াছে, 'আত্মানং বিদ্ধি'—আপনাকে জান—ইহাই মুক্তির উপায়। 'পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ'—পরের অনুকরণেই বিনাশ।

বস্তুপ্রধান শক্তিপ্রধান সভ্যতার সম্পদ্ আমাদের ইন্দ্রিয়মনকে অভিভূত করিয়া দেয়। তাহার কল দ্রুত চলে, তাহার প্রাসাদ আকাশ স্পর্শ করে, তাহার কামান শতঘ্নী, তাহার বাণিজ্যজাল জগদ্ব্যাপী—ইহা আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ও বুদ্ধিকে স্তম্ভিত না করিয়া থাকিতে পারে না। কিছু না হৌক্, বিপুলতার একটা গায়ের জোর আছে, সেই জোরকে ঠেলিয়া-উঠিয়া মনকে মোহমুক্ত করা আমাদের মত দুর্ব্বলের পক্ষে বড় কঠিন। যদি বিপুলতাগ্রস্ত এই সভ্যতার দিকেই একমাত্র আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তবে তাহাতে আমাদের মানসিক দুর্ব্বলতা কেবল বাড়িতেই থাকে,—এই সভ্যতাকেই একমাত্র আদর্শ বলিয়া বোধ হয়, এবং নিজের সামর্থ্যকে ও সম্পদ্‌কে একেবারে নগণ্য বলিয়া জ্ঞান হয়। ইহাতে স্বচেষ্টা পরাস্ত হয়, আত্মগৌরব দূর হয়, ভবিষ্যতের জন্য কোন আশা থাকে না, এবং জড়ত্বের মধ্যে অনায়াসেই আত্মসমর্পণ করিয়া নিরাপত্তির আরামে নিদ্রার অচেতনতায় সমস্ত ভুলিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়।

বিশেষত আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা ধর্ম্মে-কর্ম্মে বিদ্যাবুদ্ধিতে অত্যন্ত দীন। য়ুরোপীয় সভ্যতাকে কেবলি নিজের সেই দীনতার সহিত তুলনা করিয়া নিজেদের সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়ি।

এ অবস্থায় প্রথমে আমাদের বুঝিতে হইবে, বস্তুপ্রধান শক্তিপ্রধান সভ্যতাই একমাত্র সভ্যতা নহে, ধর্ম্মপ্রধান মঙ্গলপ্রধান সভ্যতা তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহার পরে, এই শেষোক্ত সভ্যতাই আমাদের ছিল, সুতরাং শেষোক্ত সভ্যতার শক্তি আমাদের প্রকৃতির মধ্যে নিহিত হইয়া আছে, ইহাই জানিয়া আমাদিগকে মাথা তুলিতে হইবে, আমাদিগকে আশা ও আনন্দ লাভ করিতে হইবে। আমরা বর্ত্তমান দুর্গতির মধ্যে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র করিয়া রাখিলে, য়ুরোপীয় ব্যাপারের বৃহত্ত্ব আমাদের বুদ্ধিকে দলন-পেষণ করিয়া তাহাকে আপনার চিরদাস করিয়া রাখিবে। সেই বুদ্ধির দাসত্ব, রুচির দাসত্ব আমরা প্রত্যহ অনুভব করিতেছি। প্রাচীন ভারতের সহিত নিজেকে সংযুক্ত করিয়া নিজেকে বড় করিয়া তুলিতে হইবে।

জড়পদার্থের অপেক্ষা মানুষ জটিল জিনিষ, জড়শক্তি অপেক্ষা মানুষের ইচ্ছাশক্তি দুর্দ্ধর্ষতর, এবং বাহ্যসম্পদের অপেক্ষা সুখ অনেক বেশি দুর্লভ। সেই মানুষকে আকর্ষণ করিয়া, তাহার প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া, তাহার ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত

করিয়া যে সভ্যতা সুখ দিয়াছে, সন্তোষ দিয়াছে, আনন্দ ও মুক্তির অধিকারী করিয়াছে, সেই সভ্যতার মাহাত্ম্য আমাদিগকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে।

উপলব্ধি করা কঠিন, কারণ তাহা বস্তুপুঞ্জে এবং বাহুশক্তির প্রাবল্যে আমাদের ইন্দ্রিয়মনকে অতিমাত্র অধিকার করে না। সমস্ত শ্রেষ্ঠ পদার্থের ন্যায় তাহার মধ্যে একটি নিগূঢ়তা আছে, গভীরতা আছে,—তাহা বাহির হইতে গায়ে পড়িয়া অভিভূত করিয়া দেয় না, নিজের চেষ্টায় তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়—সংবাদপত্রে তাহার কোন বিজ্ঞাপন নাই।

এইজন্য ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতাকে বস্তুর তালিকাদ্বারা স্ফীত করিয়া তুলিতে পারি না বলিয়া, তাহাকে নিজের কাছে প্রত্যক্ষগোচর করিতে পারি না বলিয়া, আমরা পুষ্পক-রথকে রেলগাড়ি বলিতে চেষ্টা করি এবং ধর্ম্মকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্বারা কুটিল করিয়া ফ্যারাডে-ডার্বিনের প্রতিভাকে আমাদের শাস্ত্রের বিবর হইতে টানিয়া বাহির করিবার প্রয়াস পাই। এই সকল চাতুরী দ্বারাতেই বুঝা যায়, ভারতবর্ষের সভ্যতাকে আমরা ঠিক বুঝিতেছি না এবং তাহা আমাদের বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ তৃপ্ত করিতেছে না। ভারতবর্ষকে কৌশলে য়ুরোপ বলিয়া প্রমাণ না করিলে আমরা স্থির হইতে পারিতেছি না।

ইহার একটা কারণ, য়ুরোপীয় সভ্যতাকে যেমন আমরা অত্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া দেখিতেছি, প্রাচ্য সভ্যতাকে তেমন ব্যাপ্ত করিয়া দেখিতেছি না। ভারতবর্ষীয় সভ্যতাকে অন্যান্য সভ্যতার সহিত মিলাইয়া মানবপ্রকৃতির মধ্যে তাহার একটা বৃহত্ত্ব—একটা ধ্রুবত্ব উপলব্ধি করিতেছি না। ভারতবর্ষকে কেবল ভারতবর্ষের মধ্যে দেখিলেই তাহার সভ্যতা, তাহার স্থায়িত্বযোগ্যতা আমাদের কাছে যথার্থরূপে প্রমাণিত হয় না। একদিকে প্রত্যক্ষ য়ুরোপ, আর একদিকে শাস্ত্রের কথা—পুঁথির প্রমাণ, একদিকে প্রবল শক্তি, আর একদিকে আমাদের দোদুল্যমান বিশ্বাসমাত্র—এ অবস্থায় অসহায় ভক্তিকে ভারতবর্ষের অভিমুখে স্থির করিয়া রাখাই কঠিন।

এমন সময় আমাদের সেই পুরাতন সভ্যতাকে যদি চীনে ও জাপানে প্রসারিত দেখি, তবে বুঝিতে পারি, মানবপ্রকৃতির মধ্যে তাহার একটা বৃহৎ স্থান আছে, তাহা কেবল পুঁথির বচনমাত্র নহে। যদি দেখি, চীন ও জাপান সেই সভ্যতার মধ্যে সার্থকতা অনুভব করিতেছে, তবে আমাদের দীনতার অগৌরব দূর হয়, আমাদের ধনভাণ্ডার কোন্‌খানে, তাহা বুঝিতে পারি।

য়ুরোপের বন্যা জগৎ প্লাবিত করিতে ছুটিয়াছে, তাই আজ সভ্য এসিয়া আপনার পুরাতন বাঁধগুলিকে সন্ধান ও তাহাদিগকে দৃঢ় করিবার জন্য উদ্যত। প্রাচ্যসভ্যতা আত্মরক্ষা করিবে। যেখানে তাহার বল, সেইখানে তাহাকে দাঁড়াইতে হইবে। তাহার বল ধর্ম্মে, তাহার বল সমাজে। তাহার ধর্ম্ম ও তাহার সমাজ যদি আপনাকে ঠেকাইতে না পারে, তবে সে মরিল। য়ুরোপের প্রাণ বাণিজ্যে, পলিটিক্সে—আমাদের প্রাণ অন্যত্র। সেই প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য এসিয়া উত্তরোত্তর ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছে। এইখানে

আমরা একাকী নহি; সমস্ত এসিয়ার সহিত আমাদের যোগ রহিয়াছে। চীনেম্যানের চিঠিগুলি তাহাই প্রমাণ করিতেছে।

লেখক তাঁহার প্রথম পত্রে লিখিতেছেন :—আমাদের সভ্যতা জগতের মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন। অবশ্য ইহা হইতেই প্রমাণ হয় না যে, তাহা সব চেয়ে ভাল;—তেমনি আবার ইহাও প্রমাণ হয় না যে, তাহা সব চেয়ে মন্দ। এই প্রাচীনত্বের খাতিরে অন্তত এটুকুও স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের আচার-অনুষ্ঠান আমাদিগকে যে একটা স্থায়িত্বের আশ্বাস দিয়াছে, য়ুরোপের কোন জাতির মধ্যে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া ভার। আমাদের সভ্যতা কেবল যে ধ্রুব, তাহা নহে, ইহার মধ্যে একটা ধর্ম্মনীতির শৃঙ্খলা আছে; কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেবল একটা অর্থনৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিতে পাই। তোমাদের ধর্ম্ম আমাদের ধর্ম্মের চেয়ে ভাল কি না, এ জায়গায় আমি সে তর্ক তুলিতে চাই না—কিন্তু এটা নিশ্চয়, তোমাদের সমাজের উপর তোমাদের ধর্ম্মের কোন প্রভাব নাই। তোমরা খৃষ্টান-ধর্ম্ম স্বীকার কর, কিন্তু তোমাদের সভ্যতা কোনকালেই খৃষ্টান হয় নাই। অপর পক্ষে আমাদের সভ্যতা একেবারে অন্তরে অন্তরে কন্‌ফুশিয়ান্ বলাও যা, আর ধর্ম্মনৈতিক বলাও তা। অর্থাৎ ধর্ম্মবন্ধনগুলিকেই ইহা প্রধানভাবে গণ্য করে। অপরপক্ষে অর্থনৈতিক বন্ধনকেই তোমরা প্রথম স্থান দাও, তাহার পরে, যতটা পার, তাহার সঙ্গে ধর্ম্মনীতি বাহির হইতে জুড়িয়া দিতে চেষ্টা কর।

তোমাদের পরিবার এবং আমাদের পরিবারের তুলনা করিলেই আমার কথাটা স্পষ্ট হইবে। সন্তান যতদিন পর্য্যন্ত না বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিজের ভার লইতে পারে, তোমাদের পরিবার ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে আহার দিবার ও রক্ষা করিবার একটা উপায়স্বরূপমাত্র। যত সকাল-সকাল পার, ছেলেগুলিকে পাব্লিক্‌স্কুলে পাঠাইয়া দাও, সেখানে তাহারা যত শীঘ্র পারে, গৃহের প্রভাব হইতে নিজেদের মুক্তিদান করিয়া বসে। যেমনি তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, অমনি তাহাদিগকে রোজগার করিতে ছাড়িয়া দাও—এবং তাহার পরে অধিকাংশস্থলেই বাপ-মার প্রতি নির্ভর যখনই ফুরাইল, বাপ-মার প্রতি কর্ত্তব্যস্বীকারও অমনি শেষ হইল। তাহার পরে ছেলেরা যেখানে খুসি যাক্, যাহা খুসি করুক্, যত খুসি পাক্ এবং যেমন খুসি ছড়াক্, তাহাতে কাহারো কথা কহিবার নাই;—পরিবারবন্ধন রক্ষা করিবে কি না করিবে, তাহা সম্পূর্ণ তাহাদের ইচ্ছা। তোমাদের সমাজে এক একটি ব্যক্তি এক-জন এবং সেই একজনেরা ছাড়াছাড়া। কেহ কাহারো সহিত বদ্ধ নহে, তেমনি কোথাও কাহারো শিকড় নাই। তোমাদের সমাজকে তোমরা [illegible] বলিয়া থাক—সর্ব্বদাই তোমরা চলিতেছ। প্রত্যেকেই নিজের জন্য একটা নূতন রাস্তা বাহির করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করে। যে অবস্থার মধ্যে জন্মিয়াছ, সে অবস্থার মধ্যে স্থির থাকাকে তোমরা অগৌরব মনে কর। পুরুষ যদি পুরুষ হইতে চায় তবে সে সাহস করিবে, চেষ্টা করিবে, লড়াই করিবে এবং জয়ী

হইবে। এই ভাব হইতেই তোমাদের সমাজে অপরিসীম উদ্যমের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং বস্তুগত শিল্পাদির তোমরা উন্নতি করিতে পারিয়াছ। কিন্তু ইহা হইতেই তোমাদের সমাজে এত অস্থিরতা, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং এইজন্যই আমাদের মতে ইহার মধ্যে ধর্ম্মভাবের এই অভাব;—চীনেম্যানের চোখে এইটেই বেশি করিয়া ঠেকে। তোমাদের মধ্যে কেহই সন্তুষ্ট নও—জীবনযাত্রার আয়োজন বৃদ্ধি করিতে সকলেই এত ব্যগ্র যে, কাহারো জীবনযাত্রার অবকাশ জোটে না। মানুষের মধ্যে অর্থের সম্বন্ধকেই তোমরা স্বীকার কর।

পূর্ব্বদেশীয় আমাদের কাছে ইহা বর্ব্বর-সমাজের লক্ষণ-বলিয়া বোধ হয়। জীবনযাত্রার উপকরণবৃদ্ধির মাপে আমরা সভ্যতাকে মাপি না, কিন্তু সেই জীবনযাত্রার প্রকৃতি ও মূল্য দ্বারাই আমরা সভ্যতার বিচার করি। যেখানে কোন সম্বন্ধয় ও ধ্রুব বন্ধন নাই, পুরাতনের প্রতি ভক্তি নাই, বর্ত্তমানের প্রতিও যথার্থ শ্রদ্ধা নাই, কেবল ভবিষ্যৎকেই লুব্ধভাবে লুণ্ঠন করিবার চেষ্টা আছে, সেখানে আমাদের মতে যথার্থ সমাজই নাই। যদি তোমাদের আচার-অনুষ্ঠানের নকল না করিলে ধনে, বিজ্ঞানে ও শিল্পে তোমাদের সঙ্গে টক্কর দেওয়া না যায়, তবে আমরা টক্কর না দেওয়াই ভাল মনে করি।

এ সকল ব্যাপারে আমাদের পদ্ধতি তোমাদের ঠিক উল্টা। আমাদের কাছে সমাজ প্রথম, ব্যক্তিবিশেষ তাহার পরে। আমাদের মধ্যে নিয়ম এই যে, মানুষ যে সকল সম্বন্ধের মধ্যে জন্মলাভ করে, চির-জীবন তাহারই মধ্যে সে আপনাকে রক্ষা করিবে। সে তাহার পরিবারতন্ত্রের অঙ্গ হইয়া জীবন আরম্ভ করে, সেই ভাবেই জীবন শেষ করে এবং তাহার জীবননির্ব্বাহের সমস্ত তত্ত্ব এবং অনুষ্ঠান এই অবস্থারই অনুযায়ী। সে তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগকে পূজা করিতে শিখিয়াছে, তাহার পিতা-মাতাকে ভক্তি ও মান্য করিতে শিখিয়াছে এবং অল্পবয়স হইতেই পতি ও পিতার কর্ত্তব্যসাধনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছে। বিবাহের দ্বারা পরিবারবন্ধন ছিঁড়িয়া যায় না, স্বামী পরিবারেই থাকে এবং স্ত্রী আত্মীয়কুটুম্ববর্গের অঙ্গীভূত হয়। এইরূপ এক একটি কুটুম্বশ্রেণীই সমাজের এক একটি অংশ। ইহার ভূমিখণ্ড, ইহার দেবপীঠ ও পূজাপদ্ধতি, আত্মীয়দের মধ্যে বিবাদমীমাংসার বিচার-ব্যবস্থা, এ সমস্তই পরিবারের মধ্যে সরকারী। চীনদেশে নিজের দোষে ছাড়া কোন লোক একলা পড়ে না। চীনে কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে তোমাদের মত ধনী হইয়া উঠা সহজ নহে, তেমনি তাহার পক্ষে অনাহারে মরাও শক্ত;—যেমন রোজগারের জন্য অত্যন্ত ঠেলাঠেলি করিবার উত্তেজনা তাহার নাই, তেমনি প্রবঞ্চনা এবং পীড়ন করিবার প্রলোভনও তাহার অল্প। অত্যাকাঙ্ক্ষার তাড়না এবং অভাবের আশঙ্কা হইতে মুক্ত হইয়া জীবনযাত্রার উপকরণ উপার্জ্জনের অবিশ্রাম চেষ্টা ছাড়িয়া জীবনযাত্রার জন্যই সে অবসর লাভ করে। প্রকৃতির দানসকল উপভোগ করিতে, শিষ্টতার চর্চ্চা করিতে, এবং মানুষের সঙ্গে সহৃদয় নিঃস্বার্থ সম্বন্ধ পাতাইয়া

বসিতে, তাহার ভিতরের স্বভাব এবং বাহিরের সুযোগ দুইই অনুকূল। ইহার ফল হইয়াছে এই যে, ধর্ম্মের দিকেই বল, আর মাধুর্য্যের দিকেই বল, তোমাদের য়ুরোপের অধিকাংশ অধিবাসীর চেয়ে আমাদের লোকেরা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। তোমাদের কার্য্যকরী এবং বৈজ্ঞানিক সফলতার মহত্ব আমরা স্বীকার করি—কিন্তু স্বীকার করিয়াও, তোমাদের যে সভ্যতা হইতে বড় বড় সহরে এমন রূঢ় আচার, এমন অবনত ধর্ম্মনীতি এবং বাহ্যশোভনতার এমন বিকার উৎপন্ন হইয়াছে, সে সভ্যতাকে আমরা সমস্ত মন দিয়া প্রশংসা করা অসম্ভব দেখি। তোমরা যাহাকে উন্নতিশীল জাত বল, আমরা তাহা নই, এ কথা মানিতে রাজি আছি—কিন্তু ইহাও দেখিতেছি, উন্নতির মূল্য সর্ব্বদেশে হইতে পারে। তোমাদের আর্থিক লাভের চেয়ে আমাদের ধর্ম্মনৈতিক লাভকেই আমরা শিরোধার্য্য করি—এবং তোমাদের সেই সম্পদ্ হইতে যদি বঞ্চিত হইতে হয়, সে-ও স্বীকার,তবু আমাদের যে সকল আচার-অনুষ্ঠান আমাদের ধর্ম্মলাভকে সুনিশ্চিত করিয়াছে, তাহাকে আমরা শেষ পর্য্যন্ত আঁকড়িয়া ধরিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এই গেল প্রথম পত্র। দ্বিতীয় পত্রে লেখক অর্থনৈতিক-অবস্থা-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমাদের যাহা দরকার, তাহাই আমরা উৎপন্ন করি, আমরা যাহা উৎপন্ন করি, তাহা আমরাই খাই। অন্যজাতের উৎপন্ন-দ্রব্য আমরা চাহি নাই, আমাদের দরকারও হয় নাই। আমাদের মতে সমাজের স্থিতি-রক্ষা করিতে হইলে, তাহার আর্থিক স্বাধীনতা থাকা চাই। বৃহৎ বিদেশী বাণিজ্য সামাজিক ভ্রষ্টতার একটা নিশ্চিত কারণ।

তোমরা যাহা খাইতে চাও,তাহা তোমরা উৎপন্ন করিতে পার না, তোমাদিগকে যাহা উৎপন্ন করিতে হয়, তাহা তোমরা দুরাইতে পার না। প্রাণের দায়ে এমনতর কেনাবেচার গঞ্জ তোমাদের দরকার, যেখানে তোমাদের কারখানার মাল চালাইতে পার, এবং খাদ্য এবং কৃষিজাত দ্রব্য কিনিতে পার। অতএব যেমন করিয়া হোক্, চীনকে তোমাদের দরকার।

তোমরা চাও, আমরাও ব্যবসাদার হই এবং আমাদের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক যে স্বাধীনতা আছে, তাহা বিসর্জ্জন দিই; কেবল যে আমাদের সমস্ত কারকারবার উলট্‌পালট্ করিয়া দিই, তাহা নহে, আমাদের আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম, আমাদের সাবেক রীতিনীতি, সমস্তই বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেল। এমত অবস্থায়, তোমাদের দশাটা কি হইয়াছে, তাহা যদি বেশ করিয়া আলোচনা করিয়া দেখি, তবে আশা করি, মাপ করিবে।

যাহা দেখা যায়, সেটা ত বড় উৎসাহজনক নহে। প্রতিযোগিতানামক একটা দৈত্যকে তোমরা ছাড়িয়া দিয়াছ, এখন আর সেটাকে কিছুতেই কায়দা করিতে পারিতেছ না। তোমাদের গত একশো বৎসরের বিধি-বিধান কেবল এই আর্থিক বিশৃঙ্খলাকে সংযত করিবার জন্য অবিশ্রাম নিষ্ফল চেষ্টামাত্র। তোমাদের গরিবেরা, মাতালেরা, অন্ধমেরা, তোমাদের পীড়া ও

জরা গ্রস্তগণ একটা বিভীষিকার মত তোমাদের ঘাড়ে চাপিয়া আছে। মানুষের সহিত সমস্ত ব্যক্তিগত বন্ধন তোমরা ছেদন করিয়া বসিয়া আছ, এখন ষ্টেট্ অর্থাৎ সরকারের অব্যক্তিক উদ্যমের দ্বারা তোমরা ব্যক্তির সমস্ত কাজ সারিয়া লইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছ। তোমাদের সভ্যতার প্রধান লক্ষণ দায়িত্ববিহীনতা। তোমাদের কারবারের সর্ব্বত্রই তোমরা ব্যক্তির জায়গায় কোম্পানি এবং মজুরের জায়গায় কল বসাইতেছ। মুনফার চেষ্টাতেই সকলে ব্যস্ত—শ্রমজীবীর মঙ্গলের ভার কাহারই নহে, সেটা সরকারের। সরকার সেটাকে সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারেন না। সহস্রক্রোশ দূরে যদি দুর্ভিক্ষ হয়, যদি কোথাও মাশুলের কোন পরিবর্ত্তন হয়, তবে তোমাদের লক্ষ লোকের কারবার বিশ্লিষ্ট হইবার জো হয়—যাহার উপরে তোমাদের হাত নাই, তাহার উপরে তোমাদিগকে নির্ভর করিতে হয়। তোমাদের মূলধন একটা সজীব পদার্থ, সেটা খোরাকের জন্য সর্ব্বদাই চীৎকার করিতেছে; তাহাকে আহার না জোগাইলে সে তোমাদের গলা চাপিয়া ধরে। তোমরা যে উৎপন্ন কর, সেটা ইচ্ছামত নহে, সেটা অগত্যা,এবং তোমরা যে কিনিয়া থাক, সেটা যে চাও বলিয়া, তাহা নহে, সেটা তোমাদের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে বলিয়া। এই যে বাণিজ্যটাকে তোমরা মুক্ত বল, ইহার মত বদ্ধ বাণিজ্য আর নাই। কিন্তু ইহা কোন বিবেচনাসঙ্গত ইচ্ছার দ্বারা বদ্ধ নহে, ইহা আকস্মিক খেয়ালের স্তূপাকার মূঢ়তার দ্বারা বন্দীকৃত।

চীনেম্যানের চক্ষে তোমাদের দেশের ভিতরকার আর্থিক অবস্থা এইরকমই ঠেকে। পররাষ্ট্রের সহিত তোমাদের বাণিজ্য-সম্বন্ধ, সে-ও অত্যন্ত উল্লাসজনক নয়। পঞ্চাশবৎসর পূর্ব্বে ধারণা হইয়াছিল যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে যখন বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপিত হইবে, তখন শান্তির সত্যযুগ আসিবে। কাজে দেখা গেল, সমস্তই উল্টা। প্রাচীনকালের রাজাদের অত্যাকাঙ্ক্ষা ও ধর্ম্মযাজকদের গোঁড়ামীর চেয়ে এই বাণিজ্য-স্থান লইয়া পরস্পর টানাটানিতে যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনা আরো বেশি প্রবল হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর যেখানেই একটুখানি অপরিচিত স্থান ছিল, সেইখানেই য়ুরোপের লোক একেবারে ক্ষুধিত হিংস্রজন্তুর মত হুঙ্কার দিয়া পড়িতেছে। এখন য়ুরোপের এলাকার সীমানার বাহিরে এই লুণ্ঠনব্যাপার চলিতেছে। কিন্তু যতক্ষণ ভাগাভাগি চলিতেছে, ততক্ষণ পরস্পরের প্রতি পরস্পর কট্‌মট্ করিয়া তাকাইতেছে। আজ হোক্ বা কাল হোক্, যখন আর বাঁটোয়ারা করিবার জন্য কিছুই বাকি থাকিবে না, তখন তাহারা পরস্পরের ঘাড়ের উপরে গিয়া পড়িবে। তোমাদের শস্ত্রসজ্জার এই আসল তাৎপর্য্য—হয় তোমরা অন্যকে গ্রাস করিবে, নয় অন্যে তোমাদিগকে গ্রাস করিবে। যে বাণিজ্য-সম্পর্ককে তোমরা শান্তির বন্ধন মনে করিয়াছিলে, তাহাই তোমাদিগকে পরস্পরের গলা-কাটাকাটির প্রতিযোগী করিয়া তুলিয়াছে এবং তোমাদের সকলকে একটা বিরাট্ বিনাশব্যাপারের অনতিদূরে আনিয়া স্থাপন করিয়াছে।

লেখক বলেন, পরিশ্রম বাঁচাইবার কল তৈরি করিতে তোমরা যে বুদ্ধি খাটাইতেছ, তাহাতে সমাজের কল্যাণ হইতেছে না। তাহাতে ধনবৃদ্ধি হইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেটা যে মঙ্গলই, আমার মতে, এমন কথা মনে করিবার হেতু নাই। ধন কিরূপে ভাগ হয় এবং সেই ধনে জাতির চরিত্রের উপরে কি ফল হয়, তাহাই চিন্তার বিষয়। সেইটে যখন চিন্তা করি, তখন বিলাতি পদ্ধতি চীনে ঢুকাইবার প্রস্তাবে মন বিগড়িয়া যায়।

এই তোমরা যতদিন ধরিয়া যন্ত্রতন্ত্রের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে লাগিয়াছ, ততদিনে, তোমাদের শ্রমজীবীদিগকে সঙ্কটে ফেলিয়া তাহা হইতে উদ্ধারের কোন একটা ভাল উপায় বাহির কর নাই। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কারণ টাকা করা তোমাদের প্রধান লক্ষ্য, জীবনের আর সমস্ত লক্ষ্য তাহার নীচে। চীনেম্যানের কাছে এটা কিছুতেই উৎসাহ-জনক ঠেকে না। বিলাতি কারবারের প্রণালী যদি চীনদেশে ফালাও করিয়া তোলা যায়, তবে তাহার চল্লিশকোটি অধিবাসীর মধ্যে যে নিশ্চিত বিশৃঙ্খলা জাগিয়া উঠিবে—অন্তত আমি ত তাহাকে অত্যন্ত আশঙ্কার চক্ষে দেখি! তোমরা বলিবে, সে বিশৃঙ্খলা সাময়িক, আমি ত দেখিতেছি, তোমাদের দেশে তাহা চিরস্থায়ী। আচ্ছা সে কথাও যাক্, তাহাতে আমাদের লাভটা কি? আমরা ত তোমাদেরই মত হইয়া যাইব! সে সম্ভাবনা কি অবিচলিতচিত্তে কল্পনা করা যায়? তোমাদের লোকেরা না হয় আমাদের চেয়ে আরামে খায় বেশি, পান করে বেশি, নিদ্রা যায় বেশি—কিন্তু তাহারা প্রফুল্ল নয়, সন্তুষ্ট নয়, শ্রমানুরাগী নয়, তাহারা আইন মানে না। তাহাদের কর্ম্ম শরীর-মনের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর,—তাহারা প্রকৃতি হইতে বিচ্যুত হইয়া, ভূমিখণ্ডের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া সহরে এবং কারখানার মধ্যে ঠাসাঠাসি করিয়া থাকে।

আমাদের কবিগণ—লেখকগণ ধনের মধ্যে, ক্ষমতার মধ্যে, নানাপ্রকার উদ্যোগের মধ্যে,কল্যাণ অনুসন্ধান করিতে উপদেশ দেন নাই, কিন্তু মানবজীবনের অত্যন্ত সরল ও বিশ্বব্যাপী সম্বন্ধগুলির সংযত, সুনির্ব্বাচিত, সুমার্জ্জিত রসাস্বাদনের পথে আমাদের মনকে তাঁহারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এই জিনিষটা আমাদের আছে—এটা তোমরা আমাদিগকে দিতে পার না, কিন্তু এটা তোমরা অনায়াসে অপহরণ করিতে পার। তোমাদের কলের গর্জ্জনের মধ্যে ইহার স্বর শোনা যায় না, তোমাদের কারখানার কালো ধোঁয়ার মধ্যে ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না,—তোমাদের বিলাতি জীবনযাত্রার ঘূর্ণী এবং ঘর্ষণের মধ্যে ইহা মরিয়া যায়। যে কেজো লোকদিগকে তোমরা অত্যন্ত খাতির করিয়া থাক, যখন দেখি তাহারা ঘণ্টার পর ঘণ্টায়, দিনের পর দিনে, বৎসরের পর বৎসরে তাহাদের জাঁতার মধ্যে আনন্দহীন অগত্যা-প্রেরিত খাটুনিতে নিযুক্ত, যখন দেখি তাহাদের দিনের উৎকণ্ঠাকে তাহারা স্বল্পাবশিষ্ট অবকাশের মধ্যে টানিয়া আনিতেছে, এবং পরিশ্রমের দ্বারা ততটা নহে, যতটা শুদ্ধ সঙ্কীর্ণ দুশ্চিন্তা দ্বারা আপনাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে, তখন—এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমাদের

দেশের প্রাচীন বৈশ্যবৃত্তির সরলতর পদ্ধতির কথা স্মরণ করিয়া আমি সন্তোষলাভ করি—এবং আমাদের যে সকল চিরব্যবহৃত পথগুলি আমাদের অভ্যস্ত চরণের কাছে এমন পরিচিত যে, তাহা দিয়া চলিবার সময়েও অনন্ত নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিবার জন্য আমাদের অবকাশের অভাব ঘটে না—তোমাদের সমুদয় নূতন ও ভয়সঙ্কুল বর্ত্মের চেয়ে সেই পথগুলিকে আমি অধিক মূল্যবান্ বলিয়া গৌরব করি।

ইহার পরে লেখক রাষ্ট্রতন্ত্রের কথা তুলিয়াছেন। তিনি বলেন, গবর্মেণ্ট্ তোমাদের কাছে এতই প্রধান এবং সর্ব্বত্রই সে তোমাদের সঙ্গে এমনি লাগিয়াই আছে যে, যে জাতি গবর্মেণ্ট্‌কে প্রায় সম্পূর্ণই বাদ দিয়া চলিতে পারে, তাহার অবস্থা তোমরা কল্পনাই করিতে পার না। অথচ আমাদেরই সেই অবস্থা। আমাদের সভ্যতার সরল এবং অকৃত্রিম ভাব, আমাদের লোকদের শান্তিপ্রিয় প্রকৃতি, এবং সর্ব্বোচ্চে আমাদের সেই পরিবারতন্ত্র,যাহা পোলিটিক্যাল্, সামাজিক ও আর্থিক ব্যাপারে এক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যবিশেষ,তাহারা আমাদিগকে গবর্মেণ্ট্-শাসন হইতে এতটা-দূর মুক্তিদান করিয়াছে যে, য়ুরোপের পক্ষে তাহা বিশ্বাস করাই কঠিন।

আমাদের সমাজের গোড়াকার জিনিষগুলি কোন রাজক্ষমতার স্বেচ্ছাকৃত সৃজন নহে। আমাদের জনসাধারণ নিজের জীবনকে এইরূপ শরীরতন্ত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কোন গবর্মেণ্ট্ তাহাকে গড়ে নাই, কোন গবর্মেণ্ট্ তাহার বদল করিতে পারে না। এক কথায়, আইন-জিনিষটা উপর হইতে আমাদের মাথায় চাপান হয় নাই,—তাহা আমাদের জাতিগত জীবনের মূলসূত্র, এবং যাহা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে, তাহাই ব্যবহারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এইজন্য চীন গবর্মেণ্ট্ যথেচ্ছাচারী নহে, অত্যাবশ্যকও নয়। রাজপুরুষদের শাসন তুলিয়া লও, তবু আমাদের জীবনযাত্রা প্রায় পূর্ব্বের মতই চলিয়া যাইবে। যে আইন আমরা মান্য করি, সে আমাদের স্বভাবের আইন, বহুশতাব্দীর অভিজ্ঞতায় তাহা অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে,—বাহিরের শাসন তুলিয়া লইলেও ইহার কাছে আমরা বশ্যতা স্বীকার করি। যাহাই ঘটুক্ না, আমাদের পরিবার থাকে, পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে মনের সেই গঠনটি থাকে, সেই শৃঙ্খলা, কর্ম্মনিষ্ঠতা ও মিতব্যয়িতার ভাবটি থাকিয়া যায়। ইহারাই চীনকে তৈরি করিয়াছে।

তোমাদের পশ্চিমদেশে গবর্মেণ্ট্-ব্যাপারটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখানে কোন মূলবিধান নাই, কিন্তু ইচ্ছাকৃত অন্তহীন আইন পড়িয়া আছে। মাটি হইতে কিছুই গজাইয়া উঠে না, উপর হইতে সমস্ত পুঁতিয়া দিতে হয়। যাহাকে একবার পোঁতা হয়, তাহাকে আবার পোঁতা দরকার হয়। গত শত বৎসরের মধ্যে তোমরা তোমাদের সমস্ত সমাজকে উল্‌টাইয়া দিয়াছ। সম্পত্তি, বিবাহ, ধর্ম্ম, চরিত্র, শ্রেণীবিভাগ পদবিভাগ, অর্থাৎ মানবসম্বন্ধগুলির মধ্যে যাহা কিছু সব চেয়ে উদার ও গভীর, তাহাদিগকে একেবারে শিকড়ে ধরিয়া উপ্‌ড়াইয়া কালের স্রোতে আবর্জ্জনার মত ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এইজন্যই তোমাদের গবর্মেণ্ট্‌কে এত বেশি উদ্যম প্রয়োগ করিতে হয়—কারণ,গবর্মেণ্ট্‌ নহিলে কে তোমাদের সমাজকে ধারণ করিয়া রাখিবে? তোমাদের পক্ষে গবর্মেণ্ট্‌ যত একান্ত আবশ্যক, সৌভাগ্যক্রমে আমাদের পূর্ব্বদেশের পক্ষে তত নয়। আমার কাছে এটা একটা অমঙ্গল বলিয়াই বোধ হয়—কিন্তু দেখিতেছি, ইহা নহিলেও তোমাদের চলিবার উপায় নাই। তবু, এত বড় কাজটা যাহাকে দিয়া আদায় করিতে চাও, সেই যন্ত্রটার অসামান্য অপটুতা দেখিয়া আমি আরো আশ্চর্য্য হই। যোগ্য-লোক-নির্ব্বাচনের সুনিশ্চিত উপায় আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করা দুরূহ, সে কথা স্বীকার করি, কিন্তু তবু এটা বড়ই অদ্ভুত যে, যাহাদের উপরে এমন একটা মহৎ-ভার দেওয়া হয়, তাহাদের ধর্ম্মনৈতিক ও বুদ্ধিগত সামর্থ্যের কোন-প্রকার পরীক্ষার চেষ্টা হয় না।

ইলেক্‌শন্‌-ব্যাপারটার অর্থ কি? তোমরা মুখে বল, তাহার অর্থ জনসাধারণের দ্বারা প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন—কিন্তু তোমরা মনে মনে কি নিশ্চয় জান না, তাহার অর্থ তাহা নহে? বস্তুত এক একটি দলীয় স্বার্থেরই প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়। জমিদার, মদের কারখানার কর্ত্তা,রেল কোম্পানির অধ্যক্ষ—ইহারাই কি তোমাদিগকে শাসন করিতেছে না? আমি জানি, একদল আছে, তাহারা 'মাস্‌' অর্থাৎ জনসাধারণের প্রচণ্ড পশু-শক্তিকেও এই কর্ত্তৃপক্ষদের দলভুক্ত করিয়া সামঞ্জস্যসাধন করিতে চাহে। কিন্তু তোমাদের দেশে জনসাধারণও যে একটা স্বতন্ত্র বিশেষ দল—তাহাদেরও একটা দলগত সঙ্কীর্ণ স্বার্থ আছে। তোমাদের এই যন্ত্রটার উদ্দেশ্য দেখিতেছি, একটা গর্ত্তের মধ্যে কতকগুলা প্রাইভেট্‌ স্বার্থের আত্মম্ভরী শক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া,—তাহারা শুদ্ধমাত্র পরস্পর লড়াইয়ের জোরেই সাধারণের কল্যাণে উপনীত হইবে। ধর্ম্ম এবং সদ্বিবেচনার কর্ত্তৃত্বের উপর চীনেম্যানের এমন একটা মজ্জাগত শ্রদ্ধা আছে যে, তোমাদের এই প্রণালীকে আমার ভালই বোধ হয় না। তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যত্র আমি এমন সকল লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা তোমাদের ব্যবহারোপযোগ্য সমস্ত বিষয়গুলিকে সুগভীরভাবে আলোচনা করিয়াছেন, যাঁহাদের বুদ্ধি পরিষ্কৃত, বিচার পক্ষপাতশূন্য, উৎসাহ নিঃস্বার্থ এবং নির্ম্মল,—কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের প্রাজ্ঞতাকে কোন কাজে লাগাইবার আশাও করিতে পারেন না—কারণ, তাঁহাদের প্রকৃতি, তাঁহাদের শিক্ষা, তাঁহাদের অভ্যাস, জানপদিক ইলেক্‌শনের উপদ্রব সহ্য করিবার পক্ষে তাঁহাদিগকে অপটু করিয়াছে। পার্লামেণ্টের সভ্য হওয়াও একটা ব্যবসাবিশেষ—এবং ধর্ম্মনৈতিক ও মানসিক যে সকল গুণ সাধারণের মঙ্গলসাধনের জন্য আবশ্যক, এই ব্যবসায়ে প্রবেশ করিবার গুণ তাহা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই বোধ হয়!

আমি সংক্ষেপে চীনেম্যানের পত্রের প্রধান অংশগুলি উপরে বিবৃত করিলাম। এই পত্রগুলি পড়িলে প্রাচ্যসমাজের সাধারণ-ভিত্তি-সম্বন্ধে আমাদের পরস্পরের যে ঐক্য, তাহা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই, এই যে শান্তি এবং

শৃঙ্খলা, সন্তোষ এবং সংযমের উপরে সমস্ত সমাজকে গড়িয়া তোলা—তাহার চরম সার্থকতার কথা এই চিঠিগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। চীনদেশ সুখী, সন্তুষ্ট, কর্ম্মনিষ্ঠ হইয়াছে, কিন্তু সেই সার্থকতা পায় নাই। অসুখে-অসন্তোষে মানুষকে ব্যর্থ করিতে পারে, কিন্তু সুখে-সন্তোষে মানুষকে ক্ষুদ্র করে। চীন বলিতেছে, আমি বাহিরের কিছুতেই দৃক্‌পাত করি নাই নিজের এলাকার মধ্যেই নিজের সমস্ত চেষ্টাকে বদ্ধ করিয়া সুখী হইয়াছি, কিন্তু এ কথা যথেষ্ট নহে। এই সঙ্কীর্ণতাটুকুর মধ্যে সরল উৎকর্ষ লাভ করাকেই চরম মনে করিলে হতাশ হইতে হয়। জলধারা যদি সমুদ্রকে চায়, তবে নিজেকে দুই তটের মধ্যে সংহত-সংযত করিয়া তাহাকে চলিতে হয়, কিন্তু তাই বলিয়া নিজেকে একজায়গায় আনিয়া বদ্ধ করিলে চলে না। মুক্তির জন্যই তাহাকে সংযত হইতে হয়, কিন্তু নিজেকে বন্দী করিলে তাহার চরম উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়—তাহা হইলে নদীকে ঝিল হইতে হয় এবং স্রোতের অন্তহীন ধারাকে সমুদ্রের অন্তহীন তৃপ্তির মধ্যে লইয়া যাওয়া হয় না।

ভারতবর্ষ সমাজকে সংযত-সরল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা সমাজের মধ্যে আবদ্ধ হইবার জন্য নহে। নিজেকে শতধাবিভক্ত অন্ধচেষ্টার মধ্যে বিক্ষিপ্ত না করিয়া, সে আপন সংহত শক্তিকে অনন্তের অভিমুখে একাগ্র করিবার জন্যই ইচ্ছাপূর্ব্বক বাহ্য-বিষয়ে সঙ্কীর্ণতা আশ্রয় করিয়াছিল। নদীর তটবন্ধনের ন্যায় সমাজবন্ধন তাহাকে বেগদান করিবে, বন্দী করিবে না, এই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। এইজন্য ভারতবর্ষের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্মের মধ্যে, সুখশান্তিসন্তোষের মধ্যে মুক্তির আহ্বান আছে—আত্মাকে ভূমানন্দে ব্রহ্মের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্যই সে সমাজের মধ্যে আপন শিকড় বাঁধিয়াছিল। যদি সেই লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হই, জড়ত্ববশত সেই পরিণামকে উপেক্ষা করি, তবে বন্ধন কেবল বন্ধনই থাকিয়া যায়, তবে অতিক্ষুদ্র সন্তোষ-শান্তির কোন অর্থই থাকে না। ভারতবর্ষের লক্ষ্য ক্ষুদ্র নহে, তাহা ভারতবর্ষ স্বীকার করিয়াছে—ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি—ভূমাই সুখ, অল্পে সুখ নাই। ভারতের ব্রহ্মবাদিনী বলিয়াছেন—যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্‌ যাহার দ্বারা অমর না হইব, তাহা লইয়া আমি কি করিব? কেবলমাত্র পারিবারিক শৃঙ্খলা এবং সামাজিক সুব্যবস্থার দ্বারা আমি অমর হইব না; তাহাতে আমার আত্মার বিকাশ হইবে না। সমাজ যদি আমাকে সম্পূর্ণ সার্থকতা না দেয়, তবে সমাজ আমার কে? সমাজকে রাখিবার জন্য যে আমাকে বঞ্চিত হইতে হইবে, এ কথা স্বীকার করা যায় না—য়ুরোপও বলে, individualকে যে সমাজ পঙ্গু ও প্রতিহত করে, সে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করিলে হীনতা স্বীকার করা হয়। ভারতবর্ষও অত্যন্ত অসঙ্কোচে নির্ভয়ে বলিয়াছে, আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ। সমাজকে মুখ্য করিলে উপায়কে উদ্দেশ্য করা হয়। ভারতবর্ষ তাহা করিতে চাহে নাই, সেইজন্য তাহার বন্ধন যেমন দৃঢ়, তাহার ত্যাগও সেইরূপ সম্পূর্ণ। সাংসারিক পরিপূর্ণতার মধ্যে ভারতবর্ষ আপনাকে বেষ্টিত,

বদ্ধ করিত না, তাহার বিপরীতই করিত। যখন সমস্ত সঞ্চিত হইয়াছে, ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়াছে, পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিবাহ করিয়াছে, যখন সেই পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত সংসারের মধ্যে আরাম করিবার, ভোগ করিবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে, ঠিক সেই সময়েই সংসারপরিত্যাগের ব্যবস্থা—যতদিন খাটুনি, ততদিন তুমি আছ, যখন খাটুনি বন্ধ, তখন আরামে ফলভোগের দ্বারা জড়ত্বলাভ করিতে বসা নিষিদ্ধ। সংসারের কাজ হইলেই সংসার হইতে মুক্তি হইল—তাহার পরে আত্মার অবাধ অনন্ত গতি। তাহা নিশ্চেষ্টতা নহে। সংসারের হিসাবে তাহা জড়ত্বের ন্যায় দৃশ্যমান—কিন্তু চাকা অত্যন্ত ঘুরিলে যেমন তাহাকে দেখা যায় না, তেমনি আত্মার অত্যন্ত বেগকে নিশ্চলতা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আত্মার সেই বেগকে চতুর্দ্দিকে নানারূপে অপব্যয় না করিয়া সেই শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া তোলাই আমাদের সমাজের কাজ ছিল। আমাদের সমাজে প্রবৃত্তিকে খর্ব্ব করিয়া প্রত্যহই নিঃস্বার্থ মঙ্গলসাধনের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা ব্রহ্মলাভের সোপান বলিয়াই আমরা তাহা লইয়া গৌরব করি। বাসনাকে ছোট করিলে আত্মাকেই বড় করা হয়, এইজন্যই আমরা বাসনা খর্ব্ব করি—সন্তোষ অনুভব করিবার জন্য নহে। য়ুরোপ মরিতেও রাজি আছে, তবু বাসনাকে ছোট করিতে চায় না, আমরাও মরিতেও রাজি আছি, তবু আত্মাকে তাহার চরমগতি—পরমসম্পদ্ হইতে বঞ্চিত করিয়া ছোট করিতে চাই না। দুর্গতির দিনে ইহা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি—সেই সমাজ আমাদের এখনো আছে, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়া ব্রহ্মাভিমুখী মোক্ষাভিমুখী বেগবতী স্রোতোধারা 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্' এই গান করিয়া ধাবিত হইতেছে না—

মালা ছিল, তার ফুলগুলি গেছে,
রয়েছে ডোর।

সেইজন্য আমাদের এতদিনকার সমাজ আমাদিগকে বল দিতেছে না, গৌরব দিতেছে না, আধ্যাত্মিকতার দিকে আমাদিগকে অগ্রসর করিতেছে না, আমাদিগকে চতুর্দ্দিকে প্রতিহত করিয়া রাখিয়াছে। এই সমাজের মহৎ উদ্দেশ্য যখন আমরা সচেতনভাবে বুঝিব, ইহাকে সম্পূর্ণ সফল করিবার জন্য যখন সচেষ্টভাবে উদ্যত হইব, তখনই মুহূর্ত্তের মধ্যে বৃহৎ হইব, মুক্ত হইব, অমর হইব—জগতের মধ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠা হইবে, প্রাচীন ভারতের তপোবনে ঋষিরা যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইবে, এবং পিতামহগণ আমাদের মধ্যে কৃতার্থ হইয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।*

* "ব্রাহ্মণ" এবং "চীনেম্যানের চিঠি" সম্পাদকবর্ত্তৃক মজুমদার লাইব্রেরির সাংস্থ 'আলোচনা সমিতির" বিশেষ অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল।

প্রকাশ।

১

কখনো বলিনি যাহা, আজ্ সেই কথা, দেবি,
শুনিতে কি বাসনা তোমার ?
যে ব্রত জীবন-পণে দেবতা-শপথ করি'
রুধিয়াছি হৃদয়-দুয়ার !
আজ্ সে মন্দির ভাঙি, দেখিতে চাহিবে কি গো,
চির-ধ্যেয়—সাধনার ধন ?
খর্ব্ব কি করিবে তার হৃদয়ের প্রেমগর্ব্ব
চূর্ণ করি' সে কঠিন পণ ?

২

লক্ষ চক্ষে ব্যক্ত হবে, হবে ক্ষুদ্র—সাধারণ
যে ব্রহ্মাণ্ড চাপিয়াছি বুকে !
বর্ষ-যুগ-পরিমেয় তপস্যার তীব্র তৃপ্তি
গ্রাসিবেক মুহূর্ত্তের সুখে।
রুদ্ধ করিয়াছি দ্বার— শুদ্ধ অন্তঃপুরে মম
করিও না নিষ্ফল আঘাত ;
মোহ নয়—মায়া নয়, কঠোর-নিবৃত্তি-সুখ—
আজীবন-সাধন-সঞ্জাত !

৩

রূপ নাই—স্পৃহা নাই, অমূর্ত্ত—নিষ্কাম সেই—
আমার সে চিদানন্দময়ী !
আমার বৈরাগ্য—মন্ত্র, কামনা-সংহার—পূজা,
প্রেম মম—সর্ব্ব-দুঃখ-জয়ী।
করিও না ক্ষুদ্র তারে, তপস্যারে প্রেম বলি'
করিও না তার গর্ব্বহানি ;
ধ্রুব সেই—লক্ষ্য সেই, জীবন—সাধনা তার
সে পূজায় নাহি জানাজানি !

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

তুলনা।

তুমি দিয়েছিলে নারি, বাসনার সুধা
তুলি নিজ হাতে ; ওগো, উন্মদ চুম্বনে
জাগাইয়া দিয়েছিলে নিখিলের ক্ষুধা,
উন্মাদনা ঢেলেছিলে ধরার যৌবনে !
প্রেম যাহা দিয়েছিলে, সে ত প্রেম নয় ;
—সে যে আত্মপ্রতিষ্ঠার শুধু নামান্তর !
নর-ভাগ্য লয়ে খেলা—সে যে গো প্রলয়,
তোমার মলয়-শ্বাসে জাগে বৈশ্বানর !

আর এক জন নারি,—করুণারূপিণী
মেঘচ্ছায়া দেছে রৌদ্রে ; শুষ্ক কণ্ঠে বারি ;
অশ্রু পতিতের তরে ; বিশ্ববিপ্লাবিনী
দেছে প্রেমভোগবতী হৃদয়ে সঞ্চারি'।
প্রেমময়ী—ক্ষমাময়ী—স্বার্থবিরহিত—
জীবনের চিরারাধ্যা—সে মম কবিতা !

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

বুদ্বুদ। শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

ইহা একখানি কবিতার পুস্তক। ইহাতে ৺ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে ছবিখানি দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভাল ছবিই হইয়াছে।

গোড়ায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ হইতে দুইছত্র তোলা হইয়াছে—

"We poets in our youth
begin in gladness ;
But thereof comes in the end
despondency and madness."

দেখিতেছি, যাহা শেষে ঘটিবার কথা, তাহা আগেই ঘটিয়াছে। অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়!

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বঙ্গদর্শন।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।*

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে দীনেশচন্দ্রবাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে পুস্তকখানি দ্বিতীয়বার পাঠ করিয়া আমরা দ্বিতীয়বার আনন্দলাভ করিলাম।

যাঁহারা প্রথম সংস্করণ পড়িয়াছেন বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবেন, তাঁহারা বঞ্চিত হইবেন। দ্বিতীয় সংস্করণে বইখানি নব আকার ধারণ করিয়াছে অথবা দ্বিতীয়বার পাঠে আমাদের আনন্দ নবীভূত হইয়াছে, এ উভয়ই সম্ভব।

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ যখন বাহির হইয়াছিল, তখন দীনেশবাবু আমাদিগকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য বলিয়া এতবড় একটা ব্যাপার যে আছে, তাহা আমরা জানিতাম না,—তখন সেই অপরিচিতের সহিত পরিচয়স্থাপনেই ব্যস্ত ছিলাম।

দ্বিতীয়বার পাঠে গ্রন্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার সময় ও সুযোগ পাইয়াছি। এবারে বাংলার প্রাচীন সাহিত্যকারদের স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত পরিচয়ে বা তুলনামূলক সমালোচনায় আমাদের মন আকর্ষণ করে নাই—আমরা দীনেশবাবুর গ্রন্থের মধ্যে বাংলাদেশের বিচিত্রশাখাপ্রশাখাসম্পন্ন ইতিহাস-বনস্পতির বৃহৎ আভাস দেখিতে পাইয়াছি।

যে সকল গ্রন্থকে বাংলার ইতিহাস বলে, তাহাও পড়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে বাদশাহদের সহিত নবাবদের, ও নবাবদের সহিত বিদেশী বণিক্‌দের, ও বণিক্‌দের সহিত দেশী ষড়যন্ত্রকারীদের কি খেলা চলিতেছিল, তাহার অনেক সত্যমিথ্যা বিবরণ পাওয়া যায়। সে সকল বিবরণ যদি কোন দৈবঘটনায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়, তবে বাংলাদেশকে চিনিবার পক্ষে অল্পই ব্যাঘাত ঘটে। বাংলাদেশের সহিত নবাবদের কি সম্বন্ধ ছিল, তাহার বিবরণ বাংলাসাহিত্যের ইতস্তত যেটুকু পাওয়া যায়, তাহাই পর্য্যাপ্ত—তাহার অতিরিক্ত যাহা

* গত জ্যৈষ্ঠমাসে মজুমদার লাইব্রেরীর অন্তর্গত "আলোচনা-সমিতির" বিশেষ অধিবেশনে সম্পাদককর্ত্তৃক পঠিত।

পাঠ্যগ্রন্থে আলোচিত হয়, তাহা ব্যক্তিগত কাহিনীমাত্র।

কিন্তু দীনেশবাবুর এই গ্রন্থে হুসেন সা, পরাগল খাঁ, ছুটিখাঁর সহিত আমাদের যে-টুকু পরিচয় হইয়াছে, তাহাতে ইতিহাস আমাদের কাছে অনেকটা সজীব হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমান ও হিন্দু যে কত কাছাকাছি ছিল, নানা উপদ্রব-উচ্ছৃঙ্খলতা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে যে হৃদ্যতার পথ ছিল, ইহা এমন একটি কথা, যাহা যথার্থই জ্ঞাতব্য, যাহা প্রকৃতপক্ষেই ঐতিহাসিক। ইহা দেশের কথা,ইহা লোকবিশেষের সংবাদবিশেষ নহে।

যেমন ভূস্তরপর্য্যায়ে ভূমিকম্প, অগ্নি-উচ্ছ্বাস, জলপ্লাবন,তুষারসংহতি,কালে কালে ভূমিগঠনের ইতিহাস নানা অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে এবং বৈজ্ঞানিক সেই লিপি উদ্ঘাটন করিয়া বিচিত্র সৃজনশক্তির রহস্যলীলা বিস্ময়ের সহিত পাঠ করেন—তেমনি যে সকল প্রলয়শক্তি ও সৃজনশক্তি অদৃশ্যভাবে সমাজকে পরিণতিদান করিয়া আসিয়াছে, সাহিত্যের স্তরে স্তরে তাহাদের ইতিবৃত্ত আপনি মুদ্রিত হইয়া যায়। সেই নিগূঢ় ইতিহাসটি উদ্ঘাটন করিতে পারিলে প্রকৃত-ভাবে—সজীবভাবে আমাদের দেশকে আমরা জানিতে পারি। রাজার দপ্তর ঘাঁটিয়া যে সকল কীটজর্জ্জর দলিল পাওয়া যায়,তাহাতে অনেক সময়ে কেবলমাত্র কৌতূহল পরিতৃপ্ত ও অনেক সময়ে ভুল ইতিহাসের সৃষ্টি হইতে পারে—কারণ, তাহাকে তাহার যথা-স্থান ও যথাসময় হইতে, তাহার চারিপাশ হইতে বিচ্যুত আকারে যখন দেখি, তখন কল্পনা ও প্রবৃত্তির বিশেষ ঝোঁকে তাহাকে অসত্যরূপে বড় বা অসত্যরূপে ছোট করিয়া দেখিতে পারি।

বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী ভারতবর্ষই বর্ত্তমান ভারতবর্ষ। সেই যুগের অন্তিম অবস্থায় যখন গৌড়ের রাজসিংহাসন ক্ষণে ক্ষণে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজত্বের মধ্যে দোলায়মান হইতেছিল, তখন প্রজাসাধারণের মধ্যে সমাজ যে স্থিরভাবে ছিল, তাহা সম্ভব নহে। তখনকার সেই আধ্যাত্মিক অরাজকতার মধ্যে বাংলাদেশে যেন একটা দেবদেবীর লড়াই বাধিয়াছিল—তখন সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম-সমেত এক দেবতার মন্দির আর এক দেবতা অধিকার করিয়া পূজার্চ্চনায় নানা-প্রকার বিশ্রাট উৎপন্ন করিতেছিল। তখন এক দেবতার বিগ্রহে আর এক দেবতার সঞ্চার, এক সম্প্রদায়ের তীর্থে আর এক সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব, এমনি একটা বিপর্য্যয়-ব্যাপার ঘটিতেছিল। ঠিক সেই সময়কার কথা সাহিত্যে আমরা স্পষ্ট করিয়া খুঁজিয়া পাই না।

ইহা দেখিতেছি, বৈদিককালের দেবতল্পে মহাদেবের আধিপত্য নাই। তাহার পরে দীর্ঘকালের ইতিহাসহীন নিস্তব্ধতা কাটিয়া গেলে দেখিতে পাই, ইন্দ্র ও বরুণ ছায়ার মত অস্পষ্ট হইয়া গেছে, এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে দ্বন্দ্ব ও মিলন ঘটিতেছে। এই দৈবসংগ্রামে ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমেই পূজাগৃহ হইতে দূরে আশ্রয় লইলেন, বিষ্ণু নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে নানা আকারে নিজের দাবী রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং মহেশ্বর এক সময়ে অধিকাংশ ভারত অধিকার করিয়া লইলেন।

এই সকল দেবদ্বন্দ্বের মূল কোথায়, তাহা অনুসন্ধানযোগ্য। ভারতবর্ষের কটাহে আর্য্য, অনার্য্য, নানা জাতির সম্মিশ্রণ হইয়াছিল। এক এক সময়ে এক এক জাতি ফুটিয়া উঠিয়া আপন আপন দেবতাকে জয়ী করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই অনবরত বিপ্লবের সময় হিন্দুর প্রতিভা সমস্ত বিরোধ-বিপ্লবের মধ্যে আপনার ঐক্যসূত্র বিস্তার করিয়া নানা বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে আর্য্য-অনার্য্যের সমন্বয়স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিল।

কথাসরিৎসাগরে আছে, একদা ব্রহ্মা ও বিষ্ণু হিমাদ্রিপাদমূলে কঠোর তপস্যা সহকারে ধূর্জ্জটির আরাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শিব তুষ্ট হইয়া বর দিতে উদ্যত হইলে, ব্রহ্মা শিবকেই নিজের পুত্ররূপে লাভ করিবার প্রার্থনা করিলেন, এই অনুচিত আকাঙ্ক্ষার জন্য তিনি নিন্দিত ও লোকের নিকট অপূজ্য হইলেন। বিষ্ণু এই বর চাহিলেন, যেন আমি তোমারই সেবাপর হইতে পারি। শিব তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুকে নিজের অর্দ্ধাঙ্গ করিয়া লইলেন। সেই অর্দ্ধাঙ্গই শিবের শক্তিরূপিণী পার্ব্বতী।

এক এক সময়ে এক এক দেবতা বড় হইয়া অন্যান্য দেবতাকে কিরূপে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই গল্পেই তাহা বুঝা যায়। ব্রহ্মা, যিনি চারি বেদের চতুর্ম্মুখ-বিগ্রহস্বরূপ, তিনি বেদবিদ্রোহী বৌদ্ধযুগে অধঃকৃত হইয়াছিলেন। বিষ্ণু, যিনি বেদে ব্রাহ্মণদের দেবতা ছিলেন, তিনিও একসময় হীনবল হইয়া এই শ্মশানচারী কপালমালী দিগম্বরের পশ্চাতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শিবের যখন প্রথম অভ্যুত্থান হইয়াছিল, তখন বৈদিকদেবতারা যে তাঁহাকে আপনাদের মধ্যে স্থান দিতে চান নাই, তাহা দক্ষ-যজ্ঞের বিবরণেই বুঝা যায়। বস্তুতই তখনকার অন্যান্য আর্য্যদেবতার সহিত এই বিলোচনের অত্যন্ত প্রভেদ। দক্ষের মুখে যে সকল নিন্দা বসান হইয়াছিল, তখনকার আর্য্যমণ্ডলীর মুখে সে নিন্দা স্বাভাবিক। সমস্ত দেবমণ্ডলীর মধ্যে ভূতপ্রেতপিশাচের দ্বারা এই অদ্ভুত দেবতাকর্ত্তৃক দক্ষযজ্ঞধ্বংস কেবল কাল্পনিক কথা নহে। ইহা একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের তুল্য। আর্য্যমণ্ডলীর যে বৈদিকযজ্ঞে প্রাচীন আর্য্যদেবতারা আহূত হইতেন, সেই যজ্ঞে এই শ্মশানেশ্বরকে দেবতা বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই এবং তাঁহাকে অনার্য্য অনাচারী বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছিল; সেই কারণে তাঁহার-সেবকদের সহিত আর্য্যদেবপূজকদের প্রচণ্ড বিরোধ বাধিয়াছিল। এই বিরোধে অনার্য্য ভূতপ্রেতপিশাচের দ্বারা বৈদিকযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড হইয়া যায় এবং সেই শোণিতাক্ত অপবিত্র যজ্ঞবেদীর উপরে নবাগত দেবতার প্রাধান্য বলপূর্ব্বক স্থাপিত হয়।

আর্য্যদেবসমাজে এই অদ্ভুতাচারী দেবতা বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু ইহাকে অনেক জবাবদিহি করিতে হইয়াছিল। কথাসরিৎসাগরেই আছে, একদা পার্ব্বতী শম্ভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরকপালে এবং শ্মশানে তোমার এমন প্রীতি কেন?"

এ প্রশ্ন তখনকার আর্য্যমণ্ডলীর প্রশ্ন। আমাদের আর্য্যদেবতারা স্বর্গবাসী তাঁহারা বিকৃতিহীন, সুন্দর, সম্পৎশালী। যে দেবতা স্বর্গবিহারী নহেন, ভস্ম, নৃমুণ্ড, রুধিরাক্ত হস্তিচর্ম্ম যাঁহার সাজ, তাঁহার নিকট হইতে কোন কৈফিয়ৎ না লইয়া তাঁহাকে দেবসভায় স্থান দেওয়া যায় না।

মহেশ্বর উত্তর করিলেন, "কল্পাবসানে যখন জগৎ জলময় ছিল, তখন আমি উরু ভেদ করিয়া একবিন্দু রক্তপাত করি। সেই রক্ত হইতে অণ্ড জন্মে, সেই অণ্ড হইতে ব্রহ্মার জন্ম হয়। তৎপরে আমি বিশ্বসৃজনের উদ্দেশে প্রকৃতিকে সৃজন করি। সেই প্রকৃতি-পুরুষ হইতে অন্যান্য প্রজাপতি ও সেই প্রজাপতিগণ হইতে অখিল প্রজার সৃষ্টি হয়। তখন, আমিই চরাচরের সৃজনকর্ত্তা বলিয়া ব্রহ্মার মনে দর্প হইয়াছিল। সেই দর্প সহ্য করিতে না পারিয়া আমি ব্রহ্মার মুণ্ডচ্ছেদ করি—সেই অবধি আমার এই ব্রতাব্রত, সেই অবধিই আমি কপালপাণি ও শ্মশানপ্রিয়।

এই গল্পের দ্বারা একদিকে ব্রহ্মার পূর্ব্বতন প্রাধান্যচ্ছেদন ও ধূর্জ্জটির আর্য্যরীতিবহির্ভূত অদ্ভুত আচারেরও ব্যাখ্যা হইল। এই মুণ্ডমালী প্রেতেশ্বর ভীষণ দেবতা আর্য্যদের হাতে পড়িয়া ক্রমে কিরূপ পরম শান্ত যোগরত মঙ্গলমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বৈরাগ্যবানের ধ্যানের সামগ্রী হইয়াছিলেন, তাহা কাহারও অগোচর নাই। কিন্তু তাহাও ক্রমশ হইয়াছিল। অধুনাতন-কালে দেবী চণ্ডীর মধ্যে যে ভীষণ চঞ্চলভাবের আরোপ করা হইয়াছে, এক সময়ে তাহা প্রধানত শিবের ছিল। শিবের এই ভীষণত্ব কালক্রমে চণ্ডীর মধ্যে বিভক্ত হইয়া শিব একান্ত শান্ত-নিশ্চল যোগীর ভাব প্রাপ্ত হইলেন।

কিন্নরজাতিসেবিত হিমাদ্রি লঙ্ঘন করিয়া কোন্ শুভ্রকায় রজতগিরিনিভ প্রবলজাতি এই দেবতাকে বহন করিয়া আনিয়াছে? অথবা ইনি লিঙ্গপূজক দ্রাবিড়গণের দেবতা, অথবা ক্রমে উভয় দেবতায় মিশ্রিত হইয়া ও আর্য্য-উপাসকগণকর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়া এই দেবতার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষীয় আর্য্যদেবতত্ত্বের ইতিহাসে আলোচ্য। সে ইতিহাস এখনো লিখিত হয় নাই। আশা করি, তাহার অন্য ভাষা হইতে অনুবাদের অপেক্ষায় আমরা বসিয়া নাই।

কখনো সাংখ্যের ভাবে, কখনো বেদান্তের ভাবে, কখনো মিশ্রিত ভাবে, এই শিব-শক্তি কখনো বা জড়িত হইয়া, কখনো বা স্বতন্ত্র হইয়া, ভারতবর্ষে আবর্ত্তিত হইতেছিলেন। এই রূপান্তরের কালনির্ণয় দুরূহ। ইহার বীজ কখন্ ছড়ান হইয়াছিল এবং কোন্ বীজ কখন্ অঙ্কুরিত হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা সন্ধান করিতে হইবে। ইহা নিঃসন্দেহ যে, এই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ক্রিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বিপুল-ভারতসমাজ-গঠনে নানাজাতীয় স্তর যে মিশ্রিত হইয়াছে, তাহা নিয়তই আমাদের ধর্ম্মপ্রণালীর নানা বিসদৃশ ব্যাপারের বিরোধ ও সমন্বয়চেষ্টায় স্পষ্টই বুঝা যায়। ইহাও বুঝা যায়, অনার্য্যগণ মাঝে মাঝে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং আর্য্যগণ তাহাদের

অনেক আচার-ব্যবহার-পূজাপদ্ধতির দ্বারা অভিভূত হইয়াও আপন প্রতিভাবলে সে-সমস্তকে দার্শনিক ইন্দ্রজালদ্বারা আর্য্য আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত করিয়া লইতেছিলেন। সেইজন্য আমাদের প্রত্যেক দেবদেবীর কাহিনীতে এত বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা—একই পদার্থের মধ্যে এত বিরুদ্ধ ভাবের ও মতের সমাবেশ।

এককালে ভারতবর্ষে প্রবলতাপ্রাপ্ত অনার্য্যদের সহিত ব্রাহ্মণপ্রধান আর্য্যদের দেবদেবী-ক্রিয়াকর্ম্ম লইয়া এই যে বিরোধ বাধিয়াছিল—সেই বহুকালব্যাপী বিপ্লবের মৃদুতর আন্দোলন সেদিন পর্য্যন্ত বাংলাকেও আঘাত করিতেছিল, দীনেশবাবুর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পড়িলে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

কুমারসম্ভব প্রভৃতি কাব্য পড়িলে দেখিতে পাই, শিব যখন ভারতবর্ষের মহেশ্বর, তখন কালিকা অন্যান্য মাতৃকাগণের পশ্চাতে মহাদেবের অনুচরীবৃত্তি করিয়াছিলেন। ক্রমে কখন্ তিনি করালমূর্ত্তি ধারণ করিয়া শিবকেও অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার ক্রমপরম্পরা নির্দ্দেশ করার স্থান ইহা নহে, ক্ষমতাও আমার নাই। কুমারসম্ভব কাব্যে বিবাহকালে শিব যখন হিমাদ্রিভবনে চলিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পশ্চাতে মাতৃকাগণ এবং—

তাসাঞ্চ পশ্চাৎ কনকপ্রভাণাং
কালী কপালাভরণা চকাশে।

তাঁহাদেরও পশ্চাতে কপালভূষণা কালী প্রকাশ পাইতেছিলেন। এই কালীর সহিত মহাদেবের কোন ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ ব্যক্ত হয় নাই।

মেঘদূতে গোপবেণী বিষ্ণুর কথাও পাওয়া যায়, কিন্তু মেঘের ভ্রমণকালে কোন মন্দির উপলক্ষ্য করিয়া বা উপমাচ্ছলে কালিকাদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। স্পষ্টই দেখা যায়, তৎকালে ভদ্রসমাজের দেবতা ছিলেন মহেশ্বর। মালতীমাধবেরও করালাদেবীর পূজোপচারে যে নৃশংস বীভৎসতা দেখা যায়, তাহা কখনই আর্য্যসমাজের ভদ্রমণ্ডলীর অনুমোদিত ছিল বলিয়া মনে করিতে পারি না।

এক সময়ে এই দেবীপূজা যে ভদ্রসমাজের বহির্ভূত ছিল, তাহা কাদম্বরীতে দেখা যায়। মহাশ্বেতাকে শিবমন্দিরেই দেখি; কিন্তু কবি ঘৃণার সহিত অনার্য্য শবরের পূজাপদ্ধতির যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, পশুরুধিরের দ্বারা দেবতার্চ্চন ও মাংসদ্বারা বলিকর্ম্ম তখন ভদ্রমণ্ডলীর কাছে নিন্দিত ছিল। কিন্তু সেই ভদ্রমণ্ডলীও পরাস্ত হইয়াছিলেন। সেই সামাজিক মহোৎপাতের দিনে নীচের জিনিষ উপরে এবং উপরের জিনিষ নীচে বিক্ষিপ্ত হইতেছিল।

বঙ্গসাহিত্যের আরম্ভস্তরে সেই সকল উৎপাতের চিহ্ন লিখিত আছে। দীনেশবাবু অদ্ভুত পরিশ্রমে ও প্রতিভায় এই সাহিত্যের স্তরগুলি যথাক্রমে বিন্যাস করিয়া বঙ্গসমাজের নৈসর্গিক প্রক্রিয়ার ইতিহাস আমাদের দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন।

তিনি যে ধর্ম্মকলহব্যাপারের সম্মুখে আমাদিগকে দণ্ডায়মান করিয়াছেন, সেখানে বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের দেবতা শিবের বড় দুর্গতি। তাঁহার এতকালের প্রাধান্য "মেয়ে

দেবতা" কাড়িয়া লইবার জন্য রণভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন—শিবকে পরাস্ত হইতে হইল।

স্পষ্টই দেখা যায়, এই কলহ বিশিষ্ট দলের সহিত ইতরসাধারণের কলহ। উপেক্ষিত সাধারণ যেন তাহাদের প্রচণ্ডশক্তি মাতৃদেবতার আশ্রয় লইয়া ভদ্রসমাজের শান্ত-সমাহিত-নিশ্চেষ্ট বৈদান্তিক যোগীশ্বরকে উপেক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

এক সময়ে বেদ তাহার দেবতাগণকে লইয়া ভারতবর্ষের চিত্তক্ষেত্র হইতে দূরে গিয়াছিল বটে, কিন্তু বেদান্ত এই স্থাণুকে ধ্যানের আশ্রয়স্বরূপ অবলম্বন করিয়া জ্ঞানী, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীদের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কিন্তু এই জ্ঞানীর দেবতা অজ্ঞানীদিগকে আনন্দদান করিত না, জ্ঞানীরাও অজ্ঞানীদিগকে অবজ্ঞাভরে আপন অধিকার হইতে দূরে রাখিতেন। ধন এবং দারিদ্র্যের মধ্যেই হৌক্, উচ্চপদ ও হীনপদের মধ্যেই হৌক্ বা জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যেই হৌক্, যেখানে এত বড় একটা বিচ্ছেদ ঘটে, সেখানে ঝড় না আসিয়া থাকিতে পারে না। গুরুতর পার্থক্যমাত্রই ঝড়ের কারণ।

আর্য্য-অনার্য্য যখন মেশে নাই, তখনো ঝড় উঠিয়াছিল, আবার ভদ্র-অভদ্র-মণ্ডলীতে জ্ঞানী-অজ্ঞানীর ভেদ যখন অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল, তখনো ঝড় উঠিয়াছে।

শঙ্করাচার্য্যের ছাত্রগণ যখন বিদ্যাকেই প্রধান করিয়া তুলিয়া জগৎকে মিথ্যা ও কর্ম্মকে বন্ধন বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছিলেন - তখন সাধারণে মায়াকেই, শান্তস্বরূপের শক্তিকেই মহামায়া বলিয়া শক্তীশ্বরের ঊর্দ্ধে দাঁড় করাইবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। মায়াকে মায়াধিপতির চেয়ে বড় বলিয়া ঘোষণা করা, এই এক বিদ্রোহ।

ভারতবর্ষে এই বিদ্রোহের প্রথম সূত্রপাত কবে হইয়াছিল বলা যায় না, কিন্তু এই বিদ্রোহ দেখিতে দেখিতে সর্ব্বসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। কারণ, ব্রহ্মের সহিত জগৎকে ও আত্মাকে প্রেমের সম্বন্ধে, নিত্য সম্বন্ধে, সত্য সম্বন্ধে যোগ করিয়া না দেখিলে হৃদয়ের পরিতৃপ্তি হয় না। তাহার সহিত জগতের সম্বন্ধ স্বীকার না করিলেই জগৎ মিথ্যা—সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই জগৎ সত্য। যেখানে ব্রহ্মের শক্তি বিরাজমান, সেইখানেই ভক্তের অধিকার, যেখানে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সেখানে ভক্তির মাৎসর্য্য উপস্থিত হয়। ব্রহ্মের শক্তিকে ব্রহ্মের চেয়ে বড় বলা ভক্তির মাৎসর্য্য—কিন্তু তাহা ভক্তি ;—শক্তির পরিচয়কে একেবারেই অসত্য বলিয়া গণ্য করাতে ও তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিমুখ হইবার চেষ্টা করাতেই ক্ষুব্ধ ভক্তি যেন আপনার তীর লঙ্ঘন করিয়া উদ্বেলিত হইয়াছিল।

এইরূপ বিদ্রোহকালে শক্তিকে উৎকটরূপে প্রকাশ করিতে গেলে, প্রথমে তাহার প্রবলতা, তাহার ভীষণতাই জাগাইয়া তুলিতে হয়। তাহা ভয় হইতে রক্ষা করিবার সময় মাতা ও ভয় জন্মাইবার সময় চণ্ডী। তাহার ইচ্ছা কোন বিধিবিধানের দ্বারা নিয়মিত নহে—তাহা বাধাবিহীন লীলা, কখন্ কি করে, কেন কি রূপ ধরে, তাহা বুঝিবার জো নাই, এইজন্য তাহা ভয়ঙ্কর।

নিশ্চেষ্টতার বিরুদ্ধে এই প্রচণ্ডতার ঝড়। নারী যেমন স্বামীর নিকট হইতে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্যের স্বাদবিহীন মৃদুতা অপেক্ষা প্রবল শাসন ভালবাসে, বিদ্রোহী ভক্ত সেইরূপ নির্গুণ নিষ্ক্রিয়কে পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছাময়ী শক্তিকে ভীষণতার মধ্যে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুভব করিতে ইচ্ছা করিল।

শিব আর্য্যসমাজে ভিড়িয়া যে ভীষণতা, যে শক্তির চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিলেন, নিম্নসমাজে তাহা নষ্ট হইতে দিল না। যোগানন্দের শান্ত ভাবকে তাহারা উচ্চশ্রেণীর জন্য রাখিয়া ভক্তির প্রবল উত্তেজনার আশায় শক্তির উগ্রতাকেই নাচাইয়া তুলিল। তাহারা শক্তিকে শিব হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া বিশেষভাবে শক্তির পূজা খাড়া করিয়া তুলিল।

কিন্তু কি আধ্যাত্মিক, কি আধিভৌতিক, ঝড় কখনই চিরদিন থাকিতে পারে না। ভক্তহৃদয় এই চণ্ডীশক্তিকে মাধুর্য্যে পরিণত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম আশ্রয় করিল। প্রেম সকল শক্তির পরিণাম—তাহা চূড়ান্ত শক্তি বলিয়াই তাহার শক্তিরূপ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। ভক্তির পথ কখনই প্রচণ্ডতার মধ্যে গিয়া থামিতে পারে না—প্রেমের আনন্দেই তাহার অবসান হইতে হইবে। বস্তুত মাঝখানে শিবের ও শক্তির যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রেমের মধ্যে সেই শিব-শক্তির কতকটা সম্মিলনচেষ্টা দেখা যাইতেছে। মায়াকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র করিলে তাহা ভয়ঙ্করী, ব্রহ্মকে মায়া হইতে স্বতন্ত্র করিলে ব্রহ্ম অনধিগম্য—ব্রহ্মের সহিত মায়াকে সম্মিলিত করিয়া দেখিলেই প্রেমের পরিতৃপ্তি।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে এই পরিবর্ত্তন-পরম্পরার আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগ ও শিবপূজার কালে বঙ্গসাহিত্যের কি অবস্থা ছিল, তাহা দীনেশবাবু খুঁজিয়া পান নাই। "ধান ভান্‌তে শিবের গীত" প্রবাদে বুঝা যায়, শিবের গীত একসময়ে প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে সমস্তই সাহিত্য হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে বৌদ্ধধর্ম্মের যে সকল চিহ্ন ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকলও বৌদ্ধযুগের বহুপরবর্ত্তী। আমাদের চক্ষে বঙ্গসাহিত্যমঞ্চের প্রথম যবনিকাটি যখন উঠিয়া গেল, তখন দেখি, সমাজে একটি কলহ বাধিয়াছে—সে দেবতার কলহ। আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থখানির পঞ্চম অধ্যায়ে দীনেশবাবু প্রাচীন শিবের প্রতি চণ্ডী, বিষহরি ও শীতলার আক্রমণব্যাপার সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল স্থানীয় দেবদেবীরা জনসাধারণের কাছে বল পাইয়া কিরূপ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের ব্যবহারে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমেই চোখে পড়ে—দেবী চণ্ডী নিজের পূজাস্থাপনের জন্য অস্থির। যেমন করিয়া হউক্, ছলে-বলে-কৌশলে মর্ত্ত্যে পূজা প্রচার করিতে হইবেই। ইহাতেই বুঝা যায়, পূজা লইয়া একটা বাদবিবাদ আছে। তাহার পর দেখি, যাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া দেবী পূজাপ্রচার করিতে উদ্যত, তাহারা উচ্চশ্রেণীর লোক নহে। যে নীচের, তাহাকেই উপরে উঠাইবেন—ইহাতেই দেবীর শক্তির পরি-

চয়। নিম্নশ্রেণীর পক্ষে এমন সান্ত্বনা—এমন বলের কথা আর কি আছে! যে দরিদ্র, দুইবেলা আহার জোটাইতে পারে না, সে-ই শক্তির লীলায় সোণার ঘড়া পাইল; যে ব্যাধ নীচজাতীয় ভদ্রজনের অবজ্ঞাভাজন, সে-ই মহত্বলাভ করিয়া কলিঙ্গরাজের কন্যাকে বিবাহ করিল;—ইহাই শক্তির লীলা।

তাহার পরে দেখি, শিবের পূজাকে হতমান করিয়াই নিজের পূজা প্রচার করা দেবীর চেষ্টা। শিব তাঁহার স্বামী বটেন, কিন্তু তাহাতে কোন সঙ্কোচ নাই। শিবের সহিত শক্তির এই লড়াই। এই লড়াইয়ে পদে পদে দয়ামায়া বা ন্যায়-অন্যায় পর্য্যন্ত উপেক্ষিত হইয়াছে।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ব্যাধের গল্পে দেখিতে পাই, শক্তির ইচ্ছায় নীচ উচ্চে উঠিয়াছে। কেন উঠিয়াছে, তাহার কোন কারণ নাই—ব্যাধ যে ভক্ত ছিল, এমনো পরিচয় পাই না। বরঞ্চ সে দেবীর বাহন সিংহকে মারিয়া দেবীর ক্রোধভাজন হইতেও পারিত। কিন্তু দেবী নিতান্তই যথেচ্ছাক্রমে তাহাকে দয়া করিলেন। ইহাই শক্তির খেলা।

ব্যাধকে যেমন বিনা কারণে দেবী দয়া করিলেন, কলিঙ্গরাজকে তেমনি তিনি বিনা দোষে নিগ্রহ করিলেন। তাহার দেশ জলে ডুবাইয়া দিলেন। জগতে ঝড়, জলপ্লাবন, ভূমিকম্পে যে শক্তির প্রকাশ দেখি, তাহার মধ্যে ধর্ম্মনীতিসঙ্গত কার্য্যকারণমালা দেখা যায় না- এবং সংসারে সুখদুঃখ-বিপৎসম্পদের যে আবর্ত্তন দেখিতে পাই, তাহার মধ্যেও ধর্ম্মনীতির সুসঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। দেখিতেছি, যে শক্তি নির্ব্বিচারে পালন করিতেছে, সেই শক্তিই নির্ব্বিচারে ধ্বংস করিতেছে। এই অহৈতুক পালনে এবং অহৈতুক বিনাশে সাধু-অসাধুর ভেদ নাই। এই দয়ামায়াহীন ধর্ম্মাধর্ম্মবিবর্জ্জিত শক্তিকে বড় করিয়া দেখা তখনকার কালের পক্ষে বিশেষ স্বাভাবিক ছিল।

তখন নীচের লোকের আকস্মিক অভ্যুত্থান ও উপরের লোকের হঠাৎ পতন সর্ব্বদাই দেখা যাইত। হীনাবস্থার লোক কোথা হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া অরণ্য কাটিয়া নগর বানাইয়াছে এবং প্রতাপশালী রাজা হঠাৎ পরাস্ত হইয়া লাঞ্ছিত হইয়াছে। তখনকার নবাব-বাদ্‌শাহদের ক্ষমতাও বিধি-বিধানের অতীত ছিল—তাঁহাদের খেয়ালমাত্রে সমস্ত হইতে পারিত। ইঁহারা দয়া করিলেই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া নীচ মহৎ হইত, ভিক্ষুক রাজা হইত। ইঁহারা নির্দ্দয় হইলে ধর্ম্মের দোহাইও কাহাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে পারিত না। ইহাই শক্তি।

এই শক্তির প্রসন্ন মুখ মাতা, এই শক্তির অপ্রসন্ন মুখ চণ্ডী। ইহার "প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ"—সেইজন্য সর্ব্বদাই করজোড়ে বসিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু যতক্ষণ ইনি যাহাকে প্রশ্রয় দেন, ততক্ষণ তাহার সাত-খুন মাপ—যতক্ষণ সে প্রিয়পাত্র, ততক্ষণ তাহার সঙ্গত-অসঙ্গত সকল আবদারই অনায়াসে পূর্ণ হয়।

এইরূপ শক্তি ভয়ঙ্করী হইলেও মানুষের চিত্তকে আকর্ষণ করে। কারণ, ইহার কাছে প্রত্যাশার কোন সীমা নাই। আমি অন্যায় করিলেও জয়ী হইতে পারি, আমি

অক্ষম হইলেও আমার দুরাশার চরমতম স্বপ্ন সফল হইতে পারে। যেখানে নিয়মের বন্ধন, ধর্ম্মের বিধান আছে, সেখানে দেবতার কাছেও প্রত্যাশাকে খর্ব্ব করিয়া রাখিতে হয়।

এই সকল কারণে যে সময় বাদ্‌শাহ ও নবাবের অপ্রতিহত ইচ্ছা জনসাধারণকে ভয়ে-বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল, এবং ন্যায়-অন্যায়—সম্ভব-অসম্ভবের ভেদচিহ্নকে ক্ষীণ করিয়া আনিয়াছিল, হর্ষ-শোক—বিপৎ-সম্পদের অতীত শান্ত-সমাহিত বৈদান্তিক শিব সেসময়কার সাধারণের দেবতা হইতে পারেন না। রাগদ্বেষ—প্রসাদ-অপ্রসাদের লীলাচঞ্চলা যদৃচ্ছাচারিণী শক্তিই তখনকার কালের দেবত্বের চরমাদর্শ। সেইজন্যই তখনকার লোকে ঈশ্বরকে অপমান করিয়া বলিত—"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।"

কবিকঙ্কণে দেবী এই যে ব্যাধের দ্বারা নিজের পূজা মর্ত্ত্যে প্রচার করিলেন, স্বয়ং ইন্দ্রের পুত্র যে ব্যাধরূপে মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিল, বাংলাদেশের এই লোকপ্রচলিত কথার কি কোন ঐতিহাসিক অর্থ নাই? পশুবলি প্রভৃতির দ্বারা যে ভীষণ পূজা এক কালে ব্যাধের মধ্যে প্রচলিত ছিল, সেই পূজাই কি কালক্রমে উচ্চসমাজে প্রবেশলাভ করে নাই? কাদম্বরীতে বর্ণিত শবরনামক ক্রূরকর্ম্মা ব্যাধজাতির পূজা-পদ্ধতিতেও ইহারই কি প্রমাণ দিতেছে না? উড়িষ্যাই কলিঙ্গদেশ। বৌদ্ধধর্ম্মলোপের পর উড়িষ্যায় শৈবধর্ম্মের প্রবল অভ্যুদয় হইয়াছিল—ভুবনেশ্বর তাহার প্রমাণ। কলিঙ্গের রাজারাও প্রবল রাজা ছিলেন। এই কলিঙ্গরাজত্বের প্রতি শৈবধর্ম্মবিদ্বেষীদের আক্রোশপ্রকাশ—ইহার মধ্যেও দূর ইতিহাসের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়।

ধনপতির গল্পে দেখিতে পাই, উচ্চজাতীয় ভদ্রবৈশ্য শিবোপাসক। শুদ্ধমাত্র এই পাপে চণ্ডী তাঁহাকে নানা দুর্গতির দ্বারা পরাস্ত করিয়া আপন মাহাত্ম্য প্রমাণ করিলেন।

বস্তুত সাংসারিক সুখদুঃখ-বিপৎসম্পদের দ্বারা নিজের ইষ্টদেবতার বিচার করিতে গেলে, সেই অনিশ্চয়তার কালে শিবের পূজা টিঁকিতে পারে না। অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার তরঙ্গ যখন চারিদিকে জাগিয়া উঠিয়াছে, তখন যে দেবতা ইচ্ছাসংযমের আদর্শ, তাঁহাকে সাংসারিক উন্নতির উপায় বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দুর্গতি হইলেই মনে হয়, আমার নিশ্চেষ্ট দেবতা আমার জন্য কিছুই করিতেছেন না, ভোলানাথ সমস্ত ভুলিয়া বসিয়া আছেন। চণ্ডীর উপাসকেরাই কি সকল দুর্গতি এড়াইয়া উন্নতিলাভ করিতেছিলেন? অবশ্যই নহে। কিন্তু শক্তিকে দেবতা করিলে সকল অবস্থাতেই আপনাকে ভুলাইবার উপায় থাকে। শক্তিপূজক দুর্গতির মধ্যেও শক্তি অনুভব করিয়া ভীত হয়, উন্নতিতেও শক্তি অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে। আমারই প্রতি বিশেষ অকৃপা, ইহার ভয় যেমন আত্যন্তিক, আমারই প্রতি বিশেষ দয়া, ইহার আনন্দও তেমনি অতিশয়! কিন্তু যে দেবতা বলেন, সুখ-দুঃখ, দুর্গতি-সদ্গতি, ও কিছুই নয়, ও কেবল মায়া, ও দিকে দৃক্‌পাত করিয়ো না, সংসারে তাঁহার উপাসক অল্পই অবশিষ্ট

থাকে ;—সংসার, মুখে যাহাই বলুক্, মুক্তি চায় না, ধন-জন-মান চায়। ধনপতির মত ব্যবসায়ী লোক সংযমী সদাশিবকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিল না, বহুতর নৌকা ডুবিল, ধনপতিকে শেষকালে শিবের উপাসনা ছাড়িয়া শক্তি-উপাসক হইতে হইল।

কিন্তু তখনকার নানাবিভীষিকাগ্রস্ত পরিবর্ত্তনব্যাকুল দুর্গতির দিনে শক্তিপূজারূপে এই যে প্রবলতার পূজা প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা আমাদের মনুষ্যত্বকে চিরদিন পরিতৃপ্ত রাখিতে পারে না। যে ফলের মিষ্ট হইবার ক্ষমতা আছে, সে প্রথম অবস্থার তীব্র অম্লত্ব পক্ক অবস্থায় পরিহার করে। যথার্থ ভক্তি সুতীব্র কঠিন ক্ষমতাকে গোড়ায় যদি-বা প্রাধান্য দেয়, শেষকালে তাহাকে উত্তরোত্তর মধুর, কোমল ও বিচিত্র করিয়া আনে। বাংলাদেশে অত্যুগ্র চণ্ডী ক্রমশ মাতা অন্নপূর্ণার রূপে, ভিখারীর গৃহলক্ষ্মীরূপে, বিচ্ছেদবিধুর পিতামাতার কন্যারূপে—মাতা, পত্নী ও কন্যা, রমণীর এই ত্রিবিধ মঙ্গল-সুন্দর রূপে দরিদ্র বাঙালীর ঘরে যে রসসঞ্চার করিয়াছেন, চণ্ডীপূজার সেই পরিণাম-রমণীয়তার দৃশ্য দীনেশবাবু তাঁহার এই গ্রন্থে বঙ্গসাহিত্য হইতে যথেষ্টপরিমাণে উদ্ধার করিয়া দেখান নাই। কালিদাসের কুমারসম্ভব সাহিত্যে দাম্পত্য-প্রেমকে মহীয়ান্ করিয়া এই মঙ্গলভাবটিকে মূর্ত্তিমান্ করিয়াছিল। বাংলা সাহিত্যে এই ভাবের সম্পূর্ণ পরিস্ফুটতা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তথাপি বাঙালীর দরিদ্রগৃহের মধ্যে এই মঙ্গলমাধুর্য্যসিক্ত দেবভাবের অবতারণা কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে কিয়ৎপরিমাণে আপনাকে অঙ্কিত করিয়াছে, অন্নদামঙ্গলও তাহার উপর রঙ্ ফলাইয়াছে। কিন্তু মাধুর্য্যের ভাব গীতিকবিতার সম্পত্তি। চণ্ডীপূজা ক্রমে যখন ভক্তিতে স্নিগ্ধ ও রসে মধুর হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন তাহা মঙ্গলকাব্য ত্যাগ করিয়া খণ্ড খণ্ড গীতে উৎসারিত হইল। এই সকল বিজয়া-আগমনীর গীত ও গ্রাম্য খণ্ডকবিতাগুলি বাংলাদেশে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। বৈষ্ণবপদাবলীর ন্যায় এগুলি সংগৃহীত হয় নাই। ক্রমে ইহারা নষ্ট ও বিকৃত হইবে, এমন সম্ভাবনা আছে। এক সময়ে ভারতীতে গ্রাম্যকবিতানামক প্রবন্ধে আমি এই কাব্যগুলির আলোচনা করিয়াছিলাম।

চণ্ডী যেমন প্রচণ্ড উপদ্রবে আপনার পূজা প্রতিষ্ঠা করেন, মনসা-শীতলাও তেমনি তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। শৈব চাঁদ-সদাগরের দুরবস্থা সকলেই জানেন। বিষহরি, দক্ষিণরায়, সত্যপীর প্রভৃতি আরো অনেক ছোটখাট দেবতা আপন আপন বিক্রম প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। এমনি করিয়া সমাজের নিম্নস্তরগুলি প্রবল ভূমিকম্পে সমাজের উপরের স্তরে উঠিবার জন্য কিরূপ চেষ্টা করিতেছিল, দীনেশবাবুর গ্রন্থে পাঠকেরা তাহার বিবরণ পাইবেন—এই প্রবন্ধে তাহার আলোচনা সম্ভব নহে।

কিন্তু দীনেশবাবুর সাহায্যে বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, সাহিত্যে বৈষ্ণবই জয়লাভ করিয়াছেন। শঙ্করের অভ্যুত্থানের পর শৈবধর্ম্ম ক্রমশই অদ্বৈতবাদকে আশ্রয় করিতেছিল। বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়, জনসাধারণের ভক্তিব্যাকুল হৃদয়সমুদ্র হইতে, শাক্ত ও বৈষ্ণব, এই দুই দ্বৈতবাদের

ঢেউ উঠিয়া সেই শৈবধর্ম্মকে ভাঙিয়াছে। এই উভয় ধর্ম্মেই ঈশ্বরকে বিভক্ত করিয়া দেখিয়াছে। শাক্তের বিভাগ গুরুতর। যে শক্তি ভীষণ, যাহা খেয়ালের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা আমাদিগকে দূরে রাখিয়া স্তব্ধ করিয়া দেয়;—সে আমার সমস্তই দাবী করে, তাহার উপর আমার কোন দাবী নাই। শক্তিপূজায় নীচকে উচ্চে তুলিতে পারে, কিন্তু উচ্চ-নীচের ব্যবধান সমানই রাখিয়া দেয়—সক্ষম-অক্ষমের প্রভেদকে সুদৃঢ় করে। বৈষ্ণবধর্ম্মের শক্তি হ্লাদিনী শক্তি—সে শক্তি বলরূপিণী নহে, প্রেমরূপিণী। তাহাতে ভগবানের সহিত জগতের যে দ্বৈতবিভাগ স্বীকার করে, তাহা প্রেমের বিভাগ, আনন্দের বিভাগ। তিনি বল ও ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিবার জন্য শক্তিপ্রয়োগ করেন নাই, তাঁহার শক্তি সৃষ্টির মধ্যে নিজেতে নিজে আনন্দিত হইতেছে—এই বিভাগের মধ্যে তাঁহার আনন্দ নিয়ত মিলনরূপে প্রতিষ্ঠিত। শাক্তধর্ম্মে অনুগ্রহের অনিশ্চিত সম্বন্ধ, বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রেমের নিশ্চিত সম্বন্ধ। শক্তির লীলায় কে দয়া পায়, কে না পায়, তাহার ঠিকানা নাই; কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রেমের সম্বন্ধ যেখানে, সেখানে সকলেরই নিত্য দাবী। শাক্তধর্ম্মে ভেদকেই প্রাধান্য দিয়াছে—বৈষ্ণবধর্ম্মে এই ভেদকে নিত্যমিলনের নিত্য উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

বৈষ্ণব এইরূপে ভেদের উপরে সাম্যস্থাপন করিয়া প্রেমপ্লাবনে সমাজের সকল অংশকে সমান করিয়া দিয়াছিলেন। এই প্রেমের শক্তিতে বলীয়সী হইয়া আনন্দ ও ভাবের এক অপূর্ব্ব স্বাধীনতা প্রবল-বেগে বাংলা সাহিত্যকে এমন এক জায়গায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, যাহা, পূর্ব্বাপরের তুলনা করিয়া দেখিলে, হঠাৎ খাপ্‌ছাড়া বলিয়া বোধ হয়। তাহার ভাষা, ছন্দ, ভাব, তুলনা, উপমা ও আবেগের প্রবলতা, সমস্ত বিচিত্র ও নূতন। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের সমস্ত দীনতা কেমন করিয়া এক মুহূর্ত্তে দূর হইল, অলঙ্কারশাস্ত্রের পাষাণবন্ধনসকল কেমন করিয়া এক মুহূর্ত্তে বিদীর্ণ হইল, ভাষা এত শক্তি পাইল কোথায়, ছন্দ এত সঙ্গীত কোথা হইতে আহরণ করিল? বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে নহে, প্রবীণ সমালোচকের অনুশাসনে নহে—দেশ আপনার বীণায় আপনি সুর বাঁধিয়া আপনার গান ধরিল। প্রকাশ করিবার আনন্দ এত, আবেগ এত যে, তখনকার উন্নত মার্জ্জিত কালোয়াতি সঙ্গীত থই পাইল না, দেখিতে দেখিতে দশে মিলিয়া এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতপ্রণালী তৈরি করিল; আর কোন সঙ্গীতের সহিত তাহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য পাওয়া শক্ত। মুক্তি কেবল জ্ঞানীর নহে, ভগবান্ কেবল শাক্তের নহেন, এই মন্ত্র যেমনি উচ্চারিত হইল, অমনি দেশের যত পাখী সুপ্ত হইয়া ছিল, সকলেই এক নিমেষে জাগরিত হইয়া গান ধরিল।

ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে, বাংলাদেশ আপনাকে যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছিল বৈষ্ণবযুগে। সেই সময়ে এমন একটি গৌরব সে প্রাপ্ত হইয়াছিল, যাহা অলোকসামান্য, যাহা বিশেষরূপে বাংলাদেশের—যাহা এ দেশ হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া অন্যত্র বিস্তারিত হইয়াছিল। শাক্তযুগে তাহার দীনতা

ঘোচে নাই—বরঞ্চ নানারূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল; বৈষ্ণবযুগে অযাচিত-ঐশ্বর্য্য-লাভে সে আশ্চর্য্যরূপে চরিতার্থ হইয়াছে।

শাক্ত যে পূজা অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা তখনকার কালের অনুগামী। অর্থাৎ সমাজে তখন যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, যে শক্তির খেলা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হইতেছিল, যে সকল আকস্মিক উত্থানপতন লোককে প্রবলবেগে চকিত করিয়া দিতেছিল—মনে মনে তাহাকেই বিশ্বব্যাপ্ত করিয়া, তাহাকেই দেবত্ব দিয়া, শাক্তধর্ম্ম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। বৈষ্ণবধর্ম্ম এক ভাবের উচ্ছ্বাসে সাময়িক অবস্থাকে লঙ্ঘন করিয়া তাহাকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। সাময়িক অবস্থার বন্ধন হইতে এক বৃহৎ আনন্দের মধ্যে সকলকে নিষ্কৃতিদান করিয়াছিল। শক্তি যখন সকলকে পেষণ করিতেছিল, উচ্চ যখন নীচকে দলন করিতেছিল, তখনই সে প্রেমের কথা বলিয়াছিল। তখনই সে ভগবানকে তাঁহার রাজসিংহাসন হইতে আপনাদের খেলাঘরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিল—এমন কি, প্রেমের স্পর্দ্ধায় সে ভগবানের ঐশ্বর্য্যকে উপহাস করিয়াছিল। ইহাতে করিয়া, যে ব্যক্তি তৃণাদপি নীচ, সে-ও গৌরব লাভ করিল; যে ভিক্ষার ঝুলি লইয়াছে, সে-ও সম্মান পাইল; যে ম্লেচ্ছাচারী, সে-ও পবিত্র হইল। তখন সাধারণের হৃদয় রাজার পীড়ন ও সমাজের শাসনের উপরে উঠিয়া গেল। বাহ্য অবস্থা সমানই রহিল, কিন্তু মন সেই অবস্থার দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া নিখিল জগৎসভার মধ্যে স্থানলাভ করিল। প্রেমের অধিকারে, সৌন্দর্য্যের অধিকারে, ভগবানের অধিকারে কাহারও কোন বাধা রহিল না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই যে ভাবোচ্ছ্বাস, ইহা স্থায়ী হইল না কেন? সমাজে ইহা বিকৃত ও সাহিত্য হইতে ইহা অন্তর্হিত হইল কেন? ইহার কারণ এই যে, ভাবসৃজনের শক্তি প্রতিভার, কিন্তু ভাব রক্ষা করিবার শক্তি চরিত্রের। বাংলাদেশে ক্ষণে ক্ষণে ভাববিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার পরিণাম দেখিতে পাই না। ভাব আমাদের কাছে সম্ভোগের সামগ্রী, তাহা কোন কাজের সৃষ্টি করে না, এইজন্য বিকারেই তাহার অবসান হয়।

পশ্চিমে রামচরিত্র লোকের হৃদয় অধিকার করিয়া লইয়াছে। সেই চরিত্রে ভাবের উচ্ছ্বাসমাত্র নহে, তাহাতে কর্ত্তব্যের আদর্শ আছে। সেই চরিতকাব্যে পিতৃসত্যপালনের জন্য রামের নির্ব্বাসনগ্রহণ, ভ্রাতার জন্য লক্ষণের আত্মত্যাগ, স্বামীর জন্য সীতার বনবাসস্বীকার, প্রভুর প্রতি হনুমানের অচলা ভক্তি, ধর্ম্মের জন্য ভরতের স্বার্থত্যাগ, এ সমস্তই বীর্য্যের আদর্শ, কর্ত্তব্যের আদর্শ। এই আদর্শের সৌন্দর্য্য যাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহারা নিষ্ঠালাভ করিয়াছে, কর্ত্তব্যসাধনে বললাভ করিয়াছে, ধর্ম্মের জন্য তাহারা প্রাণ দিতে পারে। আমরা ভাব উপভোগ করিয়া অশ্রুজলে নিজেকে প্লাবিত করিয়াছি, কিন্তু পৌরুষলাভ করি নাই, দৃঢ়নিষ্ঠা পাই নাই। আমরা শক্তিপূজায় নিজেকে শিশু কল্পনা করিয়া মা মা করিয়া আবদার করিয়াছি এবং বৈষ্ণব-সাধনায় নিজেকে নায়িকা কল্পনা করিয়া মান-

অভিমানে, বিরহ-মিলনে ব্যাকুল হইয়াছি। শক্তির প্রতি ভক্তি আমাদের মনকে বীর্য্যের পথে লইয়া যায় নাই, প্রেমের পূজা আমাদের মনকে কর্ম্মের পথে প্রেরণ করে নাই। আমরা ভাববিলাসী বলিয়াই আমাদের দেশে ভাবের বিকার ঘটিতে থাকে, এবং এইজন্যই চরিতকাব্য আমাদের দেশে পূর্ণ সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। একদিকে দুর্গায় ও আর একদিকে রাধায় আমাদের সাহিত্যে নারীভাবই অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বেহুলা ও অন্যান্য নায়িকার চরিত্র-সমালোচনায় দীনেশবাবু তাহার আভাস দিয়াছেন। পৌরুষের অভাব ও ভাবরসের প্রাচুর্য্য বঙ্গসাহিত্যের প্রধান লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বঙ্গসাহিত্যে দুর্গা ও রাধাকে অবলম্বন করিয়া দুই ধারা দুই পথে গিয়াছে—প্রথমটি গেছে বাংলার গৃহের মধ্যে, দ্বিতীয়টি গেছে বাংলার গৃহের বাহিরে। কিন্তু এই দুইটি ধারারই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রমণী এবং এই দুইটিরই স্রোত ভাবের স্রোত।

যাহা হউক, বঙ্গসাহিত্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাবের সম্বন্ধে যে আলোচনা করা গেল, তাহা হইতে সাহিত্যসম্বন্ধে আমরা একটি সাধারণ তত্ত্ব লাভ করিতে পারি। সমাজের চিত্ত যখন নিজের বর্ত্তমান অবস্থাবন্ধনে বদ্ধ থাকে এবং সমাজের চিত্ত যখন ভাবপ্রাবল্যে নিজের অবস্থার ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়, এই দুই অবস্থার সাহিত্যের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক।

সমাজ যখন নিজের চতুর্দ্দিক্‌বর্ত্তী বেষ্টনের মধ্যে, নিজের বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যেই সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ থাকে, তখনো সে বসিয়া বসিয়া আপনার সেই অবস্থাকে কল্পনার দ্বারা দেবত্ব দিয়া মণ্ডিত করিতে চেষ্টা করে। সে যেন কারাগারের ভিত্তিতে ছবি আঁকিয়া কারাগারকে প্রাসাদের মত সাজাইতে চেষ্টা পায়। সেই চেষ্টার মধ্যে মানবচিত্তের যে বেদনা—যে ব্যাকুলতা আছে, তাহা বড় করুণ। সাহিত্যে সেই চেষ্টার বেদনা ও করুণা আমরা শাক্তযুগের মঙ্গলকাব্যে দেখিয়াছি। তখন সমাজের মধ্যে যে উপদ্রব-উৎপীড়ন, আকস্মিক উৎপাত, যে অন্যায়, যে অনিশ্চয়তা ছিল, মঙ্গলকাব্য তাহাকেই দেবমর্য্যাদা দিয়া সমস্ত দুঃখ-অবমাননাকে ভীষণ দেবতার অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার সহিত সংযুক্ত করিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভ করিতেছিল এবং দুঃখক্লেশকে ভাঙাইয়া ভক্তির স্বর্ণমুদ্রা গড়িতেছিল। এই চেষ্টা কারাগারের মধ্যে কিছু আনন্দ—কিছু সান্ত্বনা আনে বটে, কিন্তু কারাগারকে প্রাসাদ করিয়া তুলিতে পারে না। এই চেষ্টা সাহিত্যকে তাহার বিশেষ দেশকালের বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না।

কিন্তু সমাজ যখন পরিব্যাপ্ত ভাবাবেগে নিজের অবস্থাবন্ধনকে লঙ্ঘন করিয়া আনন্দে ও আশায় উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে, তখনই সে হাতের কাছে যে তুচ্ছভাবা পায়, তাহাকেই অপরূপ করিয়া তোলে, যে সামান্য উপকরণ পায়, তাহার দ্বারাই ইন্দ্রজাল ঘটাইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় যে কি হইতে পারে ও না পারে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা হইতে কেহ অনুমান করিতে পারে না।

একটি নূতন আশার যুগ চাই। সেই আশার যুগে মানুষ নিজের সীমা দেখিতে পায় না—সমস্তই সম্ভব বলিয়া বোধ করে। সমস্তই

সম্ভব বলিয়া বোধ করিবামাত্র যে বল পাওয়া যায়, তাহাতেই অনেক অসাধ্য সাধ্য হয় এবং যাহার যতটা শক্তি আছে, তাহা পূর্ণমাত্রায় কাজ করে।

বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যও হঠাৎ একদিন অভাবনীয় উন্নতির উচ্চশিখরে উঠিবে, এরূপ আশা করি। কখন্ উঠিবে? যখন একমাত্র ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহার প্লাবনের দ্বারা নানাকে এক করিয়া দিবে, সকলের হৃদয়কে সকলের সম্মুখে আনিয়া দিবে, কাহারো কাহাকেও বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। যখন বিভাগের মধ্যে এককে পাইব, বিচ্ছেদের মধ্যে মিলন পাইব। যখন অনুগ্রহের দ্বারা পীড়িত হইব না, যেখানে আমাদের গৌরব আছে, সেই জায়গাটা সন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিব। যখন আমরা বর্ত্তমানের বন্ধন ছেদন করিয়া তাহার বাহিরে একটা অনন্ত আশার ক্ষেত্র বিস্তৃত দেখিব। এখন ইংরাজের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রতন্ত্র, আমাদিগকে চারিদিকে নীরন্ধ্রভাবে বেষ্টন করিয়া আছে, আমরা তাহার বাহিরে কিছুই দেখিতে পাই না। পরের জিনিষ আমাদিগকে একেবারে গ্রাস করিয়াছে। যখন কোন প্রতিভাসম্পন্ন মনীষী আসিয়া এই বেষ্টনকে ভেদ করিয়া আমাদিগকে মুক্তি দিবেন; যখন হঠাৎ আমরা অনুভব করিব, অনুকরণই আমাদের একমাত্র গৌরব নয়; আবিষ্কার করিব, আমাদের নিজের মধ্যে এমন এক বিশেষ শক্তি আছে, যাহা অন্য কোন জাতির নাই; যখন চেতনা হইবে, ইংরাজিগ্রন্থের অর্থপুস্তক না মুখস্থ করিয়াও আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে; যখন আমাদের নিজের গৌরবের আনন্দে আমাদিগকে এক করিয়া দিবে, পরস্পরের সহিত সম্বন্ধস্বীকারে আমাদের কোন লজ্জা থাকিবে না; তখন সেই আনন্দের দিনে, আশার দিনে, গৌরবের দিনে, মিলনের দিনে, যে সৌভাগ্যবান্ কবি বাংলাদেশে গান ধরিবেন, তাঁহার গান জগতের মধ্যে সার্থক হইবে। বঙ্গদেশ যখন নিজের অমরত্ব নিজের মধ্যে সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিবে, নিজের সম্বন্ধে যখন তাহার কোন সংশয়—কোন সঙ্কোচ থাকিবে না, তখন নির্ভীক বঙ্গসাহিত্য সমস্ত সমালোচকের সমস্ত বাঁধি-বোল, সমস্ত ইস্কুলের সমস্ত মুখস্থ গৎ অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করিয়া নিজের অন্তরের মহান্ আদর্শ অবলম্বন করিয়া অপূর্ব্ব কারুকৌশলে আপন নবীন দেবমন্দিরকে অভেদী করিয়া তুলিবে, এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহাকে প্রাচীনের চিরন্তন মহিমা সমর্পণ করিবে। আমরা নিজের অবস্থাগণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ হইয়া, যাহা পারিয়াছি, তাহাই করিয়াছি, যাহা শিখিয়াছি, তাহাই বকিয়াছি, যাহা সম্মুখে পাইয়াছি, তাহাই বিহিতনিয়মে সাজাইয়া গেছি। আমাদের রচনা বাংলার বর্ত্তমান ভিত্তির মধ্যে এখনো কোন নূতন গবাক্ষ কাটিয়া কোন নূতন আলোক আনে নাই, কোন নূতন আশায় দেশকে প্লাবিত করে নাই, সাহিত্যকে এমন একটি প্রাণশক্তি দেয় নাই, যে শক্তিবলে আমাদের সাহিত্য দেশের ও বিদেশের পক্ষে চিরকালের জন্য প্রাণের, সৌন্দর্য্যের ও কল্যাণের অক্ষয় ভাণ্ডার হইয়া থাকে।

কিন্তু অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতেছি, সেদিন দূরে নাই। সমস্ত অনুকরণ-অনুসরণকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া নিজেকে নিজে লাভ করিবার জন্য আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তীব্র বেদনা উপস্থিত হইয়াছে। মরুভূমির মধ্যে ক্ষুধাতুর তৃষার্ত্তের স্কন্ধে টাকার থলি যেমন কেবল ভারমাত্র, তেমনি বিদেশের যে সমস্ত বহুমূল্য বোঝা আমরা মাথায় চাপাইয়াছি, বুঝিতে পারিতেছি, তাহার মূল্য যতই হোক্, তাহা আমাদের বল অপহরণ করিতেছে—এখন মন কেবলি বলিতেছে চাহি না, চাহি না, এ সমস্ত কিছুই চাহি না। তবে কি চাই? হৃদয়ের মধ্য হইতে এই প্রার্থনা উর্দ্ধস্বরে কাঁদিয়া উঠিতেছে, আপনাকে চাই! চাই আপনার শক্তিকে! প্রচুর হইলেও উপকরণমাত্রে কোন লাভ নাই—তাহা আবর্জ্জনা! সভাসমিতি, দরখাস্ত ও কন্‌গ্রেসে যে আমাদিগকে হীনতা হইতে মুক্তি দিতে পারে, এ মোহ আমাদের মন হইতে চলিয়া যাইতেছে, গবর্মেণ্ট্ অনুগ্রহপূর্ব্বক উচ্চ আসনে চড়াইয়া আমাদিগকে বড় করিতে পারে, এই মিথ্যা আশাও শিথিল হইয়া আসিয়াছে। এখনি যথার্থ সময়! এখনি মনে হইতেছে, কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব আসন্ন হইয়াছে, যিনি ভারতবর্ষের সম্মুখে ভারতবর্ষের পথ উদ্ঘাটিত করিয়া দিবেন—যিনি আমাদের অন্তরের মধ্যে এই কথা ধ্বনিত করিয়া তুলিবেন যে, আমরা ভারতবাসী, আমরা ফিরিঙ্গি নই, আমরা বর্ব্বর নই, আমাদের লজ্জার কোন কারণ নাই। যিনি আমাদের মনকে, আমাদের হৃদয়কে, আমাদের কল্পনাকে স্বাধীন করিয়া দিবেন—যিনি আমাদের শিক্ষার বন্ধনমোচন করিবেন, আমাদের বিদেশী সংস্কারের সমস্ত কুহেলিকা অপসারিত করিয়া দিবেন। তখন আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা যেমনি থাক্, আমাদের চিত্ত তাহার বহু উর্দ্ধে উঠিয়া সমস্ত বিশ্বজগৎকে প্রত্যক্ষ আপনার সম্মুখে প্রসারিত দেখিবে। এমন মুক্তি আছে, যাহাকে রাজার শাসন, প্রবলের পীড়ন, অবস্থার পেষণ স্পর্শ করিতে পারে না। সেই মুক্তিই ভারতবর্ষের লক্ষ্যস্থল ছিল এবং সকল ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থচেষ্টার আক্রমণ হইতে সেই রত্নকে রক্ষা করিবার ভার লইয়াই ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষে গৌরব লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই রত্ন হারাইয়াই ব্রাহ্মণ ও ভারতবর্ষ রসাতলে গেছে। সেই মুক্তির আশা ও আনন্দ যখন অরুণালোকের ন্যায় আমাদের মাতৃভূমির উদয়াচল স্পর্শ করিবে, তখন যে অপরূপ সঙ্গীত চতুর্দ্দিক্ হইতে ধ্বনিত—উদ্গীত হইয়া উঠিবে, তাহা আমার অন্তরে বাজিতেছে, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবার সাধ্য আমার নাই। সেইদিনকার বঙ্গসাহিত্যের জন্য আমরা অপেক্ষা করিয়া আছি, ততদিন যাহা করিতেছি, তাহা ক্রীড়াচ্ছলে সময়যাপন মাত্র।

স্কুলের স্মৃতি।

আমাদের বাড়ীর নিকট পাঁচটি স্কুল ছিল। একটি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য-প্রাপ্ত এণ্ট্রেন্স স্কুল। এটি ফরাসী চন্দননগরের ভদ্রলোকের যত্নে সংস্থাপিত হইলেও বৃটিশ চন্দননগরে অবস্থিত ছিল এবং গড়-বাটী-নামক স্থানে ছিল বলিয়া সকলে ইহাকে গড়ের স্কুল বলিত। দ্বিতীয় স্কুলটি ফরাসী চন্দননগরের মধ্যে সংস্থাপিত ছিল এবং রোমান্ ক্যাথলিক্ পাদ্রিরা ইহা প্রতিষ্ঠা করেন, এইজন্য সকলে ইহাকে ফরাসী স্কুল বা পাদ্রীর স্কুল বলিত। তৃতীয় হুগলী কলেজ—পরিচয় অনাবশ্যক। চতুর্থ চুঁচুড়া ফ্রীচর্চ্চ বা ডফের স্কুল, এটি কলিকাতা ফ্রীচর্চ্চের শাখা। পঞ্চম হুগলী নর্ম্মাল স্কুল। হুগলী কলেজ ও নর্ম্মাল স্কুল ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের খাস। গড়ের স্কুল, পাদ্রী স্কুল ও ফ্রীচর্চ্চে এণ্ট্রেন্স ক্লাস পর্য্যন্ত পড়াইবার বন্দোবস্ত ছিল। হুগলি কলেজে এম্, এ, ও নর্ম্মাল স্কুলে ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষা পর্য্যন্ত পড়ান হইত। কলেজের অধীনে কলিজিয়েট স্কুল এবং নর্ম্মাল স্কুলের অধীনে মডেল স্কুল ছিল। মডেল স্কুলে মধ্য ইংরাজী বা মধ্য বাংলা পর্য্যন্ত পড়া চলিত।

গড়ের স্কুলটি মধ্যে একেবারে লোপ পাইয়াছিল, এখন আবার স্থানীয় লোকের যত্নে মাথা তুলিয়াছে। ফরাসী স্কুলটি এখন আর পাদ্রীদের হাতে নাই, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট এখন উহা নিজের হস্তে লইয়াছেন। স্কুলটির এখন নাম হইয়াছে—"ডুপ্লে কলেজ"। স্কুলটি ফরাসী অধিকারে স্থাপিত ও ফরাসী গবর্ণমেণ্টের দ্বারা পরিচালিত হইলেও, উহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। উহাতে এফ্, এ, পর্য্যন্ত পড়ান হইয়া থাকে। পূর্ব্বে স্কুলটির নাম ছিল—"সেণ্ট মেরীজ্ ইন্‌ষ্টিটিউশন্"। এখনও চন্দননগরের বাহিরে উহা এই নামেই পরিচিত। ডুপ্লে কলেজে ফরাসী পড়িবার জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। এই বিভাগে সকল বিষয়ই ফরাসীতে পড়ান হইয়া থাকে, কেবল ইংরাজী ও বাংলা দ্বিতীয় ভাষা (second language) বলিয়া পড়ান হয়। ফরাসী বিভাগের ছাত্রেরা প্রথমে একটা পরীক্ষা দেয়, তাহার নাম সার্তিফিকাদেত্যুদ্"। ইহার পরে যে পরীক্ষা হয়, তাহার নাম "ব্রেভে"। ব্রেভে-পরীক্ষা আবার দুই প্রকারের আছে—নিম্ন ও উচ্চ। ব্রেভে-পরীক্ষা চন্দননগরে হয় না, পরীক্ষার্থীদিগকে পণ্ডীচারীতে গিয়া পরীক্ষা দিতে হয়। নিম্ন ব্রেভে অনেক বাঙালী পাস্ হইয়াছেন, কিন্তু উচ্চ ব্রেভে এ পর্য্যন্ত কোনও বাঙালী দেন নাই। উচ্চ ব্রেভে নাকি ইংরাজী বি, এ, পরীক্ষার অপেক্ষা কঠিন। অধিকন্তু ইহাতে সঙ্গীত, যুদ্ধবিদ্যা ইত্যাদিও শিক্ষা করিতে হয়। ডুপ্লে কলেজের প্রিন্সিপাল একজন ফরাসী সাহেব, সহকারী প্রিন্সিপাল এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্, এ, উপাধিধারী একজন বাঙালী যুবক।

সমস্ত ইংরাজী বিভাগের ইনি সর্ব্বময় কর্ত্তা। ইংরাজী বিভাগের নিম্নশ্রেণীতেও ফরাসী ভাষা পড়ান হয়, কিন্তু চতুর্থ শ্রেণী হইতে উহা ছাত্রদের ইচ্ছাধীন।

ফরাসী-শিক্ষা আমাদের তত আবশ্যক ছিল না বলিয়াই হউক, অথবা তখন পাদ্রীদের আমলে ভাল ইংরাজী পড়ান হইত না বলিয়াই হউক, আমাদের বাটীর নিকট হইলেও আমরা ফরাসী স্কুলে না পড়িয়া গড়ের স্কুলে পড়িতে যাইতাম। তখন গড়ের স্কুলের পড়্‌তা ভাল ছিল। আমাদের পাড়ার অধিকাংশ ছেলেই গড়ের স্কুলে পড়িত। আমি ফরাসী স্কুলে অতি অল্পদিনমাত্রই পড়িয়াছিলাম। ফরাসী স্কুলের কতকগুলি বন্দোবস্ত বড় ভাল ছিল এবং এখনও আছে। কোন কারণে কোন বালক দণ্ডার্হ হইলে শারীরিক বা আর্থিক দণ্ড ভোগ করিতে হইত না। একমাত্র দণ্ড ছিল—হস্তাক্ষর লেখা। 'মারধোর' ফরাসী স্কুলে একেবারেই ছিল না। কোন বালককে দণ্ড দিতে হইলে শিক্ষক বলিতেন,"তোমার দুইশত ছত্র দণ্ড হইল।" অর্থাৎ সেই বালককে তাহার নিত্যকর্ত্তব্য পাঠ ছাড়া আরও ২০০ ছত্র লিখিতে হইত। এই ছত্রেরও একটা নিয়ম ছিল। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষেরা ফ্রান্স হইতে একপ্রকার অক্ষর লিখিবার আদর্শপুস্তক (copy book) আনাইতেন। তাহাতে অক্ষর লিখিবার বড় সুন্দর উপায় প্রদর্শিত ছিল। এক হইতে দশ নম্বর পর্য্যন্ত কপি-বই কিনিতে পাওয়া যাইত। প্রতি পৃষ্ঠার উপরে এক ছত্র, আর নিম্নে অতি সূক্ষ্ম বিন্দু দ্বারা সেই উপরিস্থ ছত্রের অক্ষরগুলিই লেখা থাকিত। পাঁচ-সাত পৃষ্ঠার পর আর পুরা অক্ষরে লেখা থাকিত না, কেবল কয়েকটি বিন্দুদ্বারা অক্ষরের আয়তন দেখান হইত। ছাত্রেরা অভ্যাসবশত ঠিক ছাপার ন্যায় লিখিয়া যাইত। খাতাগুলির আয়তন ফুলস্ক্যাপ কাগজের চারিভাগের এক ভাগ। যখন এই খাতার প্রচলন ছিল, তখন ফরাসী স্কুলের ছাত্রদের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ও সকলের হস্তাক্ষর প্রায় এক ছাঁদের হইত। ফ্রান্সের কর্ত্তৃপক্ষগণ এখন অন্যপ্রকার ধারণায় কপিবই উঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, কপিবই দেখিয়া লিখিলে হস্তাক্ষর ভাল হয় বটে, কিন্তু হাতের লেখায় ছেলেদের স্বাধীনতা না থাকায় তাহাদের মনোবৃত্তির স্বচ্ছন্দ স্ফূর্ত্তি ও বিকাশে ব্যাঘাত ঘটে। তাঁহাদের মতে প্রত্যেক লোকের হস্তাক্ষর ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হওয়া উচিত। কপিবই দেখিয়া লিখিলে তাহা হয় না। হস্তাক্ষরশিক্ষক এখন কপি লিখিয়া দেন না, প্রত্যেক ছাত্রের লেখা তাহারই ছাঁদে বজায় রাখিয়া শুদ্ধ করিয়া দেন। তিনি কেবল দেখেন, লেখাগুলি সরল রেখায় চলিতেছে কি না, সমান্তর এবং সমায়তন হইতেছে কি না। স্বাধীনতার লীলাভূমি ফ্রান্সে হস্তাক্ষরের স্বাধীনতাটুকু নষ্ট করিতেও কর্ত্তৃপক্ষ বিরক্ত।

এই সকল 'কপি-বই'এর হিসাবে ছাত্রদের দণ্ড হইত। প্রত্যহ ছুটির পর অথবা টিফিনের ছুটির সময় অপরাধী বালক একাকী আবদ্ধ থাকিয়া এই হস্তলিপিরূপ দণ্ড ভোগ করিত। এই লেখা স্কুলে বসিয়া লিখিতে হইত। অন্যান্য বালকেরা খেলা

করিতেছে অথবা ছুটির পর বাড়ী চলিয়া গেছে, আর একজনমাত্র বালক পাঠগৃহে আবদ্ধ থাকিয়া বসিয়া-বসিয়া লিখিতেছে, ইহা বোধ হয় বালকদের পক্ষে দণ্ডের চূড়ান্ত। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ মিশনরীরা বলিতেন যে, বালকদের জরিমানা করিলে সেটাতে কার্য্যত তাহাদের অভিভাবকগণেরই জরিমানা করা হয়। বালকদিগকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিলে তাহারা প্রায়ই পিতামাতার নিকট অর্থ চাহিতে সাহস করে না, অনেক স্থলে চুরি করিয়া বসে, অথবা অন্য কোন অসদুপায়ে পয়সা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে; সেইজন্য ছাত্রদের অর্থদণ্ডের অপেক্ষা জঘন্য প্রথা আর নাই। লিখনদণ্ডে ছাত্রেরাও শাসিত হয়, অথচ তাহাদের হস্তাক্ষরেরও উন্নতি হইয়া থাকে। স্কুলের ছোটসাহেব বালকগণকে বড় ভাল বাসিতেন, এমন কি, ছাত্রদের পীড়া হইলে স্বয়ং তাহাদের বাড়ীতে গিয়া দেখিয়া আসিতেন। পাদ্রীরা সকলেই অল্প-অল্প বাংলা শিখিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহাদের বাংলা শুনিয়া বালকগণ হাস্য-সংবরণ করিতে পারিত না। ছোট-সাহেব কোন বালকের উপর বিরক্ত হইলে অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিতেন, "জা—দূর—" অর্থাৎ যা—দূর। এই 'যা' শব্দটা উচ্চারণ করিতেন ইংরাজী pleasure শব্দের 'S' এ চন্দ্রবিন্দু দিলে যেমন হয়, কতকটা সেইরূপ। ফরাসীরা 'চ' 'ছ' উচ্চারণ করিতে পারে না, তাহার পরিবর্ত্তে 'শ' ও 'স' ব্যবহার করে। ছোট-সাহেব ছাত্রগণকে গালাগালি দিতেন "নেরা পোশা" বলিয়া। "নেরা পোশা" অর্থাৎ "নেড়া পচা।" কেশশূন্য মস্তক যে একটা গালাগালি, তাহা বাঙালী ছাত্রেরা কোনপ্রকারেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না। তাঁহার আর একটা তিরস্কারসূচক কথা ছিল—"যাঁরের দুদ খেয়ে বাস্তুরের মত হয়েছিস্।" (যাঁড়ের দুদ খেয়ে বাছুরের মত হয়েছিস্!)

ফরাসী স্কুলে মাসে একবার করিয়া পরীক্ষা হইত। যে সকল বালক পরীক্ষায় উচ্চস্থান লাভ করিত, তাহারা প্রতিমাসে একখানা করিয়া ছাপান সার্টিফিকেট্ পাইত। ঐ সার্টিফিকেট্‌কে 'নোত্-দে-অনার' (note of honour) বলিত। ছোট ছোট ছেলেরা বলিত 'নতদানায়' এবং কেহ কেহ বা 'নরদামায়'ও বলিত। যাহাদের নোত্-দে-অনারের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং বাৎসরিক পরীক্ষাতে ফল ভাল হইত, তাহারাই প্রাইজ পাইত। বাৎসরিক পরীক্ষার সময় কেহ পীড়িত হইয়া পরীক্ষা দিতে অসমর্থ হইলে, সে নোত্-দে-অনার দেখাইয়া উপরের শ্রেণীতে উঠিতে পারিত। এখন এইপ্রকার নোত্-দে-অনার নাই, তাহার পরিবর্ত্তে প্রতি বালকের জন্য একখানি করিয়া ছাপান পুস্তক শিক্ষকের নিকট রাখিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যহ কোন্ বালক কোন্ বিষয়ে কত নম্বর পাইল, তাহা ঐ পুস্তকে লেখা থাকে। মাসের শেষ ঐ পুস্তকখানিতে শিক্ষক নিজের অভিপ্রায় লিখিয়া ছাত্রের অভিভাবকের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং অভিভাবক তাহা দেখিয়া ছাত্রের পড়াশুনার পরিচয় পান। অভিভাবক দেখিয়া নাম সই করিয়া আবার ছাত্রের দ্বারা শিক্ষকের

নিকট পাঠাইয়া দেন। এইপ্রকারে বালকের প্রাত্যহিক পাঠের দোষগুণ লিখিত হইতে থাকে এবং বৎসরের শেষে এই পুস্তক দেখিয়া ছেলেদের পারদর্শিতার বিচার করা হয়। এইপ্রকার লেখাপড়া থাকায় ছেলেরা স্কুলে ফাঁকি দিতে পারে না।

ফরাসী স্কুলের আর একটি সুন্দর নিয়ম এই যে, টিফিনের ছুটি হইলে অথবা অপরাহ্ণে স্কুল বন্ধ হইলে বালকগণ দুইজন দুইজন করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে ক্লাস হইতে বাহির হয়। অন্যান্য স্কুলে যেমন দেখিতে পাই, ছুটি হইলেই বালকেরা ভয়ানক গোলমাল করিয়া বেঞ্চ ডিঙাইয়া জানলা লাফাইয়া পরস্পরকে ধাক্কা দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে রাস্তার দিকে ধাবমান হয়, ফরাসী স্কুলে সেরূপ হইত না এবং এখনও হয় না। ছুটির ঘণ্টা বাজিবামাত্র ছাত্রেরা দণ্ডায়মান হইয়া দুই-জন দুইজন করিয়া নীরবে কক্ষ হইতে বাহির হইতে থাকে। প্রথমে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর, তার পর তার উপর শ্রেণীর এবং সর্ব্বশেষে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণ বাহির হয়। স্কুল পার হইয়া পথে গিয়া ছাত্রগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। ফরাসী স্কুলের এই প্রথাগুলি সকল বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত হইলে ভাল হয়।

গড়ের স্কুলে একটি বাংলা বিভাগ ছিল। যদিও তাহা হইতে কখনও কাহাকেও ছাত্রবৃত্তি বা প্রাইমারী পরীক্ষা দিতে দেখি নাই, তথাপি একটি বাংলা বিভাগ ছিল। প্রত্যহ ছুটির পূর্ব্বে প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া ছাত্রেরা বাংলা কবিতা আবৃত্তি করিত। বালকগণ যখন কোমল কণ্ঠে "দয়ার সাগর, সর্ব্বগুণাকর, যিনি অখিলের স্বামী" অথবা "একে একে দিবারাত, করিতেছে গতায়াত, রবি-শশী আলো করে জগতে কেমন হে" বলিয়া সমস্বরে কবিতাপাঠ করিত, তখন সে কবিতপাঠ বড় মিষ্ট লাগিত। শুনিয়াছি, শিশুগণের এইপ্রকার কবিতা আবৃত্তি করিবার প্রথা হুগলী মডেল স্কুলের কোন একজন শিক্ষক প্রথমে প্রবর্ত্তিত করেন। 'প্রথমে প্রবর্ত্তিত' অর্থে স্কুলে প্রথমে প্রবর্ত্তিত। নচেৎ আমাদের দেশীয় পাঠশালে "বন্দে মাত সুরধুনি, পুরাণে মহিমা শুনি, পতিতপাবনী পুরাতনী" আবৃত্তি হইত। কিন্তু, স্কুলনামক বিদ্যালয়ে বেঞ্চে বসিয়া ঈশ্বরের মহিমাবিষয়ে কবিতা আবৃত্তির সৃষ্টি প্রথমে হুগলী মডেল স্কুলেই হইয়াছিল। তখন বর্দ্ধমানবিভাগে এমন কোনও বিদ্যালয় ছিল না, যেখানে হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রেরা শিক্ষকতা না করিয়াছেন। আমাদের গড়ের স্কুলের পণ্ডিতমহাশয়ও হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্র ছিলেন, তাই সেই কবিতা-আবৃত্তির প্রথা আমাদের স্কুলেও সংক্রামিত হইয়াছিল। কোন শ্রেণীর বালকেরা অধিক গোলমাল করিলে পণ্ডিতমহাশয় বলিয়া উঠিতেন, "উত্তিষ্ঠ।" আর অমনি সকলে মুখের অর্দ্ধসমাপ্ত কথা অসমাপ্ত রাখিয়া নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া উঠিত এবং যতক্ষণ পণ্ডিতমহাশয় না বলিতেন "উপবিশ", ততক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। আমাদের যিনি হেড্ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাকে আমরা যমের মত ভয় করিতাম। তাঁহার সময়ে কথা কহা দূরে থাক্, কাশিতে ভয় হইত। আমাদের স্কুলে ছাত্রদের সম্মুখে ডেস্ক অথবা টেবিল ছিল না, ছাত্রেরা

সমুখের মেঝের উপরেই পুস্তক রাখিত। এই পুস্তকরক্ষাও ঠিক সরলরেখাতে করিতে হইত। যদি রেখা বাঁকিয়া যাইত, তাহা হইলে পণ্ডিতমহাশয় একএকবার নাম ধরিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিতেন, আর ছাত্রদের এক-সের রক্ত শুখাইয়া যাইত। হেড্ পণ্ডিত-মহাশয় একটু অধিক প্যারেড্ প্রিয় ছিলেন। তিনি ক্লাসে প্রবেশ করিয়াই বলিতেন, "পুস্তক লও—সমশির" অর্থাৎ সকলে মস্তক সমান নত করিয়া পুস্তক লও। তার পর যত-ক্ষণ তিনি না বলিতেন "মস্তক তোল", তত-ক্ষণ আমরা মাথা নত করিয়া থাকিতাম। এই স্কুলে ছুটির পর সারিবন্দী হইয়া যাওয়া অথবা কোন অপরাধে লেখা-দণ্ড ছিল না। বড় পণ্ডিতমহাশয় বেত্রদণ্ডেই সকল অপ-রাধের শাস্তিবিধান করিতেন। এই স্কুলে শাস্তির চরম অর্থাৎ capital punishment ছিল 'গাধার টুপি'। গাধার টুপি আবার দুই প্রকারের ছিল—ক্লাসের মধ্যে গাধার টুপি, আর স্কুলের প্রাঙ্গণে গাধার টুপি। স্কুলের মাঝখানে একটা বড় উঠান ছিল। কাহাকেও চরম শাস্তি দিতে হইলে এই উঠানের মাঝখানে একটা টুল রাখিয়া অপরাধীর মস্তকে একটা ত্রিকোণ কাগজের টুপি পরাইয়া দেওয়া হইত। নির্ব্বুদ্ধিতা যদি গাধার লক্ষণ হয়, তাহা হইলে যাহা-দের মাথায় এই টুপি দেওয়া হইত, তাহাদিগকে গাধা বলিতে পারি না। কারণ নির্ব্বোধ ছেলেরা প্রায় কখনও দুষ্ট হয় না। এই গাধার টুপি কখনও নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য ব্যবহৃত হইত না। যাহারা অতিরিক্ত বুদ্ধিমান্ অর্থাৎ দুষ্ট, তাহারাই এই অদ্ভুত শিরস্ত্রাণে সজ্জিত হইত।

গ্রীষ্মাবকাশের একমাস পূর্ব্ব হইতে আমাদের মণিং স্কুল হইত। সে এক মহা-আমোদ। আমাদের বাড়ী হইতে গড়ের স্কুল নিতান্ত কাছে ছিল না, প্রায় দেড়-মাইল পথ হইবে। প্রাতে সাড়ে ছয়টার সময় আমাদের স্কুল বসিত, কিন্তু আমরা অতি প্রত্যূষে, বোধ হয় সাড়ে তিনটা বা চারিটার সময়, শয্যাত্যাগ করিয়া স্কুলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতাম। মা পূর্ব্বদিন বৈকালে কিছু খাবার আনাইয়া রাখিতেন। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া সেই খাবার খাইয়া পথে বাহির হইতাম। তখনও বেশ অন্ধকার থাকিত। মার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদিগকে এই অন্ধকার থাকিতে থাকিতে যাইতে হইত, কারণ পাড়ার অন্যান্য বয়স্করা আমাদিগকে ডাকিতে থাকিত। এক-এক-দিন এত প্রাতে যাইতাম যে, যখন স্কুলে উপস্থিত হইতাম, তখনও ১০।১৫ হাত দূরের লোক চিনিতে পারা যাইত না। স্কুলে একটি অতি প্রাচীন মালী ছিল। সে বেচারা সমস্তরাত্রি মশার অত্যাচারে ছট্‌ফট্ করিয়া ভোরবেলায় একটু চক্ষু বুজিত, আর সেই সময় স্কুলের পোড়োরা গিয়া চীৎকার-স্বরে তাহার নিদ্রা ভাঙাইয়া দিত। পথে যাইবার সময় যে আমরা খুব ভাল মানুষটির মত যাইতাম না, তাহা বলাই বাহুল্য। চৈত্র-মাসের প্রায় অর্দ্ধেক আন্দাজ হইলেই আমা-দের মণিং স্কুল আরম্ভ হইত। সেই সময় তারকেশ্বরযাত্রী সন্ন্যাসীরা প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া দলবদ্ধ হইয়া তারকেশ্বর যাত্রা

করিত। তখন তারকেশ্বরের গাড়ি হয় নাই, সুতরাং যাত্রীরা পদব্রজে যাইত ও মাঝে মাঝে জনশূন্য পথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া "বলে তারকেশ্বরের শিবো—মহা-দেব—জয় বাবা তারকনাথ" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিত। আমরাও তাহাদের অনুকরণে "তারকেশ্বরের শিবো" বলিয়া চীৎকার করিতাম। কখনও বা দলবদ্ধ হইয়া তালে তালে "ধন্য ধন্য ধন্য আজি দীন-আনন্দকারী" বলিয়া গান করিতে করিতে যাইতাম। আমাদের স্কুলে একটি ব্রাহ্মসমাজ ছিল; তাহার বাৎসরিক অধি-বেশনের দিন আচার্য্যমহাশয়ের মুখে ঐ গান শুনিয়া আমরা শিখিয়াছিলাম।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমরা খুব শান্ত-শিষ্ট, প্রথমভাগের 'গোপালের' মত আদর্শ-বালক ছিলাম না। আমরা যখন পঞ্চম-শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমাদের একজন নূতন শিক্ষক আসিলেন। তিনি জাতিতে কলু। আমাদের দলের একজন ডান্‌পিটে ছেলে একদিন বলিল, "ভাই মর্ণিং স্কুল আস্‌চে, সকালে এসে যে কলুর মুখ দেখ্‌ব, তা হবে না। হয় কলুকে তাড়াব, নয় আমি স্কুল ছাড়্‌ব," ইত্যাদি ইত্যাদি। তার পর মর্ণিং স্কুল আরম্ভ হইল। ক্লাসে গিয়া দেখি, আমাদের সেই মাতব্বর বন্ধুটি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিয়াছে! মাষ্টার যাহা প্রশ্ন করেন, তাহার উত্তর দেয়, কিন্তু মুদ্রিতনেত্রে। শিক্ষকমহাশয় প্রথমদিন কিছু বলিলেন না। ২।৪দিনের মধ্যে চক্ষু-বোজা-রোগটা সংক্রামক হইয়া পড়িল। মাষ্টারমহাশয় ক্লাসে প্রবেশ করিয়া দেখি-লেন যে, তাঁহার শিষ্যগণ সকলেই ধৃতরাষ্ট্র হইয়াছে। বলা বাহুল্য, তিনি তৎক্ষণাৎ কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং অবিলম্বে গিয়া দ্বিতীয় শিক্ষকমহাশয়কে বালকদের এই অদ্ভুত ব্যবহারের কথা বলিয়া দিলেন। আমাদের স্কুলে হেড্‌মাষ্টার সত্ত্বেও second masterই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। কারণ তাঁহা-রই কয়েকজন বন্ধুর উদ্যোগে এই স্কুলটি স্থাপিত হয়, তিনি বিদ্যালয়ের আরম্ভ হইতে মাষ্টারি করিতেছেন, আর তাঁহার আমলে অনেক হেড্ মাষ্টারের প্রবেশ ও প্রস্থান হইয়াছে। অধিকন্তু তিনি বড় রাশ-ভারী লোক। এই সকল কারণে তিনি ইংরাজী বিভাগের সর্ব্বময়-কর্ত্তা ছিলেন। যাহা হউক, আমরা ত চক্ষু বুজিয়া বসিয়া আছি, এমন-সময় হঠাৎ "আর করবো না sir," "ঘাট হয়েছে sir," "আর না sir" ইত্যাদি সকাতর চীৎকারধ্বনিতে চমকিত হইয়া চক্ষু চাহিয়া দেখি—সর্ব্বনাশ! স্বয়ং সেকেণ্ড মাষ্টার বেত্রদণ্ডহস্তে ক্লাসে অধিষ্ঠিত হইয়া মুদ্রিতচক্ষু বালকগণের ধ্যানভঙ্গ করিতেছেন। সেকেণ্ড মাষ্টার ক্লাসের এক ধার হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের মস্তকে সজোরে এক এক ঘা প্রহার করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। আমাদের ধ্যানমগ্ন হওয়াটা যেমন সংক্রামক হইয়াছিল, ধ্যানভঙ্গটাও সেইপ্রকার আক-স্মিক হইল। আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ধ্যানভঙ্গ হইলে যোগীরা যে যথেষ্ট ব্যথা অনুভব করেন, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি-লাম। বুঝিলাম যে, পুষ্পশরে আহত হইয়া মহাযোগী মহাদেব কেন মদন-

ঠাকুরকে ভস্ম করিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে কিন্তু মনে মনে সেকেণ্ড মাষ্টারকে এবং তাঁহার সহিত কলু মাষ্টারকে মদনের দশা পাওয়াইবার জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহারা সশরীরে স্বস্ব নির্দ্দিষ্টস্থানে ফিরিয়া যাইলেন। বলা বাহুল্য যে চোরা গাভীর সহিত অনেক কপিলা গাভীও সেকেণ্ড মাষ্টারের সুমিষ্ট বেত্রদণ্ডের আস্বাদ অনুভব করিয়াছিলেন।

মর্ণিং স্কুলে দশটার সময় ছুটি হইত, আমরা প্রায় এগারটার সময় বাটী পৌঁছিতাম। তাহার পর বোধ হয় ৪।৫ মিনিটের মধ্যে বস্ত্রপরিবর্ত্তন, পুস্তকরক্ষা, তৈলমর্দ্দন ইত্যাদি শেষ করিয়া নিকটস্থ বৃহৎ সরোবরে দলবদ্ধ হইয়া পড়িতাম। সে পতন মৈনাকের সাগরজলে অবগাহনের ন্যায়, তাহার আর শেষ নাই। কত স্নানার্থী আসিয়া স্নান-আহ্নিক শেষ করিয়া উঠিয়া গেল; কত যুবতী, কত প্রৌঢ়া, কত বৃদ্ধার নিকট হইতে গালি খাইলাম; কেহ বা মার নিকট নালিশ করিবার ভয় পর্য্যন্ত দেখাইতে লাগিল; কিন্তু আমাদের স্নান আর শেষ হয় না। অবশেষে যখন পুষ্করিণীর ঘাটের জল যথেষ্ট কর্দ্দমাক্ত এবং চক্ষু রক্তবর্ণ ও হস্ত-পদ-তল রক্তশূন্য ও কুঞ্চিত হইয়া উঠিত, তখন আমাদের স্নান শেষ হইত। তখন বোধ হয় বেলা একটা বাজিত। তার পর আহারান্তেই কি রৌদ্রের ভয়ে স্থির হইয়া গৃহে থাকিতাম? সমস্ত মধ্যাহ্নে বাগানে বাগানে কাঁচা আম পাড়িয়া তাহাই পুদিনা, লঙ্কা ও লবণ সংযোগে অর্দ্ধকুট্টিত করিয়া চাট্‌নি করিতাম ও কদলীপত্রের দীর্ঘাকৃতি ঠোঙা করিয়া ঠোঙার সরু দিক্‌টা মুখে দিয়া চুষিয়া চুষিয়া সেই চাট্‌নির রস খাইতে থাকিতাম। মর্ণিং স্কুলে ছেলেদের যা কল্যাণ সাধিত হইত, তা আমরা বেশ বুঝিতে পারিতাম। যদি ইহাতে কাহারও কোন উপকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে শিক্ষকগণের। কারণ মধ্যাহ্নে চেয়ারে বসিয়া ক্লাশের মাঝে না ঢুলিয়া বেশ সুখে তাঁহারা গৃহে গিয়া নিদ্রা দিতেন।

হুগলী কলিজিয়েট স্কুলে যখন প্রবিষ্ট হইলাম, তখনও আমরা বালক। হুগলী কলেজে মর্ণিং স্কুল হইত না বটে, কিন্তু আমাদের আবার নূতন উপসর্গ আসিয়া জুটিল। আমাদের বাড়ী হইতে হুগলীর কলেজ প্রায় দেড়ক্রোশ পথ। আমরা প্রত্যহ নৌকাযোগে কলেজে যাতায়াত করিতাম। হুগলী কলেজ গঙ্গার উপরেই অবস্থিত, আর আমাদের বাড়ীও গঙ্গার তীর হইতে দশ মিনিটের পথ, সুতরাং জলপথটাই আমাদের পক্ষে প্রশস্ত ছিল। কলেজে যাইবার জন্য প্রত্যহ ৫।৬খানি নৌকা আমাদের চন্দননগর হইতে কলেজে যাইত। কলেজে মোটের উপর বোধ হয় ২০।২৫খানি নৌকা জড় হইত। যাহাদের এইরূপ নৌকায় যাতায়াত, তাহাদের প্রত্যেকের কাছ হইতে কলেজের নৌকার মাঝির মাসিক একটাকা করিয়া বেতন বরাদ্দ ছিল। আমাদের নৌকা যখন আমাদের ঘাট হইতে ছাড়িত, তখন বেলা ৯টা; ১০টার সময় কলেজ বসিত। এক এক খানি নৌকায় ১২।১৩জন ছাত্র থাকিত। প্রতি

মাসে এই ১২।১৩ টাকা মাঝির বাঁধা বেতন, তা ছাড়া পূজার সময় সে প্রায় সকল ছাত্রের নিকট হইতে ধুতি-চাদর এবং ছাত্রগণের বিবাহ, উপনয়ন অথবা 'পাস' হওয়া প্রভৃতি উপলক্ষে নানাপ্রকার বক্‌সিস পাইত। গ্রীষ্মাবকাশ বা পূজার বন্ধে কলেজ বন্ধ হইত, কিন্তু মাঝিদের বেতন বন্ধ হইত না। এইসময় মাঝিরা স্বেচ্ছামত নৌকা ভাড়া দিত। তদ্ভিন্ন প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও রাত্রে তাহারা গঙ্গায় ইলিশ-মাছ ধরিত বা ভাড়া পাইলে ভাড়ায় যাইত মোটের উপর কলেজের নৌকার মাঝিদের অবস্থা মন্দ ছিল না। অনেকেরই মাসে গড়ে ত্রিশ-টাকা উপার্জ্জন হইত। অধিকাংশ নৌকায় একজন করিয়াই মাঝি থাকিত, কেবল দুই একখানি নৌকাতে একজন সহকারী মাঝি বা দাঁড়ি দেখা যাইত, নতুবা নৌকার বাবুরাই মাঝির সহকারী হইত। কলেজের নৌকায় প্রত্যেক বাবুই একএকজন পাকা মাঝি। প্রত্যহ প্রাতে এবং অপরাহ্ণে ছাত্রেরা পালা করিয়া হাল না ধরিলে, নৌকা কেবলমাত্র নাবিকের সাহায্যে দ্রুতগতি যাইতে পারিত না, তাহাতে স্কুলের বেলা হইবার সম্ভাবনা, আর বাড়ী আসিতেও বিলম্ব ঘটিত। সুতরাং ছাত্রদিগকে পালা করিয়া হাল ধরিতেই হইত। ভাদ্রমাসের ভরা-গাঙে রক্তবর্ণ বারিরাশি যখন প্রবলবেগে সগর্জ্জনে সাগরাভিমুখে ছুটিত, তখন আমরা অতি নিশ্চিন্তভাবেই হাল ধরিয়া বসিয়া থাকিতাম; জলের গর্জ্জনে, আবর্ত্তের আস্ফালনে, স্রোতের আকর্ষণে ভ্রূক্ষেপও করিতাম না। আমরা প্রায়ই হালের নিকটে বসিয়া বামকক্ষে হাল জড়াইয়া ধরিতাম, আর দক্ষিণ হস্তে ছত্র ধরিয়া সম্মুখে পুস্তক খুলিয়া রাখিয়া পাঠ মুখস্থ করিতাম। নৌকা ঘুরাইবার ফিরাইবার আবশ্যক হইলে বাম হস্তের সাহায্যেই তাহা সমাধা হইত। বৈশাখমাসের অপরাহ্ণে কলেজ হইতে ফিরিবার সময় প্রায়ই ঝড়বৃষ্টিতে পড়িতাম। অপরাহ্ণে পশ্চিম আকাশে মেঘ দেখিলে আমাদের অভিভাবকগণ চিন্তিত হইতেন, কিন্তু আমরা তাহা গ্রাহ্যও করিতাম না। আমরা যখন কলেজে পড়ি, সেই সময় হুগলীর পুল নির্ম্মিত হইতে থাকে। পুলনির্ম্মাণকালে 'মার্গারেট'-নামক একখানি অতি দ্রুতগামী ক্ষুদ্র ষ্টীমার প্রায়ই কলিকাতা হইতে হুগলীতে যাতায়াত করিত। তাহার মস্ত দুইখানা চাকা ছিল, সেইজন্য ষ্টীমারখানি চলিয়া গেলে, ৪।৫টা অতি প্রকাণ্ড ঢেউ সমস্ত গঙ্গার একূল ওকূল আলোড়িত করিয়া দিত। মার্গারেটের ঢেউ লাগিয়া বড় বড় নৌকাগুলিও দুলিয়া উঠিত; কিন্তু আমরা সে ঢেউ দেখিয়া, ভয় পাওয়া দূরে থাক্, সময়-সময় এক আধ-ক্রোশ এই চলন্ত ষ্টীমার ধরিয়াই চলিয়া যাইতাম। কখন-কখন তিন-চারি-খানা কলেজের নৌকাতে বাচ-খেলা লাগিয়া যাইত। বাচ-খেলাটা প্রায় অপরাহ্ণেই হইত। আমাদের নৌকায় দিনকয়েকের জন্য একজন দাঁড়ি আসিয়াছিল। সে বড় অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। নৌকায় যদি ছাত্রেরা গোলমাল করিত, তাহা হইলে সে বলিত, "বাবুরা গোলমাল কোরো না গো—গোলমাল কল্লে নৈকো-ফৈকো চলে না।" সে নৌকাকে বলিত 'নৈকো'। গোলমাল করিলে অর্থাৎ আরো-

হীরা সকলে একসঙ্গে উচ্চস্বরে কথা কহিলে "নৈকো" যে কেন চলিবে না, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতাম না।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন কলেজের সম্মুখে গঙ্গার মাঝখানে একটা খুব বড় রকমের চড়া ছিল। চড়াটা বড় বড় ঘাস, হোগলা, শর, খড়ি এবং অনেকগুলি শিমুলগাছে ভরিয়া গিয়াছিল। চড়ার খানিকটা একজন কৃষক আবাদ করিত। সময়ে সময়ে মধ্যাহ্নে আমরা নৌকা লইয়া এই চড়ায় যাইতাম। আমাদের নৌকায় হুগলী কলেজ ছাড়া অন্যান্য স্কুলেরও দুইচারিজন ছাত্র ছিল। যদি কোন কারণে আমাদের হাফ্‌স্কুল হইত, তাহা হইলে আমরা অন্যান্য ছাত্রদের জন্য তিনটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতাম। এই অপেক্ষাটা অনেকসময়ে চড়ার উপরেই কাটিয়া যাইত। মধ্যাহ্নে মাঝিরা প্রায় নৌকায় থাকিত না। কলেজের ঘাটের দক্ষিণের ঘাটে একটা খুব বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষ আছে, তাহার তলদেশ সান-বাঁধান। মাঝিরা প্রায় প্রতিদিন এই অশ্বত্থতলে একত্র হইয়া তাস খেলিত, কেহ বা গাত্রমার্জ্জনীর উপাধান করিয়া নিদ্রাদেবীর সেবা করিত। আমরা যখন মধ্যাহ্নে চড়ায় যাইতাম, তখন প্রায়ই মাঝিরা নৌকায় থাকিত না। একদিন আমরা ৪।৫ জনে জুটিয়া এইপ্রকার চড়ায় গিয়া দেখি যে, একটা শিমুল গাছের তলায় আমাদের তিনজন সমপাঠী বসিয়া 'চড়িভাতি' করিতেছে। তাহাদের নৌকার মাঝি তাহাদের আয়োজন করিয়া দিতেছে। কেরোসিনের ষ্টোভ জ্বালিয়া তাহাতে খিচুড়ি রন্ধন হইয়াছে, আর ইলিশমাছ ভাজা হইতেছে।

কলেজে অধ্যয়নকালে আমাদের জলযোগটা প্রায়ই ছুটির পর নৌকায় বসিয়া হইত। ঐ সময় দুইজন খাদ্যবিক্রেতা মিষ্টান্ন, লুচি, কচুরি ও আলুর দম লইয়া ঘাটে বসিয়া থাকিত। আমরা নৌকায় যাইবার সময় তাহার নিকট হইতে খাবার কিনিয়া লইতাম। কখনও বা স্কুলে যাইবার সময় আমাদের মাঝির নিকট পয়সা দিয়া যাইতাম, সে বাজার হইতে খাবার কিনিয়া-আনিয়া রাখিয়া দিত। আমাদের মাঝি দিনকতক খাবারের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিল। আমরা যে কয়জন নৌকায় জল খাইতাম, মাঝি সেই হিসাবে বাজার হইতে ওজন করিয়া খাবার কিনিয়া আনিত এবং আমাদিগকে খুচরা দরে বিক্রয় করিত। তাহাতে আমাদেরও কোন ক্ষতি হইত না, অথচ মাঝে হইতে মাঝি প্রত্যহ দুই-এক-আনা পাইয়া যাইত।

আমাদের পাঠ্যাবস্থায় 'বার্ডসাই' ছিল না। চুরুটও যাহা ছিল, তাহা স্কুলের বালকগণের মধ্যে বড় দেখিতে পাইতাম না। এখন দেখিতে পাই, ৬।৭বৎসরের ছেলেগুলোও বার্ডসাই খায়। তখন যুবকেরাও চুরুট খাইত না, তবে অনেকে হুঁকাতে তামাকু খাইত। আমি যখন সপ্তম কি অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি, তখন একজন প্রথম শ্রেণীর ছাত্রকে চুরুট খাইতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। তাহার বয়স তখন ১৮।১৯বৎসর হইবে। ভদ্রলোকের ছেলে এত অল্প বয়সে চুরুট খায়, তাহা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।

আমাদের সময়ের আর একটা বিষয়ের অভাব আজকাল বড় অধিক বলিয়া বোধ হয়। আমার মনে হয়, আমাদের সময়ে ছেলেদের মধ্যে গুরুজনকে সম্ভ্রম-সম্মান-প্রদর্শন যেন এখনকার অপেক্ষা বেশী ছিল। আমরা যখন দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতাম, তখন প্রথমশ্রেণীর বা কলেজের এফ্‌, এ, ক্লাসের ছাত্রদিগকে অতিশয় ভয় করিতাম। সহপাঠীদের সহিত খুবই বাচালতা চলিত, কিন্তু উপরশ্রেণীর ছাত্র দেখিলে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইতাম। আমাদের নৌকায় উপরশ্রেণীর ছাত্রগণকে ঠিক জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় দেখিতাম। কিন্তু আজকাল দেখিতে পাই, উপরশ্রেণীর ছাত্রগণকে ভয় করা দূরে থাক্‌, স্কুলের বাহিরে ছাত্রেরা নিজের শিক্ষকগণকেও গ্রাহ্য করে না। এ কথা আমার কল্পিত নহে। প্রায় দুইবৎসর হইল, একদিন হেয়ার স্কুলের হেড্‌ মাষ্টারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তাঁহার নিকট আমরা হুগলী কলেজে পড়িয়াছিলাম। তিনি কথায় কথায় বলিলেন, "বাপু, আজকাল আমি ভারতবর্ষের মধ্যে একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয় আমার অধীনে। কিন্তু আমার মনে হয়, আমি হুগলীতে অথবা অন্য কোন পল্লীগ্রামে থাকিলে ভাল হইত। এখানকার ছেলেদের কথা বলিও না; কাহাকেও কিছু বলিতে ভয় করে, পাছে রাস্তায় ছুরি মারে। আমার ছাত্রেরা পথে আমার সম্মুখে বার্ডসাই খায়—লজ্জায় আমি ছাতা আড়াল দিয়া চলিয়া যাই।"

এখন যেমন স্কুল-কলেজের ছেলেদের মধ্যে ফুটবল্‌ হইয়াছে, তখন তেম্‌নি জিম্‌ন্যাষ্টিক ছিল। আমাদের এ অঞ্চলে প্রতি পাড়াতেই একটা করিয়া জিম্‌ন্যাষ্টিকের আড্ডা ছিল। একটা হরাইজণ্টাল্‌ বার্‌, একজোড়া প্যারালাল্‌ বার্‌ ও একটা ট্রেপিজ্‌ বার্‌ তখন সকল পাড়াতেই দেখিতে পাইতাম। এখন সে সকল অদৃশ্য হইয়া তাহার স্থানে ফুটবল্‌ দেখা দিয়াছে। এখন কদাচিৎ দুই-একটা স্কুলে জিম্‌ন্যাষ্টিকের সরঞ্জাম দেখিতে পাই। ইহার মধ্যে কে ভাল, কে মন্দ, তাহা বলিতে পারি না, তবে হাত-পা-মাথা-ভাঙা উভয়ের মধ্যেই আছে। জিম্‌ন্যাষ্টিকের ছেলে অপেক্ষা ফুট্‌বল্‌ওয়ালা ছেলেরা অনেকটা বেশী সাহেবঘেঁষা হইয়া উঠিয়াছে। এখন বঙ্গসন্তানগণ ফুট্‌বলের প্রসাদে সাহেবসুবোকে গুঁতাটাগাঁতাটা দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

চোখের বালি।

(৪৬)

পরদিন প্রত্যূষেই মহেন্দ্র বিহারীর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, দ্বারের কাছে অনেকগুলা গোরুর গাড়িতে ভৃত্যগণ আস্‌বাব্ বোঝাই করিতেছে। ভজুকে মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারখানা কি?" ভজু কহিল, "বাবু বালিতে গঙ্গার ধারে একটি বাগান লইয়াছেন, সেইখানে জিনিষপত্র চলিয়াছে।" মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু বাড়ীতে আছেন না কি?" ভজু কহিল, "তিনি দুইদিনমাত্র কলিকাতায় থাকিয়া কাল বাগানে চলিয়া গেছেন।"

শুনিয়া মহেন্দ্রের মন আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া গেল। সে অনুপস্থিত ছিল, ইতিমধ্যে বিনোদিনী ও বিহারীতে যে দেখা হইয়াছে, ইহাতে তাহার মনে কোন সংশয় রহিল না। সে কল্পনাচক্ষে দেখিল, বিনোদিনীর বাসার সম্মুখেও এতক্ষণে গোরুর গাড়ি বোঝাই হইতেছে। তাহার নিশ্চয় বোধ হইল, 'এইজন্যই নির্ব্বোধ আমাকে বিনোদিনী বাসা হইতে দূরে রাখিয়াছিল।'

মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া মহেন্দ্র তাহার গাড়িতে চড়িয়া কোচ্‌মান্‌কে হাঁকাইতে কহিল। ঘোড়া যথেষ্ট দ্রুত চলিতেছে না বলিয়া মহেন্দ্র মাঝে মাঝে কোচ্‌মান্‌কে গালি দিল। গলির মধ্যে সেই বাসার দ্বারের সম্মুখে পৌছিয়া দেখিল, সেখানে যাত্রার কোন আয়োজন নাই। ভয় হইল, পাছে সে কার্য্য পূর্ব্বেই সমাধা হইয়া থাকে। বেগে দ্বারে আঘাত করিল। ভিতর হইতে বৃদ্ধ চাকর দরজা খুলিয়া দিবামাত্র মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "সব খবর ভাল ত?" সে কহিল—"আজ্ঞা হাঁ, ভাল বই কি!"

মহেন্দ্র উপরে গিয়া দেখিল, বিনোদিনী স্নানে গিয়াছে। তাহার নির্জ্জন শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র বিনোদিনীর গতরাত্রে ব্যবহৃত শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল—সেই কোমল আস্তরণকে দুই প্রসারিত হস্তে বক্ষের কাছে আকর্ষণ করিল এবং তাহাকে ঘ্রাণ করিয়া তাহার উপরে মুখ রাখিয়া বলিতে লাগিল—"নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর!"

এইরূপে হৃদয়োচ্ছ্বাস উন্মুক্ত করিয়া দিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া মহেন্দ্র অধীরভাবে বিনোদিনীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে দেখিল, একখানা বাংলা খবরের কাগজ নীচের বিছানায় খোলা পড়িয়া আছে। সময় কাটাইবার জন্য কতকটা অন্যমনস্কভাবে সেখানা তুলিয়া লইয়া, যেখানে চোখ পড়িল, মহেন্দ্র সেখানেই বিহারীর নাম দেখিতে পাইল। এক মুহূর্ত্তে তাহার সমস্ত মন খবরের কাগজের সেই জায়গাটাতে ঝুঁকিয়া পড়িল। একজন পত্রপ্রেরক লিখিতেছে, অল্পবেতনের দরিদ্র কেরাণীগণ রুগ্‌ণ হইয়া পড়িলে তাহাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও সেবার জন্য বিহারী বালিতে

গঙ্গার ধারে একটি বাগান লইয়াছেন—সেখানে এককালে পাঁচজনকে আশ্রয় দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে, ইত্যাদি।

বিনোদিনী এই খবরটা পড়িয়াছে! পড়িয়া তাহার কিরূপ ভাব হইল? নিশ্চয় তাহার মনটা সেইদিকে পালাই-পালাই করিতেছে। শুধু সেজন্য নহে, মহেন্দ্রের মন এই কারণে আরও ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল যে, বিহারীর এই সদ্বন্ধে তাহার প্রতি বিনোদিনীর ভক্তি আরো বাড়িয়া উঠিবে। বিহারীকে মহেন্দ্র মনে মনে "হাথাগ্" বলিল, বিহারীর এই কাজটাকে "হুজুগ" বলিয়া অভিহিত করিল—কহিল, "লোকের হিতকারী হইয়া উঠিবার হুজুগ বিহারীর ছেলেবেলা হইতেই আছে;"—মহেন্দ্র নিজেকে বিহারীর তুলনায় একান্ত অকপট অকৃত্রিম বলিয়া বাহবা দিবার চেষ্টা করিল—কহিল, "ঔদার্য্য ও আত্মত্যাগের ভড়ঙে মূঢ়লোক ভুলাইবার চেষ্টাকে আমি ঘৃণা করি।" কিন্তু হায়, এই পরম নিশ্চেষ্ট অকৃত্রিমতার মাহাত্ম্য লোকে অর্থাৎ বিশেষ কোন একটি লোক হয় ত বুঝিবে না। মহেন্দ্রের মনে হইতে লাগিল, বিহারী যেন তাহার উপরে এ-ও একটা চাল চালিয়াছে।

বিনোদিনীর পদশব্দ শুনিয়া মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি কাগজখানা মুড়িয়া তাহার উপর চাপিয়া বসিল। স্নাত বিনোদিনী ঘরে প্রবেশ করিলে, মহেন্দ্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিল। তাহার কি এক অপরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে যেন এই কয়দিন আগুন জ্বালিয়া তপস্যা করিতেছিল। তাহার শরীর কৃশ হইয়া গেছে—এবং সেই কৃশতা ভেদ করিয়া তাহার পাণ্ডুবর্ণ মুখে একটি দীপ্তি বাহির হইতেছে।

বিনোদিনী বিহারীর পত্রের আশা ত্যাগ করিয়াছে। নিজের প্রতি বিহারীর নিরতিশয় অবজ্ঞা কল্পনা করিয়া সে অহোরাত্রি নিঃশব্দে দগ্ধ হইতেছিল। এই দাহ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোন পথ তাহার কাছে ছিল না। বিহারী যেন তাহাকেই তিরস্কার করিয়া পশ্চিমে চলিয়া গেছে—তাহার নাগাল পাইবার কোন উপায় বিনোদিনীর হাতে নাই। কর্ম্মপরায়ণা নিরলসা বিনোদিনী কর্ম্মের অভাবে এই ক্ষুদ্র বাসার মধ্যে যেন রুদ্ধশ্বাস হইয়া উঠিতেছিল—তাহার সমস্ত উদ্যম তাহার নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া আঘাত করিতেছিল। তাহার সমস্ত ভাবী জীবনকে এই প্রেমহীন, কর্ম্মহীন, আনন্দহীন বাসার মধ্যে, এই রুদ্ধ গলির মধ্যে চিরকালের জন্য আবদ্ধ কল্পনা করিয়া তাহার বিদ্রোহী প্রকৃতি আয়ত্তাতীত অদৃষ্টের বিরুদ্ধে যেন আকাশে মাথা ঠুকিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল। যে মূঢ় মহেন্দ্র বিনোদিনীর সমস্ত মুক্তির পথ চারিদিক্ হইতে রুদ্ধ করিয়া তাহার জীবনকে এমন সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, তাহার প্রতি বিনোদিনীর ঘৃণা ও বিদ্বেষের সীমা ছিল না। বিনোদিনী বুঝিতে পারিয়াছিল, সেই মহেন্দ্রকে সে কিছুতেই আর দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারিবে না। এই ক্ষুদ্র বাসায় মহেন্দ্র তাহার কাছে ঘেঁষিয়া সম্মুখে আসিয়া বসিবে—প্রতিদিন অলক্ষ্য আকর্ষণে তিলে তিলে তাহার দিকে অধিকতর অগ্রসর হইতে থাকিবে,—এই অন্ধকূপে, এই সমাজ-

ভ্রষ্ট জীবনের পঙ্কশয্যায় ঘৃণা এবং আসক্তির মধ্যে যে প্রাত্যহিক লড়াই হইতে থাকিবে, তাহা অত্যন্ত বীভৎস। বিনোদিনী স্বহস্তে, স্বচেষ্টায় মাটি খুঁড়িয়া মহেন্দ্রের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এই যে একটা লোলজিহ্বা লোলুপতার ক্লেদাক্ত সরীসৃপকে বাহির করিয়াছে,ইহার পুচ্ছপাশ হইতে সে নিজেকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে? একে বিনোদিনীর ব্যথিত হৃদয়, তাহাতে এই ক্ষুদ্র অবরুদ্ধ বাসা,তাহাতে মহেন্দ্রের বাসনা-তরঙ্গের অহরহ অভিঘাত—ইহা কল্পনা করিয়াও বিনোদিনীর সমস্ত চিত্ত আতঙ্কে পীড়িত হইয়া উঠে! জীবনে ইহার সমাপ্তি কোথায়? কবে সে এই সমস্ত হইতে বাহির হইতে পারিবে?

বিনোদিনীর সেই কৃশ-পাণ্ডুর মুখ দেখিয়া মহেন্দ্রের মনে ঈর্ষানল জ্বলিয়া উঠিল। তাহার কি এমন কোন শক্তি নাই,যাহাদ্বারা সে বিহারীর চিন্তা হইতে এই তপস্বিনীকে বলপূর্ব্বক উৎপাটিত করিয়া লইতে পারে? ঈগল্ যেমন মেষশাবককে এক নিমেষে ছোঁ মারিয়া তাহার সুদুর্গম অভ্রভেদী পর্ব্বত-নীড়ে উত্তীর্ণ করে, তেমনি এমন কি কোন মেষপরিবৃত নিখিলবিস্তৃত স্থান নাই, যেখানে একাকী মহেন্দ্র তাহার এই কোমল-সুন্দর শিকারটকে আপনার বুকের কাছে লুকাইয়া রাখিতে পারে? ঈর্ষার উত্তাপে তাহার ইচ্ছার আগ্রহ চতুর্গুণ বাড়িয়া উঠিল। আর কি সে একমুহূর্ত্তও বিনোদিনীকে চোখের আড়াল করিতে পারিবে? বিহারীর বিভীষিকাকে অহরহ ঠেকাইয়া রাখিতে হইবে, তাহাকে সূচাগ্রমাত্র অবকাশ দিতে আর ত মহেন্দ্রের সাহস হইবে না!

বিরহতাপে রমণীর সৌন্দর্য্যকে সুকুমার করিয়া তোলে, মহেন্দ্র এ কথা সংস্কৃতকাব্যে পড়িয়াছিল, আজ বিনোদিনীকে দেখিয়া সে তাহা যতই অনুভব করিতে লাগিল, ততই সুখমিশ্রিত দুঃখের সুতীব্র আলোড়নে তাহার হৃদয় একান্ত মথিত হইয়া উঠিল।

বিনোদিনী ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চা খাইয়া আসিয়াছ?"

মহেন্দ্র কহিল, "না হয় খাইয়া আসিয়াছি, তাই বলিয়া স্বহস্তে আর এক পেয়ালা দিতে কৃপণতা করিয়ো না!—প্যালা মুখ ভর দেরে!"

বিনোদিনী বোধ হয় ইচ্ছা করিয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে মহেন্দ্রের এই উচ্ছ্বাসে হঠাৎ আঘাত দিল—কহিল, "বেহারি-ঠাকুর-পো এখন কোথায় আছেন, খবর জান?"

মহেন্দ্র নিমেষের মধ্যে বিবর্ণ হইয়া কহিল, "সে ত এখন কলিকাতায় নাই।"

বিনোদিনী। তাহার ঠিকানা কি?

মহেন্দ্র। সে ত কাহাকেও বলিতে চাহে না।

বিনোদিনী। সন্ধান করিয়া কি খবর লওয়া যায় না?

মহেন্দ্র। আমার ত তেমন জরুরি দরকার কিছু দেখি না।

বিনোদিনী। দরকারই কি সব? আশৈশব বন্ধুত্ব কি কিছুই নয়?

মহেন্দ্র। বিহারী আমার আশৈশব বন্ধু বটে, কিন্তু তোমার সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব

দুদিনের—তবু তাগিদটা তোমারই যেন অত্যন্ত বেশি বোধ হইতেছে!

বিনোদিনী। তাহাকে দেখিয়া তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। বন্ধুত্ব কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহা তোমার অমন বন্ধুর কাছ হইতেও শিখিতে পারিলে না?

মহেন্দ্র। সেজন্যে তত দুঃখিত নহি, কিন্তু ফাঁকি দিয়া স্ত্রীলোকের মন হরণ কেমন করিয়া করিতে হয়, সে বিদ্যা তাহার কাছে শিখিলে আজ কাজে লাগিতে পারিত।

বিনোদিনী। সে বিদ্যা কেবল ইচ্ছা থাকিলেই শেখা যায় না, ক্ষমতা থাকা চাই।

মহেন্দ্র। গুরুদেবের ঠিকানা যদি তোমার জানা থাকে ত বলিয়া দাও, এ বয়সে তাঁহার কাছে একবার মন্ত্র লইয়া আসি, তাহার পরে ক্ষমতার পরীক্ষা হইবে।

বিনোদিনী। বন্ধুর ঠিকানা যদি বাহির করিতে না পার, তবে প্রেমের কথা আমার কাছে উচ্চারণ করিয়ো না! বিহারি-ঠাকুর-পোর সঙ্গে তুমি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, তোমাকে কে বিশ্বাস করিতে পারে?

মহেন্দ্র। আমাকে যদি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিতে, তবে আমাকে এত অপমান করিতে পারিতে না! আমার ভালবাসা-সম্বন্ধে যদি এত নিঃসংশয় না হইতে, তবে হয় ত আমার এত অসহ্য দুঃখ ঘটিত না! বিহারী পোষ না মানিবার বিদ্যা জানে, সেই বিদ্যাটা যদি সে এই হতভাগ্যকে শিখাইত, তবে বন্ধুত্বের কাজ করিত!

"বিহারী যে মানুষ, তাই সে পোষ মানিতে পারে না" এই বলিয়া বিনোদিনী খোলা চুল পিঠে মেলিয়া যেমন আলনার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। মহেন্দ্র হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া মুষ্টি বদ্ধ করিয়া রোষগর্জ্জিতস্বরে কহিল—"কেন তুমি আমাকে বারবার অপমান করিতে সাহস কর! এত অপমানের যে কোন প্রতিফল পাও না, সে কি তোমার ক্ষমতায়, না আমার গুণে? আমাকে যদি পশু বলিয়াই স্থির করিয়া থাক, তবে হিংস্র পশু বলিয়াই জানিয়ো! আমি একেবারে আঘাত করিতে জানি না, এত-বড় কাপুরুষ নই!" বলিয়া বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল—তাহার পর বলিয়া উঠিল, "বিনোদ, এখান হইতে কোথাও চল! আমরা বাহির হইয়া পড়ি! পশ্চিমে হোক্, পাহাড়ে হোক্, যেখানে তোমার ইচ্ছা, চল! এখানে বাঁচিবার স্থান নাই! আমি মরিয়া যাইতেছি!"

বিনোদিনী কহিল, "চল এখনি চল—পশ্চিমে যাই!"

মহেন্দ্র। পশ্চিমে কোথায় যাইবে?

বিনোদিনী। কোথাও নহে। এক জায়গায় দুদিন থাকিব না—ঘুরিয়া বেড়াইব।

মহেন্দ্র কহিল, "সেই ভাল, আজ রাত্রেই চল!"

বিনোদিনী সম্মত হইয়া মহেন্দ্রের জন্য রন্ধনের উদ্যোগ করিতে গেল।

মহেন্দ্র বুঝিতে পারিল, বিহারীর খবর বিনোদিনীর চোখে পড়ে নাই। খবরের কাগজে মন দিবার মত অবধানশক্তি বিনোদিনীর এখন আর নাই। পাছে দৈবাৎ সে

খবর বিনোদিনী জানিতে পারে, সেই উদ্বেগে মহেন্দ্র সমস্তদিন সতর্ক হইয়া রহিল।

(৪৭)

বিহারীর খবর লইয়া মহেন্দ্র ফিরিয়া আসিবে, এই স্থির করিয়া বাড়ীতে তাহার জন্য আহার প্রস্তুত হইয়াছিল। অনেক দেরি দেখিয়া পীড়িত রাজলক্ষ্মী উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন। সারারাত ঘুম না হওয়াতে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলেন, তাহার উপরে মহেন্দ্রের জন্য উৎকণ্ঠায় তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিতেছে, দেখিয়া আশা খবর লইয়া জানিল, মহেন্দ্রের গাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছে। কোচ্‌মানের কাছে সংবাদ পাওয়া গেল, মহেন্দ্র বিহারীর বাড়ী হইয়া পটলডাঙার বাসায় গিয়াছে। শুনিয়া রাজলক্ষ্মী দেয়ালের দিকে পাশ ফিরিয়া স্তব্ধ হইয়া শুইলেন। আশা তাঁহার শিয়রের কাছে চিত্রার্পিতের মত স্থির হইয়া বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। অন্যদিন যথাসময়ে আশাকে খাইতে যাইবার জন্য রাজলক্ষ্মী আদেশ করিতেন—আজ আর কিছুই বলিলেন না। কাল রাত্রে তাঁহার কঠিন পীড়া দেখিয়াও মহেন্দ্র যখন বিনোদিনীর মোহে ছুটিয়া গেল, তখন রাজলক্ষ্মীর পক্ষে এ সংসারে প্রশ্ন করিবার, চেষ্টা করিবার, ইচ্ছা করিবার আর কিছুই রহিল না। তিনি বুঝিয়াছিলেন বটে যে, মহেন্দ্র তাঁহার পীড়াকে সামান্য জ্ঞান করিয়াছে; অন্যান্যবার যেমন মাঝে মাঝে রোগ দেখা দিয়া সারিয়া গেছে, এবারেও সেইরূপ একটা ক্ষণিক উপসর্গ ঘটিয়াছে মনে করিয়া মহেন্দ্র নিশ্চিন্ত আছে;—কিন্তু এই আশঙ্কাশূন্য অনুদ্বেগই রাজলক্ষ্মীর কাছে বড় কঠিন বলিয়া মনে হইল। মহেন্দ্র প্রেমোন্মত্ততায় কোন আশঙ্কাকে, কোন কর্ত্তব্যকে মনে স্থান দিতে চায় না, তাই সে মাতার কষ্টকে, পীড়াকে এতই লঘু করিয়া দেখিয়াছে—পাছে জননীর রোগশয্যায় তাহাকে আবদ্ধ হইয়া পড়িতে হয়, তাই সে এমন নির্লজ্জের মত একটু অবকাশ পাইতেই বিনোদিনীর কাছে পলায়ন করিয়াছে! রোগ-আরোগ্যের প্রতি রাজলক্ষ্মীর আর লেশমাত্র উৎসাহ রহিল না—মহেন্দ্রের অনুদ্বেগ যে অমূলক, দারুণ অভিমানে ইহাই তিনি প্রমাণ করিতে চাহিলেন।

বেলা দুটার সময় আশা কহিল "মা, তোমার ঔষুধ খাইবার সময় হইয়াছে।" রাজলক্ষ্মী উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। আশা ঔষুধ আনিবার জন্য উঠিলে তিনি বলিলেন—"ওষুধ দিতে হইবে না বৌমা, তুমি যাও!"

আশা মাতার অভিমান বুঝিতে পারিল,—সেই অভিমান সংক্রামক হইয়া তাহার হৃদয়ের আন্দোলনে দ্বিগুণ দোলা দিতেই আশা আর থাকিতে পারিল না—কান্না চাপিতে চাপিতে গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মী ধীরে ধীরে আশার দিকে পাশ ফিরিয়া তাহার হাতের উপরে সকরুণ মেহে আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে লাগিলেন, কহিলেন—"বৌমা তোমার বয়স অল্প, এখনো তোমার সুখের মুখ দেখিবার সময় আছে। আমার জন্য তুমি আর বৃথা চেষ্টা করিয়ো না বাছা—আমি ত অনেকদিন বাঁচিয়াছি—আর কি হইবে!"

শুনিয়া আশার রোদন আরো উচ্ছ্বসিত

হইয়া উঠিল—সে মুখের উপর আঁচল চাপিয়া ধরিল।

এইরূপে রোগীর গৃহে নিরানন্দ দিন মন্দগতিতে কাটিয়া গেল। অভিমানের মধ্যেও এই দুই নারীর ভিতরে ভিতরে আশা ছিল, এখনি মহেন্দ্র আসিবে। শব্দমাত্রেই উভয়ের দেহে যে একটি চমক-সঞ্চার হইতেছিল, তাহা উভয়েই বুঝিতে পারিতেছিল। ক্রমে দিবাবসানের আলোক অস্পষ্ট হইয়া আসিল; কলিকাতার অন্তঃপুরের মধ্যে সেই গোধূলির যে আভা, তাহাতে আলোকের প্রফুল্লতাও নাই, অন্ধকারের আবরণও নাই—তাহা বিষাদকে গুরুভার এবং নৈরাশ্যকে অশ্রুহীন করিয়া তোলে, তাহা কর্ম্ম ও আশ্বাসের বল হরণ করে, অথচ বিশ্রাম ও বৈরাগ্যের শান্তি আনয়ন করে না। রুগ্ণগৃহের সেই শুষ্ক শ্রীহীন সন্ধ্যায় আশা নিঃশব্দপদে উঠিয়া একটি প্রদীপ আলিয়া ঘরে আনিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "বৌমা, আলো ভাল লাগিতেছে না, প্রদীপ বাহিরে রাখিয়া দাও!"

আশা প্রদীপ বাহিরে রাখিয়া আসিয়া বসিল। অন্ধকার যখন ঘনতর হইয়া এই ক্ষুদ্রকক্ষের মধ্যে বাহিরের অনন্ত রাত্রিকে আনিয়া দিল, তখন আশা রাজলক্ষ্মীকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"মা, তাঁহাকে কি একবার খবর দিব?"

রাজলক্ষ্মী দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "না বৌমা, তোমার প্রতি আমার শপথ রহিল, মহেন্দ্রকে খবর দিয়ো না।"

শুনিয়া আশা স্তব্ধ হইয়া রহিল; তাহার আর কাঁদিবার বল ছিল না।

বাহিরে দাঁড়াইয়া বেহারা কহিল, "বাবুর কাছ হইতে চিঠ্‌ঠি আসিয়াছে!"

শুনিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে রাজলক্ষ্মীর মনে হইল, মহেন্দ্রের হয় ত হঠাৎ একটা কিছু ব্যামো হইয়াছে, তাই সে কোনমতেই আসিতে না পারিয়া চিঠি পাঠাইয়াছে। অনুতপ্ত ও ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "দেখ ত বৌমা, মহীন্ কি লিখিয়াছে?"

আশা বাহিরের প্রদীপের আলোকে কম্পিতহস্তে মহেন্দ্রের চিঠি পড়িল। মহেন্দ্র লিখিয়াছে, কিছুদিন হইতে সে ভাল বোধ করিতেছিল না, তাই সে পশ্চিমে বেড়াইতে যাইতেছে। মাতার অসুখের জন্য বিশেষ চিন্তার কারণ কিছুই নাই। তাঁহাকে নিয়মিত দেখিবার জন্য সে নবীন-ডাক্তারকে বলিয়া দিয়াছে। রাত্রে ঘুম না হইলে বা মাথা ধরিলে কখন্ কি করিতে হইবে, তাহাও চিঠির মধ্যে লেখা আছে—এবং দুই-টিন লঘু ও পুষ্টিকর পথ্য মহেন্দ্র ডাক্তারখানা হইতে আনাইয়া চিঠির সঙ্গে পাঠাইয়াছে। আপাতত গিরিধির ঠিকানায় মাতার সংবাদ অবশ্য অবশ্য জানাইবার জন্য চিঠিতে পুনশ্চের মধ্যে অনুরোধ আছে।

এই চিঠি পড়িয়া আশা স্তম্ভিত হইয়া গেল;—প্রবল ধিক্কার তাহার দুঃখকে অতিক্রম করিয়া উঠিল। এই নিষ্ঠুর বার্ত্তা মাকে কেমন করিয়া শুনাইবে?

আশার বিলম্বে রাজলক্ষ্মী অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "বৌমা, মহীন্ কি লিখিয়াছে, শীঘ্র আমাকে শুনাইয়া যাও!"—বলিতে বলিতে তিনি আগ্রহে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন।

আশা তখন ঘরে আসিয়া ধীরে ধীরে সমস্ত চিঠি পড়িয়া শুনাইল। রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন—"শরীরের কথা মহীন্ কি লিখিয়াছে, ঐখানটা আর একবার পড় ত!"

আশা পুনরায় পড়িল—"কিছুদিন হইতেই আমি তেমন ভাল বোধ করিতেছিলাম না, তাই আমি—"

রাজলক্ষ্মী। থাক্ থাক্, আর পড়িতে হইবে না! ভাল বোধ হইবে কি করিয়া! বুড়ো মা মরেও না, অথচ কেবল ব্যামো লইয়া তাহাকে জ্বালায়! কেন তুমি মহিন্‌কে আমার অসুখের কথা খবর দিতে গেলে? বাড়ীতে ছিল, ঘরের কোণে বসিয়া পড়াশুনা করিতেছিল, কাহারো কোন এলাকায় ছিল না—মাঝে হইতে মার ব্যামোর কথা পাড়িয়া তাহাকে ঘরছাড়া করিয়া তোমার কি সুখ হইল? আমি এখানে মরিয়া থাকিলে তাহাতে কাহার কি ক্ষতি হইত? এত দুঃখেও তোমার ঘটে এইটুকু বুদ্ধি আসিল না!

বলিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িলেন।

বাহিরে মস্‌মস্ শব্দ শোনা গেল। বেহারা কহিল, "ডাক্তারবাবু আয়া।"

ডাক্তার কাশিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আশা তাড়াতাড়ি ঘোম্‌টা টানিয়া খাটের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি হইয়াছে বলুন্ ত?"

রাজলক্ষ্মী ক্রোধের স্বরে কহিলেন, "হইবে আর কি? মানুষকে কি মরিতে দিবে না? তোমার ওষুধ খাইলেই কি অমর হইয়া থাকিব?"

ডাক্তার সান্ত্বনার স্বরে কহিল, "অমর করিতে না পারি, কষ্ট যাহাতে কমে, সে চেষ্টা—"

রাজলক্ষ্মী বলিয়া উঠিলেন, "কষ্টের ভাল চিকিৎসা ছিল, যখন বিধবারা পুড়িয়া মরিত—এখন এ ত কেবল বাঁধিয়া মারা! যাও ডাক্তারবাবু, তুমি যাও—আমাকে আর বিরক্ত করিয়ো না, আমি একলা থাকিতে চাই!"

ডাক্তার ভয়ে ভয়ে কহিল—"আপনার নাড়ীটা একবার—"

রাজলক্ষ্মী অত্যন্ত বিরক্তির স্বরে কহিলেন, "আমি বলিতেছি তুমি যাও! আমার নাড়ী বেশ আছে—এ নাড়ী শীঘ্র ছাড়িবে, এমন ভরসা নাই!"

ডাক্তার অগত্যা ঘরের বাহিরে গিয়া আশাকে ডাকিয়া পাঠাইল। আশাকে নবীন-ডাক্তার রোগের সমস্ত বিবরণ জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে সমস্ত শুনিয়া গম্ভীরভাবে ঘরের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিল। কহিল—"দেখুন, মহেন্দ্র আমার উপর বিশেষ করিয়া ভার দিয়া গেছে। আমাকে যদি আপনার চিকিৎসা করিতে না দেন, তবে সে মনে কষ্ট পাইবে!"

মহেন্দ্র কষ্ট পাইবে, এ কথাটা রাজলক্ষ্মীর কাছে উপহাসের মত শুনাইল—তিনি কহিলেন, "মহিনের জন্য বেশি ভাবিয়ো না! কষ্ট সংসারে সকলকেই পাইতে হয়! এ কষ্টে মহেন্দ্রকে অত্যন্ত বেশি কাতর করিবে না। তুমি এখন যাও ডাক্তার! আমাকে একটু ঘুমাইতে দাও!"

নবীন-ডাক্তার বুঝিল, রোগীকে উত্যক্ত করিলে ভাল হইবে না। ধীরে ধীরে

বাহিরে আসিয়া, যাহা যাহা কর্ত্তব্য, আশাকে উপদেশ দিয়া গেল।

আশা ঘরে ঢুকিতেই রাজলক্ষ্মী কহিলেন; "যাও বাছা, তুমি একটু বিশ্রাম করগে! সমস্তদিন রোগীর কাছে বসিয়া আছ। হারুর মাকে পাঠাইয়া দাও—পাশের ঘরে বসিয়া থাক্!"

আশা রাজলক্ষ্মীকে বুঝিত। ইহা তাঁহার স্নেহের অনুরোধ নহে, ইহা তাঁহার আদেশ;—পালন করা ছাড়া আর উপায় নাই। হারুর মাকে পাঠাইয়া দিয়া অন্ধকারে সে নিজের ঘরে গিয়া শীতল ভূমিশয্যায় শুইয়া পড়িল।

সমস্ত দিনের উপবাসে ও কষ্টে তাহার শরীর-মন শ্রান্ত ও অবসন্ন। পাড়ার বাড়ীতে সেদিন থাকিয়া থাকিয়া বিবাহের বাদ্য বাজিতেছিল। এই সময়ে সানাইয়ে আবার সুর ধরিল। সেই রাগিণীর আঘাতে রাত্রির সমস্ত অন্ধকার যেন স্পন্দিত হইয়া আশাকে বারংবার যেন অভিঘাত করিতে লাগিল। তাহার বিবাহরাত্রির প্রত্যেক ক্ষুদ্র ঘটনাটিও সজীব হইয়া রাত্রির আকাশকে স্বপ্নচ্ছবিতে পূর্ণ করিয়া তুলিল; সেদিনকার আলোক, কোলাহল, জনতা;—সেদিনকার মাল্যচন্দন, নববস্ত্র ও হোমধূমের গন্ধ; নববধূর শঙ্কিত, লজ্জিত, আনন্দিত হৃদয়ের নিগূঢ়-কম্পন—সমস্তই স্মৃতির আকারে যতই তাহাকে চারিদিকে আবিষ্ট করিয়া ধরিল, ততই তাহার হৃদয়ের ব্যথা প্রাণ পাইয়া বল করিতে লাগিল। দারুণ দুর্ভিক্ষে ক্ষুধিত বালক যেমন খাদ্যের জন্য মাতাকে আঘাত করিতে থাকে, তেমনি জাগ্রত সুখের স্মৃতি আপনার খাদ্য চাহিয়া আশার বক্ষে বারংবার সরোদনে করাঘাত করিতে লাগিল! অবসন্ন আশাকে আর পড়িয়া থাকিতে দিল না। দুই হাত জোড় করিয়া দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতে গিয়া সংসারে তাহার একমাত্র প্রত্যক্ষদেবতা মাসিমার পবিত্র স্নিগ্ধমূর্ত্তি আশার অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন হৃদয়ের মধ্যে আবির্ভূত হইল। পুনরায় সংসারের দুঃখ-ঝঞ্চটে সেই তাপসীকে আহ্বান করিয়া আনিবে না, এতদিন ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা ছিল। কিন্তু আজ সে আর কোথাও কোন উপায় দেখিতে পাইল না—আজ তাহার চতুর্দ্দিকে ঘনায়িত নিবিড় দুঃখের মধ্যে আর রন্ধ্রমাত্র ছিল না। তাই আজ সে ঘরের মধ্যে আলো জ্বালিয়া কোলের উপর একখানা খাতায় চিঠির কাগজ রাখিয়া ঘন-ঘন চোখের জল মুছিতে মুছিতে চিঠি লিখিতে লাগিল।—

"শ্রীচরণকমলেষু—

মাসিমা, তুমি ছাড়া আজ আমার আর কেহ নাই। একবার আসিয়া তোমার কোলের মধ্যে এই দুঃখিনীকে টানিয়া লও—নহিলে আমি কেমন করিয়া বাঁচিব? আর কি লিখিব, জানি না। তোমার চরণে আমার শতসহস্রকোটি প্রণাম।

তোমার স্নেহের
চুনি।"

(৪৮)

অন্নপূর্ণা কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া অতি ধীরে ধীরে রাজলক্ষ্মীর ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইলেন। মাঝখানের

বিরোধ-বিচ্ছেদ-সত্ত্বেও অন্নপূর্ণাকে দেখিয়া রাজলক্ষ্মী যেন হারান-ধন ফিরিয়া পাইলেন। ভিতরে-ভিতরে তিনি যে নিজের অলক্ষ্যে-অগোচরে অন্নপূর্ণাকে চাহিতেছিলেন, অন্নপূর্ণাকে পাইয়া তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার এতদিনের অনেক শ্রান্তি—অনেক ক্ষোভ যে কেবল অন্নপূর্ণার অভাবে, অনেক-দিনের পরে আজ তাহা তাঁহার কাছে মুহূর্ত্তের মধ্যে সুস্পষ্ট হইল,—মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার সমস্ত ব্যথিত হৃদয় তাহার চিরন্তন স্থানটি অধিকার করিল। মহেন্দ্রের জন্মের পূর্ব্বেও এই দুটি জা যখন বধূভাবে এই পরিবারের সমস্ত সুখদুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন—পূজায়, উৎসবে, শোকে, মৃত্যুতে, উভয়ে এই সংসাররথে একত্রে যাত্রা করিয়াছিলেন—তখনকার সেই ঘনিষ্ঠ সখিত্ব রাজলক্ষ্মীর হৃদয়কে আজ মুহূর্ত্তের মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। যাঁহার সঙ্গে সুদূর অতীতকালে একত্রে জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, নানা ব্যাঘাতের পর সেই বাল্যসহচরীই পরম দুঃখের দিনে তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী হইলেন—তখনকার সমস্ত সুখদুঃখের, সমস্ত প্রিয়ঘটনার এই একটিমাত্র স্মরণাশ্রয় রহিয়াছে। যাহার জন্য রাজলক্ষ্মী ইহাকেও নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করিয়াছিলেন, সেই বা আজ কোথায়!

অন্নপূর্ণা রোগিণীর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার দক্ষিণহস্ত হস্তে লইয়া কহিলেন—"দিদি!"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন—"মেজ-বৌ!" বলিয়া আর তাঁহার কথা বাহির হইল না। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আশা এই দৃশ্য দেখিয়া আর থাকিতে পারিল না—পাশের ঘরে গিয়া মাটিতে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রাজলক্ষ্মী বা আশার কাছে অন্নপূর্ণা মহেন্দ্রের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন পাড়িতে সাহস করিলেন না। সাধুচরণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মামা, মহিন্ কোথায়?"

তখন সাধুচরণ বিনোদিনী ও মহেন্দ্রের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন। অন্নপূর্ণা সাধুচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিহারীর কি খবর?"

সাধুচরণ কহিলেন, "অনেকদিন তিনি আসেন নাই—তাঁহার খবর ঠিক বলিতে পারি না।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "একবার বিহারীর বাড়ীতে গিয়া তাহার সংবাদ জানিয়া আইস।"

সাধুচরণ ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "তিনি বাড়ীতে নাই, বলিতে গঙ্গার ধারে বাগানে গিয়াছেন।"

অন্নপূর্ণা নবীন-ডাক্তারকে ডাকিয়া রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। ডাক্তার কহিল, "হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতার সঙ্গে উদরী দেখা দিয়াছে, মৃত্যু অকস্মাৎ কখন্ আসিবে, কিছুই বলা যায় না।"

সন্ধ্যার সময় রাজলক্ষ্মীর রোগের কষ্ট যখন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, তখন অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, একবার নবীন-ডাক্তারকে ডাকাই?"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "না মেজবৌ, নবীন-ডাক্তার আমার কিছুই করিতে পারিবে না।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "তবে কাহাকে তুমি ডাকিতে চাও, বল।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "[illegible] বিহারীকে [illegible]!"

অন্নপূর্ণার বক্ষের মধ্যে আঘাত লাগিল। সেদিন দূরপ্রবাসে সন্ধ্যাবেলায় তিনি দ্বারের বাহির হইতে অন্ধকারের মধ্যে বিহারীকে অপমানের সহিত বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন, সেই বেদনা তিনি আজ পর্য্যন্ত ভুলিতে পারেন নাই। বিহারী আর কখনই তাঁহার দ্বারে ফিরিয়া আসিবে না। ইহজীবনে আর যে কখনো সেই অনাদরের প্রতিকার করিতে অবসর পাইবেন, এ আশা তাঁহার মনে ছিল না।

অন্নপূর্ণা একবার ছাদের উপর মহেন্দ্রের ঘরে গেলেন। বাড়ীর মধ্যে এই ঘরটিই ছিল আনন্দনিকেতন। আজ সে ঘরের কোন শ্রী নাই—বিছানাপত্র বিশৃঙ্খল, সাজ-সজ্জা অনাদৃত, ছাদের টবে কেহ জল দেয় না, গাছগুলি শুকাইয়া গেছে।

মাসিমা ছাদে গিয়াছেন বুঝিয়া আশাও ধীরে ধীরে তাঁহার অনুসরণ করিল। অন্নপূর্ণা তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া তাহার মস্তকচুম্বন করিলেন। আশা নত হইয়া দুই হাতে তাঁহার দুই পা ধরিয়া বারবার তাঁহার পায়ে মাথা ঠেকাইল। কহিল, "মাসিমা, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আমাকে বল দাও! মানুষ যে এত কষ্ট সহ্য করিতে পারে, তাহা আমি কোনকালে ভাবিতেও পারিতাম না! মাগো! এমন আর কতদিন সহিবে!"

অন্নপূর্ণা সেইখানেই মাটিতে বসিলেন,—আশা তাঁহার পায়ে মাথা দিয়া লুটাইয়া পড়িল। অন্নপূর্ণা আশার মাথা কোলের উপরে তুলিয়া লইলেন—এবং কোন কথা না কহিয়া নিস্তব্ধভাবে জোড়হাত করিয়া দেবতাকে স্মরণ করিলেন।

অন্নপূর্ণার স্নেহসিঞ্চিত নিঃশব্দ আশীর্ব্বাদ আশার গভীর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেকদিন পরে শান্তি আনয়ন করিল। তাহার মনে হইল, তাহার অভীষ্ট যেন সিদ্ধপ্রায় হইয়াছে। দেবতা তাহার মত মূঢ়কে অবহেলা করিতে পারেন, কিন্তু মাসিমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না।

হৃদয়ের মধ্যে আশ্বাস ও বল পাইয়া আশা অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বসিল। কহিল, "মাসিমা, বিহারি-ঠাকুরপোকে একবার আসিতে চিঠি লিখিয়া দাও!"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "না, চিঠি লেখা হইবে না।"

আশা। তবে তাঁহাকে খবর দিবে কি করিয়া?

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "কাল আমি বিহারীর সঙ্গে নিজে দেখা করিতে যাইব।"

(৪৯)

বিহারী যখন পশ্চিমে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তখন তাহার মনে হইল, একটা কোন কাজে নিজেকে আবদ্ধ না করিলে তাহার আর শান্তি নাই। সেই মনে করিয়া কলিকাতার দরিদ্র কেরাণীদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ভার সে গ্রহণ করিয়াছে। গ্রীষ্মকালের ডোবার মাছ যেমন অল্পজল পাঁকের মধ্যে কোনমতে শীর্ণ হইয়া খাবি খাইয়া থাকে, গলি-নিবাসী অল্পাশী পরিবারভারগ্রস্ত কেরাণীর বঞ্চিতজীবন সেইরূপ;—সেই বিবর্ণ

কৃশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ভদ্রমণ্ডলীর প্রতি বিহারীর অনেকদিন হইতে করুণদৃষ্টি ছিল—তাহাদিগকে বিহারী বনের ছায়াটুকু ও গঙ্গার খোলা হাওয়া দান করিবার সঙ্কল্প করিল।

বালিতে বাগান লইয়া চীনে মিস্ত্রির সাহায্যে সে সুন্দর করিয়া ছোট ছোট কুটীর তৈরি করাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু তাহার মন শান্ত হইল না। কাজে প্রবৃত্ত হইবার দিন তাহার যতই কাছে আসিতে লাগিল, ততই তাহার চিত্ত আপন সঙ্কল্প হইতে বিমুখ হইয়া উঠিল। তাহার মন কেবলি বলিতে লাগিল, "এ কাজে কোন সুখ নাই, কোন রস নাই, কোন সৌন্দর্য্য নাই,—ইহা কেবল শুষ্ক ভারমাত্র!" কাজের কল্পনা বিহারীকে কখনো ইতিপূর্ব্বে এমন করিয়া ক্লিষ্ট করে নাই।

একদিন ছিল, যখন বিহারীর বিশেষ কিছুই দরকার ছিল না; তাহার সম্মুখে যাহা কিছু উপস্থিত হইত, তাহার প্রতিই অনায়াসে সে নিজেকে নিযুক্ত করিতে পারিত। এখন তাহার মনে একটা-কি ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে, আগে তাহাকে নিবৃত্ত না করিয়া অন্য কিছুতেই তাহার আসক্তি হয় না! পূর্ব্বেকার অভ্যাসমতে সে এটা-ওটা নাড়িয়া দেখে, পরক্ষণেই সে-সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কৃতি পাইতে চায়।

বিহারীর মধ্যে যে যৌবন নিশ্চলভাবে সুপ্ত হইয়া ছিল, যাহার কথা সে কখনো চিন্তাও করে নাই, বিনোদিনীর সোণার কাঠিতে সে আজ জাগিয়া উঠিয়াছে। সদ্যোজাত গরুড়ের মত সে আপন খোরাকের জন্য সমস্ত জগৎটাকে ঘাঁটিয়া বেড়াইতেছে। এই সুপ্ত প্রাণীর সহিত বিহারীর পূর্ব্ব-পরিচয় ছিল না, ইহাকে লইয়া সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে; এখন কলিকাতার ক্ষীণ-জীর্ণ স্বল্পায়ু কেরাণীদের লইয়া সে কি করিবে?

আষাঢ়ের গঙ্গা সম্মুখে বহিয়া চলিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া পরপারে নীলমেঘ ঘনশ্রেণী গাছপালার উপরে ভারাবনত নিবিড়ভাবে আবিষ্ট হইয়া উঠে; সমস্ত নদীতল ইস্পাতের তরবারির মত কোথাও বা উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, কোথাও বা আগুনের মত ঝক্‌ঝক্ করিতে থাকে। নববর্ষার এই সমারোহের মধ্যে যেমনি বিহারীর দৃষ্টি পড়ে, অমনি তাহার হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া আকাশের এই নীল-স্নিগ্ধ আলোকের মধ্যে কে একাকিনী বাহির হইয়া আসে, কে তাহার স্নানসিক্ত ঘনতরঙ্গায়িত কৃষ্ণকেশ উন্মুক্ত করিয়া দাঁড়ায়, বর্ষাকাশ হইতে বিদীর্ণ-মেঘচ্ছুরিত সমস্ত বিচ্ছিন্ন রশ্মিকে কুড়াইয়া লইয়া কে একমাত্র তাহারই মুখের উপরে অনিমেষ-দৃষ্টির দীপ্ত-কাতরতা প্রসারিত করে!

পূর্ব্বের যে জীবনটা তাহার সুখে-সন্তোষে কাটিয়া গেছে, আজ বিহারী সেই জীবনটাকে পরম ক্ষতি বলিয়া মনে করিতেছে। এমন কত মেঘের সন্ধ্যা, এমন কত পূর্ণিমার রাত্রি আসিয়াছিল, তাহারা বিহারীর শূন্যহৃদয়ের দ্বারের কাছে আসিয়া সুধাপাত্রহস্তে নিঃশব্দে ফিরিয়া গেছে,—সেই সকল দুর্লভ শুভক্ষণে কত সঙ্গীত অনারব্ধ, কত উৎসব অসম্পন্ন হইয়াছে, তাহার আর শেষ নাই! বিহারীর মনে যে সকল পূর্ব্বস্মৃতি ছিল,

বিনোদিনী সেদিনকার উষ্ণত্ত [illegible]বনের রক্তিম আভা [illegible] সেগুলিকে আজ এমন বিবর্ণ অকিঞ্চিৎকর করিয়া দিয়া গেল! মহেন্দ্রের ছায়ার মত হইয়া জীবনের অধিকাংশ দিন কেমন করিয়া কাটিয়াছিল? তাহার মধ্যে কি চরিতার্থতা ছিল! প্রেমের বেদনায় সমস্ত জল-স্থল-আকাশের কেন্দ্রকুহর হইতে যে এমন রাগিণীতে এমন বাঁশী বাজে, তাহা ত অচেতন বিহারী পূর্ব্বে কখনো অনুমান করিতেও পারে নাই! যে বিনোদিনী দুই বাহুতে বেষ্টন করিয়া একমুহূর্ত্তে অকস্মাৎ এই অপরূপ সৌন্দর্য্যলোকে বিহারীকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তাহাকে সে আর কেমন করিয়া ভুলিবে? তাহার দৃষ্টি, তাহার আকাঙ্ক্ষা আজ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার ব্যাকুল ঘননিশ্বাস বিহারীর রক্তস্রোতকে অহরহ তরঙ্গিত করিয়া তুলিতেছে এবং তাহার স্পর্শের সুকোমল উত্তাপ বিহারীকে বেষ্টন করিয়া পুলকাবিষ্ট হৃদয়কে ফুলের মত ফুটাইয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু তবু সেই বিনোদিনীর কাছ হইতে বিহারী আজ এমন দূরে রহিয়াছে কেন? তাহার কারণ এই, বিনোদিনী যে সৌন্দর্য্যরসে বিহারীকে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছে, সংসারের মধ্যে বিনোদিনীর সহিত সেই সৌন্দর্য্যের উপযুক্ত কোন সম্বন্ধ সে কল্পনা করিতে পারে না। পদ্মকে তুলিতে গেলে পঙ্ক উঠিয়া পড়ে। কি বলিয়া তাহাকে এমন কোথায় স্থাপন করিতে পারে, যেখানে সুন্দর বীভৎস হইয়া না উঠে! তাহা ছাড়া মহেন্দ্রের সহিত যদি কাড়াকাড়ি বাধিয়া যা[illegible] তবে সমস্ত ব্যাপারটা এতই কুৎসিত ত[illegible] ধারণ করিবে যে, সে সম্ভাবনা বিহারী মনের প্রান্তেও স্থান দিতে পারে না। তাই বিহারী নিভৃত গঙ্গাতীরে বিশ্বসঙ্গীতের মাঝখানে তাহার মানসী প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনার হৃদয়কে ধূপের মত দগ্ধ করিতেছে। পাছে এমন কোন সংবাদ পায়, যাহাতে তাহার সুখস্বপ্নজাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাই সে চিঠি লিখিয়া বিনোদিনীর কোন খবরও লয় না!

তাহার বাগানের দক্ষিণ প্রান্তে ফলপূর্ণ জামগাছের তলায় মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতে বিহারী চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল, সম্মুখ দিয়া কুঠির পাল্কী যাতায়াত করিতেছিল, তা-ই সে অলসভাবে দেখিতেছিল। ক্রমে বেলা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। চাকর আসিয়া, আহারের আয়োজন করিবে কি না, জিজ্ঞাসা করিল—বিহারী কহিল, "এখন থাক্!" মিস্ত্রির সর্দ্দার আসিয়া বিশেষ পরামর্শের জন্য তাহাকে কাজ দেখিতে আহ্বান করিল—বিহারী কহিল—"আর একটু পরে!"

এমন-সময় বিহারী হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া দেখিল, সম্মুখে অন্নপূর্ণা। শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল—দুই হাতে তাঁহার পা চাপিয়া ধরিয়া ভূতলে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। অন্নপূর্ণা তাঁহার দক্ষিণহস্ত দিয়া পরমস্নেহে বিহারীর মাথা ও গা স্পর্শ করিলেন। [illegible] স্বরে কহি[illegible] "বিহা[illegible]

করিয়া জল পড়িতে লাগিল। বিহারী ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কাকীমা, তোমার এখনো খাওয়া হয় নাই?"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "না, এখনো আমার সময় হয় নাই।"

বিহারী কহিল—"চল, আমি রাঁধিবার জোগাড় করিয়া দিইগে। আজ অনেকদিন পরে তোমার হাতের রান্না এবং তোমার পাতের প্রসাদ খাইয়া বাঁচিব।"

মহেন্দ্র-আশার সম্বন্ধে বিহারী কোন কথাই উত্থাপন করিল না। অন্নপূর্ণা একদিন স্বহস্তে বিহারীর নিকটে সেদিক্‌কার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। অভিমানের সহিত সেই নিষ্ঠুর নিষেধ সে পালন করিল।

আহারান্তে অন্নপূর্ণা কহিলেন, "নৌকা ঘাটেই প্রস্তুত আছে বিহারি, এখন একবার কলিকাতায় চল্।"

বিহারী কহিল, "কলিকাতায় আমার কোন্ প্রয়োজন?"

অন্নপূর্ণা কহিলেন—"দিদির বড় অসুখ, তিনি তোকে দেখিতে চাহিয়াছেন।"

শুনিয়া বিহারী চকিত হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, "মহিন্‌-দা কোথায়?"

অন্নপূর্ণা [illegible] কহিলেন - "সে কলিকাতায় [illegible] গেছে।"

নাই, পশ্চিমে চলিয়া গেছে।

শুনিয়া মুহূর্ত্তে বিহারীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে চুপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই কি সকল কথা জানিস্ না?"

বিহারী কহিল—"কতকটা জানি, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জানি না!"

তখন অন্নপূর্ণা, বিনোদিনীকে লইয়া মহেন্দ্রের পশ্চিমে পলায়নের বার্ত্তা বলিলেন। বিহারীর চক্ষে তৎক্ষণাৎ জল-স্থল-আকাশের সমস্ত রং বদ্‌লাইয়া গেল, তাহার কল্পনা-ভাণ্ডারের সমস্ত সঞ্চিতরস মুহূর্ত্তে তিক্ত হইয়া উঠিল। 'মায়াবিনী বিনোদিনী কি সেদিনকার সন্ধ্যাবেলায় আমাকে লইয়া খেলা করিয়া গেল? তাহার ভালবাসার আত্ম-সমর্পণ সমস্তই ছলনা! সে তাহার গ্রাম ত্যাগ করিয়া নির্লজ্জভাবে মহেন্দ্রের সঙ্গে একাকিনী পশ্চিমে চলিয়া গেল! ধিক্ তাহাকে, এবং ধিক্ আমাকে, যে আমি-মূঢ় তাহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্বাস করিয়াছিলাম!'

হায় মেঘাচ্ছন্ন আষাঢ়ের সন্ধ্যা, হায় গতবৃষ্টি পূর্ণিমার রাত্রি, তোমাদের ইন্দ্রজাল কোথায় গেল!

ক্রমশ।

সার সত্যের আলোচনা।

মোট-বন্ধন।

সার সত্যের আলোচনার প্রথম উপক্রমে সত্য-জগৎ এবং ভাব-জগতের আলোচনা-প্রসঙ্গে দেখানো হইয়াছে যে, একই জগৎ এক দিকে সৎস্বরূপের অধিষ্ঠানে সত্তাবান্, সুতরাং সত্য কিনা সৎসম্পর্কীয়, * আর-এক দিকে ভিন্ন ভিন্ন-ব্যক্তির নিকটে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগত ভাব! সেই সঙ্গে এটাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, ভিন্ন ভিন্ন ভাব-জগতের সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাতা যেমন ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা, একমাত্র অদ্বিতীয় সত্য-জগতের সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাতা তেমনি একমাত্র অদ্বিতীয় পরমাত্মা।

দ্বিতীয় উপক্রমে—জীবাত্মা হইতেই যাত্রারম্ভ করা বিধেয় এবং জীবাত্মা হইতে যাত্রারম্ভ করিতে হইলে জীবাত্মা আপনার জ্ঞানে আপনি কিরূপ প্রতীয়মান হ'ন, তাহাই সর্ব্বাগ্রে আলোচ্য এইরূপ বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া দেখানো হইয়াছে যে, জীবাত্মার প্রধানতম তিনটি অবস্থা হ'চ্চে জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি; আর, জীবাত্মা আপনার নিকটে আপনি প্রকাশ পাইবার সময় সেই তিন বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে একই অভিন্ন কর্ত্তা ভোক্তা এবং জ্ঞাতা রূপে প্রকাশ পা'ন। সেই সঙ্গে এটাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, ভোগ, কর্ম্ম এবং জ্ঞান, এই তিনটি ব্যাপার জীবাত্মার তিনটি প্রধানতম গুণ-স্ফূর্ত্তি।

তৃতীয় উপক্রমে ভোগ কর্ম্ম এবং জ্ঞান, এই তিনটি মৌলিক ব্যাপারের সহিত প্রাণ মন এবং বুদ্ধি, এই তিনটি অন্তঃকরণ-বৃত্তিরা থাপে-থাপে মিল রহিয়াছে দেখাইয়া—প্রাণ মন এবং বুদ্ধির ভেদাভেদ-সম্বন্ধীয় সার-কথাগুলি বিস্তার-পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে; বলিতে আরম্ভ করিয়া তিনের মধ্যগত বৈশেষিক লক্ষণগুলির আলোচনা-কার্য্য প্রথম চোটে যতদূর সম্ভবে, তাহা এক-প্রকার করিয়া-চোকা হইয়াছে। দেখানো হইয়াছে যে,—

(১) প্রাণ ভোগ-প্রধান; মন ক্রিয়া-প্রধান, অথবা যাহা একই কথা—প্রবৃত্তি-প্রধান; বুদ্ধি জ্ঞান-প্রধান।

(২) প্রাণের গতি তরঙ্গের উত্থান-পতনের ন্যায় স্বস্থানেই আবদ্ধ; অর্থাৎ প্রাণ-ক্রিয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গ্রহণ-বর্জ্জনের ন্যায় প্রকৃতির বাঁধা নিয়মে নিরন্তর সমভাবে

---

* দুগ্ধ, দধি, ঘৃত প্রভৃতি গোসম্পর্কীয় পদার্থসকল যে-হিসাবে গব্য-শব্দের বাচ্য—জগতের যাবতীয় পদার্থ সেই হিসাবে সত্য-শব্দের বাচ্য। "সত্য" কিনা সৎসম্পর্কীয়। "সৎ" কিনা অনাদি অনন্ত অপরিবর্ত্তনীয় নিত্যবস্তু।

† অনতিপরে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, প্রাণ অন্তঃকরণেরই সামিল।

চলিতে থাকে। মনের গতি বিক্ষেপাত্মিকা; মনঃক্রিয়া ভাবের-অনুবর্ত্তিতা-মূলক * প্রতিযোগের পথানুবর্ত্তী। বুদ্ধির গতি সমাধি-মুখী;—বুদ্ধিক্রিয়া অগ্রপশ্চাৎ-বিবেচনা-মূলক সংযোগের পথানুবর্ত্তী।

(৩) প্রাণের বিশেষ কার্য্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায় সুষুপ্তির অবস্থায়; মনের—স্বপ্নাবস্থায়; বুদ্ধির—জাগরিতাবস্থায়। শেষোক্ত কথাটি আমাদের দেশে এমনি সুপ্রসিদ্ধ যে, জাগরিতাবস্থার নামই প্রবুদ্ধ অবস্থা।

(৪) প্রাণের বিচরণ-ক্ষেত্র অব্যক্ত সত্তা; মনের—প্রাতিভাসিক সত্তা; বুদ্ধির—বাস্তবিক সত্তা।

প্রাণ, মন এবং বুদ্ধির পৃথক্ পৃথক্ বৈশেষিক লক্ষণগুলি এক-তো এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখানো হইয়াছে; তা ছাড়া—স্থানে স্থানে তিনের মধ্যস্থিত একাত্মভাবের কতক কতক আভাস প্রদান করিতেও ত্রুটি করা হয় নাই। কিন্তু তাহা আভাস-মাত্র; তা বই—তাহা জিজ্ঞাসু ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারিবার মতো পরিষ্কার অভিজ্ঞপ্তি † নহে। কর্ত্তব্য হ'চ্ছে এখন—তিনের মধ্যগত একাত্মভাবের প্রকৃত বৃত্তান্তটি স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলা, তাহা হইলেই পাঠক এবং লেখকের মধ্যে বোঝা-পড়া'র গোলোযোগ মিটিয়া যাইবে;—লেখক কোন্ কথা কি অর্থে বলিয়াছে, তাহা খুঁজিয়া-পাতিয়া বাহির করিবার জন্য পাঠককে আর অন্ধকারে হাতড়াইতে হইবে না।

প্রাণের অব্যক্ত-চেতনতা।

একটু স্থির-চিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, প্রাণ দুই নৌকায় পা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে; এক নৌকা হ'চ্ছে চেতনা, আর-এক নৌকা জড়তা। প্রাণের গতিও তদ্বৎ—অর্থাৎ দুই-নৌকায়-পা-দেওয়া রকমের। সে গতি আর-কিছু-না—নিশ্বাস হইতে প্রশ্বাস, প্রশ্বাস হইতে নিশ্বাস; অন্নগ্রাহী কণ্ঠনলীর সঙ্কোচ হইতে বিকোচ, বিকোচ হইতে সঙ্কোচ; হৃৎপিণ্ডের উত্থান হইতে পতন, পতন হইতে উত্থান; এইরূপে এপাশ-ওপাশ করিয়া হেলন-দোলন; এক কথায়—স্পন্দন।

সম্প্রতি পাশ্চাত্য-দর্শন-রাজ্যে একটি পুরাতন কথাকে নূতন উপাধি দিয়া সাজানো হইয়াছে। উপাধিটি হ'চ্ছে Subconscious। Subconsciousness একপ্রকার অবগুণ্ঠনবতী সন্ধ্যাচ্ছায়া; না তাহা ব্যক্ত-চেতনা'র দিবালোক—না তাহা অচেতনতা'র নিশান্ধকার—পরন্তু দুয়ের মাঝামাঝি; তাহা অব্যক্ত চেতনা। এই Subconscious উপাধিটি প্রাণের দুই-নৌকায়-ভর-দেওয়া প্রকৃতির সহিত দিব্য সংলগ্ন হয়। চলিত ভাষায় কথোপকথনের সময় প্রাণ এবং মনের মধ্যগত প্রভেদকে গ্রাহ্যের মধ্যে বড়-একটা আমল দেওয়া হয় না। "মন ঠাণ্ডা হ'ল", "প্রাণ ঠাণ্ডা হ'ল", এ দুই কথার মধ্যে,

* ভাবের অনুবর্ত্তিতা = Association of ideas.

† অভিজ্ঞপ্তি = অভিজ্ঞান জন্মাইয়া দেওয়া'র ব্যাপার = চিনাইয়া দেওয়া'র ব্যাপার।

অথবা "মন চায়," "প্রাণ চায়," এই দুই কথার মধ্যে—ধরা-পাক্‌ড়া করিলে—প্রভেদ অস্বীকার করিতে পারা যায় না সত্য, কিন্তু তথাপি—লৌকিক ধাঁচা'র কথাবার্ত্তার মাঝখানে সে প্রভেদ কাহারো বড়-একটা গ্রাহ্যের মধ্যে আসে না। পক্ষান্তরে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, দর্শনাদি শাস্ত্রের আলোচনা-কালে মন এবং বুদ্ধিকেই কেবল অন্তঃকরণের কোটায় স্থান দেওয়া হয়; প্রাণকে মনে করা হয়, অচেতনতা-প্রযুক্ত অন্তঃকরণের কোটায় স্থান পাইবার অনুপযুক্ত। প্রাণ-বেচারীর প্রতি এইরূপ শক্ত আইন-জারি করিয়া তাহার প্রাণে আঘাত করা বড় যে ভাল কাজ, তাহা বলিতে পারি না। সত্য বটে—প্রাণ অব্যক্ত-চেতন (Subconscious); কিন্তু সেই অপরাধে তাহাকে সর্ব্বসমক্ষে একান্ত-পক্ষেই অচেতন (Unconscious) বলিয়া ঘোঁটা দিয়া অন্তঃকরণের কোটা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড বিধান করা হয়—ইহা যখন বুঝিতেই পারা যাইতেছে, তখন, জানিয়া-শুনিয়া কে এমন নির্ব্বোধ বিচারপতি যে, তিনি সামান্য অপরাধে ঐরূপ অতি-দণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিয়া আপীল-আদালতের বিচারে নিজে দণ্ডার্হ হইবেন? ইহার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতের ধর্ম্মাসন হইতে যেরূপ সুবিচার-প্রাপ্তির প্রত্যাশা করা যায়, তাহা এই:—

পরীক্ষারূপী প্রবীণ সাক্ষীর জবানবন্দিতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, প্রাণ অব্যক্ত-চেতন। তবেই হইতেছে যে, প্রাণ একান্ত-পক্ষেই অচেতন নহে। তাহা যখন নহে—একান্ত-পক্ষেই অচেতন যখন নহে—তখন অবশ্য প্রাণ এক হিসাবে অচেতন, আর-এক হিসাবে সচেতন। প্রাণ যে হিসাবে সচেতন, সে হিসাবে তাহা বুদ্ধি এবং মনের দলভুক্ত, সুতরাং অন্তঃকরণের কোটায় স্থান পাইবার অনুপযুক্ত নহে।

উচ্চ আদালতের প্রথানুযায়ী এইরূপ নিক্তির ওজনের বিচারকে যথার্থ ন্যায়-বিচার জানিয়া তদনুসারে আমি বুদ্ধি, মন এবং প্রাণ, তিনকেই অন্তঃকরণের কোটায় একসঙ্গে বসাইলাম—একসঙ্গে বসাইয়া তিন ভ্রাতার একত্র মেলামেশা-গতিকে তাহাদের ভ্রাতৃসৌহার্দ্দের ম্লানমুখ উজ্জ্বল হইয়া ওঠে কি না, তাহার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলাম। পরীক্ষা করিয়া পাইলাম কি—সেইটিই এখন জিজ্ঞাস্য! পাইলাম যে কি, তাহা "ফলেন পরিচীয়তে"; অতএব নিম্নের উদাহরণগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা হো'ক্।

প্রাণ এবং মনের একাত্মভাব।

প্রথম উদাহরণ।

সুনিদ্রার সময় যখন নিদ্রিত ব্যক্তির নিশ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া স্বভাব-গুণে আপনা-আপনি চলিতে থাকে, তখন তাহাকে বলা হয় প্রাণ-ক্রিয়া। পক্ষান্তরে, প্রাণায়াম-সাধনের সময় যখন সাধকের নিশ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া শাস্ত্রোক্ত নিয়মে পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে বলা হয় মানসী ক্রিয়া। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, নিদ্রিত ব্যক্তির কথা এবং প্রাণায়াম-সাধকের কথা ছাড়িয়া দিয়া, জাগ্রৎ-কালে লোকে সচরাচর যে-ভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ-বর্জ্জন করে,

সে-ভাবের শ্বাস-ক্রিয়াকে কোন্ শ্রেণীর ক্রিয়া বলিব? প্রাণ-ক্রিয়া বলিব, না মনঃক্রিয়া বলিব? আমি এই যে নিশ্বাস-প্রশ্বাস টানিতেছি-ফেলিতেছি—টানিতেছি-ফেলিতেছি, কিসের বলে? মনের বলে—না প্রাণের বলে? ইহার উত্তর এই যে, মনে করিলেই মনের বলে, মনে না করিলেই প্রাণের বলে। এরূপ স্থলে প্রাণ এবং মনের অধিকারের সীমা-নির্দ্দেশ করা এক প্রকার অসাধ্য-সাধন। আমি যখন দেখি যে, জাগরিতাবস্থায় ইচ্ছা করিলেই আমি আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের পরিচালনা স্থগিত করিতে পারি, তখন আমি বলি যে, আমার এই জাগরিতাবস্থার শ্বাস-ক্রিয়াতে আমার মন নিরবচ্ছেদে লাগিয়া আছে; সংক্ষেপে—জাগরিতাবস্থার শ্বাস-ক্রিয়া মনস্কা। পক্ষান্তরে, আমি যখন দেখি যে, জাগরিতাবস্থাতেও আমার শ্বাস-ক্রিয়া আমার মনোযোগের অপেক্ষা না করিয়া আপনা-আপনি চলিতে থাকে; তখন আমি আর-এক কথা বলি; তখন বলি যে, জাগরিতাবস্থার শ্বাস-ক্রিয়া সুষুপ্ত অবস্থার শ্বাস-ক্রিয়ারই যমক সহোদর;—তাহাও অমনস্কা। তবেই হইতেছে যে, জাগরিতাবস্থার শ্বাস-ক্রিয়া এক হিসাবে মনস্কা, আর-এক হিসাবে অমনস্কা; যে-হিসাবে তাহা মনস্কা, সেই হিসাবে তাহা মনঃক্রিয়া; যে-হিসাবে তাহা অমনস্কা, সেই হিসাবে তাহা প্রাণ-ক্রিয়া।

দ্বিতীয় উদাহরণ।

একটি দুই-বৎসরের বালক মাতার ক্রোড়ে ঘুমাইয়া-ঘুমাইয়া নিমীলিত চক্ষে স্তনপান করিতে করিতে জাগিয়া-উঠিয়া উন্মীলিত চক্ষে স্তনপান করিতে লাগিল। এরূপ স্থলে বালকটির জাগরিতাবস্থায় সুপ্তাবস্থারই পান-ক্রিয়ার লেজুড় চলিতেছে, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। তবেই হইতেছে যে, জাগরিতাবস্থাতেও বালকটির পানক্রিয়া অমনস্কা। আর-এক দিকে দেখা যায় যে, মাতা যখন কোনো আবশ্যক গৃহকার্য্যের অনুরোধে ক্রোড়স্থ বালকটির মুখ হইতে স্তনাগ্র ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা করেন—বালকটি তখন কিছুতেই তাহা ছাড়িতে চাহে না; ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, বালকটি মনের সহিত স্তনপান করিতেছে, সুতরাং তাহার পান-ক্রিয়া সমনস্কা। এবারেও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, জাগ্রৎকালের স্তনপান-ক্রিয়া এক হিসাবে অমনস্কা, আর এক হিসাবে সমনস্কা। যে-হিসাবে তাহা অমনস্কা, সেই হিসাবে তাহা প্রাণ-ক্রিয়া, যে-হিসাবে তাহা সমনস্কা, সেই হিসাবে তাহা মনঃক্রিয়া।

তৃতীয় উদাহরণ।

এক জন গায়ক যখন নিভৃত তরুতলে ভাবে ভোর হইয়া সঙ্গীত-লহরীতে প্রাণ-মন ঢালিয়া দিতেছে, তখন মাতা সরস্বতী তাহার কণ্ঠে আবির্ভূত হইয়া গান করিতেছেন, অথবা গায়ক নিজে গান করিতেছে, তাহা বলিতে পারা সুকঠিন। এরূপ স্থলে গায়কের গানক্রিয়া যে-হিসাবে মা-সরস্বতীর অনুপ্রাণনা, সেই হিসাবে তাহা প্রাণ-ক্রিয়া; যে-হিসাবে তাহা গায়কের মনের চেষ্টা-প্রসূত নিজের কারীকুরি, সেই হিসাবে তাহা মনঃক্রিয়া।

চতুর্থ উদাহরণ।

বিমাতা যখন সপত্নীপুত্রের কোনোপ্রকার ব্যক্ত সদ্‌গুণ দেখিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করেন, তখন সেরূপ সহেতুক ভালবাসাকে বলা যাইতে পারে মনের ভালবাসা। পক্ষান্তরে, স্বমাতা যখন অপরাধী পুত্রের কোনোপ্রকার গুণাগুণের প্রতি কিছুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া মুখে ভর্ৎসনা করেন, অথচ মনে মনে তাহার মুখচুম্বন করেন, তখন সেরূপ অহৈতুক ভালবাসাকে বলা যাইতে পারে প্রাণের ভালবাসা। তাহা যেন হইল—এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, রাধা-কৃষ্ণের ভালবাসাকে কোন্ শ্রেণীর ভালবাসা বলিব? তাহা প্রাণের ভালবাসা, না মনের ভালবাসা? প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তির মনের ভাব যদি এইরূপ হয় যে, "কি-গুণে উহাকে আমি ভালবাসি তাহা জানি না—জানি মাত্র এই যে, উহাকে দেখিলে প্রাণ পাই—না দেখিলে প্রাণ-বিয়োগ হয়", তবেই বলিব যে, তাহার ভালবাসা প্রাণের ভালবাসা। পক্ষান্তরে, তাহার মনের ভাব যদি এরূপ হয় যে, "এই গুণে উহাকে আমি এত ভালবাসি", তবে তাহা মনের ভালবাসা। পুরাণের মতানুসারে রাধা-কৃষ্ণের ভালবাসা নিতান্ত-পক্ষেই জন্মজন্মান্তরের ভালবাসা; সুতরাং কি-গুণে দোঁহে দোঁহাকে ভাল বাসিতেছেন, দোঁহা'র তাহা না জানিতে পারিবারই কথা। এই হিসাবে দোঁহার ভালবাসা প্রাণের ভালবাসা। এটাও কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক দিকে রাধিকার অনুপম রূপলাবণ্য, আর-এক দিকে কৃষ্ণের মনোহর ত্রিভঙ্গ ঠাম, বাণবিদ্ধকারী নয়ন-ভঙ্গী এবং সুমধুর মুরলীধ্বনি—দুই দিকের এই দুইরূপ মোহন গুণের গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম হইতে তুমুল তরঙ্গ উঠিয়া ভালবাসাকে ক্ষণে সুখ-স্বপ্নের স্বর্গে তুলিতেছে, ক্ষণে দুঃস্বপ্নের পাতালে নাবাইতেছে; সাগরমন্থন হইতে সুধাও যেমন—হলাহলও তেমনি—দুই-ই দুই কূল ছাপাইয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। এইরূপ অধীর ধাঁচা'র ভালবাসা বিক্ষেপাত্মক মনের ভালবাসা। রাধাকৃষ্ণের ভালবাসাতে প্রাণের অব্যক্ত সংস্কার এবং মনের উদ্রিক্ত বাসনা একরূপ গায়ে-গায়ে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে যে, দুয়ের মধ্যে ছেদ-রেখার স্থানাভাব।

উপরের উদাহরণগুলিতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, মনঃক্রিয়া এবং প্রাণক্রিয়ার মধ্যে প্রভেদ কেবল ব্যক্তাব্যক্তের তারতম্য লইয়া; তা বই, বস্তু-পক্ষে দুয়ের মধ্যে কোনো প্রভেদ নাই; বস্তু-পক্ষে প্রভেদ না থাকিবারই কথা—কেন না, প্রাণ এবং মন, উভয়ে একই জীবাত্মার দুই অন্তঃকরণ-বৃত্তি; তা বই, ও দুই বৃত্তি দুই শ্রেণীর দুই বৃত্তিও নহে, দুই ব্যক্তির দুই বৃত্তিও নহে। প্রাণ এবং মনের মধ্যে বস্তু-পক্ষে প্রভেদ না থাকিলেও—গুণ-পক্ষে প্রভেদ আছে, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। সে প্রভেদ এই যে, মন ব্যক্ত-চেতন, প্রাণ অব্যক্ত-চেতন। মন ব্যক্ত-চেতন বটে, কিন্তু সুব্যক্ত-চেতন নহে;—মন অর্দ্ধব্যক্ত-চেতন। সুব্যক্ত-চেতন কে? না বুদ্ধি। এইজন্য, মন এবং প্রাণের মধ্যগত একাত্মভাবটিকে

অন্তঃকরণের গভীর প্রদেশ হইতে প্রকাশ-ক্ষেত্রে টানিয়া তুলিতে গেলে বুদ্ধি পর্য্যন্ত টান পড়ে। নিম্নের উদাহরণ দৃষ্টে প্রকাশ পাইবে যে, একাত্মভাব কেবল মন এবং প্রাণের মধ্যেই আবদ্ধ নহে; পরন্তু তাহা প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি, তিনকেই এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া অব্যক্ত হইতে অর্দ্ধব্যক্তের মধ্য দিয়া সুব্যক্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে।

প্রাণ, মন এবং বুদ্ধির একাত্মভাব।

উদাহরণ।

মনে কর, আমি দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়া পথিমধ্যে মাস-কয়েকের জন্য একটি অপরিচিত গ্রামে বাস করিতেছি। প্রত্যহ প্রাতঃকালে আমি একবার করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করি। পথিমধ্যে আমি প্রত্যহ আম, জাম, বেল, কাঁঠাল, এই চারি ফলের চারিটা গাছ পরে পরে অবলোকন করি। প্রতিদিনের এই ভূয়োদর্শনের ফল হইল এই যে, ঐ চারিটি বৃক্ষের মধ্যগত ভেদাভেদ-সম্বন্ধ আমার প্রাণে গাঁথা পড়িয়া গেল। কেহ বলিতে পারেন যে, "প্রাণে গাঁথা পড়িয়া গেল", এটা কেবল একটা কথার কথা; "মনে গাঁথা পড়িয়া গেল" বলিতে দোষ কি? ইহার উত্তর এই যে, সত্যসত্যই আমাতে যাহা ঘটিল, তাহাই আমি বলিলাম। তাহা এই যে, পথিমধ্যে প্রত্যহ ঐ চারিটি বৃক্ষের ভূয়োদর্শনের দ্বার দিয়া উহাদের মধ্যগত ভেদাভেদ-সম্বন্ধ আমার অন্তঃকরণের অব্যক্ত মহলে চুপিচুপি প্রবেশ করিল—কখন্ যে প্রবেশ করিল, তাহা আমি জানিতেও পারিলাম না। অন্তঃকরণের সেই যে অব্যক্ত মহল, তাহার নাম প্রাণ; তা বই, তাহার নাম মনও নহে, বুদ্ধিও নহে। মন সচেতন অন্তঃকরণ-বৃত্তি; যাহা মনে বাস করে, তাহা মনে প্রকাশ পায়। "মনে বাস করিতেছে, অথচ মনে প্রকাশ পাইতেছে না", এ কথা বলাও যা, আর "এক ব্যক্তি কথা কহিতেছে, অথচ তাহার মুখ দিয়া শব্দ বাহির হইতেছে না", এ কথা বলাও তা—দুই-ই অর্থহীন জল্পনা। অতএব এই কথাই ঠিক্ যে, ঐ চারিটি বৃক্ষের ভেদাভেদ-সম্বন্ধ আমার প্রাণে গাঁথা পড়িয়া গেল। তাহার পরে দেখি যে, প্রতিদিনই সেই স্থানের সেই আম-গাছটি দেখিবামাত্র আমার মনে জামগাছটির দর্শনাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া ওঠে; তেমনি, জাম-গাছটি দেখিবামাত্র বেল-গাছটির দর্শনাকাঙ্ক্ষা, বেল-গাছটি দেখিবামাত্র কাঁঠাল-গাছটির দর্শনাকাঙ্ক্ষা মনোমধ্যে ক্রমান্বয়ে জাগিয়া ওঠে। হয় আর কিছু না—প্রাণে যাহা অব্যক্তভাবে গাঁথা রহিয়াছে, মনে তাহার এক এক অংশ চাক্ষুষ-দৃষ্টি-যোগে ব্যক্ত হয় এবং সেই সঙ্গে পরপরবর্ত্তী অংশের দর্শনাকাঙ্ক্ষা ভাবের অনুবন্ধিতা-সূত্রে ব্যক্ত হয়। ব্যক্ত হইবারই কথা; কেন না, কোনো অভ্যস্ত সংস্কার যখন অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হয়, তখন তাহা প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া লুকাইয়া অবস্থিতি করে; আবার, সেই সংস্কার যখন কোনোপ্রকার স্মারকের উত্তেজনায় নাড়াচাড়া পাইয়া প্রকট-বাসনা-রূপে অভিব্যক্ত হয়, তখন কাজেই তাহা মনে ভাসিয়া ওঠে।

একদিন আমি কাঁঠাল-গাছটার অব্যবহিত-পরবর্ত্তী মাঠের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে মাঠ পার হইয়া ধান্য-ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলাম। এতক্ষণ ধরিয়া, আম হইতে জাম ভিন্ন, জাম হইতে কাঁঠাল ভিন্ন, কাঁঠাল হইতে তৃণ ভিন্ন, এইরূপ একটা ভিন্নতার ব্যাপার—দৃষ্টপূর্ব্ব বিষয়-সজ্জের এক এক অংশের দর্শন এবং পরপরবর্ত্তী অংশের দর্শনাকাঙ্ক্ষা, এই দুই পক্ষে ভর করিয়া মনের আকাশে উড়িয়া চলিতেছিল। ধান্য-ক্ষেত্র হইতে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইবামাত্র মন থম্‌কিয়া দাঁড়াইল; বুদ্ধির পালা আরম্ভ হইল। ভাবের অনুবন্ধিতা (association of ideas) আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইল; অগ্রপশ্চাৎ-বিবেচনা প্রকাশ্যে আবির্ভূত হইল। দৃষ্টপূর্ব্ব বিষয়সকলের ভিন্নতার মধ্য হইতে অভিন্নতা ক্রমে ক্রমে মস্তক উত্তোলন করিতে আরম্ভ করিল। অগ্রপশ্চাৎ-বিবেচনাই বা কিরূপ এবং ভিন্নতার মধ্য হইতে অভিন্নতার বিনির্গমনই বা কিরূপ—তাহা দেখা যা'ক্।

ধান্য-বৃক্ষ আম-জাম-বেল-কাঁঠাল-গাছ হইতে কেবল যে ভিন্ন, তাহা নহে, পরন্তু জাত্যংশে ভিন্ন। তাহা যদি হইল—আম্রাদি-বৃক্ষ যদি ধান্য-বৃক্ষ হইতে জাত্যংশে ভিন্ন হইল, তবে আম্রাদি বৃক্ষগুলা আপনাদের মধ্যে অবশ্যই জাত্যংশে অভিন্ন। ফলেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা সকলেই একই অভিন্ন শ্রেণীর তরু—সকলেই উদ্যান-তরু।

এইপ্রকার বিবেচনার অভ্যুদয়ে আমার বুদ্ধিতে এইরূপ একটি আনুমানিক সিদ্ধান্ত (Hypothesis) উপস্থিত হইল যে, ঐ চারিটি ফল-বৃক্ষের প্রতিষ্ঠা-ভূমি, যাহা আমি পশ্চাতে ছাড়িয়া আসিয়াছি, তাহা বোধ করি কোনো একটি উদ্যান-ভূমির অন্তঃপাতী। তাহার পরে, সেই আনুমানিক সিদ্ধান্তটির যাথার্থ্য পরীক্ষা করিবার জন্য আম জাম-কাঁঠালের সঙ্গম-স্থানটিতে পুনরাগমন করিয়া আশপাশের সমস্ত প্রদেশ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম যে, সেখানকার যতগুলা গাছ, সবগুলাই উদ্যান-তরু—কেবলি ফুলগাছ এবং ফলগাছ; তা ছাড়া—অপর কোনোপ্রকার বৃক্ষ দেখিলাম না। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, আম হইতে জাম ভিন্ন, জাম হইতে কাঁঠাল ভিন্ন, এইরূপ ধাঁচার প্রভেদকে বলা যায় ব্যক্তিগত প্রভেদ। নিছক ব্যক্তিগত প্রভেদ যাহা মনে প্রতিভাসিত হইয়াই ক্ষান্ত থাকে, তাহার সহিত অভেদের বড় একটা দেখা-সাক্ষাৎ নাই। পক্ষান্তরে, ওষধি এবং বনস্পতির মধ্যগত প্রভেদ যাহা বুদ্ধিতে প্রকাশ পায়, তাহা জাতিগত প্রভেদ। তাহা একপ্রকার ভেদাভেদ কিনা অভেদাত্মক প্রভেদ। তৃণ এবং পর্ব্বতের মধ্যে যতই প্রভেদ থাকুক্ না কেন—তথাপি দুয়ের মধ্যে অভেদ এই যে, দুই-ই পার্থিব বস্তু; ইহারই নাম অভেদাত্মক প্রভেদ।

উপরে যতগুলি দৃষ্টান্ত সবিস্তরে প্রদর্শিত হইল, তাহার মধ্য হইতে সার সংগ্রহ করিয়া মোট কথাটি যাহা পাওয়া যাইতেছে, তাহা সংক্ষেপে এই :—

(১) প্রথমে ভূয়োদর্শন-জনিত ভেদাভেদের সংস্কার বুকের ধুক্‌ধুকুনির ন্যায় প্রাণের মধ্যে অব্যক্তভাবে স্পন্দিত হইতে থাকে।

(২) তাহার পরে সেই প্রাণে-গাঁথা অব্যক্ত ভেদাভেদের ভেদাংশটি ভাবের অনুবন্ধিতা-সূত্রে মনের বাসনা-ক্ষেত্রে ভাসিয়া-ভাসিয়া উঠিতে থাকে।

(৩) তাহার পরে প্রাণে-গাঁথা ভেদাভেদের অভেদাংশটি মনঃসমুত্থিত ভেদাংশটির সহিত একতানে মিলিয়া গিয়া, ভেদাভেদ উভয়াংশ, বুদ্ধির আলোকে বিনিষ্ক্রান্ত হয়। তাহা যখন হয়, তখন যেমন—

পদ্মসা কমলং কমলেন পদ্মঃ
পদ্মসা কমলেন বিভাতি সরঃ।
মণিনা বলয়ং বলয়েন মণি-
র্মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ॥
শশিনা চ নিশা নিশয়া চ শশী
নিশয়া শশিনা চ বিভাতি নভঃ।
কবিনা চ বিভুর্বিভুনা চ কবিঃ
কবিনা বিভুনা চ বিভাতি সভা॥ *

কমলে সলিল শোভে সলিলে কমল।
কমলে সলিলে শোভে সর নিরমল।
বলয়ে অলয়ে মণি মণিতে বলয়।
বলয়ে মণিতে শোভে কর-কিসলয়॥
নিশীথে শোভয়ে শশী শশীতে নিশীথ।
নিশিতে শশিতে নভ তারকা-ভূষিত॥
নৃপ পাশে কবি শোভে কবি পাশে ভূপ।
কবিতে বিভুতে সভা শোভে অপরূপ॥

তেমনি প্রভেদের আলোকে অভেদ ব্যক্ত হয়, অভেদের আলোকে প্রভেদ ব্যক্ত হয়, এবং উভয়গ্রাহী বুদ্ধির আলোকে ভেদাভেদ ব্যক্ত হয়। নূতন কিছুই ব্যক্ত হয় না;—যে ভেদাভেদের শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সংস্কার পূর্ব্ব হইতেই প্রাণের অভ্যন্তরে অব্যক্তভাবে লুকাইয়া অবস্থিতি করে, এবং মনের বাসনা-ক্ষেত্রে যাহার অর্দ্ধাংশ (ভেদাংশ) ভাবের অনুবন্ধিতা-সূত্রে ভাসিয়া-ভাসিয়া উঠিতে থাকে, বুদ্ধিতে তাহারই সর্ব্বাংশ (ভেদাভেদ উভয়াংশ) অগ্রপশ্চাৎ-বিবেচনার আলোকে সুব্যক্ত হইয়া উঠে। কাজেই বলিতে হয় যে, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি, পরস্পরের সহিত এক-সূত্রে গাঁথা রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে অতীব একটি গুরুতর বিষয় বিবেচ্য; তাহা এই যে, বুদ্ধির উচ্চ-ভূমিতে ব্যক্তের আলোকে অব্যক্ত আলোকিত হয়; অব্যক্তের সংস্পর্শে ব্যক্ত প্রতিষ্ঠা-লাভ করে, এবং উভয়ের সন্ধিস্থলে বাস্তবিক সত্তা অব্যক্তের আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত এবং ব্যক্তের আলোকে আলোকিত হয়। বিষয়টি অতীব গুরুতর;—এখানে আজ আর তাহাকে ঘাঁটাইব না। বারান্তরে তাহাকে বিধিমতে অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়া আলোচনা-ক্ষেত্রে অধিষ্ঠান করানো যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* উল্লিখিত সংস্কৃত শ্লোকটি একটি প্রসিদ্ধ উদ্ভট-শ্রেণীর শ্লোক। বোধ করি, উহা কোনো প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত-কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া থাকিবে।

দান।

যেদিন প্রথম সেই কতদিন হ'ল
মোর কাছে লইলে বিদায়,
সুদূর প্রবাসে গিয়ে ভুলে যাও পাছে
ছবিখানি দিলাম তোমায়।
তুমি তব কণ্ঠ হতে হাতে দিলে তুলে
এক-ছড়া বকুলের হার,—
আজো আছে মোর কাছে সে মালা সে ছবি
দুজনের দুই উপহার।
ছবিটির আলো-ছায়া লুপ্ত হয়ে গেছে
কার মুখ চেনা সুকঠিন।
শুষ্কমালা হতে আজো গন্ধটুকু তার
একেবারে হয়নি বিলীন।
তোমার সে ফুলগুলি বিশ্ববিধাতার
প্রেমপূর্ণ আনন্দরচনা,
মোর দান সেই ছবি শুধু মানবের
প্রাণপণ অক্ষম সাধনা!

বিপরীত।

যবে মোরা অতি শিশু
মনে কিছু রাখিতে পারি না,
হাতে যদি পড়ে কিছু
তবে তাহা সহজে ছাড়ি না।
বড় হ'লে হাত ছেড়ে
বুকে যদি কিছু ধরা পড়ে
রাখিতে পারি না তাও
সবি শুধু রাখি মনে করে।

বন্ধনলেশ।

দেখ সখা, কেঁশপ্রান্ত গুচ্ছ থরে থরে
উঠেছে কুঞ্চিত হয়ে অঙ্গুরী ফাঁদিয়া।
এ মৃদু বন্ধনে শুধু ক্ষণেকের তরে
রাখিব তর্জ্জনী তব জড়ায়ে বাঁধিয়া!

অভীষ্ট।

তোমারে ভুলিতে মোর হ'ল নাক মতি,
এ জগতে কারো তাহে নাহি কোন ক্ষতি।
আমি তাহে দীন নহি, তুমি নহ ঋণী,
দেবতার অংশ তাও পাইবেন তিনি।

পঞ্চ পাল-নরপাল।

পঞ্চগৌড়েশ্বর জয়ন্তের তিরোভাবের পর, গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্য পুনরায় ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। বাহুবলই সর্ব্বত্র প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তারানাথের বর্ণনাপাঠে বোধ হয়, এই সময়ে রাষ্ট্রবিপ্লবে অরাজকতার সূত্রপাত হইয়াছিল। কিন্তু সে বিপ্লবে দেশের প্রজাসাধারণ বিশেষ বিপন্ন হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাহারা প্রবলপুরুষকে করপ্রদান করিয়া গৃহধর্ম্ম প্রতিপালন করিত; কে সিংহাসনে আরোহণ করিল, কে সিংহাসনচ্যুত হইল, তাহার সন্ধান লইবার জন্য ব্যস্ত হইত না। তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলপতি-সামন্তের অধীনে বাস করিত; রাজচক্রবর্ত্তীকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে জানিবার অবসর বা প্রয়োজন উপস্থিত হইত না। সামন্তগণ কখন-কখন একজনকে রাজচক্রবর্ত্তী করিয়া তাঁহার অধীনে রাজ্যভোগ করিতেন। তাহাতে কিছুদিনের জন্য যুদ্ধকোলাহল শান্তিলাভ করিত। এই সকল কারণে, মগধের পালবংশীয় নরপালগণ বঙ্গভূমিতে অধিকার-বিস্তারের অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাষ্ট্রবিপ্লব।

পালবংশের ইতিহাস নানা বিচিত্র

কাহিনীর আধার। তাঁহারা দীর্ঘকাল বঙ্গভূমির অধিপতি থাকিয়া, নানা স্থানে গ্রাম, নগর ও রাজধানী সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গে অদ্যাপি তাঁহাদের কোন কোন কীর্ত্তিচিহ্ন বিদ্যমান আছে। পাল-নরপালগণ জাতিতে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় এবং ধর্ম্মে বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু পালবংশের অভ্যুদয়কালে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ মন্দীভূত হইয়াছিল; শৈবমত সকল স্থানেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। প্রজাসাধারণ বৌদ্ধ ও শৈব নামক দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পাল-নরপালগণ বৌদ্ধধর্ম্মের উৎসাহদাতা হইলেও, শৈবমত প্রতিহত করিতে সক্ষম হন নাই; বরং লোকরঞ্জনার্থ সময়ে সময়ে শৈবমত-সংস্থাপনেরও সহায়তা-সম্পাদন করিয়াছেন।

পালবংশ।

দিনাজপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে পালবংশীয় সপ্তদশ নরপালের নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহারা সকলেই বঙ্গভূমিতে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না; সকলে সমগ্র বঙ্গভূমি করতলগত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়াও বোধ হয় না। ক্রমে মগধ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া, প্রথমে উত্তর ও পরে পূর্ব্ব বঙ্গ অধিকার করিয়া, পাল-নরপালগণ শাসনক্ষমতা বিস্তৃত করিয়া থাকিবেন। কিন্তু পালবংশীয় প্রথম পঞ্চ নরপাল আদৌ বঙ্গভূমিতে রাজধানী-সংস্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহাদের নাম বঙ্গীয় জনশ্রুতি হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

সপ্তদশ নরপাল।

পালরাজবংশের আলোচনায় এই পঞ্চ নরপতির ইতিহাস পৃথক্ আলোচিত হওয়া আবশ্যক। সমগ্র পাল-নরপালগণের নাম,—(১) গোপাল, (২) ধর্ম্মপাল, (৩) দেবপাল, (৪) বিগ্রহপাল, (৫) নারায়ণপাল, (৬) রাজ্যপাল, (৭) দ্বিতীয় গোপাল (৮) দ্বিতীয় বিগ্রহপাল, (৯) মহীপাল, (১০) নরপাল, (১১) তৃতীয় বিগ্রহপাল, (১২) দ্বিতীয় মহীপাল, (১৩) সুরপাল, (১৪) রামপাল, (১৫) কুমারপাল, (১৬) মদনপাল, (১৭) তৃতীয় গোপাল। এই বিখ্যাত রাজবংশের ধর্ম্মপাল, দেবপাল, বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল ও মদনপালের প্রদত্ত কয়েকখানি তাম্রশাসন এবং গোপাল, দেবপাল, মহীপাল ও নরপালের নামাঙ্কিত কয়েকখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে তাম্রশাসনগুলি নানা ঐতিহাসিক তথ্যের আধার। সেগুলি, যেখানে যেখানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সেই সকল স্থানের নামানুসারে পরিচিত হইয়াছে। তদনুসারে ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনের নাম "মালদহের তাম্রশাসন", দেবপালের তাম্রশাসনের নাম "মুঙ্গেরের তাম্রশাসন", বিগ্রহপালের তাম্রশাসনের নাম "আমগাছীর তাম্রশাসন", নারায়ণপালের তাম্রশাসনের নাম "ভাগলপুরের তাম্রশাসন" এবং মদনপালের তাম্রশাসনের নাম "দিনাজপুরের তাম্রশাসন"। এই সকল তাম্রশাসনে রাজবংশের জাতি, ধর্ম্ম ও বংশাবলী লিখিত আছে; প্রসঙ্গক্রমে শাসনপ্রণালীরও আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দিনাজপুরের অন্তর্গত বোদালের গরুড়স্তম্ভে যে শিলালিপি খোদিত আছে, তাহাতেও পালবংশের কিছু

কিছু বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল সমসাময়িক পুরাতন লিপি বহুমূল্য হইলেও, সাধারণ পাঠকসমাজে সুপরিচিত হয় নাই। তজ্জন্য তারানাথ-সঙ্কলিত জনশ্রুতি ও "আইন-ই-আকবরির" গল্পগুজব ইতিহাসের উপাদান বলিয়া পরিচিত ছিল; ক্রমে সে ভ্রম দূর হইয়া যাইতেছে।

পালবংশীয় প্রথম নরপালের নাম কি ছিল, তাহা লইয়া একসময়ে বহু তর্কবিতর্ক প্রচলিত হইয়াছিল। "আমগাছীর তাম্রশাসনে" প্রথম নরপালের যে নাম লিখিত আছে, তাহাকে "লোকপাল" পাঠ করিয়া, ইংরাজেরা এই তর্কবিতর্কের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালের ও মদনপালের তাম্রশাসন পালবংশীয়-নরপতি-প্রদত্ত প্রথম ও শেষ তাম্রশাসন বলিয়া পরিচিত। এই উভয় প্রাচীন লিপিতেই "গোপাল"নাম স্পষ্টাক্ষরে খোদিত আছে। গোপালপ্রদত্ত কোন তাম্রশাসন এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। নালন্দায় বাগীশ্বরীনাম্নী এক চতুর্ভুজা মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। তাহার পাদপীঠের খোদিত-লিপিতে গোপালের নামোল্লেখ আছে। রাজসাহীর অন্তর্গত মান্দার নিকটবর্ত্তী ভগ্নাবশেষের মধ্যে এক শৈবমন্দিরের কলক-লিপি আবিষ্কৃত হইয়া আমার হস্তগত হইয়াছে। তাহাতেও গোপালদেবের নাম খোদিত আছে। কিন্তু এই দুই শিলালিপির গোপালদেব কোন্ গোপালদেব, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। সুতরাং ধর্ম্মপালাদি পরবর্ত্তী নরপালগণের তাম্রশাসনে প্রসঙ্গক্রমে গোপালদেবের যাহা কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার অধিক আর কোন বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। বর্ত্তমানে, ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনকেই বঙ্গভূমির সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন লিপি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

গোপাল।

এই পুরাতন শাসনলিপি অন্যান্য শাসনলিপির ন্যায় সুললিত সংস্কৃতভাষায় লিখিত; —প্রথমাংশ কবিতা, শেষাংশ গদ্য। মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপাল এতদ্দ্বারা তদীয় বিজয়রাজ্যের দ্বাত্রিংশৎ বৎসরের অগ্রহায়ণমাসের দ্বাদশ দিবসে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তঃপাতিভূমি দান করিয়াছিলেন। এই ভূমি কাহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধেও বাদানুবাদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ধর্ম্মপালের এই তাম্রশাসনখানি গৌড়ান্তর্গত খালিমপুর-গ্রামের উত্তরাংশে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ভূমিকর্ষণোপলক্ষে জনৈক কৃষক-কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। কৃষক ইহা হস্তান্তর করিতে অসম্মত বলিয়া, সন্ধান পাইয়াও লোকে এই তাম্রশাসন পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইত না। সুপণ্ডিত স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় মালদহের কালেক্টার হইয়া গৌড়াঞ্চলে উপনীত হইবার সময়ে কৃষক পরলোকগমন করিয়াছিল। বটব্যাল-মহাশয় কৃষকপত্নীর নিকট তাম্রশাসনখানি ক্রয় করিয়া, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহায়তায় পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা সংযুক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। তাহাতে বেণীসংহার-রচয়িতা কবিবর ভট্টনারায়ণের নামাঙ্কিত ভূমিদানপত্র বলিয়া এই তাম্রশাসন পরিচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা কষ্টকল্পনামাত্র। এই তাম্রশাসন নারায়ণনামক বিগ্রহের উদ্দেশ্যে

ধর্ম্মপাল।

ভূমিদানপত্র। তৎকালে নারায়ণ বর্ম্মা মহাসামন্তাধিপতিপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি নারায়ণবিগ্রহ সংস্থাপন করিয়া দেবাপূজানির্ব্বাহার্থ ভূমিদানপ্রার্থনায় যুবরাজ ত্রিভুবনপালের মুখে ধর্ম্মপালকে অনুরোধ জ্ঞাপন করায়, এই দানপত্র লিখিত হইয়াছিল। এ সকল কথা দানপত্রেই উল্লিখিত আছে। এই রাজশাসন পাটলিপুত্রের জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইবার কথা খোদিত আছে। তখন পর্য্যন্তও পাল-নরপালগণের রাজধানী পাটলিপুত্রেই সংস্থিত ছিল। কিন্তু সেই শেষ। এই সময়ে কান্যকুব্জের প্রবল-প্রতাপে মগধ-সাম্রাজ্যসীমা ক্রমেই সঙ্কুচিত হইতেছিল। পাল-নরপালগণ পাটলিপুত্র ছাড়িয়া মুদ্গগিরিতে রাজধানী সংস্থাপিত করিয়া, কালক্রমে উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তাম্রশাসনগুলি একত্র বিচার করিলে এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

দেবপাল প্রদত্ত এক তাম্রশাসন মুঙ্গেরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। খৃষ্টীয় ১৭৮১ অব্দে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনুবাদক স্বনামখ্যাত পণ্ডিতবর স্যর চার্লস্ উইল্কিন্স তাহার এক ইংরাজি অনুবাদ "এসিয়াটিক্ রিসার্চস্" পত্রে প্রকাশিত করেন। এই তাম্রশাসনে দেবপালের রাজধানী মুদ্গগিরি-নগরে সংস্থাপিত থাকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ত্তমান মুঙ্গেরের পুরাতন নাম মুদ্গগিরি। দেবপাল প্রসঙ্গক্রমে ধর্ম্মপালের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে ধর্ম্মপালের ধর্ম্মবিদ্বেষীদিগের সহিত সংগ্রামে নিহত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেবপাল কে,—তদ্বিষয়ে একদা নানা তর্কবিতর্ক প্রচলিত হইয়াছিল। ভাগলপুরের তাম্রশাসনে ধর্ম্মপালের সহিত ইন্দ্র রাজার যুদ্ধ ও পরাভব কীর্ত্তিত আছে। উক্ত তাম্রশাসনের সমালোচনায় সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দেবপাল ও জয়পালকে ধর্ম্মপালের ভ্রাতা বাক্পালের পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। জয়পাল উড়িষ্যা ও প্রাগ্জ্যোতিষ (আসাম) জয় করার সংবাদও লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুঙ্গেরের তাম্রশাসনে দেবপাল আপনাকে স্পষ্টাক্ষরে ধর্ম্মপালের পুত্র বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন। এই তাম্রশাসনে পালবংশাবলী যে ভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার সারমর্ম্ম এই যেঃ— "গোপালের ধর্ম্মপাল নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ধর্ম্মপাল পরবল-নামক রাজার রণ্ণাদেবীনাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করায়, দেবপাল-নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে।" এই তাম্রশাসনের শেষাংশে লিখিত আছে যে,— "দেবপাল তাঁহার ধর্ম্মশীল পুত্র রাজ্যপালকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।" ইহা দেবপালরাজ্যের ৩৩ সংবৎসরের শাসনলিপি। যুবরাজ রাজ্যপাল বোধ হয় পিতা বর্ত্তমানেই পরলোকগমন করেন; কারণ দেবপালের পর বিগ্রহপাল সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। বিহারে আবিষ্কৃত এক শিলালিপিতে দেবপালের প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে তাঁহার বিদ্ধা, কাম্বোজ ও কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত দিগ্বিজয় করিবার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। দেবপালদেবের

দেবপাল।

মুঙ্গেরের তাম্রশাসনে তাঁহার দিগ্বিজয়ের উল্লেখ নাই; বঙ্গভূমিতে অধিকারবিস্তৃতিরও আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মুঙ্গেরের তাম্রশাসন একখানি ভূমিদানপত্র। তদ্দ্বারা দেবপালদেব শ্রীনগর-(পাটলিপুত্র)-ভুক্তির অন্তর্গত ক্রিমিল-নামক বিভাগে মেসিক-নামক নগর দান করিয়াছিলেন। কিন্তু দিনাজপুরের অন্তর্গত বোদালের গরুড়-স্তম্ভে খোদিত লিপিতে দেবপালের দিগ্বিজয়ের উল্লেখ আছে। তাহা ভট্টগুরব-নামধেয় নারায়ণপালের সুবিখ্যাত মন্ত্রীর সংস্থাপিত। ভট্টগুরব যে নারায়ণপালের মন্ত্রী ছিলেন, সে কথা ভাগলপুরের তাম্রশাসনেও উল্লিখিত আছে। সুতরাং ভট্টগুরবের গরুড়-স্তম্ভলিপির বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করা যায় না। তাহাতে দেবপালের দিগ্বিজয়-ব্যাপারে বাহুবল অপেক্ষা ভট্টগুরবের আরাধ্য প্রপিতামহ দর্ভপাণি মিশ্রের নীতিকৌশলেরই প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা :—

"আরেবাঙ্গনকান্ত্রঙ্গমদণ্ডিমাচ্ছিলাসংহতে-
রাশৌরীপিতুরীশ্বরেন্দুকিরণৈঃ পূর্ণাধনিতচ্ছিরাঃ গিরেঃ।
মার্ত্তণ্ডাত্মজমোদয়ারুণজলাদাবারিরাশিদ্বয়াৎ
নীত্যা যস্য ভুবং চকার করদাং শ্রীদেবপালো নৃপঃ॥"

দেবপালের নাম বঙ্গীয় ঘটক ও কুলজ্ঞগণের গ্রন্থেও অপরিচিত নহে। ধর্ম্মপাল ও দেবপাল তাঁহাদের পাটলিপুত্র ও মুদ্গগিরির জয়স্কন্ধাবার হইতে বঙ্গভূমির শাসনকার্য্য যথাবিধি সুসম্পন্ন করিতে সক্ষম হইতেন কি না, তাহাতে নানা সংশয় উপস্থিত হয়। কারণ, বারেন্দ্রবংশাবলীলেখক কুলজ্ঞগণের মতানুসারে এই সময়ে আদিশূর-নামক নরপতি গৌড়াধিপতি ছিলেন, জানিতে পারা যায়।

পালবংশীয় চতুর্থ নরপালের নাম বিগ্রহপাল। ইনি ইতিহাসে প্রথম বিগ্রহপাল বলিয়া পরিচিত। ভট্টগুরবের পিতা কেদারমিশ্র সুরপাল-নামধেয় নরপতির প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, এ কথা বোদালের গরুড়স্তম্ভে খোদিত আছে। সুরপাল প্রথম বিগ্রহপালের অন্য নাম কি না, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। ভট্টগুরব পুরুষানুক্রমে পালবংশীয় নরপালের কর্ম্মচারী। তাঁহার পিতা কোন্ নরপতির মন্ত্রিত্ব করিতেন, তদ্বিষয়ে ভট্টগুরবের ভ্রান্তি সংঘটিত হওয়া সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। ভট্টগুরব কেবল সুরপালের নামোল্লেখ করিয়াই নিরস্ত হন নাই; তিনি যে উড়িষ্যা, দ্রাবিড় ও গুর্জ্জর জয় করিয়াছিলেন, সে কথাও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রথম বিগ্রহপালের এরূপ কোন দিগ্বিজয় সাধন করার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহার পুত্র নারায়ণপাল তাম্রশাসনে পিতার পরিচয় দিবার সময়ে এরূপ কোন দিগ্বিজয়ের উল্লেখ করেন নাই। কেবল বলিয়াছেন,—পিতা বিগ্রহপাল আজন্ম অজাতশত্রুর ন্যায় শত্রুশূন্য ছিলেন। নারায়ণপালের তাম্রশাসনে বিগ্রহপালের যে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"শ্রীমান্ বিগ্রহপালস্তৎসূনুরজাতশত্রুরিব।
জাতঃ শত্রুবনিতাপ্রসাধনবিলোপিবিমলাসিজলধারঃ॥
রিপবো যেন গুর্ব্বীণাঃ বিপদামাস্পদীকৃতাঃ।
পুরুষায়ুষদীর্ঘাণাং সুহৃদঃ সম্পদামপি॥
লজ্জতে তস্য জলধেরেব জড়ত্বকৃতা
পত্নী বভূব কৃতহৃদয়বংশভূষা।
যস্যাঃ শুচীনি চরিতানি পিতুশ্চ বংশে
পত্যুশ্চ পাবনবিধিঃ পরমো বভূব॥"

ইহাতে বিশেষ কোন দেশজয়ের উল্লেখ নাই; সাধারণ বীরকীর্ত্তির উল্লেখ আছে। বিগ্রহপালের রাজধানী কোথায় ছিল, তাহারও উল্লেখ নাই। কিন্তু তখনও মুদ্গগিরিই যে পাল-নরপালবর্গের রাজধানী ছিল, তাহা অনুমান করিবার কারণের অভাব নাই।

প্রথম বিগ্রহপালের পুত্র নারায়ণপালের তাম্রশাসন ও ভট্টগুরবের গরুড়স্তম্ভলিপি নানা ঐতিহাসিক তথ্যের আধার। নারায়ণপালের তাম্রশাসন মুদ্গগিরির জয়স্কন্ধাবার হইতেই প্রদত্ত হইয়াছিল। তদ্দ্বারা তাঁহার রাজধানীও মুঙ্গেরে থাকাই অনুমিত হয়; দেবপালের রাজধানী ও নারায়ণপালের রাজধানী মুদ্গগিরিতে থাকার প্রমাণ পাইয়া, প্রথম বিগ্রহপালের রাজধানীও মুঙ্গেরে থাকাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। সুতরাং পালবংশীয় প্রথম পঞ্চ নরপালের মধ্যে কাহারও বঙ্গভূমিতে রাজধানী থাকা সিদ্ধান্ত করা যায় না। সেরূপ কোন প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। এই পঞ্চ নরপালের মধ্যে একমাত্র ধর্ম্মপালেরই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তঃপাতি-ভূমি দান করিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাঁহার শাসনসময়ে রাজধানী পাটলিপুত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি যে তাহার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু দেবপাল, বিগ্রহপাল ও নারায়ণপাল যে প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গভূমি উপভোগ করিয়াছিলেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের অভাব। ধর্ম্মপালের পাটলিপুত্রের সুবিখ্যাত রাজধানী দেবপাল, বিগ্রহপাল ও নারায়ণপালের অধিকারভুক্ত ছিল বলিয়াও বোধ হয় না। তৎকালে কান্যকুব্জের প্রবল প্রতাপ মগধেশ্বরকে ক্রমে পূর্ব্বাভিমুখে পলায়নপর করিয়াছিল। তাহাই হয় ত মুদ্গগিরির রাজধানী-সংস্থাপনের মূল কারণ। কিন্তু এখানে ইতিহাস নীরব; কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তথ্যনির্ণয় করা অসম্ভব। ধর্ম্মপালের পর বঙ্গভূমি কিয়ৎকাল শূরবংশের অধিকারভুক্ত হওয়া স্বীকার করিলে, জনশ্রুতির সঙ্গে এই সকল ঐতিহাসিক ব্যাপারের সামঞ্জস্য সুরক্ষিত হয়। নারায়ণপালের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াও, তাঁহার কথা যথাযথরূপে আলোচিত হয় নাই। তাঁহার ধর্ম্মমত কি ছিল, তদ্বিষয়ে এখনও বহু বিতর্ক বিদ্যমান। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ভট্টগুরব যে বেদানুরক্ত ছিলেন, তাহাতে সংশয় নাই। নারায়ণপালের তাম্রশাসনের শেষাংশে তাহা স্পষ্টই উল্লিখিত আছে। নারায়ণপালের তাম্রশাসনে বৌদ্ধমুদ্রা সংযুক্ত দেখিয়া এবং মঙ্গলাচরণশ্লোকে দশবোদ্ধবলের উল্লেখ দেখিয়া, তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু অভিনিবেশ-সহকারে আলোচনা করিলে, এই সিদ্ধান্ত সর্ব্বথা সমর্থন করা যায় না। সুপণ্ডিত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই তাম্রশাসনের পাঠ ও ব্যাখ্যা মুদ্রিত করিয়া নানা তর্কবিতর্কের সূচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা মূলানুযায়ী বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্তও অন্ধবৎ অনুসরণ করা অসম্ভব।

নারায়ণপাল।

পালবংশীয় প্রথম পঞ্চ নরপালের বৌদ্ধ-

ধর্ম্মানুরাগ প্রবল ছিল। কিন্তু তাহার সহিত হিন্দুবিদ্বেষ বর্ত্তমান থাকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তৎকালে শাক্য-শৈব-সংঘর্ষের তুমুল কোলাহল শান্ত হইয়াছিল; হিন্দু ও বৌদ্ধ পরস্পরের ধর্ম্মমতকে শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। লোকরঞ্জনার্থ রাজাও হিন্দু এবং বৌদ্ধকে তুল্যভাবে অনুগ্রহ বিতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রাজা ধর্ম্মপাল সামন্তাধিপতি নারায়ণ বর্ম্মার অনুরোধে নারায়ণের সেবাপূজা-নির্ব্বাহার্থ ভূমিদান করিয়াছিলেন; রাজা নারায়ণপাল পাশুপত মতের আশ্রয়দানের জন্য ব্যবস্থা করিয়া উদারতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন; এবং দেবপাল, বিগ্রহপাল ও নারায়ণপাল বেদানুরক্ত মিশ্রবংশীয় ব্রাহ্মণগণকে প্রধান মন্ত্রীর উচ্চাসন প্রদান করিয়া তাঁহাদের নীতিকৌশলেই রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মমত কাহারও পক্ষে রাজপ্রসাদলাভের অন্তরায় হইত না। অন্যথা বৌদ্ধ ভূপালের নিকট হিন্দু সামন্তাধিপতি বা রাজমন্ত্রী উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতেন না।

ধর্ম্মমত।

এ সময়ে গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্যের সহিত মগধের সঙ্কীর্ণ সাম্রাজ্য সংযুক্ত হইয়া, মগধ-সাম্রাজ্যকে পুনরায় বিপুলায়তন করিয়া তুলিয়াছিল। গৌরবের দিনে মগধের অধিকার পশ্চিমাঞ্চলেই সমধিক বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। অধঃপতনকালে মগধের সাম্রাজ্যসীমা পশ্চিমে সঙ্কীর্ণ হইয়া পূর্ব্বাঞ্চলে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। তৎকালে উৎকল ও আসাম কখন-কখন গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত হইত। পালবংশীয় প্রথম পঞ্চ নরপালের শাসনসময়ে পুনঃপুন এই সকল দেশজয়ের বর্ণনাপাঠে বোধ হয়, এই সকল খণ্ডরাজ্যের সহিত গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের সংঘর্ষ বর্ত্তমান ছিল; সম্মিলন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রবল হূনজাতির আক্রমণে ভারতবর্ষ বিপর্য্যস্ত হইত; গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্যও তজ্জন্য হূনগর্ব্ব খর্ব্ব করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। ভট্টগুরবের গরুড়স্তম্ভলিপিতে তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সামন্তাধিপতি।

এই সময়ে উত্তরবঙ্গ সবিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। পালনরপালবর্গের প্রধান মন্ত্রিগণ উত্তরবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। সে বিখ্যাত মিশ্রবংশে ভট্টগুরবই শেষ সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি। তিনি অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করেন। বংশকীর্ত্তনের জন্য উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান রহিল না বলিয়া, ভট্টগুরব শেষজীবনে গরুড়স্তম্ভলিপিতে বংশবৃত্তান্ত খোদিত করাইয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গের ন্যায় দক্ষিণবঙ্গও তৎকালে জ্ঞান ও শিল্পালোচনার জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। দক্ষিণবঙ্গ তখন পর্য্যন্তও "সমতট"নামে পরিচিত ছিল। তথাকার শিল্পিগণ পাল-নরপালবর্গের শাসনলিপি উৎকীর্ণ করিতেন। নারায়ণপালের তাম্রশাসনের শেষশ্লোকে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। দক্ষিণবঙ্গ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল; তথায় সহসা রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইত না। কিন্তু নানা কারণে উত্তরবঙ্গ বহু বিপ্লবের লীলাভূমি হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্বে প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য, পশ্চিমে মিথিলা ও উত্তরে

উত্তরবঙ্গ।

সাম্রাজ্যসীমা।

ভোট নিয়ত কলহ উপস্থিত করিত। এই সকল কলহের মধ্যে পালবংশ যে নিরুদ্বেগে বংশানুক্রমে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আধিপত্য রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহারা তখনও মগধেশ্বর; বঙ্গভূমির সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তজ্জন্যই বঙ্গীয় জনশ্রুতির মধ্যে এই পঞ্চ নরপালের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রথমে পাটলিপুত্র ও পরে মুদ্গগিরি ইঁহাদের প্রধান আবাসস্থল বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ইঁহারা বঙ্গভূমিতে রাজধানীস্থাপন করিয়া বসতি করিলে, তাহার প্রমাণ বা জনশ্রুতি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইত না।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

যুবতী-জীবন। শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র।

পুস্তকখানি জ্ঞানগর্ভ ও জ্ঞাতব্য কথায় পরিপূর্ণ। কিন্তু জ্ঞানগর্ভ ও জ্ঞাতব্য, সকল কথাই কি সকলকে শুনান যায়? অথচ যাহা জ্ঞানগর্ভ, যাহা বহু-দর্শন বা বহু-অধ্যয়ন লব্ধ, যাহা বিজ্ঞানানুমোদিত, যাহা অবশ্যজ্ঞাতব্য—যাহা জানিলে এবং জানিয়া চলিলে সমাজের লাভ আছে, সুখ আছে, শান্তি আছে. স্বাস্থ্য আছে—তাহা সমাজকে, দেশের লোককে, না বলা-ও ত একটা পাপ। এমন অবস্থায় উপায় কি? ইউরোপে একটা উপায় অবলম্বিত হয়। সমাজতত্ত্ব বা জীবতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে, যে কথা সকলের শ্রোতব্য নহে, তাহা অপরদেশীয় বা কোন প্রাচীন ভাষায় লিখিত হয়। ফরাশী পুস্তকে দেখা যায় যে, সাধারণের অশ্রোতব্য কথা ল্যাটীন্ বা ইতালীয় ভাষায় লিখিত হয়। ইংরেজি ভাষায় সেইরূপ স্থলে ল্যাটিন্ বা ফরাশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে সেরূপ পথ নাই। আমাদের দেশে সেইরূপ কথা সংস্কৃতে লিখিলে চলিতে পারে বটে; কিন্তু আমাদের সদ্বিদ্বান্ পাঠকেরাও সংস্কৃত জানেন না; আমাদের অতিবিদ্বান্ লেখকেরাও সংস্কৃতে লিখিতে পারেন না—সাধারণ লোকের ত কথাই নাই। এরূপ অবস্থায়, বক্তব্য কথা যাহার আছে, তাহাকে সে কথা আমাদের নিজের ভাষাতেই বলিতে হইবে। তবে, ভরস্থার স্থল এই যে, যাহাতে জ্ঞাতব্য কথা আছে, সেরূপ পুস্তক আমাদের দেশের লোকে পড়িবে না।

সমালোচ্য গ্রন্থের সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, হিন্দু ও অহিন্দু, সকল গৃহের কর্ত্তা বা কর্ত্রী যদি কেবল নিজে এই পুস্তক পড়িয়া ইহার উপদেশ অনুসারে নিজ নিজ সংসারের ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে যে সংসার স্বাস্থ্যের, শান্তির, প্রসন্নতার ও সুখের হয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বিপ্র-

দাসবাবু এইরূপ সৎকার্য্যে ব্রতী থাকুন, ইহাই আমাদের কামনা।

এই পুস্তকের ভাষা অতি প্রাঞ্জল—যাহার কিছুমাত্র লেখাপড়া জানা আছে, সে-ই বুঝিতে পারিবে। এই পুস্তক স্ত্রী-পুরুষের কথোপকথন-রকমে কেন লিখিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এরূপ সারগর্ভ পুস্তক অনুবন্ধাকারে লিখিত হইলেই ভাল হয় না?

রত্নযুগল। শ্রীজয়গোপাল গোস্বামী।

টাইটেল্-পেজে আর কিছুই লেখা নাই—অসম্ভবের অপেক্ষাও যাহা অসম্ভব, মূল্যও লেখা নাই। গোস্বামী মহাশয়ের আত্ম-বিসর্জ্জন প্রশংসনীয়। আমরা রহস্য-পটু হইলে এমনও বলিতে পারিতাম যে, পুস্তক-খানির নাম রত্নত্রয় হইলেই ঠিক হইত; কেন না, রত্নের হিসাবে গোস্বামী মহাশয়ও ফেলিবার নহেন।

উপন্যাস লিখিলেই যে চতুর্ব্বর্গলাভ হইবে, এবং উপন্যাস না লিখিলেই যে মহা-ভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে, এরূপ কোন নৈসর্গিক নিয়ম বা ঋষিবাক্যের কথা আমরা অবগত নহি। শুনিয়াছি, গোস্বামী মহাশয় প্রবীণ এবং সংস্কৃত-সাহিত্যে সুপণ্ডিত। প্রাচীন অবস্থায় তাঁহার অদৃষ্টে উপন্যাস লিখিবার বিড়ম্বনা কেন, ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

কার্য্য-কারণ বলিয়া একটা নিয়ম যে জগতে আছে—অন্তত আমাদের মতন মূঢ়েরা যাহা স্বীকার করে—তাহা গোস্বামী মহাশয় এই উপন্যাসে একেবারে উপেক্ষা করিয়াছেন। ঘটনাগুলি যে কেন ঘটিতেছে, তাহা কিছুতেই বুঝা যায় না—তবে গোস্বামী মহাশয়ের উপন্যাস খাড়া করিবার প্রয়োজন যদি নিসর্গ-নিয়মের একটা অঙ্গ হয়, সে অন্য কথা। এই উপন্যাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা যদি করি, তাহা গ্রন্থকারের বিশেষ অপ্রীতিকর হইবার কথা! তাঁহার প্রাচীনতার খাতিরে তাহা করিতে বিরত হইলাম। কেবল এই-মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইব যে, উপন্যাসখানি—গাল-গল্প হইয়াছে মাত্র, উপন্যাস হয় নাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৮৮/এফ, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯
খাতা মুড়িও না
খাতা মুড়িও না

বঙ্গদর্শন।

ভারতবর্ষের ইতিহাস। *

আমাদের দেশে রাজা ছিলেন সমাজের একটি অঙ্গ। ব্রাহ্মণ গুরুগণও এক ভাবে সমাজরক্ষা-ধর্ম্মরক্ষায় প্রবৃত্ত ছিলেন, ক্ষত্রিয় রাজারাও অন্যভাবে সেই কার্য্যেই ব্রতী ছিলেন। দেশরক্ষা গৌণ, কিন্তু দেশের ধর্ম্ম-রক্ষাই তাঁহাদের মুখ্য কর্ত্তব্য ছিল। ভারত-বর্ষে সাধারণত রাজা সমস্ত দেশকে গ্রাস করেন নাই। তাঁহারা প্রধানব্যক্তি ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের স্থান সীমাবদ্ধ, নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেইজন্য রাজার অভাবে ভারতীয় সমাজ অঙ্গহীন হইত, দুর্ব্বল হইত, তবু মরিত না। যেমন এক চক্ষুর অভাবে অন্য চক্ষু দিয়া দৃষ্টি চলে, তেমনি স্বদেশী রাজার অভাবেও সমাজের কাজ চলিয়া গেছে।

বিদেশী রাজা আর সমস্ত অধিকার করিতে পারে, কিন্তু সামাজিক সিংহাসনের অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। সমাজই ভারতবর্ষের মর্ম্মস্থান; সেই সমাজের সহিত বিদেশী রাজার নাড়ীর সম্বন্ধ না থাকাতে যথার্থ ভারতবর্ষের সহিত তাহার সম্বন্ধ অত্যন্ত ক্ষীণ।

সকল দেশেই বিদেশী রাজা দেশের সম্পূর্ণ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না—ভারতবর্ষে আরো বেশি। কারণ, ভারত-বর্ষীয় সমাজ দুর্গের ন্যায় দৃঢ় প্রাকারের দ্বারা আপনাকে দুর্গম করিয়া রাখিয়াছে। বিদেশী অনাত্মীয় তাহার মধ্যে অবারিত পথ পায় না। এইজন্য বিদেশী সাম্রাজ্যের ইতিহাস ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস নহে। ভারত-বর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্ত ভারত-ইতিবৃত্তের অতি সামান্য অংশ—তাহা পরিশিষ্টভাগে লিখিত হইবার যোগ্য।

ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারত-বর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্নকাহিনী-মাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি-মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলেয় ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানা-টানি চলিতে লাগিল, এক দল যদি বা যায়,

* গত জ্যৈষ্ঠমাসে মজুমদার লাইব্রেরির সংসৃষ্ট আলোচনা-সমিতিতে বঙ্গদর্শন-সম্পাদক-কর্ত্তৃক পঠিত।

কোথা হইতে আর-এক দল উঠিয়া পড়ে —পাঠান-মোগল, পর্ত্তুগীজ-ফরাসী-ইংরাজ, সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু এই রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্ত্তমান স্বপ্নদৃশ্যপটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে, যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয় না। ভারতবাসী কোথায়—এ সকল ইতিহাস তাহার কোন উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নাই—কেবল যাহারা কাটাকাটি-খুনাখুনি করিয়াছে, তাহারাই আছে।

তখনকার দুর্দ্দিনেও এই কাটাকাটি-খুনাখুনিই যে ভারতবর্ষের প্রধানতম ব্যাপার, তাহা নহে। ঝড়ের দিনে যে ঝড়ই সর্ব্বপ্রধান ঘটনা, তাহা তাহার গর্জ্জনসত্ত্বেও স্বীকার করা যায় না,—সে দিনও সেই ধূলিসমাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে পল্লীর গৃহে গৃহে যে জন্ম-মৃত্যু-সুখ-দুঃখের প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহা ঢাকা পড়িলেও মানুষের পক্ষে তাহাই প্রধান। কিন্তু বিদেশী পথিকের কাছে এই ঝড়টাই প্রধান, এই ধূলিজালই তাহার চক্ষে আর সমস্তই গ্রাস করে; কারণ, সে ঘরের ভিতরে নাই, সে ঘরের বাহিরে। সেইজন্য বিদেশীর ইতিহাসে এই ধূলির কথা—ঝড়ের কথাই পাই, ঘরের কথা কিছুমাত্র পাই না। সেই ইতিহাস পড়িলে মনে হয়, ভারতবর্ষ তখন ছিল না, কেবল মোগল-পাঠানের গর্জ্জনমুখর বাত্যাবর্ত্ত শুষ্কপত্রের ধ্বজা তুলিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

কিন্তু বিদেশ যখন ছিল, দেশ তখনো ছিল, নহিলে এই সমস্ত উপদ্রবের মধ্যে কবীর, নানক, চৈতন্য, তুকারাম, ইহাদিগকে জন্ম দিল কে? তখন যে কেবল দিল্লী এবং আগ্রা ছিল, তাহা নহে—কাশী এবং নবদ্বীপও ছিল। তখন প্রকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে যে জীবনস্রোত বহিতেছিল, যে চেষ্টার তরঙ্গ উঠিতেছিল, যে সামাজিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল, তাহার বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

কিন্তু বর্ত্তমান পাঠাগ্রন্থের বহির্ভূত সেই ভারতবর্ষের সঙ্গেই আমাদের যোগ। সেই যোগের বহুবর্ষকালব্যাপী ঐতিহাসিক সূত্র বিলুপ্ত হইয়া গেলে আমাদের হৃদয় আশ্রয় পায় না। আমরা ভারতবর্ষের আগাছা-পরগাছা নহি—বহুশত শতাব্দীর মধ্য দিয়া আমাদের শতসহস্র শিকড় ভারতবর্ষের মর্ম্মস্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে এমন ইতিহাস আমাদিগকে পড়িতে হয় যে, ঠিক সেই কথাটাই আমাদের ছেলেরা ভুলিয়া যায়। মনে হয়, ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা যেন কেহই না, আগন্তুকবর্গই যেন সব।

নিজের দেশের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ এইরূপ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানিলে, কোথা হইতে আমরা প্রাণ আকর্ষণ করিব? এরূপ অবস্থায় বিদেশকে স্বদেশের স্থানে বসাইতে আমাদের মনে দ্বিধামাত্র হয় না—ভারতবর্ষের অগৌরবে আমাদের প্রাণান্তকর লজ্জাবোধ হইতে পারে না। আমরা অনায়াসেই বলিয়া থাকি, পূর্ব্বে আমাদের কিছুই ছিল না, এবং এখন আমাদিগকে অশনবসন, আচারব্যবহার, সমস্তই বিদেশীর কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া লইতে হইবে।

যে সকল দেশ ভাগ্যবান্, তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়—বাল্যকালে ইতিহাসই দেশের সহিত তাহাদের পরিচয়সাধন করাইয়া দেয়। আমাদের ঠিক তাহার উল্টা। দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মামুদের আক্রমণ হইতে লর্ড কার্জ্জনের সাম্রাজ্যগর্ব্বোদ্গারকাল পর্য্যন্ত যে কিছু ইতিহাসকথা, তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিকা—তাহা স্বদেশসম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে না, দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র। তাহা এমন স্থানে কৃত্রিম আলোক ফেলে, যাহাতে আমাদের দেশের দিক্‌টাই আমাদের চোখে অন্ধকার হইয়া যায়। সেই অন্ধকারের মধ্যে নবাবের বিলাসশালার দীপালোকে নর্ত্তকীর মণিভূষণ জ্বলিয়া উঠে; বাদ্‌শাহের সুরাপাত্রের রক্তিম ফেনোচ্ছ্বাস উন্মত্ততার জাগর-রক্ত দীপ্ত-নেত্রের ন্যায় দেখা দেয়—সেই অন্ধকারে আমাদের প্রাচীন দেবমন্দিরসকল মস্তক আবৃত করে এবং সুলতান-প্রেয়সীদের শ্বেতমর্ম্মররচিত কারুখচিত কবরচূড়া নক্ষত্রলোক চুম্বন করিতে উদ্যত হয়। সেই অন্ধকারের মধ্যে অশ্বের খুরধ্বনি, হস্তীর বৃংহিত, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, সুদূরব্যাপী শিবিরের তরঙ্গিত পাণ্ডুরতা, কিংখাব-আস্তরণের স্বর্ণচ্ছটা, মস্‌জিদের ফেনবুদ্‌বুদাকার পাষাণমণ্ডপ, খোঞ্জাপ্রহরিরক্ষিত প্রাসাদ-অন্তঃপুরে রহস্যনিকেতনের নিস্তব্ধ মৌন—এ সমস্তই বিচিত্র শব্দে ও বর্ণে ও ভাবে যে প্রকাণ্ড ইন্দ্রজাল রচনা করে, তাহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিয়া লাভ কি? তাহা ভারতবর্ষের পুণ্যমন্ত্রের পুঁথিটিকে একটি অপরূপ আরব্য উপন্যাস দিয়া মুড়িয়া রাখিয়াছে—সেই পুঁথিখানি কেহ খোলে না, সেই আরব্য উপন্যাসেরই প্রত্যেক ছত্র ছেলেরা মুখস্থ করিয়া লয়। তাহার পরে প্রলয়রাত্রে এই মোগলসাম্রাজ্য যখন মুমূর্ষু, তখন শ্মশানস্থলে দূরাগত গৃধ্রগণের পরস্পরের মধ্যে যে সকল চাতুরী-প্রবঞ্চনা-হানাহানি পড়িয়া গেল, তাহাও কি ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত? এবং তাহার পর হইতে পাঁচ পাঁচ বৎসরে বিভক্ত ছক-কাটা সতরঞ্চের মত ইংরাজশাসন, ইহার মধ্যে ভারতবর্ষ আরো ক্ষুদ্র;—বস্তুত সতরঞ্চের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, ইহার ঘরগুলি কালোয়-শাদায় সমান বিভক্ত নহে, ইহার পনেরো-আনাই শাদা। আমরা পেটের অন্নের বিনিময়ে সুশাসন, সুবিচার, সুশিক্ষা, সমস্তই একটি বৃহৎ হোয়াইট্যাওয়ে-লেড্‌ল-র দোকান হইতে কিনিয়া লইতেছি—আর সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। এই কারখানাটির বিচার হইতে বাণিজ্য পর্য্যন্ত সমস্তই সু হইতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে কেরাণীশালার এককোণে আমাদের ভারতবর্ষের স্থান অতি যৎসামান্য।

কিন্তু তবুও ভারতবর্ষ আছে। তাহা আমাদের রাষ্ট্রশালা ও পাঠ্যগ্রন্থভার নেপথ্যে রহিয়াছে। আমাদের সুশিক্ষা-সুশাসনের রঙ্গভূমির আলোকে তাহাকে দেখিতে পাই না—রঙ্গমঞ্চের উপর নানাসাজে নানা নট নাচিয়া বাহবা ও বেতন লইয়া চলিয়া যাইতেছে—সে বাহিরের বিস্তীর্ণ-নিস্তব্ধ ক্ষেত্রে ধ্রুবতারার আলোকে মৌন হইয়া বসিয়া আছে। প্রতিদিন তাহার

সহিত আমাদের—অর্থাৎ এই বিদেশী নাট্যের ভারতবর্ষীয় দর্শকদের—পরিচয় অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন বেদীর উপর হইতে কোন রাত্রে তাহার আহ্বান যদি আসে, তবে সাজ বদল করিয়া, মচ্‌মচে বুট খুলিয়া কাষায়-বসন পরিয়া করজোড়ে তাহার কাছে যাইবার পথ কি আর খুঁজিয়া পাইব? যে পতঙ্গ প্রদীপে পুড়িয়া মরিতে আসে, হায়, সেই দগ্ধপক্ষ পঙ্গু কি আর তাহার স্নিগ্ধশ্যামল জন্মভূমির কোমল ক্রোড়ে মরিবার জন্য ফিরিয়া যাইতে পারে না?

ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জ্জন না করিলে নয়। যে ব্যক্তি রথ্‌চাইল্‌ডের জীবনী পড়িয়া পাকিয়া গেছে, সে খৃষ্টের জীবনীর বেলায় তাঁহার হিসাবের খাতাপত্র ও আপিসের ডায়ারি তলব করিতে পারে; যদি সংগ্রহ করিতে না পারে, তবে তাহার অবজ্ঞা জন্মিবে এবং সে বলিবে, যাহার এক পয়সার সঙ্গতি ছিল না, তাহার আবার জীবনী কিসের? তেমনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফ্‌তর হইতে তাহার রাজবংশমালা ও জয়পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাসসম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন এবং বলেন, যেখানে পলিটিক্স নাই, সেখানে আবার হিষ্ট্রী কিসের, তাঁহারা ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না। সকল ক্ষেতের আবাদ এক নহে, ইহা জানিয়া যে ব্যক্তি যথাস্থানে উপযুক্ত শস্যের প্রত্যাশা করে, সেই প্রাজ্ঞ।

যিশুখৃষ্টের হিসাবের খাতা দেখিলে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা জন্মিতে পারে, কিন্তু তাঁহার অন্য বিষয় সন্ধান করিলে খাতাপত্র সমস্ত নগণ্য হইয়া যায়। তেমনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ভারতবর্ষকে দীন বলিয়া জানিয়াও অন্য বিশেষ দিক্ হইতে সে দীনতাকে তুচ্ছ করিতে পারা যায়। ভারতবর্ষের সেই নিজের দিক্ হইতে ভারতবর্ষকে না দেখিয়া, আমরা শিশুকাল হইতে তাহাকে খর্ব্ব করিতেছি ও নিজে খর্ব্ব হইতেছি। ইংরাজের ছেলে জানে, তাহার বাপ-পিতামহ অনেক যুদ্ধজয়, দেশ-অধিকার ও বাণিজ্যব্যবসায় করিয়াছে, সে-ও নিজেকে রণগৌরব, ধনগৌরব, রাজ্যগৌরবের অধিকারী করিতে চায়। আমরা জানি, আমাদের পিতামহগণ দেশ-অধিকার ও বাণিজ্যবিস্তার করেন নাই—এইটে জানাইবার জন্যই ভারতবর্ষের ইতিহাস। তাঁহারা কি করিয়াছিলেন জানি না, সুতরাং আমরা কি করিব, তাহাও জানি না। সুতরাং পরের নকল করিতে হয়। ভিতরে সার না থাকিলে আসল জিনিষটির নকল কেহ করিতে পারে না, তাই বিদেশী নিত্যবস্তুর পরিবর্ত্তে বিদেশী পোষাক-তক্‌মা, বিলাস-বিহার-চালচলন গ্রহণ করিয়া প্রচুর বাক্যাড়ম্বরে সমস্ত শূন্যতাকে স্ফীত করিয়া তুলিতে হয়। আমরা কন্‌গ্রেস্ করিতেছি, মনে করিতেছি যেন আমরা লড়াই করিতেছি; ভিক্ষাপত্রে সই করিতে একত্র হইয়াছি, মনে করিতেছি আমরা পার্লামেণ্ট করিতেছি; যথেচ্ছাচার করিতেছি, মনে করিতেছি আমরা সমাজ-সংস্কারক; পরের সমস্ত সংস্কার অন্ধভাবে গ্রহণ করাকেই বলিতেছি ঔদার্য্য, নিজের

সমস্ত সংস্কার অন্ধভাবে ত্যাগ করাকেই বলিতেছি কুসংস্কারমুক্তি।

ইহার জন্য কাহাকে দোষ দিব? ছেলেবেলা হইতে আমরা যে প্রণালীতে যে শিক্ষা পাই, তাহাতে প্রতিদিন দেশের সহিত আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়া ক্রমে দেশের বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহভাব জন্মে। সেই দেশ-বিদ্রোহ সর্ব্বাঙ্গে এবং সকল মনে বহন করিয়া আমরা কন্‌গ্রেস্ করি,—ভাষায়, ভাবনায়, ভঙ্গীতে সেই দেশবিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইয়া আমরা দেশের কাজ করিতেছি বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকি।

আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও ক্ষণে ক্ষণে হতবুদ্ধির ন্যায় বলিয়া উঠেন, দেশ তুমি কাহাকে বল, আমাদের দেশের বিশেষ ভাবটা কি, তাহা কোথায় আছে, তাহা কোথায় ছিল? প্রশ্ন করিয়া ইহার উত্তর পাওয়া যায় না। কারণ, কথাটা এত সূক্ষ্ম, এত বৃহৎ যে, ইহা কেবলমাত্র যুক্তির দ্বারা বোধগম্য নহে। ইংরাজ বল, ফরাসী বল, কোন দেশের লোকই আপনার দেশীয় ভাবটি কি, দেশের মূল মর্ম্মস্থানটি কোথায়, তাহা এক কথায় ব্যক্ত করিতে পারে না—তাহা দেহস্থিত প্রাণের ন্যায় প্রত্যক্ষ সত্য, অথচ প্রাণের ন্যায় সংজ্ঞা ও ধারণার পক্ষে দুর্গম। তাহা শিশুকাল হইতে আমাদের জ্ঞানের ভিতর, আমাদের প্রেমের ভিতর, আমাদের কল্পনার ভিতর নানা অলক্ষ্য পথ দিয়া নানা আকারে প্রবেশ করে। সে তাহার বিচিত্র শক্তি দিয়া আমাদিগকে নিগূঢ়ভাবে গড়িয়া তোলে—আমাদের অতীতের সহিত বর্ত্তমানের ব্যবধান ঘটিতে দেয় না—তাহারই প্রসাদে আমরা বৃহৎ, আমরা বিচ্ছিন্ন নহি। এই বিচিত্র উদ্যমসম্পন্ন গুপ্ত পুরাতনী শক্তিকে সংশয়ী জিজ্ঞাসুর কাছে আমরা সংজ্ঞার দ্বারা দুই-চার কথায় ব্যক্ত করিব কি করিয়া?

এই প্রত্যক্ষ, অন্তরতর, অথচ আয়ত্তের অতীত স্বদেশসত্তা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উঠে—তর্ক উঠে, তাহার কারণ, বাল্যকাল হইতে আমাদের জ্ঞান-প্রেম-কল্পনার দ্বারে গোরা-সৈন্যের পাহারা বসে—আমাদের প্রকৃতির অন্তঃপুরের মধ্যে স্বদেশলক্ষ্মী প্রবেশ করিতে পান না—বিদেশ হইতে আনীত যুক্তি-সংশয় প্রভৃতি কতকগুলা কিঙ্কর-কিঙ্করী সেখানে ভিড় করিয়া বেড়ায়, কিন্তু যিনি তাহাদের কর্ত্রী হইয়া তাহাদিগকে আপন কল্যাণের কাজে, ঐক্যের মহোৎসবে খাটাইতে পারিতেন, তিনি নাই। তাই আমাদের এমন লক্ষ্মীছাড়ার দশা, তাই এই ভিক্ষাবৃত্তি, এই উচ্ছৃঙ্খলতা। তাই এমন বারংবার আড়ম্বরপূর্ণ অকৃতকার্য্যতা, বাক্যে ও কর্ম্মে, শিক্ষায় ও ব্যবহারে তাই পদে পদে অসামঞ্জস্য। সেই মহালক্ষ্মী, যিনি পিতার সহিত পুত্রকে, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতাকে, নিকটের সহিত দূরকে, অনাগতের সহিত অতীতকে, ভিতরের সহিত বাহিরকে অদৃশ্য ঐক্যবন্ধনে চিরকাল গ্রথিত করিতেছেন, তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দাও! তিনি সমস্ত জ্যামিতি, বীজগণিত, ব্যাকরণ, ভূগোল ও অর্থপুস্তকের পর্ব্বতস্তূপ বিদীর্ণ করিয়া আমাদের হৃদয়ের অন্তঃপুরে তাঁহার চিরন্তন সিংহাসনে আসিয়া বসুন—

সমস্ত শূন্য পূর্ণ হইবে, সমস্ত সংশয় দূর হইবে।

কিন্তু আমাদের প্রকৃতির দ্বারের কাছে এই যে সকল জঞ্জাল জমিয়া আছে, যাহাতে বাহিরের আলো আমাদের বাহিরেই পড়িয়া থাকে এবং অন্তরের ধন আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, তাহার মধ্য দিয়া পথ করিবে কে? প্রতিদিনের প্রহসন ও পরিণামের বিভীষিকা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে কে?

ভারতবর্ষের একখানি প্রকৃত ইতিহাস এই হাস্যকর—এই শোকাবহ বিড়ম্বনা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবার একমাত্র উপায়। বিদেশী আক্রমণপরম্পরার তারিখ-কণ্টকিত সমস্ত জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ভারতবর্ষের চিরন্তন রাজপথটি উদ্ঘাটিত করিতে হইবে। দেখিব, সেই প্রাচীন পথটি নদীজালজড়িত বঙ্গদেশ হইতে পঞ্চধারাবিধৌত ব্রহ্মাবর্ত্তে চলিয়া গেছে; দেখিব, কত-শত জীর্ণ, কত-শত নবসংস্কৃত পান্থশালা দুইধারে রাখিয়া এই পুরাতন পথ সহস্র বৎসরের ভিতর দিয়া মানব-সভ্যতা-ইতিহাসের সুদূর প্রান্তভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই পান্থশালাগুলি জীর্ণ হউক, সংস্কৃত হউক, ভগ্ন ইষ্টকের স্তূপ হউক, কালে কালে আমাদের পিতামহগণ ইহা আশ্রয় করিয়াছিলেন—ইহারা তাঁহাদেরই চেষ্টার পথ, চিন্তার পথ, যাত্রার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে, ইহাই মনে রাখিয়া ভক্তির দৃষ্টিতে তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে হইবে;—বিদেশীর বিচারের আদর্শ দূরে পরিহার করিয়া শ্রদ্ধার সাহায্যে পিতামহগণের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।

নহিলে আমরা ভুল বুঝিব। বিদ্বেষ-বুদ্ধির দ্বারা আমরা কোনমতেই প্রাচীন-কালের বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত প্রমাণাংশগুলিকে ঐক্যদান করিয়া সঞ্জীবিত করিতে পারিব না। ছড়ানোকে টানিয়া আনিবার এবং ভাঙাকে জোড়া দিবার শক্তি শ্রদ্ধা-ভক্তি ও অনুরাগেরই আছে। সেই সঙ্গে বুদ্ধি-বিচারকে নির্ব্বাসন দিতে বলি না। বুদ্ধি-বিচার কাজ করিবে, সংশোধন করিবে, কিন্তু সৃজন করিবে শ্রদ্ধা।

এই শ্রদ্ধা না থাকিলে আমরা ভুল করিব। কারণ, যে সকল আধুনিক বিদেশী সংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেছে, ভারতের প্রাচীন-ইতিহাস-আলোচনা-কালে তাহাদিগকে সংযত করিয়া না রাখিলে, তাহারা অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখান যাইতে পারে, জাতি-ভেদ। এই জাতিভেদের 'পরে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা যদি থাকে, তবে ভারতবর্ষের ইতিহাস ঠিক-ভাবে লেখা একেবারেই অসম্ভব হয়। বর্ণভেদ ভারতসমাজের আধার। কেন এমন হইল? ভারতবর্ষীয় প্রতিভা সমাজকে বর্ণভেদের উপর স্থাপন করিয়া গড়িয়া তুলিল কেন?

আধুনিক সংস্কারগুলিকে বক্ষে পোষণ করিয়া লইয়া বসিলে আমরা উধোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে চাপাই। যদি বর্ণভেদের উপর আমাদের রাগ থাকে, ভারতবর্ষের যেখানে যত-কিছু দুর্গতি হইয়াছে, সমস্তই ঐ বর্ণ-ভেদের ঘাড়েই চাপান হয়।

বাহির হইতে আমাদের পায়ের তলায় যদি সাংঘাতিক ঘা লাগে, তবে সমস্ত পা আগাগোড়া পচিয়া উঠিতে পারে—ক্ষতের সংসর্গে সজীব অংশ দূষিত হইয়া নিজের কাজ-চালাইতে অক্ষম হয়। তেমনি বাহ্য কারণে দেশের যখন দুর্গতি ঘটে, তখন তাহার ভিতরের যন্ত্রতন্ত্রগুলি কেবল যে বিকল হয়, তাহা নয়, দূষিতও হইতে পারে। সে দোষ তাহার আন্তরিক নহে, তাহা আগন্তুক।

অতএব, দুর্গতিপ্রাপ্ত ভারতবর্ষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া প্রাচীন ভারত-বর্ষের আদর্শকে লঘুভাবে বিচার করা চলে না। তাহা ছাড়া, য়ুরোপের আদর্শকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ আদর্শ কল্পনা করিয়া তাহারই দিকে দাঁড়াইয়া বিপর্য্যস্ত দূরবীক্ষণ দিয়া ভারতবর্ষকে অতি ক্ষুদ্র করিয়া দেখিলেও ভারতবর্ষকে দেখা হইবে না।

ভারতবর্ষীয় সমাজপ্রকৃতিসম্বন্ধে আর একটা বিভীষিকা আমাদিগকে চঞ্চল করিয়া তোলে। আমরা বলি—"ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে ভারতবর্ষ, সমাজের মাপে ছাঁটিয়া ফেলিতে চায়, সেটা উচ্চ অঙ্গের সভ্যতার লক্ষণ নহে। কেবল সমাজের দিক্ দেখিলে হইবে না। মানুষের নিজের একটা দিক্ আছে। সমাজ এমন হওয়া চাই, যাহাতে মানুষ তাহার নিজত্বকে যথাসম্ভব সার্থকতা দিতে পারে।" ভারতবর্ষীয় সভ্যতাকে এই দিক্ হইতে আক্রমণ করা যায়, এইরূপ আমাদের অনে-কের বিশ্বাস।

মানুষ নিজেকে লাভ করিবে, নিজেকে পরিণতিদান করিবে, এ সব কথা ভাল। ভারতবর্ষেরও সেই অভিপ্রায় ছিল এবং য়ুরোপেরও সেই অভিপ্রায়। কিন্তু এই প্রকৃত নিজত্বটা যে কি, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলে তাহার লাভের উপায়সম্বন্ধেও পথ-ভেদ ঘটে। অতিরিক্ত সার দিলে গাছের অতি-বাড় হইয়া তাহার ডালপালাপাতার প্রাচুর্য্য হয়, তাহাতে ফসল হয় না। যে ব্যক্তি ডালপালার অতিবৃদ্ধিকেই প্রাধান্য দেয়, সে যে-ভাবে চাষ করে, যে ব্যক্তি ফসল চায়, সে সে-ভাবে করে না, সে সার প্রভৃতিকে পরিমিত করিয়া আনে।

ভারতবর্ষ বলে, প্রবৃত্তিকে অতিরিক্ত সার জোগাইলে তাহাতে আমাদের ডালপালা বাড়ে, কিন্তু ফসল নষ্ট হয়। ভারতবর্ষ ডালপালার অতিবৃদ্ধি চায় নাই বলিয়া বাল্যকাল হইতে প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করি-য়াছে। ইহা বিশেষরূপে ব্যক্তিগত সার্থ-কতারই জন্য, সমাজের জন্য নহে। স্পার্টান্-সমাজ মানুষকে বিশেষ একটা সমাজের উপযোগী করিবার জন্যই চেষ্টা করিত, কিন্তু ভারতবর্ষ তাহার সন্তানদিগকে ব্যক্তিগত চরমপরিণতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই গড়িত। তাহার ব্রহ্মচর্য্যের অর্থই এই, প্রবৃত্তির চাঞ্চ-ল্যকে খর্ব্ব করিয়া যথার্থ মানুষটিকে বাহির করিয়া আনা। সংযমের সার্থকতাই তাই। সাহিত্যে যে সংযম, তাহার অর্থ এই, ভিত-রের ভাবটিকে উজ্জ্বল করিয়া বাহির করিবার জন্য বাহিরের আড়ম্বরকে নিয়মিত করা। যে লোক বকিতে ভালবাসে, তাহাকে বকিতে দিলে তাহার যথেষ্ট সুখ হয়, বক্তৃনিও পল্লবিত হইয়া উঠে, কিন্তু বক্তৃতার যথার্থ বিষয়টি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

ভারতবর্ষের চতুরাশ্রমের প্রতি ভাল

করিয়া মনোযোগ করিলে দেখা যায়, ভারতবর্ষ গৃহস্থাশ্রমকে আত্মার বিকাশের একটি সোপানস্বরূপ গণ্য করিত। সুতরাং তাহাকেই চরমলক্ষ্য করিয়া ভারতবর্ষ মানুষ গড়িতে চায় নাই। বরঞ্চ ভারতবর্ষ এমন করিয়া তাহার গৃহস্থাশ্রমকে গড়িতে চাহিয়াছে, যাহাতে সে মানুষের আত্মাকে মুক্তির পথে অগ্রসর করে, বাধা না দেয়—যাহাতে প্রবৃত্তিকে যথাপথে নিয়মিত করিয়া ভোগের সঙ্গে সঙ্গে ভোগনিবৃত্তিরও চর্চ্চা থাকে। কারণ, এই পুরাতন সত্য ভারতবর্ষ বিস্মৃত হয় নাই যে—

ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি।

প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ দমন করিলে প্রবৃত্তিকে নিষ্ফল করা হয় এবং প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিতে থাকিলেও বিনাশকে আহ্বান করা হয়। এইজন্য ভারতবর্ষ মনুষ্যত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই গৃহস্থাশ্রমে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সামঞ্জস্য চেষ্টা করিয়াছিল। সেইজন্যই বলি, ভারতবর্ষ ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের প্রতি যেমন একান্ত লক্ষ্য রাখিয়াছিল, য়ুরোপ তেমন করে নাই।

আশঙ্কা হইতেছে, ইহার পরে এমন কথা উঠিবে, তবে অত স্বাতন্ত্র্য ভাল নয়। অর্থাৎ ভারতবর্ষকে শাঁখের করাতে কাটিতে হইবে।

ছন্দের বন্ধন খুব কড়া বন্ধন—কিন্তু সেই বন্ধন কবিত্বের ভাবকে ফোয়ারার মত সবেগে মুক্তিদান করে। ভারতবর্ষে গৃহের বন্ধন অত্যন্ত বেশি—বাপমায়ের সঙ্গে বন্ধন, ভাইয়ের সঙ্গে বন্ধন, সন্তানের সঙ্গে বন্ধন, প্রতিবেশীর সঙ্গে বন্ধন—এমন বন্ধন য়ুরোপে নাই। অতএব স্বাতন্ত্র্যের দিক্ ছাড়িয়া বন্ধনের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে বলিতে হইবে, যথেষ্ট হইয়াছে। অথচ এই সকল বন্ধনকে স্বীকার করিয়াও ভারতবর্ষ তাহাদিগকে চরম করিয়া তোলে নাই—ব্যক্তির পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্যকে ইহার মধ্য হইতে উদ্ভিন্ন করিবার জন্য ভারতবর্ষ তাড়া দিতেছে। বীজের ভিতরেই প্রকৃতির তাড়া যেমন অঙ্কুরকে বীজ বিদীর্ণ করিতে—মাটিভেদ করিতে বলে, তেমনি গৃহের নিবিড় বন্ধনের ভিতরে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার জন্য—স্বতন্ত্র হইবার জন্য আমাদিগকে উদ্বোধিত করে।

ইহার পরে কথা উঠিবে, অত বৈপরীত্য ভাল নয়—অত্যন্ত বন্ধন এবং অত্যন্ত মুক্তির সামঞ্জস্য হয় না। আবার শাঁখের করাত।

উত্তর এই যে, এখানে বৈপরীত্য বাহ্যিক। ভারতবর্ষ যাহাকে মুক্তি বলে, ভারতবর্ষীয় সমাজের বন্ধন তাহার বিরোধী নহে, তাহার অনুকূল। এই সকল বন্ধনে প্রীতিপ্রবৃত্তি, কল্যাণপ্রবৃত্তি প্রধান হইয়া স্বার্থপ্রবৃত্তিকে পদে পদে দমন করে। তাহাতে প্রেমের আনন্দ, মঙ্গলের শান্তি স্বার্থের মত্ততাকে অভিভূত করিয়া নীচে ফেলিয়া রাখে।

ইহাতে আপত্তি এই উঠে, এত সংযমের চর্চ্চায় সমাজ কি শেষে কল হইয়া দাঁড়ায় না?

সমাজমাত্রই কল হইয়া উঠিতে চায়। য়ুরোপীয় সমাজে কলের লক্ষণ যথেষ্ট আছে। সমাজ যদি থাকিয়া-থাকিয়া কল হইয়া না উঠিত, তবে মহাপুরুষের প্রয়োজন হইত না। কর্ম্ম যখন উদ্দেশ্যকে বিস্মৃত হয়, অভ্যাস যখন আদর্শকে হারাইয়া ফেলে, তখন মহাপুরুষেরা আসিয়া দেহের মধ্যে আত্মাকে জাগ্রত করেন, উপায়ের মধ্যে উদ্দেশ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁহারা পুরাতনকে নবীন করেন।

ভারতবর্ষীয় সমাজ সম্প্রতি কল হইয়া আছে। বিকৃত ঘড়ির মত তাহা এমন-একটা পদার্থ হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার কল চলিতেছে, কিন্তু কাঁটা চলিতেছে না, সময় অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু সে অগ্রসর হইতেছে না। তাহার দম ফুরায় নাই বটে, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। তাই সে চলিতেছে, কিন্তু কাজে লাগিতেছে না।

সেই কারণেই আমরা সেই মহাপুরুষের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি, যিনি এই দারুণ বিস্মৃতির দিনে ভারতবর্ষের প্রাচীন সার্থকতাকে স্মরণ করিবেন। এই সমাজ কিসের উপযোগী, কি জন্য ইহার সৃষ্টি, তাহা সুস্পষ্ট বুঝিয়া সেই সজীব উদ্দেশ্যকে এই সমাজের সহিত যোজনা করিয়া দিবেন। ঐতিহাসিক তাঁহাকেই সাহায্য করিবেন। সেই ঐতিহাসিক ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। বিদেশী বাধি বুলির দ্বারা স্বদেশকে বুঝা যায় না।

ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কি, এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, সে উত্তর আছে; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা,—বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।

এই এককে প্রত্যক্ষ করা এবং ঐক্যবিস্তারের চেষ্টা করা ভারতবর্ষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। তাহার এই স্বভাবই তাহাকে চিরদিন রাষ্ট্রগৌরবের প্রতি উদাসীন করিয়াছে। কারণ, রাষ্ট্রগৌরবের মূলে বিরোধের ভাব। যাহারা পরকে একান্ত পর বলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে অনুভব না করে, তাহারা রাষ্ট্রগৌরবলাভকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতে পারে না। পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা, তাহাই পোলিটিক্যাল্ উন্নতির ভিত্তি—এবং পরের সহিত আপনার সম্বন্ধবন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্যস্থাপনের চেষ্টা, ইহাই ধর্ম্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি। য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা বিরোধমূলক; ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা মিলনমূলক। য়ুরোপীয় পোলিটিক্যাল্ ঐক্যের ভিতরে যে বিরোধের ফাঁস রহিয়াছে, তাহা তাহাকে পরের বিরুদ্ধে টানিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু তাহাকে নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য দিতে পারে না। এইজন্য তাহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, রাজায় প্রজায়, ধনীতে দরিদ্রে বিচ্ছেদ ও বিরোধকে সর্ব্বদা জাগ্রত করিয়াই রাখিয়াছে। তাহারা সকলে মিলিয়া যে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট অধিকারের দ্বারা সমগ্র সমাজকে বহন করিতেছে, তাহা নয়, তাহারা পরস্পরের প্রতিকূল

—যাহাতে কোন পক্ষের বলবৃদ্ধি না হয়, অপর পক্ষের ইহাই প্রাণপণ সতর্ক চেষ্টা। কিন্তু সকলে মিলিয়া যেখানে ঠেলাঠেলি করিতেছে, সেখানে বলের সামঞ্জস্য হইতে পারে না—সেখানে কালক্রমে জনসংখ্যা যোগ্যতার অপেক্ষা বড় হইয়া উঠে, উদ্যম গুণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করে, এবং বণিকের ধনসংহতি গৃহস্থের ধনভাণ্ডারগুলিকে অভিভূত করিয়া ফেলে—এইরূপে সমাজের সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায় এবং এই সকল বিসদৃশ বিরোধী অঙ্গগুলিকে কোনমতে জোড়াতাড়া দিয়া রাখিবার জন্য গবর্মেণ্ট্ কেবলই আইনের পর আইন সৃষ্টি করিতে থাকে। ইহা অবশ্যম্ভাবী। কারণ বিরোধ যাহার বীজ, বিরোধই তাহার শস্য; মাঝখানে যে পরিপুষ্ট পল্লবিত ব্যাপারটিকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই বিরোধশস্যেরই প্রাণবান্ বলবান্ বৃক্ষ।

ভারতবর্ষ বিসদৃশকেও সম্বন্ধবন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে। যেখানে যথার্থ পার্থক্য আছে, সেখানে সেই পার্থক্যকে যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করিয়া—সংযত করিয়া তবে তাহাকে ঐক্যদান করা সম্ভব। সকলেই এক হইল বলিয়া আইন করিলেই এক হয় না। যাহারা এক হইবার নহে, তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনের উপায় তাহাদিগকে পৃথক্ অধিকারের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া। পৃথক্‌কে বলপূর্ব্বক এক করিলে তাহারা একদিন বলপূর্ব্বক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সেই বিচ্ছেদের সময় প্রলয় ঘটে। ভারতবর্ষ মিলনসাধনের এই রহস্য জানিত। ফরাসীবিদ্রোহ গায়ের জোরে মানবের সমস্ত পার্থক্য রক্ত দিয়া মুছিয়া ফেলিবে, এমন স্পর্দ্ধা করিয়াছিল—কিন্তু ফল উল্‌টা হইয়াছে—য়ুরোপে রাজশক্তি-প্রজাশক্তি, ধনশক্তি-জনশক্তি, ক্রমেই অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল সকলকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করা, কিন্তু তাহার উপায় ছিল স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষ সমাজের সমস্ত প্রতিযোগী বিরোধী শক্তিকে সীমাবদ্ধ ও বিভক্ত করিয়া সমাজকলেবরকে এক এবং বিচিত্র-কর্ম্মের উপযোগী করিয়াছিল—নিজ নিজ অধিকারকে ক্রমাগতই লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিয়া বিরোধ-বিশৃঙ্খলা জাগ্রত করিয়া রাখিতে দেয় নাই। পরস্পর প্রতিযোগিতার পথেই সমাজের সকল শক্তিকে অহরহ সংগ্রামপরায়ণ করিয়া তুলিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম-গৃহ সমস্তকেই আবর্ত্তিত, আবিল, উদ্ভ্রান্ত করিয়া রাখে নাই। ঐক্যনির্ণয়, মিলনসাধন, এবং শান্তি ও স্থিতির মধ্যে পরিপূর্ণ পরিণতি ও মুক্তিলাভের অবকাশ, ইহাই ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল।

বিধাতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টানিয়া আনিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় আর্য্য যে শক্তি পাইয়াছে, সেই শক্তি চর্চ্চা করিবার অবসর ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকাল হইতেই পাইয়াছে। ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তিনির্ম্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসঙ্গত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে,

সমস্তই স্বীকার করিয়াছে। এত গ্রহণ করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে হইলে এই পুঞ্জীভূত সামগ্রীর মধ্যে নিজের ব্যবস্থা, নিজের শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হয়—পশুযূথভূমিতে পশুদলের মত ইহাদিগকে পরস্পরের উপর ছাড়িয়া দিলে চলে না। ইহাদিগকে বিহিত নিয়মে বিভক্ত-স্বতন্ত্র করিয়া একটি মূলভাবের দ্বারা বদ্ধ করিতে হয়। উপকরণ যেখানকার হউক, সেই শৃঙ্খলা ভারতবর্ষের, সেই মূলভাবটি ভারতবর্ষের। য়ুরোপ পরকে দূর করিয়া, উৎসাদন করিয়া সমাজকে নিরাপদ্ রাখিতে চায়; আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিয়ুজীলাণ্ড, কেপ্‌কলনিতে তাহার পরিচয় আমরা আজ পর্য্যন্ত পাইতেছি। ইহার কারণ, তাহার নিজের সমাজের মধ্যে একটি সুবিহিত শৃঙ্খলার ভাব নাই—তাহার নিজেরই ভিন্ন সম্প্রদায়কে সে যথোচিত স্থান দিতে পারে নাই এবং যাহারা সমাজের অঙ্গ, তাহাদের অনেকেই সমাজের বোঝার মত হইয়াছে—এরূপ স্থলে বাহিরের লোককে সে সমাজ নিজের কোন্‌খানে আশ্রয় দিবে? আত্মীয়ই যেখানে উপদ্রব করিতে উদ্যত, সেখানে বাহিরের লোককে কেহ স্থান দিতে চায় না। যে সমাজে শৃঙ্খলা আছে, ঐক্যের বিধান আছে, সকলের স্বতন্ত্র স্থান ও অধিকার আছে, সেই সমাজেই পরকে আপন করিয়া লওয়া সহজ। হয় পরকে কাটিয়া-মারিয়া-খেদাইয়া নিজের সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করা, নয় পরকে নিজের বিধানে সংযত করিয়া সুবিহিত শৃঙ্খলার মধ্যে স্থান করিয়া দেওয়া, এই দুইরকম হইতে পারে। য়ুরোপ প্রথম প্রণালীটি অবলম্বন করিয়া সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে বিরোধ উদ্যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে—ভারতবর্ষ দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়া সকলকেই ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে আপনার করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। যদি ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, যদি ধর্ম্মকেই মানবসভ্যতার চরম আদর্শ বলিয়া স্থির করা যায়, তবে ভারতবর্ষের প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠতা দিতে হইবে।

পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। শেক্‌স্‌পিয়র কোথা হইতে কি আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাহা সন্ধান করিতে বসিলে নানা ভাণ্ডারেই তাঁহার প্রবেশাধিকার আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু আপনার করিবার শক্তি ছিল বলিয়াই তিনি এত লইতে পারিয়াছেন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সেই প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ অসঙ্কোচে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনায়াসে অন্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে। বিদেশী যাহাকে পৌত্তলিকতা বলে, ভারতবর্ষ তাহাকে দেখিয়া ভীত হয় নাই, নাসা কুঞ্চিত করে নাই। ভারতবর্ষ পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে—তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে।

এই ঐক্যবিস্তার ও শৃঙ্খলাস্থাপন

কেবল সমাজব্যবস্থায় নহে, ধর্ম্মনীতিতেও দেখি। গীতায় জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ-সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেষ্টা দেখি, তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের। য়ুরোপে রিলিজন্ বলিয়া যে শব্দ আছে, ভারতবর্ষীয় ভাষায় তাহার অনুবাদ অসম্ভব—কারণ ভারতবর্ষ ধর্ম্মের মধ্যে মানসিক বিচ্ছেদ ঘটিতে বাধা দিয়াছে—আমাদের বুদ্ধি-বিশ্বাস-আচরণ, আমাদের ইহকাল-পরকাল, সমস্ত জড়াইয়াই ধর্ম্ম। ভারতবর্ষ তাহাকে খণ্ডিত করিয়া কোনটাকে পোষাকী এবং কোনটাকে আটপৌরে করিয়া রাখে নাই। হাতের জীবন, পায়ের জীবন, মাথার জীবন, উদরের জীবন যেমন আলাদা নয়, বিশ্বাসের ধর্ম্ম, আচরণের ধর্ম্ম, রবিবারের ধর্ম্ম, অপর ছয়দিনের ধর্ম্ম, গির্জ্জার ধর্ম্ম এবং গৃহের ধর্ম্মে ভারতবর্ষ ভেদ ঘটাইয়া দেয় নাই। ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সমস্ত সমাজেরই ধর্ম্ম—তাহার মূল মাটির ভিতরে এবং মাথা আকাশের মধ্যে—তাহার মূলকে স্বতন্ত্র ও মাথাকে স্বতন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষ দেখে নাই—ধর্ম্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোকভূলোকব্যাপী, মানবের সমস্ত জীবনব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে।

পৃথিবীর সভ্যসমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্ম্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধা-বিপত্তি-দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব, তখন আমাদের বর্ত্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ লোপ পাইবে।

বিদেশের শিক্ষা ভারতবর্ষকে অতীতে ও বর্ত্তমানে দ্বিধা বিভক্ত করিতেছে। যিনি সেতু নির্ম্মাণ করিবেন, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। যদি সেই সেতু নির্ম্মিত হয়, তবে এই দ্বিধারও সফলতা আছে—কারণ বিচ্ছেদের আঘাত না পাইলে মিলন সচেতন হয় না। যদি আমাদের মধ্যে কিছুমাত্র পদার্থ থাকে, তবে বিদেশ আমাদিগকে যে আঘাত করিতেছে, সেই আঘাতে স্বদেশকেই আমরা নিবিড়তররূপে উপলব্ধি করিব। প্রবাসে নির্ব্বাসনই আমাদের কাছে গৃহের মাহাত্ম্যকে মহত্তম করিয়া তুলিবে।

মামুদ ও মহম্মদঘোরীর বিজয়বার্ত্তার সমস্ত তারিখ আমরা মুখস্থ করিয়া পরীক্ষার প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছি, এখন যিনি সমস্ত ভারতবর্ষকে আমাদের সম্মুখে মূর্ত্তিমান্ করিয়া তুলিবেন, অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া সেই ঐতিহাসিককে আমরা আহ্বান করিতেছি। তিনি তাঁহার শ্রদ্ধার দ্বারা আমাদের মধ্যে শ্রদ্ধার সঞ্চার করিবেন, আমাদিগকে প্রতিষ্ঠাদান করিবেন, আমাদের আত্ম-উপহাস আত্ম-অবিশ্বাসকে অতি অনায়াসে তিরস্কৃত করিবেন, আমাদিগকে এমন প্রাচীন সম্পদের অধিকারী করিবেন যে, পরের ছদ্মবেশে নিজের লজ্জা লুকাইবার

আর প্রবৃত্তি থাকিবে না। তখন এ কথা আমরা বুঝিব, পৃথিবীতে ভারতবর্ষের একটি মহৎ স্থান আছে, আমাদের মধ্যে মহৎ আশার কারণ আছে; আমরা কেবল গ্রহণ করিব না—অনুকরণ করিব না, দান করিব—প্রবর্ত্তন করিব, এমন সম্ভাবনা আছে; পলিটিক্স এবং বাণিজ্যই আমাদের চরমতম গতি-মুক্তি নহে, প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্যের পথে বৈরাগ্য-কঠিন দারিদ্র্যগৌরব শিরোধার্য্য করিয়া দুর্গম-নির্ম্মল মাহাত্ম্যের উন্নততম শিখরে অধিরোহণ করিবার জন্য আমাদের ঋষি-পিতামহদের সুগম্ভীর নিদেশ-নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হইয়াছি; সে পথে পণ্যভারাক্রান্ত অন্য কোন পান্থ নাই বলিয়া আমরা ফিরিব না, অন্নভারনত শিক্ষকমহাশয় সে পথে চলিতেছেন না বলিয়া লজ্জিত হইব না। মূল্য না দিলে কোন মূল্যবান্ জিনিষকে আপনার করা যায় না। ভিক্ষা করিতে গেলে কেবল খুদকুঁড়া মেলে, তাহাতে পেট অল্পই ভরে, অথচ জাতিও থাকে না। বিদেশকে যতক্ষণ আমরা কিছু দিতে পারি না, বিদেশ হইতে ততক্ষণ আমরা কিছু লইতেও পারি না; লইলেও তাহার সঙ্গে আত্মসম্মান থাকে না বলিয়াই তাহা তেমন করিয়া আপনার হয় না; সঙ্কোচে সে অধিকার চিরদিন অসম্পূর্ণ ও অসঙ্গত হইয়া থাকে। যখন গৌরবসহকারে দিব, তখন গৌরবসহকারে লইব। হে ঐতিহাসিক, আমাদের সেই দিবার সম্পত্তি কোন্ প্রাচীন ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া আছে, তাহা দেখাইয়া দাও, তাহার দ্বার উদ্ঘাটন কর। তাহার পর হইতে আমাদের গ্রহণ করিবার শক্তি বাধাহীন ও অকুণ্ঠিত হইবে, আমাদের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি অকৃত্রিম ও স্বভাবসিদ্ধ হইয়া উঠিবে। দেখ, আমাদের শিক্ষকমহাশয়েরা উপলক্ষ্য পাইবামাত্র খোঁটা দিয়া থাকেন—"তোমরা কেবল শিখিতেছ, কিন্তু শিক্ষার কোন ফল দেখাইতেছ না—তোমাদের নিজের কিছুই নাই, তোমরা ওরিজিন্যালিটি-হীন।" পরের অন্নে যে অকর্ম্মণ্য প্রতিপালিত, মুখরা গৃহকর্ত্রী তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করাইয়া দেন—"তুমি কেবল গিলিতেছ, কিন্তু কিছুই করিতেছ না।" তখন সে হতভাগ্যের এ সত্যকথাটুকু বলিবারও মুখ থাকে না যে, "তুমি সিকি-ছটাক অর্দ্ধসিদ্ধ ডালে পাঁচপোয়া বিশুদ্ধ জল মিশাইয়া যে পথ্য দিতেছ, তাহাতে কাজ করিবার সামর্থ্য থাকে না!" এ কথা বলিলেই তাহার জবাব এই যে, "তুমি নিজে উপার্জ্জন করিয়া খাও, মনের মত ডাল-ভাত খাইতে পারিবে।" আমাদের অর্দ্ধপক্ক শিক্ষা আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে মিশিতেছে না বলিয়াই তাহাকে আমরা কোন কাজে লাগাইতে পারিতেছি না, এ কথা বলিয়া অরণ্যে রোদন করা বৃথা—কারণ, বিদেশী শিক্ষক কোনমতেই শিক্ষাকে আমাদের অনুকূল করিতে পারে না। একে ত তাহারা আমাদিগকে জানেই না, তাহার পরে আমাদের প্রতি তাহাদের অবজ্ঞার সীমা নাই। দম্ভে যে মূঢ়তা আনে, তাহার মত প্রবল মূঢ়তা আর নাই—সভ্যতার উৎকট দম্ভে আমাদের পাশ্চাত্য অধ্যাপকেরা নিজেদের সংস্কার ছাড়া অন্য সংস্কারের সভ্যতা একেবারে দেখিতে পান না—যেখানে আমাদের বহুদিনের বেড়া দেওয়া আছে, সেখানে তাঁহাদের অসহিষ্ণু

সংস্কারের চার ঘোড়ার গাড়ি কেন অনায়াসে চলিবে না, তাহা তাঁহারা কিছুতেই ভাবিয়া পান না। যদি না চলে, তবে স্থির করেন, সেটা কেবল আমাদেরই দোষ, সেটা যে তাঁহাদেরও উদ্ধত বর্ব্বরতা হইতে পারে, তাহা কল্পনা করিবার শক্তিও তাঁহাদের নাই। বিশেষত আজকাল হঠাৎ ইংলণ্ডে উচ্চ-শ্রেণীর ভাবুকলোকের একেবারে অভাব ঘটাতে ইংরাজের জাতীয় মদমত্ততা সর্ব্ব-প্রকার সদ্বিবেচনা ও মঙ্গলের বন্ধন একে-বারে উন্মূলন করিতে উদ্যত হইয়াছে; ইংরাজ নিজেকে সর্ব্বত্র প্রসারিত, দ্বিগুণিত, চতুর্গুণিত করাকেই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেয় বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে, তাহাদের বুদ্ধি-বিচারের এই উন্মত্ত অন্ধ অবস্থায় তাহারা ধৈর্য্যের সহিত আমাদিগকে শিক্ষাদান করিতে পারে না। উপনিষদে অনুশাসন আছে—শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্—শ্রদ্ধার সহিত দিবে, অশ্রদ্ধার সহিত দিবে না—কারণ, শ্রদ্ধার সহিত না দিলে যথার্থ জিনিষ দেওয়াই যায় না, বরঞ্চ এমন একটা জিনিষ দেওয়া হয়, যাহাতে গ্রহীতাকে হীন করা হয়। আজকালকার ইংরাজশিক্ষক-গণ দানের দ্বারা আমাদিগকে হীন করিয়া থাকেন,—তাঁহারা অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধার সহিত দান করেন, সেই সঙ্গে প্রত্যহ সবিদ্রূপে স্মরণ করাইতে থাকেন—"যাহা দিতেছি, ইহার তুল্য তোমাদের কিছুই নাই এবং যাহা লইতেছ, তাহার প্রতিদান দেওয়া তোমাদের সাধ্যের অতীত।" প্রত্যহ এই অবমাননার বিষ আমাদের মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করে, ইহাতে পক্ষাঘাত আনিয়া আমাদিগকে নিরুদ্যম করিয়া দেয়। শিশুকাল হইতেই নিজের নিজত্ব উপলব্ধি করিবার কোন অবকাশ—কোন সুযোগ পাই নাই, পরভাষার বানান-বাক্য-ব্যাকরণ ও মতামতের দ্বারা উদ্‌ভ্রান্ত-অভিভূত হইয়া আছি—নিজের কোন শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ দিতে না পারিয়া মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হয়। শিশুকে অন্নস্তূপের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিয়া যদি তাহার অভিভাবক বলে—"লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, তোকে এত অন্ন জোগাইলাম, তবু তুই বাঁচিলি না কেন, কত গরীবের ছেলে ইহার চেয়ে অল্প অন্নেও সবল হইয়া উঠে," তবে তখন সেই হতাশ অভিভাবককে এই বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হয়, "মহাশয়, ঔদার্য্যবশত অন্নের অপব্যয় করা হইয়াছে, শিশুটিকেও অপব্যয় করিয়াছেন।" প্রথমত, প্রচুর অন্ন বাহিরে চাপানোর চেয়ে অল্প অন্ন ভিতরে দেওয়া ভাল; দ্বিতীয়ত, অন্নই যে শিশুর প্রাণের পক্ষে একমাত্র প্রয়োজনীয়, তাহা নহে, তাহার বাতাস চাই, আলো চাই, খেলা চাই! ইংরাজ-শিক্ষকেরা আমাদের ছেলেদের মাথার উপরে অবজ্ঞাভরে দূর হইতে অন্ন ছুঁড়িয়া মারেন, তাহার পরে ছেলেটা কাহিল হই-তেছে বলিয়া বিস্ময়প্রকাশ করেন। তাঁহা-দের নিজের ছেলেদের শিক্ষাপ্রণালী এরূপ নহে—অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজে তাঁহাদের ছেলে কেবল যে গিলিয়া থাকে, তাহা নহে, তাহারা আলোক, আলোচনা ও খেলা হইতে বঞ্চিত হয় না। অধ্যাপকদের সঙ্গে তাহা-দের সুদূর কলের সম্বন্ধ নহে। একে ত তাহাদের চতুর্দ্দিক্‌বর্ত্তী স্বদেশী সমাজ স্বদেশী

শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে আপন করিয়া লইবার জন্য শিশুকাল হইতে সর্ব্বতোভাবে আনু-কূল্য করিয়া থাকে, তাহার পরে শিক্ষা-প্রণালী ও অধ্যাপকগণও অনুকূল। আমা-দের আদ্যোপান্ত সমস্তই প্রতিকূল—যাহা শিখি, তাহা প্রতিকূল, যে উপায়ে শিখি, তাহা প্রতিকূল, যে শেখায়, সে-ও প্রতি-কূল। ইহা সত্ত্বেও যদি আমরা কিছু লাভ করিয়া থাকি, যদি এ শিক্ষা আমরা কোন কাজে খাটাইতে পারি, তাহা আমাদের গুণ।

অবশ্য এই বিদেশী শিক্ষাধিকারের হাত হইতে স্বজাতিকে মুক্তি দিতে হইলে শিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে লইতে হইবে এবং যাহাতে শিশুকাল হইতে ছেলেরা স্বদেশীয় ভাবে, স্বদেশীয় প্রণালীতে, স্বদেশের সহিত হৃদয়মনের যোগরক্ষা করিয়া, স্বদেশের বায়ু ও আলোক প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া শিক্ষা পাইতে পারে, তাহার জন্য আমাদিগকে একান্ত-যত্নে চেষ্টা করিতে হইবে। ভারতবর্ষ সুদীর্ঘকাল ধরিয়া আমাদের মনের যে প্রকৃতিকে গঠন করিয়াছে, তাহাকে নিজের বা পরের ইচ্ছা-মত বিকৃত করিলে, আমরা জগতে নিষ্ফল ও লজ্জিত হইব। সেই প্রকৃতিকেই পূর্ণ-পরিণতি দিলে সে অনায়াসেই বিদেশের জিনিষকে আপনার করিয়া লইতে পারিবে এবং আপনার জিনিষ বিদেশকে দান করিতে পারিবে।

এই স্বদেশী প্রণালীর শিক্ষার প্রধান ভিত্তি স্বার্থত্যাগপর ভৃতিনিরপেক্ষ অধ্যয়ন-অধ্যাপনরত নিষ্ঠাবান্ গুরু এবং তাঁহার অধ্যাপনের প্রধান অবলম্বন স্বদেশের এক-খানি সম্পূর্ণ ইতিহাস। একদিন এইরূপ গুরু আমাদের দেশে গ্রামে-গ্রামেই ছিলেন—তাঁহাদের জুতামোজা, গাড়িঘোড়া, আস্‌বাব্-পত্রের প্রয়োজনই ছিল না—নবাব ও নবা-বের অনুকারিগণ তাঁহাদের চারিদিকে নবাবী করিয়া বেড়াইত, তাহাতে তাঁহাদের দৃক্‌পাত ছিল না, তাঁহাদের অগৌরব ছিল না। এখনো আমাদের দেশে সেই সকল গুরুর অভাব নাই। কিন্তু শিক্ষার বিষয় গরিবর্ত্তিত হইয়াছে—এখন ব্যাকরণ, স্মৃতি ও ন্যায় আমাদের জঠরানলনির্ব্বাণের সহায়তা করে না এবং আধুনিক কালের জ্ঞানস্পৃহা মিটাইতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা নূতন শিক্ষাদানের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহা চাল বিগ্‌ড়াইয়া গেছে, তাঁহাদের বিকৃত হইয়াছে; তাঁহারা অন্নে নহেন, বিদ্যাদানকে তাঁহারা ধর্ম্মকর্ম্ম বলি জানেন না, বিদ্যাকে তাঁহারা পণ্যদ্রব্য করিয়া বিদ্যাকেও হীন করিয়াছেন, নিজেকেও হেয় করিয়াছেন। নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে আমাদের সামাজিক উচ্চ আদর্শের এই বিপর্য্যয়দশা একদিন সংশোধিত হইবে—ইহা আমি দুরাশা বলিয়া গণ্য করি না। আমাদের বৃহৎ-শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে এমন দুই-চারিটি লোক নিশ্চয়ই উঠি-বেন, যাঁহারা বিদ্যাব্যবসায়কে ঘৃণা করিয়া বিদ্যাদানকে কৌলিক ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিবেন। তাঁহারা জীবনযাত্রার উপকরণ সংক্ষিপ্ত করিয়া, বিলাস বিসর্জ্জন দিয়া, দেশের স্থানে স্থানে যে আধুনিক শিক্ষার টোল করিবেন, ইন্‌স্পেক্টরের গর্জ্জন ও য়ুনিভার্-

সিটির তর্জ্জন বর্জ্জিত সেই সকল টোলেই বিদ্যা স্বাধীনতালাভ করিবে, মর্য্যাদালাভ করিবে। ইংরাজ রাজবণিকের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এমনতর জনকয়েক গুরুকে জন্ম দিতে পারিবে, এ বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় রহিয়াছে।

চোখের বালি।

(৫০)

বিহারী ভাবিতেছিল, দুঃখিনী আশার মুখের দিকে সে চাহিবে কি করিয়া? দেউড়ির মধ্যে যখন সে প্রবেশ করিল, তখন নাথহীন সমস্ত বাড়ীটার ঘনীভূত বিষাদ তাহাকে এক মুহূর্ত্তে আবৃত করিয়া ফেলিল। বাড়ীর দারোয়ান ও চাকরদের মুখের দিকে চাহিয়া ও নিরুদ্দেশ মহেন্দ্রের জন্য লজ্জায় তাহার মাথা নত করিয়া দিল। পরিচিত ভৃত্যদিগকে সে স্নিগ্ধভাবে কুশলের মত কুশল জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে তাহার পা যেন সরিতে চাহিল না। বিশ্বজনের সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে মহেন্দ্র অসহায় আশাকে যে দারুণ অপমানের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া গেছে—যে অপমানে স্ত্রীলোকের চরমতম আবরণটুকু হরণ করিয়া তাহাকে সমস্ত সংসারের সকৌতূহল কৃপাদৃষ্টিবর্ষণের মাঝখানে দাঁড় করাইয়া দেয়, সেই অপমানের অনাবৃত প্রকাশ্যতার মধ্যে বিহারী কুণ্ঠিত-ব্যথিত আশাকে দেখিবে কোন্ প্রাণে?

কিন্তু এ সকল চিন্তার ও সঙ্কোচের আর অবসর রহিল না। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই আশা দ্রুতপদে আসিয়া বিহারীকে কহিল, "ঠাকুরপো, একবার শীঘ্র আসিয়া মাকে দেখিয়া যাও, তিনি বড় কষ্ট পাইতেছেন!"

বিহারীর সঙ্গে আশার প্রকাশ্যভাবে এই প্রথম আলাপ। দুঃখের দুর্দ্দিনে একটিমাত্র সামান্য ঝটিকায় সমস্ত ব্যবধান উড়াইয়া লইয়া যায়;—যাহারা দূরে বাস করিতেছিল, তাহাদিগকে হঠাৎ বন্যায় একটিমাত্র সঙ্কীর্ণ ডাঙার উপরে একত্র করিয়া দেয়।

আশার এই সঙ্কোচহীন ব্যাকুলতায় বিহারী আঘাত পাইল। মহেন্দ্র তাহার সংসারটিকে যে কি করিয়া দিয়া গেছে, এই ক্ষুদ্র ঘটনা হইতেই তাহা সে যেন অধিক বুঝিতে পারিল। দুর্দ্দিনের তাড়নায় গৃহের যেমন সজ্জা-সৌন্দর্য্য উপেক্ষিত, গৃহলক্ষ্মীরও তেমনি লজ্জার শ্রীটুকু রাখিবারও অবসর ঘুচিয়াছে—ছোটখাট আবরণ-অন্তরাল-বাচ-বিচার সমস্ত খসিয়া পড়িয়া গেছে—তাহাতে আর ভ্রূক্ষেপ করিবার সময় নাই।

বিহারী রাজলক্ষ্মীর ঘরে প্রবেশ করিল। রাজলক্ষ্মী একটা আকস্মিক শ্বাসকষ্ট অনুভব করিয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন—সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী না হওয়াতে পুনর্ব্বার কতকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এফ, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বঙ্গদর্শন।

বাজে কথা।

অন্য খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে যথার্থ চেনা যায়। কারণ, মানুষ ব্যয় করে বাঁধা নিয়ম অনুসারে, অপব্যয় করে নিজের খেয়ালে।

যেমন বাজে খরচ, তেমনি বাজে কথা। বাজে কথাতেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়। উপদেশের কথা যে রাস্তা দিয়া চলে, মনুর আমল হইতে তাহা বাঁধা, কাজের কথা যে পথে আপনার গো-যান টানিয়া আনে, সে পথ কেজো সম্প্রদায়ের পায়ে পায়ে তৃণ-পুষ্পশূন্য চিহ্নিত হইয়া গেছে। বাজে কথা নিজের মত করিয়াই বলিতে হয়।

এইজন্য চাণক্য ব্যক্তিবিশেষকে যে একেবারেই চুপ করিয়া যাইতে বলিয়াছেন, সেই কঠোর বিধানের কিছু পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে; আমাদের বিবেচনায় চাণক্য-কথিত উক্ত ভদ্রলোক 'তাবচ্চ শোভতে' যাবৎ তিনি উচ্চ অঙ্গের কথা বলেন, যাবৎ তিনি আবহমান কালের পরীক্ষিত সর্ব্বজনবিদিত সত্য ঘোষণায় প্রবৃত্ত থাকেন—কিন্তু তখনি তাঁহার বিপদ্, যখনি তিনি সহজ কথা নিজের ভাষায় বলিবার চেষ্টা করেন।

যে লোক একটা বলিবার বিশেষ কথা না থাকিলে কোন কথাই বলিতে পারে না; হয় বেদবাক্য বলে, নয় চুপ করিয়া থাকে; হে চতুরানন, তাহার কুটুম্বিতা, তাহার সাহচর্য্য, তাহার প্রতিবেশ—

শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ!

কবি বররুচির যে শ্লোক হইতে আমরা উপরের প্যারাগ্রাফে একটা ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার তাৎপর্য্য কিছু স্বতন্ত্র। তিনি বলেন—

ইতরপাণফলানি যথেচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরানন,
অরসিকেষু রহস্যনিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ!
চতুরানন, পাপের ফল
যেমন খুসি তব
বিতর মোরে সকলি আমি
যে করে' হোক্ স'ব;
মিনতি শুধু—অরসিকেরে
রসের নিবেদন
লিখো না ওগো লিখো না ভালে
লিখো না সে বেদন!

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, রহস্যকথা অর্থাৎ নিতান্ত আপনার কথা, মর্ম্মের কথা, যদি

শ্রেণীবিশেষের লোক বলিবার চেষ্টা করে, তবে বিপদে পড়ে। তাহার উপর বররুচি বলিতেছেন, উক্ত শ্রেণীবিশেষের কাছে যে হতভাগ্য রহস্যকথা বলিতে চেষ্টা করে, তাহারো সমূহ বিপদ্!

অতএব সবটা মিলাইয়া মোট এই দাঁড়াইতেছে, কাজের কথা—উচ্চ কথা শ্রেণী-নির্ব্বিচারে ব্যবহার হইতে পারে—কিন্তু নিজের কথার, মনের কথার, সম্পূর্ণ বাজে কথার 'বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ।'

বক্তা দুর্লভ কেন? নিজের কথা—বাজে কথা ত কাহাকেও সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয় না! সেইজন্যই দুর্লভ, তাহা সহজ বলিয়াই শক্ত।

বাজে খরচের সঙ্গে বাজে কথার আমরা তুলনা দিয়াছি, সেই তুলনাটি শেষ করিয়া ফেলি।

বুনিয়া[illegible] বংশে[illegible] ধনী যখন হাল ফেশানের বড়মানুষীর দ্বারা প্রতিষ্ঠা[illegible] করিতে চায়, তখন বাজে খরচ লইয়াই তাহার মুস্কিল। দেশে তাহার পৈতৃক অতিথিশালা, দেবালয় আছে, তাহার আত্মীয়বর্গের দস্তুরবাঁধা মাসহারা বরাদ্দ আছে, তাহার খরচের অন্ত নাই। কিন্তু এ সকল খরচের জন্য কখনো তাহাকে চিন্তা করিতে হয় নাই। ইহার জন্য তাহার রুচি বা দয়া, তাহার মস্তিষ্ক বা হৃদয়ের কোন প্রয়োজন হয় নাই।

কিন্তু সেই সকল মামুলি খরচ হইতে সহসা বাজে খরচের মধ্যে আসিয়া পড়িলেই তাহার ভিতরকার পদার্থ বা পদার্থের অভাব আর ঢাকা থাকে না। হয় ত, তাহার নিজের রুচি কি, সে জানে না,—সে রুচির উপরে নির্ভর করিতে [illegible] সাহস হয় না,—ভয় হয় পাছে সে যথার্থ যাহা, তাহাই ধরা পড়ে। সেই ভীরু, ম্যাকিন্টশ্‌বার্ণ্‌-ল্যাজারস্‌-র‍্যাম্‌জের হাতে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করে। তাহার প্রাসাদে ভিন্ন ভিন্ন দোকানীদের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু স্বয়ং প্রাসাদের অধীশ্বর সেই সকল দ্রব্যজাতের মধ্যে দীনভাবে বিলুপ্ত হইয়া নিজের চেয়ে নিজের ঐশ্বর্য্যকে আড়ম্বরের সহিত ঘোষণা করে। বাজে খরচ, যাহা বিশেষরূপে সম্পূর্ণ নিজের হওয়া উচিত ছিল, তাহাই বিশেষরূপে সম্পূর্ণ পরের আয়ত্ত হওয়ার অগৌরব যে কি, সেই বোধটুকু পর্য্যন্ত যাহার নাই, কৌতুকপ্রিয় চতুরানন অধিকাংশস্থলে তাহারই হস্তে বাজে খরচ করিবার সামর্থ্য দিয়া তাহাকে অপদস্থ করেন।

বাজে কথা সেইরূপ নিজের কথা। তাহা বিলাতি বা দিশি দোকান হইতে বাঁধিবুলির [illegible] কিনিয়া চালাইবার উপক্রম করিলেই যে দৈন্য চাপা দিবার চেষ্টা করা হয়, সেই দৈন্যই বাহির হইয়া পড়ে। হাসিকান্নার কথা, তালমন্দলাগার কথা, হৃদয়ের খিড়কিদুয়ারের কথা, মনের খাস্‌মহলের কথা,—এ সকল, যে ব্যক্তি নিজে বলিতে পারে, সেই যেন বলে; অন্য সকলে বিশ্বজনীন প্রেম, বাণিজ্যব্যবসায়ের উপকারিতা, ভারত-উদ্ধারের উপায় প্রভৃতি সহস্র বিষয়ের আলোচনা করিতে পারেন। আজকালকার বিলাতি মাসিকপত্রগুলি খুলিয়া দেখিলেই, অরসিকের আলোচ্য বিষয় যে কতশত আছে, তাহার আশাজনক

বৃহৎ তালিকা অনায়াসে সংগৃহীত হইতে পারিবে।

পৃথিবীতে জিনিষমাত্রই প্রকাশধর্ম্মী নয়। কয়লা আগুন না পাইলে জ্বলে না, স্ফটিক অকারণে ঝক্‌ঝক্ করে। কয়লায় বিস্তর কল চলে, স্ফটিক হার গাঁথিয়া প্রিয়জনের গলায় পরাইবার জন্য। কয়লা আবশ্যক, স্ফটিক মূল্যবান্।

এক একটি দুর্লভ মানুষ এইরূপ স্ফটিকের মত অকারণ ঝল্‌মল্ করিতে পারে। সে সহজেই আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে—তাহার কোন বিশেষ উপলক্ষ্যের আবশ্যক হয় না। তাহার নিকট হইতে কোন বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া লইবার গরজ কাহারো থাকে না—সে অনায়াসে আপনাকে আপনি দেদীপ্যমান করে, ইহা দেখিয়াই আনন্দ। মানুষ, প্রকাশ এত ভালবাসে, আলোক তাহার এত প্রিয় যে, আবশ্যককে বিসর্জ্জন দিয়া, পেটের অন্ন ফেলিয়াও উজ্জ্বলতার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। এই গুণটি দেখিলে, মানুষ যে পতঙ্গশ্রেষ্ঠ, সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। উজ্জ্বল চক্ষু দেখিয়া যে জাতি অকারণে প্রাণ দিতে পারে, তাহার পরিচয় বিস্তারিত করিয়া দেওয়া বাহুল্য।

কিন্তু সকলেই পতঙ্গের ডানা লইয়া জন্মায় নাই। জ্যোতির মোহ সকলের নাই। অনেকেই বুদ্ধিমান্, বিবেচক। ওহা দেখিলে তাঁহারা গভীরতার মধ্যে তলাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু আলো দেখিলে উপরে উড়িবার ব্যর্থ উদ্যমমাত্রও করেন না। কাব্য দেখিলে ইঁহারা প্রশ্ন করেন ইহার মধ্যে লাভ করিবার বিষয় কি আছে, গল্প শুনিলে অষ্টাদশ সংহিতার সহিত মিলাইয়া ইঁহারা ভূয়সী গবেষণার সহিত বিশুদ্ধ হিন্দুমতে ছুয়ো বা বাহবা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসেন। যাহা অকারণ, যাহা অনাবশ্যক, তাহার প্রতি ইঁহাদের কোন লোভ নাই।

যাহারা আলোক-উপাসক, তাহারা এই সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে নাই। তাহারা ইঁহাদিগকে যে সকল নামে অভিহিত করিয়াছে, আমরা তাহার অনুমোদন করি না। বররুচি ইঁহাদিগকে অরসিক বলিয়াছেন, আমাদের মতে ইহা রুচিগর্হিত। আমরা ইঁহাদিগকে যাহা মনে করি, তাহা মনেই রাখিয়া দিই। কিন্তু প্রাচীনেরা মুখ সাম্‌লাইয়া কথা কহিতেন না—তাহার পরিচয় একটি সংস্কৃতশ্লোকে পাই। ইহাতে বলা হইতেছে, সিংহনখরের দ্বারা উৎপাটিত একটি গজমুক্তা বনের মধ্যে পড়িয়াছিল, কোন ভীলরমণী দূর হইতে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহা তুলিয়া লইল—যখন টিপিয়া দেখিল তাহা পাকা কুল নহে, তাহা মুক্তামাত্র, তখন দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, প্রয়োজনীয়তা-বিবেচনায় যাঁহারা সকল জিনিষের মূল্যনির্দ্ধারণ করেন, শুদ্ধমাত্র সৌন্দর্য্য ও উজ্জ্বলতার বিকাশ যাঁহাদিগকে লেশমাত্র বিচলিত করিতে পারে না, কবি বর্ব্বরনারীর সহিত তাঁহাদের তুলনা দিতেছেন। আমাদের বিবেচনায় কবি ইঁহাদের সম্বন্ধে নীরব থাকিলেই ভাল করিতেন—কারণ, ইঁহারা ক্ষমতাশালী লোক, বিশেষত, সমালোচনায় ভার প্রায় ইঁহাদেরই হাতে। ইঁহারা গুরুমহাশয়ের কাজ করেন। যাঁহারা

সরস্বতীর কাব্যকমলবনে বাস করেন, তাঁহারা তটবর্ত্তী বেত্রবনবাসীদিগকে উদ্বেজিত না করুন, এই আমার প্রার্থনা।

সাহিত্যের যথার্থ বাজে রচনাগুলি কোনো বিশেষ কথা বলিবার স্পর্দ্ধা রাখে না। সংস্কৃত-সাহিত্যে মেঘদূত তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাহা ধর্ম্মের কথা নহে, কর্ম্মের কথা নহে, পুরাণ নহে, ইতিহাস নহে। যে অবস্থায় মানুষের চেতন-অচেতনের বিচার লোপ পাইয়া যায়, ইহা সেই অবস্থার প্রলাপ। ইহাকে যদি কেহ বদরীফল মনে করিয়া পেট ভরাইবার আশায়ে তুলিয়া লন, তবে তখনি ফেলিয়া দিবেন। ইহাতে প্রয়োজনের কথা কিছুই নাই। ইহা নিটোল মুক্তা, এবং ইহাতে বিরহীর বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্তচিহ্ন কিছু লাগিয়াছে, কিন্তু সেটুকু মুছিয়া ফেলিলেও ইহার মূল্য কমিবে না।

ইহার কোন উদ্দেশ্য নাই বলিয়াই এ কাব্যখানি এমন স্বচ্ছ, এমন উজ্জ্বল। ইহা একটি মায়াতরী ;—কল্পনার হাওয়ায় ইহার সজল মেঘনির্ম্মিত পাল ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং একটি বিরহী হৃদয়ের কামনা বহন করিয়া ইহা অবারিতবেগে একটি অপরূপ নিরুদ্দেশের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে—আর-কোন বোঝা ইহাতে নাই।

টেনিসন্ যে idle tears, যে অকারণ অশ্রুবিন্দুর কথা বলিয়াছেন, মেঘদূত সেই বাজে চোখের জলের কাব্য। এই কথা শুনিয়া অনেকে আমার সঙ্গে তর্ক করিতে উদ্যত হইবেন। অনেকে বলিবেন, যক্ষ যখন প্রভুশাপে তাহার প্রেয়সীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তখন মেঘদূতের অশ্রুধারাকে অকারণ বলিতেছ কেন? আমি তর্ক করিতে চাই না—এ সকল কথার আমি কোন উত্তর দিব না। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, ঐ যে যক্ষের নির্ব্বাসন প্রভৃতি ব্যাপার, ও সমস্তই কালিদাসের বানানো—কাব্যরচনার ও একটা উপলক্ষ্যমাত্র। ঐ ভারা বাঁধিয়া তিনি এই ইমারৎ গড়িয়াছেন—এখন আমরা ঐ ভারাটা ফেলিয়া দিব। আসল কথা, "রমাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্" মন অকারণ বিরহে বিকল হইয়া উঠে, কালিদাস অন্যত্র তাহা স্বীকার করিয়াছেন ;—আষাঢ়ের প্রথমদিনে অকস্মাৎ ঘনমেঘের ঘটা দেখিলে আমাদের মনে এক সৃষ্টিছাড়া বিরহ জাগিয়া উঠে, মেঘদূত সেই অকারণ বিরহের অমূলক প্রলাপ। তা যদি না হইত, সেই মিলনলোকের যথার্থই যদি কোন উদ্দেশ থাকিত, তবে বিরহী মেঘকে ছাড়িয়া বিদ্যুৎকে দূত পাঠাইত। তবে পূর্ব্বমেঘ এত রহিয়া-বসিয়া, এত ঘুরিয়া-ফিরিয়া, এত যূথীবন প্রফুল্ল করিয়া, এত জনপদবধূর উৎক্ষিপ্ত দৃষ্টির কৃষ্ণ কটাক্ষপাত লুটিয়া লইয়া চলিত না। কবি কাব্যরচনা করিবার সময় একটু ছল করেন—সেই ছলটুকুর পর্দ্দার আড়াল হইতে পাঠক তাঁহার আসল কথাটিকে অন্তঃপুরে দেখিয়া লইবেন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। সেইজন্যই আমি যক্ষের গল্পটাকে ঠেলিয়া সরাইলাম—নিশ্চয় জানি, স্বর্গস্থ কবি তাঁহার অধম ভক্তকে সকৌতুক স্নেহের সহিত ক্ষমা করিবেন।

কাব্য পড়িবার সময়েও যদি হিসাবের খাতা খোলা রাখিতেই হয়, যদি কি লাভ করিলাম, হাতে হাতে তাহার নিকাশ চুকাইয়া

লইতেই হয়, তবে স্বীকার করিব মেঘদূত হইতে আমরা একটি তথ্যলাভ করিয়া বিস্ময়ে পুলকিত হইয়াছি। সেটি এই যে, তখনো মানুষ ছিল, এবং তখনো আষাঢ়ের প্রথম-দিন যথানিয়মে আসিত। এই তথ্যটি উপলব্ধি করিলে নিজেকেই যুগে যুগান্তরে অমর বলিয়া মনে হয়। এই অমরত্বের আনন্দ-বার্ত্তা কোন উপদেশের বইয়ে—কাজের বইয়ে আমরা পাই না। ইহা নিতান্তই একটি বাজে কথামাত্র।

কিন্তু অসহিষ্ণু বররুচি যাঁহাদের প্রতি অশিষ্ট বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা কি এরূপ লাভকে লাভ বলিয়াই গণ্য করিবেন? ইহাতে কি জ্ঞানের কোনো বিস্তার, দেশের কোনো উন্নতি ও চরিত্রের কোনো সংশোধন হইবে? ইহাতে কি বহুযত্নে রক্ষণীয় বাঙালি পাঠকের অনিষ্টের কোন আশঙ্কা নাই? যাহা অকারণ, যাহা অনাবশ্যক, হে চতুরানন, তাহা রসের কাব্যে রসিকদের জন্যই ঢাকা থাকুক্—যাহা আবশ্যক, যাহা হিতকর, তাহার ঘোষণার বিরতি ও তাহার খরিদ্দারের অভাব হইবে না!

শকুন্তলা।

শেক্সপীয়রের টেম্পেষ্ট-নাটকের সহিত কালিদাসের শকুন্তলার তুলনা মনে সহজেই উদয় হইতে পারে। ইহাদের বাহ্য সাদৃশ্য এবং আন্তরিক অনৈক্য আলোচনা করিয়া দেখিবার বিষয়।

নির্জ্জনলালিতা মিরান্দার সহিত রাজকুমার ফার্দ্দিনান্দের প্রণয় তাপসকুমারী শকুন্তলার সহিত দুষ্যন্তের প্রণয়ের অনুরূপ। ঘটনাস্থলটিরও সাদৃশ্য আছে; এক পক্ষে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপ, অপর পক্ষে তপোবন।

এইরূপে উভয়ের আখ্যানমূলে ঐক্য দেখিতে পাই, কিন্তু কাব্যরসের স্বাদ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা পড়িলেই অনুভব করিতে পারি।

এই স্বাদ-জিনিষকে বিশ্লেষ করিয়া দেখা কঠিন। ছোট-বড় কত কাব্যকলার অলক্ষ্য সমবায়ে এই স্বাদের সৃষ্টি হয়, তাহার রহস্য পাঠকদের কাছে অগোচর থাকিয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহা উদ্ঘাটনের স্পর্দ্ধা রাখি না। সমালোচ্য দুইটি নাটক পরে পরে পাঠ করিয়া আমাদের মনে যে অনুভূতির উদয় হইয়াছে, তাহাই বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব।

সমালোচনা-ব্যবসায়ের অনেক দোষ আছে। কবি যাহা সমগ্রভাবে দেখাইয়া থাকেন, সমালোচককে অনেকসময় তাহা খণ্ডখণ্ড করিয়া দেখাইতে হয়। অথচ কাব্যসম্বন্ধে এই স্বতোবিরোধী কথাটি বলা যাইতে পারে যে, অংশের সমষ্টিই সমগ্র নহে। ভাল কাব্যে সমগ্রটি তাহার অংশ-প্রত্যংশকে আচ্ছন্ন করিয়া—অন্তর্হিত করিয়া যেন একাকী বিরাজ করে। এইজন্য খণ্ড

করিলে আসল জিনিষটিকে নষ্ট করা হয়। আমাদের সমালোচকেরা অনেকসময় নাটক-নভেল হইতে তাহার নায়ক বা নায়িকাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া অত্যন্ত বিস্তারিত-ভাবে তাহাদের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার করিয়া থাকেন। আসামীকে কাঠগড়ার মধ্যে দাঁড় করাইয়া যে বিচার, সে বিচার কাব্যের নহে। তাহা রাজার বিচার, শাস্ত্রের বিচার, জ্ঞানের বিচার বা ধর্ম্মনীতির বিচার হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের বিচার নহে। কাব্যের নায়িকা, কে লজ্জা বেশি করিয়াছে বা কম করিয়াছে, কে আত্মত্যাগ বেশি দেখাইয়াছে বা কম দেখাইয়াছে, কাহার মুখের কথাগুলি চুনিয়া লইয়া বিদ্যালয়ের নীতিবোধ দুইখণ্ড সঙ্কলিত হইতে পারে এবং কাহার কথায় কেবল একখণ্ডমাত্র হয়, এ সমস্ত আলোচনা অধিকাংশস্থলেই অনর্থক। সমস্ত কাব্য তাহার দেশ-কাল-পাত্র লইয়া তাহার ব্যক্ত ও অনতিব্যক্ত ভাবে, ভঙ্গীতে ও ভাষায় যে কথা মুখ্যত ও গৌণত প্রকাশ করিতে থাকে, তাহাকে অবিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করিতে পারিলে তবেই তাহার যথার্থ রসগ্রহণ করা হয়। শ্রেষ্ঠকাব্য, বিশেষত নাটক, অন্তঃপুর-বিশেষ,—সে আপনার সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীকে বাহিরে আসিতে দেয় না।

আমি ত শকুন্তলাসম্বন্ধে ইহাই বিশেষ-রূপে অনুভব করিয়া থাকি। শকুন্তলার ছবিটি যে পটের উপর অঙ্কিত হইয়াছে, সে পট হইতে সেই চিত্রটিকে তুলিয়া লই-বার চেষ্টামাত্র আমার মনে উদয় হয় না। ইহা আঠা দিয়া জোড়া নহে, ইহা বিচিত্র বর্ণের দ্বারা প্রতিফলিত। ইহাকে খুঁটিয়া তুলিলে ইহা কেবল রং, ইহাকে একত্রে দেখিলে ইহা ছবি।

একত্রে যখন দেখি, তখন ইহার শান্তি, সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা অনির্ব্বচনীয়ভাবে আমাদের মনকে আবিষ্ট করে। তখন অন্য কোন কাব্যের সহিত ইহার তুলনা করিবার প্রবৃত্তিই আমাদের মনে জন্মিতে পারে না। কিন্তু যখন এ কথা বলি যে, দেখা যাক্ শকুন্তলা ভাল কি মিরান্দা ভাল, তখন আমরা কাব্যের ধনকে কাব্যের অধি-কার হইতে বাহির করিয়া আনি। কারণ, শকুন্তলা ত অভিজ্ঞানশকুন্তল-কাব্য নহে, সে ত কাব্যের উপাদানমাত্র। স্বতন্ত্র করিয়া দেখিলে তাহার ভালমন্দের আদর্শও স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। কাব্যের ভিতরে তাহার যে শ্রেষ্ঠত্ব, কাব্যের বাহিরে তাহার সে শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়?

এইজন্য য়ুরোপের কবিকুলগুরু গেটে একটিমাত্র শ্লোকে শকুন্তলার সমালোচনা লিখিয়াছেন, তিনি কাব্যকে খণ্ডখণ্ড,বিচ্ছিন্ন করেন নাই। তাঁহার শ্লোকটি একটি দীপ-বর্ত্তিকার শিখার ন্যায় ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহা দীপ-শিখার মতই সমগ্র শকুন্তলাকে একমুহূর্ত্তে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইবার উপায়। তিনি এক কথায় বলিয়াছেন, কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত্ত্য ও স্বর্গ একত্রে দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।

অনেকেই এই কথাটিকে কবির উচ্ছ্বাস-মাত্র মনে করিয়া লঘুভাবে পাঠ করিয়া থাকেন। তাঁহারা মোটামুটি মনে করেন,

ইহার অর্থ এই যে, গেটের মতে শকুন্তলা-কাব্যখানি অতি উপাদেয়। কিন্তু তাহা নহে। গেটের এই শ্লোকটি আনন্দের অত্যুক্তি নহে, ইহা রসজ্ঞের বিচার। ইহার মধ্যে বিশেষত্ব আছে। কবি বিশেষভাবেই বলিয়াছেন, শকুন্তলার মধ্যে একটি গভীর পরিণতির ভাব আছে, সে পরিণতি ফুল হইতে ফলে পরিণতি, মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গে পরিণতি, স্বভাব হইতে ধর্ম্মে পরিণতি। মেঘদূতে যেমন পূর্ব্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে—পূর্ব্বমেঘে পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্য্য পর্য্যটন করিয়া উত্তরমেঘে অলকাপুরীর নিত্যসৌন্দর্য্যে উত্তীর্ণ হইতে হয়, তেমনি শকুন্তলায় একটি পূর্ব্বমিলন ও উত্তরমিলন আছে। প্রথম-অঙ্কবর্ত্তী সেই মর্ত্ত্যের চঞ্চল-সৌন্দর্য্যময় বিচিত্র পূর্ব্বমিলন হইতে, স্বর্গ-তপোবনে শাশ্বত-আনন্দময় উত্তরমিলনে যাত্রাই অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক। ইহা কেবল বিশেষ কোন ভাবের অবতারণা নহে, বিশেষ কোন চরিত্রের বিকাশ নহে, ইহা সমস্ত কাব্যকে এক লোক হইতে অন্য লোকে লইয়া যাওয়া—প্রেমকে স্বভাব-সৌন্দর্য্যের দেশ হইতে মঙ্গলসৌন্দর্য্যের অক্ষয় স্বর্গধামে উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়া। এই প্রসঙ্গটি আমরা অন্য একটি প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং এখানে তাহার পুনরুক্তি করিতে ইচ্ছা করি না।

স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের এই যে মিলন, কালিদাস ইহা অত্যন্ত সহজেই করিয়াছেন। ফুলকে তিনি এমনি স্বভাবত ফলে ফলাইয়াছেন, মর্ত্ত্যের সীমাকে তিনি এমনি করিয়া স্বর্গের সহিত মিশাইয়া দিয়াছেন যে, মাঝে কোন ব্যবধান কাহারো চোখে পড়ে না। প্রথম অঙ্কে শকুন্তলার পতনের মধ্যে কবি মর্ত্ত্যের মাটি কিছুই গোপন রাখেন নাই; তাহার মধ্যে বাসনার প্রভাব যে কতদূর বিদ্যমান, তাহা দুষ্যন্ত-শকুন্তলা উভয়ের ব্যবহারেই কবি সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। যৌবনমত্ততায় হাবভাববীলাচাঞ্চল্য, পরম লজ্জার সহিত প্রবল আত্মপ্রকাশের সংগ্রাম, সমস্তই কবি ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা শকুন্তলার সরলতার নিদর্শন। অনুকূল অবসরে এই ভাবাবেশের আকস্মিক আবির্ভাবের জন্য সে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিল না। সে আপনাকে দমন করিবার—গোপন করিবার উপায় করিয়া রাখে নাই। যে হরিণী ব্যাধকে চেনে না, তাহার কি বিদ্ধ হইতে বিলম্ব লাগে? শকুন্তলা পঞ্চশরকে ঠিকমত চিনিত না—এইজন্যই তাহার মর্ম্মস্থান অরক্ষিত ছিল। সে না কন্দর্পকে, না দুষ্যন্তকে, কাহাকেও অবিশ্বাস করে নাই। যেমন, যে অরণ্যে সর্ব্বদাই শিকার হইয়া থাকে, সেখানে ব্যাধকে অধিক করিয়া আত্মগোপন করিতে হয়, তেমনি যে সমাজে স্ত্রীপুরুষের সর্ব্বদাই সহজেই মিলন হইয়া থাকে, সেখানে মীন-কেতুকে অত্যন্ত সাবধানে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কাজ করিতে হয়। তপোবনের হরিণী যেমন অশঙ্কিত, তপোবনের বালিকাও তেমনি অসতর্ক।

শকুন্তলার পরাভব যেমন অতি সহজে চিত্রিত হইয়াছে, তেমনি, সেই পরাভব সত্ত্বেও তাহার চরিত্রের গভীরতর পবিত্রতা, তাহার স্বাভাবিক অক্ষুণ্ণ সতীত্ব অতি অনা-

য়াসেই পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহাও তাহার সরলতার নিদর্শন। ঘরের ভিতরে যে কৃত্রিম ফুল সাজাইয়া রাখা যায়, তাহার ধূলা প্রত্যহ না ঝাড়িলে চলে না, কিন্তু অরণ্যফুলের ধূলা ঝাড়িবার জন্য লোক রাখিতে হয় না,—সে অনাবৃত থাকে, তাহার গায়ে ধূলাও লাগে, তবু সে কেমন করিয়া সহজে আপনার সুন্দর নির্ম্মলতাটুকু রক্ষা করিয়া চলে! শকুন্তলাকেও ধূলা লাগিয়াছিল, কিন্তু তাহা সে নিজে জানিতেও পারে নাই—সে সরলা অরণ্যের মৃগীর মত, নির্ঝরের জলধারার মত মলিনতার সংস্রবেও অনায়াসেই নির্ম্মল।

কালিদাস তাঁহার এই আশ্রমপালিতা উদ্ভিন্নযৌবনা শকুন্তলাকে সংশয়বিরহিত স্বভাবের পথে ছাড়িয়া দিয়াছেন, শেষ পর্য্যন্ত কোথাও তাহাকে বাধা দেন নাই। আবার অন্যদিকে তাহাকে অপ্রগল্‌ভা, দুঃখশীলা, নিয়মচারিণী, সতীধর্ম্মের আদর্শরূপিণী করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। একদিকে তরুলতাফলপুষ্পের ন্যায় সে আত্মবিস্মৃত স্বভাবধর্ম্মের অনুগতা, আবার অন্যদিকে তাহার অন্তরতর নারীপ্রকৃতি সংযত, সহিষ্ণু, একাগ্রতপঃপরায়ণা, কল্যাণধর্ম্মের শাসনে একান্ত নিয়ন্ত্রিতা। কালিদাস অপরূপ কৌশলে তাঁহার নায়িকাকে লীলা ও স্থৈর্য্যের, স্বভাব ও নিয়মের, নদী ও সমুদ্রের ঠিক মোহানার উপর স্থাপিত করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহার পিতা ঋষি, তাহার মাতা অপ্সরা; ব্রতভঙ্গে তাহার জন্ম, তপোবনে তাহার পালন। তপোবন স্থানটি এমন, যেখানে স্বভাব এবং তপস্যা, সৌন্দর্য্য এবং সংযম একত্র মিলিত হইয়াছে। সেখানে সমাজের কৃত্রিম বিধান নাই, অথচ ধর্ম্মের কঠোর নিয়ম বিরাজমান। গান্ধর্ব্ববিবাহ-ব্যাপারটিও তেমনি; তাহাতে স্বভাবের উদ্দামতাও আছে, অথচ বিবাহের সামাজিক বন্ধনও আছে। বন্ধন ও অবন্ধনের সঙ্গম-স্থলে স্থাপিত হইয়াই শকুন্তলা-নাটকটি একটি বিশেষ অপরূপত্ব লাভ করিয়াছে। তাহার সুখ-দুঃখ-মিলন-বিচ্ছেদ সমস্তই এই উভয়ের ঘাতপ্রতিঘাতে। গেটে যে কেন তাঁহার সমালোচনায় শকুন্তলার মধ্যে দুই বিসদৃশের একত্র সমাবেশ ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা অভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিলেই বুঝা যায়।

টেম্পেষ্টে এ ভাবটি নাই। কেনই বা থাকিবে? শকুন্তলাও সুন্দরী, মিরান্দাও সুন্দরী, তাই বলিয়া উভয়ের নাসা-চক্ষুর অবিকল সাদৃশ্যকে প্রত্যাশা করিতে পারে? উভয়ের মধ্যে অবস্থার, ঘটনার, প্রকৃতির সম্পূর্ণ প্রভেদ। মিরান্দা যে নির্জ্জনতায় শিশুকাল হইতে পালিত, শকুন্তলার সে নির্জ্জনতা ছিল না। মিরান্দা একমাত্র পিতার সাহচর্য্যে বড় হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং তাহার প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হইবার আনুকূল্য পায় নাই। শকুন্তলা সমানবয়সী সখীদের সহিত বর্দ্ধিত,—তাহারা পরস্পরের উত্তাপে, অনুকরণে, ভাবের আদানপ্রদানে, হাস্যে-পরিহাসে-কথোপকথনে স্বাভাবিক বিকাশ লাভ করিতেছিল। শকুন্তলা যদি অহরহ কণ্বমুনির সঙ্গেই থাকিত, তবে তাহার উন্মেষ বাধা পাইত, তবে তাহার সরলতা অজ্ঞতার নামান্তর হইয়া তাহাকে স্ত্রী-ঋষ্যশৃঙ্গ করিয়া তুলিতে

পারিত। বস্তুত শকুন্তলার সরলতা স্বাভাবিক এবং মিরান্দার সরলতা অস্বাভাবিক। উভয়ের মধ্যে অবস্থার যে প্রভেদ আছে, তাহাতে এইরূপই সঙ্গত। মিরান্দার ন্যায় শকুন্তলার সরলতা অজ্ঞানের দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিরক্ষিত নহে। শকুন্তলার যৌবন সদ্য বিকশিত হইয়াছে এবং কৌতুকশীলা সখীরা সে সম্বন্ধে তাহাকে আত্মবিস্মৃত থাকিতে দেয় নাই, তাহা আমরা প্রথম অঙ্কেই দেখিতে পাই। সে লজ্জা করিতেও শিখিয়াছে। কিন্তু এ সকলই বাহিরের জিনিস। তাহার সেই আশৈশবধাত্রী ভূমি হইতে তাহাকে তুলিয়া আনিতে গেলে তাহার কোন জায়গায় টান পড়িবে না। সেখানে মিরান্দা মানুষের সঙ্গ পায় নাই, এই অভাবটুকুই কেবল তাহার চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে; কিন্তু সেখানকার সমুদ্র-পর্ব্বতের সহিত তাহার অন্তঃকরণের কোন ভাবাত্মক যোগ আমরা দেখিতে পাই না। নির্জ্জন দ্বীপকে আমরা ঘটনাচ্ছলে কবির বর্ণনায় দেখি মাত্র, কিন্তু মিরান্দার ভিতর দিয়া দেখি না। এই দ্বীপটি কেবল কাব্যের আখ্যানের পক্ষেই আবশ্যক, চরিত্রের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে।

শকুন্তলাসম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। শকুন্তলা তপোবনের অঙ্গীভূত। তপোবনকে দূরে রাখিলে কেবল নাটকের আখ্যানভাগ ব্যাঘাত পায়, তাহা নহে, স্বয়ং শকুন্তলাই অসম্পূর্ণ হয়। শকুন্তলা মিরান্দার মত স্বতন্ত্র নহে, শকুন্তলা তাহার চতুর্দ্দিকের সহিত একাত্মভাবে বিজড়িত। তাহার মধুর চরিত্রখানি অরণ্যের ছায়া ও মাধবীলতার পুষ্পমঞ্জরীর সহিত ব্যাপ্ত ও বিকশিত,

পশুপক্ষীদের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্যের সহিত নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট। কালিদাস তাঁহার নাটকে যে বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া রাখেন নাই, তাহাকে শকুন্তলার চরিত্রের মধ্যে উন্মেষিত করিয়া তুলিয়াছেন। সেইজন্য বলিতেছিলাম, শকুন্তলাকে তাহার কাব্যগত পরিবেষ্টন হইতে বাহির করিয়া আনা কঠিন।

ফার্দ্দিনান্দের সহিত প্রণয়ব্যাপারেই মিরান্দার প্রধান পরিচয়; আর, ঝড়ের সময় ভগ্নতরী হতভাগ্যদের জন্য ব্যাকুলতায় তাহার ব্যথিত হৃদয়ের করুণা প্রকাশ পাইয়াছে। শকুন্তলার পরিচয় আরো অনেক ব্যাপক। দুষ্যন্ত না দেখা দিলেও তাহার মাধুর্য্য বিচিত্রভাবে হিল্লোলিত হইয়া উঠিত। তাহার হৃদয়লতিকা চেতন-অচেতন সকলকেই স্নেহের ললিতবেষ্টনে সুন্দর করিয়া বাঁধিয়াছে। সে তপোবনের তরুগুলিকে জলসেচনের সঙ্গে সঙ্গে সোদর স্নেহে অভিষিক্ত করিয়াছে। সে নবকুসুম-যৌবনা বনজ্যোৎস্নাকে স্নিগ্ধদৃষ্টির দ্বারা আপনার কোমল হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে। শকুন্তলা যখন তপোবন ত্যাগ করিয়া পতিগৃহে যাইতেছে, তখন পদে পদে তাহার আকর্ষণ, পদে পদে তাহার বেদনা। বনের সহিত মানুষের বিচ্ছেদ যে এমন মর্ম্মান্তিক সকরুণ হইতে পারে, তাহা জগতের সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে কেবল অভিজ্ঞান-শকুন্তলের চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায়। এই কাব্যে স্বভাব ও ধর্ম্মনিয়মের যেমন মিলন, মানুষ ও প্রকৃতির তেমনি মিলন। বিসদৃশের মধ্যে এমন একান্ত মিলনের ভাব বোধ করি ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোন দেশে সম্ভবপর হইতে পারে না।

টেম্পেষ্টে বহিঃ প্রকৃতি, এরিয়েলের মধ্যে মানুষ-আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু তবু সে মানুষের আত্মীয়তা হইতে দূরে রহিয়াছে। মানুষের সঙ্গে তাহার অনিচ্ছুক ভৃত্যের সম্বন্ধ। সে স্বাধীন হইতে চায়, কিন্তু মানবশক্তি দ্বারা পীড়িত—আবদ্ধ হইয়া দাসের মত কাজ করিতেছে। তাহার হৃদয়ে স্নেহ নাই, তাহার চক্ষে জল নাই। মিরান্দার নারীহৃদয়ও তাহার প্রতি স্নেহবিস্তার করে নাই। দ্বীপ হইতে যাত্রাকালে প্রস্পেরো ও মিরান্দার সহিত এরিয়েলের স্নিগ্ধ বিদায়-সম্ভাষণ হইল না। টেম্পেষ্টে পীড়ন, শাসন, দমন—শকুন্তলায় প্রীতি, শান্তি, সদ্ভাব। টেম্পেষ্টে প্রকৃতি মানুষ-আকার ধারণ করিয়াও মানুষের সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধে বদ্ধ হয় নাই—শকুন্তলায় গাছপালা-পশুপক্ষী আত্মস্বভাব রক্ষা করিয়াও মানুষের সহিত মধুর আত্মীয়ভাবে মিলিত হইয়া গেছে।

শকুন্তলার আরম্ভেই যখন ধনুর্ব্বাণধারী রাজার প্রতি এই করুণ নিষেধ উত্থিত হইল—"ভো ভো রাজন্ আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ", তখন কাব্যের একটি মূল সুর বাজিয়া উঠিল। এই নিষেধটি আশ্রমমৃগের সঙ্গে সঙ্গে তাপসকুমারী শকুন্তলাকেও করুণাচ্ছাদনে আবরিত করিতেছে। ঋষি বলিতেছেন :—

"মৃদু এ মৃগদেহে
মেরো না শর!
আগুন দেবে কে হে
ফুলের পর?

কোথা হে মহারাজ,
মৃগের প্রাণ,
কোথায় যেন বাজ
তোমার বাণ!"

এ কথা শকুন্তলাসম্বন্ধেও খাটে। শকুন্তলার প্রতিও রাজার প্রণয়শরনিক্ষেপ নিদারুণ। প্রণয়ব্যবসায়ে রাজা পরিপক্ক ও কঠিন—কত কঠিন, অন্যত্র তাহার পরিচয় আছে—আর এই আশ্রমপালিতা বালিকার অনভিজ্ঞতা ও সরলতা বড়ই সুকুমার ও সকরুণ। হায়, মৃগটি যেমন কাতরবাক্যে রক্ষণীয়, শকুন্তলাও তেমনি! দ্বৌ অপি অত্র আরণ্যকৌ!

মৃগের প্রতি এই করুণাবাক্যের প্রতিধ্বনি মিলাইতে না মিলাইতেই দেখি, বল্কলবসনা তাপসকন্যা সখীদের সহিত আলবালে জলপূরণে নিযুক্ত, তরু-সোদর ও লতা-ভগিনীদের মধ্যে তাহার প্রাত্যহিক স্নেহসেবার কর্ম্মে প্রবৃত্ত। কেবল বল্কলবসনে নহে, ভাবে ভঙ্গীতেও শকুন্তলা যেন তরুলতার মধ্যেই একটি। তাই দুষ্যন্ত বলিয়াছেন—

"অধর কিসলয়-রাঙিমা-আঁকা,
মৃদুল বাহু যেন কোমল শাখা,
হৃদয়-লোভনীয় কুসুম হেন
তনুতে যৌবন ফুটেছে যেন!"

নাটকের আরম্ভেই শান্তিসৌন্দর্য্য-সংবলিত এমন একটি সম্পূর্ণ জীবন নিভৃত পুষ্পপল্লবের মাঝখানে প্রাত্যহিক আশ্রমধর্ম্ম, অতিথিসেবা, সখীস্নেহ ও বিশ্ববাৎসল্য লইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দিল! তাহা এমনি অখণ্ড—এমনি আনন্দকর যে, আমাদের কেবলি আশঙ্কা হয়, পাছে আঘাত লাগিলেই ইহা ভাঙিয়া যায়! দুষ্যন্তকে দুই উদ্যত বাহু দ্বারা প্রতিরোধ করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, বাণ মারিয়ো না, মারিয়ো না!—এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যটি ভাঙিয়ো না!

যখন দেখিতে দেখিতে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রণয় প্রগাঢ় হইয়া উঠিতেছে, তখন প্রথম অঙ্কের শেষে নেপথ্যে অকস্মাৎ আর্ত্তরব উঠিল—"ভো ভো তপস্বিগণ, তোমরা তপোবনপ্রাণীদের রক্ষার জন্য সতর্ক হও! মৃগয়াবিহারী রাজা দুষ্যন্ত প্রত্যাসন্ন হইয়াছেন।"

ইহা সমস্ত তপোবনভূমির ক্রন্দন—এবং সেই তপোবনপ্রাণীদের মধ্যে শকুন্তলাও একটি! কিন্তু তাহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারিল না।

সেই তপোবন হইতে শকুন্তলা যখন যাইতেছে, তখন কণ্ব ডাক দিয়া বলিলেন :—

"ওগো সন্নিহিত তপোবনতরুগণ!—
তোমাদের জল না করি দান
যে আগে জল না করিত পান;
সাধ ছিল যার সাজিতে, তবু
স্নেহে পাতাটি না ছিঁড়িত কভু;
তোমাদের ফুল ফুটিত যবে
যে জন মাতিত মহোৎসবে;
পতিগৃহে সেই বালিকা যায়,
তোমরা সকলে দেহ বিদায়!"

চেতন-অচেতন সকলের সঙ্গে এমনি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা, এমনি প্রীতি ও কল্যাণের বন্ধন!

শকুন্তলা কহিল, "হলা প্রিয়ংবদে, আর্য্যপুত্রকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ আকুল, তবু আশ্রম ছাড়িয়া যাইতে আমার পা যেন উঠিতেছে না।" প্রিয়ংবদা কহিল, "তুমিই যে কেবল তপোবনের বিরহে কাতর, তাহা

নহে, তোমার আসন্নবিয়োগে তপোবনেরও সেই একই দশা—

মৃগের গলি পড়ে মুখের তৃণ,
ময়ূর নাচে না যে আর
খসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হ'তে
যেন সে আঁখিজলধার !"

শকুন্তলা কণ্বকে কহিল, "তাত, এই যে কুটীরপ্রান্তচারিণী গর্ভমন্থরা মৃগবধূ, এ যখন নির্ব্বিঘ্নে প্রসব করিবে, তখন সেই প্রিয়-নিবেদন করিবার জন্য একটি লোককে আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়ো !"

কণ্ব কহিলেন—"আমি কখনো ভুলিব না।"

শকুন্তলা পশ্চাৎ হইতে বাধা পাইয়া কহিল, "আরে কে আমার কাপড় ধরিয়া টানে !"

কণ্ব কহিলেন, "বৎসে,—

ইঙ্গুদির তৈল দিতে স্নেহসহকারে
কুশক্ষত হলে মুখ যার,
শ্যামাধান্যমুষ্টি দিয়ে পালিয়াছ যারে
এই মৃগ পুত্র সে তোমার !"

শকুন্তলা তাহাকে কহিল—"ওরে বাছা, সহবাসপরিত্যাগিনী আমাকে আর কেন অনুসরণ করিস্! প্রসব করিয়াই তোর জননী যখন মরিয়াছিল, তখন হইতে আমিই তোকে বড় করিয়া তুলিয়াছি ! এখন আমি চলিলাম, তাত তোকে দেখিবেন, তুই ফিরিয়া যা !"

এইরূপে সমুদয় তরুলতা-মৃগপক্ষীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শকুন্তলা তপোবন ত্যাগ করিয়াছে।

লতার সহিত ফুলের যেরূপ সম্বন্ধ, তপোবনের সহিত শকুন্তলার সেইরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্যন্ত যেমন, তপোবনপ্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। এই মূক প্রকৃতিকে কোন নাটকের ভিতরে যে এমন প্রধান—এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বোধ করি সংস্কৃতসাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নাই। প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার মুখে কথাবার্ত্তা বসাইয়া রূপকনাট্য রচিত হইতে পারে—কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃত রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্য্যসাধন করাইয়া লওয়া—এ ত অন্যত্র দেখি নাই। বহিঃপ্রকৃতিকে যেখানে দূর করিয়া—পর করিয়া ভাবে, যেখানে মানুষ আপনার চারদিকে প্রাচীর তুলিয়া জগতের সর্ব্বত্র কেবল ব্যবধান রচনা করিতে থাকে, সেখানকার সাহিত্যে এরূপ সৃষ্টি সম্ভবপর হইতে পারে না।

উত্তরচরিতেও প্রকৃতির সহিত মানুষের আত্মীয়বৎ সৌহার্দ্দ্য এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে। রাজপ্রাসাদে থাকিয়াও সীতার প্রাণ সেই অরণ্যের জন্য কাঁদিতেছে। সেখানে নদী তমসা ও বনস্তবনলক্ষ্মী তাঁহার প্রিয়সখী, সেখানে ময়ূর ও করিশিশু তাঁহার কৃতক-পুত্র, তরুলতা তাঁহার পরিজনবর্গ।

টেম্পেষ্ট-নাটকে মানুষ আপনাকে বিশ্বের মধ্যে মঙ্গলভাবে প্রীতিযোগে প্রসারিত করিয়া বড় হইয়া উঠে নাই—বিশ্বকে খর্ব্ব করিয়া,দমন করিয়া আপনি অধিপতি হইতে চাহিয়াছে। বস্তুত আধিপত্য লইয়া দ্বন্দ্ব-

বিরোধ ও প্রয়াসই টেম্পেষ্টের মূলভাব। সেখানে প্রস্পেরো স্বরাজ্যের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া মন্ত্রবলে প্রকৃতিরাজ্যের উপর কঠোর আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন। সেখানে আসন্নমৃত্যুর হস্ত হইতে কোনমতে রক্ষা পাইয়া যে কয়জন প্রাণী তীরে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও এই শূন্যপ্রায় দ্বীপের ভিতরে আধিপত্য লইয়া ষড়্‌যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও গোপনহত্যার চেষ্টা! পরিণামে তাহার নিবৃত্তি হইল, কিন্তু শেষ হইল, এ কথা কেহই বলিতে পারে না। দানবপ্রকৃতি ভয়ে, শাসনে ও অবসরের অভাবে পীড়িত ক্যালিবানের মত স্তব্ধ হইয়া রহিল মাত্র, কিন্তু তাহার দন্তমূলে ও নখাগ্রে বিষ রহিয়া গেল। যাহার যাহা প্রাপ্য সম্পত্তি, সে তাহা পাইল। কিন্তু সম্পত্তিলাভ ত বাহ্যলাভ—তাহা বিষয়ি-সম্প্রদায়ের লক্ষ্য হইতে পারে কাব্যের তাহা চরম পরিণাম নহে।

টেম্পেষ্ট-নাটকের নামও যেমন, তাহার ভিতরকার ব্যাপারও সেইরূপ। মানুষে-প্রকৃতিতে বিরোধ, মানুষে-মানুষে বিরোধ—এবং সে বিরোধের মূলে ক্ষমতালাভের প্রয়াস। ইহার আগাগোড়াই বিক্ষোভ।

মানুষের দুর্ব্বাধ্য প্রবৃত্তি এইরূপ ঝড় তুলিয়া থাকে। শাসন-দমন-পীড়নের দ্বারা এই সকল প্রবৃত্তিকে হিংস্রপশুর মত সংযত করিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু, এইরূপ বলের দ্বারা বলকে ঠেকাইয়া রাখা, ইহা কেবল একটা উপস্থিতমত কাজ চালাইবার প্রণালী-মাত্র। আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ইহা-কেই পরিণাম বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। সৌন্দর্য্যের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, মঙ্গলের দ্বারা পাপ একেবারে ভিতর হইতে বিলুপ্ত, বিলীন হইয়া যাইবে, ইহাই আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষা। সংসারে তাহার সহস্র বাধাব্যতিক্রম থাকিলেও ইহার প্রতি মানবের অন্তরতর লক্ষ্য একটি আছে। সাহিত্য সেই লক্ষ্যসাধনের নিগূঢ় প্রয়াসকে ব্যক্ত করিয়া থাকে। সে ভালকে সুন্দর, সে শ্রেয়কে প্রিয়, সে পুণ্যকে হৃদয়ের ধন করিয়া তোলে। ফলাফলনির্ণয় ও বিভী-ষিকা দ্বারা আমাদিগকে কল্যাণের পথে প্রবৃত্ত রাখা বাহিরের কাজ—তাহা দণ্ডনীতি ও ধর্ম্মনীতির আলোচ্য হইতে পারে—কিন্তু উচ্চসাহিত্য অন্তরাত্মার ভিতরের পথটি অবলম্বন করিতে চায় ;—তাহা স্বভাবনিঃসৃত অশ্রুজলের দ্বারা কলঙ্কক্ষালন করে, আন্ত-রিক ঘৃণার দ্বারা পাপকে দগ্ধ করে এবং সহজ আনন্দের দ্বারা পুণ্যকে অভ্যর্থনা করে।

কালিদাসও তাঁহার নাটকে দুরন্ত প্রবৃত্তির দাবদাহকে অনুতপ্ত চিত্তের অশ্রু-বর্ষণে নির্ব্বাপিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ব্যাধিকে লইয়া অতিমাত্রায় আলোচনা করেন নাই—তিনি তাহার আভাস দিয়া-ছেন, এবং দিয়া তাহার উপরে একটি আচ্ছাদন টানিয়াছেন। সংসারে এরূপ স্থলে যাহা স্বভাবত হইতে পারিত, তাহাকে তিনি দুর্ব্বাসার শাপের দ্বারা ঘটাইয়াছেন। নতুবা তাহা এমন একান্ত নিষ্ঠুর ও ক্ষোভজনক হইত যে, তাহাতে সমস্ত নাটকটির শান্তি ও সামঞ্জস্য ভঙ্গ হইয়া যাইত। শকুন্তলায় কালিদাস যে রসের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন,

এরূপ অত্যুৎকট আন্দোলনে তাহা রক্ষা পাইত না। দুঃখবেদনাকে তিনি সমানই রাখিয়াছেন, কেবল বীভৎস কদর্য্যতাকে কবি আবৃত করিয়াছেন।

কিন্তু কালিদাস সেই আবরণের মধ্যে এতটুকু ছিদ্র রাখিয়াছেন, যাহাতে পাপের আভাস পাওয়া যায়। সেই কথার উত্থাপন করি।

পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান। সেই অঙ্কের আরম্ভেই কবি রাজার প্রণয়-রঙ্গভূমির যবনিকা ক্ষণকালের জন্য একটু-খানি সরাইয়া দেখাইয়াছেন। রাজপ্রেয়সী হংসপদিকা নেপথ্যে সঙ্গীতশালায় আপন মনে বসিয়া গান গাহিতেছেন—

অভিনবমধুশোভী মধুকর
চূতমঞ্জরী চুমি'
কমলনিবাসে যে প্রীতি পেয়েছ
কেমনে ভুলিলে তুমি!

রাজান্তঃপুর হইতে ব্যথিত হৃদয়ের এই অশ্রুসিক্ত গান আমাদিগকে বড় আঘাত করে। বিশেষ আঘাত করে এইজন্য যে, তাহার পূর্ব্বেই শকুন্তলার সহিত দুষ্যন্তের প্রেমলীলা আমাদের চিত্ত অধিকার করিয়া আছে। ইহার পূর্ব্ব অঙ্কেই শকুন্তলা ঋষি-বৃদ্ধ কণ্বের আশীর্ব্বাদ ও সমস্ত অরণ্যানীর মঙ্গলাচরণ গ্রহণ করিয়া বড় স্নিগ্ধকরুণ, বড় পবিত্রমধুর ভাবে পতিগৃহে যাত্রা করিয়াছে। তাহার জন্য যে প্রেম—যে গৃহের চিত্র আমাদের আশাপটে অঙ্কিত হইয়া উঠে, পরবর্ত্তী অঙ্কের আরম্ভেই সে চিত্রে দাগ পড়িয়া যায়।

বিদূষক যখন জিজ্ঞাসা করিল—"এই গানটির অক্ষরার্থ বুঝিলে কি?" রাজা ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "সঙ্কৃতকৃত-প্রণয়োঽয়ং জনঃ—আমরা একবারমাত্র প্রণয় করিয়া তাহার পরে ছাড়িয়া দিই, সেইজন্য দেবী বসুমতীকে লইয়া আমি ইঁহার মহৎ ভর্ৎসনের যোগ্য হইয়াছি। সখে মাধব্য, তুমি আমার নাম করিয়া হংসপদিকাকে বল, 'বড় নিপুণভাবে তুমি আমাকে ভর্ৎসনা করিয়াছ।' * * * যাও, বেশ নাগরিকবৃত্তি দ্বারা এই কথাটি তাঁহাকে বলিবে।"

পঞ্চম অঙ্কের প্রারম্ভে রাজার চপল প্রণয়ের এই পরিচয় নিরর্থক নহে। ইহাতে কবি নিপুণ কৌশলে জানাইয়াছেন, দুর্ব্বাসার শাপে যাহা ঘটাইয়াছে, স্বভাবের মধ্যে তাহার বীজ ছিল। কাব্যের খাতিরে যাহাকে আকস্মিক করিয়া দেখান হইয়াছে, তাহা স্বাভাবিক।

চতুর্থ অঙ্ক হইতে পঞ্চম অঙ্কে আমরা হঠাৎ আর এক বাতাসে আসিয়া পড়িলাম। এতক্ষণ আমরা যেন একটি মানসলোকে ছিলাম—সেখানকার যে নিয়ম, এখানকার সে নিয়ম নহে। সেই তপোবনের সুর এখানকার সুরের সঙ্গে মিলিবে কি করিয়া? সেখানে যে ব্যাপারটি সহজ-সুন্দরভাবে অতি অনায়াসে ঘটিয়াছিল, এখানে তাহার কি দশা হইবে, তাহা চিন্তা করিলে আশঙ্কা জন্মে। তাই পঞ্চম অঙ্কের প্রথমেই নাগরিকবৃত্তির মধ্যে যখন দেখিলাম যে, এখানে হৃদয় বড় কঠিন, প্রণয় বড় কুটিল এবং মিলনের পথ সহজ নহে, তখন আমাদের সেই বনের সৌন্দর্য্যস্বপ্ন

ভাঙিবার মত হইল। ঋষিশিষ্য শার্ঙ্গরব রাজভবনে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "যেন অগ্নিবেষ্টিত গৃহের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম।" শারদ্বত কহিলেন, "স্নাত ব্যক্তির তৈলাক্তকে দেখিয়া, শুচি ব্যক্তির অশুচিকে দেখিয়া, জাগ্রত জনের সুপ্তকে দেখিয়া এবং স্বাধীন পুরুষের বদ্ধকে দেখিয়া যে ভাব মনে হয়, এই সকল বিষয়ী লোককে দেখিয়া আমার সেইরূপ মনে হইতেছে।"—একটা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র লোকের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন, ঋষিকুমারগণ তাহা সহজেই অনুভব করিতে পারিলেন। পঞ্চম অঙ্কের আরম্ভে কবি নানাপ্রকার আভাসের দ্বারা আমাদিগকে এই ভাবে প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন যাহাতে শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যান-ব্যাপার অকস্মাৎ অতি-মাত্র আঘাত না করে! হংসপদিকার সরল করুণগীতে এই ক্রূরকাণ্ডের ভূমিকা হইয়া রহিল।

তাহার পরে প্রত্যাখ্যান যখন অকস্মাৎ বজ্রের মত শকুন্তলার মাথার উপরে ভাঙিয়া পড়িল, তখন এই তপোবনের দুহিতা বিস্মৃত হস্ত হইতে বাণাহত মৃগীর মত বিস্ময়ে, ত্রাসে, বেদনায় বিহ্বল হইয়া ব্যাকুলনেত্রে চাহিয়া রহিল। তপোবনের পুষ্পরাশির উপর অগ্নি আসিয়া পড়িল। শকুন্তলাকে অন্তরে-বাহিরে ছায়ায়-সৌন্দর্য্যে আচ্ছন্ন করিয়া যে একটি তপোবন লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে বিরাজ করিতেছিল, এই বজ্রাঘাতে তাহা শকুন্তলার চতুর্দ্দিক্ হইতে চিরদিনের জন্য বিশ্লিষ্ট হইয়া গেল, শকুন্তলা একেবারে অনাবৃত হইয়া পড়িল। কোথায় তাত কণ্ব, কোথায় মাতা গৌতমী, কোথায় অনসূয়া-প্রিয়ংবদা, কোথায় সেই সকল তরুলতাপশুপক্ষীর সহিত স্নেহের সম্বন্ধ, মাধুর্য্যের যোগ, সেই সুন্দর শান্তি, সেই নির্ম্মল জীবন! এই এক মুহূর্ত্তের প্রলয়াভিঘাতে শকুন্তলার যে কতখানি বিলুপ্ত হইয়া গেল, তাহা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাই। নাটকের প্রথম চারি অঙ্কে যে সঙ্গীতধ্বনি উঠিয়াছিল, তাহা একমুহূর্ত্তেই নিঃশব্দ হইয়া গেল!

তাহার পরে শকুন্তলার চতুর্দ্দিকে কি গভীর স্তব্ধতা, কি বিরলতা! যে শকুন্তলা কোমল হৃদয়ের প্রভাবে তাঁহার চারিদিকের বিশ্ব জুড়িয়া সকলকে আপনার করিয়া থাকিত, সে আজ কি একাকিনী! তাহার সেই বৃহৎ-শূন্যতাকে শকুন্তলা আপনার একমাত্র মহৎ দুঃখের দ্বারা পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। কালিদাস যে তাহাকে কণ্বের তপোবনে ফিরাইয়া লইয়া যান নাই, ইহা তাঁহার অসামান্য কবিত্বের পরিচয়। তাহার পূর্ব্বপরিচিত বনভূমির সহিত তাহার পূর্ব্বের মিলন আর সম্ভবপর নহে। কণ্বাশ্রম হইতে যাত্রাকালে তপোবনের সহিত শকুন্তলার কেবল বাহ্যবিচ্ছেদমাত্র ঘটিয়াছিল, দুষ্যন্তভবন হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া সে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইল—সে শকুন্তলা আর রহিল না, এখন বিশ্বের সহিত তাহার সম্বন্ধ-পরিবর্ত্তন হইয়া গেছে, এখন তাহাকে তাহার পুরাতন সম্বন্ধের মধ্যে স্থাপন করিলে অসামঞ্জস্য উৎকট নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশিত হইত। এখন এই দুঃখিনীর জন্য তাহার মহৎ দুঃখের উপযোগী বিরলতা আবশ্যক। সখীবিহীন নূতন তপোবনে কালিদাস শকুন্তলার বিরহদুঃখের প্রত্যক্ষ অবতারণা

করেন নাই। কবি নীরব থাকিয়া শকুন্তলার চারিদিকের নীরবতা ও শূন্যতা আমাদের চিত্তের মধ্যে ঘনীভূত করিয়া দিয়াছেন। কবি যদি শকুন্তলাকে কণ্বাশ্রমের মধ্যে ফিরাইয়া লইয়া এইরূপ চুপ করিয়াও থাকিতেন, তবু সেই আশ্রম কথা কহিত। সেখানকার তরুলতার ক্রন্দন, সখীজনের বিলাপ, আপনি আমাদের অন্তরের মধ্যে ধ্বনিত হইতে থাকিত। কিন্তু অপরিচিত মারীচের তপোবনে সমস্তই আমাদের নিকট স্তব্ধ, নীরব—কেবল বিশ্ববিরহিত শকুন্তলার নিয়মসংযত ধৈর্য্যগম্ভীর অপরিমেয় দুঃখ আমাদের মানসনেত্রের সম্মুখে ধ্যানাসনে বিরাজমান। সেই ধ্যানমগ্ন দুঃখের সম্মুখে কবি একাকী দাঁড়াইয়া আপন ওষ্ঠাধরের উপরে তর্জ্জনী স্থাপন করিয়াছেন, এবং সেই নিষেধের সঙ্কেতে সমস্ত প্রশ্নকে নীরব ও সমস্ত বিশ্বকে দূরে অপসারিত করিয়া রাখিয়াছেন।

দুষ্যন্ত এখন অনুতাপে দগ্ধ হইতেছেন। এই অনুতাপ তপস্যা। এই অনুতাপের ভিতর দিয়া শকুন্তলাকে লাভ না করিলে, শকুন্তলালাভের কোন গৌরব ছিল না। হাতে পাইলেই যে তাহাকে পাওয়া বলে, তাহা নহে—লাভ করা অত সহজ ব্যাপার নয়। যৌবনমত্ততার আকস্মিক ঝড়ে শকুন্তলাকে এক মুহূর্ত্তে উড়াইয়া লইলে তাহাকে সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যাইত না। লাভ করিবার প্রকৃষ্ট প্রণালী সাধনা, তপস্যা। যাহা অনায়াসেই হস্তগত হইয়াছিল, তাহা অনায়াসেই হারাইয়া গেল। যাহা আবেশের মুষ্টিতে আহরিত হয়, তাহা শিথিলভাবেই স্খলিত হইয়া পড়ে। সেইজন্য কবি পরস্পরকে যথার্থভাবে, চিরন্তনভাবে লাভের জন্য দুষ্যন্ত-শকুন্তলাকে দীর্ঘদুঃসহ তপস্যায় প্রবৃত্ত করিলেন। রাজসভায় প্রবেশ করিবামাত্র দুষ্যন্ত যদি তৎক্ষণাৎ শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতেন, তবে শকুন্তলা হংসপদিকার দলবৃদ্ধি করিয়া তাঁহার অবরোধের এক প্রান্তে স্থান পাইত। বহুবল্লভ রাজার এমন কত সুখলব্ধ প্রেয়সী ক্ষণকালীন সৌভাগ্যের স্মৃতিটুকুমাত্র লইয়া অনাদরের অন্ধকারে অনাবশ্যক জীবন যাপন করিতেছে। "সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং জনঃ।"

শকুন্তলার সৌভাগ্যবশতই দুষ্যন্ত নিষ্ঠুর কঠোরতার সহিত তাহাকে পরিহার করিয়াছিলেন। নিজের উপর নিজের নিষ্ঠুরতার সেই প্রত্যভিঘাতেই দুষ্যন্তকে শকুন্তলা সম্বন্ধে আর অচেতন থাকিতে দিল না। অহরহ পরমবেদনার উত্তাপে শকুন্তলা তাঁহার বিগলিত হৃদয়ের সহিত মিশ্রিত হইতে লাগিল, তাঁহার অন্তর-বাহিরকে ওতপ্রোত করিয়া দিল। এমন অভিজ্ঞতা রাজার জীবনে কখনো হয় নাই—তিনি যথার্থ প্রেমের উপায় ও অবসর পান নাই। রাজা বলিয়াই এ সম্বন্ধে তিনি হতভাগ্য। ইচ্ছা তাঁহার অনায়াসেই মিটে বলিয়াই সাধনার ধন তাঁহার অনায়ত্ত ছিল। এবারে বিধাতা কঠিন দুঃখের মধ্যে ফেলিয়া রাজাকে প্রকৃত প্রেমের অধিকারী করিয়াছেন—এখন হইতে তাঁহার নাগরিকবৃত্তি একেবারে বন্ধ।

এইরূপে কালিদাস পাপকে হৃদয়ের ভিতর-দিক্ হইতে আপনার অনলে আগুন

দগ্ধ করিয়াছেন—বাহির হইতে তাহাকে ছাইচাপা দিয়া রাখেন নাই। সমস্ত অমঙ্গলের নিঃশেষে অগ্নিসংস্কার করিয়া তবে নাটকখানি সমাপ্ত হইয়াছে,—পাঠকের চিত্ত একটি সংশয়হীন পরিপূর্ণ পরিণতির মধ্যে শান্তিলাভ করিয়াছে। বাহির হইতে অকস্মাৎ বীজ পড়িয়া যে বিষবৃক্ষ জন্মে, ভিতর হইতে গভীরভাবে তাহাকে নির্ম্মূল না করিলে তাহার উচ্ছেদ হয় না। কালিদাস দুষ্যন্ত-শকুন্তলার বাহিরের মিলনকে দুঃখখনিত পথ দিয়া লইয়া গিয়া অভ্যন্তরের মিলনে সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। এইজন্যই কবি গেটে বলিয়াছেন, তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, মর্ত্ত্য এবং স্বর্গ যদি কেহ একাধারে পাইতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাওয়া যাইবে।

টেম্পেষ্টে ফার্দ্দিনান্দের প্রেমকে প্রস্পেরো কৃচ্ছ্রসাধনদ্বারা পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সে বাহিরের ক্লেশ। কেবল কাঠের বোঝা বহন করিয়া পরীক্ষার শেষ হয় না। আভ্যন্তরিক কি উত্তাপে ও পেষণে অঙ্গার হীরক হইয়া উঠে, কালিদাস তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি কালিমাকে নিজের ভিতর হইতেই উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন, তিনি ভঙ্গুরতাকে চাপপ্রয়োগে দৃঢ়তা দান করিয়াছেন। শকুন্তলায় আমরা অপরাধের সার্থকতা দেখিতে পাই—সংসারে বিধাতার বিধানে পাপও যে কি মঙ্গলকর্ম্মে নিযুক্ত আছে, কালিদাসের নাটকে আমরা তাহার সুপরিণত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। অপরাধের অভিঘাত ব্যতীত মঙ্গল তাহার শাশ্বত দীপ্তি ও শক্তি লাভ করে না।

শকুন্তলাকে আমরা কাব্যের আরম্ভে একটি নিষ্কলুষ সৌন্দর্য্যলোকের মধ্যে দেখিলাম—সেখানে সরল আনন্দে সে আপন সখীজন ও তরুলতামৃগের সহিত মিশিয়া আছে। সেই স্বর্গের মধ্যে অলক্ষ্যে অপরাধ আসিয়া প্রবেশ করিল—এবং স্বর্গসৌন্দর্য্য কীটদষ্ট পুষ্পের ন্যায় বিদীর্ণ, স্রস্ত হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার পরে লজ্জা, সংশয়, দুঃখ, বিচ্ছেদ, অনুতাপ। এবং সর্ব্বশেষে বিশুদ্ধতর—উন্নততর স্বর্গলোকে ক্ষমা, প্রীতি ও শান্তি। শকুন্তলাকে একত্রে Paradise Lost এবং Paradise Regained বলা যাইতে পারে।

প্রথম স্বর্গটি বড় মৃদু এবং অরক্ষিত—তাহা সুন্দর এবং সম্পূর্ণ বটে, কিন্তু পদ্মপত্রে শিশিরের মত—তাহা সদ্যঃপাতী। এই সঙ্কীর্ণ সম্পূর্ণতার সৌকুমার্য্য হইতে মুক্তি পাওয়াই ভাল—ইহা চিরদিনের নহে এবং ইহাতে আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন তৃপ্তি নাই। অপরাধ মত্তগজের ন্যায় আসিয়া এখানকার পদ্মপত্রের বেড়া ভাঙিয়া দিল—আলোড়নের বিক্ষোভে সমস্ত চিত্তকে উন্মথিত করিয়া তুলিল। সহজ স্বর্গ এইরূপে সহজেই নষ্ট হইল, বাকি রহিল সাধনার স্বর্গ। অনুতাপের দ্বারা—তপস্যার দ্বারা সেই স্বর্গ যখন জিত হইল, তখন আর কোন শঙ্কা রহিল না। এ স্বর্গ শাশ্বত।

মানুষের জীবনও এইরূপ—শিশু যে সরল স্বর্গে থাকে, তাহা সুন্দর, তাহা সম্পূর্ণ, কিন্তু ক্ষুদ্র। মধ্যবয়সের সমস্ত বিক্ষেপ ও বিক্ষোভ, সমস্ত অপরাধের আঘাত ও অনুতাপের দাহ জীবনের পূর্ণবিকাশের পক্ষে

আবশ্যক। শিশুকালের শান্তির মধ্য হইতে বাহির হইয়া সংসারের বিরোধ-বিপ্লবের মধ্যে না পড়িলে, পরিণতবয়সের পরিপূর্ণ শান্তির আশা বৃথা। প্রভাতের স্নিগ্ধতাকে মধ্যাহ্নতাপে দগ্ধ করিয়া তবেই সায়াহ্নের লোকলোকান্তর-ব্যাপী বিরাম। পাপে-অপরাধে ক্ষণভঙ্গুরকে ভাঙিয়া দেয় এবং অনুতাপে-বেদনায় চিরস্থায়ীকে গড়িয়া তোলে। শকুন্তলা-কাব্যে কবি সেই স্বর্গচ্যুতি হইতে স্বর্গপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্ত বিবৃত করিয়াছেন।

বিশ্বপ্রকৃতি যেমন বাহিরে প্রশান্ত-সুন্দর, কিন্তু তাহার প্রচণ্ড শক্তি অহরহ অভ্যন্তরে কাজ করে, অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকখানির মধ্যে আমরা তাহার প্রতিরূপ দেখিতে পাই। এমন আশ্চর্য্য সংযম আমরা কোন নাটকেই দেখি নাই। প্রবৃত্তির প্রবলতাপ্রকাশের অবসরমাত্র পাইলেই য়ুরোপীয় কবিগণ যেন উদ্দাম হইয়া উঠেন। প্রবৃত্তি যে কতদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে, তাহা অতিশয়োক্তিদ্বারা প্রকাশ করিতে তাঁহারা ভালবাসেন। শেক্‌স্‌পিয়রে রোমিয়ো-জুলিয়েট্‌ প্রভৃতি নাটকে তাহার ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শকুন্তলার মত এমন প্রশান্ত-গভীর, এমন সংযত-সম্পূর্ণ নাটক শেক্‌স্‌পিয়রের নাট্যাবলির মধ্যে একখানিও নাই। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মধ্যে যেটুকু প্রেমালাপ আছে, তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, তাহার অধিকাংশই আভাসে-ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে, কালিদাস কোথাও রাশ আল্‌গা করিয়া দেন নাই। অন্য কবি যেখানে লেখনীকে দৌড় দিবার অবসর অন্বেষণ করিত, তিনি সেখানেই তাহাকে হঠাৎ নিরস্ত করিয়াছেন। দুষ্যন্ত তপোবন হইতে রাজধানীতে ফিরিয়া গিয়া শকুন্তলার কোন খোঁজ লইতেছেন না। এই উপলক্ষ্যে বিলাপ-পরিতাপের কথা অনেক হইতে পারিত, তবু শকুন্তলার মুখে কবি একটি কথাও দেন নাই। কেবল দুর্ব্বাসার প্রতি আতিথ্যে অনবধান লক্ষ্য করিয়া হতভাগিনীর অবস্থা আমরা যথাসম্ভব কল্পনা করিতে পারি। শকুন্তলার প্রতি কণ্বের একান্ত স্নেহ বিদায়-কালে কি সকরুণ গাম্ভীর্য্য ও সংযমের সহিত কত অল্প কথাতেই ব্যক্ত হইয়াছে! অনসূয়া-প্রিয়ংবদার সখীবিচ্ছেদবেদনা ক্ষণে ক্ষণে দুটি-একটি কথায় যেন বাঁধ লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিয়া তখনি অন্তরের মধ্যে নিরস্ত হইয়া যাইতেছে। প্রত্যাখ্যানদৃশ্যে ভয়, লজ্জা, অভিমান, মিনতি, ভৎর্সনা, বিলাপ, সমস্তই আছে, অথচ কত অল্পের মধ্যে! যে শকুন্তলা সুখের সময় সরল অসংশয়ে আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়াছিল, দুঃখের সময় দারুণ অপমান-কালে সে যে আপন হৃদয়বৃত্তির অপ্রগল্‌ভ মর্য্যাদা এমন আশ্চর্য্য সংযমের সহিত রক্ষা করিবে, এ কে মনে করিয়াছিল? এই প্রত্যাখ্যানের পরবর্ত্তী নীরবতা কি ব্যাপক, কি গভীর! কণ্ব নীরব, অনসূয়া-প্রিয়ংবদা নীরব, মালিনীতীরতপোবন নীরব, সর্ব্বাপেক্ষা নীরব শকুন্তলা। হৃদয়-বৃত্তিকে আলোড়ন করিয়া তুলিবার এমন অবসর কি আর কোন নাটকে এমন নিঃশব্দে উপেক্ষিত হইয়াছে? দুষ্যন্তের অপরাধকে দুর্ব্বাসার শাপের আচ্ছাদনে আবরিত করিয়া রাখা, সে-ও কবির সংযম। দুষ্টপ্রবৃত্তির দুরন্তপনাকে অবারিত-ভাবে—উচ্ছৃঙ্খলভাবে দেখাইবার যে প্রলো-

ভন, তাহাও কবি সংবরণ করিয়াছেন—তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিয়াছে—

"ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্‌
মৃদুনি মৃগশরীরে পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ!

দুষ্যন্ত যখন কাব্যের মধ্যে বিপুল বিক্ষোভের কারণ লইয়া মত্ত হইয়া প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার অন্তরের মধ্যে এই ধ্বনি উঠিল—

মূর্ত্তো বিঘ্নস্তপস ইব নো ভিন্নসারঙ্গযূথো
ধর্ম্মারণ্যং প্রবিশতি গজঃ স্যন্দনালোকভীতঃ।

তপস্যার মূর্ত্তিমান্‌ বিঘ্নের ন্যায় গজরাজ ধর্ম্মারণ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এইবার বুঝি কাব্যের শান্তিভঙ্গ হয়—কালিদাস তখনই ধর্ম্মারণ্যের, কাব্যকাননের, এই মূর্ত্তিমান্‌ বিঘ্নকে শাপের বন্ধনে সংযত করিলেন—ইহাকে দিয়া তাঁহার পদ্মবনের পঙ্ক আলোড়িত করিয়া তুলিতে দিলেন না।

য়ুরোপীয় কবি হইলে এইখানে সাংসারিক সত্যের নকল করিতেন—সংসারে ঠিক যেমন, নাটকে তাহাই ঘটাইতেন। শাপ বা অলৌকিক ব্যাপারের দ্বারা কিছুই আবৃত করিতেন না। যেন তাঁহাদের 'পরে সমস্ত দাবী কেবল সংসারের, কাব্যের কোন দাবী নাই। কালিদাস সংসারকে কাব্যের চেয়ে বেশি খাতির করেন নাই—পথে-ঘাটে যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহাকে নকল করিতেই হইবে, এমন দাসখৎ তিনি কাহাকেও লিখিয়া দেন নাই—কিন্তু কাব্যের শাসন কবিকে মানিতেই হইবে। কাব্যের প্রত্যেক ঘটনাটিকে সমস্ত কাব্যের সহিত তাঁহাকে খাপ্‌ খাওয়াইয়া লইতেই হইবে। তিনি সত্যের আভ্যন্তরিক মূর্ত্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সত্যের বাহ্য-মূর্ত্তিকে তাঁহার কাব্যসৌন্দর্য্যের সহিত সঙ্গত করিয়া লইয়াছেন। তিনি অনুতাপ ও তপস্যাকে সমুজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন, কিন্তু পাপকে তিরস্করিণীর দ্বারা কিঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন করিয়াছেন। শকুন্তলা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে একটি শান্তি, সৌন্দর্য্য ও সংযমের দ্বারা পরিবেষ্টিত, এরূপ না করিলে তাহা বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইত। সংসারের নকল ঠিক হইত, কিন্তু কাব্যলক্ষ্মী সুকঠোর আঘাত পাইতেন। কবি কালিদাসের করুণ-নিপুণ লেখনীর দ্বারা তাহা কখনই সম্ভবপর হইত না।

কবি এইরূপে বাহিরের শান্তি ও সৌন্দর্য্যকে কোথাও অতিমাত্র ক্ষুব্ধ না করিয়া তাঁহার কাব্যের আভ্যন্তরিক শক্তিকে নিস্তব্ধতার মধ্যে সর্ব্বদা সক্রিয় ও সবল করিয়া রাখিয়াছেন। এমন কি, তাঁহার তপোবনের বহিঃপ্রকৃতিও সর্ব্বত্র অন্তরের কাজেই যোগ দিয়াছে। কখনো বা তাহা শকুন্তলার যৌবনলীলায় আপনার লীলা-মাধুর্য্য অর্পণ করিয়াছে, কখনো বা মঙ্গল-আশীর্ব্বাদের সহিত আপনার কল্যাণমর্ম্মর মিশ্রিত করিয়াছে, কখনো বা বিচ্ছেদকালীন ব্যাকুলতার সহিত আপনার মূক বিদায়বাক্যের করুণা জড়িত করিয়া দিয়াছে এবং অপরূপ মন্ত্রবলে শকুন্তলার চরিত্রের মধ্যে একটি পবিত্র নির্ম্মলতা—একটি স্নিগ্ধ মাধুর্য্যের রশ্মি নিয়ত বিকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। এই শকুন্তলাকাব্যে নিস্তব্ধতা যথেষ্ট আছে, কিন্তু সকলের চেয়ে নিস্তব্ধভাবে অথচ ব্যাপক-ভাবে কবির তপোবন এই কাব্যের মধ্যে

কাজ করিয়াছে। সে কাজ টেম্পেষ্টের এরিয়েলের ন্যায় শাসনবদ্ধ দাসত্বের বাহ্য কাজ নহে—তাহা সৌন্দর্য্যের কাজ, প্রীতির কাজ, আত্মীয়তার কাজ, অভ্যন্তরের নিগূঢ় কাজ!

টেম্পেষ্টে শক্তি, শকুন্তলায় শান্তি; টেম্পেষ্টে বলের দ্বারা জয়, শকুন্তলায় মঙ্গলের দ্বারা সিদ্ধি; টেম্পেষ্টে অর্দ্ধপথে ছেদ, শকুন্তলায় সম্পূর্ণতায় অবসান; টেম্পেষ্টে যথালাভ, শকুন্তলায় চরমলাভ। টেম্পেষ্টের মিরান্দা সরল মাধুর্য্যে গঠিত, কিন্তু সে সরলতার প্রতিষ্ঠা অজ্ঞতা-অনভিজ্ঞতার উপরে,—শকুন্তলার সরলতা অপরাধে, দুঃখে, অভিজ্ঞতায়, ধৈর্য্যে ও ক্ষমায় পরিপক্ক, গম্ভীর ও স্থায়ী। গেটের সমালোচনার অনুসরণ করিয়া পুনর্ব্বার বলি—শকুন্তলায় আরম্ভের তরুণ সৌন্দর্য্য মঙ্গলময় পরম পরিণতিতে সফলতা লাভ করিয়া মর্ত্ত্যকে স্বর্গের সহিত সম্মিলিত করিয়া দিয়াছে।*

শুক্ল-সন্ধ্যা।

শূন্য ছিল মন,
নানা কোলাহলে ঢাকা,
নানা-আনাগোনা-আঁকা
দিনের মতন।
নানা জনতার ফাঁকা,
কর্ম্মে অচেতন
শূন্য ছিল মন।

জানি না কখন্ এল নূপুর-বিহীন
নিঃশব্দ গোধূলি!
দেখি নাই স্বর্ণরেখা,
কি লিখিল শেষ লেখা
দিনান্তের তুলি।
আমি যে ছিলাম একা
তা-ও ছিনু ভুলি।
আইল গোধূলি।

* আলোচনা-সমিতির অধিবেশনে বঙ্গদর্শন-সম্পাদক-কর্ত্তৃক পঠিত।

হেনকালে আকাশের বিস্ময়ের মত
কোন্ স্বর্গ হতে
চাঁদখানি ল'য়ে হেসে
শুক্ল-সন্ধ্যা এল ভেসে
আঁধারের স্রোতে।
বুঝি সে আপনি মেশে
আপন আলোতে!
এল কোথা হতে!

মোহন লাইব্রেরী

অকস্মাৎ-বিকশিত পুষ্পের পুলকে
তুলিলাম আঁখি।
আর কেহ কোথা নাই,
সে শুধু আমারি ঠাঁই
এসেছে একাকী।
সম্মুখে দাঁড়াল তাই
মোর মুখে রাখি
অনিমেষ আঁখি!

রাজহংস এসেছিল কোন্ যুগান্তরে
শুনেছি পুরাণে।
দময়ন্তী আলবালে
স্বর্ণঘটে জল ঢালে
নিকুঞ্জ-বিতানে,—
কার কথা হেনকালে
কহি গেল কাণে,
শুনেছি পুরাণে!

জ্যোৎস্নাসন্ধ্যা তারি মত আকাশ বাহিয়া
এল মোর বুকে।
কোন্ দূর প্রবাসের
লিপিখানি আছে এর
ভাষাহীন মুখে!

সে যে কোন্ উৎসুকের
মিলনকৌতুকে
এল মোর বুকে !

দুইখানি শুভ্র ডানা ঘেরিল আমারে
সর্ব্বাঙ্গে হৃদয়ে।
স্কন্ধে মোর রাখি শির
নিস্পন্দ রহিল স্থির,
কথাটি না ক'য়ে।
কোন্ পদ্ম-বনানীর
কোমলতা ল'য়ে
পশিল হৃদয়ে ?

আর কিছু বুঝি নাই, শুধু বুঝিলাম
আছি আমি একা !
এই শুধু জানিলাম
জানি নাই তার নাম
লিপি যার লেখা।
এই শুধু বুঝিলাম
না পাইলে দেখা
রব আমি একা !

ব্যর্থ হয়, ব্যর্থ হয় এ দিন-রজনী,
এ মোর জীবন !
হায় হায় চিরদিন
হ'য়ে আছে অর্থহীন
এ বিশ্বভুবন !
অনন্ত প্রেমের ঋণ
করিছে বহন
ব্যর্থ এ জীবন !

ওগো দূত দূরবাসি, ওগো বাক্যহীন,
হে সৌম্য-সুন্দর !

চাহি তব মুখপানে
ভাবিতেছি মুগ্ধপ্রাণে
কি দিব উত্তর ?
অশ্রু আসে দু'নয়ানে,
নির্ব্বাক্ অন্তর !
হে সৌম্য-সুন্দর !

বোগ্‌দাদে ভারতবর্ষীয় চিকিৎসক।

আর ভারতের প্রাচীন গৌরবের কাহিনী বড় গীত হয় না। এক সময় ছিল, যখন য়ুরোপীয় বিশিষ্ট পণ্ডিতেরা ভারতের ইতিবৃত্ত-উদ্ধারে সবিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। য়ুরোপে সেরূপ মহাপ্রাণ লোক ক্রমেই বিরল হইয়া পড়িতেছেন। এখন সেখানে সকলে নিজ নিজ জাতির মাহাত্ম্যই যথা বা অযথা রূপে কীর্ত্তন করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত। পরের দিকে চাহিবার বা পরের বিষয় জানিবার আর ইচ্ছাও নাই, প্রয়াসও নাই। নিঃস্বার্থ গুণগ্রাহিতার দিন ফুরাইয়াছে।

তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, পঞ্চাশৎ-বৎসর পূর্ব্বে য়ুরোপীয় নিঃস্বার্থ জ্ঞান-পিপাসু পণ্ডিতেরা ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের যে সকল তথ্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই ভারতের প্রাচীন সভ্যতার কীর্ত্তি সভ্যজগতে ঘোষিত হইয়া ভারতকে পূজিত এবং আদৃত করিয়াছে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা যাহা করিয়াছেন, যথেষ্টই করিয়াছেন। ভারত চিরদিনই তাঁহাদের নিকট ঋণী থাকিবে। এখন যে তাঁহাদের মধ্যে অন্য কেহ এ বিষয়ে যত্নবান্ নহেন, তাহা লইয়া আমাদের ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত হওয়া কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে। তাঁহারা আমাদের অনেক করিয়াছেন। তাঁহারা ধন্য হউন।

কিন্তু দুঃখ হয় নিজেদের জন্য। যে জাতির অভাবনীয় উন্নতির বিষয় ঘোষণা করিবার জন্য এতসংখ্যক বিদেশী বিদ্বন্মণ্ডলী প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক-তত্ত্ব-আবিষ্কারকে জীবনের ব্রত করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন, সে জাতির আধুনিক শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের সে তত্ত্ব আবিষ্কারে তেমন আস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। দুইচারিজন প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ভিন্ন আর সকলেই ইহাতে উদাসীন। শুধু যে উদাসীন, তাহা নহে; স্বীকার করিতে লজ্জা হয়, অনেকেই আবার ভারতের প্রাচীন সভ্যতার সমূহ বিদ্বেষী। বিদেশী যাহাকে সসম্ভ্রমে পূজার অর্ঘ্য দিল, স্বদেশী গভীর অনাদরের সহিত তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিল। ভারতের শত্রু আজ ভারতই।

আমি এসিয়াটিক্ সোসাইটির জার্‌ন্যাল্ উল্‌টাইতে গিয়া হারুণ আল্‌রসিদের সভায় কতকগুলি প্রতিভাশালী ভারতীয় পণ্ডিতের আখ্যান বর্ণিত দেখিলাম। ইহা মওয়াফিকুদ্দিন আবু লব্বাস আহমদ ইব্‌ন্ আবু উসাইবিয়াহ মহাশয়ের লিখিত। রেভারেণ্ড কিওরটন্-সাহেবের দ্বারা ইহা অনুবাদিত এবং সংস্কৃতজ্ঞ বিচক্ষণ পণ্ডিত উইল্‌সন্-সাহেব মহাশয়ের দ্বারা তাঁহার টিপ্পনী সহিত প্রকাশিত। আবু উসাইবিয়াহ সাহেব ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাঠক দেখিতে পাইবেন, এমন দিনও ছিল, যখন এই গ্রীষ্মাতিশয্যপ্রপীড়িত পাশ্চাত্যসভ্যতালোকবিহীন ভারতবর্ষও অলসতায় বা অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমগ্ন না থাকিয়া, সভ্যজগতের সুদূরপ্রান্ত পর্য্যন্ত দর্শন এবং বিজ্ঞানের স্নিগ্ধজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া মানবজাতিকে ধন্য করিয়াছিল। ভারতের সে সভ্যতা স্থির, গম্ভীর, শান্ত, সমাহিত। প্রতীচ্য সভ্যতার প্রচণ্ড প্রখরতা বা আসুরিক ভেরীনিনাদ না থাকিলেও দেশে-বিদেশে এই স্তব্ধ সভ্যতার বিশ্বব্যাপিনী শক্তির ও পরিচয়ের অসদ্ভাব নাই।

এখানে বলিয়া রাখা ভাল, এই পুস্তকে ভারতবর্ষীয় নামগুলি এমন বিকৃতমূর্ত্তিতে প্রকাশিত যে, তাহা দেখিয়া অনেকসময় সেগুলিকে ভারতবর্ষীয় বলিয়া বোধ হয় না। বিজাতীয় ভাষায় নামের এরূপ বিকৃতি নূতন নহে। অতএব উদাহরণ দিয়া কালক্ষেপ করা বৃথা। এই সকল নামের অনেকগুলিই ভারতবর্ষের ইতিহাসে অপরিচিত। যাঁহাদের নাম, বহুদিন বিদেশে বাস করিতে করিতে স্বদেশে তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ অজানিত হইয়া পড়িবে, ইহা বিচিত্র নয়।

অনুবাদ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ভারতবাসী "কানকা"।

ভারতবর্ষীয় জ্ঞানীদিগের মধ্যে ইনি একজন মহা-জ্ঞানী এবং একজন খুব উচ্চশ্রেণীর পণ্ডিত। চিকিৎসাশাস্ত্রের অনেক বিষয় ইঁহার অনুসন্ধানে স্থিরীকৃত হইয়াছে। ঔষধাদির গুণ এবং অমিশ্র ও মিশ্র পদার্থের সম্বন্ধে তথ্যগুলি ইনি সম্যক্ অবগত ছিলেন। জ্যোতির্ব্বিদ্যায় পৃথিবীতে ইঁহার দ্বিতীয় ছিল না। আবু মশহর জাফর বলেন, ইনিই জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রথম প্রবর্ত্তক।

ভারতবাসী সন্‌জাহল।

ইনিও ভারতবর্ষের একজন প্রধান পণ্ডিত। ইঁহারও চিকিৎসা এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। গ্রহবিজ্ঞান-(Astrology)-সম্বন্ধে ইনি বিশেষ চর্চ্চা করিয়াছিলেন। সন্‌জাহলের পর ভারতবর্ষে আরও অনেকানেক প্রতিভাশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, যথা :—

বাখর, দাহর, জাভর, রাহাহ, আনকর, আন্দি, শাকা, জঙ্গল, জারী। চিকিৎসা এবং অন্যান্য শাস্ত্র সম্বন্ধে ইঁহাদের লিখিত অনেকানেক পুস্তক আছে। নক্ষত্রমণ্ডলীর গতিবিধিবিষয়ে বহু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এইগুলিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয়েরা এখন ইঁহাদেরই অনুকরণ করেন এবং ইঁহাদেরই মতানুসারে শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইঁহাদের

প্রণীত পুস্তকাবলীর অনেকগুলিই আরবীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। বাজী-সাহেবের পুস্তকেও আমি ইঁহাদের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত অনেক বিষয় পাইয়াছি। উদাহরণস্বরূপে ভারতবাসী সারক-পণ্ডিতের পুস্তকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই পুস্তকের প্রথমত পারস্যভাষায় অনুবাদ হয়। তাহার পর আবদালা বিন্ আলি ইহাকে পারস্য হইতে আরব্য ভাষায় অনুবাদ করেন। শাস্ত্রাদের পুস্তক হইতেও রোগের লক্ষণ, চিকিৎসার নিয়ম এবং ঔষধাদির ব্যবস্থা সংগৃহীত হইয়াছে দেখিতে পাই। ইহা দশ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। হারুণ আল্‌রসিদের প্রধান মন্ত্রী য়াহিয়া বিন্ খালিদ মহাশয়ের আদেশ অনুসারে ইহার অনুবাদ হয়।

ভারতবর্ষীয় শনকা।

ইনি চিকিৎসাশাস্ত্রে একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত। নানা প্রণালীতে চিকিৎসা করিবার উপায় ইনি আবিষ্কার করিয়াছেন। দর্শন, বিজ্ঞান এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে ইঁহার প্রগাঢ় অধিকার। ইনি একজন বড় বাগ্মীও বটেন। ইঁহার বাগ্মিতার কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কোন রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া ইনি বলিতেছেন—

"হে রাজন্, বৃথা সময়ের অপব্যয় করিও না। কালের করাল হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া চিরদুঃখে নিমগ্ন হইও না। সকল মন্দ কর্ম্মেরই শাস্তি অনিবার্য্য। অতএব সর্ব্বদা সাবধানে থাকিও। অদৃষ্ট ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে,—সকলপ্রকার অবস্থার জন্যই প্রস্তুত থাক। সময় পরিবর্ত্তনশীল, সর্ব্বদা সজাগ থাকিও। পৃথিবীতে কষ্ট অনিবার্য্য, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও। যশ, মান, সম্ভ্রম অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী,—নিজের দৌভাগ্যের উপর নির্ভর করিতে গিয়া আত্মবিস্মৃত হইও না। ইহা স্মরণ রাখিও, যে ব্যক্তি পৃথিবীর ক্ষণিক প্রলোভনের নিকট হইতে নিজেকে বাঁচাইতে পারে না, সে অনন্তের মধ্যে অনন্ত প্রলোভনের সম্মুখে কেমন করিয়া স্থির থাকিবে। যিনি সৎকর্ম্মের নিমিত্ত আপনার পাশব প্রবৃত্তিসকল সর্ব্বদাই দমনে রাখেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী এবং মহান্। যে রাজা নিজের রিপু জয় করিতে না পারিল, সে আপনার দুর্দ্ধর্ষ-বিশৃঙ্খল সৈন্যদলকে কেমন করিয়া বশে রাখিতে সক্ষম হইবে। সুতরাং স্বার্থপর, প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় রত মূর্খ রাজার রাজ্যে অত্যাচার, অনাচার, বিদ্রোহ এবং অশান্তি ভিন্ন অন্য কি আশা করা যাইতে পারে?"

জাওদার।

জাওদার ভারতবর্ষীয় জ্ঞানী এবং পণ্ডিতদিগের মধ্যে একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রেই বিশেষরূপে চর্চ্চা করিতেন। তাঁহার সময়ে তাঁহার ন্যায় খ্যাতিসম্পন্ন লোক অতি অল্পই ছিলেন। তাঁহার গ্রহগণনাসম্বন্ধে একখানি পুস্তকও আছে। আরবীভাষায় উহার অনুবাদ হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় মানকা।

ইনি চিকিৎসাশাস্ত্রে একজন অসামান্য পণ্ডিত। ইঁহার চিকিৎসাবিদ্যা যেরূপ অসাধারণ, ঔষধাদিপ্রয়োগে যেরূপ বিচক্ষণতা, চিকিৎসাপ্রণালীও তেমনি সুন্দর।

ইনি ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতবর্গের মধ্যে মহা-পণ্ডিত। ইনি পারস্যভাষাও বেশ জানিতেন। ভারতবর্ষীয় শনকের বিষ-বিষয়ক পুস্তকগুলিকে পারস্যভাষায় ইনিই অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইনি হারুণ আল্‌রসিদের সময়কার লোক এবং ভারতবর্ষ হইতে তাঁহারই চিকিৎসক হইয়া ইরাকে আসিয়াছিলেন। আমি কোন কোন পুস্তকে পড়িয়াছি যে, ইনি ইষাক্ বিন্ সুলেমান মহাশয়ের দ্বারা ভারতবর্ষীয় অনেক পুস্তক আরবী এবং পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। "খালিফ এবং বারমিসিদিদিগের ইতিহাস" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আল্‌রসিদ একসময়ে অত্যন্ত পীড়িত হন এবং নানাপ্রকার চিকিৎসাতেও তিনি কোন ফল পান নাই। অবশেষে আবু আমরু আলজামি তাঁহাকে একদিবস বলিলেন, ভারতবর্ষে মানকা নামে একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক আছেন। তিনি একজন ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি এবং বিচক্ষণ পণ্ডিত। যদি বাদশাহ তাঁহার নিকট হইতে ব্যবস্থা আনাইয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে ঈশ্বরের কৃপায় নিশ্চয়ই তিনি আরোগ্যলাভ করিবেন। আল্‌রসিদ তাহা শুনিয়া নানারূপ উপঢৌকন দিয়া মানকাকে বোগ্‌দাদে আনিবার নিমিত্ত লোক পাঠাইয়া দিলেন। মানকা আসিয়া আল্‌রসিদকে অচিরেই রোগমুক্ত করিলেন। আল্‌রসিদও প্রীত হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট ধনরত্ন দান করিলেন এবং তাঁহার জীবনকালব্যাপী একটি বৃত্তিও নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। একদিবস মানকা ভ্রমণে বাহির হইয়া দেখিলেন যে, একটি লোক অঙ্গলে নানাপ্রকার ঔষধাদি লইয়া তাহাদের গুণবর্ণনায় ব্যাপৃত রহিয়াছে। পৃথিবীর যাবতীয় রোগের অমোঘ মহৌষধ তাহার নিকট প্রাপ্তব্য, উচ্চৈঃস্বরে সে এইরূপ ঘোষণা করিতেছে। মানকা তাঁহার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ব্যক্তি কি বলিতেছে?" সঙ্গী সে বিষয় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলে, তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আরবদিগের রাজা নিশ্চয়ই একজন ঘোর মূর্খ। কেন না, এ ব্যক্তি যাহা বলিতেছে, তাহা যদি সত্যই হয়, তাহা হইলে প্রলোভন দেখাইয়া পুত্রপরিবার হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিবার প্রয়াস কেন তিনি করিয়াছিলেন। অথবা যদি এ মিথ্যাবাদী হয়, তবে ইহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা না দেন কেন। কারণ এই একজনের প্রাণদণ্ডে সহস্র সহস্র লোক অকালে কালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

ভারতবর্ষীয় বালার পুত্র শালেহ।

বালার পুত্র শালেহও একজন বিচক্ষণ ভারতবর্ষীয় চিকিৎসক। ইঁহার চিকিৎসা-প্রণালী অতি সুন্দর এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে ইঁহার অপরিসীম উৎসাহ। ইনিও হারুণ আল্‌রসিদের সময় ভারতবর্ষ হইতে ইরাকে আসিয়াছিলেন। ইব্‌ন্ উলদায়াহ নামে সবিশেষ পরিচিত আবুল হাসান মুসুফ মহাশয় নিম্নলিখিত ঘটনাটি সালেম উলবর্ষের প্রিয় কর্ম্মচারী আমেদ বিন্ রসিদের নিকট শুনিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমেদ তাঁহার প্রভুর নিকট হইতে ব্যাপারটি অবগত হইয়াছিলেন।

আবু শালেমা (আমেদের প্রভু) বলিতে লাগিলেন—"তৎপরে বাদশাহ জাব্রিলকে (একজন প্রসিদ্ধ বোগ্‌দাদী চিকিৎসক—ইঁহার ল্যাটিন্‌ভাষায় লিখিত এক জীবনী আছে) ডাকিয়া আনিবার নিমিত্ত আমাকে আদেশ করিলেন। কারণ তাঁহার উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত বাদশাহ আহার আরম্ভ করিতে পারিতেছিলেন না। আমি জাব্রিলকে তাঁহার গম্য-অগম্য নানা স্থানে অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া বাদশাহকে জানাইলাম। বাদশাহ অত্যন্ত কুপিত হইয়া তাঁহার উদ্দেশে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। এমন-সময় জাব্রিল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বাদশাহকে কুপিত হইয়া তাঁহার উপর গালিবর্ষণ করিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "যদি বাদশাহ গালি ছাড়িয়া এ সময়ে তাঁহার ভ্রাতা ইব্রাহিম বিন্ শালেহের নিমিত্ত অশ্রুবর্ষণ করিতেন, তাহা হইলে অধিক সময়োচিত কর্ম্ম করা হইত।" ইহাতে বাদশাহ ইব্রাহিমসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায়, জাব্রিল যে তাঁহাকে মুমূর্ষু অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহা বাদশাহকে জ্ঞাপন করিলেন। আর ইহাও স্পষ্টাক্ষরে তিনি জানাইলেন যে, রাত্রিশেষে তাঁহার মৃত্যুও অনিবার্য্য। আল্‌রসিদ একেবারে দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং আহার্য্যসামগ্রী সমস্ত সেখান হইতে তৎক্ষণাৎ সরাইয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার দুঃখ দেখিয়া সকলেই দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তখন জাফর বিন্ য়াহিয়া বলিলেন, "হে স্বধর্ম্মপ্রতিপালক! জাব্রিলের চিকিৎসা গ্রীসীয় মতের অনুযায়ী। কিন্তু বাদশাহ যদি বালার পুত্র ভারতবর্ষীয় শালেহকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয়-চিকিৎসা-প্রণালীমতে ইহার কোন প্রতিকার হওয়া সম্ভব কি না, তাহা জানা যাইতে পারে। বাদশাহ তৎক্ষণাৎ শালেহকে লইয়া রোগীকে দেখাইয়া আনিতে জাফরকেই আদেশ করিলেন। শালেহ তদনুসারে রোগীর নিকট নীত হইলেন। তখন জাফর তাঁহাকে রোগীর অবস্থাসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, শালেহ বলিলেন যে, তিনি বাদশাহ ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট তাঁহার অভিমত জ্ঞাপন করিবেন না। জাফর বিস্তর চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু শালেহ কিছুতেই কিছু বলিতে স্বীকৃত হইলেন না। জাফর অগত্যা বাদশাহকে সংবাদ দিলেন। বাদশাহ তখনই শালেহকে তাঁহার সমীপে লইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। শালেহ তদনুসারে বাদশাহের নিকট উপনীত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"হে স্বধর্ম্মপ্রতিপালক! আপনার প্রতাপ অপরিসীম এবং ক্ষমতা অপ্রতিহত। আপনার আজ্ঞা বা বিচারের অবমাননা করে, এমন কেহ নাই। আমি আপনার এবং সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সমক্ষে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, অদ্য রাত্রিতে এই রোগী যদি উপস্থিত রোগে কালগ্রাসে পতিত হন, তাহা হইলে আমার সমুদায় ক্রীতদাসদিগকে আমি মুক্ত করিয়া দিব, আমার গোধনাদি সমস্তই ধার্ম্মিকদিগকে দান করিব, আমার ধনসম্পত্তি যাহা-কিছু অকাতরে বিলাইয়া দিব, আমার সমগ্র ভার্য্যাগণকে এককালে পরিত্যাগ করিব, এমন কি, আমার তিনটি যুবতী স্ত্রীর

সহিতও সম্বন্ধ ছেদন করিয়া ফেলিব।" আল্‌রসিদ কহিলেন, "শালেহ, তুমি নির্ব্বোধ,—তুমি কেমন করিয়া ভবিষ্যতের বিষয় এত দৃঢ়তার সহিত বলিতে সাহস কর।" শালেহ উত্তর করিলেন, "হে স্বধর্ম্মপ্রতিপালক! আমি না বুঝিয়া বলি নাই। অজ্ঞতার অন্ধকারই বাস্তবিক অন্ধকার। যদি ভবিষ্য ঘটনাসম্বন্ধে সুস্পষ্ট সাঙ্কেতিক নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চিতভাবে অভিমত ব্যক্ত করিবার বাধা কি?" তখন বাদশাহ প্রকৃতিস্থ হইয়া আহারাদি করিলেন এবং তাহার পর মদ্যপানেও মন দিলেন।

ক্রমে রাত্রিশেষে দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, ইব্রাহিমের মৃত্যু হইয়াছে। তখন বাদশাহ নিরতিশয় রোষান্বিত হইয়া ভারতবর্ষ ও তাহার চিকিৎসাবিদ্যার সম্বন্ধে নিতান্ত বিরক্তিব্যঞ্জক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন এবং শালেহের পরামর্শ লইতে বলিয়াছিলেন বলিয়া জাফরের উপরেও যথেষ্ট ক্রোধপ্রকাশ করিলেন। পরে এক-গ্লাস নাবিধ্ আনাইয়া লবণ ও জল সংযোগে তাহা পান করিয়া, যাহা কিছু আহার করিয়াছিলেন, সমস্তই বমন করিয়া ফেলিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে তিনি ইব্রাহিমের গৃহে গিয়া তাঁহার মৃতদেহের পার্শ্বে ভূতলে উপবেশন করিয়া হাহুতাশ করিতেছেন, এমনসময় শালেহ আসিয়া আল্‌রসিদের নিকট উপস্থিত হইলেন। কেহ তাঁহাকে সম্মান বা অভ্যর্থনা করিল না। তখন শালেহ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"হে স্বধর্ম্মপ্রতিপালক! আপনি কি নিমিত্ত আমার বিবাহিতা ভার্য্যাদের সহিত আমার বিচ্ছেদ ঘটাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। হে পরমেশ্বর, আমি কি অপরাধে এরূপে দণ্ডিত হইতে বসিয়াছি। আমার পত্নীগণকে অন্যে বিবাহ করিবে, সেটা ত ন্যায়সঙ্গত নহে। আর কেনই বা আপনি আপনার ভ্রাতাকে জীবিত অবস্থায় সমাধিস্থ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। উনি মরেন নাই। আমাকে একবার নিকটে গিয়া উঁহাকে দেখিতে দিন।"

আল্‌রসিদ শালেহকে এইরূপ বলিতে দেখিয়া, মৃতদেহের নিকট তাঁহাকে যাইতে অনুমতি করিলেন। তখন আমরা বাহির হইতে যেন চপেটাঘাতের শব্দ পাইলাম এবং পরক্ষণেই শালেহ "পরমেশ্বর তুমি ধন্য—পরমেশ্বর তুমি ধন্য" বলিতে বলিতে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিয়া আল্‌রসিদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে স্বধর্ম্মপ্রতিপালক! অদ্য আমি আপনাকে অত্যাশ্চর্য্য এক ব্যাপার দেখাইব, আমার সহিত আসুন।" তখন আল্‌রসিদ, মসরুর, সেলিম এবং আমি তাঁহার সহিত কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। শালেহ একটি সূচিকা লইয়া মৃত ইব্রাহিমের অঙ্গুলির মধ্যে বিদ্ধ করিয়া দিলেন। ইব্রাহিম হাত টানিয়া লইলেন। তখন শালেহ বলিলেন, "হে স্বধর্ম্মপ্রতিপালক! আপনি কখন মৃত ব্যক্তিকে যন্ত্রণা অনুভব করিতে দেখিয়াছেন কি? আপনি কি ইহাকে এখনও মৃত বলিতে চাহেন?" আল্‌রসিদ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। তখন শালেহ ইব্রাহিমের অন্তিমকালোচিত সাজসজ্জা সরাইয়া ফেলিতে

অনুরোধ করিলেন। কেন না, তিনি বলিলেন যে, ইব্রাহিম যদি সংজ্ঞালাভ করিয়া এই সকল দেখিতে পান, তাহা হইলে তিনি বাস্তবিকই মারা পড়িবেন এবং তাহা হইলে তাঁহাকে রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইবে। তৎপরে শালেহের ঔষধ-প্রয়োগ করিবার স্বল্পক্ষণেরই মধ্যে রোগী উঠিয়া বসিলেন। ক্রমে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া তিনি অনেকদিন জীবিত ছিলেন। অবশেষে বহুকাল পরে তিনি ঈজিপ্ট ও প্যালেষ্টাইনের শাসনকর্ত্তৃরূপে প্রেরিত হন। এই ঈজিপ্টেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

অধ্যাপক।

শেষ দেখা।

অন্তিম দিনেতে যবে
আত্মীয়স্বজন সবে
শেষ সজ্জা করাবেন মোর,
দেখিবেন রহিয়াছে
নীরব বুকের কাছে
তব কেশে গাঁথা এক ডোর!
সে দিন হে প্রিয়তম
তুমি এসো গৃহে মম,
শেষ দেখা দেখে যেয়ো তব,
সেই দিন শুভক্ষণে
মরণের আগমনে
পুরাতন হবে অভিনব!

সার সত্যের আলোচনা।

আত্মজ্ঞান।

এক ব্যক্তিকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"দেবদত্তের সহিত আপনার পরিচয় আছে?" তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন—"দেবদত্ত আমারই নাম।" অর্থাৎ-কিনা দেবদত্তের সহিত তাঁহার খুবই পরিচয় আছে, যেহেতু তিনিই দেবদত্ত এবং দেবদত্তই তিনি। ইহাতে প্রকারান্তরে বলা হইল এই যে, প্রতিজনেরই আত্মা আপনার নিকটে সুপরিচিত; কেন না, চলিত ভাষায় যাহার নাম

আপনি,শাস্ত্রীয় ভাষায় তাহারই নাম আত্মা। দুইদিন পরে সেই দেবদত্তের বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখি যে, তিনি চৌকি হেলান্ দিয়া বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া পুস্তকখানি বন্ধ করিলেন। তাহার পরে পুস্তকখানির নামাক্ষরের প্রতি আমার অনুসন্ধান-দৃষ্টি নিপতিত হইতে দেখিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, "দেখিতেছেন কি—এখানি মহাজ্ঞানী সক্রেটিসের জীবন-কাহিনী। ডেল্‌ফস-উপদ্বীপের গুহার অভ্যন্তর হইতে তাঁহার প্রতি এইরূপ দৈববাণী হইয়াছিল যে, আপনাকে জানো। এটা কি কম আশ্চর্য্য যে,অনেকে অনেক বিষয় জানে, কিন্তু আপনাকে কেহই জানে না!" কিন্তু দুইদিন পূর্ব্বে ইনি যখন জোরের সহিত বলিয়াছিলেন যে, "দেবদত্ত আমারই নাম", তখন তাহাতে এইরূপ বুঝাইয়াছিল যে, সকলেই আপনার নিকটে আপনি সুপরিচিত। তবেই হইতেছে যে, দেবদত্তের দুইবারের কথা দুইরূপ। তাঁহার প্রথমবারের কথার ভাব এই যে, আত্মা সকলেরই নিকটে সুপরিচিত। তাঁহার দ্বিতীয়বারের কথার ভাব এই যে, আত্মা অনেকেরই নিকটে অপরিচিত। আমার মন বলিতেছে যে, "দুই কথাই সত্য।" কিন্তু মনের সে কথায় বুদ্ধি সায় দিতেছে না। বুদ্ধি বলিতেছে যে, "একটি সত্য হইলে অপরটি অসত্য হইয়া যায়।" আমি মধ্যস্থ হইয়া দোঁহার বিবাদ মিটাইয়া দিলাম। বামে ফিরিয়া মনকে বলিলাম, "তুমি যে বলিতেছ 'দুই কথাই সত্য', এটা ঠিক্; কিন্তু তোমার কথা আরো ঠিক্ হইত, যদি বলিতে যে, 'দুই হিসাবে দুই কথা সত্য'।" ডাহিনে ফিরিয়া বুদ্ধিকে বলিলাম, "তুমি যে বলিতেছ 'দুই কথাই সত্য হইতে পারে না', এ কথা খুবই সত্য; কিন্তু তোমার কথা আরো সত্য হইত, যদি বলিতে যে, 'একই হিসাবে দুই কথা সত্য হইতে পারে না'। তোমাদের দুই জনের কথার মধ্য হইতে দুই ভাবের দুই সত্য টানিয়া বাহির করিয়া, সেই দুই সত্য জোড়া দিয়া মোট সত্য আমি একটি পাইতেছি এই যে, আত্মা এক হিসাবে সকলেরই নিকটে সুপরিচিত, আর এক হিসাবে অনেকেরই নিকটে অপরিচিত।" মনোবুদ্ধির বিবাদ ভালোয়-ভালোয় একপ্রকার মিটিয়া গেল—এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কি হিসাবেই বা আত্মা সকলেরই নিকটে সুপরিচিত—কি হিসাবেই বা আত্মা অনেকেরই নিকটে অপরিচিত।

প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, "এটা আমি জানিতেছি যে, আমি আছি, কিন্তু আমি যে কিরূপ, তাহা আমার নিকটে অপ্রকাশ"—এ'র নাম যদি হয় আত্মজ্ঞান, তবে সেরকমের আত্মজ্ঞান সকলেরই আছে।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, "এটা আমি বেশ জানিতেছি যে, আমিই দেখিতেছি, আমিই শুনিতেছি, আমিই ভাবিতেছি", ইত্যাদি। দৃশ্য দেখিবার সময় আমি আপনার নিকটে দ্রষ্টারূপে প্রকাশ পাই—গান শুনিবার সময় আমি আপনার নিকটে শ্রোতারূপে প্রকাশ পাই—মনোমধ্যে কোনো বিষয়ের আলোচনা করিবার সময় আমি আপনার নিকটে মন্তারূপে প্রকাশ পাই—কোনো বিষয়ের সত্যাসত্য অবধারণ করিবার সময় আমি

আপনার নিকটে বোদ্ধারূপে প্রকাশ পাই—প্রকাশ পাই এই পর্য্যন্ত; কিন্তু সত্যসত্যই আমি যে কিরূপ—আমার গাত্র হইতে নাট্যশালার সমস্ত সাজগোজ খুলিয়া ফেলিলে তখন আমি যে কিরূপ, তাহা আমার নিকটে অপ্রকাশ। এই পর্য্যন্তই কেবল আমি বলিতে পারি যে, "আমি এই-এই-সময়ে এই-এই-রূপে আপনার নিকটে প্রকাশ পাই;" তা বই, কোনো সময়েই আমি এরূপ কথা বলিতে পারি না যে, "এখন আমি আপনার নিকটে যেরূপে প্রকাশ পাইতেছি—বাস্তবিকই আমি সেইরূপ;"—এ'র নাম যদি আত্মজ্ঞান হয়—তবে এ-রকমের আত্মজ্ঞানও অনেকেরই আছে।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, কোনো দানপ্রার্থীর হস্তে একটি স্বর্ণমুদ্রা বিন্যস্ত হইলে সে বস্তুটি যেমন তাহার বুদ্ধিতে (শুধু যে কেবল প্রকাশ পায়, তাহা নহে, পরন্তু) বাস্তবিক-সত্য-রূপে প্রকাশ পায়—আত্মা সকলের বুদ্ধিতে সেই-রকম বাস্তবিক-সত্য-রূপে — জাজ্বল্যমান-ধ্রুব-সত্য-রূপে — প্রকাশ পা'ন কি না, সেইটিই হ'চ্চে জিজ্ঞাস্য।

একটি কথা এই যে, আমি যদি বর্ত্তমান থাকি-ও, তথাপি আপনার নিকটে প্রকাশ না পাইলে আত্মজ্ঞান হয় না; আর একটি কথা এই যে, আমি যা-তা-রূপে আপনার নিকটে প্রকাশ পাইলেও আত্মজ্ঞান হয় না। তৃতীয় কথা এই যে, আমি বাস্তবিক যাহা এবং আপনার নিকটে প্রকাশ পাইতেছি যেরূপ, এই দুয়ের মধ্যে যদি ব্যবধান বা প্রভেদ না থাকে, আমি বাস্তবিক যাহা—সেইরূপেই যদি আমি আপনার নিকটে প্রকাশ পাই—তবেই তাহাকে বলা যাইতে পারে আত্মজ্ঞান। পূর্ব্বোক্ত দুইরূপ আত্মজ্ঞান অনেকেরই আছে—শেষোক্তপ্রকার আত্মজ্ঞানই মনুষ্যমধ্যে সুদুর্লভ।

যিনি বলেন যে, "সুষুপ্তিকালেও 'আমি আছি, কিন্তু প্রকাশ পাইতেছি না' এই ভাবে আপনার নিকটে আপনি প্রকাশ পাই, আর প্রকাশ যখন পাই তখন সেই সুষুপ্তকালের প্রকাশকেই বা আত্মজ্ঞান না বলি কেন," তিনি মুখে তাহা বলেন বটে, কিন্তু মনে মনে বিলক্ষণই জানেন যে, সেরূপে প্রকাশ পাওয়া প্রকাশ না পাওয়ারই নামান্তর; এইজন্য তাঁহার সহিত বৃথা তর্কে কালাতিপাত না করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়।

যিনি বলেন যে, "স্বপ্নকালে আমি যখন রাজা হইয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করি, তখন যেমন আমি আপনার নিকটে রাজারূপে প্রকাশ পাই—তেমনি তুমি যাঁহাকে বলিতেছ আত্মজ্ঞানী, তিনি আপনার নিকটে আপনি বাস্তবিক-সত্য-রূপে প্রকাশ পাইতে পারেন—এ কথা আমি অস্বীকার করিতেছি না, কিন্তু তিনি আপনার নিকটে আপনি যেরূপ প্রকাশ পাইতেছেন—সত্যসত্যই যে তিনি সেইরূপ, তাহার প্রমাণ কি?" তাঁহার প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, স্বপ্নের প্রাতিভাসিক রাজা এবং জাগ্রৎকালের বাস্তবিক রাজা, এ দুয়ের মধ্যে যে, প্রভেদ আছে, ইহা তিনি বিলক্ষণই জানেন, কিন্তু সে প্রভেদ যে কিরূপ প্রভেদ এবং কতটা প্রভেদ, তাহা বোধ করি তিনি ভাল

করিয়া প্রণিধান করিয়া দেখেন নাই। এইটি তাঁহার দেখা উচিত যে, আরব্য উপন্যাসের আবু হোসেন্‌কে যখন দশচক্রে ফেলিয়া রাজা বানানো হইয়াছিল, তখন আবু হোসেনের মনোমধ্যে ক্রমাগতই এইরূপ একটা প্রশ্ন আন্দোলিত হইতেছিল যে, "কালিকে'র সেই দীন-হীন ক্ষুদ্র আমি হঠাৎ আজিকে প্রত্যূষে উঠিয়াই রাজা হইলাম কিরূপে? সত্যই কি আমি রাজা—না স্বপ্ন দেখিতেছি!" পক্ষান্তরে, স্বপ্নের রাজার মনোমধ্যে ভূলক্রমেও একটিবার এরূপ প্রশ্ন উত্থিত হয় না যে—"কাল্ যে চাসা ছিলাম! আজ রাজা হইলাম কিরূপে? সত্যই কি আমি রাজা—না স্বপ্ন দেখিতেছি!" ফলে—"বাস্তবিক বা অবাস্তবিক" এ কথাটিই স্বপ্নাবস্থার কথা নহে। জাগরিত অবস্থাতেই আমাদের নিকটে বস্তুসকলের বাস্তবিক সত্তা প্রকাশ পায়, আর, সেই সঙ্গে প্রাতিভাসিক সত্তা যাহা প্রকাশ পায়, তাহা বাস্তবিক সত্তা'র প্রতিযোগেই প্রকাশ পায়। প্রকৃত কথা এই যে, "বাস্তবিক বা অবাস্তবিক" এই যে একটি কথা অভিধানে আছে—এ কথা জাগরিত অবস্থার খাস্ নিজাধিকারের কথা—উহা স্বপ্নের অধিকারাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে চাহেও না—প্রবেশ করিতে পারেও না। অতএব প্রকৃত আত্মজ্ঞানী আত্মাকে যে-ভাবের বাস্তবিক-সত্য-রূপে—ধ্রুব-সত্য-রূপে—উপলব্ধি করেন, তাহার সহিত স্বপ্নের রাজ্যভোগের উপমা দেওয়া কেবল একটা কথার-কথা বই আর কিছুই নহে।

আত্মজ্ঞানের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার সময়, আত্মজ্ঞানের কাঠিন্য কোন্‌খানটিতে, সেইটি সর্ব্বপ্রথমে বুঝিয়া দেখা আবশ্যক।

জ্ঞানের কার্য্যই হ'চ্চে অব্যক্তকে ব্যক্ত করা। আত্মার ভিতরে কতপ্রকার অব্যক্ত-শক্তি যে অতলস্পর্শ গভীরে নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? সেই অব্যক্ত-শক্তির কতক-কতক অংশ যখন আমাদের ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া, মনঃক্রিয়া, প্রাণ-ক্রিয়া এবং বুদ্ধি-ক্রিয়াতে ব্যক্ত হয়, তখনই সেই সেই ক্রিয়া-দ্বারা বিশেষিত হইয়া আত্মা আপনার নিকটে বিশেষ বিশেষ রূপে প্রকাশ পা'ন—দ্রষ্টা-রূপে, শ্রোতারূপে, মন্তারূপে, বোদ্ধারূপে প্রকাশ পা'ন। প্রথমত, আত্মার যখন যে-শক্তি বর্ত্তমানে স্ফূর্ত্তি পায়, তাহাই তখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনুভূত হয়। দ্বিতীয়ত, অতীত কালে যে-শক্তি স্বকার্য্য সাধন করিয়া এক্ষণে বিশ্রাম করিতেছে—সে শক্তিরও স্ফূর্ত্তি স্মরণে জাগ্রত হইয়া অনুভূত শক্তি-স্ফূর্ত্তির সহিত মিলিয়া যায়। উল্কাপিণ্ড আকাশ হইতে দ্রুতবেগে নিপতিত হইবার সময় তাহার নিজের পিণ্ডাকার পরিত্যাগ করিয়া আগ্নেয়রেখাকারে প্রকাশ পায় কেন? তাহার কারণ শুদ্ধকেবল এই যে, দৃষ্ট আগ্নেয় পিণ্ডের পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্মৃত আগ্নেয়-পিণ্ড-পরম্পরা সারিবন্দী-ক্রমে আবির্ভূত হইয়া, সমস্ত মিলিয়া, দেখিতে দেখায় ঠিক্ যেন একটা প্রলম্বিত আগ্নেয়রেখা। দর্শন-শক্তির স্ফূর্ত্তি যেমন স্মরণ-শক্তিকে জাগাইয়া তোলে—দর্শন এবং স্মরণ দুয়ের সমবেত স্ফূর্ত্তি তেমনি ধী-শক্তিকে

জাগাইয়া তোলে। আমি যখন সম্মুখে একটা বটবৃক্ষ দেখিতেছি, তখন আমার স্মরণ হইতেছে যে, পূর্ব্বে অনেক স্থানে আমি ঐরূপ বৃক্ষ দেখিয়াছি; আর, ঐরূপ বৃক্ষ যেখানে যতগুলা চক্ষে দেখিয়াছি, সবগুলাকেই লোকে "বটবৃক্ষ" বলে, তাহাও কর্ণে শুনিয়াছি: এইরূপে দর্শন-স্ফূর্ত্তি হইতে স্মরণ-স্ফূর্ত্তি উদ্দীপিত হইল; এবং পরিশেষে উভয়-স্ফূর্ত্তির সমবেত উদ্দীপনায় আমার বুদ্ধি-স্ফূর্ত্তি হইল এইরূপ যে, দৃশ্যমান বৃক্ষটি বটবৃক্ষ। আমার এইরূপ দর্শন-শক্তি, অনুভব-শক্তি, স্মরণ-শক্তি, ধী-শক্তির বর্ত্তমান স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনার নিকটে দ্রষ্টা, অনুভব-কর্ত্তা, স্মরণ-কর্ত্তা, বোদ্ধা রূপে প্রকাশ পাই। "বর্ত্তমান স্ফূর্ত্তি" এখানে বলা হইতেছে কাহাকে—সেটা বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। বর্ত্তমান কালে আমি যে ঐ বিশেষ বটবৃক্ষটি দেখিতেছি—সেই বিশেষ দর্শন-ক্রিয়া এবং তাহার সঙ্গে "আমি পূর্ব্বে অমুক অমুক স্থানে ঐরূপ বটবৃক্ষ দেখিয়াছিলাম" এই বিশেষ স্মরণ-ক্রিয়া, এবং "এটা বটবৃক্ষ" এই বিশেষ বুদ্ধি-ক্রিয়া, যাহা বর্ত্তমান কালে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে—সেই সকল বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার স্ফূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়াই এখানে বলা হইতেছে—দর্শনাদি-শক্তির বর্ত্তমান স্ফূর্ত্তি। এখন যেন আমার দর্শনাদি-শক্তির বর্ত্তমান স্ফূর্ত্তি ঐ বিশেষ বটবৃক্ষটির দর্শনাদি-ক্রিয়াতেই আবদ্ধ; কিন্তু গতকল্য আমার দর্শনাদি-শক্তির বর্ত্তমান স্ফূর্ত্তি পশ্বাগারের সিংহ দর্শনে ব্যাপৃত ছিল। আজিকের এখনকার এই বর্ত্তমান স্ফূর্ত্তি আজ আমার নিকটে ব্যক্ত হইয়াছে—কাল আমার নিকটে অব্যক্ত ছিল; কালিকের বর্ত্তমান স্ফূর্ত্তি কাল আমার নিকটে ব্যক্ত ছিল, আজ আমার নিকটে অব্যক্ত রহিয়াছে। এইরূপ প্রত্যহ প্রতি-ক্ষণে আত্মার বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া-স্ফূর্ত্তি ব্যক্ত হইতেছে এবং সেই সঙ্গে অপরাপর ক্রিয়া-স্ফূর্ত্তি অব্যক্ত থাকিতেছে। যে-ক্রিয়া যখনই স্ফূর্ত্তিমতী হয়, সেই ক্রিয়া তখনই ব্যক্ত হয়; আর, যখন ব্যক্ত হয়, তখনই সেই-ক্রিয়া-সমন্বিত-রূপে আপনাকে উপলব্ধি করি। কিন্তু যাহা এখন অব্যক্ত আছে, পূর্ব্বে তাহা এক সময়ে ব্যক্ত হইয়াছিল, অথবা ভবিষ্যতে তাহা ব্যক্ত হইতে পারে। এইরূপ করিয়া ক্রমাগতই মুহুর্ম্মুহু ব্যক্তাব্যক্তের উদয়াস্ত হইতে থাকিলেও ব্যক্তাব্যক্তের মধ্যে বস্তুত কোনো প্রভেদ থাকিতে পারে না; কেন না, যাহা এক কালে ব্যক্ত হইতেছে, তাহাই আর-এক কালে অব্যক্ত থাকিতেছে; এবং যাহা এক কালে অব্যক্ত থাকিতেছে, তাহাই আর এক কালে ব্যক্ত হইতেছে। এইজন্য আত্মা যখন ব্যক্ত-ক্রিয়াস্ফূর্ত্তি-সমন্বিত-রূপে বর্ত্তমানে প্রকাশ পা'ন, তখন তাহাতেই প্রকারান্তরে দাঁড়ায় যে, আত্মা ব্যক্তাব্যক্ত-উভয়প্রকার-ক্রিয়া-স্ফূর্ত্তি-সমন্বিত—কেন না, ব্যক্ত এবং অব্যক্তের মধ্যে বস্তুত কোনো প্রভেদ নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আত্মা বাস্তবিক যাহা—সেইরূপে প্রকাশ পাওয়ার নামই আত্মজ্ঞান। আত্মা বাস্তবিক যাহা, সেই জায়গাটিতে আত্মা ব্যক্তাব্যক্ত-উভয়প্রকার স্ফূর্ত্তি-সমন্বিত; আর, আত্মা বিশেষ বিশেষ কালে বিশেষ বিশেষ যে-যে-রূপে আপনার নিকটে প্রকাশ পা'ন—সেই জায়গাটিতে

আত্মা ব্যক্তস্ফূর্ত্তি-সমন্বিত-রূপে প্রকাশ পা'ন। যে জায়গাটিতে আত্মা ব্যক্তস্ফূর্ত্তি-সমন্বিত, সেই জায়গাটিই আত্মার জ্ঞেয়-স্থান; যে জায়গাটিতে আত্মা অব্যক্ত-শক্তির আশ্রয়-ভূমি,অথবা যাহা একই কথা—যে জায়গাটিতে আত্মা ক্রিয়াস্ফূর্ত্তিসমূহের লয়স্থান বা সমাধি-স্থান, সেই জায়গাটিই আত্মার জ্ঞাতৃস্থান; আর, যে জায়গাটি ব্যক্তাব্যক্তের সন্ধিস্থান, অর্থাৎ যে জায়গাটিতে আত্মা ব্যক্তাব্যক্ত-উভয়প্রকার-শক্তিস্ফূর্ত্তি-সমন্বিত-রূপে প্রকাশ পা'ন—সেই জায়গাটিই আত্মার জ্ঞান-স্থান—আর সেই জায়গাটিতে আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হয়। আত্মজ্ঞানের কাঠিন্য কোন্‌খানটিতে, তাহা এখন বলিবামাত্রই বুঝিতে পারা যাইবে—যিনি জ্ঞাতা, তিনিই জ্ঞেয়—যিনি ব্যক্তাব্যক্ত-উভয়প্রকার-শক্তি-সমন্বিত, তিনিই ব্যক্তশক্তি-সমন্বিত—এটা বুঝিলে সহজ, না বুঝিলে কঠিন; এই-খানেই আত্মজ্ঞানের কাঠিন্য। পাঠকের প্রতি সবিনয় নিবেদন এই, বুঝিবার এবং বুঝাইবার সুবিধার জন্য—সময় এবং কাগজ বাঁচাইবার জন্য—আমি স্থানে স্থানে রূপক-চ্ছলে ভাবপ্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি; ইহা দেখিয়া তিনি যেন এরূপ মনে না করেন যে, তাহা রূপক ছাড়া আর কিছুই নহে। উপরে আমি বলিলাম, "এ জায়গায় আত্মা অমুক—ও জায়গায় আত্মা অমুক" ইত্যাদি। এখানে জায়গা-শব্দের অর্থ যে কি, তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। যদি এরূপ কেহ থাকেন—যিনি উপরি-উক্ত স্থলে জায়গা-শব্দে প্রকৃতপক্ষেই জায়গা বা স্থান বুঝিয়া বসিয়া আছেন—তবে তাঁহার প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধের গন্তব্য-পথে আর-কিছুদূর অগ্রসর হইলে তাঁহার ভ্রম ঘুচিয়া যাইবে;—আপাতত যাহা তিনি বোঝেন, তাহাই বুঝিয়া সন্তুষ্ট থাকুন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শুভক্ষণ।

আকাশে গহন মেঘে গভীর গর্জ্জন,
শ্রাবণের ধারাপাতে প্লাবিত ভুবন।
ও কি এতটুকু নামে সোহাগের ভরে
ডাকিলে আমারে তুমি! পূর্ণ নাম ধরে'
আজি ডাকিবার দিন; এ হেন সময়
সরম-সোহাগ-হাসি-কৌতুকের নয়!
আঁধার অম্বর, পৃথ্বী পথচিহ্নহীন,
এল চিরজীবনের পরিচয়দিন!

রাজতরঙ্গিণী।

কবি-কহ্লণ-বিরচিত "রাজতরঙ্গিণীর" * নাম এক্ষণে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। এই সুবিখ্যাত সংস্কৃতগ্রন্থ সুললিত-কবিতা-নিবদ্ধ বলিয়া, অনেকে ইহাকে কাব্যমাত্র মনে করিয়া যথাযোগ্য সমাদর প্রদর্শনে ইতস্তত করিতেন। ইহা যে ভারতীয় পুরাতত্ত্বোদ্ধারে সহায়তাসাধন করিতে সক্ষম, সে কথা সকলে স্বীকার করিতেন না। যে সকল অশুদ্ধ পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে এই গ্রন্থ প্রথমে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার ভ্রমপ্রমাদ অনেক স্থলে অর্থবোধের অসুবিধা উপস্থিত করিত। পুরাতন গ্রাম-নগর কোথায় ছিল, তাহা জানিতে না পারিয়া, অনেকে অনেক বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনাও কবিকাহিনী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেন। অধ্যাপক ষ্টীন্ এই সকল ভ্রমপ্রমাদ সংশোধিত করিয়া, ভৌগোলিক বিবরণ, মানচিত্র ও ইংরাজী অনুবাদ সহ রাজতরঙ্গিণীর এক অভিনব সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া, অনেক আবর্জ্জনা অপসারিত করিয়া দিয়াছেন। অধ্যাপক ষ্টীন্ তজ্জন্য ধন্যবাদের পাত্র।

সংস্কৃতসাহিত্যে গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয় প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। অনেক গ্রন্থে কিছু-মাত্র পরিচয় নাই; যে সকল গ্রন্থে কিছু-কিছু পরিচয় আছে, তাহাও এত যৎসামান্য যে, তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তার জীবনী-সঙ্কলনের আকাঙ্ক্ষা কিছুমাত্র পরিতৃপ্ত হয় না! তজ্জন্য গ্রন্থরচনার কালনির্দ্দেশেও নানা গোলযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। কোন্ গ্রন্থ কবে রচিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার সম্ভাবনা যতই নিরস্ত হয়, পণ্ডিতমণ্ডলীর তর্কবিতর্ক ততই বুদ্‌বুদের উপর বুদ্‌বুদ সৃষ্টি করিয়া পাণ্ডিত্যের আড়ম্বরে পাঠকসমাজকে বিস্ময়াপন্ন করে!

সৌভাগ্যক্রমে রাজতরঙ্গিণীর রচনাকাল-নির্ণয়ে মতপার্থক্য উপস্থিত হইবার আশঙ্কা নাই। কবিকহ্লণ গ্রন্থমধ্যে যে সকল কালোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে রাজতরঙ্গিণী ৪২২৪ লৌকিকাব্দে রচিত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা খৃষ্টীয় ১১৪৮ অব্দের সমসাময়িক;—ভারতবর্ষের বিচিত্র ইতিহাসের বিস্ময়াবহ সন্ধিস্থল! সে সন্ধিস্থলে হিন্দুসাম্রাজ্যের শেষ অঙ্কের অভিনয়ান্তে যবনিকা নিপতিত হইয়াছে। তৎকাল-বিরচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ যে নানা তথ্যাবিষ্কারে সহায়তাসাধন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তজ্জন্য কহ্লণের কাব্য বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া আবশ্যক।

এই বিপুল গ্রন্থ অষ্ট তরঙ্গে বিভক্ত। প্রথম তিন তরঙ্গ আদি, চতুর্থ তরঙ্গ মধ্য এবং শেষ তরঙ্গচতুষ্টয়কে শেষ বলিয়া কল্পনা করিলে, এই গ্রন্থে তিনটি বিভিন্ন যুগের ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। কবি

* Kalhana's Chronicles of the Kings of Kashmir,—By M. A. Stein.

কহ্লণের সময়ে আদিযুগের কিংবদন্তি-মাত্রই প্রচলিত ছিল, কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস বর্ত্তমান ছিল না। মধ্যযুগের কিছু-কিছু জনশ্রুতি ও লিখিত বিবরণ প্রচলিত ছিল; শেষ যুগের অনেক ঘটনা কবির জীবনকালেই সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং কবিতানিবদ্ধ হইলেও, রাজতরঙ্গিণীর কোন কোন অংশ সবিশেষ বিশ্বাসযোগ্য। কহ্লণ গ্রন্থরচনায় হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে পুরাতন শিলা ও তাম্রলিপি এবং অন্যান্য লিখিত বিবরণ সঙ্কলন ও সমালোচনা করিয়াছিলেন। তথ্যানুসন্ধানের অনুরাগেই তিনি এই শ্রমসাধ্য ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে রাজতরঙ্গিণীর গৌরব সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে।

বিচারপতির ন্যায় নিরত সত্যোদ্ঘাটনের চেষ্টাই যে ইতিহাসলেখকের প্রধান কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে কবি কহ্লণ নিজেই গ্রন্থমধ্যে মতপ্রকাশ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন :—

শ্লাঘ্যঃ স এব গুণবান্ রাগদ্বেষবহিষ্কৃতা।
ভূতার্থকথনে যস্য স্থেয়স্যেব সরস্বতী॥ ১।৭।

তিনি গ্রন্থসঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়া নীলমতপুরাণ ও একাদশখানি পূর্ব্বলিখিত ইতিহাস আলোচনা করিয়া পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনকালে যে সকল ফলকলিপি ও রাজশাসনলিপি বর্ত্তমান ছিল, তাহাও যথাযোগ্য আগ্রহে অধীত ও ব্যবহৃত হইয়াছিল। যথা :—

"দৃষ্টৈশ্চ পূর্ব্বভূভর্ত্তৃপ্রতিষ্ঠাবস্তুশাসনৈঃ।
প্রশস্তিপট্টৈঃ শাস্ত্রৈশ্চ শাস্তোঽশেষজনস্মৃতঃ॥"১।১৫।

পূর্ব্ব নরপালবর্গের যে সকল বিবরণ লোকসমাজে বা লিখিত ইতিহাসে পরিচিত ছিল, তাহার সত্যাসত্যবিচারের জন্য কবি কহ্লণ পুরাতন শাসনলিপির সহায়তা গ্রহণ করিয়া নানা প্রচলিত ভ্রম সংশোধন করিয়াছিলেন। অধ্যাপক ষ্টীন্ ভারতবর্ষীয় প্রাচীন লেখকের এই তথ্যাবিষ্কারের অনুরাগ লক্ষ্য করিয়া মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন।

কহ্লণ যে সকল জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা লোকব্যবহারের নানা তথ্য প্রকাশিত করিয়া, তাঁহার গ্রন্থকে সমধিক মূল্যবান্ করিয়াছে। এই সকল জনশ্রুতির ঐতিহাসিক মূল্য অধিক না হইলেও, লোকব্যবহারের ইতিহাস সঙ্কলনের পক্ষে ইহা বহুমূল্য। শেষাংশের অনেক ঘটনা কহ্লণের সমক্ষেই সংঘটিত হইয়াছিল; তাহার বিস্তৃত বর্ণনা ইতিহাসের পক্ষে সবিশেষ উপকারজনক।

ইতিহাস লিখিবার যে সকল যোগ্যতা থাকা আবশ্যক, কবি কহ্লণ তাহাতে দরিদ্র ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার শিক্ষাকে তৎকালোচিত উচ্চশিক্ষা বলিয়া স্বীকার করা যায়। তিনি গ্রন্থমধ্যে নানা শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সত্যানুসন্ধানের অনুরাগ প্রবল ছিল, অনুসন্ধান করিবার নানা সুবিধাও বর্ত্তমান ছিল। তিনি রাজমন্ত্রী চম্পকের পুত্র বলিয়া অন্য লোকের অজ্ঞাত অনেক তথ্য স্বচ্ছে সঙ্কলন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার সমনাময়িক ও অল্পকালপূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাবলী যথাযথরূপেই লিপিবদ্ধ হওয়া সম্ভব। পুরাতন কাহিনী জনশ্রুতিমূলক,—তজ্জন্য রাজতরঙ্গিণীর প্রথমাংশ সেরূপ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

কহ্লণের প্রকৃত নাম কি ছিল, তাহা নানা তর্কবিতর্কে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কহ্লণ-নাম সংস্কৃতমূলক হইলেও অপভ্রংশ। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, কল্যাণশব্দের অপভ্রংশে কহ্লণ-শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। রাজতরঙ্গিণীতে জনৈক ব্যক্তি কথন কল্যাণ কথন বা কহ্লণ নামে কথিত ও লিখিত থাকা দেখিতে পাওয়া যায়। কহ্লণের প্রকৃত নাম যে কবি কল্যাণ, তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কহ্লণ তাঁহার সমসাময়িক কবিগণের মধ্যে মঙ্খ-নামক কবির নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই কবি 'শ্রীকণ্ঠচরিত' নামক কাব্য রচনা করেন; তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার সমসাময়িক ত্রিশজন কবির নাম ও গ্রাগ্রাম বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে কবি কল্যাণ একজন। সান্ধিবিগ্রহিক অলকদত্ত এই কবি কল্যাণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইহাতে কহ্লণের প্রকৃত নামের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার কহ্লণ-নাম এত সুপরিচিত যে, এক্ষণে কল্যাণ-নাম আর সমাদরলাভে সক্ষম হইবে না।

কহ্লণ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু সে কথা কুত্রাপি স্পষ্টাক্ষরে লিখিত নাই। তিনি কাশ্মীরের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া লুপ্তকীর্ত্তি ও তীর্থস্থান স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস হয়। স্থানীয় বর্ণনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পারিপাট্যে তাহার যথেষ্ট আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সেকালে সৃষ্টিপ্রকরণ হইতে কথা আরম্ভ করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। পুরাণে তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কবি কহ্লণ ইতিহাসরচনাকালেও সে সনাতন পদ্ধতির সমাদর রক্ষা করিয়া, সৃষ্টির প্রথমে কাশ্মীরের উপত্যকা যে "সতীসরঃ"-নামক হ্রদ ছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহা কাশ্মীরের চিরন্তন জনশ্রুতি। আধুনিক ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই জনশ্রুতি একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারেন না।

প্রকৃতির লীলানিকেতন কাশ্মীরের পার্ব্বত্য জনপদ ভূস্বর্গ বলিয়া অদ্যাপি কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। পর্ব্বতের উপর পর্ব্বতমাল অসংখ্য শিখর বিস্তার করিয়া, সমগ্র কাশ্মীররাজ্যকে বিচিত্র চিত্রপটের ন্যায় প্রতিভাত করিয়াছে। তাহার উপত্যকা-অধিত্যকা ফল-পুষ্প-শস্যে, নদ-নদী-প্রস্রবণে, মন্দির, চৈত্য ও অট্টালিকায় সুশোভিত হইয়া, কাশ্মীরকে সুখসৌভাগ্য, জ্ঞান ও ধর্ম্মে সমুন্নত করিয়াছিল। কবে এই পার্ব্বত্যরাজ্যে প্রথমে সভ্যতা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠালাভ করে, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব; সে আদিযুগের জনশ্রুতি পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! মহাভারত যে কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের আখ্যায়িকা, তাহাতে কাশ্মীররাজকে কোন পক্ষে অস্ত্রধারণ করিতে না দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন,—তৎকালে কাশ্মীর কোন প্রবল নরপতির রাজ্য বলিয়া পরিচিত ছিল না। কবি কহ্লণ এই সিদ্ধান্তের প্রতিকূল প্রমাণ উপস্থিত করিবার জন্য লিখিয়াছেন, —তৎকালে কাশ্মীরের সিংহাসনে শিশু রাজা সমাসীন বলিয়া, তিনি কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে যোগদান করিতে পারেন নাই।

কোন্ সময়ে ভারতবিখ্যাত কুরুক্ষেত্রের মহাসমর সংঘটিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে নানা তর্কবিতর্ক প্রচলিত হইয়াছে। এই তর্ক-বিতর্ক নিতান্ত আধুনিক নহে; সেকালেও এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ বর্ত্তমান ছিল। সাধারণত এই মহাসমর দ্বাপরযুগে সংঘটিত হইবার জনশ্রুতি বর্ত্তমান আছে; তাহা দ্বাপর ও কলির সন্ধিকাল বলিয়া পরিচিত। তদনুসারে ইহা পঞ্চসহস্র বৎসরের পুরাতন ঘটনা। কবি কহ্লণ এই মহাসমরের কালনির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টায় তিনি প্রচলিত জনশ্রুতির পক্ষসমর্থন করেন নাই; ইতিহাসলেখকের ন্যায় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া কালনির্ণয় করিয়াছেন।

কহ্লণের পূর্ব্বে বরাহমিহির "বৃহৎ-সংহিতা" গ্রন্থে এই কালনির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কহ্লণ তাঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। বরাহমিহিরের মতানুসারে সপ্তর্ষিমণ্ডল শতবর্ষে এক নক্ষত্র হইতে নক্ষত্রান্তরে পরিভ্রমণ করে। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকসময়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে অবস্থিত ছিল; সুতরাং তাহা শকাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী ২৫.৬ বৎসরের ঘটনা। যথা :—

"কৃষ্ণাদূর্দ্ধং শতেনাস্তৈর্যাত্যহ্ন চিত্রশিখণ্ডিনু।
তচ্চারে সংহিতাকারৈরেষ দত্তোঽত্র নির্ণয়ঃ॥
আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্যাদ্য॥"১।৫৫—৫৬।

কবি কহ্লণ এই গণনা অবলম্বন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, কলিগতাব্দ ৬৫৩বৎসর পরে কুরুপাণ্ডব প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এই গণনায় কহ্লণ-পণ্ডিত রাজতরঙ্গিণী-রচনার কালনির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা ১০৭০ শক-বৎসর বলিয়া লিখিত আছে; তাহা ১ ৭০ + ৩১৭৯ = ৪২৪৯ কলিগতাব্দ। কহ্লণ মোট ৩৫৯৬ বৎসরের ইতিহাস সঙ্কলিত করিয়া গিয়াছেন। ৪২৪৯ কলিগতাব্দ হইতে এই ৩৫৯৬ বৎসর বিয়োগ করিলে, কাশ্মীরের ইতিহাস-আরম্ভের কাল প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহা ৬৫৩ কলিগতাব্দ। তৎকালে কুরুপাণ্ডবের সমসাময়িক গোনন্দ-নামধেয় নরপতি কাশ্মীরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন। এত দীর্ঘকালের বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না। কহ্লণ তজ্জন্য রাজতরঙ্গিণীর প্রথম তরঙ্গে ২২৬৮ বৎসরের কিংবদন্তিমূলক ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে সমাপ্ত করিয়া, দ্বিতীয় হইতে অষ্টম তরঙ্গে ১৩২৮বৎসরের ইতিহাস ক্রমে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। চতুর্থ তরঙ্গ হইতেই প্রামাণিক ঐতিহাসিক ঘটনার আরম্ভ; তৎপরে ক্রমেই নানা বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাসের অবতারণা করিয়া, কহ্লণ-পণ্ডিত তাঁহার সমসাময়িক ঘটনা বর্ণনা করিয়া গ্রন্থশেষ করিয়াছেন।

এই বিপুল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইলে, অধ্যাপক ষ্টীনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা সবিশেষ উপকারজনক বলিয়া বোধ হইবে। এই টীকার সহায়তায় রাজতরঙ্গিণী অধ্যয়ন করা যাঁহাদের সময়ে কুলাইবে না, তাঁহারা অধ্যাপক ষ্টীনের ভূমিকা পাঠ করিলেও, রাজতরঙ্গিণীর প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে পারিবেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের নানা অংশ। সকল অংশই তমসাচ্ছন্ন। সকল অংশই নানা তর্কবিতর্কে অধিকতর তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের কথা এখন কবিকাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধাবির্ভাবের পরবর্ত্তী ও খৃষ্টাবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী নরপালগণের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, কণিষ্ক প্রভৃতি কয়েকজন নরপালের নাম লোকসমাজে সুপরিচিত হইলেও, তাঁহাদের শাসনকাহিনীর সকল কথা অবগত হইবার উপায় নাই। কোন্ সময়ে ভারতীয় সাম্রাজ্যসীমা কতদূর বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল, তাহাও নিঃসংশয়ে নির্ণয় করা যায় না। ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চল বহুবিপ্লবের লীলাভূমি; তাহা কখন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত; কখন বা সংযুক্ত মগধসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত; কখন আবার বিদেশীয় পরাক্রমশালী প্রবল নরপতির অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। রাজতরঙ্গিণী কাশ্মীরের ইতিহাস হইলেও, এই সকল বিপ্লবের পরিচয় প্রদান করে।

কাশ্মীর শৈলপ্রাচীরাবৃত স্বতন্ত্র খণ্ডরাজ্য হইলেও, কখন কখন কাশ্মীরের বাহিরে গান্ধারে, তাতারে, তিব্বতে, পঞ্জাপে, পঞ্চালে, কান্যকুব্জেও অধিকারবিস্তার করিয়াছিল; আবার কখন বা মগধ ও মালবের অধিকারভুক্ত হইয়া স্বাতন্ত্র্যবিচ্যুত করদরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। রাজতরঙ্গিণীতে ইহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কখন কাশ্মীর হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয়স্থান, কখন বা বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয়ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। রাজতরঙ্গিণীতে তাহারও কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। অসভ্য পার্ব্বত্যজাতির অভিযানে বিপর্য্যস্ত হইয়া, জলপ্লাবন ও দুর্ভিক্ষে উৎপীড়িত হইয়া, কাশ্মীর নানা সময়ে নানা দুঃখক্লেশ বহন করিয়াছিল,—তাহাও কহ্লণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বিচিত্র ঐতিহাসিক ঘটনার আদ্যন্তের আলোচনা হইলে, তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের বিলুপ্ত ইতিহাসের নানা তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। তজ্জন্য এই গ্রন্থের সমুচিত সমালোচনা আবশ্যক। বঙ্গসাহিত্যে অনেকবার রাজতরঙ্গিণীর আলোচনা লিপিবদ্ধ হইলেও, অদ্যাপি কোন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই; মাসিকপত্রের প্রবন্ধেই সমস্ত আলোচনা সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

কাশ্মীরের সহিত মহাচীন-সাম্রাজ্যের কখন কখন সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, রাজতরঙ্গিণীতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও, মহাচীন-সাম্রাজ্যের ইতিহাসে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদ্দেশের বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণ ভ্রমণপ্রসঙ্গে ভারতে উপনীত হইয়া কাশ্মীরের যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, রাজতরঙ্গিণীপাঠে তাহারও অনেক কথার সত্যতা উপলব্ধ হয়। তবে কাশ্মীরের পুরাতন নরপতিদিগের রাজ্যকালসম্বন্ধে কহ্লণ-পণ্ডিত পুরাতন পুস্তক অবলম্বন করিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত সকল স্থলে ইতিহাসের ঐক্য সম্পাদন করা যায় না;—তাহা জনশ্রুতিমাত্র।

কাশ্মীরের ভূতপূর্ব্ব ভূপালগণের যে নামমালা কহ্লণ অন্যান্য পুরাতন গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে অশোক, হুবিষ্ক ও কণিষ্কের নাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে সুপরিচিত। কিন্তু কহ্লণ ইহাদের রাজ্যকাল ও বংশাবলী যে ভাবে কীর্ত্তন

করিয়াছেন, তাহার সহিত ইতিহাসের কিছু-মাত্র ঐক্য নাই। অশোকের নাম জগদ্বিখ্যাত; তাঁহার বিবিধ শিলালিপি ও জীবনচরিত তাঁহার কথা অদ্যাপি লোকসমাজে ঘোষণা করিতেছে। তিনি মগধেশ্বর সুবিখ্যাত চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র,—প্রবলপরাক্রান্ত বৌদ্ধ নরপতি। প্রথমে হিন্দুধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, পরে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, অশোক "দেবানাং প্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী" নামে সুপরিচিত হন। তিনি প্রজাসাধারণকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিবার জন্য ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণকে তুল্যভাবে সমাদর প্রদর্শন করিতেন; সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পুত্রকে কাশ্মীরশাসনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের বহু চৈত্যে ও বিহারে তাঁহার কীর্ত্তি দীর্ঘকাল দেদীপ্যমান ছিল। তাঁহার প্রবল প্রতাপে ভারত-সীমাসংলগ্ন ম্লেচ্ছরাজ্যও বশীভূত হইয়াছিল; তদ্দেশেও অশোকশাসন প্রচলিত হইয়াছিল। খৃষ্টাবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী তৃতীয় শতাব্দীতে এই সকল ব্যাপার সংঘটিত হয়। রাজতরঙ্গিণী ইহাকে সহস্রবৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; বংশাবলীর সঙ্গে অশোকের সুপরিচিত বংশাবলীরও সামঞ্জস্য নাই। তথাপি "দেবানাং প্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী" স্বনামখ্যাত মগধাধিপতি মহারাজ অশোকই যে রাজতরঙ্গিণীর অশোক, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। তিনি কাশ্মীররাজ, ম্লেচ্ছবিমর্দ্দকারী, হিন্দু ও বৌদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বর্ণিত। তাঁহার শাসন-সময়েই যে কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ-লাভ করে, তাহারও আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ, তৎপূর্ব্বে অন্য কোন ভূপতির শাসনসময়বর্ণনায় কহ্লণ বৌদ্ধ চৈত্যাদির উল্লেখ করেন নাই। শৈবমত নিতান্ত আধুনিক বলিয়া কাহারও কাহারও ধারণা আছে; তাঁহারা সেই ধারণার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেক তথ্য বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু রাজতরঙ্গিণী কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই শৈবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত থাকার সাক্ষ্যদান করে। অশোক নিজেও কাশ্মীরে শৈব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং তাহা বহুকাল অশোকের নামানুসারে লোক-সমাজে পরিচিত ছিল। ইহা দ্বিসহস্র বৎসরের অধিক পুরাতন কথা। তখনও কাশ্মীর বিবিধ তীর্থে, বিদ্যালয়ে, জ্ঞান-গৌরবে ভারতবর্ষে সুপরিচিত ছিল। ইহা কবিপ্রসিদ্ধি হইলেও, নিতান্ত কাল্পনিক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

অশোক ও তৎপুত্র জলৌক সম্বন্ধে রাজতরঙ্গিণীতে যে সকল আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকাবলীতে কিছু-কিছু ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত থাকা সম্ভব। যথা :—

"প্রপৌত্রঃ শকুনেস্তস্য ভূপতেঃ প্রপিতুস্ত্যজঃ।
অথাবহদশোকাখ্যঃ সত্যসন্ধো বসুন্ধরাম্॥
যঃ শাস্তৃজিনো রাজা প্রপন্নো জিনশাসনম্।
শুদ্ধলত্রবিতস্তাত্রো তস্যার স্তূপমণ্ডলৈঃ॥
ধর্ম্মারণ্যবিহারাস্তর্বিতস্তাপুরেঽভবৎ।
যৎকৃতঃ চৈত্যমুৎসেধাবধিপ্রাত্যক্ষমে ক্ষণম্॥
স যঠনত্যা দেহানাং লক্ষৈর্লক্ষীনমূল্যৈঃ।
গরীয়সীং পুরীং শ্রীমাংশ্চক্রে শ্রীনগরীং নৃপঃ॥
জীর্ণং শ্রীবিজয়েশস্য বিনিবাধ্য সুধামহম্।
নিদ্ধমঞ্চেণোন্মুখঃ প্রাকারো যেন কারিতঃ॥
সভায়াং বিজয়েশস্য সমাপে চ বিনির্ম্মমে।
শাস্ত্রাবসাদঃ প্রাসাদাবশোকেশ্বরসংজ্ঞিতৌ॥
ম্লেচ্ছৈঃ সংক্ষাদিতে দেশে স তদুচ্ছিস্তয়ে নৃপঃ।
তপঃসন্তোষিতাগ্নেয়ে ভূতেশাৎ সুকৃতী সুতম্॥"
১।১০১—১০৭।

এই বর্ণনাপাঠে অশোকের যে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে কোন কোন কথার সত্যতা অন্যান্য প্রমাণেও প্রতিষ্ঠিত হয়। কাশ্মীরের অশোকচৈত্যের এখন নিদর্শনমাত্রও বর্ত্তমান নাই; কিন্তু হিয়ঙ্গথ্সঙ্গের তীর্থভ্রমণকালে ও কহ্লণের গ্রন্থরচনাকালে তাহা লোকলোচনের গোচরীভূত ছিল। কাশ্মীরের জনশ্রুতি অশোককে কাশ্মীরাধিপতি বলিয়াই প্রচার করিয়া থাকিবে; তজ্জন্য কবি কহ্লণ তাঁহার মগধরাজ্যের উল্লেখ করেন নাই। অশোকের নাম বিলুপ্ত হইয়া "দেবানাং প্রিয়ঃ" নামই সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়াছিল; তিনিও সেই নামেই শিলালিপি খোদিত করাইয়াছিলেন। হিন্দুপুরাণে, বৌদ্ধগ্রন্থাবলীতে এবং রাজতরঙ্গিণীতে "অশোক"-নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার "দেবানাং প্রিয়ঃ" উপাধি এত সুপরিচিত হইয়াছিল যে, উত্তরকালে পাণিনির টীকার উদাহরণেও তাহা স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সাধারণত সমাসে বিভক্তির লোপ হইয়া থাকে। তদনুসারে "দেবানাং প্রিয়ঃ" সমাসে "দেবপ্রিয়ঃ" হয়। কতকগুলি বিশেষ স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। তাহার অধিকাংশস্থলেই একবচনের প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেবল কয়েকটি বিশেষ স্থলে বহুবচনের প্রয়োগ প্রচলিত ছিল; তন্মধ্যে "দেবানাং প্রিয়ঃ" একটি সুবিখ্যাত উদাহরণ। * অশোক এই নামেই বিশ্ববিখ্যাত; তাঁহার প্রকৃত নাম সেরূপ সুপরিচিত নহে। কাশ্মীরের লোকে তাঁহাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে জানিত বলিয়াই কাশ্মীরের জনশ্রুতি তাঁহার প্রকৃত নাম সঞ্জীবিত রাখিয়াছিল। পুরাতন জনশ্রুতির সঙ্গে ক্রমে কাল্পনিক আবর্জ্জনা সংযুক্ত

* উত্তরকালে "দেবানাং প্রিয়ঃ" শব্দের নানা ব্যাখ্যা প্রচলিত হইয়াছিল। পাণিনির "ষষ্ঠ্যা আক্রোশে" এই বিখ্যাত সূত্রের অন্যান্য উদাহরণের সঙ্গে কাশিকা বৃত্তিতে "দেবানাং প্রিয় ইত্যত্র চ ষষ্ঠ্যা অলুগ্বক্তব্যঃ" এইরূপ নির্দ্দেশ ছিল। চ শব্দে এই উদাহরণ উত্তরকালে সংযুক্ত হওয়া অনুমিত হয়। ভট্টোজিদীক্ষিত ইহার ব্যাখ্যায় "দেবানাং প্রিয় ইতি চ মূর্খে, অন্যত্র দেবপ্রিয়ঃ" এইরূপ টীকা সংযুক্ত করেন। শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য বামনেন্দ্র স্বামীর চরণারবিন্দসেবক শ্রীজ্ঞানেন্দ্র সরস্বতী স্বকৃত তত্ত্ববোধিনীনাম্নী টীকায় আরও একটু অগ্রসর হইয়া "দেবানাং প্রিয়ঃ" শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন :—"মূর্খা হি দেবানাং প্রীতিং জনয়ন্তীতি দেবপশুত্বাদিতি মনোরমায়াং ভাবঃ। ব্রহ্মজ্ঞানরহিতত্বাৎ সংসারিণো মূর্খাস্তে তু যাগাদি-কর্ম্মাণ্যনুতিষ্ঠন্তঃ পুরোডাশাদিষ্বারা দেবানামতত্ত্বং প্রীতিং জনয়ন্তি। ব্রহ্মজ্ঞানিনস্তু ন তথা। তেষাং যাগাদ্যনুষ্ঠানাভাবাৎ। অতো গবাদিস্থানাপন্নত্বান্মূর্খা এব দেবপশব ইতি।" ভাষাবৃত্তিকার বৌদ্ধ পুরুষোত্তম এরূপ কোন ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেন নাই; তাঁহার টীকাকার সুষেণ শর্ম্মা "আক্রোশে নিন্দায়াম্" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। অশোকের "দেবানাং প্রিয়ঃ" নাম প্রচলিত হইয়া ব্যাকরণের উদাহরণে স্থান-প্রাপ্ত হইলে, উত্তরকালে শৈব টীকাকারগণ তাহার কত ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই ঐতিহাসিক নিদর্শনমাত্র!

হইয়া, প্রকৃত তথ্য আচ্ছন্ন করিয়া দেয়;—অশোকের ভাগ্যেও তাহাই সংঘটিত হইয়াছে!

অশোকের ন্যায় কণিষ্কের নামও এক্ষণে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। তিনি একদা আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ ভূভাগে অধিকারবিস্তার করিয়া, প্রবলপ্রতাপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার নামাঙ্কিত শিলালিপি ও রাজমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়া, ভারতবর্ষের ইতিহাসের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্রবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী ও বৌদ্ধমতপ্রচারক প্রবল পুরুষ বলিয়া বৌদ্ধসাহিত্যে সুপরিচিত। কিন্তু তিনি কোন্ সময়ের লোক, কোন্ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কতদূর পর্য্যন্ত শাসনক্ষমতা বিস্তৃত করেন, তদ্বিষয়ে কিছু-কিছু তর্কবিতর্ক প্রচলিত হইয়াছে। রাজতরঙ্গিণী সে সকল তর্কের মীমাংসায় কিছু-কিছু সহায়তা সম্পাদন করিতে সক্ষম। কবি কহ্লণ অশোকের ন্যায় কণিষ্ককেও কাশ্মীরের রাজা বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। তাঁহার মতে এই রাজবংশ আদৌ ভারতবর্ষীয় নহে; তুরুষ্কদেশ হইতে সমাগত। হুষ্ক, জুষ্ক ও কণিষ্ক নামক নরপতিত্রয় বাহুবলে কিয়দ্দিবসের জন্য ভারতবর্ষেও অধিকারবিস্তার করিয়াছিলেন। ইঁহারা বংশে বা জাতিতে তুরুষ্ক হইলেও, ধর্ম্মে, শিক্ষাদীক্ষায় ও শাসনপ্রণালীতে বৌদ্ধ ছিলেন। কবি কহ্লণ জনশ্রুতিমূলক নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যথা :—

"অধ্যাস্তবন্ স্বনামাঙ্কপুরত্রয়বিধায়িনঃ।
হুষ্ক-জুষ্ক-কনিষ্কাখ্যাস্ত্রয়স্তত্রৈব পার্থিবাঃ॥
স বিহারস্তু নির্ম্মাতা জুষ্কো জুষ্কপুরস্য যঃ।
জয়স্বামিপুরস্যাপি শুদ্ধধীঃ সংবিধায়কঃ॥
তে তুরুষ্কান্বয়োদ্ভূতা অপি পুণ্যাশ্রয়া নৃপাঃ।
শুষ্কলেত্রাদিদেশেষু মঠচৈত্যাদি চক্রিরে॥
প্রাজ্যে রাজ্যক্ষণে তেষাং প্রায়ঃ কস্মীরমণ্ডলম্।
ভোজ্যমাস্তে স্ম বৌদ্ধানাং প্রত্যুজ্জ্বলিততেজসাম্॥
তদা ভগবতঃ শাক্যসিংহস্য পরিনির্বৃতেঃ।
অস্মিন্ মহীতলাবাতো সার্দ্ধং বর্ষশতং অগাৎ॥
বোধিসত্ত্বস্য দেশেঽস্মিন্নেকো ভূমীশ্বরোঽভবৎ।
স চ নাগার্জ্জুনঃ শ্রীমান্ মড়র্হদ্ধনসংশ্রয়ী॥"
১।১৬৮—১৭৩॥

অশোকের ন্যায় কণিষ্কের অভ্যুদয়-কালও কহ্লণকর্ত্তৃক যথাকালে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কণিষ্কশাসনসময়ে নাগার্জ্জুন-নামধেয় বৌদ্ধযতির আবির্ভাবের কথা বৌদ্ধসাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উদীচ্য বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে ভগবান্ শাক্যসিংহের পরিনির্ব্বাণের চারিশত বৎসর পরে কণিষ্কের আবির্ভাব পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তদনুসারে খৃষ্টপূর্ব্ব সার্দ্ধবর্ষশতান্তে কণিষ্কের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিতে হয়। কেহ কেহ কণিষ্ককেই শকাব্দপ্রবর্ত্তক ভূপতি বলিয়া তাঁহাকে খৃষ্টোত্তর ৭৮বৎসরের সমকালবর্ত্তী বলিয়া তর্ক করেন; কেহ আবার খৃষ্টাবির্ভাবের সমকালেই কণিষ্কের শাসনকাল নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তুরুষ্কবংশীয় এই তিন পরাক্রান্ত ভূপতির মধ্যে জুষ্কের নাম অন্য কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কাশ্মীরের হুষ্কপুর, জুষ্কপুর ও কনিষ্কপুর অদ্যাপি এই তিন প্রবল পুরুষের পরিচয় প্রদান করে। হুষ্কের নাম হুবিষ্ক;—তাঁহার ও কনিষ্কের নামাঙ্কিত শিলালিপি মথুরার ভগ্নাবশেষের মধ্যে

আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে সংবৎ, ঋতু, মাস ও দিনের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ তাহাকে "বিক্রম-সংবৎ" মনে করিয়া, তদনুসারে কালনির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। রাজতরঙ্গিণীর এই অংশ বুঝিবার জন্য ঐ সকল শিলালিপির সমালোচনা করা আবশ্যক।

মথুরার পুরাতন শিলালিপিতে কণিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেব নামক তিনজন নরপতির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাঁহারা "দেবপুত্র"-নামে উল্লিখিত, এবং তাঁহাদের রাজ্যকাল "সংবৎ"সংজ্ঞায় লিপিবদ্ধ। জেনারেল কনিংহাম এই সকল শিলালিপির সমালোচনাকালে কণিষ্ককে প্রথম, হুবিষ্ককে দ্বিতীয় এবং বাসুদেবকে তৃতীয় নরপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কণিষ্কের রাজমুদ্রা কাশ্মীর হইতে মালব, সিন্ধু হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রাজমুদ্রার নাম "নানক"; ইহা "মৃচ্ছকটিক"নামক সংস্কৃত-নাট্যগ্রন্থে উল্লিখিত আছে; তাহাতে "বাসুদেবে"রও নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। খৃষ্টাবির্ভাবের সমসময়ে আর্য্যাবর্ত্তে যে "তুরুষ্কান্বয়সম্ভূত কাণ্বংশীয়" কণিষ্কাদি রাজা বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা এক্ষণে স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই সময়ের শিলালিপিতে ঋতু, মাস ও দিনের উল্লেখ করিবার সময়ে যে ভাবে ঋতুর সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে তৎকালে বৎসরে কেবল তিন ঋতু—গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হেমন্ত—প্রচলিত থাকা জানিতে পারা যায়। ভারতবর্ষে চিরদিন ষড়্ঋতু পরিগণিত হইত না; এক সময়ে তিন ঋতু, পরে চারি ঋতু, অবশেষে ছয় ঋতু পরিগণিত হইয়াছে। হিয়ঙ্গ-থ্সাঙ্গ এই কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মৎস্যপুরাণে বর্ষাকাল চারিমাস বলিয়া লিখিত আছে; মথুরার পুরাতন শিলালিপিতে "গ্রীষ্মকালের চতুর্থ মাস" বলিয়া কালনির্দ্দেশের পরিচয় আছে। সুতরাং পুরাকালে বৎসরে তিনটিমাত্র ঋতু প্রচলিত থাকায় যে কিংবদন্তী হিয়ঙ্গথ্সাঙ্গ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুকূল প্রমাণের অভাব নাই। কালে তিন ঋতু হইতে ষড়্ঋতু পরিকল্পিত হইয়াছে। কণিষ্কের শাসনসময়ে, দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে, ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বৎসরে তিনটিমাত্র ঋতু সুপরিচিত ছিল। ইহা হয় ত তুরুষ্কবংশীয় দেবপুত্রনামধারী অভিনব ভূপতিবর্গের প্রবর্ত্তিত কালগণনার নিয়ম! কণিষ্কবংশের প্রবল প্রতাপে কিছুদিনের জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বর্দ্ধিত হইবার কথা রাজতরঙ্গিণীতে দেখিতে পাওয়া যায়; বৌদ্ধসাহিত্য এ কথার পক্ষসমর্থন করে। কণিষ্কের শাসনসময়ে বৌদ্ধদিগের এক মহাসভা ও ধর্ম্মালোচনার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সময়ে গান্ধার ও কাশ্মীর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্রভূমি বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছিল।

কণিষ্কের শাসনক্ষমতা যে মথুরাঞ্চলে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, মথুরার শিলালিপিই তাহার যথেষ্ট নিদর্শন। সে শাসনক্ষমতা মালব পর্য্যন্তও বিস্তৃত হইবার কথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়া থাকেন। কারণ, কণিষ্কমুদ্রা তদ্দেশেও প্রচলিত

থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মালবের রাজধানী উজ্জয়িনী ভুবনবিখ্যাত; উজ্জয়িনীর অধিপতি বিক্রমাদিত্য সর্ব্বত্র সুপরিচিত। তিনি খৃষ্টাবির্ভাবের ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে "সংবৎ" প্রচলিত করেন; খৃষ্টোত্তর ৭৮ বৎসর পরে "শকাব্দে"র সূচনা হয়। "সংবৎ"সূচনা হইতে "শকাব্দ"সূচনা পর্য্যন্ত ১৩৫ বৎসর; এই সময়ে তুরুষ্কবংশীয় তিনজন নরপতির অভ্যুদয় হইয়াছিল। ইঁহাদের নামাঙ্কিত শিলালিপিতে "সংবৎ"শব্দ একটু বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কণিষ্কের নামাঙ্কিত এক শিলালিপিতে "নবম সংবৎসর", হবিষ্কের নামাঙ্কিত শিলালিপিতে "উনচত্বারিংশৎ সংবৎসর" এবং বাসুদেবের নামাঙ্কিত শিলালিপিতে "৪৪ সংবৎসর" লিখিত আছে। এই সকল সংবৎসর যদি প্রত্যেক নরপতির রাজ্যসংবৎসর হয়, তাহা হইলে ইঁহাদের রাজ্যকাল দীর্ঘস্থায়ী বলিতে হইবে। সংবৎ সূচনা হইতে শকাব্দ-সূচনা অর্থাৎ ১৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত এই তিন নরপতির শাসনকাল বর্ত্তমান থাকা অসম্ভব না হইতে পারে। বিক্রম-সংবতের ১৩৫বৎসরমাত্র পরেই আবার শকাব্দনামক নূতন কালগণনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল কেন? তাহা অবশ্যই কোন স্মরণীয় ঘটনা উপলক্ষে প্রচলিত হইবার কথা। এরূপ স্মরণীয় ঘটনা কি? কেহ কেহ বলেন, শকবংশীয় অনার্য্য ভূপতিকে বিতাড়িত করিয়া ভারতবর্ষকে পরকীয়-শাসন-মুক্ত করিবার দিন হইতে শকাব্দের সূচনা হয়; তাহা খৃষ্টোত্তর ৭৮ বৎসরের সমসাময়িক ঘটনা। তাহা কি এই তুরুষ্কবংশের উচ্ছেদসাধনের সমকালবর্ত্তী নহে? এই তর্ক সমীচীন হইলে, কণিষ্ককে সংবৎপ্রবর্ত্তক বিক্রমাদিত্য ও কাণ্বরাজবংশের উচ্ছেদান্তে শকাব্দপ্রচলন স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। শকাব্দপ্রচলনকালে যে শক-বংশের উচ্ছেদসাধন সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহার জনশ্রুতি অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। এই কণিষ্কবংশ ভিন্ন তৎসমসময়ে আর্য্যাবর্ত্তে আর কোন শক-বংশের শাসনক্ষমতা প্রচলিত থাকা দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং কণিষ্ককেই সংবৎপ্রবর্ত্তক বিক্রমাদিত্য বলিয়া অনুমান করিতে হয়। এই অনুমান সত্য হইলে, শকারি বিক্রমাদিত্য কে ছিলেন, তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। তিনি শকাব্দপ্রবর্ত্তক, শকবিমর্দ্দক প্রবল নরপতি। তাঁহার অন্য পরিচয় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

তুরুষ্কবংশীয় বৌদ্ধনরপালবর্গের শাসনসময়ে কাশ্মীরপ্রদেশে ধর্ম্মবিপ্লব সংঘটিত হইবার কথা কহ্লণ-পণ্ডিত স্পষ্টাক্ষরেই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সে বিপ্লবে বৌদ্ধধর্ম্ম জয়যুক্ত হইয়া, বৈদিক শিক্ষা ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। কহ্লণ লিখিয়াছেন, অভিমন্যুনামক হিন্দুনরপতি তুরুষ্কবংশীয় ভূপতির উচ্ছেদসাধন করিয়া বৌদ্ধভিক্ষুর উপদ্রব নিবারণ ও মহাভাষ্যের অধ্যয়ন প্রচলিত করেন। ইহাকে কাশ্মীরে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। কাশ্মীরের ন্যায় আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য প্রদেশেও এই পুনরুত্থান খৃষ্টাবির্ভাবের সমসময়ে পরিলক্ষিত হইয়াছিল "শাকাশৈব-সংঘর্ষকাল"

বলিয়া ইহার নামকরণ করা যাইতে পারে। এই সংঘর্ষকালে পুনরায় সংস্কৃতশিক্ষা প্রচলিত হইয়াছিল; পুনরায় বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অভ্যুদয় হইয়াছিল; পুনরায় শৈবমতের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই সন্ধিকালের কোন কথাই আদ্যোপান্ত জ্ঞাত হইবার উপায় নাই। রাজতরঙ্গিণী প্রসঙ্গক্রমে তুরুষ্কবংশের শাসনকাহিনীর বর্ণনা করায়, যৎকিঞ্চিৎ আভাসমাত্রই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; —সকল কথা অবগত হইবার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় নাই! তুরুষ্কান্বয়সম্ভূত ভূপতিবর্গের শাসনসময়ে পূর্ব্বপ্রচলিত শিক্ষা ও সদাচার যে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল, কবি কহ্লণ তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে সংস্কৃতভাষা কতদূর বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, মথুরার শিলালিপিতে তাহার কিছু-কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা:—

"মহারাজস্য রাজাতিরাজস্য দেবপুত্রস্য হবিষ্কস্য বিহারে দানং ভিক্ষুস্য জীবকস্য উদেয়নকস্য কুশুকো ২৫ সর্ব্বসত্ত্বহিতসুখং ভবতু সংঘে চতুর্দ্দিশ।"

এই শিলালিপি পালি অক্ষরে খোদিত; তুরুষ্কান্বয়সম্ভূত অন্যান্য ভূপতিবর্গের নামাঙ্কিত শিলালিপির অনুরূপ। এই সময়ে মহাভাষ্যের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা পরিত্যক্ত হইবার যে জনশ্রুতি কহ্লণ-পণ্ডিত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, মথুরার শিলালিপি তাহার পরিচয় প্রদান করে। ইহার অল্পকাল পরে "মৃচ্ছকটিক" রচিত হইয়াছিল, তখনও ব্যাকরণের শাসন সম্পূর্ণরূপে সংস্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না; "মৃচ্ছকটিকে"ই তাহার অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কণিষ্কশাসনসময়ে আর্য্যাবর্ত্তে যে শকবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা সমূলে উৎসাদিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। শকগণ কাশ্মীর-গিরিসঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়াই আর্য্যাবর্ত্তে উপনীত হইয়াছিলেন। এই ভারতাক্রমণপথ মধ্য-এসিয়ার প্রবল পুরুষদিগের নিকট সুপরিচিত হইয়াছিল। আমাদের সাহিত্যে কাশ্মীরের উত্তর-প্রদেশের সকল জাতিই শক অথবা ম্লেচ্ছ অথবা যবন নামে পরিচিত। তাহারা সকলে এক জাতি বা একবংশসম্ভূত নহে। কাণ্বংশের ন্যায় হূনবংশের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। তাহারাও বাহুবলে ভারতবর্ষের বিবিধ প্রদেশ আক্রমণ ও অধিকার করিত; এবং পুনঃপুন বিতাড়িত হইলেও, পুনঃপুন আর্য্যাবর্ত্তে আপতিত হইত। এক সময়ে হূনগর্ব্ব এরূপ প্রবল হইয়াছিল যে, কাশ্মীররাজ্য হূনরাজবংশের সম্পূর্ণ অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। কবি কহ্লণ সে কথা স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ না করিলেও, তাঁহার গ্রন্থনিহিত মিহিরকুলনামক কাশ্মীরাধিপতি যে হূনবংশীয় ছিলেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহা সংস্থাপনের জন্য নানা প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে সে সকল প্রমাণ এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে আলোচিত হইল না। মিহিরকুল শৈবমতাবলম্বী ও বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন; তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রায় "জয়তু বৃষ জয়তু বৃষধ্বজ" ইত্যাদি ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধমতের ন্যায় শৈবমতও একদা ভারতবর্ষের বাহিরে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মিহিরকুল খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর নরপতি। এই সময়ে আর্য্যাবর্ত্তের বিবিধ প্রদেশের নর-

পালগণ শকাভিযান প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মগধেশ্বর বালাদিত্যের নাম তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া আছে। অশোক ও কণিষ্কের ন্যায় এই সকল শকভূপতির শাসনকালনির্দ্দেশেও কবি কহ্লণ নানা ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন।

হিয়ঙ্গথ্ সাঙ্গের ভারতভ্রমণসময়ে, খৃষ্টীয় ষষ্টশতাব্দীর শেষভাগে, শীলাদিত্য-নামধেয় নরপতির মালবের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় থাকার কথা হিয়ঙ্গের ভ্রমণকাহিনীতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই নরপতির পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতির নাম বিক্রমাদিত্য বলিয়া লিখিত আছে। কবিকহ্লণও প্রসঙ্গক্রমে এই উক্তির সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। একদা কিয়ৎকালের জন্য কাশ্মীর এই বিক্রমাদিত্যের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল; তজ্জন্য রাজতরঙ্গিণীতেও তাঁহার নাম স্থানলাভ করিয়াছে।

"তত্রানেহস্যজ্বরিঙ্গাং শ্রীমান্ হর্ষাপরাভিধঃ।
একচ্ছত্রশ্চক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য ইত্যভূৎ॥
ভূপমদ্ভুতসৌভাগ্যঃ শীর্ষ্ণদ্বসাস্তজৎ।
বিহায় হরিবাহাংশ্চ চতুরঃ সাগরাংশ্চ যম্॥
লক্ষ্মীঃ কৃতোপকরণং গুণে যেন প্রবর্দ্ধিতে।
শ্রীমৎস্থ গুণিনোঽধ্যাপি তিষ্ঠন্ত্যাদ্ধ রকন্ধরাঃ॥
ম্লেচ্ছোচ্ছেদায় বধূবাং হরেরবতরিষ্যতঃ।
শকান্ বিনাশ্য যেনাদৌ কার্য্যভারো লঘুকৃতঃ॥
৩।১২৫—১২৮॥

কবি কহ্লণের বর্ণনায় জানিতে পারা যায়, উজ্জয়িনীর অধিপতি বিক্রমাদিত্যের অপর নাম হর্ষ; তিনি ভারতবর্ষের রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন ও শকগণকে বিনাশ করিয়া গৌরবলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে মাতৃগুপ্তনামক কবি কিছুদিনের জন্য কাশ্মীরের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়া, বিক্রমাদিত্যের স্বর্গারোহণের পর সিংহাসন ত্যাগ করিয়া, বারাণসীধামে শেষজীবন অতিবাহিত করেন। এই হর্ষবিক্রমাদিত্যই এক্ষণে নবরত্নসভাধিপতি কালিদাসাদি-প্রতিপালক সুবিখ্যাত রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন। ডাক্তার ভাওদাজী মাতৃগুপ্তকে মহাকবি কালিদাস বলিয়া স্থির করিবার আশায় নানা প্রমাণ প্রয়োগের চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় ডাক্তার রামদাস সেন তাঁহার মতানুসরণ করিয়া, রাজতরঙ্গিণীর প্রমাণ অবলম্বনে 'বঙ্গদর্শন'-পত্রের প্রথম খণ্ডে কালিদাসশীর্ষক প্রবন্ধ প্রকটিত করিয়াছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক মোক্ষমুলর প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ ডাক্তার ভাওদাজীর মত খণ্ডন করায় এস্থলে তাহার পুনরালোচনা অনাবশ্যক।

কবি কহ্লণ মহাকবি কালিদাসের নামোল্লেখ করেন নাই; তাঁহার সহিত কাশ্মীরের যে কিছুমাত্র সংস্রব ছিল, এরূপ কোন আভাসও প্রদান করেন নাই। কুমারসম্ভবের হিমালয়বর্ণনা, মেঘদূতের বিরহবেদনা, রঘুবংশের দিগ্বিজয়ঘোষণা, শকুন্তলার হিমালয়ের উপত্যকারণ্যের অপূর্ব্ব প্রণয়কাহিনী কাশ্মীরের সহিত কবির পরিচয় থাকার প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হইলেও, তদ্দ্বারা মাতৃগুপ্তকে কালিদাস বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কবি কহ্লণের গ্রন্থে কালিদাসের পরিচয় না থাকিলেও, ভবভূতির নামোল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাকবি ভবভূতি আপনাকে দাক্ষিণাত্যনিবাসী বলিয়া পরিচয় প্রদান

করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃতসাহিত্যে একাধিক কালিদাসের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু অদ্যাপি একাধিক ভবভূতি আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং কবি কহ্লণ যে স্বনামখ্যাত মহাকবি ভবভূতিকেই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই স্বীকার করিতে হয়। কহ্লণের মতানুসারে ভবভূতি কান্যকুব্জেশ্বর যশোবর্ম্মার রাজসভার অলঙ্কার ছিলেন। কাশ্মীরাধিপতি মুক্তাপীড়-ললিতাদিত্য যশোবর্ম্মাকে পরাস্ত করায়, ভবভূতি কাশ্মীররাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মুক্তাপীড়-ললিতাদিত্যের রাজ্যকাল এক্ষণে নানা প্রমাণে সুনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তিনি খৃষ্টোত্তর অষ্টম শতাব্দীর নরপতি ছিলেন। যশোবর্ম্মার রাজসভায় ভবভূতির ন্যায় বাক্‌পতিরাজনামক আর একজন মহাকবি বর্ত্তমান ছিলেন; তাঁহার নামও রাজতরঙ্গিণীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি যশোবর্ম্মার গৌড়বিজয় অবলম্বনে কাব্যরচনা করিয়াছিলেন।

রাজতরঙ্গিণীতে ললিতাদিত্য ও তৎপৌত্র বিনয়াদিত্যের শাসনসময়ে কাশ্মীর ও গৌড়ের সংস্রবের কথা লিপিবদ্ধ আছে। তাহা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর কাহিনী। কিন্তু গৌড় যে বহুপুরাতন প্রসিদ্ধ জনপদ, তাহার অন্য প্রমাণ বিলুপ্ত হয় নাই। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীসূত্রেও গৌড়ের উল্লেখ আছে। আচার্য্য গোল্‌ডষ্টুকর নানা প্রমাণের আলোচনা করিয়া, পাণিনিকে খৃষ্টাবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী একাদশশত বৎসরের সমসাময়িক লেখক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে, তিনসহস্র বৎসর পূর্ব্বেও যে গৌড়ীয় জনপদ ভারতবর্ষে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, তাহাতে সংশয়স্থাপন করা যায় না।

রাজতরঙ্গিণী প্রদেশবিশেষের ইতিহাস হইলেও, এই সকল কারণে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের ঐতিহাসিক-তথ্য-সঙ্কলনের সহায়তা সম্পাদন করিতে সক্ষম। এই বিপুল গ্রন্থের অধ্যয়নব্যাপার সমধিক শ্রমসাধ্য হইলেও, তদ্দ্বারা ইতিহাসপাঠক প্রচুর জ্ঞানলাভ করিবেন। অধ্যাপক ষ্টীন্ বিদেশের লোক হইয়াও, যেরূপ অধ্যবসায় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই সংস্কৃত ইতিহাসের লুপ্তোদ্ধার সাধন করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। এরূপ অধ্যয়নস্পৃহা ও তথ্যানুসন্ধানের অনুরাগ ভিন্ন ভারতবর্ষের বিলুপ্ত ইতিহাস কদাপি সঙ্কলিত হইবে না। ইহা কেবল শ্রমসাধ্য নহে, বিলক্ষণ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। অধ্যাপক ষ্টীন্ তাহাতে যথেষ্ট সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই এরূপ দুরূহ ব্রত সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ অধ্যাপক ষ্টীন্ বা কবি কহ্লণের সঙ্কলিত বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্যের সামান্য আভাসমাত্রও প্রদান করিতে সক্ষম হইল না। তজ্জন্য ইহা আদৌ লিপিবদ্ধ হয় নাই। এই ক্ষুদ্র-প্রবন্ধ পাঠে রাজতরঙ্গিণী-অধ্যয়নে কাহারও উৎসাহ ও অনুরাগ বর্দ্ধিত হইলে, তদ্দ্বারা বঙ্গসাহিত্য কালে নানা তথ্যলাভে সক্ষম হইবে,—কেবল এই আশায় সমালোচনা লিখিত হইল। বঙ্গসাহিত্যে অতি ধীরে, অতি নিঃশব্দে, পল্লবগ্রাহী শিশু সমালোচকবর্গের

অজ্ঞাতসারে যে অভিনব যুগ প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা প্রতিষ্ঠালাভ করিলে, বঙ্গীয় লেখকবর্গের অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান স্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। তখন এ আশা নিতান্ত দুরাশা বলিয়া পরিগণিত না হইতে পারে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

দুর্ব্বলের অপরাধ।

প্রভু তুমি দিয়েছ যে ভার,
যদি তাহা মাথা হতে
এই জীবনের পথে
নামাইয়া রাখি বারবার,—
জেনো, সে বিদ্রোহ নয়,
ক্ষীণ শ্রান্ত এ হৃদয়,
বলহীন পরাণ আমার!

চোখের বালি।

(৫৩)

সমস্তরাত্রি মহেন্দ্র ঘুমায় নাই—ক্লান্তশরীরে ভোরের দিকে তাহার ঘুম আসিল। বেলা আটটা-নয়টার সময় জাগিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। গতরাত্রির একটা কোন্ অসমাপ্ত বেদনা ঘুমের ভিতরে-ভিতরে যেন প্রবাহিত হইতেছিল। সচেতন হইবামাত্র মহেন্দ্র তাহার ব্যথা অনুভব করিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরেই রাত্রির সমস্ত ঘটনাটা মনে স্পষ্ট জাগিয়া উঠিল। সকাল-বেলাকার সেই রৌদ্রে, অতৃপ্ত নিদ্রার ক্লান্তিতে সমস্ত জগৎটা এবং জীবনটা অত্যন্ত বিরস বোধ হইল। সংসারত্যাগের গ্লানি, ধর্ম্মত্যাগের গভীর পরিতাপ এবং এই উদ্ভ্রান্ত জীবনের সমস্ত অশান্তিভার মহেন্দ্র কিসের জন্য বহন করিতেছে! এই মোহাবেশশূন্য প্রভাতরৌদ্রে মহেন্দ্রের মনে হইল, সে বিনোদিনীকে ভালবাসে না। রাস্তার দিকে সে চাহিয়া দেখিল, সমস্ত জাগ্রত পৃথিবী ব্যস্ত হইয়া কাজে ছুটিয়াছে। সমস্ত আত্মগৌরব পঙ্কের মধ্যে বিসর্জ্জন দিয়া একটি বিমুখ স্ত্রীলোকের পদপ্রান্তে অকর্ম্মণ্য জীবনকে প্রতিদিন আবদ্ধ করিয়া রাখিবার যে মূঢ়তা, তাহা মহেন্দ্রের কাছে সুস্পষ্ট

হইল। একটা প্রবল আবেগের উচ্ছ্বাসের পর হৃদয়ে অবসাদ উপস্থিত হয়—ক্লান্ত হৃদয় তখন আপন অনুভূতির বিষয়কে কিছুকালের জন্য দূরে ঠেলিয়া রাখিতে চায়। সেই ভাবের ভাঁটার সময় তলের সমস্ত প্রচ্ছন্ন পঙ্ক বাহির হইয়া পড়ে,—যাহা মোহ আনিয়াছিল, তাহাতে বিতৃষ্ণা জন্মে। মহেন্দ্র যে কিসের জন্য নিজেকে এমন করিয়া অপমানিত করিতেছে, তাহা সে আজ বুঝিতে পারিল না। সে বলিল, "আমি সর্ব্বাংশেই বিনোদিনীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তবু আজ আমি সর্ব্বপ্রকার হীনতা ও লাঞ্ছনা স্বীকার করিয়া ঘৃণিত ভিক্ষুকের মত তাহার পশ্চাতে অহোরাত্র ছুটিয়া বেড়াইতেছি, এমনতর অদ্ভুত পাগ্‌লামি কোন্ সয়তান আমার মাথার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে!" বিনোদিনী মহেন্দ্রের কাছে আজ একটি স্ত্রীলোকমাত্র, আর কিছুই নহে—তাহার চারিদিকে সমস্ত পৃথিবীর সৌন্দর্য্য হইতে, সমস্ত কাব্য হইতে, কাহিনী হইতে যে একটি লাবণ্যজ্যোতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা আজ মায়ামরীচিকার মত অন্তর্দ্ধান করিতেই একটি সামান্য নারীমাত্র অবশিষ্ট রহিল, তাহার কোন অপূর্ব্বত্ব রহিল না।

তখন এই ধিক্কৃত মোহচক্র হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্য মহেন্দ্র ব্যগ্র হইল। যে শান্তি, প্রেম এবং স্নেহ তাহার ছিল, তাহাই তাহার কাছে দুর্লভতম অমৃত বলিয়া বোধ হইল। বিহারীর আশৈশব অটলনির্ভর বন্ধুত্ব তাহার কাছে মহামূল্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মহেন্দ্র মনে মনে কহিল, "যাহা যথার্থ গভীর এবং স্থায়ী, তাহার মধ্যে বিনা চেষ্টায়, বিনা বাধায় আপনাকে সম্পূর্ণ নিমগ্ন করিয়া রাখা যায় বলিয়া তাহার গৌরব আমরা বুঝিতে পারি না—যাহা চঞ্চল ছলনামাত্র, যাহার পরিতৃপ্তিতেও লেশমাত্র সুখ নাই, তাহা আমাদিগকে পশ্চাতে ঊর্দ্ধশ্বাস ঘোড়দৌড় করাইয়া বেড়ায় বলিয়াই তাহাকেই চরম কামনার ধন বলিয়া মনে করি।"

মহেন্দ্র কহিল, "আজই বাড়ী ফিরিয়া যাইব—বিনোদিনী যেখানেই থাকিতে চাহে, সেইখানেই তাহাকে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমি মুক্ত হইব।" "আমি মুক্ত হইব", এই কথা দৃঢ়স্বরে উচ্চারণ করিতেই তাহার মনে একটি আনন্দের আবির্ভাব হইল—এতদিন যে অবিশ্রাম দ্বিধার ভার সে বহন করিয়া আসিতেছিল, তাহা হাল্‌কা হইয়া আসিল। এতদিন, এই মুহূর্ত্তে যাহা তাহার পরম অপ্রীতিকর ঠেকিতেছিল, পরমুহূর্ত্তেই তাহা সে পালন করিতে বাধ্য হইতেছিল—জোর করিয়া "না" কি "হাঁ" সে বলিতে পারিতেছিল না—তাহার অন্তঃকরণের মধ্যে যে আদেশ উত্থিত হইতেছিল, বরাবর জোর করিয়া তাহার মুখচাপা দিয়া সে অন্যপথে চলিতেছিল—এখন সে যেমনি সবেগে বলিল, "আমি মুক্তিলাভ করিব", অমনি তাহার দোলা-পীড়িত হৃদয় আশ্রয় পাইয়া তাহাকে অভিনন্দন করিল।

মহেন্দ্র তখনি শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া মুখ ধুইয়া বিনোদিনীর সহিত দেখা করিতে গেল। গিয়া দেখিল, তাহার দ্বার বন্ধ। দ্বারে আঘাত দিয়া কহিল, "ঘুমাইতেছ কি?"

বিনোদিনী কহিল, "না। তুমি এখন যাও!"

মহেন্দ্র কহিল—"তোমার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে—আমি বেশিক্ষণ থাকিব না।"

বিনোদিনী কহিল—"কথা আর আমি শুনিতে পারি না—তুমি যাও, আমাকে আর বিরক্ত করিয়ো না, আমাকে একলা থাকিতে দাও!"

অন্য কোন সময় হইলে এই প্রত্যাখ্যানে মহেন্দ্রের আবেগ আরো বাড়িয়া উঠিত। কিন্তু আজ তাহার অত্যন্ত ঘৃণাবোধ হইল! সে ভাবিল, "এই সামান্য এক স্ত্রীলোকের কাছে আমি নিজেকে এতই হীন করিয়াছি যে, আমাকে যখন তখন এমনতর অবজ্ঞাভরে দূর করিয়া দিবার অধিকার ইহার জন্মিয়াছে। সে অধিকার ইহার স্বাভাবিক অধিকার নহে। আমিই তাহা ইহাকে দিয়া ইহার গর্ব্ব এমন অন্যায়রূপে বাড়াইয়া দিয়াছি।" এই লাঞ্ছনার পরে মহেন্দ্র নিজের মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিবার চেষ্টা করিল। সে কহিল, "আমি জয়ী হইব—ইহার বন্ধন আমি ছেদন করিয়া দিয়া চলিয়া যাইব।"

আহারান্তে মহেন্দ্র টাকা উঠাইয়া আনিবার জন্য ব্যাঙ্কে চলিয়া গেল। টাকা উঠাইয়া আশার জন্য ও মার জন্য কিছু ভাল নূতন জিনিষ কিনিবে বলিয়া সে এলাহাবাদের দোকানে ঘুরিতে লাগিল।

আবার একবার বিনোদিনীর দ্বারে আঘাত পড়িল। প্রথমে সে বিরক্ত হইয়া কোন উত্তর করিল না—তাহার পরে আবার বারবার আঘাত করিতেই বিনোদিনী জলন্ত রোষে সবলে দ্বার খুলিয়া কহিল, "কেন তুমি আমাকে বারবার বিরক্ত করিতে আসিতেছ?" কথা শেষ না হইতেই বিনোদিনী দেখিল, বিহারী দাঁড়াইয়া আছে।

ঘরের মধ্যে মহেন্দ্র আছে কি না, দেখিবার জন্য বিহারী একবার ভিতরে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, শয়নঘরে শুষ্কফুল এবং ছিন্নমালা ছড়ান। তাহার মন নিমেষের মধ্যেই প্রবলবেগে বিমুখ হইয়া গেল। বিহারী যখন দূরে ছিল, তখন বিনোদিনীর জীবনযাত্রাসম্বন্ধে কোন সন্দেহজনক চিত্র যে তাহার মনে উদয় হয় নাই, তাহা নহে; কিন্তু কল্পনার লীলা সে চিত্রকে ঢাকিয়াও একটি উজ্জ্বল মোহিনীচ্ছবি দাঁড় করাইয়াছিল। বিহারী যখন বাগানে প্রবেশ করিতেছিল, তখন তাহার হৃৎকম্প হইতেছিল—পাছে কল্পনাপ্রতিমায় অকস্মাৎ আঘাত লাগে, এইজন্য তাহার চিত্ত সঙ্কুচিত হইতেছিল। বিহারী বিনোদিনীর শয়নগৃহের দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্র সেই আঘাতটাই লাগিল।

দূরে থাকিয়া বিহারী একসময় মনে করিয়াছিল, সে আপনার প্রেমাভিষেকে বিনোদিনীর জীবনের সমস্ত পঙ্কিলতা অনায়াসে ধৌত করিয়া লইতে পারিবে। কাছে আসিয়া দেখিল, তাহা সহজ নহে—মনের মধ্যে করুণার বেদনা আসিল কই? হঠাৎ ঘৃণার তরঙ্গ উঠিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া দিল। বিনোদিনীকে বিহারী অত্যন্ত মলিন দেখিল।

একমুহূর্ত্তেই বিহারী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া "মহেন্দ্র" "মহেন্দ্র" করিয়া ডাকিল।

এই অপমান পাইয়া বিনোদিনী নম্রমৃদুস্বরে কহিল, "মহেন্দ্র নাই, মহেন্দ্র সহরে গেছে।"

বিহারী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে বিনোদিনী কহিল, "বিহারি-ঠাকুরপো, তোমার পায়ে ধরি, একটুখানি তোমাকে বসিতে হইবে।"

বিহারী কোন মিনতি শুনিবে না মনে করিয়াছিল, একেবারে এই ঘৃণার দৃশ্য হইতে এখনি নিজেকে দূরে লইয়া যাইবে স্থির করিয়াছিল, কিন্তু বিনোদিনীর করুণ অনুনয়স্বর শুনিবামাত্র ক্ষণকালের জন্য তাহার পা যেন আর উঠিল না।

বিনোদিনী কহিল, "আজ যদি তুমি বিমুখ হইয়া এমন করিয়া চলিয়া যাও, তবে আমি তোমারি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি মরিব।"

বিহারী তখন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "বিনোদিনি, তোমার জীবনের সঙ্গে আমাকে তুমি জড়াইবার চেষ্টা করিতেছ কেন? আমি তোমার কি করিয়াছি! আমি ত কখনো তোমার পথে দাঁড়াই নাই,—তোমার সুখদুঃখে হস্তক্ষেপ করি নাই।"

বিনোদিনী কহিল—"তুমি আমার কতখানি অধিকার করিয়াছ, তাহা একবার তোমাকে জানাইয়াছি—তুমি বিশ্বাস কর নাই। তবু আজ আবার তোমার বিরাগের মুখে সেই কথাই জানাইতেছি। তুমি ত আমাকে না বলিয়া জানাইবার,—লজ্জা করিয়া জানাইবার, সময় দাও নাই! তুমি আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়াছ, তবু আমি তোমার পা ধরিয়া বলিতেছি, আমি তোমাকে—"

বিহারী বাধা দিয়া কহিল—"সে কথা আর বলিয়ো না, মুখে আনিয়ো না! সে কথা বিশ্বাস করিবার জো নাই!"

বিনোদিনী। সে কথা ইতর লোকে বিশ্বাস করিতে পারে না, কিন্তু তুমি করিবে। সেইজন্য একবার আমি তোমাকে বসিতে বলিতেছি।

বিহারী। আমি বিশ্বাস করি বা না করি, তাহাতে কি আসে যায়! তোমার জীবন যেমন চলিতেছে, তেমনি চলিবে ত!

বিনোদিনী। আমি জানি, তোমার ইহাতে কিছুই আসিবে-যাইবে না। আমার ভাগ্য এমন যে, তোমার সম্মানরক্ষা করিয়া তোমার পাশে দাঁড়াইবার আমার কোন উপায় নাই। চিরকাল তোমা হইতে আমাকে দূরেই থাকিতে হইবে। আমার মন তোমার কাছে এই দাবিটুকু কেবল ছাড়িতে পারে না যে, আমি যেখানে থাকি, আমাকে তুমি একটুখানি মাধুর্য্যের সঙ্গে ভাবিবে। আমি জানি, আমার উপরে তোমার অল্প-একটু শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, সেইটুকু আমার একমাত্র সম্বল করিয়া রাখিব। সেইজন্য আমার সব কথা তোমাকে শুনিতে হইবে। আমি হাতজোড় করিয়া বলিতেছি ঠাকুরপো, একটুখানি বস!

"আচ্ছা চল" বলিয়া বিহারী এখান হইতে অন্যত্র কোথাও যাইতে উদ্যত হইল।

বিনোদিনী কহিল—"ঠাকুরপো, যাহা মনে করিতেছ, তাহা নহে। এ ঘরে কোন কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। তুমি এই ঘরে একদিন শয়ন করিয়াছিলে—এ ঘর তোমার জন্যই উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছি—ঐ ফুলগুলা

তোমারি পূজা করিয়া আজ শুকাইয়া পড়িয়া আছে। এই ঘরেই তোমাকে বসিতে হইবে।"

শুনিয়া বিহারীর চিত্তে পুলকের সঞ্চার হইল। ঘরের মধ্যে সে প্রবেশ করিল। বিনোদিনী দুই হাত দিয়া তাহাকে খাট দেখাইয়া দিল। বিহারী খাটে গিয়া বসিল—বিনোদিনী ভূমিতলে তাহার পায়ের কাছে উপবেশন করিল। বিহারী ব্যস্ত হইয়া উঠিতেই বিনোদিনী কহিল, "ঠাকুরপো, তুমি বস, আমার মাথা খাও উঠিয়ো না। আমি তোমার পায়ের কাছে বসিবারও যোগ্য নই, তুমি দয়া করিয়াই সেখানে স্থান দিয়াছ। দূরে থাকিলেও এই অধিকারটুকু আমি রাখিব।"

এই বলিয়া বিনোদিনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পরে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া কহিল—"তোমার খাওয়া হইয়াছে ঠাকুরপো?"

বিহারী কহিল, "ষ্টেশন্ হইতে খাইয়া আসিয়াছি।"

বিনোদিনী। আমি গ্রাম হইতে তোমাকে যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলাম, তাহা খুলিয়া কোন জবাব না দিয়া মহেন্দ্রের হাত দিয়া আমাকে ফিরাইয়া পাঠাইলে কেন?

বিহারী। সে চিঠি ত আমি পাই নাই?

বিনোদিনী। এবারে মহেন্দ্রের সঙ্গে কলিকাতায় কি তোমার দেখা হইয়াছিল?

বিহারী। তোমাকে গ্রামে পৌঁছাইয়া দিবার পরদিন মহেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, তাহার পরেই আমি পশ্চিমে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে আর দেখা হয় নাই।

বিনোদিনী। তাহার পূর্ব্বে আর একদিন আমার চিঠি পড়িয়া উত্তর না দিয়া ফিরাইয়া পাঠাইয়াছিলে?

বিহারী। না, এমন কখনই হয় নাই।

বিনোদিনী স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"সমস্ত বুঝিলাম। এখন আমার সব কথা তোমাকে বলি। যদি বিশ্বাস কর ত ভাগ্য মানিব, যদি না কর ত তোমাকে দোষ দিব না, আমাকে বিশ্বাস করা কঠিন।"

বিহারীর হৃদয় তখন আর্দ্র হইয়া গেছে। এই ভক্তিভারনম্রা বিনোদিনীর পূজাকে সে কোনমতেই অপমান করিতে পারিল না। সে কহিল, "বৌঠা'ণ, তোমাকে কোন কথাই বলিতে হইবে না, কিছু না শুনিয়া আমি তোমাকে বিশ্বাস করিতেছি। আমি তোমায় ঘৃণা করিতে পারি না। তুমি আর একটি কথাও বলিয়ো না।"

শুনিয়া বিনোদিনীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে বিহারীর পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল। কহিল, "সব কথা না বলিলে আমি বাঁচিব না। একটু ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিতে হইবে।—তুমি আমাকে যে আদেশ করিয়াছিলে, তাহাই আমি শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। যদিও তুমি আমাকে পত্রটুকুও লেখ নাই, তবু আমি আমার সেই গ্রামে লোকের উপহাস ও নিন্দা সহ্য করিয়া জীবন কাটাইয়া দিতাম, —তোমার স্নেহের পরিবর্ত্তে তোমার শাসনই আমি গ্রহণ করিতাম—কিন্তু বিধাতা তাহাতেও বিমুখ হইলেন। আমি যে পাপ জাগাইয়া তুলিয়াছি, তাহা আমাকে নির্ব্বাসনেও টিঁকিতে দিল না। মহেন্দ্র সেই গ্রামে আসিয়া,—আমার ঘরের দ্বারে আসিয়া, আমাকে সকলের সম্মুখে লাঞ্ছিত করিল। সে গ্রামে আর আমার স্থান হইল না। দ্বিতীয়বার তোমার আদেশের জন্য তোমাকে অনেক খুঁজিলাম, কোনমতেই তোমাকে পাইলাম না, মহেন্দ্র আমার খোলা চিঠি তোমার ঘর হইতে ফিরাইয়া লইয়া আমাকে প্রতারণা করিল। বুঝিলাম, তুমি আমাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছ। ইহার পরে আমি একেবারেই নষ্ট হইতে পারিতাম—কিন্তু তোমার কি গুণ আছে, তুমি দূরে থাকিয়াও রক্ষা করিতে পার—তোমাকে মনে স্থান দিয়াছি বলিয়াই আমি পবিত্র হইয়াছি—একদিন তুমি আমাকে দূর করিয়া দিয়া নিজের যে পরিচয় দিয়াছ, তোমার সেই কঠিন পরিচয় কঠিন সোণার মত—কঠিন মাণিকের মত আমার মনের মধ্যে রহিয়াছে, আমাকে মহামূল্য করিয়াছে। দেব, এই তোমার চরণ ছুঁইয়া বলিতেছি, সে মূল্য নষ্ট হয় নাই।"

বিহারী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিনোদিনীও আর কোন কথা কহিল না। অপরাহ্নের আলোক প্রতিক্ষণে ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল।

এমন-সময় মহেন্দ্র ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া বিহারীকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। বিনোদিনীর প্রতি তাহার যে একটা ঔদাসীন্য জন্মিতেছিল, ঈর্ষার তাড়নায় তাহা দূর হইবার উপক্রম হইল। বিনোদিনী বিহারীর পায়ের কাছে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে দেখিয়া, প্রত্যাখ্যাত মহেন্দ্রের গর্ব্বে আঘাত লাগিল। বিনোদিনীর সহিত বিহারীর চিঠিপত্রদ্বারা এই মিলন ঘটিয়াছে, ইহাতে তাহার আর সন্দেহ রহিল না। এতদিন বিহারী বিমুখ হইয়া ছিল, এখন সে যদি নিজে আসিয়া ধরা দেয় তবে বিনোদিনীকে ঠেকাইবে কে? মহেন্দ্র বিনোদিনীকে ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু আর কাহারো হাতে ত্যাগ করিতে পারে না, তাহা আজ বিহারীকে দেখিয়া বুঝিতে পারিল।

ব্যর্থরোষে তীব্র বিদ্রূপের স্বরে মহেন্দ্র বিনোদিনীকে কহিল, "এখন তবে রঙ্গভূমিতে মহেন্দ্রের প্রস্থান, বিহারীর প্রবেশ? দৃশ্যটি সুন্দর—হাততালি দিতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু আশা করি, এই শেষ অঙ্ক, ইহার পরে আর কিছুই ভাল লাগিবে না।"

বিনোদিনীর মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রের আশ্রয় লইতে যখন তাহাকে বাধ্য হইতে হইয়াছে, তখন এ অপমানের উত্তর তাহার আর কিছুই নাই,—ব্যাকুলদৃষ্টিতে সে কেবল একবার বিহারীর মুখের দিকে চাহিল।

বিহারী খাট হইতে উঠিল—অগ্রসর হইয়া কহিল, "মহেন্দ্র, তুমি বিনোদিনীকে কাপুরুষের মত অপমান করিয়ো না—তোমার ভদ্রতা যদি তোমাকে নিষেধ না করে, তোমাকে নিষেধ করিবার অধিকার আমার আছে।"

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "ইহারই মধ্যে অধিকার সাব্যস্ত হইয়া গেছে? আজ

তোমার নূতন নামকরণ করা যাক্—বিনোদ-বিহারী!"

বিহারী অপমানের মাত্রা চড়িতে দেখিয়া মহেন্দ্রের হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল, "মহেন্দ্র, বিনোদিনীকে আমি বিবাহ করিব তোমাকে জানাইলাম, অতএব এখন হইতে সংযতভাবে কথা কও!"

শুনিয়া মহেন্দ্র বিস্ময়ে নিস্তব্ধ হইয়া গেল—এবং বিনোদিনী চমকিয়া উঠিল, বুকের মধ্যে তাহার সমস্ত রক্ত তোলপাড় করিতে লাগিল।

বিহারী কহিল, "তোমাকে আর একটি খবর দিবার আছে—তোমার মাতা মৃত্যু-শয্যায় শয়ান, তাঁহার বাঁচিবার কোন আশা নাই। আমি আজ রাত্রের গাড়িতেই যাইব—বিনোদিনীও আমার সঙ্গে ফিরিবে।"

বিনোদিনী চমকিয়া উঠিল, কহিল, "পিসিমার অসুখ?"

বিহারী কহিল, "সারিবার অসুখ নহে। কখন্ কি হয়, বলা যায় না।"

মহেন্দ্র তখন আর কোন কথা না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিনোদিনী তখন বিহারীকে বলিল—"যে কথা তুমি বলিলে, তাহা তোমার মুখ দিয়া কেমন করিয়া বাহির হইল? এ কি ঠাট্টা?"

বিহারী কহিল—"না, আমি সত্যই বলিয়াছি, তোমাকে আমি বিবাহ করিব।"

বিনোদিনী। এই পাপিষ্ঠাকে উদ্ধার করিবার জন্য?

বিহারী। না। আমি তোমাকে ভালবাসি বলিয়া; শ্রদ্ধা করি বলিয়া!

বিনোদিনী। এই আমার শেষ পুরস্কার হইয়াছে। এই যেটুকু স্বীকার করিলে, ইহার বেশি আর আমি কিছুই চাই না। পাইলেও তাহা থাকিবে না, ধর্ম্ম কখনো তাহা সহ্য করিবেন না।

বিহারী। কেন করিবেন না?

বিনোদিনী। ছিছি, এ কথা মনে করিতে লজ্জা হয়! আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব, এ কখন হইতেই পারে না! ছিছি, এ কথা তুমি মুখে আনিয়ো না।

বিহারী। তুমি আমাকে ত্যাগ করিবে?

বিনোদিনী। ত্যাগ করিবার অধিকার আমার নাই। তুমি গোপনে অনেকের অনেক ভাল কর—তে মার একটা কোন ব্রতের একটা কিছু ভার আমার উপর সমর্পণ করিয়ো, তাহাই বহন করিয়া আমি নিজেকে তোমার সেবিকা বলিয়া গণ্য করিব। কিন্তু ছিছি, বিধবাকে তুমি বিবাহ করিবে! তোমার ঔদার্য্যে সব সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আমি যদি এ কাজ করি,—তোমাকে সমাজে নষ্ট করি,তবে ইহজীবনে আমি আর মাথা তুলিতে পারিব না।

বিহারী। কিন্তু বিনোদিনি, আমি তোমাকে ভালবাসি।

বিনোদিনী। "সেই ভালবাসার অধিকারে আমি আজ একটিমাত্র স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিব।"—বলিয়া বিনোদিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া বিহারীর পদাঙ্গুলি চুম্বন করিল। পায়ের কাছে বসিয়া কহিল—"পরজন্মে তোমাকে পাইবার জন্য আমি তপস্যা করিব—এ জন্মে আমার আর কিছু আশা নাই, প্রাপ্য নাই। আমি অনেক দুঃখ দিয়াছি, অনেক দুঃখ পাইয়াছি, আমার অনেক শিক্ষা হইয়াছে। সে শিক্ষা যদি ভুলিতাম, তবে আমি তোমাকে হীন করিয়া আরো হীন হইতাম। কিন্তু তুমি উচ্চ আছ বলিয়াই আজ আমি আবার মাথা তুলিতে পারিয়াছি—এ আশ্রয় আমি ভূমিসাৎ করিব না!"

বিহারী গম্ভীরমুখে চুপ করিয়া রহিল।

বিনোদিনী হাতজোড় করিয়া কহিল, "ভুল করিয়ো না,—আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবে না, তোমার গৌরব যাইবে, আমিও সমস্ত গৌরব হারাইব। তুমি চিরদিন নির্লিপ্ত, প্রসন্ন। আজও তুমি তাই থাক—আমি দূরে থাকিয়া তোমার কর্ম্ম করি। তুমি প্রসন্ন হও, তুমি সুখী হও!"

ক্রমশ।

বিসর্জ্জন।

শুধু এইটুকু সুখ, অতি সুকুমার,
তারি তরে কি আগ্রহ, কত হাহাকার!
সকলি গেছে ত চলে, এইটুকু বাকি,
অবোধ শিশুর মত রাখিয়ো না ঢাকি'!
স্থির হ'য়ে সহ্য কর পরিপূর্ণ ক্ষতি,
শেষটুকু নিয়ে যাক্ নিষ্ঠুর নিয়তি!

প্যারাসেল্‌সাস্।

[Paracelsus.—By Robert Browning.]

Make no more giants, God!
But elevate the race at once!

"হে পরমেশ্বর, আর দানবের সৃষ্টি করিও না, মানবজাতিটাকে একবার তুলিয়া দাও!"

'ব্রাউনিং'এর প্যারাসেল্‌সাসে কথাটি যে অর্থেই প্রযুক্ত হোক, আমরা কথাটিকে নামাইয়া আমাদের কাজে লাগাইতে পারি। কথাটি 'ব্রাউনিং'এর কবিতাসম্বন্ধে খাটে। রবার্ট ব্রাউনিংএর গান আমাদিগকে কোন পরী কিংবা দেবদানবের রাজ্যে লইয়া যায় না, এই পৃথিবীরই উপরিস্থিত মানবমণ্ডলীর অন্তর-অভিমুখে আহ্বান করে। মানব-

জীবনের যে অংশটুকু নিত্য—যে অংশটুকু সুন্দর, মহান্ অথবা অদ্ভুত, সেই অংশটুকুর উপরেই ব্রাউনিং কল্পনার আলোক ফেলিয়া এমন এক একটি ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিতে পারেন যে, পরী-দেবতার অভাব আমাদের আর অভাব বলিয়া মনে হয় না। মানব-জীবনের নিতান্ত জড়সম্পর্কীয় সুখ হইতে আরম্ভ করিয়া—Fine flesh stuff হইতে আরম্ভ করিয়া—গভীর আত্মার প্রেমের স্বাদ পর্য্যন্ত রবার্ট ব্রাউনিংএ পাওয়া যায়। "The whole live world is rife, God, with thy glory"—"জগদীশ, সমস্ত এই জীবন্ত জগৎ তোমার মহিমায় উজ্জ্বল।" এই-ই রবার্ট ব্রাউনিংএর সর্ব্ব কবিতার সারোক্তি। তার পরে মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্যের সহিত ব্রাউনিং মানবজীবনের পাপতাপ-দুঃখগানও আয়ত্ত করিয়াছেন। দুঃখের উপরে সহানুভূতি দিয়া কি-যে কোমল বর্ণে দুঃখের চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন—অপরাধের সহিত মনুষ্যহৃদয়ের দুর্ব্বলতা কি-যে যাদুমন্ত্রে তিনি জড়িত করিয়াছেন!—যে, তাহার সৌন্দর্য্যও আমি বর্ণনা করিতে পারি না। তার পরে সমস্ত জীবন্ত ধরণীর আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া ব্রাউনিং বলিয়াছেন—"Greet the unseen with a cheer"—"সেই পর-জগৎকে আনন্দস্বরে সম্ভাষণ কর।"

যাহারা জগতের কোন সুখ ভোগ করে নাই—নিরানন্দে জীবনযাপন করিয়াছে, আর যাঁহারা আনন্দে বলবান্ হইয়া উঠিয়াছেন, এ দুয়ের পরকালে বিশ্বাসে কত প্রভেদ! নিরানন্দ জন যেন শিক্ষা-করা আশায়—কিন্তু অন্তরের দৃঢ় প্রতীতিতে নহে—'তরুছায়া-মসীমাখা' পরপারের দিকে অলসচোখে চাহিয়া থাকে; কিন্তু আনন্দবলবান্ মহাজন এ জীবনের সকল আনন্দের উপর চলিয়া সহজেই যেন,—জ্যোতির্ম্ময় পরলোককে নিশ্চিত জানিয়াই যেন, অগ্রসর হইয়া যান। ব্রাউনিং মানবজীবনকে যথাসাধ্য সম্ভোগ করিয়াছিলেন, আশা করি।

আজ যে গ্রন্থখানির আলোচনা করিব, তাহাতে বর্ণিত মহাত্মার জীবনে ব্রাউনিং একটা-বড় সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। প্যারাসেল্‌সাসের জীবনে ব্রাউনিং এককালে মানবের আশার বিপুলতা, মানবের মহত্ত্ব, মানবজীবনের দুরপনেয় অসম্পূর্ণতা, জাগতিক নিয়মের কঠোরতা এবং মানবের অনন্ত-মুখী উন্নতি—এককালে এতগুলি জিনিষ ব্যক্ত করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। নিয়তির বল এবং তার উপরেও মানবাত্মার আশা এই গ্রন্থে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার কল্পনাসম্পদ্ ও ভাষাসম্পদ্ অত্যাশ্চর্য্য—তবু ব্রাউনিংএর প্রারম্ভকালের লেখা বলিয়া গ্রন্থ যেন কিছু অধিক বিস্তৃত এবং যেন কিছু অধিক বিশদীকৃত। এরূপ একটু অধিক বিশদীকৃত বা বিস্তৃত হইবার আরও কারণ থাকিতে পারে এই যে, ব্রাউনিং কবিতার একটা নূতন পথ অবলম্বন করিতেছিলেন। মানবজীবনের যে একটি গভীর রহস্য এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, তাহাকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারি, জ্ঞান ও শক্তি, প্রেমের অভাবে কিরূপে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, এ গ্রন্থে তাহাই দেখান হইয়াছে। প্রেম অর্থে—সমস্ত কোমল মনোবৃত্তি এবং সুন্দর মনোবৃত্তি।

প্যারাসেল্‌সাস্‌কে এতদিন কেহই জানিতে পারে নাই। চারি শতাব্দীর পুঞ্জীকৃত আবর্জ্জনায় এই মহাত্মার জীবন-কাহিনী ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্রাউনিং সকল জঞ্জাল বিদীর্ণ করিয়া এই মহাত্মার গভীর হৃদয়ের ক্রিয়া বাহির করিয়া দেখাইয়াছেন। পরে প্যারাসেল্‌সাসের যে ইতিহাস দেওয়া গিয়াছে, উহা হইতে এবং তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতে প্যারাসেল্‌সাসের বহ্নিমান্ উদ্যম, তাঁহার বিনাশবীজ, তাঁহার এ জীবনে ক্ষণিক বিনাশ, হৃদয়যন্ত্রণায় তাঁহার নরকভোগ, পরিশেষে আশার সঞ্চারান্তে মৃত্যু—প্যারাসেল্‌সাসের এই গভীরতম জীবন ব্রাউনিং বহু পুষ্পপত্রে সজ্জিত করিয়া,—কবিত্বের ইন্দ্রজালে অনুরঞ্জিত করিয়া, প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ বড় জীবন লইয়া কারবার করিয়াই তিনি দেখাইতে পারিয়াছেন—মানুষের বুকে কতখানি ধরে, মানুষ কত বড়! যাঁহারা ব্রাউনিংএর কাব্যরাজ্যে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে প্যারাসেল্‌সাসের আরও একটু বিশেষ সৌন্দর্য্য আছে। 'প্যারাসেল্‌সাস্' কাব্যখানি ব্রাউনিংএর প্রথম লেখা—সর্ব্বপ্রথম না হইলেও ঠিক্ তার পরেরই লেখা। তাই ব্রাউনিং-ভক্তগণ দেখিতে পাইবেন—তাঁহার যে কাব্যরাজ্যে মানবজীবনের আনন্দমহোৎসব চলিতেছে, প্যারাসেল্‌সাস্ ঠিক্ তাহারই সম্মুখবর্ত্তী ধ্বজমালাসজ্জিত বিরাট্ তোরণ-দ্বারের উপযুক্ত বটে।

এখন প্যারাসেল্‌সাসের কিছু ইতিহাস দিয়া, তার পর কাব্যখানির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে সুইজর্লণ্ডের জর্ম্মাণ-ভাগে আইন্‌সাইডেল্‌ন্-নামক স্থানে প্যারাসেল্‌সাসের জন্ম। বাল্যে তিনি মায়ের কাছে ধর্ম্মশিক্ষা করেন,—মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার ঈশ্বরভক্তি অটুট ছিল। পিতা এই বালককে সেকালের গ্রীক্-ল্যাটিন্ শিখাইয়াছিলেন এবং অ্যাল্‌কিমি-বিদ্যাতেও দীক্ষিত করিয়া দিয়াছিলেন। প্যারাসেল্‌সাস্ কিন্তু ক্রমে এই স্বর্ণপ্রসূ বিদ্যাকে আর সম্মান করিতেন না। কয়েকজন খ্রীষ্টান ভক্তের নিকটে তিনি বাইবেল্ শিখিয়া শেষে তাঁহার পৈতৃক ডাক্তারিব্যবসায় অবলম্বন করেন। তখনই গ্যালেন্, র‍্যাজিস্, অ্যাভিসেনা প্রভৃতি পুরাতন হাতুড়ে কবিরাজদের প্রতি তাঁহার অবজ্ঞা জন্মে। তিনি ডাক্তারীর মূল আয়ত্ত করিতে চাহিয়াছিলেন—কেবল এখানে-সেখানে ছুচারিটি হাতুড়ে ঔষধ আবিষ্কার করিয়া তৃপ্ত ছিলেন না। তাই তিনি ভ্রমণে বাহির হইলেন;—রুসিয়ার জঙ্গলে, তাতার নোমাড্‌দের মধ্যে,—নানা স্থানে নানা লোকের সঙ্গে গিয়া মিশিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন, "চাকরবাকর, ছোটলোক-বড়লোক, ওঝা, বুড়া স্ত্রীলোক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিয়া আমি জ্ঞানসঞ্চয় করিয়াছি।" শরীরে-মনে, কাজে-কর্ত্তব্যে, আশায় ভয়ে জড়াইয়া যে মানুষ, প্যারাসেল্‌সাস্ তাহারি মূল অবধি জানিয়া স্বাভাবিক উপায়ে চিকিৎসা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। আমাদের দেশের চিকিৎসকগণ ইহার অর্থ কতদূর বুঝিবেন জানি না, আধুনিক ইউরোপীয় ডাক্তারই বা কয়জনে বুঝেন! পরম-

শ্রদ্ধের ভক্তিপাত্র একজন অধ্যাপক সেদিন প্যারাসেল্‌সাসের কথায় বলিতেছিলেন, "বাস্তবিক আজকাল ডাক্তারীর এই একটা সমস্যা! এরূপ খণ্ডভাবে ডাক্তারীকে লইলে,—সমস্ত জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া না লইলে, কেবল 'ভিভিসেক্‌সন্'—জীবন্ত শরীরের ব্যবচ্ছেদ দ্বারা অগ্রসর হইতে চাহিলে ডাক্তারী কোনদিনও উন্নতিলাভ করিবে কি না, কে জানে!" ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, প্যারাসেল্‌সাসের মহত্ত্ব কোথায়! বাস্তবিক সমগ্র জীবনের দিকে দৃষ্টি অনেক লোকেরই নাই। প্যারাসেল্‌সাসের তাহা ছিল। তিনি মানব জীবনের মূল জানিয়া সমূলে রোগ উৎপাটিত করিবার ইচ্ছা করিয়া অশ্রান্ত উদ্যমে দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া আসিলেন; কিন্তু আশানুরূপ ফল হইল না, কতগুলি ঔষধ আবিষ্কার করিলেন মাত্র, শরীরও অনেকটা ভাঙিয়া পড়িল। 'ব্যালে'তে আসিয়া তিনি ডাক্তারীর অধ্যাপক হইলেন। স্বয়ং প্রকৃতির কাছ হইতে শেখা ঔষধগুলির শক্তিতে লোকে প্রথমটা চমৎকৃত হইল, প্যারাসেল্‌সাস্ কিন্তু ঔষধ-আবিষ্কারকে বড়-একটা-কিছু মনে করিতেন না—ছাত্রদের মনে তত্ত্বান্বেষণস্পৃহা উদ্রিক্ত করিবারই সমধিক চেষ্টা পাইতেন। একদিন কলেজের ভিতরেই 'অ্যাভিসেনা'র একটা গ্রন্থ তিনি পুড়াইয়া দিলেন। লোক সব ক্ষেপিয়া উঠিল, পাকা মাথা সব জড় হইল। প্যারাসেল্‌সাস্ 'পুরাণী' কবিজদের প্রতি অজস্র বিদ্রূপ প্রয়োগ করিতেন, তাহাতে বুড়া লোকদের অজ্ঞানপক মস্তকে ছুঁচ ফুটিত। তিনি 'অ্যাভিসেনা'র ঔষধগুলিকে 'kitchen medicine' বা 'রান্নাঘরের দাওয়াই' বলিয়া অভিহিত করিতেন এবং বলিতেন, "আমি 'পুরাণী'শিক্ষার ধার ধারি না—প্রকৃতির কাছে যাহা আমি নিজে শিখিয়াছি, তাহাই আমার অবলম্বন—প্রকৃতিই গ্রন্থ, ডাক্তার তাহার ব্যাখ্যাতা।" ক্রমে তাঁহার প্রতি কটূক্তিপূর্ণ ল্যাটিন্ কবিতা প্রতি পবিত্র চার্চ্চের দরজায় ঝুলিতে আরম্ভ করিল। প্যারাসেল্‌সাস্ অসহিষ্ণু ছিলেন,—তিনি মর্ম্মাহত ও ক্রুদ্ধ হইয়া এ কথা 'ব্যালে'র ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে জানাইলেন। তাহাতেও আবার বিদ্রূপ করিয়া তাঁহাদিগকে "প্রবল, মহান্ দৃঢ়, সম্মানিত, বিচক্ষণ, জ্ঞানী, সুশিক্ষিত, সদাশয় মহাশয়গণ"—এইরূপ সম্বোধন করিলেন। পবিত্র চার্চ্চের একজন পিতা প্যারাসেল্‌সাসের চিকিৎসায় রোগমুক্ত হইয়া টাকা দিতে চান না। ডাক্তার, ম্যাজিষ্ট্রেটদের নিকট অনুযোগ জানাইলেন, তাঁহারা কিন্তু পবিত্র চার্চ্চের বিরুদ্ধে হাত তুলিতে সাহস করিলেন না; বরং প্যারাসেল্‌সাসের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপরেই হাত পড়িবার উদ্যোগ হইল। প্যারাসেল্‌সাস্ তখন পলায়ন করিয়া কল্‌মারে গিয়া আশ্রয় লইলেন এবং সেখান হইতে ভিলাচে ও ভিলাচ্ হইতে ব্যাভেরিয়ার ডিউকের আহ্বানে তাঁহার সভায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু পরিশেষে কি কারণে ভাড়া-করা খুনীর হস্তে তাঁহার জীবনলীলার অবসান হয়। প্যারাসেল্‌সাস্ ৪৭বৎসরমাত্র জীবিত ছিলেন। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তিনি বন্ধুদের ও গরীবদের উইল করিয়া বিলাইয়া গিয়াছিলেন।

মালাবারী-সম্পাদিত 'প্রাচী ও প্রতীচী'

নামক মাসিকপত্র হইতে এ-বছরের এপ্রিল সংখ্যায় কুমারী আনা, এম্, ষ্টডার্টের লিখিত প্যারাসেল্‌সাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে উপরে সারোদ্ধার ও স্থানে স্থানে অনুবাদ করিয়া লইয়াছি—এখন তাঁহার দুটি কথা তুলিয়া প্যারাসেল্‌সাসের ইতিহাস ক্ষান্ত করি।

ষ্টডার্ট বলিতেছেন—

The nature of this great man was volcanic.·····God needed a volcanic nature to reform science just as He needed superlative courage to reform the Church. Paracelsus was to the one what Luther was to the other and by his friends was called "the other Luther".

প্যারাসেল্‌সাস্ লুথরের সমসাময়িক ছিলেন। ষ্টডার্টের প্রবন্ধের উপসংহারে আছে—

The man belonged to the whole world as much as did Socrates, Marcus Aurelius, Saint Francis in the West, as Buddha, Ramananda, Chaitanya in the East and it is time that West and East awoke to recognise his claim upon their gratitude.—কথাটা যদিও বিচার্য্য, তবু এটি নিশ্চয় যে, প্রাচী যদি জাগ্রিত, তাহার তৃষ্ণা যদি বলবতী হইত, আত্মপুষ্টির জন্য নানা দিগ্‌দেশ হইতে জীবনের রস আহরণ করা যদি তাহার অনিবার্য্য হইত, তবে হয় ত এখানেও আজ প্যারাসেল্‌সাসের ডাক পড়িত, তাঁহার Paragranum ভারতের ভাষায় অনূদিত হইত—কিন্তু তাহা কোথায়? যাই হোক, ইতিমধ্যে আমরা ররার্ট ব্রাউনিংএর হস্তে নিত্য-মানবলোকে উত্তোলিত প্যারাসেল্‌সাসের সার জীবন দেখিয়া একটি জীবনপূর্ণ শোণিতোষ্ণ কবিত্বের আস্বাদন করিয়া লই।

প্যারাসেল্‌সাস্ কাব্যখানি ৫ খণ্ডে বিভক্ত। প্রতি খণ্ডের উপরে একটি করিয়া নাম আছে।—

(১) "প্যারাসেল্‌সাসের আশার উদ্যম", (২) "প্যারাসেল্‌সাস্ পাইলেন", (৩) "প্যারাসেল্‌সাস্," (৪) "পুনরায় প্যারাসেল্‌সাসের আশার উদ্যম" এবং (৫) "প্যারাসেল্‌সাস্ পাইলেন"—ক্রমান্বয়ে এইরূপ পাঁচটি নামে খণ্ডগুলি চিহ্নিত।

প্রথম খণ্ডে প্যারাসেল্‌সাস্ তাঁহার বিরাট্ উদ্দেশ্য হৃদয়ে লইয়া অমিত উদ্যমে অনন্ত-রহস্যময় বিশ্বসংসারের দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছেন। তাঁহার বন্ধু ফেষ্টাস্ ও তৎপত্নী মাইকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় প্রথম খণ্ডে একদিকে প্যারাসেল্‌সাসের সেই অমিত উদ্যম, মনোরহস্যবিষয়ে তাঁহার গূঢ় দর্শন এবং প্রবল অনুসন্ধিৎসা—আর একদিকে সেই সহৃদয় সুন্দর বন্ধুদম্পতির শান্ত জীবন-প্রবাহ সম্যক্ ব্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে প্যারাসেল্‌সাস্ হতোদ্যম, ভগ্নহৃদয়,—কিন্তু প্রেমসার বা সৌন্দর্য্যসার ইটালীয় কবি 'অ্যাপ্রিলে'র সাক্ষাৎলাভে মানুষের ভাবরাজ্যে লব্ধদৃষ্টি। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে প্যারাসেল্‌সাস্ জীবনের গতি উল্টাইয়া দিতেছেন। পঞ্চম খণ্ডে মৃত্যুর ছায়ায় সহসা স্থির হইয়া প্যারাসেল্‌সাস্ আপনাকে সহজেই পাইতেছেন,—মানুষকে যে সব অজ্ঞানের ভূতে পাইয়া জীবনের একদেশে বসাইয়া রাখে

এবং সেই একদেশের অন্ধকারেই তাহার হাড় ভাঙিয়া জীবন অসম্পূর্ণ করিয়া দেয়—সেই সব ভূত প্যারাসেল্‌সাস্‌কে একেবারে ছাড়িয়া গেল, তিনি—

"Man's true purpose, path, and fate"

জানিতে পারিলেন—মৃত্যুর অন্ধকার সত্বেও আশার আনন্দগানে তাঁহার কণ্ঠ প্লাবিত হইয়া উঠিল।

ফেষ্টাস্‌ এবং মাইকল্‌ অল্পের মধ্যে সম্পূর্ণতার চিত্র। সুখে, দুঃখে, বিশ্বাসে, ভালবাসায়, কাজে, একটি ছোট জীবন কেমন করিয়া মধুর-গম্ভীর-ভাবে বহিয়া যায়, প্যারাসেল্‌সাসের ঝটিকাক্ষুব্ধ জীবনের পার্শ্বে, ফেষ্টাস্‌ এবং মাইকল্‌, তাহাই দেখাইয়া দিতেছেন। কবি অ্যাপ্রিলে একটি সম্পূর্ণ মানবজীবন হইতে ভাঙিয়া-লওয়া ভাবাংশ বই আর কিছুই নহে। সৌন্দর্য্য ও ভাব মানুষের মধ্যে কতদূর প্রসারিত হয় এবং কিরূপে বিধ্বস্ত হইয়া যায়, অ্যাপ্রিলে তাহারই চিত্র।

পাঠকপাঠিকা ধৈর্য্য ধরিয়া আগেই এই চরিত্রগুলির বিবরণ শুনিয়া লইলে,সবিস্তারে কাব্যখানির আলোচনাকালে সুবিধা হইবে এবং এই সংক্ষেপ বিবরণ ও সেই বিস্তারে উল্লেখ মিলাইয়া অবশেষে চরিত্রগুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বেশ মোটামুটি একরকম দাঁড়াইয়া যাইবে।

এখন বিস্তারে আলোচনায় অগ্রসর হইব। প্রথম খণ্ডে—

ওয়ার্জবার্গের একটি উদ্যানবেষ্টিত গৃহে বসিয়া ফেষ্টাস্‌, মাইকল্‌ এবং প্যারাসেল্‌সাস্‌ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। প্যারাসেল্‌সাস্‌ বিদায় লইতেছেন,—তিনি পৃথিবী-ভ্রমণে যাইবেন। অতি সুজন, সহৃদয় বন্ধু ফেষ্টাস্‌ এবং তাঁহার সহচরী মাইকল্‌—দুজনেই শঙ্কিতচিত্তে তাঁহাদের বন্ধুকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন। সময় সন্ধ্যা। সেই যে রাজ্যখানি—

This kingdom, limited
Alone by one old populous green wall,
Tenanted by the ever-busy flies,
Grey crickets, and shy lizards, and quick spiders,

হেথা এই রাজ্য হের, যার চারিধারে
একখানি জীবপূর্ণ-সবুজ প্রাচীর!—
চিরব্যস্ত মক্ষিকুল, ঝিঁঝি, গিরগিটি
নিত্য পলায়নপর, মাকড়সা আর
ক্ষিপ্র মূষিপুত্র—যত প্রজা হেথাকার!—

এই রাজ্যখানির সহিত সুসম্মিলিত-জীবন ফেষ্টাস্‌-দম্পতি কিছুতেই তাঁহাদের বন্ধুর আশার উদ্যমকে আয়ত্ত করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা কিছুতেই তাঁহার উন্মত্তদৃষ্টির বিরামস্থল দৃষ্টিপথে খুঁজিয়া পাইতেছেন না। তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাতে এক একটি করিয়া ধ্রুবতারা কি দৃষ্টিসীমায় জ্বলিতেছে?—প্রথমেই ফেষ্টাস্‌ বুঝিলেন, প্যারাসেল্‌সাস্‌কে ফিরান যাইবে না—তবু প্রীতি ও বিরামের দোহাই দিয়া বুঝাইলেন, ইহাদের মূল্য কম নয়—এইরূপে—

A solitary briar the bank puts forth
To save our swan's nest floating out to the sea.

তীর চাহে একখানি লতাবাহু দিয়া
রাখিতে সাগর হ'তে সারসের নীড়।—

তখন প্যারাসেল্‌সাস্‌ তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্যের কথা পাড়িলেন—তিনি ত শৈশবে কিছু বুঝিতেন না—এই বন্ধুর অন্তর্দৃষ্টি ও

উৎসাহের গুণেই ত তাঁহার আপনার শক্তি আপনার কাছে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে, এখন কি বলিয়া সেই বন্ধুই তাঁহাকে ফিরাইতে চান। আমরা ঈশ্বরের পথে থাকিতে চাই, তাহার প্রমাণ বুঝি এই যে, এমন ভাবে চলি, যাহাতে জগৎ নিরীশ্বর বলিয়া মনে হয়! এই যে বিরাট্‌ আশা, এই যে ঈশ্বরের দান, ইহাকে কি তবে মিথ্যা বলিয়া জানিতে হইবে?—তা ফেষ্টাস্‌ তাঁহার নিজের প্রদর্শিত পথ ছাড়িয়া দিউন; আমি যাহা প্রাণে ধ্রুব বলিয়া জানিয়াছি, তাহা কিছুতেই ছাড়িব না। ফেষ্টাস্‌ তখন শৈশব হইতে প্যারাসেল্‌সাসের জীবনের কথা বিবৃত করিতে লাগিলেন—কেমন করিয়া গ্রামের বিরাম বিশ্রাম হইতে দুই বন্ধু বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন—সকল ছাত্রের অপেক্ষা প্যারাসেল্‌সাস্‌ বুদ্ধিমত্তা দেখাইলেন, কিন্তু অচিরেই আবার অধ্যয়নে শৈথিল্য দেখাইতে লাগিলেন। শৈথিল্য আর কিছুই নহে, ঐ অল্প বয়সেই প্যারাসেল্‌সাস্‌ হৃদয়ের ভিতর এক মহাবিদ্যার আভাস পাইয়াছিলেন। বাস্তবিক অন্যান্য ছাত্রেরা যখন তাহাদের ক্ষুদ্র বিদ্যালাভ লইয়া আস্ফালন করিতেছিল, প্যারাসেল্‌সাস্‌ তখন একটা সমগ্র জ্ঞানের কথা ভাবিতেছিলেন। ফেষ্টাস্‌ সকলই জানেন, সকলই বুঝেন,—প্যারাসেল্‌সাসের অসাধারণত্ব তাঁহার অজ্ঞাত নহে, তিনি জানেন যে, তাঁহার মন—

—The secret of the world,
Of man, and man's true purpose, path, and fate:

জগতের মূল, আর মানবের মূল,
অর্থ তার, পন্থা তার, অদৃষ্ট তাহার—

জানিতে চাহিতেছে!—জানেন যে, ঈশ্বরের আহ্বানে তিনি উদ্বোধিত হইয়াছেন, মানুষের প্রীতি-নিন্দার সহিত তাঁহার সম্পর্ক নাই—কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, ঈশ্বর যেমন ডাকিতেছেন, তিনি কি তেমনি পথও বলিয়া দিতেছেন? বাস্তবিক প্যারাসেল্‌সাস্‌ তাঁহার একটা ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা, একটা গভীর আশাতেই পাগল হইয়াছেন, প্রকৃত উদ্দেশ্য নিভিয়া গিয়া প্যারাসেল্‌সাসের আশাই জ্বলিয়া উঠিয়াছে—তাহা না হইলে পাহাড়ে, বনে, সাগরে, অসভ্য বর্ব্বরের মধ্যে, যাইবার কি প্রয়োজন?—এখানে বসিয়াও ত জ্ঞানলাভ করা যাইতে পারিত, কত লোক ত তা' করিয়াও গিয়াছে! তাহাদের অসম্পূর্ণ কার্য্য লইয়া প্যারাসেল্‌সাস্‌ কেন তাহাদের পথেই যান না!—

What books are in the desert? writes the sea
The secrets of her yearning in vast caves?

মরুভূমে কোন্ গ্রন্থ আছে? অম্বুনিধি
আকুলরহস্য তার লেখে কি গুহায়?

মানুষের মধ্যে, মানুষের সুখ-দুঃখ-প্রীতির মধ্যে, মানুষের ভুলভ্রান্তির উপর আলো জ্বালাইয়া এখানেই প্যারাসেল্‌সাস্‌ বাস করুন, এখানেই জ্ঞানলাভ হইতে পারিবে।

প্যারাসেল্‌সাস্‌ বলিলেন—"না, অনেক অবিশ্বাস, অনেক সন্দেহ, অনেক যন্ত্রণা-পীড়নের পর ধ্রুবসত্য আমার প্রাণে প্রতিভাত হইয়াছে—ইহাকে কখনই ভুল বলিয়া ত্যাগ করা যায় না। বিপথে যাইতে কি ভয়? মানুষের দুর্ব্বলতা আছে বলিয়াই ত আরও দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত স্বকার্য্যে নিযুক্ত হওয়া তাহার উচিত। মানুষের প্রীতি-নিন্দা-

প্রশংসার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই—আমার নৌকা কখনো সোণা এবং বানর দুয়েরই আহরণে যাইবে না—আমি পৃথিবীর পথরেখাহীন অরণ্যপ্রান্তরে উড়িয়া যাইব। বিহঙ্গ যেমন পথচিহ্নহীন আকাশে পথ দেখিতে পায়, আমিও তেমনি আমার পথ দেখিতে পাইতেছি। 'পুরাণী' জ্ঞানীদের অবহেলা করিতে কি দোষ? অনেকদিন পৃথিবী ত পুরাণ পথে গিয়াছে—কই তাহার বন্ধনরজ্জুর একগাছিও ত ছিঁড়ে নাই?—এখন সময় হইয়াছে, নূতন আলো আসুক!—আর, সত্য কাহারও কাছ হইতে শিখিবার জো নাই, সত্য নিজের মধ্যে—

সত্যজ্যোতি অন্তরমাঝারে—নাহি আসে
বাহিরের কোনো কিছু হ'তে সত্য-আলো!
সবাকার মাঝে আছে কেন্দ্র সঙ্গোপন,
যেথা সত্য বিভাসিত পরিপূর্ণরূপে—
তারে ঘেরি চারিধারে, প্রাচীরের পর
প্রাচীরের মত, নাসপিণ্ড মূঢ়-জড়
পূর্ণজ্ঞানে রেখেছে ঘিরিয়া চিরদিন!
বিক্ষেপী বিথাতী এই মূঢ়-জড় জাল
অন্ধ করি তারে, সব করে ভ্রান্তিময়।
জানা শুধু এই বদ্ধ অন্তর্জ্যোতিরেখা
বাহির করিয়া আনা পথ মুক্ত করি'—
প্রবেশ করানো নহে বাহিরের আলো।

আর জগতে বর্ব্বরে-বিজেই বা তফাৎ কি? একপরদা বেশী আবরণে বর্ব্বর, একপরদা বেশী উন্মোচনে অবর্ব্বর! কত অদ্ভুত রূপে এই অন্তর্জ্যোতির বিকাশ হয়—তাহার নিয়ম কে জানে! হয় ত সুস্থ অবস্থায় একজন মূর্খ, কিন্তু উন্মাদগ্রস্ত হইতেই তাহার অন্তরের জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইল—তাহার প্রলাপবাক্য হইতে তাহার অন্তরসঞ্চিত মহত্ত্বের পরিচয় পাইলে। সেই বিচিত্রক্রিয়াময় মানুষের মূল একবার জানিব, তাহার মহত্ত্ব একবার অনুমান করিব। হে ঈশ্বর, আর দানবের সৃষ্টি করিও না, মানবজাতিটাকে একবার তুলিয়া দাও। মানুষ হইতে তফাৎ করিয়া আমি কোন গান্ধর্ব্বজগতের কল্পনা করিতেছি না। সেরূপ অনেকে করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমি মানুষকেই রাজমুকুট পরাইব।"

"তাই বলিয়া আমাকে এখানকার এই ক্ষুদ্র প্রেমপ্রীতিতে বদ্ধ হইয়া থাকিতে বলিও না। মূলজ্ঞান লাভ হইয়া গেলে,—আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া গেলে, তখন প্রীতিপ্রেম প্রবল হইবার অবসর পাইবে—ওই যে সেন্-নদী ছুটিয়া চলিয়াছে, উহার তলদেশে যেমন নানা খনিজ নুড়ী গোপনে চলিয়াছে, আমারও এই উদ্দেশ্যের নিম্নে সঙ্গোপনে তেমনি প্রীতিপ্রেমসুখ আজ সুপ্ত রহিয়াছে।"

এইখানেই ত শরীরবীজ!—এই যে প্রীতিপ্রেমের অনুশীলন অবহেলা করিয়া জ্ঞান অন্বেষণ করিতে যাওয়া, এইখানেই প্যারাসেল্‌সাসের বিনাশবীজ নিহিত আছে। তবু প্যারাসেল্‌সাস্ যে মানুষ, প্রীতিপ্রেমের তাঁহারও যে প্রয়োজন, মানুষের অনুমোদন যে তাঁহার উৎসাহেও জোর দেয়—তাহা দেখাই যাইতেছে। ফেঠাস্‌কে যুক্তিতর্কে স্বমতে আনিয়া বিদায়কালে অবশেষে প্যারাসেল্‌সাস্ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"তোমার কি মনে হয় আমার সিদ্ধিলাভ হইবে?"—ফেঠাস্ নিজের শক্তি জানেন, এবং প্রেম-

বলে আনন্দে জাগিয়া প্যারাসেল্‌সাসের আশার উচ্চচূড়াও দেখিয়া লইতে সমর্থ, তাই তিনি বলিতেছেন, "হাঁ, নিশ্চয় মনে করি।"—তখন প্যারাসেল্‌সাস্ আনন্দস্বরে বলিয়া উঠিলেন—

"ফেঠাস্, ডুবুরীর সাহসিক অধ্যবসায়ে কি দুইটি মুহূর্ত্ত নাই? একটি—যখন দারিদ্র্যে সে ডুব দিতে যায়, আর-একটি—যখন সে রাজপুত্রের মত মুক্তা লইয়া উঠিয়া পড়ে?" এইরূপ একটি বিরাট্ আশার আনন্দেই প্রথমখণ্ড সমাপ্ত।

নয়-বছর পরে দ্বিতীয় অঙ্কে দেখিতে পাই, কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে প্যারাসেল্‌সাস্ এক গ্রীসীয় দৈবজ্ঞের ভবনে উপস্থিত। কোথায় সেই জলন্ত ললাট! কোথায় সেই বিদ্যুৎপূর্ণ চক্ষু! কুহেলীবাষ্পের আড়ালে পশ্চিমে সূর্য্য ডুবিয়া যাইতেছে, দূরে নগরের হর্ম্ম্যচূড়াগুলি কালো হইয়া আসিতেছে—প্যারাসেল্‌সাস্ দাঁড়াইয়া অদৃষ্টগণনা করিতেছেন—অতীতের পর্য্যালোচনা করিতেছেন। এই নয় বৎসরের অস্থিচূর্ণকারী পরিশ্রমের ফল কি হইল?—মানবজীবনের মূল আরম্ভেও যাহা জানা ছিল, আজো তাই! এতদিনের পরিশ্রমে প্যারাসেল্‌সাস্ কয়েকটি ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন মাত্র! সেই গূঢ়দর্শী চক্ষুষ্মত্তার এই কি পরিণাম!—আজ প্যারাসেল্‌সাস্ দৈবজ্ঞের কাছে আপনার অদৃষ্ট জানিতে আসিয়াছেন। দৈবজ্ঞ অদৃষ্টজ্ঞানপ্রার্থী কতগুলি লোককে তাহাদের পূর্ব্বজীবনের সমস্ত সাধনা ও সিদ্ধির বিবরণ লিখিয়া দিতে বলিয়াছে—সে তাহা হইতে তাহাদের ভবিষ্যৎ বলিয়া দিবে। আজ সেই মূঢ় লোকগুলির লেখার পার্শ্বে প্যারাসেল্‌সাসের লেখাও দেখা যাইতেছে। প্যারাসেল্‌সাস্ আজ বুঝিয়াছেন, "সময় বহিয়া যায়" এ কথার অর্থ কি? জীবনসম্বন্ধে প্যারাসেল্‌সাস্ কি লিখিয়াছেন? পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখা গেল, লেখা রহিয়াছে—"সময় বহিয়া যায়, যৌবন চলিয়া যায়, জীবন স্বপ্নমাত্র—কালের এই অবিরাম ধ্বনি। যত লোক জন্মিয়াছে, সবাই এ কথা শুনিয়াছে এবং বলিয়াছে। তবু, ঋতুর পর ঋতু আসে-যায়, মানুষ হাসিয়া-খেলিয়া সময় কাটায়—হঠাৎ একটা মুহূর্ত্ত আসে, যখন চকিতে কথাটার অর্থ পরিষ্কার হইয়া যায়—এবং সেই মুহূর্ত্ত হইতে চিরকাল তাহার কুঞ্চিত ললাট, তাহার নিষ্প্রভ চক্ষু বলিয়া দিতে থাকে যে, ঐ প্রবাদবাক্যটির অর্থ সত্যসত্যই সে বুঝিয়াছে।"—এইরূপে প্যারাসেল্‌সাস্ তাঁহার সাধনা ও সিদ্ধির মোট শিক্ষাটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে একটা পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কি বাকী আছে, তাহাই তিনি একবার জানিতে চান। এত পরিশ্রম—তাহাও প্রায় বৃথা হইল—ইহার পর তাঁহার চিত্ত আজ বিরাম চাহে। "শান্ত এ জীবনে মোর আসুক নিশীথকাল" বলিয়া চিত্ত ক্রন্দন করিতেছে—

"Rest!
.....this throbbing brow
To cease—this beating heart to cease—
its crowd
Of gnawing thoughts to cease!"——
"বিরাম! বিরাম পেতাম, যদি
এ ব্যথিত ললাটের থামিত কম্পন!
থা মত হৃদয়ঘাত!—থেমে যেত যদি
হৃদয়দংশনকারী চিন্তারাশি মোর!"

"আজ একবার বাঁচিতে চাই! আর এ আশা-ভয়ের আন্দোলনে ঘূর্ণ্যমান হইয়া থাকিতে পারি না। সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশিয়া সাধারণ হইয়া যাই! কেন এ পতন? কেন কিছু হইল না? যাক্, আমার কাজ ত আমি করিয়াছি। আমি ত জ্ঞানের পথে নিরন্তর চলিতে আলস্য করি নাই। এই সামান্য হৃদয়বেদনা আজ আমাকে পরাভূত করিবে কি? যে জন পৃথিবীর গুপ্ত-মন্দিরে জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিমার জ্যোতি চক্ষে রাখিয়া সমস্ত প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, সে কি অবশেষে ভূতের আরক্ত চক্ষু দেখিয়া ভয়ে ঘুরিয়া পড়িবে? কখনো নয়! এই দেখ, অন্ধকার-মন্দিরদ্বারে সে তাহার মস্তকাবরণ উন্মোচন করিয়া মাথা পাতিয়া দাঁড়াইয়াছে—সে যদি জয়লাভ করিয়া পৌরোহিত্যে বৃত হয়, ভাল—না হয়, সে দেবরোষে দগ্ধ, ভস্মীভূত হইয়া যাউক—সে-ও ভাল। সফলতা-বিফলতা আমার কি করিবে? আমি ত সেই এক প্রেরণার দ্বারা হৃদয়ের আর সব বাঞ্ছাকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছি—জীবনের আর-সব সুখ জ্ঞানের জন্য বিসর্জ্জন করিয়াছি! এ জীবনেও একদিন ত প্রেম ছিল! যাক্, ভালই হইয়াছে। প্রেমপ্রীতির চর্চ্চার দিকে গেলে, হয় ত প্রবৃত্তির কলুষে যৌবন পঙ্কিল হইয়া যাইত! (প্যারাসেল্‌সাস্ প্রেমকে এইরূপেই জানিতেন বটে!) যা হোক্, আমার সমস্ত জীবনটা একটা দিনের মত একটা লক্ষ্যের আলোকে দীপ্ত হইয়া রহিয়াছে। জীবন, মৃত্যু, আলো, অন্ধকার, জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ, সর্ব্বত্রই আমি জ্ঞানকে খুঁজিয়াছি। একটি ক্ষুদ্র সত্যের আভাসে, আমি বায়ুত্রস্ত-দেবদারুর অন্ধকারে আবৃত গিরিপার্শ্ব হইতে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া, তাহার অনিশ্চিত কম্পিত দীপ্তির অনুসরণে অলক্ত যারের অসীম শূন্যবিস্তারে ধাইয়া গিয়াছি অবশেষে খুনিজের শিরা-উপশিরা-ছড়ানো আকরমধ্যে বহ্নির আবরণে ঢাকা আমার তরল সত্যস্বর্ণের সাক্ষাৎ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত বিস্ময়, বস্ত্রের মত দুধারে খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে,—আমি ভিতরের পঞ্জরটি-দৃঢ় সত্যের আকারটি দেখিয়া তৃপ্ত হইয়াছি। সুখ-সৌন্দর্য্যের তীর হইতে, আমার এ তরঙ্গাকুল সমুদ্রে কতদূর আসিয়া পড়িলাম! এ সমুদ্রে লাভ যাই হোক্, ঐ তীরেও ত একটি মধুর সূর্য্য সমুদিত হইয়া আছে—কিন্তু এ সমুদ্রে একি ভীষণতা—কেবল সুগভীর জলতল হইতে একটা ভয়ঙ্কর রশ্মি উপরের দিকে ছুটিয়া উঠিতেছে। Oh, bitter; very bitter!

যদি আবিষ্কৃত ঔষধখণ্ডগুলির মধ্যেও কোন একটা অলৌকিক ভেল্‌ক পাওয়া যাইত—এক-ফোঁটা শক্তি, যাহার বলে বৃদ্ধের বলিত চর্ম্মে যৌবনের লাবণ্য সঞ্চার করা যাইত—একটা কৌশল, যাহাতে সোণা তৈয়ার করা যাইত—একটা আকর্ষণ, যাহাতে চন্দ্ররশ্মি সংহত করিয়া শতধার প্রবাল রচনা করা যাইত!—কেবল আজ তাহা সক্রোধে দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রবলভাবে আমার পবিত্র জ্ঞানান্বেষণস্পৃহা প্রতিপন্ন করিতাম। যাক্, গিয়াছে যাক্! প্রাণ কেন শান্ত হয় না যে, যদি আমার চেষ্টা

বিফল হইল ত আর একজনের চেষ্টা সফল হইবে—মানবজাতির উন্নতি হইলেই হইল।"

কিন্তু প্যারাসেল্‌সাস্ আপনাকে অতটা ত্যাগ করিতে শিখেন নাই—অতটা আশা ও নির্ভর তাঁহার অভ্যস্ত নহে—তাই কথাটা মনে আসিবামাত্র প্রাণের মধ্যে এমন একটা ক্রোধ হুঙ্কার দিয়া উঠিল যে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসাধ্য—কেবল কয়েকটা তিক্ত কথায় প্যারাসেল্‌সাস্ তাহা চাপিয়া রাখিতে চাহিলেন—

O God, the despicable heart of us!
Shut out this hideous mockery from my heart!

হা ঈশ্বর! কি ঘৃণিত মানবহৃদয়!
এ কুৎসিত পরিহাস ঢাক হৃদি হ'তে!

এই-ই বটে প্যারাসেল্‌সাসের হৃদয়!—

অন্তঃপর "অরিওল" তীব্রভাবে অনুতাপ করিতেছেন যে, সমগ্র জ্ঞান তাঁহার লক্ষ্য হইয়াছিল। তার ফল ত একেবারে জয় বা একেবারে সর্ব্বনাশ! সাধারণভাবে থাকিয়া দুটা-চারটে ঔষধের অনুসন্ধানে ফিরিলে, তাহাও পাওয়া যাইত—পাওয়া যাক্ আর না যাক্, অনেকটা শক্তি-সামর্থ্য-স্বাস্থ্য অবশিষ্ট থাকিতই—কিন্তু অত-বড় উদ্দেশ্য বলিয়া প্রাণপণে যৌবনের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া লাভ ত হইল এই ক'টি ঔষধ, অথচ তাহাদের ব্যবহারে লাগাইবার মত শক্তিটুকুও আজ অবশিষ্ট নাই।

"যা হোক"—প্যারাসেল্‌সাস্ আত্মপ্রবোধ করিতেছেন—"যা হোক, তবু সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিয়া একটা আলোকের অপেক্ষায় থাকা একটা কাজ বটে। কিন্তু আলো কোথায়? তবে কি ভুল হইয়াছিল? আমি যখন যুবা ছিলাম, তখন স্বপ্নরাজ্যচারিণী কে একজন আমার কাছে নিঃশব্দে যাতায়াত করিত—হৃদয় ভীত, ব্যথিত হইলে তাহার কোমল উরুমূলে আমার মাথা তুলিয়া লইত—তাহার সেই সিক্তকেশের স্পর্শ, তাহার সুচতুর আশ্বাসবাণী সকলই কি তবে মিথ্যা! তাহার প্রেরণায় স্বপ্ন দূর করিয়া দিয়া আমি কি মরণকে আহ্বান করিলাম! একি ভ্রান্তি! একি সন্দেহ! একি অবিশ্বাস! তবে কি মতিচ্ছন্ন হইলাম! হে ঈশ্বর, তুমি চিন্ময়, আমার চিৎকে অন্তত রক্ষা কর—আমাকে উন্মত্ত, উদ্‌ভ্রান্ত হইতে দিও না—আমার সব বিফল হোক্, তবু যেন ধ্রুবই জানিতে পারি—তোমারি আহ্বান শুনিয়া, তোমারি কার্য্যে ছুটিয়া গিয়াছিলাম। আর কিছু চাই না, নূতন কিছুই চাই না—অন্তত একঘণ্টার জন্য আমার যৌবনের শক্তি ফিরাইয়া দাও, একবার মাথা তুলিয়া দেখিয়া লই এতদিন কি করিলাম,—আবিষ্কৃত সত্যগুলি হইতে যদি একটা-কিছু খাড়া করিয়া তুলিতে পারি।"

"যাক্,—যাক্, তথাপি ঈশ্বর মঙ্গলময়! আমি বটে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছি, কিন্তু কাননে-প্রান্তরে বসন্তরচনা কাহার? যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সংস্কারও করিতে পারেন। আমি অতীতের নিষ্ফলবৎ প্রতীয়মান চেষ্টাগুলির ফলে হয় ত কোন আশ্চর্য্য পুরস্কার লাভ করিব। আমি কি দোষ করিয়াছি,—কেন শাস্তি পাইব?"—তবেই দেখা যাইতেছে, প্যারাসেল্‌সাস

এখনো তাঁহার অভাব বুঝিতে পারেন নাই। কোন্ মানুষই বা পারিয়াছে? মনুষ্য-বুদ্ধির কি ক্ষুদ্রতা, অথচ জগতের কি কঠিন নিয়ম!

যে খণ্ড আলোচিত হইতেছে, সেই দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 'প্যারাসেল্‌সাস্ পাইলেন'। এইবার দেখিব—প্যারাসেল্‌সাস্ কি পাইলেন!

সন্ধ্যায় প্যারাসেল্‌সাস্ যখন উপরোক্তরূপে বিলাপ করিতেছিলেন, তখন সেই ভাবমাত্র মানুষটি আসিয়া উপস্থিত। এই সৌন্দর্য্যসর্ব্বস্ব কবি প্যারাসেল্‌সাসের বিপরীতে একদেশে ছিন্নভিন্ন হইয়া উন্মাদগ্রস্ত। ভগ্নজীবনের গান গাহিতে গাহিতে ইটালীয় কবি অ্যাপ্রিলে আসিয়া উপস্থিত। অ্যাপ্রিলে গানে জানাইতেছেন যে, তিনি ভ্রষ্ট কবিদের গান শুনিতেছেন। এই কবিদিগকে ঈশ্বর শক্তি দিয়া ধরণী উদ্ধার করিতে পাঠাইয়াছিলেন—তাহারা কিছুই করে নাই। এখন তাহারা ছায়াদেহ লইয়া শূন্যে বিচরণ করিতেছে। দেখিতেছে, কোথায় কে নূতন কবি জাগে—তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে। অ্যাপ্রিলেও ঈশ্বরের দানে ঐশ্বর্য্যান্বিত একজন কবি। প্রকৃতির স্বহস্তসজ্জিত ইটালীতে তাঁহার জন্মভূমি বাছিয়া দেওয়া হইয়াছিল—তাঁহার জন্মকালে ছায়াকবিগণ আশার উৎসবে মাতিয়াছিল। ছায়াকবিগণ অন্ধকারে যাতায়াত করিয়া অ্যাপ্রিলেকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু অন্ধ অ্যাপ্রিলে তাহাদের সঙ্কেত বুঝিতে পারেন নাই। ধরণী তেমনি শৃঙ্খলিতা রহিল!—হা কষ্ট!—

Anguish! ever and for ever;
Still beginning, ending never!

অ্যাপ্রিলের জীবনও বিফল হইল। তাই তিনি আজ ভ্রষ্টকবিদের শূন্যচারী ছায়া-মণ্ডলীমধ্যে স্থান লইতে আহূত হইতেছেন।

অ্যাপ্রিলে প্যারাসেল্‌সাসকে দেখিয়া ভাবিলেন, এইবার তবে পূর্ণ কবি আসিয়াছেন—এইবার তবে ভাবচর্চ্চার সঙ্গে কর্ম্মপটুত্ব মিলিত হইয়াছে—অ্যাপ্রিলে পাগলের মত গিয়া যেন প্যারাসেল্‌সাসের পদতলে আপনাকে লুটাইয়া দিতে লাগিলেন। ঐ যে অ্যাপ্রিলে সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়াছেন—অস্তকালের কনকরশ্মিশলাকাগুলি অ্যাপ্রিলের কনককেশরাশির সহিত মিলিয়া যাইতেছে। ব্যথাপূর্ণ বিফল আপীড়নে বিকৃত ললাট-ভ্রূর নিম্নদেশে থাকিয়াও তাঁহার দুঃখপূর্ণ সুনীল চক্ষুতারকাদুটি মুক্তপ্রায় হইয়া কোন্ মায়ালোকের অভিমুখে উড়িয়া যাইতে চায়। ধীরগতি নৈরাশ্যের অনন্ত দীর্ঘশ্বাসে দৃঢ়সংবদ্ধ তাঁহার ওষ্ঠাধর জোর করিয়া কোন্ কঠোর কথা শিখাইতে আইসে! প্যারাসেল্‌সাস্ যতই কৌতূহলে এই উন্মত্তের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন, কিছুতেই তাঁহার কথা বুঝিতে পারিতেছেন না। প্যারাসেল্‌সাসের অসঙ্গত প্রশ্ন-প্রতিবাদের পরে অ্যাপ্রিলে তাঁহার ভারাক্রান্ত হৃদয় হইতে একটি সৌন্দর্য্যসার জীবনের বিপুল ইতিহাস এবং কর্ম্মপটুত্বাভাবে তাহার নিষ্ফলতার দুঃখগান বাহির করিয়া দিলেন।—এই কবি পৃথিবীর সমস্ত পদার্থ হইতে মনের ভিতর একটি সৌন্দর্য্যের ছাপ লইতেন

এবং শিল্পে তাহা ব্যক্ত করিতে চাহিতেন। সমস্ত আকার এবং বর্ণের সৌন্দর্য্য আয়ত্ত করিয়া শেষে হর্ষ-ব্যথা-আশা-আকাঙ্ক্ষা-কল্পনার সৌন্দর্য্য ভাষায় ফুটাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বহুধা-সম্বদ্ধ শব্দস্তূপে এইরূপে জীবনের সহজজ্ঞেয় সৌন্দর্য্যকথা জানাইয়া অবশেষে শব্দের ছেদে ছেদে, দুটি তারার মাঝখানকার প্রভাবন্ধনের ন্যায় সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল নিখসিয়া দিয়া, অন্তরের গভীর অনুভাবরাশি অন্তঃপ্রবাহিত করিয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। অ্যাপ্রিলে তাঁহার কবিজীবন এইরূপে সম্পূর্ণ করিবার সঙ্কল্প করেন—

Preserving through my course
God full on me, as I was full on men.
সারাপথ জগদীশজ্যোতি প্রাণে ভরি
পূর্ণ হ'য়ে ধরা'পর উদিব সুন্দর।

কিন্তু এত-বড় কাজের উপযুক্ত শক্তি মানবের কোথায়? অ্যাপ্রিলে শীঘ্রই ধরণীমণ্ডলে প্রাপ্য যন্ত্রাদির ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতা দেখিতে পাইলেন। শেলীর মত অ্যাপ্রিলের তরণী এই বাস্তবরাজ্যের অরণ্যময় অসভ্যের দ্বীপে ঠেকিয়া ভাঙিয়া গেল। এই ক্ষুদ্র সংসারে কেমন করিয়া অ্যাপ্রিলে তাঁহার মানসরাজ্যের অপূর্ব্বপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবেন?—যা হোক্, এ দ্বীপে যাহা পাওয়া যায়, তাহা লইয়াই কাজ করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই তালবৃক্ষরাজিই মর্ম্মরস্তম্ভের কাজ করিবে,—এই পক্ষীর পালক, সাপের নির্ম্মোক, মাছের শল্ক—এই সব লইয়াই, যেমন করিয়া হোক্, একটি গঠন খাড়া করিতে হইবে। তবে এমনি করিয়া সাজান যাক্ যে, লোক চমৎকৃত হইয়া বলিতে থাকে—"এ এদেশের কারিকর নহে, এ যে নন্দনের কারিকর!" পৃথিবীর হীন সরঞ্জামে বিন্যাসের অপূর্ব্ব চমৎকারিত্ব দেখাইয়া যদি তাহার মধ্যে তাঁহার মনোরাজ্যের কোন লতাপুষ্পপত্রের সমাবেশ করিতে পারা যায়, তবে তিনি সবাইকে ডাকিয়া বলিবেন—"দেখ দেখ বন্ধুগণ,—কপোতসঙ্কুলিত কত পাহাড়, অপূর্ব্ববৃক্ষাচ্ছাদিত কত রক্তবর্ণ মৃৎস্তূপ, কত চক্ষুপীড়ক ক্ষীরধবল সূক্ষ্ম বালুকারাশির বিস্তার অতিক্রম করিয়া আমি এক চমৎকার চন্দ্রালোকিত প্রান্তরে গিয়া পৌঁছিয়াছিলাম;—সেথায় অধীর হইয়া আমি এই লতাপত্রমুকুল সংগ্রহ করিয়াছি। আমার কাছে ইহাদের রমণীয়তা অল্প, কারণ ইহাদের মনোরম জন্মস্থানে আমি ইহাদিগকে দেখিয়াছি; তোমরা লও, ইহা জড়াইয়া মাথায় পর এবং ইহাদের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কল্পনা করিতে থাক—কোন্ নির্ঝরজল ইহাদের অঙ্গে সিঞ্চিত হইয়াছে, কিরূপ তারকা প্রতিরজনীতে ইহাদের শিরে জ্যোতি কম্পিত করিয়াছে, কোন্ সর্পশিশুগণ বহুদূর হইতে আসিয়া ইহাদের অন্তরসঞ্চিত শিশিরজল পান করিয়া পলাইয়া গিয়াছে।"—তার পরে অ্যাপ্রিলে ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষাকেও যথাসাধ্য ভাষাদান করিবেন ভাবিয়াছিলেন—কিন্তু হা কষ্ট!—এ সব কিছুই হয় নাই। কারণ তাঁহার ভাবরাশিকে তিনি আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। অত্যুজ্জ্বল কল্পনামূর্ত্তিগুলি তাঁহার মনোনেত্র ঝল্‌সাইয়া দিয়াছে। একটি-

কোন মূর্ত্তিকে ধরিতে গেলেই অবশিষ্টগুলির স্মৃতি কুহেলীবাষ্পের মত আসিয়া তাঁহার চক্ষু অন্ধ করিয়া দেয়—পর্ব্বতপ্রান্তপথে ঝঞ্ঝাহত লোকটির মত তাঁহাকে অজস্রবৃষ্টি করকাজালের দুর্ধ্বপ্রবাহ আসিয়া কোথায় ছুটাইয়া লইয়া যায়!—অ্যাপ্রিলে কিছু করিতে পারেন নাই, কিন্তু করিতে যে পারেন নাই, তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল নাকি?—এইরূপ ঝঞ্ঝাকে কে আয়ত্ত করিতে পারে?—এইরূপে কাতরক্রন্দনে বিলাপ করিতে করিতে অ্যাপ্রিলে ঘুরিয়া-লুঠিয়া প্যারাসেল্‌সাসের গায়ের উপর পড়িয়া যাইতেছেন। এইবার প্যারাসেল্‌সাস্ স্তম্ভিত হইলেন। হঠাৎ তাঁহার চক্ষে এক বিশাল জগতের দ্বার উন্মুক্ত হইল। তিনি জগতের মূল জানিতে গিয়া, শক্তির অভিমুখে ছুটিয়া মানবজীবনের শ্যামল ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ কোন্ এক বিপুল প্রান্তরে আদৌ পদার্পণ করেন নাই—তিনি এতদিন কেবল একটা শিলাকঙ্করময় বিদীর্ণ মরুমধ্যে প্রেতবৎ কি খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন। আজ তিনি কাতর হইয়া বলিতেছেন—

"We are weak dust. Nay, clasp not, or I faint!"

গভীর রাত্রির অন্ধকার! অন্ধকারে দুইটি ভগ্ন জগৎ পরস্পরের বুকে পড়িয়া এক হইয়া যাইতে চায়! অ্যাপ্রিলে বলিতেছেন—"হাঁ, এখন আমি স্পষ্টই দেখিতেছি—পরমেশ্বরই একমাত্র পরিপূর্ণ কবি। তিনি তাঁহার বিভাবনারাশি বহুবিচিত্র সৃষ্টিতে গড়িয়া তুলিতেছেন। মানুষও ঈশ্বরের সমান হইতে চায়। মানুষের দুর্ব্বলতাতেও গৌরব। কারণ দুর্ব্বলতার মধ্যেও শক্তি আবির্ভূত হইয়া মানুষকে ঈশ্বরসদনে উত্তোলন করে। আর ঈশ্বরের গৌরব তাঁহার অনন্ত শক্তি। এই শক্তিবলেই মানুষের দুর্ব্বলতাকেও তিনি ভালবাসিয়া তাহারি সমান হইয়া অবক্রীর্ণ হইতে পারেন—হায়, আগে যদি জানিতাম!" অন্ধকার গভীরতর হইল। প্যারাসেল্‌সাসের ভয়হৃদয়ে লুটাইয়া পড়িয়া, অ্যাপ্রিলে তাঁহার ব্যর্থ জীবন শেষ করিলেন।

"Give me thy spirit, at least! Let me love too?"

এই বলিয়া প্যারাসেল্‌সাস্ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। আমরাও দেখিয়া লইলাম—প্যারাসেল্‌সাস্ কি পাইলেন।

(আগামী বারে সমাপ্য।)

অবকাশ।

আজ করিব না আমি মান-অভিমান;
হিসাবের খাতা খুলে আদানপ্রদান
লইব না বুঝে, শুধু আর একবার
করিব পরাণ ভরি স্মরণ তোমার!

আলোচনা।

দুর্ভিক্ষের মূল কারণ।

সুবিখ্যাত পর্য্যটক প্যাল্‌গ্রেভ্ তাঁহার 'য়ুলিসিস্'-নামক গ্রন্থে ফিলিপাইন্-দ্বীপপুঞ্জে দুর্ভিক্ষের অভাবসম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা লিখিয়াছেন, তাহা ভারতবর্ষীয় পাঠকের পক্ষে বিশেষ ঔৎসুক্যজনক হইবে। নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রকাশ করা যাইতেছে।

প্যাল্‌গ্রেভ্ যখনকার কথা লিখিতেছেন, তখন স্প্যানিয়ার্ডগণ সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষ ছিল—অ্যামেরিকার সঙ্গে লড়াই বাধে নাই।

অধিকাংশ গ্রীষ্মপ্রধান য়ুরোপীয় উপনিবেশে, শাসনকার্য্য এবং বাণিজ্যভার, দুইই য়ুরোপীয়ের হাতে থাকে—দেশী লোকের কেবল মজুরী সার। কিন্তু ফিলিপাইন্-দ্বীপপুঞ্জে স্প্যানিয়ার্ডগণ শাসন করিয়াই সন্তুষ্ট—বাণিজ্য এবং মজুরের কাজ, দুইই দেশী লোকের হাতে আছে।

কম-বেশ আশী-হাজার লোক এই সকল দ্বীপে বাস্ করে—এবং প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় ভাতই ইহাদের প্রধান খাদ্য। ভাতই যে সকল দেশের খোরাক, সেখানে দুর্ভিক্ষের কিরূপ অবিরলতা এবং দারুণ প্রকোপ, তাহা মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, বাংলা ও সিংহলের ইতিহাসে বারবার দেখা গিয়াছে। মনে হয় যেন সে উৎপাত পূর্ব্বে হইতে ঠেকান যায় না, এবং তাহার কোন প্রতিকারও নাই। তথাপি ফিলিপাইন্-দ্বীপপুঞ্জে দুর্ভিক্ষ দূরে থাক্, অন্নকষ্টও প্রায় ঘটে না। অত্যন্ত দুর্বৎসরেও সেখানে অন্যত্র হইতে এক-বস্তা শস্যও আমদানি করিতে হয় না। এবং সাধারণত দেশের ছেলেদের জন্য দেশে অন্ন যথেষ্ট থাকিয়াও উদ্বৃত্ত থাকে। এ ছাড়া, এখান হইতে বৎসর-বৎসর চিনি, কফি, শণ, তামাক প্রভৃতি যাহা রপ্তানি হয়, তাহার মূল্য চল্লিশ হইতে ষাট হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। "আমাদের নিজেদের জন্য যথেষ্ট এবং তদতিরিক্ত আমাদের প্রতিবেশীর জন্য" ইহাই এই উপনিবেশের সাধারণ চলিত কথা। অন্য কয়টা য়ুরোপীয় উপনিবেশ সম্বন্ধে এমন কথা বলা যাইতে পারে?

এমন নিত্য-সচ্ছলতা কি করিয়া হইল? এরূপ দৈন্যমোচনের মহামন্ত্রটি কি? এ কি কেবল জল-বায়ু-মৃত্তিকার গুণ—এ কি কেবল সুনিয়মিত বৃষ্টিপাতের ফল? কতকটা পরিমাণে হইতেও পারে, কিন্তু এই সকল সুবিধাই যথেষ্ট নহে। তবে কি দেশী লোকের অধিকতর নৈপুণ্য, উদ্যম বা শ্রমশীলতাই ইহার কারণ? তাহাও বলা যায় না—কারণ, এখানকার দ্বীপবাসিগণ অন্যান্য উষ্ণপ্রধান দেশেরই লোকের মত—যতটুকু আবশ্যক, তাহার বেশি খাটিতে চায় না।

বস্তুত ফিলিপাইনের পরম সৌভাগ্য এই যে, সেখানে য়ুরোপীয় বাণিজ্য-উদ্যমের অভাব, সেখানে য়ুরোপের মূলধন খাটিতেছে না। গুটিকতক য়ুরোপীয় ধনী, গুটিকতক

প্রকাণ্ড সম্পত্তি, গুটিকতক কারখানা, গুটিকতক টাকা করিবার বিপুলকায় দলবন্ধন—এই হউক্ দেখি,—অমনি, সম্পত্তি ও দ্রব্যোৎপাদন, মালিকী স্বত্ব এবং খাটুনির মধ্যে এখন যে সামঞ্জস্য আছে, যাহা থাকার দরুণ বর্ত্তমানে দরিদ্রতম কুটীরবাসীর ভাগ্যেও যথেষ্ট থাকে এবং সমস্ত উপনিবেশের অংশেও প্রচুর উদ্বৃত্ত হয়, তাহা সমস্তই ভ্রষ্ট, ভগ্ন এবং বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে এবং তাহার পরিবর্ত্তে দিন-মজুরী, দৈন্য, সরকারী অন্নসত্র, চাঁদা এবং অনাহারের প্রাদুর্ভাব হইবে। য়ুরোপ—লুব্ধ অতৃপ্ত য়ুরোপ সমস্ত শস্যটুকু কাটিয়া লইবে এবং এখনকার সুখী, সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত ফিলিপাইনের অদৃষ্টে বাকি থাকিবে কেবল কাটা-ধানের নুড়া, কৃশতা, অভাব, অশান্তি এবং দুঃখ! এখন বাগানটি স্বর্গীয় ইডেন্-বাগান আছে,—ইহাদের অধিবাসীরা যদি সাপের পরামর্শ শুনিয়া সম্পদ্ (Resource) বিস্তার করিতে উদ্যত হয়, তবে নিজের সচ্ছল অনাদৃত সুখের অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আর কখনো ফিরিবার পথ পাইবে না।

ইহার পরে যে প্যারাগ্রাফটি আছে, তাহা অনুবাদ করিয়া আমরা নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না—মূলটি উদ্ধৃত করিয়া দিই।

O balmy life-giving breezes of the wide Pacific, with enjoyment in every flutter of your wings! O golden glories of the evening sun-god, ere yet he withdraws from view within his cloud-built palace of amber and crimson, reared on the deep immensity of blue! long be yours to range and reign over the waving emerald of the parcelled rice-field, the unpruned freedom of the fruit-clusted bough, the bannered flaglets of the yellowing cane-patch, the green glister of the plantain grove, the triumph of the stately garden palm, while frequent amid them, each sheltering its contented owner-peasant and the children-inheritors of the land, rise the little thatched cottages, undwarfed by the vast constructions of overshadowing capital, unsmirched by Western smoke and enginery; while the fruit-bearing land smiles her bounty on her unorphaned children, and the children yet claim for their own the native bosom of their proper land. Birthright ill sold for any counter-exchange of elusive gain: Eden unequally bartered for the whole world of unrest and striving that seethes and struggles without the island bounds. Long may those bounds remain, long may they keep at bay the gods of the stranger, the price of the alien, the progress that is retrocession, the science that strips to nakedness, the energy that consumes and destroys, the greed of all-organizing all-devouring capital, the skilled force insatiate of its slaves, the iron and the gold.

গ্রন্থ-সমালোচনা।

লীয়ার। মহাকবি শেক্সপীয়ার প্রণীত 'কিং লীয়ার' নাটকের বঙ্গানুবাদ। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ কর্ত্তৃক অনুবাদিত। মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র।

ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতিগত প্রভেদ এত অধিক যে, ইংরেজি কাব্যের ভাবানুবাদ হইলেই কেবল তাহা উপভোগ্য, সুতরাং প্রশংসনীয় হইতে পারে। যদি ভাবানুবাদ না হইয়া কেবল বাক্যানুবাদ হয়, তাহা হইলে, প্রশংসনীয় হওয়া ত দূরের কথা, গ্রহণীয়ও হয় না—হাস্যজনক হয় মাত্র।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহনবাবুর এই অনুবাদ পড়িয়া ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, তিনি ইংরেজি জানেন এবং শেক্সপীয়রের 'কিং লীয়ার'ও পাঠ করিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত হইলেই যে শেক্সপীয়রের নাটকের অনুবাদ করিবার অধিকার কাহারও হয়, এরূপ ধারণা আমাদের নাই।

যতীন্দ্রমোহনবাবু বাক্যানুবাদ করিয়াছেন মাত্র। সুতরাং তাঁহার এই 'লীয়ার', যাঁহারা ইংরেজি জানেন না বা অল্প জানেন, তাঁহাদের পক্ষে একেবারেই অনধিগম্য—কেহ কিছুই বুঝিবেন না। যাঁহারা ইংরেজি ভাল জানেন, তাঁহাদের পক্ষেও ইহা দুরধিগম্য; কেন না, মূলের সহিত মিলাইয়া না পড়িলে তাঁহারাও ইহা বুঝিতে পারিবেন না। শেক্সপীয়র-বেচারিকে এমন করিয়া নাস্তানাবুদ খানেখারাব করা কেন? একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক্। ৫ম পৃষ্ঠার শেষে—

"অন্তর আমিত হতে বিদেশী হইয়ে,
জনমের তরে তোরে দিনু বিসর্জ্জন।"

ইহার অর্থ যিনি বুঝিতে পারেন, তাঁহাকে আমরা ক্ষণজন্মা পুরুষ বলিতে প্রস্তুত আছি। মূলে কিন্তু এই স্থলের অর্থ অতি পরিষ্কার। তাহাও উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"And as a stranger to my heart and me
Hold thee, from this, for ever."

আরও একটা—৩৪ পৃষ্ঠায়—

"কৃতঘ্নতা! তুই পিশাচী পাষাণী! আরও ভয়ঙ্কর
কুৎসিত আকার সন্তানে যখন তোর হয় আবির্ভাব;
সামুদ্রিক জন্তু তুলনায় অতি ক্ষুদ্র।"
কেহ কিছু বুঝিলেন কি? মূল এই—

"Ingratitude! thou marble-hearted fiend,
More hideous, when thou show'st thee in a child,
Than the sea-monster!"

ইহারই নাম শেক্সপীয়রের বঙ্গানুবাদ! এই অনুবাদ দেখিয়া যদি কেহ যতীন্দ্রবাবুর ইংরেজিভাষার জ্ঞানসম্বন্ধে সন্দিহান হয়, তাহা হইলে তাহাকে আমরা বড় দোষ দিতে পারি না।

দুই-চারি-স্থলে এইরূপ হইলে আমরা তাহা ধরিতাম না। কিন্তু এই পুস্তকের আগাগোড়াই এইরূপ। সকল দেখাইয়া দেওয়া অসম্ভব, কেন না, তাহা হইলে সমস্ত

পুস্তকখানি উদ্ধৃত করিতে হয়। কম্বলের লোম বাছিয়া ফেলিতে হইলে, গোটা কম্বলখানি বাছিয়া ফেলিতে হয়।

শেক্সপীয়রের কথাতেই এই সমালোচনা শেষ করা ভাল বলিয়া মনে হইতেছে। তাঁহার 'নিদাঘ-নিশার স্বপ্ন' নামক নাটকে বটমের স্কন্ধে গর্দ্দভের মুণ্ড দেখিয়া কুইন্‌স্ বলিতেছে—

Bless thee, Bottom ! bless thee ! thou art translated."

আমরাও এই অনুবাদ পড়িয়া বলিতে পারি—

"ওগো শেক্সপীয়র, জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন! তুমি যে দেখিতেছি, অনুবাদিত হইয়াছ।"

যতীন্দ্রবাবু দুঃখিত হইবেন না। আমাদের ভাষায় শেক্সপীয়রের যতগুলি অনুবাদ আমি দেখিয়াছি, তাহার প্রায় সবগুলির সম্বন্ধেই এইরূপ সমালোচনা করিতে হয়।

পঞ্চ-পুষ্প বা উপন্যাসগুচ্ছ। শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ১৵০ এক টাকা দুই আনা।

বঙ্গীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে হরিসাধনবাবু অপরিচিত নহেন। অনেক সাময়িক পত্রে তাঁহার লিখিত অনেক প্রবন্ধ পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয়। সেই সকল পড়িয়া এইরূপ মনে হইয়াছে যে, মোগল আধিপত্যের সময়ের ভারতেতিহাস হরিসাধনবাবু যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন। এই উপন্যাস-গুচ্ছ তাহারই একটি ফল।

ফল, মোটের উপর ভালই হইয়াছে। এই গল্পগুলি পাঠ করিয়া মোগলের ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপ এবং রাজপুতের শৌর্য্য ও চিত্তবলের একটা চিত্র মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হয়। এবং সে চিত্র স্বভাবানুকারী, সুতরাং প্রকৃত। এই পুস্তকের সব কয়টি গল্পই অল্পাধিক পরিমাণে চিত্তাকর্ষক; তবে 'লাল বারদোয়ারী' গল্পটি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে। আজকালকার বাঙ্গালা উপন্যাসের যেরূপ দশা, তাহাতে এই পুস্তকের আদর হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি।

তাই বলিয়া দোষ যে নাই, এমন নহে। স্থানে স্থানে অসঙ্গতি-দোষ ঘটিয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত দেখান যাউক। আগ্রার রাজপ্রাসাদে আকবরশাহকে দরিদ্রের বেশে দেখিয়া—

"রঞ্জন ভাবিতেছিলেন—ঐশ্বর্য্য যেন দারিদ্র্যের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রমোদকানন যেন শ্মশানের ভাব ধরিয়াছে—তেজ যেন ধূমাচ্ছাদিত হইয়াছে—দীর্ঘকায় পর্ব্বত যেন তুষারের মলিন আচ্ছাদনে ভূষিত হইয়াছে—সুখ যেন দুঃখকে আলিঙ্গন করিয়াছে—প্রফুল্লতা যেন বিষাদকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে।"

স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করিলে বলিতে হয় যে, এই কবিত্বোচ্ছ্বাস নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে। রজনীতে, আগ্রার দুর্গে, আকবরশাহের সম্মুখে এতটা ভাব-তরঙ্গ রঞ্জনের ন্যায় লোকের মনে উছলিয়া উঠিতে পারে না—কাহারও পারে কি না, সন্দেহ। এমন আরও আছে। কিন্তু পুস্তকখানি যখন মোটের উপর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে, তখন এমন দুই-চারিটা দোষ আমরা উপেক্ষা ও মার্জ্জনা করিতে পারি।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বঙ্গদর্শন।

মা ভৈঃ।

মৃত্যু একটা প্রকাণ্ড কালো কঠিন কষ্টিপাথরের মত। ইহারই গায়ে কষিয়া সংসারের সমস্ত খাঁটি সোণার পরীক্ষা হইয়া থাকে।

তুমি দেশকে যথার্থ ভালবাস—তাহার চরম পরীক্ষা তুমি দেশের জন্য মরিতে পার কি না। তুমি আপনাকে যথার্থ ভালবাস, তাহারো চরম পরীক্ষা আপনার উন্নতির জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করা তোমার পক্ষে সম্ভবপর কি না।

এমন একটা বিশ্বব্যাপী সার্ব্বজনীন ভয় পৃথিবীর মাথার উপরে যদি না ঝুলিত, তবে সত্য-মিথ্যাকে, ছোট-বড়-মাঝারিকে বিশুদ্ধভাবে তুলা করিয়া দেখিবার কোন উপায় থাকিত না।

এই মৃত্যুর তুলায় যে সব জাতির তৌল হইয়া গেছে, তাহারা পাস্‌মার্কা পাইয়াছে। তাহারা আপনাদিগকে প্রমাণ করিয়াছে, নিজের কাছে ও পরের কাছে তাহাদের আর কিছুতেই কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। মৃত্যুর দ্বারা তাহাদের জীবন পরীক্ষিত হইয়া গেছে। ধনীর যথার্থ পরীক্ষা দানে; যাহার প্রাণ আছে, তাহার যথার্থ পরীক্ষা প্রাণ দিবার শক্তিতে। যাহার প্রাণ নাই বলিলেই হয়, সে-ই মরিতে কৃপণতা করে।

যে মরিতে জানে, সুখের অধিকার তাহারই; যে জয় করে, ভোগ করা তাহাকেই সাজে। যে লোক জীবনের সঙ্গে সুখকে, বিলাসকে, দুই হাতে আঁকড়িয়া থাকে, সুখ তাহার সেই ঘৃণিত ক্রীতদাসের কাছে নিজের সমস্ত ভাণ্ডার খুলিয়া দেয় না, তাহাকে উচ্ছিষ্টমাত্র দিয়া দ্বারে ফেলিয়া রাখে। আর মৃত্যুর আহ্বানমাত্র যাহারা তুড়ি মারিয়া চলিয়া যায়, চির-আদৃত সুখের দিকে একবার পিছন ফিরিয়া তাকায় না, সুখ তাহাদের চায়, সুখ তাহারাই জানে। যাহারা সবলে ত্যাগ করিতে পারে, তাহারাই প্রবলভাবে ভোগ করিতে পারে। যাহারা মরিতে জানে না, তাহাদের ভোগবিলাসের দীনতা-কৃশতা-ঘৃণ্যতা গাড়িজুড়ি এবং তকমা-চাপরাশের দ্বারা ঢাকা পড়ে না। পৃথিবীতে সাতটা আশ্চর্য্য জিনিষ আছে; তেমনি লজ্জার জিনিষ কয়টা আছে, তাহার গণনা হয় নাই—

যদি হইত, তবে বাঙালিবাবুর কুসুমকোমল বাবুয়ানা তাহার প্রথম স্থান অধিকার করিত। নিলর্জ্জবাবুকে তাহার বিলাতী দোকানের আরাম-চৌকি হইতে টানিয়া উৎপাটিত করিতে পারে, এমন একটা আকস্মিক দৈবদুর্যোগ বিধাতার কাছে প্রার্থনা করি। ত্যাগের বিলাসবিরল কঠোরতার মধ্যে পৌরুষ আছে। যদি স্বেচ্ছায় তাহা বরণ করি, তবে নিজেকে লজ্জা হইতে বাঁচাইতে পারিব।

এই দুই রাস্তা আছে—এক ক্ষত্রিয়ের রাস্তা, আর এক ব্রাহ্মণের রাস্তা। যাহারা মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে, পৃথিবীর সুখসম্পদ্ তাহাদেরি। যাহারা জীবনের সুখকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, তাহাদের আনন্দ মুক্তির। এই দুয়েতেই পৌরুষ।

প্রাণটা দিব, এ কথা বলা যেমন শক্ত—সুখটা চাই না, এ কথা বলা তাহা অপেক্ষা কম শক্ত নয়। পৃথিবীতে যদি মনুষ্যত্বের গৌরবে মাথা তুলিয়া চলিতে চাই, তবে এই দুয়ের একটা কথা যেন বলিতে পারি। হয় বীর্য্যের সঙ্গে বলিতে হইবে—"চাই!" নয়, বীর্য্যেরই সঙ্গে বলিতে হইবে—"চাই না!" "চাই" বলিয়া কাঁদিব, অথচ লইবার শক্তি নাই; "চাই না" বলিয়া পড়িয়া থাকিব, কারণ চাহিবার উদ্যম নাই;—এমন ধিক্কার বহন করিয়াও যাহারা বাঁচে, যম তাহাদিগকে নিজগুণে দয়া করিয়া না সরাইয়া লইলে তাহাদের মরণের আর উপায় নাই।

বাঙালি আজকাল লোকসমাজে বাহির হইয়াছে। মুস্কিল এইযে, জগতের মৃত্যুশালা হইতে তাহার কোনো পাস্ নাই। তবে তাহার কথাবার্ত্তা যতই বড় হোক্, কাহারো কাছে সে খাতির দাবী করিতে পারে না। এইজন্য তাহার আস্ফালনের কথায় অত্যন্ত বেসুর এবং নাকিসুর লাগে। না মরিলে সেটার সংশোধন হওয়া শক্ত।

পিতামহদের বিরুদ্ধে আমাদের এইটেই সব চেয়ে বড় অভিযোগ। সেই ত আজ তাঁহারা নাই, তবে ভালমন্দ কোন-একটা অবসরে তাঁহারা রীতিমত মরিলেন না কেন? তাঁহারা যদি মরিতেন, তবে উত্তরাধিকারসূত্রে আমরাও নিজেদের মরিবার শক্তিসম্বন্ধে আস্থা রাখিতে পারিতাম। তাঁহারা নিজে না খাইয়াও ছেলেদের অন্নের সঙ্গতি রাখিয়া গেছেন, শুধু মৃত্যুর সঙ্গতি রাখিয়া যান নাই। এত-বড় দুর্ভাগ্য, এত-বড় দীনতা আর কি হইতে পারে!

প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, সিংহলবিজয়ী বিজয়সিংহ, তোমাদের স্মৃতি ধারাবিহীন জলের মত বাংলার ইতিহাসমরুর মধ্যে কোথায় শুকাইয়া গেছে! আমাদের প্রাণের পিপাসা মিটাইবার জন্য তাহা আমাদের হৃদয়ের ভিতর পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। তোমাদের রক্তপূত চরিতধারাজলে বাঙালিজাতির অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারিল না। কারণ, তোমরা বিচ্ছিন্ন—এই দীনরক্তের দেশে তোমরা স্রোত বহাইয়া গেলে না! এখন আমাদিগকে কিসে গৌরব দিবে!

ইংরাজ আমাদের দেশের যোদ্ধৃজাতিকে ডাকিয়া বলেন, "তোমরা লড়াই করিয়াছ—প্রাণ দিতে জান; যাহারা কখনো লড়াই করে নাই, কেবল বকিতে জানে,

তাহাদের দলে ভিড়িয়া তোমরা কন্‌গ্রেস্ করিতে যাইবে!"

তর্ক করিয়া ইহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তর্কের দ্বারা লজ্জা যায় না। বিশ্বকর্ম্মা নৈয়ায়িক ছিলেন না, সেইজন্য পৃথিবীতে অযৌক্তিক ব্যাপার পদে পদে দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য যাহারা মরিতে জানে এবং যাহারা মরিতে জানে না, তাহারা শুধু যুদ্ধের সময়ে নহে, শান্তির সময়েও পরস্পর ঠিক সমানভাবে মিশিতে পারে না; যুক্তিশাস্ত্রে ইহা অসঙ্গত, অর্থহীন, কিন্তু পৃথিবীতে ইহা সত্য।

অতএব, আরাম-কেদারায় হেলান্ দিয়া পোলিটিকাল্ সুখস্বপ্নে যখন কল্পনা করি—সমস্ত ভারতবর্ষ এক হইয়া মিশিয়া যাইতেছে, তখন মাঝখানে এই একটা দুশ্চিন্তা উঠে যে, বাঙালির সঙ্গে শিখ আপন ভাইয়ের মত মিশিবে কেন? বাঙালি বি.-এ. এবং এম্.-এ. পরীক্ষায় পাস্ হইয়াছে বলিয়া? কিন্তু যখন তাহার চেয়ে বড় পরীক্ষার কথা উঠিবে, তখন সার্টিফিকেট্ বাহির করিব কোথা হইতে? শুদ্ধমাত্র কথায় অনেক কাজ হয়, কিন্তু সকলেই জানেন চিঁড়ে ভিজাইবার সময় কথা দধির স্থান অধিকার করিতে পারে না, এবং তেমনি যেখানে রক্তের প্রয়োজন, সেখানে বিশুদ্ধ কথা তাহার অভাব পূরণ করিতে অশক্ত।

অথচ যখন ভাবিয়া দেখি—আমাদের পিতামহীরা স্বামীর সহিত সহমরণে মরিয়াছেন, তখন আশা হয়—মরাটা তেমন কঠিন হইবে না। অবশ্য, তাঁহারা সকলেই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মরেন নাই। কিন্তু অনেকেই যে মৃত্যুকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বরণ করিয়াছেন, বিদেশীরাও তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন।

কোন দেশেই লোকনির্বিশেষে নির্ভয়েও স্বেচ্ছায় মরে না। কেবল স্বল্প একদল মৃত্যুকে যথার্থভাবে বরণ করিতে পারে—বাকি সকলে কেহ বা দলে ভিড়িয়া মরে, কেহ বা লজ্জায় পড়িয়া মরে, কেহ বা দস্তুরের তাড়নায় জড়ভাবে মরে।

মন হইতে ভয় একেবারে যায় না। কিন্তু ভয় পাইতে নিজের কাছে ও পরের কাছে লজ্জা করা চাই। শিশুকাল হইতে ছেলেদের এমন শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাহাতে ভয় পাইলেই তাহারা অনায়াসে অকপটে স্বীকার না করিতে পারে। এমন শিক্ষা পাইলে লোকে লজ্জায় পড়িয়া সাহস করে। যদি মিথ্যাগর্ব্ব করিতে হয়, তবে, আমার সাহস আছে, এই মিথ্যাগর্ব্বই সব চেয়ে মার্জ্জনীয়। কারণ, দৈন্যই বল, অজ্ঞতাই বল, মূঢ়তাই বল, মনুষ্যচরিত্রে ভয়ের মত এত-ছোট আর কিছুই নাই। ভয় নাই বলিয়া যে লোক মিথ্যা অহঙ্কারও করে, অন্তত তাহার লজ্জা আছে, এ সদ্‌গুণটারও প্রমাণ হয়।

নির্ভীকতা যেখানে নাই, সেখানে এই লজ্জার চর্চ্চা করিলেও কাজে লাগে। সাহসের ন্যায় লজ্জাও লোককে বল দেয়। লোকলজ্জায় প্রাণবিসর্জ্জন করা কিছুই অসম্ভব নয়!

অতএব আমাদের পিতামহীরা কেহ কেহ লোকলজ্জাতেও প্রাণ দিয়াছিলেন, এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রাণ দিবার শক্তি তাঁহাদের ছিল,—লজ্জায়

হোক্, প্রেমে হোক্, ধর্ম্মোৎসাহে হোক্, প্রাণ তাঁহারা দিয়াছিলেন, এ কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে।

বস্তুত দল বাঁধিয়া মরা সহজ। একাকিনী চিতাগ্নিতে আরোহণ করিবার মত বীরত্ব যুদ্ধক্ষেত্রে বিরল।

বাংলার সেই প্রাণবিসর্জ্জনপরায়ণা পিতামহীকে আজ আমরা প্রণাম করি। তিনি যে জাতিকে স্তন্য দিয়াছেন, স্বর্গে গিয়া তাহাকে বিস্মৃত হইবেন না। হে আর্য্যে, তুমি তোমার সন্তানদিগকে সংসারের চরমভয় হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দাও! তুমি কখনো স্বপ্নেও জান নাই যে, তোমার আত্মবিস্মৃত বীরত্ব দ্বারা তুমি পৃথিবীর বীরপুরুষদিগকেও লজ্জিত করিতেছ। তুমি যেমন দিবাবসানে সংসারের কাজ শেষ করিয়া নিঃশব্দে পতির পালঙ্কে আরোহণ করিতে, —দাম্পত্যলীলার অবসানদিনে সংসারের কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া তুমি তেমনি সহজে বধূবেশে সীমন্তে মঙ্গলসিন্দুর পরিয়া পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছ। মৃত্যুকে তুমি সুন্দর করিয়াছ, শুভ করিয়াছ, পবিত্র করিয়াছ—চিতাকে তুমি বিবাহশয্যার ন্যায় আনন্দময়, কল্যাণময় করিয়াছ। বাংলাদেশে পাবক তোমারই পবিত্র জীবনাহুতিদ্বারা পূত হইয়াছে—আজ হইতে এই কথা আমরা স্মরণ করিব। আমাদের ইতিহাস নীরব, কিন্তু অগ্নি আমাদের ঘরে ঘরে তোমার বাণী বহন করিতেছে। তোমার অক্ষয়-অমর স্মরণানিলয় বলিয়া সেই অগ্নিকে, তোমার সেই অন্তিম-বিবাহের জ্যোতিঃসূত্রময় অনন্ত পট্টবসনখানিকে আমরা প্রত্যহ প্রণাম করিব। সেই অগ্নিশিখা তোমার উদ্যতবাহুরূপে আমাদের প্রত্যেককে আশীর্ব্বাদ করুক। মৃত্যু যে কত সহজ, কত উজ্জ্বল, কত উন্নত, হে চিরনীরব স্বর্গবাসিনি, অগ্নি প্রতিদিন আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে তোমার নিকট হইতে সেই বার্ত্তা বহন করিয়া অভয়ঘোষণা করুক্!

সুখ-দুঃখ।

সুখ যদি দেওয়া যেত গাঁথিয়া অঞ্জলি
গাঁথিয়া তোমারি কণ্ঠে দিতাম সকলি।
দুঃখে যদি করা যেত পাদোদকভার
সকলি দিতাম ঢেলে চরণে তোমার!

প্যারাসেল্‌সাস্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৩য় ও ৪র্থ, এই দুই খণ্ড ব্যাপিয়া প্যারাসেল্‌সাসের গভীর যন্ত্রণা। প্যারাসেল্‌সাস্ তাঁহার পূর্ব্বজীবনটা ছাড়িতে চাহিতেছেন। তাঁহার বর্ম্মচর্ম্ম দেহ হইতে ছিঁড়িয়া লইতেছেন অথবা কে যেন ভাঙিয়া চুরিয়া টানিয়া-ছিঁড়িয়া লইতেছে। কীট্‌সের ল্যামিয়া তাহার সর্পরূপপরিত্যাগকালে যেমন বহুক্ষণ ধরিয়া নিপীড়িত হইতেছিল—

Her eyes in torture fixed, and anguish drear,
Hot, glazed, and wide, with lid-lashes all sear,
Flashed phosphor and sharp sparks, without one cooling tear
The colours all inflamed throughout her train,
She writhed about, convulsed with scarlet pain.

প্যারাসেল্‌সাস্‌ও সেইরূপ তাঁহার পূর্ব্বজীবন ছাড়িবার সময়ে এই দুই খণ্ড ব্যাপিয়া writhed about, convulsed with scarlet pain 'দেহ রক্তবর্ণ হইয়া উঠে, এমন এক তীব্র বেদনার বিক্ষেপে অঙ্গসঙ্কোচ করিয়া ধূলায় লুণ্ঠিত' হইতেছেন। একটা দুর্জ্জয় কঠোরতা কিরূপে নিষ্পেষিত হইয়া কোমলতা প্রাপ্ত হয়, এই দুটি খণ্ডে অপূর্ব্বশক্তিসহকারে তাহা দেখান হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ডে প্যারাসেল্‌সাস্ 'ব্যালে'র অধ্যাপক। ফেষ্টাস্ লুথরের কাছ হইতে জুইংলিয়াসের কাছে একটা খবর লইয়া চলিয়াছেন, পথে বন্ধুর যশোরশ্মিমণ্ডিত মুখখানি একবার দেখিয়া যাইতেছেন। প্যারাসেল্‌সাস্ প্রথমে ফেষ্টাসের ঘরের কথা পাড়িলেন —"মাইকল্ কেমন আছে? এখনো কি সে একা একা বসিয়া পাখীর মত গান ছাড়িয়া দেয়? একা একা যাহারা গান করিতে পারে, তাহারা সম্মানের পাত্র।"

প্যারাসেল্‌সাস্ ত কখন একা বসিয়া কোন-কিছু সম্ভোগ করিতে পারেন না। ভাবই মানুষকে আপনার মধ্যে নিমিড়ভাবে বসাইয়া তৃপ্ত করিয়া রাখিতে পারে। জ্ঞানের মধ্যে একটা উগ্র তৃষ্ণা আছে—একটার পর আর একটা আবিষ্কারের জন্য মন ছুটিতে থাকে,—মোহিত যতই হোক্, ভূতগ্রস্ত যতই হোক্, নিদ্রর্ম্মনিবিড় শান্তি আস্বাদন করিবার সৌভাগ্য তাঁহার নাই। অশান্তচিত্ত প্যারাসেল্‌সাস্ বারবার সেই শান্তির মধ্যে নামিবার চেষ্টা পাইতেছেন—ফেষ্টাসের সুখশান্তিময় গৃহজীবনের কথা আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু ঘুরিয়া-ফিরিয়া তাঁহার অধ্যাপনার কথাই আসিয়া পড়িতেছে। প্যারাসেল্‌সাস্ তিক্তপ্রাণে তাঁহার অবসন্ন শক্তি, ব্যর্থ সাধনার কথা স্মরণ করিতেছেন, তথাপি মন্দকে ভাল করিবার আশায় অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইয়াছেন। এখনও তাঁহার সহানুভূতির উদয় হয় নাই, এখনও মূর্খতা তাঁহার অসহ্য, তবু

ছাত্রদের পড়াইতেছেন। তাহাদের মনে সত্যানুসন্ধিৎসা জাগাইতে তৎপর হইয়াছেন, 'পুরাণী'দের অজস্র নিন্দা করিতেছেন,—গ্রন্থ পুড়াইয়া দিতেছেন। দেখিতে পাই, তাঁহার প্রাণ এখনও কাঠিন্যময় রহিয়াছে, তবে মাথায় বুঝিতেছেন মাত্র যে, মানুষের হৃদয়ই মানুষের মুক্তিমূল। প্যারাসেল্‌সাস্‌কে এ কথাটি যুক্তিদ্বারা বুঝিয়া বুঝিয়া তাহার পর হৃদয়ে লইতে হইতেছে—ঠিক হৃদয়ের স্বাভাবিক আন্দোলনে কথাটি বুঝিতে পারিতেছেন না,—এমনি কঠিন বর্ম্মে তাঁহার মনুষ্যত্ব আবৃত হইয়া গেছে। তিনি মাথায় বুঝিতেছেন মাত্র—

From God
Down to the lowest spirit ministrant"

ঈশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষীণতম চিদ্বান্ পর্য্যন্ত—এই বিপুল চিৎসমষ্টির কাছে মানুষের বুদ্ধি কোথায় কোন্ অপরিমেয় অন্ধকারে হারাইয়া যায়; কিন্তু প্রেম-বিশ্বাস ও আশা-ভরেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব।

এখন চতুর্থ খণ্ড। এ খণ্ডে এক ভীষণ যন্ত্রণা। ফেষ্টাসেরও চিরপ্রফুল্ল মূর্খথানিতে আজ দুঃখকালিমা!—তাঁহার মাইকল্ আজ শিকড়জালের মধ্যে শিশিরসিঞ্চিত মৃৎকক্ষে অনন্তনিদ্রায় নিদ্রিত! তথাপি বিশ্বাসে ফেষ্টাসের হৃদয় স্থির হইয়া আছে! কিন্তু প্যারাসেল্‌সাস্ 'ব্যালে'তে অপমানিত, পদচ্যুত হইয়া একেবারে ঊর্দ্ধাস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এতদিন হৃদয়ের এক কোণে যে ব্যবসার প্রতি ধিক্কার উঠিতেছিল, অথচ কি-এক মোহে যাহা ছাড়িতে পারিতেছিলেন না, আজ সেই ব্যবসা হইতে তাঁহাকে জোর করিয়া ছাড়ান হইল। এতদিন প্যারাসেল্‌সাস্ তাঁহার ব্যর্থপ্রায় জীবনকেও যথাসম্ভব সার্থক করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহার সেই মহা-উদ্দেশ্যের নৌকায় সন্দিগ্ধভাবে মৃদুমৃদু হাল নাড়িতেছিলেন, যদিও বায়ু ও জীবনস্রোত তাঁহাকে অন্যপথ প্রদর্শন করিতেছিল, তথাপি পূর্ব্বপথের অভিমুখেই মৃদুমৃদু হাল নাড়িতেছিলেন—কিন্তু সম্পূর্ণতা নহিলে সার্থকতা কোথায়? পদে পদেই দেখিয়াছি, হৃদয়ের তিক্ততা প্যারাসেল্‌সাস্‌কে কিরূপ বিক্ষিপ্ত করিতেছে। কিন্তু আজ জীবন আপনার নিয়মে আবর্ত্তিত হইয়া চারিদিকে কতগুলি ঘটনা টানিয়া আনিয়া, প্যারাসেল্‌সাস্‌কে তাঁহার মোহকর তীরের স্পর্শ হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া, আপনার সম্পূর্ণতার দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল। এই "তীর সাথে শত ডোর" ছিঁড়িবার কালে প্যারাসেল্‌সাসের কি কষ্ট! —প্যারাসেল্‌সাস্ নিপীড়নে অস্থির। একএকবার আহ্লাদে ফেষ্টাস্‌কে বলিতেছেন বটে—তিনি পদচ্যুত হইয়াছেন, ভালই হইয়াছে, এখন আপন পথে যাইবেন; কিন্তু অচিরেই অপমানকারীদের প্রতি তীব্র গালি প্রদান করিতেছেন, কখনো বা বলিতেছেন- "শিখিয়াছি, শিখিয়াছি ভাই, সেই অতি পুরাতন, অতি কার্য্যকারী, 'জোর-করিয়া-শেখান' বিধিটির কঠোর প্রয়োগে এবার শিখিয়াছি, কোন্ পথে আমাকে যাইতে হইবে"—আবার যেন রাগত হইয়া বলিতেছেন, "যাই, যাই, সুখচর্চ্চায় যাই, নিতান্ত জড়ময় ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার যেটুকু সুখ, তাহাও ছাড়িব না।" বাস্তবিক সর্ব্বসত্ত্বময় নিপীড়নে

প্যারাসেল্‌সাস্ আজ অস্থির। তাঁহার দেহমনের সমস্ত কল-চাকা-স্ক্রু এমনি ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, তাহাতে জ্ঞানান্বেষণের উপযোগী অশ্রান্ত কর্ম্মই সম্পন্ন হইতে পারে, কেমন করিয়া আজ তিনি সেই যন্ত্রটি চুরমার-করিয়া দিয়া তাহার সন্ধিতে সন্ধিতে মৃণাললালিত্য, তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঙ্গীতের সুর আনয়ন করিবেন? এই নিপীড়নের পাশাপাশি ফেষ্টাসের স্ত্রীবিয়োগরূপ গভীর দুঃখ একটি পরম সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই শান্ত বিশ্বাসী লোকটি কেমন সহজেই দুঃখের অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া আপনার স্থির আসনখানিতে বসিয়া আছেন। তথাপি প্যারাসেল্‌সাসের গভীর যন্ত্রণার সঙ্গে ফেষ্টাসের দুঃখ কেমন-একটি ঘাত প্রাপ্ত হইতেছে। অন্য দিন হইলে ফেষ্টাস্—তাঁহার বন্ধুর যত বড়ই যন্ত্রণা হোক্ না—অসীম ধৈর্য্যে তাঁহার ক্ষতস্থান স্পর্শ করিয়া ভালবাসার নানা কোমল প্রলেপে তাঁহাকে শান্ত করিতে যত্নপর হইতেন—আজও যতক্ষণ ধরিয়া তাঁহার অশান্ত আইঢাই শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে ফেষ্টাসের দৃঢ় হৃদয়ের পরিচয় পাই—কিন্তু দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে আর কত পারা যায়!—শেষে যেন ফেষ্টাস্ একটু তীব্র হইয়া উঠিতেছেন—প্যারাসেল্‌সাসের এত যন্ত্রণা কিসের?—তাঁহার ত যথেষ্ট কাজ হইয়াছে—তাঁহার কীর্ত্তি ত চিরদিন থাকিবে, তিনি ত ঈশ্বরেরই সেনাপতি।—হায়! একমাত্র বন্ধুও আজ প্যারাসেল্‌সাসের যন্ত্রণা বুঝিলেন না। কিন্তু অবশেষে বুঝিলেন—হৃদয়কে একটু প্রসারিত করিয়া বুঝিলেন। প্যারাসেল্‌সাসের প্রবলতা ত চিরদিনই ফেষ্টাস্‌কে কল্পনা করিয়া—হাত বাড়াইয়া অনুভব করিতে হয়। তবু হাত বাড়াইয়াও তাঁহার মহত্ত্ব অনুভব করিয়া তিনি যে আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠেন, সে কি গভীর! যে দিন প্যারাসেল্‌সাস্ 'ব্যালে'য় অধ্যাপকরূপে আবির্ভূত, সে দিন ফেষ্টাস্‌কে প্যারাসেল্‌সাস্ তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন—বক্তৃতা শুনা তাঁহার তত উদ্দেশ্য নয়, তিনি শুধু লোকেদের মধ্যে মিশিয়া প্যারাসেল্‌সাসের যশোবার্ত্তা সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। এই-ই বটে ফেষ্টাস্—তিনি শুধু হৃদয় পাতিয়া বন্ধুর সম্পর্কিত আনন্দটুকু অনুভব করিয়া কৃতার্থ হন। আজও হৃদয় বাড়াইয়া বন্ধুর দুঃখ তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন—কিন্তু কত সহা যায়!—শেষে বলিয়া ফেলিলেন, মাইকল্ আর নাই। প্যারাসেল্‌সাস্ সেই মৃত্যুর শীতল শান্ত ক্রোড়ের কথা ভাবিতে লাগিলেন—

And Michal sleeps among the roots and dews,
While I am moved at Basil, and full of schemes
For Nuremberg, and hoping and desparing,
As though it mattered how the farce plays out,
So it be quickly played. Away, away!
Have your will, rabble! while we fight the prize,
Troop you in safety to the snug back-seats,
And leave a clear arena for the brave
About to perish for your sport!—Behold!

বীর প্যারাসেল্‌সাস্ মূর্খ সাধারণের জন্য আপনাকে পাত করিতে যাইতেছেন, এখনও তীব্রভাবে সে কথাটা তাঁহার হৃদয়ে জাগিতেছে। কিন্তু এই চতুর্থ খণ্ডটির নাম 'প্যারা-

সেল্‌সাসের আশা'। কি তাঁহার আশা, তাহা একবার দেখিতে হইবে।

সত্যসত্যই প্যারাসেল্‌সাসের আশা জাগিয়াছে। তাহা তাঁহার প্রাণের গভীরতার ভিতরে জাগিয়াছে—প্যারাসেল্‌সাস্ তাহার আভাস পান আর নাই পান, আমরা তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাই। এ আশা মনের কর্ত্তৃত্বে সচেতন আশা নহে, এ আশার অর্থ পরিপূর্ণতার দিকে জীবনের বিকাশ। প্যারাসেল্‌সাস্ যে কোমল হইয়া আসিতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার হৃদয়ের নীচে, নিভৃতে যে দুটি-একটি ফুল ফুটিতেছে, তাহার মনে তাঁহার অজ্ঞাতসারে ভাবকোমল কল্পনার এক-একটি কুমুকা-ফুল যে স্ফুটনোন্মুখ হইয়া উঠিতেছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার সেই জ্ঞানসার জীবনের দিকে তিনি যে আজ চাহিয়া দেখিতেছেন—সে দৃষ্টিতেও আজ ক্ষণে ক্ষণে একটা অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন ভাবই সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। গত জীবনের বিদায়সম্ভাষণে তিনি আজ পাগলের ন্যায় মুহুর্মুহু কেবল কল্পনাবিচিত্র গান গাহিয়া উঠিতেছেন;—কঠোর সেই গতজীবনের মধ্যেও কতগুলি সৌন্দর্য্যস্মৃতি তাঁহার চিত্তকে আবিষ্ট করিতেছে—তিনি সেই সৌন্দর্য্যগুলিকে একটা গান গাহিয়া বিদায় দিতেছেন;—

ঢাল স্তূপে স্তূপে রুচিনি, চন্দনমুকুল,
অহিফেনসারস্ফীর, নানা গন্ধচূর্ণ,
ঢাল তৈল মোহমদ-সৌরভ-আকুল
যাহে ভারতের নারী ভিজায় কিচুর—
(এ হেন সুরভিমিশ্র স্মরি' স্মরি' পড়ে
সমুদ্রবেলায় গিরিবেদি-পরিসরে
গিরিকূট হ'তে নিত্য,—অনিল যেথায়
গর্জ্জিত-সমুদ্র'পরে বহি' শ্রান্তকায়,—
দ্বীপের জ্বতাঢ্য বন আহরিতে চায়।)
অতি মৃদু গন্ধাভাসে রেণু যার উড়ে
মিসরের কীটদষ্ট গাত্রবাস হ'তে—
যাহায়ে খুলিতে গেলে, যায় ভেঙে-চুরে,
গন্ধবাষ্প, মেঘসম ছাড়ি' বায়ুস্রোতে—
যেন মেঘ জমেছিল বহুকাল ধ'রে
একখানি বহুকাল-নিরজন ঘরে—
চারিধারে জবনিকা জীর্ণ পুরাতন—
ভিতরে চৌদিকে বীণা, গ্রন্থ অগণন,—
যৌবনে মরেছে সেথা রাণী একজন।

তবেই দেখিতে পাই, প্যারাসেল্‌সাসের অশ্রুনীহারে আজ ইন্দ্রধনু বিচ্ছুরিত,—যদিও তাঁহার সেই রূঢ়ভাবটি অচিরেই জাগিয়া উঠিয়া তাঁহার এই অচিরবিকশিত কবিত্বকে উপহাস করিতেছে। গানটি হইয়া গেলে, একটা তিক্ত বিদ্রূপে প্যারাসেল্‌সাস্ ফেষ্টাস্‌কে বলিতেছেন—"দেখ দেখ, গানটায় ঔষধের তালিকা দেখিয়া আমার পুরাণ ব্যবসার গন্ধ পাইবে—আর ছন্দটা দেখ, লুথরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গানের ছন্দের মত ঠেকিয়া ঠেকিয়া যাইতেছে।" আবার নানা কথাবার্ত্তায় অলস যন্ত্রণা ব্যক্ত করিয়া প্যারাসেল্‌সাস্ তীব্র-করুণ স্বরে গাহিয়া উঠিতেছেন,—"আমরা জাহাজমণ্ডলীর উপর সুরজিত তাঁবু বসাইয়া, রূঢ়নির্ম্মিত জাহাজগুলি লইয়া, সদর্পে সমুদ্রতরঙ্গ ভাঙিয়া চলিয়াছিলাম—দিনে-রাত্রে, উদয়ে-অস্তে কেবল আশার গান গাহিতাম। ক্রমে আমাদের পশ্চাতে তরঙ্গায়িত সিন্ধুপ্রসার ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল—কিন্তু সম্মুখে তীর দেখিলাম, তীর ত পাহাড়। বন্দরের প্রতি-

জাহাজে একটি করিয়া প্রস্তরমূর্ত্তি তখন সুনির্ম্মিত হইয়াছে। আমরা বন্দরে উঠিলাম। সারাদিন বসিয়া আমরা মন্দির তৈয়ার করিয়া সেই স্বচ্ছ প্রতিমাগুলিকে স্থাপনা করিতে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু ছোট ছোট নৌকায় চড়িয়া কতগুলি দ্বীপবাসী নৌকা ভিড়াইয়া বলিল—'ঐ দেখ, সন্ধ্যায় দ্বীপগুলি মেঘের মত দেখাইতেছে, ওখানে জলপাই-কুঞ্জের ছায়ায় এ প্রতিমাগুলিকে বসাইব, প্রতিমাগুলি দাও'—(হায় এই রকম করিয়াই প্যারাসেল্‌সাসের এত সাধনের ধনগুলি সাধারণ লোকেরা সাধারণ কাজে লাগাইতে চায়!)—প্রতিমা চাহিতেই আমরা যেন স্বপ্নোত্থিত হইলাম—এ কোন্ মরুপাহাড়ে আসিয়া পড়িয়াছি! যা হোক্, গর্জ্জিয়া বলিলাম—'দূর হও, যদিও আমাদের সর্ব্বপ্রযত্ন বিফল হোক্, তবু আমাদের প্রতিমাগুলি তোমাদের মত অসভ্যের হাতে দিব না—দূর হও।'"—প্যারাসেল্‌সাস্ কাহার জন্য ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন? সর্ব্বসাধারণকে ভালবাসিয়া আপনাকে সেই ভালবাসায় ডুবাইতে পারেন নাই, তাই জ্ঞানমূর্ত্তির সমক্ষে একমাত্র পুরোহিত আপনাকে লইয়াই এত যন্ত্রণা পাইতেছেন!—তবু, আজ যখন তাঁহার পদমান সব গিয়াছে, যন্ত্রণা গভীরতম হইয়া উঠিয়াছে—তখনি বুঝিতে পারি, এ যন্ত্রণার অবসান নিকটে। আর ইহাও দেখিতে পাইয়াছি যে, এই বেদনার জ্বালার সহিত মিশ্রিত হইয়া দুচারিটি ফুলপাতাও প্যারাসেল্‌সাসের অন্তর হইতে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে।

এই ত গেল প্যারাসেল্‌সাসের প্রাণের আশা—এখন পঞ্চমখণ্ডে অবতরণ করা যাউক।

ক্ষুদ্র অধ্যবসায়ে ব্যাপৃতজীবন হইলে, একবার ভুলপথ হইতে ফিরিয়া আবার পূর্ণতার পথে চলিবার সময় হয় ত এই জীবনেই থাকিতে পারে, কিন্তু প্যারাসেল্‌সাস্ এমনি প্রবল আবেগে, এত বিরাট্ কাজে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন যে, এ জীবনে তাঁহার আর ফিরিয়া চলিবার সময় হইল না। তিনি পঞ্চম অঙ্কের পরে আবার ষষ্ঠ, সপ্তম অঙ্কে, মধুময় প্রাণ লইয়া আপনাকে চরিতার্থ করিবার অবসর পাইলেন না। এ কথাটা ঐতিহাসিক, কিন্তু কাব্যের সৌন্দর্য্যও ইহাতে নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। এইখানেই ব্রাউনিং মৃত্যুর গোধূলি-অন্ধকারের একটা ট্রাজেডি ঘনাইয়া, হঠাৎ প্যারাসেল্‌সাস্‌কে জাগাইয়া দিয়া, মানবহৃদয়ের আশাকে তাড়িতালোকবৎ কম্পিত করিবার সুযোগ পাইয়াছেন এবং মৃত্যুর পরপারেও যেন সেই কম্পনতরঙ্গ ছুটাইয়া দিয়াছেন।

অন্ধকার-গুহায় আহত প্যারাসেল্‌সাস্ পড়িয়া। সম্মুখে তাঁহার চিরকালের বন্ধু ফেষ্টাস্। প্যারাসেলসাস্ প্রলাপ বকিতেছেন। কখনো করুণস্বরে তাঁহার অপমানকারীদিগকে সম্বোধন করিতেছেন, কখনো 'অ্যাপ্রিলে, অ্যাপ্রিলে' করিয়া আকুল হইতেছেন। বিফলতার প্রতি উপহাসপরায়ণ ভূতদের অবহেলা করিয়া বারবার অ্যাপ্রিলেকে ডাকিয়া লইতেছেন। ফেষ্টাস্ কিছুতেই প্যারাসেল্‌সাস্‌কে প্রবুদ্ধ করিতে

পারিতেছেন না। ফেষ্টাস্ বিশ্বাস করিতেছেন—"একি হইল! করুণাময় পিতা! একি করিলে? এত-বড় জীবন এইরূপ বিধ্বস্তপ্রায় করিয়া ফেলিলে, আমি ত চিরকাল তোমার পদতলের শান্তিময় ছায়াখানির প্রতি চিত্ত নিবদ্ধ করিয়া আছি, আমি ত কখনো ভ্রান্ত হইয়া তোমার স্নেহময় দৃষ্টিকে হারাই নাই! আমার আর কি হইবে?—কিন্তু এই মহাত্মা! ইনি যদিও তোমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করেন নাই, তবু তোমারি পথে ত গিয়াছেন! একি! কি করিলে?" ক্রমে প্যারাসেল্সাস্ জাগিয়া উঠিলেন—কিন্তু বড়ই শ্রান্ত! "ফেষ্টাস্, তুমি একটা-কিছু বল। যা' ইচ্ছা, বল, শুধু তোমার কথা শুনিতে চাই!" ফেষ্টাস্ গান করিতে আরম্ভ করিলেন। "আরও, আরও গাও!" ফেষ্টাস্ আরও গাহিতে লাগিলেন।

প্যারাসেল্সাসের প্রাণ খুলিয়া গেল। যেন একটা ভয়ঙ্কর কালো সাপ প্যারাসেল্সাসের প্রাণের চারিধার হইতে কুণ্ডলী খুলিয়া লইয়া গানের সুরে আস্তে আস্তে পলাইয়া গেল। প্যারাসেল্সাসের প্রাণ খুলিয়া গিয়াছে। "ফেষ্টাস্, আমি মরিয়া যাইতেছি,—জীবনের ঝড় থামিয়া গিয়াছে, এখন বুঝিতে পারিতেছি—কত-বড় আলোড়নটা হইয়া গিয়াছে। আজ আমার তরণী শান্ত-নির্ম্মল আকাশের তলে সরল স্রোতে চলিয়া যাইতেছে—কিন্তু কিসের উপর দিয়া চলিতেছি? জল না স্থল? সিন্ধু যে লতা-পাতা-ভগ্নশাখায় আপনাকে ঢাকিয়া প্রান্তরের মত হইয়া চলিয়াছে—কত শাখা, কত পাতা, উড়িয়া যাইতেছে, গাছ উন্মূলিত হইয়া, উল্টা হইয়া উড়িয়া চলিয়াছে, এখনও তাহাতে পাখী রহিয়াছে—কত তীর ভাঙিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। আমার সমস্ত গতজীবনটা যেন আমার চক্ষের উপর ছুটিয়া যাইতেছে—আমি একই কালে যেন যৌবন, প্রৌঢ়বয়স, বার্দ্ধক্য, সমস্তে আপনাকে মণ্ডিত করিতেছি। আমি সমস্ত জীবনটা দেখিতে পাইতেছি, অথচ তাহার ভিতরে আমি মগ্ন নহি—আমি যেন মুক্ত হইয়া চলিয়াছি—প্রতি মুহূর্ত্তে শক্তি বাড়িয়া উঠিতেছে, যেন ডুব দিবার আগে প্রাণে নানা নূতন অনুভবশক্তি জাগিয়া উঠিবে"—বলিতে বলিতে যেন প্যারাসেল্সাসের শীর্ণগণ্ড প্রভাময় হইয়া উঠিল, কণ্ঠস্বর যৌবনের সমারোহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল—শূন্যের উপর আঙুল আঁকিয়া আঁকিয়া, যেন একখানা খোলা বহির পংক্তি অনুসরণ করিতে করিতে, হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্যারাসেল্সাস্ বলিতে আরম্ভ করিলেন। "কোথায়? আমার পক্ষিপালক-শোভিতপ্রান্ত রক্তবর্ণ গাউন্ কোথায়? আমি দাঁড়াইয়াই বরাবর বক্তৃতা করিতাম! আমার তরবারি আমার হাতে দাও—

"ফেষ্টাস্, সত্যসত্যই জানিতাম। জানিতাম, কি মহৎ কার্য্যের জন্য আমি আসিয়াছিলাম। অনেকে অন্তরের কথা ঠিক না শুনিয়া এদিক্ ওদিক্ ছুটিয়া মরে, শক্তির অপব্যয় করে—আমি প্রথম হইতেই আমার অন্তরের কথা জানিয়াছিলাম। জীবনের সমগ্র ক্ষেত্র আমার চক্ষে ভাসিয়াছিল। জানিতাম, এক অনন্তকালস্থায়ী শান্তিকেন্দ্র

হইতে জগতের সমস্ত বাহির হইয়া আসিতেছে, সমস্ত শক্তি ছুটিয়া আসিতেছে। ক্ষুদ্রতম প্রাণীর জীবনলীলাও সেই ব্রহ্মের মধ্যে সম্পাদিত হইতেছে। আনন্দের কণামাত্র যেথায়, ব্রহ্ম সেথায় বিরাজমান। নিয়তই দূরে এক পূর্ণসুখের ধ্রুবতারাকে চক্ষে রাখিয়া, সুখ, চক্র হইতে পরিবর্দ্ধিত চক্রে আরোহণ করিয়া চলিয়াছে। ধরণীর কেন্দ্রগহ্বরে বহ্নি জ্বলিতেছে, ধরণীর মুখ মনুষ্যমুখের মত রং ফিরাইতেছে, গলিত তপ্তধাতু পাথর বিদীর্ণ করিয়া খনির মধ্যে শাখায়িত হইয়া রং গাঢ় করিতে করিতে চলিয়া যায়, শুষ্ক নদীর তলায় পিঠ জাগাইয়া অবশেষে সূর্য্যালোকে কোথায় বাহির হইয়া চূর্ণবালুবৎ ঝরিয়া পড়ে,—ব্রহ্ম সেই আনন্দে মগ্ন। সমুদ্রতরঙ্গ সফেন শুভ্র হইয়া উঠে,—দগ্ধ, নির্জ্জন প্রান্তরে অদ্ভুত আগ্নেয়গিরিদল ভূতের মত উঠিয়া আসে—অগ্নিনেত্রে পরস্পরের দিকে চাহিয়া থাকে—ব্রহ্ম সেই আনন্দে মগ্ন। তার পরে ধরণী শীতে স্তম্ভিত—হঠাৎ বসন্ত কোথা হইতে নাচিতে নাচিতে আসিয়া ধরায় সঞ্জীবনী সুধা ছড়াইয়া দেয়; বন্ধুর-গিরিতটে শুষ্ক শিকড়-জাল ও তুষারস্ফোটের ভিতর হইতে এখানে-সেখানে এক-আধটি নবাঙ্কুরের শ্যামশোভা উদ্গত হইতে থাকে,—মনে হয়, একটি হাসির রেখা যেন অতিকষ্টে একটা বলীকুঞ্চিত মুখের উপর আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিতেছে!—এদিকে আবার পতঙ্গ-প্রজাপতি সূর্য্যালোকে উড়িয়া বেড়ায়, পিপীলিকা সার বাঁধিয়া কাজে যায়, বিহগদল আনন্দগানে বিভোর হইয়া ঊর্দ্ধে হইতে ঊর্দ্ধে ছুটিতে থাকে, দূরে মহাসাগর ঘুমাইয়া পড়ে, অরণ্যে-প্রান্তরে ভীষণ আরণ্যজন্তুরাও তাহাদের প্রীতিভাজনকে খুঁজিয়া বেড়ায়,—ব্রহ্ম সেই আনন্দে মগ্ন। জড়জগতে আনন্দবোধের কণা কণা ছড়ান রহিয়াছে, মানুষে আসিয়া সব কেন্দ্রীভূত হইল। এই পর্য্যন্ত জীবনের এক অধ্যায় সমাপ্ত। মানুষের কেন্দ্র হইতে আলোক বাহির হইয়া পশ্চাতের জগৎটিকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। মানুষ পশ্চাতে ফিরিয়া আপনার ইতিহাস খুঁজিয়া দেখে, ক্রমে সকল পদার্থে আপনার ভাব মাখাইয়া দিতে থাকে;—পবনপ্রচারে শব্দ উঠে, কখনো হাস্য, কখন জড়িতকলহ। দেবদারুদল জ্বলন্ত নরকদ্বারের ন্যায় অস্তসূর্য্যকে কাণ্ড-পংক্তি দ্বারা আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া সন্ধ্যায় কোন্ গভীর কথার আলাপ করে—অরণ্যের বৃক্ষাগ্রে কোন্ বনদেবতার বাঁকা চক্ষু উঁকি মারিয়া চাহিতে থাকে। প্রভাতকাল উল্লাস-উদ্যমে ভরিয়া উঠে, সন্ধ্যার সঙ্গে গভীর বিরাম আবির্ভূত হয়, অন্তকালের সিন্দুরচ্ছটা হইতে বিজয়গান ধ্বনিত হইয়া উঠে, কাহার সহাস্য মুখের ন্যায় পূর্ণচন্দ্রের আলোকে বিলাসরসে শস্য আপনাকে পাকাইতে থাকে। ক্রমে মানুষ, আরও সম্মুখে, আরও সম্মুখে চলিয়া যাউক্—সমস্ত জাতির জাগরণ নহিলে চলিবে না। এই যে সমাজদেহ নিদ্রিত রহিয়াছে!—একটি-দুটি অঙ্গ স্পন্দিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে হইবে কি?—সমস্ত দেহটিকে জাগিতে হইবে। অধর স্ফুরিত হইয়া আধ-আধ কি-কথা অনেক-

দিন হইল উচ্চারিত হইয়াছে—নিশ্বাস জোরে বহিয়াছে—একএকবার দৃঢ় দক্ষিণবাহু মুষ্টিবদ্ধ হইয়া যেন সিংহের ব্যাদানকে আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছে, তবু এখনো আদ্যোপান্ত নিদ্রিত। যেদিন জাগিবে, সেইদিনই আবার মানুষকে দেবরাজ্য-অভিমুখে চলিতে হইবে। আজই মানবের অন্তরে কত বিরাট্ আশা জাগিতেছে, কত গভীর ব্যথা আন্দোলিত হইতেছে—তাহার জন্য পরিবর্দ্ধিত ক্ষেত্র চাই। মানুষের ঈশ্বরের মহিমা জাজ্বল্যমান—আমি মানুষের জন্যই দেহমন সমর্পণ করিয়াছিলাম—সবই জানিতাম, তবু আমি বিফল হইয়াছি। শক্তির দিকে চাহিয়া আমার চক্ষু ঝলসিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম, শক্তিই মানুষের সার ধন। দুর্ব্বলতা, ভ্রম, আমি অকর্ম্মণ্য বলিয়া রাখিয়া দিলাম। অতীতকে অসম্পূর্ণ বলিয়া অবহেলা করিলাম। হে ভবিষ্যতের শিশু! তুমি তাহা করিও না,—অতীতের শিক্ষায় সতর্ক হইয়া তুমি চলিবে। অন্ধকার-অতীতের পার্শ্বে বর্ত্তমান তাহার আলোক লইয়া কাঁপিবে। ভাবিও না—অমনি ভবিষ্যৎ, সফলতা লইয়া উপস্থিত হইবে। অনায়াস আনন্দে স্বর্গমণ্ডল হইতে স্বর্গমণ্ডলে পরীর মত উড়িয়া যাওয়া মানুষের ভাগ্যে নাই। বহু বেদনার মধ্য দিয়া অনেকদিন ধরিয়া ধীরে ধীরে আনন্দে উপস্থিত হইবে—আশা-ভয়-প্রেমে এই সুদীর্ঘকাল মানুষকে মানুষ করিয়া রাখিবে। আমি অ্যাপ্রিলের কাছেই প্রেমের মহিমা জানিতে পারিয়াছিলাম—ঐ যে আমার অ্যাপ্রিলে দাঁড়াইয়া আছে। প্রেমই আগে। প্রেমের প্রেরণায় শক্তি জাগিয়া উঠিয়া কার্য্যে ধাবিত হইবে তাই, আমি আর অ্যাপ্রিলে. এই দুজনকে মিশাইয়াই একটি মাঝামাঝি জগৎ নির্ম্মিত হইবে—সেই মানুষ! ফেষ্টাস্, আজ আর আমার ভয় নাই। আজ আমি ভণ্ড বলিয়া পরিচিত হইলাম, ভালই হইয়াছে—যাহা অপরাধ, যাহা দুর্ব্বলতা ছিল, তাহার শাস্তি হোক—কিন্তু একদিন আমাকে সবাই জানিবে, আমি জগদীশ্বরের প্রদীপ বক্ষে চাপিয়া ধরিয়াছি, একদিন প্রকাশিত হইব। অ্যাপ্রিলে, তোমার হাত আমাকে দাও, অ্যাপ্রিলের সঙ্গে হাতাহাতি করিয়া আমি চলিলাম।"

প্যারাসেল্‌সাস্ চলিয়া গেলেন।

'প্যারাসেল্‌সাস্' কাব্য আলোচনা করিলাম। এই আলোচনাগুলিতে ব্রাউনিংএর কবিত্ব জানাইয়া দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। যাঁহারা ব্রাউনিংকে জানেন, তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। অনুবাদে আলোচনায় প্রচুরভাবে ব্রাউনিংএর বাক্যাবলীই আমি বাংলায় প্রদান করিয়াছি।

প্যারাসেল্‌সাসের প্রথম খণ্ডে অতিবিস্তৃত কথোপকথনে, বহুশাখান্বিত তর্কযুক্তিতে প্যারাসেল্‌সাসের জ্ঞানান্বেষণের উৎসাহই দেখিতে পাই। দ্বিতীয় খণ্ড পরম কবিত্বময়। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে ব্রাউনিং আমাদিগকে একটি মানবহৃদয়ের গুহায় নামাইয়া লইয়া নানারূপ তীব্রভাবের পরস্পর তাড়না অপূর্ব্বশক্তিসহকারে দেখাইয়া দিয়াছেন। চতুর্থ খণ্ডটি পরম রমণীয়। অবশেষে পঞ্চম খণ্ডে মৃত্যুর অন্ধকারে প্যারাসেল্‌সাসের মূলজ্ঞানপ্রাপ্তির আনন্দ অতি চমৎকার।

প্যারাসেল্‌সাস্‌সম্বন্ধে আর একটি কথা

বলিবার আছে। সে এই পঞ্চম অঙ্ক। ব্রাউনিং ইহা কোথায় পাইলেন? অবশ্য সমস্ত খণ্ডেই ব্রাউনিং মানুষটির গভীর হৃদয়গুহায় নামিয়াছেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু চতুর্থখণ্ড পর্য্যন্ত প্যারাসেল্‌সাসের যে জীবন,তাহা তাঁহার প্রাপ্ত ইতিহাস হইতে সহজেই নিদ্ধাশিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে; কিন্তু পঞ্চম খণ্ড অর্থাৎ 'প্যারাসেল্‌সাসের অভয়লাভ' ইতিহাসে আছে কি? এটুকু ব্রাউনিং জুড়িয়া দিয়াছেন। এইখানেই ব্রাউনিংএর ক্ষমতা!—খণ্ড ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত সম্পূর্ণতায় দৃষ্টিপ্রসারণেই কবির মাহাত্ম্য। মানবজীবন ক্ষণিক অন্ধকার সত্ত্বেও যে যুক্তি-শৃঙ্খলা-সৌন্দর্য্যে পূর্ণ, বিশৃঙ্খল বাহ্যঘটনা বিদীর্ণ করিয়া কবি তাহাই দেখাইয়া দিতে পারেন। প্যারাসেল্‌সাসের সেই দুর্লক্ষ্য অথচ নিতান্তই সত্য, জীবনের শেষ অঙ্কখানি, মানবহৃদয়ের মর্ম্মচারী ব্রাউনিং স্বভাবতই জাগাইয়া তুলিয়াছেন। আর্ট-হিসাবে অঙ্কগুলির সম্পূর্ণতাই বা কি চমৎকার! এই কাব্যটির আদ্যোপান্ত অনুধাবন করিয়া মনে হইল, একটি মানবহৃদয়ের, অন্ধকার এবং রত্নজ্যোতি জড়িত একটি গভীর প্রদেশ অতিক্রম করিয়া চলিয়া আসিলাম। সমুদ্রের ধ্বনির ন্যায় সেই গভীর হৃদয়ের ধ্বনি আমার কর্ণে বাজিতেছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

জাগরণ।

চিরদিন আছি আমি তব মুখে চাহি'
ওগো মম আরাধ্য-দেবতা! কোন্ ক্ষণে
পড়িবে তোমার দৃষ্টি, প্রসন্ন পবন
কবে আসি' ভরা পালে ল'য়ে যাবে টানি'
বিশ্বের কল্লোলমাঝে জীবনযৌবন।
আমি রহি বনান্তের অন্তরালে বসি'
নিরন্তর বহিতেছি অহল্যার মত
পাষাণ-হৃদয়। কোন্ শুভলগ্নে আসি'
রঞ্জিত কোমল তব পাদপদ্মখানি
পরশিবে জড় বক্ষে মোর—আমি উঠি'
সহসা বসিব জাগি'—নব অনুরাগে
নেহারিব নবীন মেদিনী।—সমুজ্জ্বল
হিরণ-কিরণরাজি পল্লবে, কুসুমে,

বনান্তে, বৃক্ষের শিরে, শ্যাম ধরাতলে,
শস্যশিরে উছলিবে অপূর্ব্ব প্রভায়।
পড়িবে সন্ধ্যার আলো মৃদু-হিল্লোলিত
তটিনীর বুকে—দূরে শ্যাম পল্লীমাঝে
ধূসর স্তব্ধতা ভেদি' উঠিবে স্বনিয়া
মঙ্গলশঙ্খের ধ্বনি সন্ধ্যারতিমাঝে।
সুখে-দুঃখে তরঙ্গিয়া স্তব্ধ মৌন প্রাণ
মুক্ত হবে জগতের প্রাণের মাঝারে
অনন্ত-পবনে।

এ কি দুরাশা কেবলি!
হায়! হায়! আমারি কি জীবন পাষাণ?
তুমি কি পাষাণ নহ হৃদয়-দেবতা?
জাগ্রত জগত-মাঝে মোর জাগরণ
তোমারি চরণতলে,—সে চরণখানি
এতই দুর্লভ ওগো এত অকরুণ!

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

সার সত্যের আলোচনা।

জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়।

আত্মজ্ঞানের কাঠিন্য যে কোন্‌খানে, তাহা বিগত প্রবন্ধে ইঙ্গিতে-আভাসে দেখানো হইয়াছে। যাহা দেখানো হইয়াছে, তাহা আরো স্পষ্ট করিয়া দেখানো যাইতে পারে এইরূপে :—

যাহা দৃষ্টিক্ষেত্রে প্রকাশ পায়, তাহারই নাম দৃশ্য; যাহা জ্ঞানে প্রকাশ পায়, তাহারই নাম জ্ঞেয়। যখন আমার সম্মুখবর্ত্তী ঐ শাখা হেলানিয়া তালগাছ'টা আমার দৃষ্টিক্ষেত্রে প্রকাশ পাইতেছে, তখন "আমি ঐ শাখা-হেলানিয়া তালগাছটা দেখিতেছি" এই মোট বৃত্তান্তটি আমার জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে। এরূপ স্থলে শাখা-হেলানিয়া তালগাছটা দৃশ্য, এবং "আমি ঐ তালগাছটা দেখিতেছি" এই মোট বৃত্তান্তটি জ্ঞেয়। ওটাই বা কেন দৃশ্য, আর, এটাই বা কেন জ্ঞেয়? ওটা (তালগাছটা) আমার চক্ষে প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া দৃশ্য; এটা (অর্থাৎ "আমি ঐ তালগাছটা দেখিতেছি" এই মোট বৃত্তান্তটি) আমার জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া জ্ঞেয়। ওটার ব্যালায় যেমন এরূপ হইতে পারে না যে, তালগাছের বা তাহার কোনো

খণ্ডাংশের শুদ্ধকেবল মধ্যপ্রদেশটিই আছে, তা বই তাহার আগা নাই অথবা গোড়া নাই; এটার ব্যালায়'ও তেমনি এরূপ হইতে পারে না যে, শুদ্ধকেবল "দেখিতেছি"-মাত্রটিই আছে, তা বই—যে দেখিতেছে সে-আমি নাই অথবা দৃষ্টিক্ষেত্রে কোনো দৃশ্য বিদ্যমান নাই। "তালগাছ" বলিলেই বুঝায় যে, তাহার আগা আছে—গোড়া আছে—মধ্যপ্রদেশ আছে; "দেখিতেছি" বলিলেই বুঝায় যে, মূলস্থানে আমি আছি—লক্ষ্যস্থানে দৃশ্য প্রকাশিত আছে—মাঝখানে দর্শনক্রিয়া চলিতেছে। মোট দৃশ্যের সঙ্গে একযোগে যেমন তাহার আগা, গোড়া এবং মধ্যপ্রদেশ, তিনই দৃশ্য; মোট জ্ঞেয়ের সঙ্গে একযোগে তেমনি জ্ঞানের কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া, তিনই জ্ঞেয়। ঐ শাখা-হেলানিয়া তালগাছটার সঙ্গে সঙ্গে উহার শাখাও আমার দৃষ্টিক্ষেত্রে প্রকাশ পাইতেছে; তথৈব, "আমি তালগাছ দেখিতেছি" এই মোট বৃত্তান্তটির সঙ্গে সঙ্গে "আমি"ও আমার জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছি। তবেই হইতেছে যে, শাখা-হেলানিয়া তালগাছটার সঙ্গে সঙ্গে শাখাও দৃশ্য; তথৈব, "আমি তালগাছ দেখিতেছি" এই মোট জ্ঞেয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমিও জ্ঞেয়। "আমি তালগাছ দেখিতেছি" এই কথাটির গোড়াতেই 'আমি' রহিয়াছে;—সেই গোড়া'র কথাটি জ্ঞানে প্রকাশ না পাইলে মোট কথাটা জ্ঞানে প্রকাশ পাইতে পারে না;—"আমি" এই ক্ষুদ্র কথাটি জ্ঞানে প্রকাশ না পাইলে, "আমি তালগাছ দেখিতেছি" এতগুলা কথা জ্ঞানে প্রকাশ পাইতে পারে না। "আমি" জ্ঞেয় না হইলে "আমি তালগাছ দেখিতেছি" এই মোট বৃত্তান্তটি জ্ঞেয় হইতে পারে না। অতএব "আমি তালগাছ দেখিতেছি" এই মোট বৃত্তান্তটি যখন আমার জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে, তখন কাজেই সেই সঙ্গে "আমি"ও আমার জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছি—সুতরাং "আমি"ও জ্ঞেয়। তবেই হইতেছে যে, মোট জ্ঞেয় বৃত্তান্তটির সহিত জড়িতরূপে—দৃশ্যমান বৃক্ষের দ্রষ্টারূপে—যে-আমি আপনার নিকটে প্রকাশ পাইতেছি, সে-আমি জ্ঞেয়-আমি। পক্ষান্তরে, ঐ জ্ঞেয়-আমির পশ্চাতে যে-আমি সাক্ষিরূপে (নিছক সাক্ষিরূপে) দণ্ডায়মান আছি, সেই-আমিই জ্ঞাতা আমি। আমার মন বলিতেছে যে, জ্ঞাতা-আমি এবং জ্ঞেয়-আমি, এ দুই আমি একই আমি। বুদ্ধি কিন্তু মনের ঐ সোজা কথাটিতে সায় দিতে ইতস্তত করিতেছে। বুদ্ধি ঘাড় নাড়িতেছে আর বলিতেছে— "তাহা হইবে কিরূপে? দুই আমি এক আমি হইব কিরূপে? বিশেষত যখন দুই আমি দুই রকমের;—এক আমি জ্ঞাতা, আর-এক আমি জ্ঞেয়। মন এবং বুদ্ধির মধ্যে এই যে, মতের অনৈক্য, ইহাই আত্মজ্ঞানের পথের কণ্টক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ ছার কণ্টকের উন্মোচন হইতে পারে কি উপায়ে, সেইটিই চিন্তার বিষয়।

তবে কি জ্ঞাতা-আমি এবং জ্ঞেয়-আমির একত্ব আমার মনে প্রকাশ পাইতেছে বই আর কিছুই নহে?—বাস্তবিক সত্য নহে? এইটিই হ'চ্চে জিজ্ঞাস্য। এ

প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে আমাদের জাগ্রত জ্ঞানের সাক্ষাতে কার্য্যত যাহা প্রতিনিয়ত ঘটে, তাহাই সর্ব্বাগ্রে প্রণিধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। অতএব দেখা যা'ক্ :—

নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিবার সময় আমার জ্ঞান যদি ব্যক্ত না হইত, তবে তো কোনো কথাই থাকিত না; তাহা হইলে জ্ঞাতা বা জ্ঞেয় এরূপ একটা কথা আমার মনেও স্থান পাইতে পারিত না—মুখেও বাহির হইতে পারিত না। কিন্তু জ্ঞান একবার ব্যক্ত হউক্ দেখি—সেই দণ্ডে সেই জ্ঞানের জাতৃস্থানে জ্ঞাতা আমি সাক্ষিরূপে অধিষ্ঠান করিব এবং তাহার জ্ঞেয়-স্থানে একদিকে যেমন ঘটপটাদি নানা বিষয় একটির পর আর-একটি যাওয়া-আসা করিতে থাকিবে, আর একদিকে তেমনি সেই সকল জ্ঞেয় বিষয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ জ্ঞেয়-আমি ক্রমাগতই ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকিবে। দেখিব তখন যে, জ্ঞেয়-আমি'র সম্মুখে যখন যে ভাবের বিষয় আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, তখন তাহার সঙ্গে গোড় দিয়া আপনিও সেই-ভাবের ব্যক্তি হইয়া দাঁড়াইতেছি—এইরূপে ঘড়ি-ঘড়ি বেশ-পরিবর্ত্তন করিতেছি। একই রাজা রাজসভায় দেশের মস্তকস্থানীয় মহা-মহা শূর-বীর এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-গণের মাঝখানে এক মূর্ত্তি ধারণ করেন; আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সহিত ভোজে বসিয়া তাঁহাদের মাঝখানে দ্বিতীয় আর-এক মূর্ত্তি ধারণ করেন; রঙ্গশালায় বয়স্য-গণের মাঝখানে তৃতীয় আর-এক মূর্ত্তি ধারণ করেন; অন্তঃপুরে পুত্র-কলত্রা-দির মাঝখানে চতুর্থ আর-এক মূর্ত্তি ধারণ করেন। যে-রাজা'র এইরূপ ঘড়ি-ঘড়ি মূর্ত্তি-পরিবর্ত্তন হইতেছে, সেই রাজাই রাজার জ্ঞেয়-আমি। তদ্ব্যতীত রাজার মধ্যে আর-এক রাজা আছেন—যিনি রাজার জ্ঞাতা-আমি। এ-রাজা (জ্ঞাতা-আমি) দেবপ্রতিমা'র ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া নির্নিমেষ চক্ষে ও-রাজার (জ্ঞেয়-আমি'র) বিচিত্র লীলা দর্শন করিতেছেন। জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় আমি-দুটার মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে, জ্ঞেয় আমি পরিবর্ত্তনশীল—জ্ঞাতা আমি অপরিবর্ত্তনীয়। এই যে দুই ভাবের দুই আমি—জ্ঞাতা আমি এবং জ্ঞেয় আমি—এ দুই আমি আপামর সাধারণ সকলেরই নিকটে এক আমি বলিয়া প্রকাশ পায়, তাহা জানি; কিন্তু প্রকাশ যে পায়—তাহা কি প্রকাশ পায় মাত্র, না তাহা বাস্তবিক সত্য—সেইটিই হ'চ্চে জিজ্ঞাস্য! তাহা শুদ্ধ-কেবল প্রকাশ-পাইতেছে-মাত্র হইলে তাহাতে আত্মজ্ঞানের পক্ষে বিশেষ কোনো ফল দর্শিতে পারে না। যাহা প্রকাশ পাই-তেছে, তাহা বাস্তবিক-সত্য-রূপে—ধ্রুব-সত্য-রূপে—প্রকাশ পাওয়া চাই, তবেই আত্মজ্ঞানের কাঠিন্যের অনেকটা লাঘব হইতে পারে।

মন তো অষ্টপ্রহরই বলিতেছে যে, "দুই আমি একই আমি—জ্ঞাতা-আমিই জ্ঞেয়-আমি এবং জ্ঞেয়-আমিই জ্ঞাতা-আমি"; তবে কেন বুদ্ধি তাহাতে সায় দিতে ইত-স্তত করিতেছে? অবশ্যই তাহার কোনো-না-কোনো কারণ আছে। সে কারণ এই যে, ব্যাঘ্র যদি মেষরূপে প্রকাশ পায়, তবে সেরূপ প্রকাশ'কে সত্যের প্রকাশ বলা যাইতে পারে না। ব্যাঘ্র যখন ব্যাঘ্র-রূপে প্রকাশ পায়, তখন তাহারই নাম সত্যের প্রকাশ। জ্ঞানের জাতৃস্থানে আমি অধিষ্ঠান করিতেছি কিরূপে?—অপরিবর্ত্ত-নীয় সাক্ষিরূপে প্রকাশ পাইবার সময় প্রকাশ পাইতেছি কিরূপে?—পরিবর্ত্তন-শীল নানারূপে। তবেই হইতেছে যে, আছি একরূপ—প্রকাশ পাইতেছি আর-একরূপ। এরূপ উল্টা-প্রকাশ'কে সত্যের প্রকাশ বলা যাইতে পারে না। জাতৃস্থানে আমি যেমন একই অপরিবর্ত্তনীয়, জ্ঞেয়-স্থানেও যদি সেইপ্রকার একই অপরি-বর্ত্তনীয় রূপে প্রকাশ পাইতাম তবেই আমি তাহাকে সত্যের প্রকাশ বলিয়া বুদ্ধিতে সমাদরপূর্ব্বক স্থানদান করিতে পারিতাম। এই বিষম গোলোকধাঁধার মধ্য হইতে বাহির হইবার একটি-কেবল পথ আছে; সে পথ এই :—

জ্ঞাতা-আমি'র জন্য কোনো চিন্তা নাই—জ্ঞাতা-আমি আপন পদে স্থির আছে; কেবল জ্ঞেয়-আমি কখনো বা সুখী, কখনো বা দুঃখী, কখনো বা জ্ঞানী, কখনো বা অজ্ঞানী, কখনো বা ঘটদ্রষ্টা, কখনো বা পটদ্রষ্টা, এইরূপে—ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন রূপে—প্রকাশ পায়। এরূপ যে হয়—কেন হয়? তাহার কারণ কি? কারণ যে কি, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে।

জ্ঞানের জ্ঞেয়-স্থানে যখন ধন-জন-যৌবন দেখা যায়—তখন জ্ঞেয় আমি তা'-সবা'র মাঝখানে সুখি-বেশে বুক ফুলাইয়া বিচরণ করে। জ্ঞানের জ্ঞেয়-স্থানে যখন স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের দীন-হীন-মলিন বেশ এবং বন্ধুবর্গের অপ্রসন্ন বদন দেখা যায়, তখন জ্ঞেয়-আমি তা-সবা'র মাঝখানে মুমূর্ষুভাবে কালাতিপাত করে। তবেই হইতেছে যে, জ্ঞেয় বিষয়ের পরিবর্ত্তনেই জ্ঞেয় আমি পরিবর্ত্তিত হয়—বা পরিবর্ত্তিত-হইতেছি-রূপে প্রকাশ পায়।

জ্ঞেয় বিষয় নানা; আর নানা বলিয়া এটার পরিবর্ত্তে ওটা, ওটার পরিবর্ত্তে সেটা, এইরূপে এটা-ওটা-সেটা'র মধ্যে পরিবর্ত্তন দাপিয়া বেড়াইতে জো পায়। পরিবর্ত্তনের মধ্যে স্থির থাকিবার এক-কেবল উপায়, যাহা বুদ্ধিতে পাওয়া যায়, তাহা এই :—

আমাদের জ্ঞানের জ্ঞেয়-স্থানে যদি অশেষ-বিধ বিচিত্র বস্তুসকলকে ক্রোড়ে করিয়া এক অদ্বিতীয় সর্ব্বশক্তিসমন্বিত সর্ব্বময় সত্য প্রকাশিত হ'ন—যে-সত্য জগতের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ দুই-ই একাধারে—অর্থাৎ যে-সত্য সত্যের একটা ভাব-মাত্র নহেন, পরন্তু বাস্তবিকই সত্য; তবে সেই একমাত্র অদ্বিতীয় জ্ঞেয়-বস্তুর সঙ্গে গোড় দিয়া আমার জ্ঞেয়-আমিও একই অপরিবর্ত্তনীয় আমি-রূপে প্রকাশ পাইতে পারে; অর্থাৎ জ্ঞানের জাতৃস্থানে আমি যেমন একই অপরিবর্ত্তনীয় আমি-রূপে অধিষ্ঠান করিতেছি, জ্ঞানের জ্ঞেয়-স্থানেও

তেমনি একই অপরিবর্ত্তনীয়-রূপে প্রকাশ পাইতে পারি; তাহা হইলেই জাতৃস্থানে আমি আছি যেরূপ, জ্ঞেয়স্থানে আমি প্রকাশ-পাই'ও সেইরূপ; ইহারই নাম বাস্তবিক-সত্য-রূপে আপনার নিকটে প্রকাশ পাওয়া। আত্মা যখন এইপ্রকার ধ্রুবসত্য-রূপে প্রকাশ পা'ন, তখন সেইরূপ প্রকাশই প্রকৃতপক্ষে আত্মজ্ঞান-শব্দের বাচ্য।

এ যাহা বলিলাম—ইহাতে দাঁড়াইতেছে এই যে, আত্মজ্ঞান এবং সত্যজ্ঞান এপিট-ওপিট। এইরূপ প্রকৃত আত্মজ্ঞান সাধকের পক্ষে কতদূর সম্ভাবনীয়—কি-প্রকারেই বা সম্ভাবনীয়, তখেব, সর্ব্বময় মহাশক্তিশালী এক অদ্বিতীয় সত্যবস্তুই বা কিরূপে জ্ঞানগম্য হইতে পারেন—এই সকল গভীর এবং গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে অতীব সাবধানে—প্রশান্ত, প্রণত এবং সংযত ভাবে—তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। অতএব আজিকের মতো এইখানেই বিশ্রাম করা শ্রেয়।

শ্রীরিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কল্পনা-সম্বল।

ভোর হতে নীলাকাশ ঢাকা কালো মেঘে,
ভিজে-ভিজে এলোমেলো বায়ু বহে বেগে।
কিছুই নাহিক হায় এ বুকের কাছে,
যা কিছু আকাশে আর বাতাসেতে আছে!

চোখের বালি।

(৫৪)

মহেন্দ্র তাহার মাতার ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, তখন আশা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া কহিল—"এখন ও ঘরে যাইয়ো না।"

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"

আশা কহিল—"ডাক্তার বলিয়াছেন, হঠাৎ মার মনে, সুখের হউক্, দুঃখের হউক্, একটা কোন আঘাত লাগিলে বিপদ্ হইতে পারে।"

মহেন্দ্র কহিল, "আমি একবার আস্তে আস্তে তাঁহার মাথার শিয়রের কাছে গিয়া দেখিয়া আসিগে—তিনি টের পাইবেন না।"

আশা কহিল—"তিনি অতি অল্প শব্দেই চম্‌কিয়া উঠিতেছেন, তুমি ঘরে ঢুকিলেই তিনি টের পাইবেন।"

মহেন্দ্র: তবে, এখন তুমি কি করিতে চাও?

আশা: আগে বিহারি-ঠাকুরপো আসিয়া একবার দেখিয়া যান্—তিনি যেরূপ পরামর্শ দিবেন, তাহাই করিব।

বলিতে বলিতে বিহারী আসিয়া পড়িল। আশা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল।

বিহারী। বৌঠা'ণ, ডাকিয়াছ? মা ভাল আছেন ত?

আশা বিহারীকে দেখিয়া যেন নির্ভর পাইল। কহিল, "তুমি যাওয়ার পর হইতে মা যেন আরো চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। প্রথমদিন তোমাকে না দেখিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিহারী কোথায় গেল?' আমি বলিলাম, 'তিনি বিশেষ কাজে গেছেন, বৃহস্পতিবারের মধ্যে ফিরিবার কথা আছে।' তাহার পর হইতে তিনি থাকিয়া-থাকিয়া চম্‌কিয়া উঠিতেছেন। মুখে কিছুই বলেন না, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছেন। কাল তোমার টেলিগ্রাম্ পাইয়া জানাইলাম, আজ তুমি আসিবে। শুনিয়া তিনি আজ তোমার জন্য বিশেষ করিয়া খাবার আয়োজন করিতে বলিয়াছেন। তুমি যাহা যাহা ভাল-বাস, সমস্ত আনিতে দিয়াছেন, সম্মুখের বারান্দায় রাঁধিবার আয়োজন করাইয়াছেন, তিনি ঘরে হইতে দেখাইয়া দিবেন। ডাক্তারের নিষেধ কিছুতেই শুনিলেন না। আমাকে এই খানিকক্ষণ হইল ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, 'বৌমা, তুমি নিজের হাতে সমস্ত রাঁধিবে,—আমি আজ সামনে বসাইয়া বিহারীকে খাওয়াইব।'"

শুনিয়া বিহারীর চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিল—"মা আছেন কেমন?"

আশা কহিল, "তুমি একবার নিজে দেখিবে এস—আমার ত বোধ হয়, ব্যামো আরো বাড়িয়াছে।"

তখন বিহারী ঘরে প্রবেশ করিল। মহেন্দ্র বাহিরে দাঁড়াইয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। আশা বাড়ীর কর্ত্তৃত্ব অনায়াসে গ্রহণ করিয়াছে—সে মহেন্দ্রকে কেমন সহজে ঘরে ঢুকিতে নিষেধ করিল! না করিল সঙ্কোচ, না করিল অভিমান! মহেন্দ্রের বল আজ কতখানি কমিয়া গেছে! সে অপরাধী, সে বাহিরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—মার ঘরেও ঢুকিতে পারিল না।

তাহার পরে ইহাও আশ্চর্য্য—বিহারীর সঙ্গে আশা কেমন অকুণ্ঠিতভাবে কথাবার্ত্তা কহিল! সমস্ত পরামর্শ তাহারই সঙ্গে! সেই আজ সংসারের একমাত্র রক্ষক, সকলের সুহৃৎ! তাহার গতিবিধি সর্ব্বত্র, তাহার উপদেশেই সমস্ত চলিতেছে। মহেন্দ্র কিছু-দিনের জন্য যে জায়গাটি ছাড়িয়া চলিয়া গেছে, ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সে জায়গা ঠিক আর তেমনটি নাই!

বিহারী ঘরে ঢুকিতেই রাজলক্ষ্মী তাঁহার করুণচক্ষু তাহার মুখের দিকে রাখিয়া কহি-লেন, "বিহারি, ফিরিয়াছিস্?"

বিহারী কহিল—"হাঁ মা, ফিরিয়া আসি-লাম।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "তোর কাজ শেষ হইয়া গেছে"—বলিয়া তাহার মুখের দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে চাহিলেন।

বিহারী প্রফুল্লমুখে "হাঁ মা, কাজ সুসম্পন্ন হইয়াছে, এখন আমার আর কোন ভাবনা নাই।"—বলিয়া বিহারী একবার বাহিরের দিকে চাহিল।

রাজলক্ষ্মী। আজ বৌমা তোমার জন্য নিজের হাতে রাঁধিবেন, আমি এখান হইতে দেখাইয়া দিব। ডাক্তার বারণ করে—কিন্তু আর বারণ কিসের জন্য বাছা? আমি কি একবার তোদের খাওয়া দেখিয়া যাইব না?

বিহারী কহিল, "ডাক্তারের বারণ করিবার ত কোন হেতু দেখি না মা,—তুমি না দেখাইয়া দিলে চলিবে কেন? ছেলেবেলা হইতে তোমার হাতের রান্নাই আমরা ভালবাসিতে শিখিয়াছি,—মহিন্দার ত পশ্চিমের ডালরুটি খাইয়া অরুচি ধরিয়া গেছে—আজ সে তোমার মাছের ঝোল পাইলে বাঁচিয়া যাইবে। আজ আমরা দুই ভাই ছেলেবেলাকার মত রেষারেষি করিয়া খাইব, তোমার বউমা অন্নে কুলাইতে পারিলে হয়।"

যদিচ রাজলক্ষ্মী বুঝিয়াছিলেন, বিহারী মহেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, তবু তাহার নাম শুনিতেই তাঁহার হৃদয় স্পন্দিত হইয়া নিশ্বাস ক্ষণকালের জন্য কঠিন হইয়া উঠিল।

সে ভাবটা কাটিয়া গেলে বিহারী কহিল, "পশ্চিমে গিয়া মহিন্দার শরীর অনেকটা ভাল হইয়াছে। আজ পথের অনিয়মে সে একটু ম্লান আছে, স্নানাহার করিলেই শুধ্‌রাইয়া উঠিবে।"

রাজলক্ষ্মী তবু মহেন্দ্রের কথা কিছু বলিলেন না। তখন বিহারী কহিল, "মা, মহিন্দা বাহিরেই দাঁড়াইয়া আছে, তুমি না ডাকিলে সে ত আসিতে পারিতেছে না।"

রাজলক্ষ্মী কিছু না বলিয়া দরজার দিকে চাহিলেন। চাহিতেই বিহারী ডাকিল—"মহিন্দা, এস!"

মহেন্দ্র ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল। পাছে হৃৎপিণ্ড হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া যায়, এই ভয়ে রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রের মুখের দিকে তখনই চাহিতে পারিলেন না। চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত করিলেন। মহেন্দ্র বিছানার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চমকিয়া উঠিল, তাহাকে কে যেন মারিল।

মহেন্দ্র মাতার পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া পা ধরিয়া পড়িয়া রহিল। বক্ষের স্পন্দনে রাজলক্ষ্মীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে অন্নপূর্ণা ধীরে ধীরে কহিলেন, "দিদি, মহিন্‌কে তুমি উঠিতে বল, নহিলে ও ত উঠিবে না!"

রাজলক্ষ্মী কষ্টে বাক্যস্ফুরণ করিয়া কহিলেন, "মহিন্, ওঠ্।"

মহিনের নাম উচ্চারণমাত্র অনেকদিন পরে তাঁহার চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সেই অশ্রু পড়িয়া তাঁহার হৃদয়ের বেদনা লঘু হইয়া আসিল। তখন মহেন্দ্র উঠিয়া মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া খাটের উপর বুক দিয়া তাহার মার পাশে আসিয়া বসিল। রাজলক্ষ্মী কষ্টে পাশ ফিরিয়া দুই-হাতে মহেন্দ্রের মাথা লইয়া তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন, তাহার ললাট চুম্বন করিলেন।

মহেন্দ্র রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "মা তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি, আমাকে মাপ কর।"

বক্ষ শান্ত হইলে রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "ও কথা বলিস্ নে মহিন্, আমি তোকে মাপ না করিয়া কি বাঁচি? বৌমা, বৌমা কোথায় গেল?"

আশা পাশের ঘরে পথ্য তৈরি করিতেছিল—অন্নপূর্ণা তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন।

তখন রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে ভূতল হইতে উঠিয়া তাঁহার খাটে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। মহেন্দ্র খাটে বসিলে রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রের পার্শ্বে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া আশাকে কহিলেন, "বৌমা, এইখানে তুমি বোস—আজ আমি একবার তোমাদের দুজনকে একত্রে বসাইয়া দেখিব, তাহা হইলে আমার সকল দুঃখ ঘুচিবে। বৌমা, আমার কাছে আর লজ্জা করিয়ো না,—আর মহিনের 'পরেও মনের মধ্যে কোন অভিমান না রাখিয়া একবার এইখানে বোস—আমার চোখ জুড়াও মা!"

তখন ঘোমটা মাথায় আশা লজ্জায় ধীরে ধীরে আসিয়া কম্পিতবক্ষে মহেন্দ্রের পাশে আসিয়া বসিল। রাজলক্ষ্মী স্বহস্তে আশার ডান হাত তুলিয়া লইয়া মহেন্দ্রের ডান হাতে রাখিয়া চাপিয়া ধরিলেন—কহিলেন, "আমার এই মাকে তোর হাতে দিয়া গেলাম মহিন্,—আমার এই কথাটি মনে রাখিস্, তুই এমন লক্ষ্মী আর কোথাও পাবি নে! মেজবৌ, এস, ইহাদের একবার আশীর্ব্বাদ কর—তোমার পুণ্যে ইহাদের মঙ্গল হোক্!"

অন্নপূর্ণা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই উভয়ে চোখের জলে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। অন্নপূর্ণা উভয়ের মস্তক চুম্বন করিয়া কহিলেন, "ভগবান্ তোমাদের কল্যাণ করুন।"

রাজলক্ষ্মী। বিহারি, এস বাবা, মহিন্‌কে তুমি একবার ক্ষমা কর।

বিহারী তখনি মহেন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই মহেন্দ্র উঠিয়া দৃঢ়বাহুদ্বারা বিহারীকে বক্ষে টানিয়া লইয়া কোলাকুলি করিল।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "মহিন্, আমি তোকে এই আশীর্ব্বাদ করি—শিশুকাল হইতে বিহারী তোর যেমন বন্ধু ছিল, চিরকাল তেমনি বন্ধু থাক্—ইহার চেয়ে তোর সৌভাগ্য আর কিছু হইতে পারে না।"

এই বলিয়া রাজলক্ষ্মী অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া নিস্তব্ধ হইলেন। বিহারী একটা উত্তেজক ঔষধ তাঁহার মুখের কাছে আনিয়া ধরিতেই রাজলক্ষ্মী হাত সরাইয়া দিয়া কহিলেন, "আর ওষুধ না বাবা! এখন আমি ভগবান্‌কে স্মরণ করি—তিনি আমাকে আমার সমস্ত সংসারদাহের শেষ ওষুধ দিবেন। মহিন্, তোরা একটুখানি বিশ্রাম কর্‌গে। বৌমা, এইবার রান্না চড়াইয়া দাও।"

সন্ধ্যাবেলায় বিহারী এবং মহেন্দ্র রাজলক্ষ্মীর বিছানার সম্মুখে নীচে পাত পাড়িয়া খাইতে বসিল। আশার উপর রাজলক্ষ্মী পরিবেষণের ভার দিয়াছিলেন, সে পরিবেষণ করিতে লাগিল।

মহেন্দ্রের বক্ষের মধ্যে অশ্রু উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার মুখে অন্ন উঠিতে

ছিল না। রাজলক্ষ্মী তাহাকে বারবার বলিতে লাগিলেন, "মহিন্, তুই কিছুই খাইতেছিস্ না কেন? ভাল করিয়া খা, আমি দেখি!"

বিহারী কহিল, "জানই ত মা, মহিন্‌দা চিরকাল ঐ-রকম, কিছুই খাইতে পারে না। বোঠা'ণ, ঐ ঘণ্টটা আমাকে আর-একটু দিতে হইবে, বড় চমৎকার হইয়াছে।"

রাজলক্ষ্মী খুসি হইয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আমি জানি, বিহারী ঐ ঘণ্টটা ভালবাসে। বৌমা, ওটুকুতে কি হইবে, আর-একটু বেশি করিয়া দাও।"

বিহারী কহিল, "মা, তোমার এই বৌটি বড় কৃপণ, হাত দিয়া কিছু গলে না।"

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিলেন, "দেখ ত বৌমা, বিহারী তোমারি নুণ্ খাইয়া তোমারি নিন্দা করিতেছে।"

আশা বিহারীর পাতে একরাশ ঘণ্ট দিয়া গেল।

বিহারী কহিল, "হায় হায়! ঘণ্ট দিয়াই আমার পেট ভরাইবে দেখিতেছি, আর ভাল ভাল জিনিষ সমস্তই মহিন্‌দার পাতে পড়িবে।"

আশা ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিয়া গেল, "নিন্দুকের মুখ কিছুতেই বন্ধ হয় না।"

বিহারী মৃদুস্বরে কহিল, "মিষ্টান্ন দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, বন্ধ হয় কি না!"

দুই বন্ধুর আহার হইয়া গেলে, রাজলক্ষ্মী অত্যন্ত তৃপ্তিবোধ করিলেন। কহিলেন, "বৌমা, তুমি শীঘ্র খাইয়া এস।"

রাজলক্ষ্মীর আদেশে আশা খাইতে গেলে তিনি মহেন্দ্রকে কহিলেন, "মহিন্, তুই শুইতে যা।"

মহেন্দ্র কহিল, "এখনি শুইতে যাইব কেন?"

মহেন্দ্র রাত্রে মাতার সেবা করিবে স্থির করিয়াছিল। রাজলক্ষ্মী কোনমতেই তাহা ঘটিতে দিলেন না। কহিলেন, "তুই শ্রান্ত আছিস্ মহিন্, তুই শুইতে যা!"

আশা আহার শেষ করিয়া পাখা লইয়া রাজলক্ষ্মীর শিয়রের কাছে আসিয়া বসিবার উপক্রম করিলে, তিনি চুপিচুপি তাহাকে কহিলেন,—"বৌমা, মহেন্দ্রের বিছানা ঠিক হইয়াছে কি না দেখ গে, সে একলা আছে।"

আশা লজ্জায় মরিয়া গিয়া কোনমতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ঘরে কেবল বিহারী এবং অন্নপূর্ণা রহিলেন।

তখন রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "বিহারি, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। বিনোদিনীর কি হইল বলিতে পারিস্? সে এখন কোথায়?"

বিহারী কহিল—"বিনোদিনী কলিকাতায় আছে।"

রাজলক্ষ্মী নীরবদৃষ্টিতে বিহারীকে প্রশ্ন করিলেন। বিহারী তাহা বুঝিল। কহিল, "বিনোদিনীর জন্য তুমি আর কিছুমাত্র ভয় করিয়ো না মা!"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "সে আমাকে অনেক দুঃখ দিয়াছে বিহারি, তবু তাহাকে আমি মনে মনে ভালবাসি!"

বিহারী কহিল, "সে-ও তোমাকে মনে মনে ভালবাসে মা!"

রাজলক্ষ্মী। আমারো তাই বোধ হয় বিহারি। দোষগুণ সকলেরই আছে, কিন্তু

সে আমাকে ভালবাসিত। তেমন সেবা কেহ ছল করিয়া করিতে পারিত না।

বিহারী কহিল, "তোমার সেবা করিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া আছে।"

রাজলক্ষ্মী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "মহিন্‌রা ত এখন শুইতে গেছে, রাত্রে তাহাকে একবার আনিলে কি ক্ষতি আছে?"

বিহারী কহিল,—"মা, সে ত এই বাড়ীরই বাহির-ঘরে লুকাইয়া বসিয়া আছে। তাহাকে আজ সমস্তদিন জলবিন্দু পর্য্যন্ত মুখে দেওয়াইতে পারি নাই। সে পণ করিয়াছে, যতক্ষণ তুমি তাহাকে ডাকিয়া না মাপ করিবে, ততক্ষণ সে জলস্পর্শ করিবে না!"

রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—"সমস্তদিন উপবাস করিয়া আছে! আহা, তাহাকে ডাক, ডাক!"

বিনোদিনী ধীরে ধীরে রাজলক্ষ্মীর ঘরে প্রবেশ করিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ছিছি বউ, তুমি করিয়াছ কি? আজ সমস্তদিন উপোস করিয়া আছ? খাও খাও, আগে খাইয়া লও, তাহার পরে কথা হইবে।"

বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীর পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া কহিল—"আগে তুমি পাপিষ্ঠাকে মাপ কর পিসিমা, তবে আমি খাইব।"

রাজলক্ষ্মী। "মাপ করিয়াছি বাছা, মাপ করিয়াছি, আমার এখন কাহারো উপর আর রাগ নাই।"—বিনোদিনীর ডানহাত ধরিয়া তিনি কহিলেন,—"বউ তোমা হইতে কাহারও মন্দ না হউক্, তুমিও ভাল থাক।"

বিনোদিনী। তোমার আশীর্ব্বাদ মিথ্যা হইবে না পিসিমা। আমি তোমার পা ছুঁইয়া বলিতেছি, আমা হইতে এ সংসারের মন্দ হইবে না।

অন্নপূর্ণাকে বিনোদিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া খাইতে গেল। খাইয়া আসিলে পর রাজলক্ষ্মী তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বউ, এখন তবে তুমি চলিলে?"

বিনোদিনী। পিসিমা, আমি তোমার সেবা করিব। ঈশ্বর সাক্ষী—আমা হইতে তুমি কোন অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়ো না।

রাজলক্ষ্মী বিহারীর মুখের দিকে চাহিলেন। বিহারী একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "বোঠা'ণ থাকুন্ মা, তাহাতে ক্ষতি হইবে না।"

রাত্রে বিহারী, বিনোদিনী এবং অন্নপূর্ণা, তিন জনে মিলিয়া রাজলক্ষ্মীর শুশ্রূষা করিলেন।

এদিকে আশা সমস্তরাত্রি রাজলক্ষ্মীর ঘরে আসে নাই বলিয়া লজ্জায় অত্যন্ত প্রত্যূষে উঠিয়াছে। মহেন্দ্রকে বিছানায় সুপ্ত অবস্থায় রাখিয়া তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া প্রস্তুত হইয়া আসিল। তখনো অন্ধকার একেবারে যায় নাই। রাজলক্ষ্মীর দ্বারের কাছে আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে আশা অবাক্ হইয়া গেল। ভাবিল, "একি স্বপ্ন!"

বিনোদিনী একটি স্পিরিট্‌ল্যাম্প জ্বালিয়া জল গরম করিতেছে। বিহারী রাত্রে ঘুমাইতে পায় নাই, তাহার জন্য চা তৈরি হইবে।

আশাকে দেখিয়া বিনোদিনী উঠিয়া

দাঁড়াইল। কহিল, "আজ আমি আমার সমস্ত অপরাধ লইয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম—আর কেহ আমাকে দূর করিতে পারিবে না—কিন্তু তুমি যদি বল 'যাও', ত আমাকে এখনি যাইতে হইবে।"

আশা কোন উত্তর করিতে পারিল না—তাহার মন কি বলিতেছে, তা-ও সে যেন ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না, অভিভূত হইয়া রহিল।

বিনোদিনী কহিল—"আমাকে কোন-দিন তুমি মাপ করিতে পারিবে না—সে চেষ্টাও করিয়ো না। কিন্তু আমাকে আর ভয় করিয়ো না। যে কয়দিন পিসিমার দরকার হইবে, সেই কটাদিন আমাকে একটুখানি কাজ করিতে দাও, তার পরে আমি চলিয়া যাইব।"

কাল রাজলক্ষ্মী যখন আশার হাত লইয়া মহেন্দ্রের হাতে দিলেন, তখন আশা তাহার মন হইতে সমস্ত অভিমান মুছিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণভাবে মহেন্দ্রের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। আজ বিনোদিনীকে সম্মুখে দেখিয়া তাহার খণ্ডিত প্রেমের দাহ আর শান্তি মানিল না। ইহাকে মহেন্দ্র একদিন ভালবাসিয়াছিল, ইহাকে এখনো হয় ত মনে মনে ভালবাসে—এ কথা তাহার বুকের ভিতরে ঢেউয়ের মত ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই মহেন্দ্র জাগিয়া উঠিবে, বিনোদিনীকে দেখিবে, কি জানি কি চক্ষে দেখিবে! কাল রাত্রে আশা তাহার সমস্ত সংসারকে নিষ্কণ্টক দেখিয়াছিল—আজ প্রত্যূষে উঠিয়াই দেখিল, কাঁটা-গাছ তাহার ঘরের প্রাঙ্গণেই। সংসারে সুখের স্থানই সব চেয়ে সঙ্কীর্ণ—কোথাও তাহাকে সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার অবকাশ নাই।

হৃদয়ের ভার লইয়া আশা রাজলক্ষ্মীর ঘরে প্রবেশ করিল—এবং অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে কহিল, "মাসিমা, তুমি সমস্ত রাত বসিয়া আছ, যাও শুতে যাও!" অন্নপূর্ণা আশার মুখের দিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পরে শুইতে না গিয়া আশাকে নিজের ঘরে লইয়া গেলেন। কহিলেন, "চুনি, যদি সুখী হইতে চাস্, তবে সব কথা মনে রাখিস্ নে। অন্যকে দোষী করিয়া যেটুকু সুখ, দোষ মনে রাখিবার দুঃখ তাহার চেয়ে ঢের বেশি।"

আশা কহিল, "মাসিমা, আমি মনে কিছু পুষিয়া রাখিতে চাই না, আমি ভুলিতেই চাই, কিন্তু ভুলিতে দেয় না যে!"

অন্নপূর্ণা। বাছা, তুই ঠিক বলিয়াছিস্—উপদেশ দেওয়া সহজ, উপায় বলিয়া দেওয়াই শক্ত। তবু আমি তোকে একটা উপায় বলিয়া দিতেছি। যেন ভুলিয়াছিস্, এই ভাবটি অন্তত বাহিরে প্রাণপণে রক্ষা করিতে হইবে—আগে বাহিরে ভুলিতে আরম্ভ করিস্, তাহা হইলে ভিতরেও ভুলিবি! এ কথা মনে রাখিস্ চুনি, তুই যদি না ভুলিস্, তবে অন্যকেও স্মরণ করাইয়া রাখিবি! তুই নিজের ইচ্ছায় না পারিস্, আমি তোকে আজ্ঞা করিতেছি, তুই বিনোদিনীর সঙ্গে এমন ব্যবহার কর্, যেন সে কখনো তোর কোন অনিষ্ট করে নাই এবং তাহার দ্বারা তোর অনিষ্টের কোন আশঙ্কা নাই।

আশা নম্রমুখে কহিল, "কি করিতে হইবে বল?"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "বিনোদিনী এখন বিহারীর জন্যে চা তৈরি করিতেছে। তুই দুধ-চিনি-পেয়ালা সমস্ত লইয়া যা—দুইজনে মিলিয়া কাজ কর্।"

আশা আদেশপালনের জন্য উঠিল। অন্নপূর্ণা কহিলেন, "এটা সহজ—কিন্তু আমার আর-একটি কথা আছে, সেটা আরো শক্ত—সেইটে তোকে পালন করিতেই হইবে। মাঝে মাঝে মহেন্দ্রের সঙ্গে বিনোদিনীর দেখা হইবেই, তখন তোর মনে কি হইবে, তাহা আমি জানি—সে সময়ে তুই গোপন-কটাক্ষেও মহেন্দ্রের ভাব কিংবা বিনোদিনীর ভাব দেখিবার চেষ্টামাত্রও করিস্ নে। বুক ফাটিয়া গেলেও তোকে অবিচলিত থাকিতে হইবে। মহেন্দ্র ইহা জানিবে যে, তুই সন্দেহ করিস্ না, শোক করিস্ না,—তোর মনে ভয় নাই, চিন্তা নাই;—জোড় ভাঙিবার পূর্ব্বে যেমন ছিল, জোড় লাগিয়া আবার ঠিক তেম্‌নিই হইয়াছে—ভাঙনের দাগটুকুও মিলাইয়া গেছে। মহেন্দ্র কি আর কেহ তোর মুখ দেখিয়া নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে করিবে না। চুনি, ইহা আমার অনুরোধ বা উপদেশ নহে, ইহা তোর মাসিমার আদেশ। আমি যখন কাশী চলিয়া যাইব, আমার এই কথাটি একদিনের জন্যও ভুলিস্ নে।"

আশা চায়ের পেয়ালা প্রভৃতি লইয়া বিনোদিনীর কাছে উপস্থিত হইল। কহিল, "জল কি গরম হইয়াছে? আমি চায়ের দুধ আনিয়াছি।"

বিনোদিনী আশ্চর্য্য হইয়া আশার মুখের দিকে চাহিল। কহিল—"বিহারি-ঠাকুরপো বারান্দায় বসিয়া আছেন, চা তুমি তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দাও, আমি ততক্ষণ পিসিমার জন্য মুখ ধুইবার বন্দোবস্ত করিয়া রাখি। তিনি বোধ হয় এখনি উঠিবেন।"

বিনোদিনী চা লইয়া বিহারীর কাছে গেল না। বিহারী ভালবাসা স্বীকার করিয়া তাহাকে যে অধিকার দিয়াছে, সেই অধিকার স্বেচ্ছামতে খাটাইতে তাহার সঙ্কোচবোধ হইতে লাগিল। অধিকারলাভের যে মর্য্যাদা আছে, সেই মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে অধিকারপ্রয়োগকে সংযত করিতে হয়। যতটা পাওয়া যায়, ততটা লইয়া টানাটানি করা কাঙালকেই শোভা পায়—ভোগকে খর্ব্ব করিলেই সম্পদের যথার্থ গৌরব। এখন, বিহারী তাহাকে নিজে না ডাকিলে, কোন একটা উপলক্ষ্য করিয়া বিনোদিনী তাহার কাছে আর যাইতে পারে না।

বলিতে বলিতেই মহেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। আশার বুকের ভিতরটা যদিও ধড়াস্ করিয়া উঠিল, তবু সে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া স্বাভাবিক স্বরে মহেন্দ্রকে কহিল—"তুমি এত ভোরে উঠিলে যে? পাছে আলো লাগিয়া তোমার ঘুম ভাঙে, তাই আমি জান্‌লা-দরজা সব বন্ধ করিয়া আসিয়াছি।"

বিনোদিনীর সম্মুখেই আশাকে এইরূপ সহজভাবে কথা কহিতে শুনিয়া মহেন্দ্রের বুকের একটা পাথর যেন নামিয়া গেল। সে আনন্দিতচিত্তে কহিল, "মা কেমন

আছেন, তাই দেখিতে আসিয়াছি—মা কি এখনো ঘুমাইতেছেন ?"

আশা কহিল, "হাঁ তিনি ঘুমাইতেছেন, এখন তুমি যাইয়ো না। বিহারি-ঠাকুরপো বলিয়াছেন, তিনি আজ অনেকটা ভাল আছেন। অনেকদিন পরে কাল তিনি সমস্তরাত ভাল করিয়া ঘুমাইয়াছেন।"

মহেন্দ্র নিশ্চিন্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকীমা কোথায় ?"

আশা তাঁহার ঘর দেখাইয়া দিল।

আশার এই দৃঢ়তা ও সংযম দেখিয়া বিনোদিনীও আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

মহেন্দ্র ডাকিল, "কাকীমা।"

অন্নপূর্ণা যদিও ভোরে স্নান করিয়া লইয়া এখন পূজায় বসিবেন স্থির করিয়াছিলেন, তবু তিনি কহিলেন, "আয় মহিন্, আয়!"

মহেন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "কাকীমা, আমি পাপিষ্ঠ, তোমাদের কাছে আসিতে আমার লজ্জা করে!"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "ছিছি ও কথা বলিস্ নে মহিন্—ছেলে ধূলা লইয়াও মার কোলে আসিয়া বসে।"

মহেন্দ্র। কিন্তু আমার এ ধূলা কিছুতেই মুছিবে না কাকীমা।

অন্নপূর্ণা। তুই একবার ঝাড়িলেই ঝরিয়া যাইবে। মহিন্, ভালই হইয়াছে। নিজেকে ভাল বলিয়া তোর অহঙ্কার ছিল, নিজের 'পরে বিশ্বাস তোর বড় বেশি ছিল, পাপের ঝড়ে তোর সেই গর্ব্বটুকুই ভাঙিয়া দিয়াছে, আর কোন অনিষ্ট করে নাই।

মহেন্দ্র। কাকীমা, এবার তোমাকে আর ছাড়িয়া দিব না, তুমি গিয়াই আমার এই দুর্গতি হইয়াছে!

অন্নপূর্ণা। আমি থাকিয়া যে দুর্গতি ঠেকাইয়া রাখিতাম, সে দুর্গতি একবার ঘটিয়া যাওয়াই ভাল। এখন আর তোর আমাকে কোন দরকার হইবে না।

দরজার কাছে আবার ডাক পড়িল—"কাকীমা, আহ্নিকে বসিয়াছ নাকি ?"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "না, তুই আয়।"

বিহারী ঘরে প্রবেশ করিল। এত সকালে মহেন্দ্রকে জাগ্রত দেখিয়া কহিল, "মহিন্‌দা, আজ তোমার জীবনে এই বোধ হয় প্রথম সূর্য্যোদয় দেখিলে!"

মহেন্দ্র কহিল—"হাঁ বিহারি, আজ আমার জীবনে প্রথম সূর্য্যোদয়। বিহারীর বোধ হয় কাকীমার সঙ্গে কোন পরামর্শ আছে—আমি যাই।"

বিহারী হাসিয়া কহিল, "তোমাকেও না হয় ক্যাবিনেটের মিনিষ্টার করিয়া লওয়া গেল। তোমার কাছে আমি ত কখনো কিছু গোপন করি নাই—যদি আপত্তি না কর, আজও গোপন করিব না।"

মহেন্দ্র। আমি আপত্তি করিব! তবে, আর দাবী করিতে পারি না বটে। তুমি যদি আমার কাছে কিছু গোপন না কর, তবে আমিও আমার প্রতি আবার শ্রদ্ধা করিতে পারিব।

আজকাল মহেন্দ্রের সম্মুখে সকল কথা অসঙ্কোচে বলা কঠিন। বিহারীর মুখে বাধিয়া আসিল, তবু সে জোর করিয়া বলিল—"বিনোদিনীকে বিবাহ করিব, এমন একটা কথা উঠিয়াছিল, কাকীমার সঙ্গে সেই

সম্বন্ধে আমি কথাবার্ত্তা শেষ করিতে আসিয়াছি।"

মহেন্দ্র একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা চকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"এ আবার কি কথা বিহারি ?"

মহেন্দ্র প্রবল শক্তি প্রয়োগ করিয়া সঙ্কোচ দূর করিল। কহিল, "বিহারি, এ বিবাহের কোন প্রয়োজন নাই।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "এ বিবাহের প্রস্তাবে কি বিনোদিনীর কোন যোগ আছে ?"

বিহারী কহিল—"কিছুমাত্র না!"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "সে কি ইহাতে রাজি হইবে ?"

মহেন্দ্র বলিয়া উঠিল—"বিনোদিনী কেন রাজি হইবে না কাকীমা ? আমি জানি, সে একমনে বিহারীকে ভক্তি করে—এমন আশ্রয় সে কি ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারে ?"

বিহারী কহিল—"মহিন্‌দা, আমি বিনোদিনীকে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছি—সে লজ্জার সঙ্গে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।"

শুনিয়া মহেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল।

(৫৫)

ভালয়-মন্দয় দুই-তিন-দিন রাজলক্ষ্মীর কাটিয়া গেল। একদিন প্রাতে তাঁহার মুখ বেশ প্রসন্ন ও বেদনা সমস্ত হ্রাস হইল। সেইদিন তিনি মহেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন—"আর আমার বেশিক্ষণ সময় নাই—কিন্তু আমি বড় সুখে মরিলাম মহিন্, আমার কোন দুঃখ নাই। তুই যখন ছোট ছিলি, তখন তোকে লইয়া আমার যে আনন্দ ছিল, আজ সেই আনন্দে আমার বুক ভরিয়া উঠিয়াছে—তুই আমার কোলের ছেলে, আমার বুকের ধন—তোর সমস্ত বালাই লইয়া আমি চলিয়া যাইতেছি, এই আমার বড় সুখ!"—বলিয়া রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রের মুখে-গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। মহেন্দ্রের রোদন বাধা না মানিয়া উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "কাঁদিস্ নে মহিন্! লক্ষ্মী ঘরে রহিল। বৌমাকে আমার চাবিটা দিস্। সমস্তই আমি গুছাইয়া রাখিয়াছি; তোদের ঘরকন্নার জিনিষের কোন অভাব হইবে না। আর-একটি কথা আমি বলি মহিন্, আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে কাহাকেও জানাস্ নে—আমার বাক্সে দুহাজার টাকার নোট আছে, তাহা আমি বিনোদিনীকে দিলাম। সে বিধবা, একাকিনী, ইহার সুদ হইতে তাহার বেশ চলিয়া যাইবে—কিন্তু মহিন্, তাহাকে তোদের সংসারের ভিতরে রাখিস্ নে, তোর প্রতি আমার এই অনুরোধ রহিল!"

বিহারীকে ডাকিয়া রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "বাবা বিহারি, কাল মহিন্ বলিতেছিল, তুই গরীব ভদ্রলোকদের চিকিৎসার জন্য একটি বাগান করিয়াছিস্—ভগবান্ তোকে দীর্ঘজীবী করিয়া গরীবের হিত করুন। আমার বিবাহের সময় আমার শ্বশুর আমাকে একখানি গ্রাম যৌতুক করিয়াছিলেন, সেই গ্রামখানি আমি তোকে দিলাম, তোর গরীবদের কাজে লাগাস্, তাহাতে আমার শ্বশুরের পুণ্য হইবে।"

রাজলক্ষ্মীর মৃত্যু হইলে পর শ্রাদ্ধশেষে মহেন্দ্র কহিল—"ভাই বিহারি, আমি

ডাক্তারি জানি—তুমি যে কাজ আরম্ভ করিয়াছ, আমাকেও তাহার মধ্যে নাও। চুনি যেরূপ গৃহিণী হইয়াছে, সে-ও তোমার অনেক সহায়তা করিতে পারিবে। আমরা সকলে সেইখানেই থাকিব।"

বিহারী কহিল—"মহিন্‌দা, ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ—এ কাজ কি বরাবর তোমার ভাল লাগিবে? বৈরাগোর ক্ষণিক উচ্ছ্বাসের মুখে একটা স্থায়ী ভার গ্রহণ করিয়া বসিয়া না।"

মহেন্দ্র কহিল—"বিহারি, তুমিও ভাবিয়া দেখ, যে জীবন আমি গঠন করিয়াছি, তাহাকে লইয়া আলস্যভরে আর উপভোগ করিবার জো নাই—কর্ম্মের দ্বারা তাহাকে যদি টানিয়া লইয়া না চলি, তবে কোন্‌দিন সে আমাকে টানিয়া অবসাদের মধ্যে ফেলিবে। তোমার কর্ম্মের মধ্যে আমাকে স্থান দিতেই হইবে।"

সেই কথাই স্থির হইয়া গেল।

অন্নপূর্ণা ও বিহারী বসিয়া শান্ত বিষাদের সহিত সেকালের কথা আলোচনা করিতেছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের বিদায়ের সময় কাছে আসিয়াছে। বিনোদিনী দ্বারের কাছে আসিয়া কহিল, "কাকীমা, আমি কি এখানে একটু বসিতে পারি?"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "এস, এস বাছা, বোস।"

বিনোদিনী আসিয়া বসিলে তাহার সহিত দুই-চারিটা কথা কহিয়া বিছানা তুলিবার উপলক্ষ্য করিয়া অন্নপূর্ণা বারান্দায় গেলেন।

বিনোদিনী বিহারীকে কহিল, "এখন আমার প্রতি তোমার যাহা আদেশ, তাহা বল!"

বিহারী কহিল, "বোঠা'ণ, তুমিই বল, তুমি কি করিতে চাও!"

বিনোদিনী কহিল—"শুনিলাম, গরীবদের চিকিৎসার জন্য গঙ্গার ধারে তুমি একখানি বাগান লইয়াছ;—আমি সেখানে তোমার কোন-একটা কাজ করিব। কিছু না হয় ত আমি রাঁধিয়া দিতে পারি।"

বিহারী কহিল, "বোঠা'ণ, আমি অনেক ভাবিয়াছি। নানান্ হাঙ্গামে আমাদের জীবনের জালে অনেক জট পড়িয়া গেছে। এখন নিভৃতে বসিয়া-বসিয়া তাহারই একটি একটি গ্রন্থিমোচন করিবার দিন আসিয়াছে। পূর্ব্বে সমস্ত পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। এখন হৃদয় যাহা চায়, তাহাকে আর প্রশ্রয় দিতে সাহস হয় না। এ পর্য্যন্ত যাহা-কিছু ঘটিয়াছে, যাহা-কিছু সহ্য করিয়াছি, তাহার সমস্ত আবর্ত্তন, সমস্ত আন্দোলন শান্ত করিতে না পারিলে, জীবনের সমাপ্তির জন্য প্রস্তুত হইতে পারিব না। যদি সমস্ত অতীতকাল অনুকূল হইত, তবে সংসারে একমাত্র তোমার দ্বারাই আমার জীবন সম্পূর্ণ হইতে পারিত,—এখন তোমা হইতে; আমাকে বঞ্চিত হইতেই হইবে। এখন আর সুখের জন্য চেষ্টা বৃথা, এখন কেবল আস্তে আস্তে সমস্ত ভাঙচুর সারিয়া লইতে হইবে।"

এই সময় অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিতেই বিনোদিনী কহিল, "মা, আমাকে তোমার পায়ে স্থান দিতে হইবে। পাপিষ্ঠা বলিয়া আমাকে তুমি ঠেলিয়ো না।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "মা, চল, আমার সঙ্গেই চল।"

অন্নপূর্ণা ও বিনোদিনীর কাশীতে যাইবার দিন কোন সুযোগে বিহারী বিরলে বিনোদিনীর সহিত দেখা করিল। কহিল, "বোঠা'ণ, তোমার একটা-কিছু চিহ্ন আমি কাছে রাখিতে চাই।"

বিনোদিনী কহিল, "আমার এমন কি আছে, যাহা চিহ্নের মত কাছে রাখিতে পার?"

বিহারী লজ্জা ও সঙ্কোচের সহিত কহিল—"ইংরাজের একটা প্রথা আছে, প্রিয়জনের একগুচ্ছ চুল স্মরণের জন্য রাখিয়া দেয়—যদি তুমি—"

বিনোদিনী। ছিছি কি ঘৃণা! আমার চুল লইয়া কি করিবে! সেই অশুচি মৃতবস্তু আমার এমন কিছুই নহে, যাহা আমি তোমাকে দিতে পারি। আমি হতভাগিনী তোমার কাজে থাকিতে পারিব না—আমি এমন একটা-কিছু দিতে চাই, যাহা আমার হইয়া তোমার কাজ করিবে—বল, তুমি লইবে?

বিহারী কহিল—"লইব।"

তখন বিনোদিনী তাহার অঞ্চলের প্রান্ত খুলিয়া হাজারটাকার দুইখানি নোট বিহারীর হাতে দিল।

বিহারী সুগভীর আবেগের সহিত স্থিরদৃষ্টিতে বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। খানিক বাদে বিহারী কহিল, "আমি কি তোমাকে কিছু দিতে পারিব না?"

বিনোদিনী কহিল, "তোমার চিহ্ন আমার কাছে আছে, তাহা আমার অঙ্গের ভূষণ—তাহা কেহ কাড়িতে পারিবে না। আমার আর-কিছু দরকার নাই।"—বলিয়া সে নিজের হাতের সেই কাটা দাগ দেখাইল।

বিহারী আশ্চর্য্য হইয়া রহিল। বিনোদিনী কহিল, "তুমি জান না—এ তোমারি আঘাত—এবং এ আঘাত তোমারি উপযুক্ত! ইহা এখন তুমিও ফিরাইতে পার না!"

মাসিমার উপদেশসত্ত্বেও আশা বিনোদিনীসম্বন্ধে মনকে নিষ্কণ্টক করিতে পারে নাই। রাজলক্ষ্মীর সেবায় দুইজনে একত্রে কাজ করিয়াছে, কিন্তু আশা যখনি বিনোদিনীকে দেখিয়াছে, তখনি তাহার বুকের মধ্যে ব্যথা লাগিয়াছে—মুখ দিয়া সহজে কথা বাহির হয় নাই, এবং হাসিবার চেষ্টা তাহাকে পীড়ন করিয়াছে। বিনোদিনীর নিকট হইতে সামান্য কোন সেবা গ্রহণ করিতেও তাহার সমস্ত চিত্ত বিমুখ হইয়াছে। বিনোদিনীর সাজা পান অনেক সময়ে শিষ্টতার খাতিরে তাহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে, কিন্তু আড়ালে তাহা ফেলিয়া দিয়াছে। কিন্তু আজ যখন বিদায়কাল উপস্থিত হইল—মাসিমা সংসার হইতে দ্বিতীয়বার চলিয়া যাইতেছেন বলিয়া আশার হৃদয় যখন অশ্রুজলে আর্দ্র হইয়া গেল, তখন সেই সঙ্গে বিনোদিনীর প্রতি তাহার করুণার উদয় হইল। যে একেবারে চলিয়া যাইতেছে, তাহাকে মাপ করিতে পারে না, এমন কঠিন মন অল্পই আছে। আশা জানিত, বিনোদিনী মহেন্দ্রকে ভালবাসে; মহেন্দ্রকে ভাল না বাসিবেই বা কেন? মহেন্দ্রকে ভালবাসা যে কিরূপ অনিবার্য্য আশা তাহা নিজের হৃদয়ের

ভিতর হইতেই জানে। নিজের ভালবাসার সেই বেদনায় বিনোদিনীর প্রতি আজ তাহার বড় দয়া হইল। বিনোদিনী মহেন্দ্রকে চিরদিনের জন্য ছাড়িয়া যাইতেছে, তাহার যে দুর্ব্বিষহ দুঃখ, তাহা আশা অতি-বড় শত্রুর জন্যও কামনা করিতে পারে না—মনে করিয়া তাহার চক্ষে জল আসিল; এককালে সে বিনোদিনীকে ভাল বাসিয়াছিল সেই ভালবাসা তাহাকে স্পর্শ করিল। সে ধীরে ধীরে বিনোদীর কাছে আসিয়া অত্যন্ত করুণার সঙ্গে, স্নেহের সঙ্গে, বিষাদের সঙ্গে মৃদুস্বরে কহিল,—"দিদি, তুমি চলিলে ?"

বিনোদিনী আশার চিবুক ধরিয়া কহিল—"হাঁ বোন, আমার যাইবার সময় আসিয়াছে। একসময়ে তুমি আমাকে ভাল বাসিয়াছিলে—এখন সুখের দিনে সেই ভালবাসার একটুখানি আমার জন্যে রাখিয়ো ভাই— আর সব ভুলিয়া যেয়ো!"

মহেন্দ্র আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "বোঠা'ণ, মাপ করিয়ো।"—তাহার চোখের প্রান্তে দুই-ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

বিনোদিনী কহিল—"তুমিও মাপ করিয়ো ঠাকুরপো, ভগবান তোমাদের চিরসুখী করুন্!"

সমাপ্ত।

ব্যাকরণ।

আমাদের দেশে রীতিমত ব্যাকরণ কবে সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। তবে আমাদের দেশ যে এ বিষয়ে অগ্রগামী, তাহাতে সন্দেহ নাই।

"The Hindus are the only nation that cultivated the science of grammar without having received any impulse directly or indirectly from the Greeks"—Max Muller in his 'Science of Language'.

অধ্যাপক ম্যাক্সমুলর ভারতে ব্যাকরণের রচনাকালসম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন :—It "dates from the 6th century B. C. which are still *unsurpassed* in the grammatical literature *of any nation*. (Science of Language)

আমরা প্রবাদপরম্পরায় রীতিমত ব্যাকরণের কতকগুলি নাম প্রাপ্ত হই—ঐন্দ্র, মাহেশ, শাকটায়ন, শৌনক, কাত্যায়ন, কৌৎস, পাণিনি, বররুচি (প্রাকৃতব্যাকরণকার), পুরন্দর, যাস্ক (শাকটায়ন-প্রতিষ্ঠিত নৈরুক্তমতবাদের প্রতিবাদী), রূপসিদ্ধি, লঙ্কেশ্বর, ভামহ, ভরত, কোহল, বসন্তরাজ, মার্কণ্ডেয়, ক্রমদীশ্বর, দীপঙ্কর, মৌগ্‌গল্যায়ন, শিলাবংশ, মুগ্ধবোধকার বোপদেব।

এই নামগুলির মধ্যে কতকগুলির সময়-নিরূপণ হইয়াছে—শৌনক ও তাঁহার ছাত্র কাত্যায়ন খৃ॰ পূ॰ ৬ষ্ঠ শতাব্দী; কৌৎস খৃ॰ পূ॰ ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতাব্দী; যাস্ক ৪র্থ; শাকটায়ন যাস্কের সমসাময়িক বা পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া যাস্ক শাকটায়নের মত খণ্ডন করিয়াছেন। পাণিনি আচার্য্য গোল্‌ড্‌ষ্টুকরের মতে খৃষ্টজন্মের ৬০০বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী; পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি তাঁহাকে ৫০০ খৃষ্টপূর্ব্বের ব্যক্তি বলিতে চাহেন; ডাক্তার রামদাস সেন কিন্তু এতদুভয়ের অপেক্ষা বহু প্রাচীনকাল নির্দ্দেশ করিবার যুক্তি দেখাইয়াছেন; অধ্যাপক ম্যাক্সমুলর ও অধ্যাপক সেস্ (Sayace) তাঁহার কাল খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী বলিয়াছেন; এবং সার্. উব্‌লিউ. হাণ্টার উক্ত কালকে ৫৫০ খৃষ্টপূর্ব্বের নিকটবর্ত্তী বলিয়া অধ্যাপক ম্যাক্সমুলর ও সেসের মতেরই পোষক হইয়াছেন। যাহাই হউক, প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর কোন অংশে রীতিমত সংস্কৃতব্যাকরণের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, বোধ হয় বিশেষ ভ্রমে পড়িতে হয় না। পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি ১১৮২ শকে বোপদেবের জন্ম অনুমান করেন; নন্দমিশ্র কহেন, শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতে ২১০বৎসর অতীত হইলে তাঁহার জন্ম হয়; ডাক্তার রামদাস সেন এই শেষ মতেরই পোষকতা করিয়াছেন (ঐতিহাসিক রহস্য তৃতীয় ভাগ)। তাহা হইলে বোপদেব খৃষ্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন, কারণ শঙ্কর ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে (শ্রীযুক্ত রমেশ দত্তের মতে) বা নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে (হণ্টর-সাহেবের মতে) অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

এক্ষণে দেখা যাউক, সম্পূর্ণ ব্যাকরণ গঠিত হইবার পূর্ব্ব হইতেও কিরূপে ক্রমশ ব্যাকরণের সূত্রপাত হইয়া আসিতেছিল। ব্যাকরণের মূল কার্য্য কি, তাহা অগ্রে না বুঝিলে চলিবে না। ব্যাকরণের কার্য্য দ্বিবিধ—

১ম। বাক্য ও শব্দের আদিম রূপ ও প্রকরণ নির্দ্ধারণ; ইহা বাক্য ও শব্দগুলিকে পদনিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীন-স্বতন্ত্রভাবে বিচার করে।

২য়। বিভক্তিকারকাদি নির্ণয় করা; ইহা পদসাপেক্ষ হইয়া বাক্য বা শব্দের অবস্থা নির্ণয় করিয়া থাকে।

এই দুই কার্য্যের জন্যই তাহার পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজন। এক্ষণে দেখা উচিত, আমরা কবে হইতে পারিভাষিক শব্দের দর্শন পাইতেছি, এবং সর্ব্বপ্রথম পারিভাষিকের কাল হইতেই ব্যাকরণের সূত্রপাত ধরিয়া লইতেই হইবে।

আমাদের দেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন রচনা বৈদিক সাহিত্য। বৈদিক কালের গ্রন্থগুলিকে নিম্নলিখিতরূপে বিভাগ করা যাইতে পারে—

১।	ছন্দ বা বেদবিভাগ	১৪০০—১০০০	খৃ॰ পূ॰।
২।	মন্ত্র ...	১০০০—৮০০	ঐ।
৩।	ব্রাহ্মণ ...	৮০০—৬০০	ঐ।
৪।	সূত্র ...	৬০০—২০০	ঐ।
৫।	উপনিষদ্		

"যে ভাষায় আদিম হিন্দুগণ কথা কহিতেন, বেদে ঠিক সেইরূপ ভাষাই রক্ষিত

হইয়াছিল"; বেদ গ্রাম্য বা চাষার গীত হইতে ক্রমশ বৃহৎ আকারে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। তখনও লিপিপ্রথার আবিষ্কার হয় নাই, কাজেই লিখিত ও কথিত বলিয়া বিভিন্ন প্রকারের ভাষার উপদ্রব ছিল না। এজন্য যে ভাষায় কথা কহা হইত, সেই ভাষাতেই গান রচিত হইয়া মুখে মুখে প্রচারিত হইতে লাগিল। সুতরাং বেদের মধ্যে ব্যাকরণের বীজ খুঁজিবার প্রয়োজন নাই। 'মন্ত্রের' কালেও লিখিবার কৌশল অজ্ঞাত ছিল (ইহার বিবরণ বিশদরূপে ভবিষ্যৎ প্রবন্ধে বিচার করা যাইবে)। যখন লিখিবার কৌশল উদ্ভাবিত হইল, তখন লিখিত ও কথিত ভাষার পার্থক্য ঘটিতে কিছুদিন অতিবাহিত হইয়াছিল; কারণ যে ভাষা লিখিত হইয়া স্থিরত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিল, অপর পক্ষে সেই ভাষাই কথিত হইতে হইতে নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, লিখিত-বেচারা শৃঙ্খলবেষ্টিত হইয়া আর নড়্‌চড়্‌ করিতে পারিল না। এইরূপে লিখিত ও কথিত ভাষার পার্থক্য সংঘটিত হয়। যখন এই সূত্রপাত হইল, তখন ব্যাকরণের দুই-একটি বিশেষ লক্ষণের আভাস লিখিত ভাষায় ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এই প্রথম আভাস "ব্রাহ্মণে"।

"ব্রাহ্মণে" আমরা অক্ষর, বর্ণ, পদ ইত্যাদির ও একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনের উল্লেখ দেখিতে পাই। ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণসকল বিভাগক্রমে বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত হইয়াছে, যথা—স্পর্শ, ব্যঞ্জন ও স্বর এবং উষ্মন্‌। তৎপরে "সূত্র"-পর্য্যায় সাহিত্যে যথার্থ শৃঙ্খলানুযায়ী (Scientific) বৈয়াকরণীয় বিতর্ক দেখিতে পাওয়া যায়; তদনন্তর প্রাতিশাখ্যে (ব্রাহ্মণান্তর্গত প্রাথমিক ব্যাকরণ-প্রক্রিয়া-প্রবন্ধ), নিরুক্তে ও পাণিনির ব্যাকরণে ক্রমশ ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ব্যাকরণশাস্ত্র বহুপুরাতন।

এক্ষণে প্রতীচ্য ব্যাকরণের কালনির্ণয়ে চেষ্টা করা যাউক। প্লেটো (৪২৯—৩৪৭ খৃঃ পূঃ) কেবলমাত্র বিশেষ্য ও ক্রিয়ার নাম অবগত ছিলেন; এবং আরিষ্টটল্‌ও (৩৮৪—৩২২ খৃঃ পূঃ) ইহা অতিক্রম করিয়া অধিকদূর অগ্রসর হন নাই। তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রের আলোচনাবসরে অব্যয়ের (Conjunction and Article) অবতারণা করিয়াছেন। সর্ব্বনামের উল্লেখ জেনোডোটাসের পূর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং আরিষ্টার্কাসের (মৃত্যু ১৫০ খৃঃ পূঃ?) গ্রন্থে প্রথম উপসর্গের (Preposition) উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। জেনোডোটাস্‌, আলেক্‌জান্দ্রিয়া পুস্তকাগারের প্রথম অধ্যক্ষ (Librarian), 'আর্টিকেল্‌'কে প্রথম 'ডেফিনিট্‌' ও 'ইন্‌ডেফিনিট্‌' বলিয়া বিভাগ করেন, এবং তিনিই প্রথম দ্বিবচনের ব্যবহার প্রবর্ত্তন করেন (২৫০ খৃঃ পূঃ)। 'সিজার' তাঁহার 'ডি অ্যানালোগিয়া'তে পঞ্চমী বিভক্তির (ablative) ব্যবহার করেন (গ্যালিক্‌ যুদ্ধের সমসময়ে), কিন্তু অপর পক্ষে প্রাতিশাখ্যে নাম (বিশেষ্য), আখ্যাত (ক্রিয়া), উপসর্গ এবং নিপাতের উল্লেখ দেখিতে পাই—

"নামাখ্যাতমুপসর্গো নিপাত-
শ্চত্বার্য্যাহুঃ পদজাতানি শব্দঃ
তন্নাম, যেনাভিদধাতি সত্ত্বং,
তদাখ্যাতং যেন ভাবং স ধাতুঃ।
উপসর্গা বিংশতিরর্থবাচকাঃ
সহেতরাভ্যামিতরে নিপাতাঃ॥"

অর্থ সহজবোধ্য। নিরুক্ত ৭।২ এবং 'চতুরাধ্যায়িকা'য় আমরা সর্ব্বনামের উল্লেখ দেখিতে পাই। 'বচন'-ভেদ আমরা ব্রাহ্মণে পাইয়াছি, কিন্তু আরিষ্টটল্‌ই প্রথম প্রতীচ্যরাজ্যে বচন-বিভাগের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং বচনের নামকরণ তাঁহার বহু পরে হইয়াছিল। আরিষ্টটল্‌ কারকের নাম জানিতেন না, কিন্তু প্রাতিশাখ্যে সাতটি বিভক্তিরই নাম দেখা যায়। কাত্যায়ন প্রাতিশাখ্যে আছে—

"তিঙ্‌কৃত্তদ্ধিতচতুষ্টয়সমাসাঃ শব্দমযম্‌।"

শাকটায়ন নৈরুক্তশাখার প্রতিষ্ঠাতা। শব্দমাত্রই ধাতু হইতে উৎপন্ন বলিয়া তিনি প্রচার করেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর বলেন (Histery of Ancient Sanskrit Literature) যে, গ্রীকেরা এক বিষয়ে আমাদের অগ্রযায়ী, —লিঙ্গনির্ণয় পাণিনি প্রথম করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রোটাগোরাস্‌ (৪৮০—৪১১ খৃঃ পূঃ?) তৎপূর্ব্বেই (?) তাহা নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

খণ্ডশ দেখা হইল; এক্ষণে দেখা যাউক, সম্পূর্ণ ব্যাকরণ কবে লিখিত হইয়াছিল। ভিক্র ব্যাকরণ খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীর কোন সময়ে রচিত হয়। য়ুরোপে প্রথম ব্যাকরণ লেখেন (Dionysius Thrax) ডাওনিসিয়াস্‌ থ্র্যাক্‌স্‌—আরিষ্টার্কাসের (Aristarchus) ছাত্র—পম্পের (Pompey —১০৬—৪৮ খৃঃ পূঃ) সময়ে রোমে গ্রীক্‌ভাষায় প্রকাশ করেন। তৎপরে ক্রেট্‌স্‌ অফ্‌ ম্যালস্‌ গ্রীসে ব্যাকরণ রচনা করেন। আবুল আস্‌ওয়েদ (মৃত্যু ৬৮৮ খৃষ্টাব্দে) আরবী ব্যাকরণের প্রথম রচয়িতা।

ইহা হইতেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ব্যাকরণরচনায় ভারতবর্ষ অন্যান্য সকল জাতি অপেক্ষা কত অগ্রযায়ী। আরও কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে ভারতবর্ষ অন্যান্য জাতির অগ্রণী, তাহা ক্রমশ দেখাইবার চেষ্টা করিব, আশা রহিল।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অজ্ঞাত দান।

কবে এসে ভেসে গেলে ছায়ার মতন
সে বারতা আজো নাহি জানে কোন জন!
তুমিও নাহিক জান—মোর তপ্ত প্রাণ
যেটুকু সান্ত্বনা বহে সে তোমারি দান!

অত্যুক্তি।

পৃথিবীর পূর্ব্বকোণের লোকেরা, অর্থাৎ আমরা, অত্যুক্তি অত্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকি; আমাদের পশ্চিমের গুরুমশায়দের কাছ হইতে এ লইয়া আমরা প্রায় বকুনি খাই। যাঁহারা সাত-সমুদ্র পার হইয়া আমাদের ভালর জন্য উপদেশ দিতে আসেন, তাঁহাদের কথা আমাদের নতশিরে শোনা উচিত। কারণ, তাঁহারা যে কেবল কথা বলিতে জানেন তাহা নহে—কি করিয়া কথা শোনাইতে হয়, তাহাও তাঁহাদের অবিদিত নাই। আমাদের কানের উপর তাঁহাদের দখল সম্পূর্ণ।

উত্তরচরিতে সীতার প্রতি লোকাপবাদের ভূমিকাস্বরূপ "যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাম্" ইত্যাদি বলিয়া একটা শ্লোক আছে। তাহার অর্থ এই যে, স্ত্রীলোকসম্বন্ধে এবং বাক্য-সম্বন্ধে লোকে নানান্ কথা তুলিয়া থাকে। কবির উক্তি আজ খাটিয়াছে। আমাদের বাক্যপ্রয়োগসম্বন্ধে আজ অনেক অশান্তি-কর কথা উঠিয়াছে। লোকের কথায় স্ত্রীকে রামচন্দ্র নির্ব্বাসনে পাঠাইয়া প্রজারঞ্জন করিয়াছিলেন,—আমরা বাক্যকে যদি অরণ্যে নির্ব্বাসন করিতে পারিতাম, তবে অরণ্যে রোদন বন্ধ হইত এবং রাজরঞ্জনের পুণ্যলাভ করিতাম।

আচারে-উক্তিতে আতিশয্য ভাল নহে, বাক্যে-ব্যবহারে সংযম আবশ্যক, এ কথা আমাদের শাস্ত্রেও বলে। তাহার ফল যে

ফলে নাই, তাহা বলিতে পারি না। ইংরেজের পক্ষে আমাদের দেশশাসন সহজ হইত না, যদি আমরা গুরুর উপদেশ না মানিতাম। ঘরে বাহিরে, এতদিনের শাসনের পরেও, যদি আমাদের উক্তিতে কিছু পরিমাণাধিক্য থাকে, তবে ইহা নিশ্চয়, সেই অত্যুক্তি অপ-রাধের নহে, তাহা আমাদের একটা বিলাস-মাত্র। ইংরেজের সিগারেট্ নিঃশব্দে ধূমো-দ্গার করে, আমাদের হুঁকায় শব্দ হয়—সেই শব্দটাকে বেয়াদবি মনে না করিয়া দরিদ্রের অবসরবিনোদনের একটা তুচ্ছ উপায় বলিয়া ধরিয়া লইলে অন্যায় হয় না।

আসল কথা, সকল জাতির মধ্যেই অত্যুক্তি ও আতিশয্য আছে। নিজেরটাকেই অত্যন্ত স্বাভাবিক ও পরেরটাকেই অত্যন্ত অসঙ্গত বোধ হয়। যে প্রসঙ্গে আমাদের কথা আপনি বাড়িয়া চলে, সে প্রসঙ্গে ইংরেজ চুপ—যে প্রসঙ্গে ইংরেজ অত্যন্ত বেশি বকিয়া থাকে, সে প্রসঙ্গে আমাদের মুখে কথা বাহির হয় না। আমরা মনে করি—ইংরেজ বড় বাড়াবাড়ি করে, ইংরেজ মনে করে—প্রাচ্য-লোকের পরিমাণবোধ নাই।

আমাদের দেশে গৃহস্থ অতিথিকে সম্বো-ধন করিয়া বলে—"সমস্ত আপনারি—আপ-নারি ঘর, আপনারি বাড়ী।" ইহা অত্যুক্তি। ইংরেজ তাহার নিজের রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে হইলে রাঁধুনিকে জিজ্ঞাসা করে—"ঘরে ঢুকিতে পারি কি?" এ একরকমের অত্যুক্তি।

স্ত্রী নুনের বাটি সরাইয়া দিলে ইংরেজ স্বামী বলে—"আমার ধন্যবাদ জানিবে!" ইহা অত্যুক্তি। নিমন্ত্রণকারীর ঘরে চর্ব্ব্য-চোষ্য খাইয়া এবং বাঁধিয়া এদেশীয় নিমন্ত্রিত বলে—"বড় পরিতোষ লাভ করিলাম"—অর্থাৎ আমার পরিতোষেই তোমার পারি-তোষিক। নিমন্ত্রণকারী বলে—"আমি কৃতার্থ হইলাম"—ইহাকে অত্যুক্তি বলিতে পার।

আমাদের দেশে স্ত্রী স্বামীকে পত্রে "শ্রীচরণেষু" পাঠ লিখিয়া থাকে, ইংরেজের কাছে ইহা অত্যুক্তি। ইংরেজ যাহাকে-তাহাকে পত্রে প্রিয়সম্বোধন করে—অভ্যস্ত না হইয়া গেলে ইহা আমাদের কাছে অত্যুক্তি বলিয়া ঠেকিত।

নিশ্চয়ই আরো এমন সহস্র দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু এগুলি বাঁধা অত্যুক্তি—ইহারা গৈতৃক। দৈনিক ব্যবহারে আমরা নব নব অত্যুক্তি রচনা করিয়া থাকি—ইহাই প্রাচ্যজাতির প্রতি ভৎর্সনার কারণ।

তালি একহাতে বাজে না। তেমনি কথা দুজনে মিলিয়া হয়—শ্রোতা ও বক্তা যেখানে পরস্পরের ভাষা বোঝে, সেখানে অত্যুক্তি উভয়ের যোগে আপনি সংশোধিত হইয়া আসে। সাহেব যখন চিঠির শেষে আমাকে লেখেন Yours truly—সত্যই তোমারি, তখন তাঁহার এই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সত্যপাটটুকুকে তর্জ্জমা করিয়া আমি এই বুঝি, তিনি সত্যই আমারি নহেন। বিশেষত বড়সাহেব যখন নিজেকে আমার বাধ্যতম ভৃত্য বলিয়া বর্ণনা করেন, তখন অনায়াসে সে কথাটার ষোল-আনা বাদ দিয়া তাহার উপরে আরো ষোল-আনা কাটিয়া লইতে পারি। এগুলি বাঁধা-দস্তুরের অত্যুক্তি, কিন্তু প্রচলিত ভাষা-প্রয়োগের অত্যুক্তি ইংরেজিতে ঝুড়িঝুড়ি আছে। Immensely, immeasurably, extremely, awfully, infinitely, absolutely, ever so much, for the life of me, for the world, unbounded, endless প্রভৃতি শব্দপ্রয়োগগুলি যদি সর্ব্বত্র যথার্থভাবে লওয়া যায়, তবে প্রাচ্য অত্যুক্তি-গুলি ইহজন্মে আর মাথা তুলিতে পারে না।

বাহ্যবিষয়ে আমাদের কতকটা ঢিলামি আছে, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। বাহিরের জিনিষকে আমরা ঠিক্‌ঠাক্‌মত দেখি না, ঠিক্‌ঠাক্‌মত গ্রহণ করি না। যখন-তখন বাহিরের নয়কে আমরা ছয় এবং ছয়কে আমরা নয় করিয়া থাকি। ইচ্ছা করিয়া না করিলেও এস্থলে অজ্ঞানকৃত পাপের দবল দোষ—একে পাপ, তাহাতে অজ্ঞান। ইন্দ্রিয়কে এমন অলস এবং বুদ্ধিকে এমন অসাবধান করিয়া রাখিলে, পৃথিবীতে আমাদের দুটি প্রধান নির্ভরকে একেবারে মাটি করা হয়। বৃত্তান্তকে নিতান্ত ফাঁকি দিয়া সিদ্ধান্তকে যাহারা কল্পনার সাহায্যে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে, তাহারা নিজেকেই ফাঁকি দেয়। যে-যে বিষয়ে আমাদের ফাঁকি আছে, সেই-সেই বিষয়েই আমরা ঠকিয়া বসিয়া আছি। একচক্ষু হরিণ যে দিকে তাহার কাণা চোখ ফিরাইয়া আরামে ঘাস খাইতেছিল, সেই দিক্ হইতেই ব্যাধের তীর তাহার বুকে বাজিয়াছে।

আমাদের কাণা চোখটা ছিল, ইহলোকের দিকে—সেই তরফ হইতে আমাদের শিক্ষা যথেষ্ট হইয়াছে। সেই দিকের ঘা খাইয়া আমরা মরিলাম! কিন্তু স্বভাব না যায় ম'লে!

নিজের দোষ কবুল করিলাম, এবার পরের প্রতি দোষারোপ করিবার অবসর পাওয়া যাইবে। অনেকে এরূপ চেষ্টাকে নিন্দা করেন, আমরাও করি। কিন্তু যে লোক বিচার করে, অন্যে তাহাকে বিচার করিবার অধিকারী। সে অধিকারটা ছাড়িতে পারিব না। তাহাতে পরের কোন উপকার হইবে বলিয়া আশা করি না—কিন্তু অপমানের দিনে যেখান হইতে যতটুকু আত্মপ্রসাদ পাওয়া যায়, তাহা ছাড়িয়া দিতে পারিব না।

আমরা দেখিয়াছি, আমাদের অভ্যুক্তি অলসবুদ্ধির বাহ্যবিকাশ। তা ছাড়া মাঝে মাঝে সুদীর্ঘকাল পরাধীনতাবশত চিত্ত-বিকারেরও হাত দেখিতে পাই। যেমন আমাদিগকে যখন-তখন, সময়ে অসময়ে, উপলক্ষ্য থাক্ বা না থাক্, চীৎকার করিয়া বলিতে হয়—আমরা রাজভক্ত। অথচ ভক্তি করিব কাহাকে, তাহার ঠিকানা নাই। আইনের বইকে, না, কমিশনর-সাহেবের চাপরাশকে, না, পুলিসের দারোগাকে? গবর্মেণ্ট আছে, কিন্তু মানুষ কই? হৃদয়ের সম্বন্ধ পাতাইব কাহার সঙ্গে? আপিস্‌কে বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে পারি না। মাঝে মাঝে অপ্রত্যক্ষ রাজার মৃত্যু বা অভিষেক উপলক্ষ্যে যখন বিবিধ চাঁদার আকারে রাজভক্তি দোহন করিয়া লইবার আয়োজন হয়, তখন, ভীতচিত্তে, শুষ্কভক্তি ঢাকিবার জন্য অতিদান ও অত্যুক্তির দ্বারা রাজপাত্র কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। যাহা স্বাভাবিক নহে, তাহাকে প্রমাণ করিতে হইলে লোকে অধিক চীৎকার করিতে থাকে—এ কথা ভুলিয়া যায় যে, মৃদুস্বরে যে বেসুরা ধরা পড়ে না, চীৎকারে তাহা চারগুণ হইয়া উঠে।

কিন্তু এই শ্রেণীর অত্যুক্তির জন্য আমরা একা দায়ী নই। ইহাতে পরাধীন জাতির ভীরুতা ও হীনতা প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু এই অবস্থাটায় আমাদের কর্ত্তৃপুরুষদের মহত্ত্ব ও সত্যানুরাগের প্রমাণ দেয় না। জলাশয়ের জল সমতল নহে, এ কথা যখন কেহ অম্লান-মুখে বলে, তখন বুঝিতে হইবে, সে কথাটা অবিশ্বাস্য হইলেও তাহার মনিব তাহাই শুনিতে চাহে। আজকালকার সাম্রাজ্য-মদমত্ততার দিনে ইংরেজ নানাপ্রকারে শুনিতে চায় আমরা রাজভক্ত,—আমরা তাহার চরণতলে স্বেচ্ছায় বিক্রীত। এ কথা জগতের কাছে তাহারা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করিতে চাহে।

তাই, ঠিক যে সময়ে ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর হৃদয়ের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন-প্রায়; যে সময়ে আমাদের প্রতি ইংরেজের বিতৃষ্ণা ও অবজ্ঞা তাহাদের সামাজিক আচরণে ও ব্যাবসায়িক ব্যবহারে প্রতিদিন অনাবশ্যক সুস্পষ্টতার সহিত পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে; যে সময়ে একে একে ভারতবর্ষ তাহার উচ্চ অধিকার হইতে ভ্রষ্ট ও আশ্রয় হইতে তাড়িত হইতেছে; যখন বিলাতের এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ভারতের রুধিরশোষণ

করিয়া ভারতবাসীর নিকট তাহার দ্বার-রোধ করিয়াছে; প্রধানত ভারতবাসীর দান-সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত মেডিকাল কলেজে ভারতীয় ছাত্রের অধিকার ক্রমশ সঙ্কীর্ণ ও বিদেশী মিলিটারী ছাত্রের সংখ্যা ক্রমশ প্রসরতাপ্রাপ্ত; রুড়্‌কি-কলেজের দ্বার রুদ্ধপ্রায়, অধ্যাপনকার্য্যের উচ্চবিভাগ হইতে সুযোগ্য দেশীয় অধ্যাপকগণ নির্ব্বাসিত, প্লেগের টীকা দিবার জন্য দেশের ডাক্তার ছাড়িয়া নিরন্ন ভারতের অর্থে বিলাত হইতে ডাক্তারের দল আহূত; যখন ইণ্ডিয়া আপিস্ ভারতের অন্নে দিব্য সুচিক্কণ হইয়া ভারতবর্ষীয় মান্য অতিথিদের নিকট হইতে আতিথ্যখরচ নির্লজ্জভাবে কড়ায়-গণ্ডায় গণিয়া লইবার জন্য মন্ত্রণা দিতেছে, ভারতবর্ষীয় রাজকর্ম্মশালায় আকস্মিক ফিরিঙ্গিপ্লাবন উপস্থিত হইয়া সুযোগ্য দেশী কর্ম্মচারীরা ভাসিয়া যাইতেছে; যে সময়ে ভারতবর্ষ সমস্ত ইংরেজ-উপনিবেশে অবমানিত; যে সময়ে ইংরেজ ভারতবাসীর মধ্যে কোন বিরোধমাত্র উপস্থিত হইলেই, যে কারণেই হউক্, ভারতবর্ষের সুবিচার পাইবার আশা প্রভাতের কুয়াশার মত ক্রমশই অত্যন্ত ক্ষীণ ও স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে; যে সময়ের অনতিকাল পূর্ব্বেই রাজদ্রোহিতার অপবাদ দিয়া রক্তচক্ষু কর্ত্তৃপুরুষ তর্জ্জনে-গর্জ্জনে, শাসনে-আস্ফালনে নিদ্রাজড়ালস ভারতবর্ষকে হঠাৎ চকিত-চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল; ঠিক সেই সময়টাতেই অধম ভারতবর্ষের রাজভক্তি ইংরেজ নানাপ্রকারে বিশ্বজগতের কাছে উদ্‌ঘোষিত করিবার আয়োজন করিতেছে,—আশানুরূপ ফলও পাইয়াছে, শূন্যঘট যথেষ্টপরিমাণ শব্দ করিতেছে। দুর্ভিক্ষে যখন ভারতবর্ষের পেটের ত্বক্ তাহার পিঠের মেরুদণ্ডে গিয়া লাগিয়াছে, তখন গোয়ালিয়রের রাজকোষ বিশ-লক্ষ টাকা অতলস্পর্শ সমুদ্রের জলে অকস্মাৎ উদ্গার করিয়া ইংরেজসাম্রাজ্যের আঁট-বাঁধন প্রমাণ করিয়াছে, তখন বিকানিয়র অস্থি-চর্ম্মসার রাজ্যকে ক্ষুধাসুরের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিজের ব্যয়ে কয়েকটি সৈন্য সঙ্গে লইয়া পরের ঝগড়ায় চীন পর্য্যন্ত তাড়া করিয়া গিয়াছে।

এদিকে আমাদের প্রতি সিকি-পয়সার বিশ্বাস মনের মধ্যে নাই; এত-বড় দেশটা সমস্ত নিঃশেষে নিরস্ত্র; একটা হিংস্র পশু দ্বারের কাছে আসিলে দ্বারে অর্গল লাগানো ছাড়া আর কোন উপায় আমাদের হাতে নাই—অথচ জগতের কাছে সাম্রাজ্যের বলপ্রমাণ উপলক্ষ্যে আমাদের অটল ভক্তি রটাইবার বেলা আমরা আছি! মুসলমান সম্রাটের সময় দেশনায়কতা-সেনানায়কতার অধিকার আমরা হারাই নাই;—মুসলমান সম্রাট্ যখন সভাস্থলে সামন্তরাজগণকে পার্শ্বে লইয়া বসিতেন, তখন তাহা শূন্যগর্ভ প্রহসনমাত্র ছিল না। যথার্থই রাজারা সম্রাটের সহায় ছিলেন, রক্ষা ছিলেন, সম্মান-ভাজন ছিলেন। আজ সে সমস্ত কিছুই নাই, রাজাদের শক্তিসামর্থ্য অপহৃত, তাহাদের সম্মান মৌখিক, অথচ তাহাদিগকে পশ্চাতে টানিয়া লইয়া দেশে-বিদেশে রাজভক্তির অভিনয় ও আড়ম্বর তখনকার চেয়ে চারগুণ। হতভাগ্য রাজাগুলির এই-টুকুমাত্র কাজ। যখন ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য-

লক্ষ্মী সাজ পরিতে বসেন, তখন কয়নি-গুলির সামান্য শাসনকর্ত্তারা মাথার মুকুটে ঝল্‌মল্ করেন; আর ভারতবর্ষের প্রাচীন-বংশীয় রাজগণ তাঁহার চরণনূপুরে কিঙ্কিণীর মত আবদ্ধ হইয়া কেবল ঝঙ্কার দিবার কাজ করেন—এবারকার বিলাতী দরবারে তাহা বিশ্বজগতের কাছে জারি হইয়াছে! হায় জয়পুর যোধপুর-কোলাপুর, ইংরেজ-সাম্রাজ্যের মধ্যে তোমাদের কোথায় স্থান, তাহা কি এমন করিয়া দেশে-বিদেশে ঘোষণা করিয়া আসিবার জন্যই এত লক্ষ-লক্ষ টাকা বিলাতের জলে জলাঞ্জলি দিয়া আসিলে? ইংরেজের সাম্রাজ্য-জগন্নাথজীর মন্দিরে, যেখানে কানাডা, নিয়ুজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা স্ফীত উদর ও পরিপুষ্ট দেহ লইয়া দিব্য হাঁক্‌ডাক্ সহকারে পাণ্ডাগিরি করিয়া বেড়াইতেছে, সেখানে কৃশশীর্ণতনু ভারতবর্ষের কে থাও প্রবেশাধিকার নাই—ঠাকুরের ভোগও তাহার কপালে অল্পই জোটে—কিন্তু যে দিন বিশ্বজগতের রাজপথে তাহার অভ্রভেদী রথ বাহির হয়, সেই একটা দিন রথের দড়া ধরিয়া টানিবার জন্য ভারতবর্ষের ডাক পড়ে। সেদিন কত বাহবা, কত করতালি, কত সৌহার্দ্দ্য—সেদিন কার্জ্জনের নিষেধ-শৃঙ্খলমুক্ত ভারতবর্ষীয় রাজাদের মণি-মাণিক্য লণ্ডনের রাজপথে ঝল্‌মল্ করিতে থাকে এবং লণ্ডনের হাঁসপাতালগুলির 'পরে রাজভক্ত রাজাদের মুষলধারে বদান্যতা-বৃষ্টির বার্ত্তা ভারতবর্ষ নতশিরে নীরবে শ্রবণ করে! এই ব্যাপারের সমস্তটা পাশ্চাত্য অত্যুক্তি। ইহা মেকি অত্যুক্তি—খাঁটি নহে!

প্রাচ্যদিগের অত্যুক্তি ও আতিশয্য অনেকসময়েই তাহাদের স্বভাবের ঔদার্য্য হইতেই ঘটিয়া থাকে। পাশ্চাত্য অত্যুক্তি সাজানো জিনিষ, তাহা জাল বলিলেই হয়। দিল্‌দরাজ মোগলসম্রাট্‌দের আমলে দিল্লিতে দরবার জমিত। আজ সে দিল্ নাই, সে দিল্লি নাই, তবু একটা নকল দরবার করিতে হইবে। সংবৎসর ধরিয়া রাজারা পোলিটিকাল্ এজেণ্টের রাহুগ্রাসে কবলিত;—সাম্রাজ্যচালনায় তাহাদের স্থান নাই, কাজ নাই, তাহাদের স্বাধীনতা নাই—হঠাৎ একদিন ইংরেজসম্রাটের নায়েব, পরিত্যক্তমহিমা দিল্লিতে সেলাম কুড়াইবার জন্য রাজাদিগকে তলব দিলেন, নিজের তুলুষ্ঠিত পোষাকের প্রান্ত শিখ্ ও রাজপুত রাজকুমারদের দ্বারা বহন করাইয়া লইলেন,—আকস্মিক উপদ্রবের মত একদিন একটা সমারোহের আগ্নেয় উচ্ছ্বাস উদ্গীরিত হইয়া উঠিল,—তাহার পর সমস্ত শূন্য, সমস্ত নিষ্প্রভ।

এখনকার ভারতসাম্রাজ্য আপিসে এবং আইনে চলে—তাহার রংচং নাই, গীতবাদ্য নাই, তাহাতে প্রত্যক্ষ মানুষ নাই। ইংরেজের খেলাধূলা, নাচগান, আমোদ-প্রমোদ, সমস্ত নিজেদের মধ্যে বদ্ধ—সে আনন্দ-উৎসবের উদ্বৃত্ত খুদকুঁড়াও ভারতবর্ষের জনসাধারণের জন্য প্রমোদশালার বাহিরে আসিয়া পড়ে না। আমাদের সঙ্গে ইংরেজের সম্বন্ধ চাবুক-জেল-জরিমানা, আপিসের বাঁধা কাজ এবং হিসাবের খাতা সহির সম্বন্ধ। প্রাচ্য সম্রাটের ও নবাবের সঙ্গে আমাদের অন্নবস্ত্র, শিল্পশোভা, আনন্দ-

উৎসবের নানা সম্বন্ধ ছিল। তাঁহাদের প্রাসাদে প্রমোদের দীপ জ্বলিলে তাহার আলোক চারিদিকে প্রজাদের ঘরে ছড়াইয়া পড়িত—তাঁহাদের তোরণদ্বারে যে নহবৎ বসিত, তাহার আনন্দধ্বনি দীনের কুটীরের মধ্যেও প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত।

ইংরেজ সিভিলিয়ান্‌গণ পরস্পরের আমন্ত্রণে-নিমন্ত্রণে-সামাজিকতার যোগদান করিতে বাধ্য, যে ব্যক্তি স্বভাবদোষে এই সকল বিনোদনব্যাপারে অপটু, তাহার উন্নতির অনেক ব্যাঘাত ঘটে। এই সমস্তই নিজেদের জন্য। যেখানে পাঁচটা ইংরেজ আছে, সেখানে আমোদ-আহ্লাদের অভাব নাই—কিন্তু সে আমোদের চারিদিক্ আমোদিত হইয়া উঠে না। আমরা কেবল দেখিতে পাই—কুলিগুলা বাহিরে বসিয়া সন্ত্রস্তচিত্তে পাখার দড়ি টানিতেছে, সহিস্ ডগ্‌কার্টের ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া চামর দিয়া মশা-মাছি তাড়াইতেছে, মুগয়ার সময় বাজে-লোকেরা জঙ্গলের শিকার তাড়া করিতেছে এবং বন্দুকের দুটোএকটা গুলি পশুলক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নেটিভের মর্ম্মভেদ করিতেছে। ভারতবর্ষে ইংরেজরাজ্যের বিপুল শাসনকার্য্য একেবারে আনন্দহীন, সৌন্দর্য্য-হীন—তাহার সমস্ত পথই আপিস্-আদালতের দিকে—জনসমাজের হৃদয়ের দিকে নহে। হঠাৎ ইহার মধ্যে একটা খাপ্‌ছাড়া দরবার কেন? সমস্ত শাসনপ্রণালীর সঙ্গে তাহার কোন্‌খানে যোগ? গাছে-লতায় ফুল ধরে, আপিসের কড়ি-বরগায় ত মাধবী-মঞ্জরী ফোটে না! এ যেন মরুভূমির মধ্যে মরীচিকার মত। এ ছায়া তাপ-নিবারণের জন্য নহে, এ জল তৃষ্ণা দূর করিবে না।

পূর্ব্বেকার দরবারে সম্রাটেরা যে নিজের প্রতাপ জাহির করিতেন, তাহা নহে; সে সকল দরবার কাহারো কাছে তারস্বরে কিছু প্রমাণ করিবার জন্য ছিল না,—তাহা স্বাভাবিক;—সে সকল উৎসব বাদশাহ-নবাবদের ঔদার্য্যের উদ্বেলিত-প্রবাহ-স্বরূপ ছিল;—সেই প্রবাহ বদান্যতা বহন করিত, তাহাতে প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিত, দীনের অভাব দূর হইত, তাহাতে আশা এবং আনন্দ দূরদূরান্তরে বিকীর্ণ হইয়া যাইত। আগামী দরবার উপলক্ষ্যে কোন্ পীড়িত আশ্বস্ত হইয়াছে, কোন্ দরিদ্র সুখস্বপ্ন দেখিতেছে? সেদিন যদি কোনো দুরাশাগ্রস্ত দুর্ভাগা দরখাস্তহাতে সম্রাট্‌প্রতিনিধির কাছে অগ্রসর হইতে চায়, তবে কি পুলিশের প্রহার পৃষ্ঠে লইয়া তাহাকে কাঁদিয়া ফিরিতে হইবে না?

তাই বলিতেছিলাম আগামী দিল্লির দরবার পাশ্চাত্য অত্যুক্তি, তাহা মেকি অত্যুক্তি। এদিকে হিসাবকিতাব এবং দোকানদারিটুকু আছে—ওদিকে প্রাচ্য-সম্রাটের নকলটুকু না করিলে নয়। আমরা দেশব্যাপী অনশনের দিনে এই নিতান্ত ভুয়া দরবারের আড়ম্বর দেখিয়া ভীত হইয়াছিলাম বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন—খরচ খুব বেশি হইবে না, যাহাও হইবে, তাহার অর্দ্ধেক আদায় করিয়া লইতে পারিব। কিন্তু সেদিন উৎসব করা চলে না, যেদিন খরচপত্র সাম্‌লাইয়া চলিতে হয়। তহবিলের টানাটানি লইয়া উৎসব করিতে

হইলে, নিজের খরচ বাঁচাইবার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অন্যের খরচের প্রতি উদাসীন হইতে হয়। তাই আগামী দরবারে সম্রাটের নামেব অল্প খরচে কাজ চালাইবেন বটে, কিন্তু আড়ম্বরটাকে স্ফীত করিয়া তুলিবার জন্য রাজাদিগকে খরচ করাইবেন। প্রত্যেক রাজাকে অন্তত ক'টা হাতী, ক'টা ঘোড়া, ক'জন লোক আনিতে হইবে, শুনিতেছি তাহার অনুশাসন জারি হইয়াছে। সেই সকল রাজাদেরই হাতিঘোড়া-লোক-লস্করে যথাসম্ভব অল্প খরচে চতুর সম্রাট্-প্রতিনিধি যথাসম্ভব বহুব্যাপার ফাঁদিয়া তুলিবেন। ইহাতে চাতুর্য্য ও প্রতাপের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু বদান্যতা ও ঔদার্য্য —প্রাচ্য সম্প্রদায়ের মতে যাহা রাজকীয় উৎসবের প্রাণ বলিলেই হয় তাহা ইহার মধ্যে থাকে না। একচক্ষু টাকার থলিটির দিকে এবং অন্য চক্ষু সাবেক বাদ্‌শাহের অনুকরণকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া এ সকল কাজ চলে না। এ সব কাজ যে স্বভাবত পারে, সে-ই পারে এবং তাহাকেই শোভা পায়।

ইতিমধ্যে আমাদের দেশের একটি ক্ষুদ্ররাজা সম্রাটের অভিষেক উপলক্ষে তাঁহার প্রজাদিগকে বহুসহস্র টাকা খাজ্‌না মাপ দিয়াছেন। আমাদের মনে হইল, ভারতবর্ষে রাজকীয় উৎসব কি ভাবে চালাইতে হয়, ভারতবর্ষীয় এই রাজাটি তাহা ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষদিগকে শিক্ষা দিলেন। কিন্তু যাহারা নকল করে, তাহারা আসল শিক্ষাটুকু গ্রহণ করে না, তাহারা বাহ্য আড়ম্বরটাকেই ধরিতে পারে। তপ্তবালুকা সূর্য্যের মত তাপ দেয়, কিন্তু আলোক দেয় না। সেইজন্য তপ্তবালুকার তাপকে আমাদের দেশে অসহ্য আতিশয্যের উদাহরণ বলিয়া উল্লেখ করে। আগামী দিল্লিদরবারও সেইরূপ প্রতাপ বিকিরণ করিবে, কিন্তু আশা ও আনন্দ দিবে না। শুদ্ধমাত্র দম্ভ-প্রকাশ সম্রাট্‌কেও শোভা পায় না—ঔদার্য্যের দ্বারা দয়াদাক্ষিণ্যের দ্বারা দুঃসহ দম্ভকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখাই যথার্থ রাজোচিত। আগামী দরবারে ভারতবর্ষ তাহার সমস্ত রাজরাজন্য লইয়া বর্ত্তমান বাদ্‌শাহের নায়েবের কাছে নতিস্বীকার করিতে যাইবে, কিন্তু বাদশাহ তাহাকে কি সম্মান, কি সম্পদ্, কোন্ অধিকার দান করিবেন? কিছুই নহে। দান করিবার বেলায় রাজশক্তি তাহার দরবারের সমস্ত বিদ্যুৎআলো নিভাইয়া, শতসহস্র আপিসের কোটরে কোটরে নিমেষের মধ্যে অন্ধকার করিবে এবং বিবিধ বড়সাহেবের ফিট্‌ফাট্ বেশে ডেস্কের সম্মুখে হিসাবের খাতা দেখিতে বসিবে। ইহাতে যে কেবল ভারতবর্ষের অবনতিস্বীকার তাহা নহে, এইরূপ শৃঙ্গগর্ত্ত আকস্মিক দরবারের বিপুল কার্পণ্যে ইংরেজের রাজমহিমা প্রাচ্যজাতির নিকট খর্ব্ব না হইয়া থাকিতে পারে না।

যে সকল কাজ ইংরেজী দস্তুরমতে সম্পন্ন হয়, তাহা আমাদের প্রথার সঙ্গে না মিলিলেও সে সম্বন্ধে আমরা চুপ করিয়া থাকিতে বাধ্য। যেমন, আমাদের দেশে বরাবর রাজার আগমনে বা রাজকীয় শুভকর্ম্মাদিতে যে সকল উৎসব আমোদ হইত, তাহার ব্যয় রাজাই বহন করিতেন, প্রজারা

জন্মতিথি প্রভৃতি নানাপ্রকার উপলক্ষ্যে রাজার অনুগ্রহ লাভ করিত। এখন ঠিক তাহার উল্টা হইয়াছে। রাজা জন্মিলে-মরিলে নড়িলে-চড়িলে প্রজার কাছে রাজার তরফ হইতে চাঁদার খাতা বাহির হয়, রাজা-রায়বাহাদুর প্রভৃতি খেতাবের রাজকীয় নিলামের দোকান জমিয়া উঠে। আকবর-শাজাহান্ প্রভৃতি বাদ্‌শারা নিজেদের কীর্ত্তি নিজেরা রাখিয়া গেছেন,—এখনকার দিনে রাজকর্ম্মচারীরা নানা ছলে নানা কৌশলে প্রজাদের কাছ হইতে বড় বড় কীর্ত্তিস্তম্ভ আদায় করিয়া লন। এই যে সম্রাটের প্রতিনিধি সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজাদিগকে সেলাম দিবার জন্য ডাকিয়াছেন, ইনি নিজের দানের দ্বারায় কোথায় দীঘি খনন করাইয়াছেন, কোথায় পান্থশালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কোথায় দেশের বিদ্যাশিক্ষা ও শিল্পচর্চ্চাকে আশ্রয় দান করিয়াছেন? সেকালে বাদশারা,নবাবরা, রাজকর্ম্মচারিগণও এই সকল মঙ্গলকার্য্যের দ্বারা প্রজাদের হৃদয়ের সঙ্গে যোগ রাখিতেন। এখন রাজকর্ম্মচারীর অভাব নাই—তাঁহাদের বেতনও যথেষ্ট মোটা বলিয়া জগদ্বিখ্যাত—কিন্তু দানে ও সৎকর্ম্মে এদেশে তাঁহাদের অস্তিত্বের কোন চিহ্ন তাঁহারা রাখিয়া যান না। বিলাতী দোকান হইতে তাঁহারা জিনিষপত্র কেনেন, বিলাতী সঙ্গীদের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করেন, এবং বিলাতের কোণে বসিয়া অন্তিমকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের পেন্‌সন্ সম্ভোগ করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষে লেডি ডফারিণের নামে যে সকল হাঁসপাতাল খোলা হইল, তাহার টাকা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ভারতবর্ষের প্রজারাই জোগাইয়াছে। এ প্রথা খুব ভাল হইতে পারে, কিন্তু ইহা ভারতবর্ষের প্রথা নহে—সুতরাং এই প্রকারের পূর্ত্তকার্য্যে আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। না করুক্, তথাপি বিলাতের রাজা বিলাতের প্রথামতই চলিবেন, ইহাতে বলিবার কথা কিছু নাই। কিন্তু কখনো দিশি কখনো বিলিতি হইলে কোনোটাই মানান্‌সই হয় না। বিশেষত আড়ম্বরের বেলায় দিশি দস্তুর এবং খরচপত্রের বেলায় বিলিতি দস্তুর হইলে আমাদের কাছে ভারি অসঙ্গত ঠেকে। আমাদের বিদেশী কর্ত্তারা ঠিক করিয়া বসিয়া আছেন, যে, প্রাচ্যহৃদয় আড়ম্বরেই ভোলে, এইজন্যই ত্রিশকোটি অপদার্থকে অভিভূত করিতে দিল্লির দরবার নামক একটা সুবিপুল অত্যুক্তি বহু চিন্তায়-চেষ্টায় ও হিসাবের বহুতর কশাকশি দ্বারা খাড়া করিয়া তুলিতেছেন—জানেন না যে, প্রাচ্যহৃদয় দানে, দয়াদাক্ষিণ্যে, অবারিত মঙ্গলঅনুষ্ঠানেই ভোলে। আমাদের যে উৎসব-সমারোহ, তাহা আহূত-অনাহূত-রবাহূতের আনন্দ-সমাগম; তাহাতে 'এহি এহি দেহি দেহি পীয়তাং ভুজ্যতাং' রবের কোথাও বিরাম ও বাধা নাই। তাহা প্রাচ্য আতিশয্যের লক্ষণ হইতে পারে, কিন্তু তাহা খাঁটি, তাহা স্বাভাবিক;—আর পুলিসের দ্বারা সীমানাবদ্ধ, সঙীনের দ্বারা কণ্টকিত, সংশয়ের দ্বারা সন্ত্রস্ত, সতর্ক কৃপণতার দ্বারা সঙ্কীর্ণ, দয়াহীন দানহীন যে দরবার—যাহা কেবলমাত্র দম্ভপ্রচার, তাহা পাশ্চাত্য অত্যুক্তি—তাহাতে আমাদের হৃদয় পীড়িত ও লাঞ্ছিত হয়—

আমাদের কল্পনা আকৃষ্ট না হইয়া প্রতিহত হইতে থাকে। তাহা ঔদার্য্য হইতে উৎসারিত নহে, তাহা প্রাচুর্য্য হইতে উদ্বেলিত হয় নাই।

এই গেল নকল-করা অত্যুক্তি। কিন্তু নকল, বাহ্য আড়ম্বরে মূলকে ছাড়াইবার চেষ্টা করে, এ কথা সকলেই জানে। সুতরাং সাহেব যদি সাহেবী ছাড়িয়া নবাবী ধরে, তবে তাহাতে যে আতিশয্য প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা কতকটা কৃত্রিম, অতএব তাহার দ্বারা জাতিগত অত্যুক্তির প্রকৃতি ঠিক ধরা যায় না। কিন্তু খাঁটি বিলাতি অত্যুক্তির একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে। গবর্মেণ্ট সেই দৃষ্টান্তটি আমাদের চোখের সাম্‌নে পাথরের স্তম্ভ দিয়া স্থায়িভাবে খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন, তাই সেটা হঠাৎ মনে পড়িল। তাহা অন্ধকূপহত্যার অত্যুক্তি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচ্য অত্যুক্তি মানসিক ঢিলামি। আমরা কিছু প্রাচুর্য্যপ্রিয়, আঁটাআঁটি আমাদের সহে না। দেখ না আমাদের কাপড়গুলা ঢিলাঢালা, আবশ্যকের চেয়ে অনেক বেশি—ইংরেজের বেশভূষা কাটাছাঁটা, ঠিক মাপসই—এমন কি, আমাদের মতে তাহা আঁটিতে আঁটিতে ও কাটিতে কাটিতে শালীনতার সীমা ছাড়াইয়া গেছে। আমরা, হয় প্রচুররূপে নগ্ন, নয় প্রচুররূপে আবৃত। আমাদের কথাবার্ত্তাও সেই ধরণের,—হয় একেবারে মৌনের কাছাকাছি, নয় উদারভাবে সুবিস্তৃত। আমাদের ব্যবহারও তাই, হয় অতিশয় সংযত, নয় হৃদয়াবেগে উচ্ছ্বসিত।

কিন্তু ইংরেজের অত্যুক্তির সেই স্বাভাবিক প্রাচুর্য্য নাই,—তাহা অত্যুক্তি হইলেও খর্ব্বকায়। তাহা আপনার অমূলকতাকে নিপুণভাবে মাটিচাপা দিয়া ঠিক সমূলকতার মত সাজাইয়া তুলিতে পারে। প্রাচ্য অত্যুক্তির অতিটুকুই শোভা, তাহাই তাহার অলঙ্কার, সুতরাং তাহা অসঙ্কোচে বাহিরে আপনাকে ঘোষণা করে। ইংরেজি অত্যুক্তির অতিটুকুই গভীরভাবে ভিতরে থাকিয়া যায়—বাহিরে তাহা বাস্তবের সংযত সাজ পরিয়া খাঁটি সত্যের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া পড়ে।

আমরা হইলে বলিতাম, অন্ধকূপের মধ্যে হাজারো লোক মরিয়াছে। সংবাদটাকে একেবারে একঠেলায় অত্যুক্তির মাঝ-দরিয়ার মধ্যে রওনা করিয়া দিতাম। হল্‌ওয়েল্ সাহেব একেবারে জনসংখ্যা সম্পূর্ণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহার তালিকা দিয়া অন্ধকূপের আয়তন একেবারে ফুট-হিসাবে গণনা করিয়া দিয়াছেন! যেন সত্যের মধ্যে কোথাও কোন ছিদ্র নাই। ওদিকে যে গণিতশাস্ত্র তাঁহার প্রতিবাদী হইয়া বসিয়া আছে, সেটা খেয়াল করেন নাই। হল্‌ওয়েলের মিথ্যা যে কতস্থানে কতরূপে ধরা পড়িয়াছে, তাহা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সিরাজদ্দৌলা গ্রন্থে ভালরূপেই আলোচিত হইয়াছে। আমাদের উপদেষ্টা কার্জ্জন্ সাহেবের নিকট স্পর্দ্ধা পাইয়া হল্‌ওলের সেই অত্যুক্তি রাজপথের মাঝখানে মাটি ফুঁড়িয়া স্বর্গের দিকে পাষাণ-অঙ্কুর উত্থাপিত করিয়াছে।

কিন্তু আমাদের এই কথাগুলা বিশুদ্ধ বিদ্বেষমূলক বলিয়া ঠেকিতে পারে। সেইজন্য

বিলাতী অত্যুক্তি সম্বন্ধে হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম। তাঁহার নূতন-প্রকাশিত Facts and Comments গ্রন্থে State Education" নামক প্রবন্ধে দক্ষিণ আফ্রিকায় বোয়ারযুদ্ধের সময় বিলাতি অত্যুক্তি কিরূপ সমুদ্রপার হইয়া চালাচালি হইত, তাহার গোটাকতক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিব। এই অত্যুক্তিগুলিতে "Tropical imagination" এর প্রাচুর্য্য নাই, কিন্তু শীতদেশীয় বুদ্ধির চাতুর্য্য আছে, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। স্পেন্‌সার বলেন—দিনের পর দিন, দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধসংবাদ অলীক কাহিনী, অত্যুক্তি ও সত্যবিকৃতির দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে—তাহার অনেকটা মিথ্যা করা এবং অনেকটা গোপন করা।

ইহার পরে লেখক অনেকগুলি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—একজন বিশেষ সংবাদদাতা কবুল করিয়াছেন যে, অযথা সংবাদ দেওয়া একটা পাকা পলিসির মধ্যেই দাঁড়াইয়াছিল। সেই সংবাদদাতা বলেন, "এই যুদ্ধের সম্পর্কে রাজভক্তি ও স্বদেশনিষ্ঠা সম্বন্ধে একটা অন্যায় ধারণা জন্মিয়াছে। হারকে জিৎ বলিয়া যাহারা না বর্ণনা করে, যাহারা বলিতে চায় বর্ত্তমান অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা রাজদ্রোহিতার অপবাদে লাঞ্ছিত হইয়া থাকে।"

মিষ্টার এফ্ ইয়ং নামক আর একজন সংবাদদাতা বলেন, মিলিটারি কর্ত্তৃপক্ষেরা যে কেবল সত্যগোপন করিয়াছেন তাহা নহে—তাঁহারা মিথ্যা প্রচার করিয়াছেন। আর একটি উদাহরণ। ঘর-জ্বালানো, স্ত্রীলোকদের তাড়ানো প্রভৃতি উপদ্রবের দ্বারা যে পর্য্যন্ত না বোয়াররা উদ্বেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে পর্য্যন্ত বন্দী ইংরেজ-সেনানায়ক ও সৈন্যদের নিকট হইতে বরাবর যে বোয়ারদের প্রশংসাই শুনা গিয়াছিল, যাহাদের সম্বন্ধে পরলোকগত সার্ জর্জ্জ গ্রে বলিয়াছেন—লোকহিতকর ও ব্যক্তিগত সদ্‌গুণসম্পদে বোয়ারদের চেয়ে ধনী জাতি আমি আর দেখি নাই,—সেই বোয়ারদের সম্বন্ধেই ডেলি মেলের সংবাদদাতা মিষ্টার রাল্‌ফ লিখিয়াছেন যে, তাহারা না সাহসী, না ন্যায়নিষ্ঠ, তাহারা ভীরু এবং কাপুরুষ, তাহারা অর্দ্ধসভ্য—তাহারা সয়তানী দুর্ব্বুদ্ধির দ্বারা পরিপূর্ণ ইত্যাদি।

আরো অনেকগুলি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া হবার্টস্পেন্সর বলিতেছেন, এ দিকে কাপ্তেন ফিলিপ্‌স্ বলেন যে, financial gang অর্থাৎ মূলধনওয়ালার দল প্রেস্‌কে হস্তগত করিয়াছিল, টেলিগ্রাফ নিজেরা চালাইয়াছিল, এবং ইংলণ্ডে কিরূপ সংবাদ পৌছান আবশ্যক তাহা তাহারা নিজেরা ঠিক করিয়া দিতেছিল। যে সকল অত্যাচারের কাহিনী ইংলণ্ডের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার উপযোগী, তাহা deliberately invented কোমর বাঁধিয়া বানাইতেছিল।

অন্যত্র আছে, পাব্লিকের বিচারবুদ্ধি কি করিয়া নিয়মিতরূপে বিকৃত করা হইয়াছে, তাহার একটি পদ্ধতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পরে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। সাক্ষীটি এমন যে, তাঁহার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা ও সেনাদলে তাঁহার উচ্চপদ তাঁহাকে অন্যায়

প্রতিকূলতার সংশয়মাত্র হইতে মুক্তিদান করিবে—তিনি আর কেহ নহেন—ফীল্‌ড্‌ মার্শাল্‌ সার নেভিল্‌ চেম্বারলেন্‌। তিনি বলেন,—"শত্রুপরিবারদিগের আত্মোপাস্ত ধ্বংস বা অপহরণকার্য্য এবার যেরূপ ঘটিয়াছে, ব্রিটিশ সৈন্যদলের দ্বারা আর কখনো এমন ঘটে নাই।" ১৯০১ শালের জুলাই মাসে তিনি এই প্রকারের অপবাদ দিয়া কোন লণ্ডনের কাগজে একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন। বহুদিন তাহা প্রকাশ না হওয়ায় টেলিগ্রামের উত্তরে তিনি সম্পাদকের নিকট হইতে তাঁহার লেখার প্রুফসহ এই অনুরোধ পাইলেন যে, কতক গুলি প্রতিকূল কথা—যাহা তাঁহার লেখার প্রধান মর্ম্ম—যেন তুলিয়া দেওয়া হয়।

যথাযথ সত্যের প্রতি বিলাত এইরূপ আস্থা দেখাইয়াছে। সেই বিলাতে জন্‌ মর্লি এবং হার্বার্ট্‌ স্পেন্সার প্রভৃতি দুই একজন মনস্বী ব্যতীত আর কোন উপদেষ্টা নাই। অথচ প্রাচ্য অত্যুক্তি সংশোধনের জন্য অনেক নীতিজ্ঞ উপদেষ্টা সেই দেশ হইতেই আমদানি হইয়া থাকে। ইহা আমাদের সৌভাগ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু এরূপ সৌভাগ্য একলা ভোগ করিতে ইচ্ছা করে না—ইংরেজের সঙ্গে ইহা আমরা ভাগাভাগি করিয়া লইতে রাজি আছি।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে দুই বিভিন্ন শ্রেণীর অত্যুক্তির উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। প্রাচ্য অত্যুক্তির উদাহরণ আরব্য উপন্যাস এবং পাশ্চাত্য অত্যুক্তির উদাহরণ রাডিয়ার্ড কিপ্লিংয়ের "কিম্‌" এবং তাঁহার ভারতবর্ষীয় চিত্রাবলী। আরব্য উপন্যাসেও ভারতবর্ষের কথা, চীনদেশের কথা আছে, কিন্তু সকলেই জানে তাহা গল্পমাত্র—তাহার মধ্য হইতে কাল্পনিক সত্য ছাড়া আর কোন সত্য কেহ প্রত্যাশাই করিতে পারে না, তাহা এতই সুস্পষ্ট। কিন্তু কিপ্লিং তাঁহার কল্পনাকে আচ্ছন্ন রাখিয়া এমনি একটি সত্যের আড়ম্বর করিয়াছেন যে, যেমন হলপ্‌-পড়া সাক্ষীর কাছ হইতে লোকে প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রত্যাশা করে, তেমনি কিপ্লিঙের গল্প হইতে ব্রিটিশ-পাঠক ভারতবর্ষের প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রত্যাশা না করিয়া থাকিতে পারে না।

ব্রিটিশ পাঠককে এমনি ছল করিয়া ভুলাইতে হয়। কারণ ব্রিটিশ পাঠক বাস্তবের প্রিয়। শিক্ষালাভ করিবার বেলাও তাহার বাস্তব চাই। খেলেনাকেও বাস্তব করিয়া তুলিতে না পারিলে তাহার খেলার সুখ হয় না। আমরা দেখিয়াছি, ব্রিটিশ ভোজে খরগোশ রাঁধিয়া জন্তুটাকে যথাসম্ভব অবিকল রাখিয়াছে। সেটা যে সুখাদ্য ইহাই যথেষ্ট আমোদের নহে, কিন্তু সেটা যে একটা বাস্তবজন্তু বৃটিশ ভোগী তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে চায়। বৃটিশ খানা যে কেবল খানা তাহা নহে, তাহা প্রাণিবৃত্তান্তের গ্রন্থবিশেষ বলিলেই হয়। যদি কোন ব্যঞ্জনে পাখীগুলা ভাজা ময়দার আবরণে ঢাকা পড়ে, তবে তাহাদের পাগুলা কাটিয়া আবরণের উপরে বসাইয়া রাখা হয়। বাস্তব এত আবশ্যক! কল্পনার নিজ এলাকার মধ্যেও বৃটিশ পাঠক বাস্তবের সন্ধান করে—তাই কল্পনাকেও দায়ে পড়িয়া প্রাণপণে বাস্তবের ভাণ করিতে হয়।

যে ব্যক্তি অসম্ভব স্থান হইতেও সাপ দেখিতেই চায়, সাপুড়ে তাহাকে ঠকাইতে বাধ্য হয়। সে নিজের ঝুলির ভিতর হইতেই সাপ বাহির করে, কিন্তু ভাণ করে যেন দর্শকের চাদরের মধ্য হইতে বাহির হইল। কিপ্লিং নিজের কল্পনার ঝুলি হইতেই সাপ বাহির করিলেন, কিন্তু নৈপুণ্যগুণে ব্রিটিশ পাঠক ঠিক বুঝিল যে, এসিয়ার উত্তরীয়ের ভিতর হইতেই সরীসৃপগুলা দলে দলে বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরের বাস্তব সত্যের প্রতি আমাদের এরূপ একান্ত লোলুপতা নাই। আমরা কল্পনাকে কল্পনা জানিয়াও তাহার মধ্য হইতে রস পাই। এজন্য গল্প শুনিতে বসিয়া আমরা নিজেকে নিজে ভুলাইতে পারি—লেখককে কোনরূপ ছলনা অবলম্বন করিতে হয় না। কাল্পনিক সত্যকে বাস্তব সত্যের ছদ্মগোঁপদাড়ি পরিতে হয় না। আমরা বরঞ্চ বিপরীত দিকে যাই। আমরা বাস্তব সত্যে কল্পনার রং ফলাইয়া তাহাকে অপ্রাকৃত করিয়া ফেলিতে পারি, তাহাতে আমাদের দুঃখবোধ হয় না। আমরা বাস্তব সত্যকেও কল্পনার সহিত মিশাইয়া দিই—আর য়ুরোপ কল্পনাকেও বাস্তব সত্যের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করাইয়া তবে ছাড়ে। আমাদের এই স্বভাবদোষে আমাদের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে—আর ইংরেজের স্বভাবে ইংরেজের কি কোনো লোক্‌সান্‌ করে নাই? গোপন-মিথ্যা কি সেখানে ঘরে-বাহিরে বিহার করিতেছে না? সেখানে খবরের কাগজে খবর-বানানো চলে, তাহা দেখা গিয়াছে এবং সেখানে ব্যবসাদার-মহলে শেয়ার-কেনা-বেচার বাজারে যে কিরূপ সর্ব্বনেশে মিথ্যা বানানো হইয়া থাকে, তাহাও কাহারো অগোচর নাই। বিলাতে বিজ্ঞাপনের অত্যুক্তি ও মিথ্যোক্তি নানা বর্ণে নানা চিত্রে নানা অক্ষরে দেশে-বিদেশে নিজেকে কিরূপ ঘোষণা করে, তাহা আমরা জানি—এবং আজকাল আমরাও ভদ্রাভদ্রে মিলিয়া নির্লজ্জভাবে এই অভ্যাস গ্রহণ করিয়াছি! বিলাতে পলিটিক্সে বানানো বাজেট তৈরি করা, প্রশ্নের বানানো উত্তর দেওয়া প্রভৃতি অভিযোগ তুলিয়া এক পক্ষের প্রতি অপর পক্ষে যে সকল দোষারোপ করিয়া থাকেন, তাহা যদি মিথ্যা হয় তবে লজ্জার বিষয়, যদি না হয় তবে শঙ্কার বিষয়, সন্দেহ নাই। সেখানকার পার্লামেণ্টে পার্লামেণ্ট-সঙ্গত ভাষায় এবং কখনো বা তাহা লঙ্ঘন করিয়াও বড় বড় লোককে মিথ্যুক, প্রবঞ্চক, সত্যগোপনকারী বলা হইয়া থাকে; হয়, এরূপ নিন্দাবাদকে অত্যুক্তিপরায়ণতা বলিতে হয়, নয়, ইংলণ্ডের পলিটিক্স্‌ মিথ্যার দ্বারা জীর্ণ, এ কথা স্বীকার করিতে হয়।

যাহা হউক, এ সমস্ত আলোচনা করিলে এই কথা মনে উদয় হয় যে, বরঞ্চ অত্যুক্তিকে সুস্পষ্ট অত্যুক্তিরূপে পোষণ করাও ভাল, কিন্তু অত্যুক্তিকে সুকৌশলে ছাঁটিয়া-ছুঁটিয়া তাহাকে বাস্তবের দলে চালাইবার চেষ্টা করা ভাল নহে—তাহাতে বিপদ্‌ অনেক বেশি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যেখানে দুই পক্ষে উভয়ের ভাষা বোঝে, সেখানে পরস্পরের যোগে অত্যুক্তি আপনি সংশোধিত হইয়া আসে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিলাতি অত্যুক্তি

বোঝা আমাদের পক্ষে শক্ত। এইজন্য তাহা অক্ষরে-অক্ষরে বিশ্বাস করিয়া, আমরা নিজের অবস্থাকে হাস্যকর ও শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছি। ইংরেজ বলিয়াছিল, আমরা তোমাদের ভাল করিবার জন্যই তোমাদের দেশ শাসন করিতেছি, এখানে শাদা-কালোয় অধিকারভেদ নাই, এখানে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খায়, সম্রাট্‌শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ আকবর যাহা কল্পনামাত্র করিয়াছিলেন, আমাদের সাম্রাজ্যে তাহাই সত্যে ফলিতেছে। আমরা তাড়াতাড়ি ইহাই বিশ্বাস করিয়া আশ্বাসে স্ফীত হইয়া বসিয়া আছি। আমাদের দাবীর আর অন্ত নাই। ইংরেজ বিরক্ত হইয়া আজকাল এই সকল অত্যুক্তিকে খর্ব্ব করিয়া লইতেছে। এখন বলিতেছে—যাহা তরবারি দিয়া জয় করিয়াছি, তাহা তরবারি দিয়া রক্ষা করিব। শাদা-কালোয় যে যথেষ্ট ভেদ আছে, তাহা এখন অনেক সময়ে নিতান্ত গায়ে পড়িয়া নিতান্ত স্পষ্ট করিয়া দেখানো হইতেছে। কিন্তু তবু বিলাতি অত্যুক্তি এমনি সুনিপুণ ব্যাপার যে, আজো আমরা দাবী ছাড়ি নাই, আজো আমরা বিশ্বাস আঁকড়িয়া বসিয়া আছি, সেই সকল অত্যুক্তিকেই আমাদের প্রধান দলিল করিয়া আমাদের জীর্ণ-চীরপ্রান্তে বহু যত্নে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। অথচ আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, এক সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীকে কাপড় জোগাইয়াছে, আজ সে পরের কাপড় পরিয়া লজ্জা বাড়াইতেছে—এক সময়ে ভারতভূমি অন্নপূর্ণা ছিল, আজ "হাদে লক্ষ্মী হইল লক্ষ্মীছাড়া"—এক সময়ে ভারতে পৌরুষরক্ষা করিবার অস্ত্র ছিল, আজ কেবল কেরাণীগিরির কলম কাটিবার ছুরিটুকু আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজত্ব পাইয়া অবধি ইচ্ছাপূর্ব্বক চেষ্টাপূর্ব্বক ছলে-বলে-কৌশলে ভারতের শিল্পকে পঙ্গু করিয়া সমস্ত দেশকে কৃষিকার্য্যে দীক্ষিত করিয়াছে, আজ আবার সেই কৃষকের খাজনা বাড়িতে বাড়িতে সেই হতভাগ্য ঋণসমুদ্রের মধ্যে চিরদিনের মত নিমগ্ন হইয়াছে—এই ত গেল বাণিজ্য এবং কৃষি।—তাহার পর বীর্য্য এবং অস্ত্র, সে কথার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। ইংরেজ বলে, তোমরা কেবলি চাকরির দিকে ঝুঁকিয়াছ, ব্যবসা কর না কেন? এদিকে দেশ হইতে বর্ষে বর্ষে প্রায় পাঁচশতকোটি টাকা খাজনায় এবং মহাজনের লাভে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। মূলধন থাকে কোথায়? এই অবস্থায় দাঁড়াইয়াছি। তবু কি বিলাতি অত্যুক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া কেবলি দরখাস্তজারি করিতে হইবে? হায় ভিক্ষুকের অনন্ত ধৈর্য্য! হায় দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ! রোমের শাসনে, স্পেনের শাসনে, মোগলের শাসনে এত-বড় একটা বৃহৎ দেশ কি এমন নিঃশেষে উপায়বিহীন হইয়াছে? অথচ পরদেশশাসনসম্বন্ধে এত বড়-বড় নীতিকথার দম্ভপূর্ণ অত্যুক্তি আর কেহ কি কখনো উচ্চারণ করিয়াছে?

কিন্তু এ সকল অপ্রিয় কথা উত্থাপন করা কেন? কোন একটা জাতিকে অনাবশ্যক আক্রমণ করিয়া পীড়া দেওয়া আমাদের দেশের লোকের স্বভাবসঙ্গত নহে—ইহা আমরা ক্রমাগত ঘা খাইয়া ইংরেজের

কাছ হইতেই শিখিয়াছি। নিতান্ত গায়ের জ্বালায় আমাদিগকে যে অশিষ্টতায় দীক্ষিত করিয়াছে, তাহা আমাদের দেশের জিনিষ নহে।

কিন্তু অন্যের কাছ হইতে আমরা যতই আঘাত পাই না কেন, আমাদের দেশের যে চিরন্তন নম্রতা, যে ভদ্রতা, তাহা পরিত্যাগ করিব কেন? ইহাকেই বলে চোরের উপর রাগ করিয়া নিজের ক্ষতি করা।

অবশ্য পরের নিকট হইতে স্বজাতি যখন অপবাদ ও অপমান সহ্য করিতে থাকে, তখন যে আমার মন অবিচলিত থাকে, এ কথা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু সেই অপবাদ-লাঞ্ছনার জবাব দিবার জন্যই যে আমার এই প্রবন্ধ লেখা, তাহা নহে। আমরা যেটুকু জবাব দিবার চেষ্টা করি, তাহা নিতান্ত ক্ষীণ, কারণ বাক্‌শক্তিই আমাদের একটিমাত্র শক্তি। কামানের যে গর্জ্জন তাহা ভীষণ, কারণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে লোহার গোলাটা থাকে, কিন্তু প্রতিধ্বনির যে প্রত্যুত্তর তাহা ফাঁকা। সেরূপ খেলামাত্রে আমার অভিরুচি নাই।

ইংরেজ আমার এ লেখা পড়িবে না, পড়িলেও সকল কথা ঠিক বুঝিবে না। আমার এ লেখা আমাদের স্বদেশীয় পাঠকদের জন্যই। অনেকদিন ধরিয়া চোখ বুজিয়া আমরা বিলাতি সভ্যতার হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, সে সভ্যতা স্বার্থকে অভিভূত করিয়া বিশ্বহিতৈষা ও বিশ্বজনের শৃঙ্খলমুক্তির পথেই সত্য-প্রেম-শান্তির অনুকূলে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু আজ হঠাৎ চমক ভাঙিবার সময় আসিয়াছে।

পৃথিবীতে এক এক সময়ে প্রলয়ের বাতাস হঠাৎ উঠিয়া পড়ে। এক সময়ে মধ্য এসিয়ার মোঙ্গলগণ ধরণী হইতে লক্ষ্মীশ্রী ঝাঁটাইতে বাহির হইয়াছিল—এক সময়ে মুসলমানগণ ধূমকেতুর মত পৃথিবীর উপর প্রলয়পুচ্ছ সঞ্চালন করিয়া ফিরিয়াছিল। পৃথিবীর মধ্যে যে কোণে ক্ষুধার বেগ বা ক্ষমতার লালসা ক্রমাগত পোষিত হইতে থাকে, সেই কোণ হইতে জগদ্বিনাশী ঝড় উঠিবেই।

প্রাচীনকালে এই ধ্বংসধ্বজা তুলিয়া গ্রীক্, রোমক, পারসীকগণ অনেক রক্তসেচন করিয়াছে। ভারতবর্ষ বৌদ্ধ-রাজাদের অধীনে বিদেশে আপন ধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছে, আপন স্বার্থবিস্তার করে নাই। ভারতবর্ষীয় সভ্যতায় বিনাশসাধনের বেগ কোনোকালে ছিল না। ক্ষমতা ও স্বার্থবিস্তার ভারতবর্ষীয় সভ্যতার ভিত্তি নহে।

য়ুরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি তাহাই। তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে নানা আকারে নানাদিক্ হইতে আপনার ক্ষমতাকে ও স্বার্থকেই বলীয়ান্ করিবার চেষ্টা করিতেছে। স্বার্থ ও ক্ষমতাস্পৃহা কোনোকালেই নিজের অধিকারের মধ্যে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না—এবং অধিকারলঙ্ঘনের পরিণামফল নিঃসংশয় বিপ্লব।

ইহা ধর্ম্মের নিয়ম, ইহা ধ্রুব। সমস্ত য়ুরোপ আজ অস্ত্রে-শস্ত্রে দস্তুর হইয়া উঠিয়াছে। ব্যবসায়বুদ্ধি তাহার ধর্ম্মবুদ্ধিকে অতিক্রম করিতেছে।

আমাদের দেশে বিলাতি সভ্যতার এমন সকল পরম ভক্ত আছেন—যাঁহারা ধর্ম্মকে অবিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্তু বিলাতি সভ্যতাকে অবিশ্বাস করিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন, বিকার যাহা-কিছু দেখিতেছ, এ সমস্ত কিছুই নহে—দুই দিনেই কাটিয়া যাইবে। তাঁহারা বলেন, য়ুরোপীয় সভ্যতার রক্তচক্ষু এঞ্জিন্‌টা সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্বের পথে ধক্‌ধক্ শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে।

এরূপ অসামান্য অন্ধভক্তি সকলের কাছে প্রত্যাশা করিতে পারি না। সেইজন্যই পূর্ব্বদেশের হৃদয়ের মধ্যে আজ এক সুগভীর চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে। আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় পাখী যেমন আপন নীড়ের দিকে ছোটে; তেমনি বায়ুকোণে রক্তমেঘ দেখিয়া পূর্ব্বদেশ হঠাৎ আপনার নীড়ের সন্ধানে উড়িবার উপক্রম করিয়াছে,—বজ্রগর্জ্জনকে সে সার্ব্বভৌমিক প্রেমের মঙ্গলশঙ্খধ্বনি বলিয়া কল্পনা করিতেছে না। য়ুরোপ ধরণীর চারিদিকেই আপনার হাত বাড়াইতেছে—তাহাকে প্রেমালিঙ্গনের বাহুবিস্তার মনে করিয়া প্রাচ্যথণ্ড পুলকিত হইয়া উঠিতেছে না।

এই অবস্থায় আমরা বিলাতি সভ্যতার যে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা কেবলমাত্র আত্মরক্ষার আকাঙ্ক্ষায়। আমরা যদি সংবাদ পাই যে, বিলাতি সভ্যতার মূলকাণ্ড যে পলিটিক্‌স্—সেই পলিটিক্‌স্ হইতে স্বার্থপরতা, নির্দ্দয়তা ও অসত্য, ধনাভিমান ও ক্ষমতাভিমান প্রত্যহ জগৎ জুড়িয়া শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিতেছে, এবং যদি ইহা বুঝিতে পারি যে, স্বার্থকে সভ্যতার মূলশক্তি করিলে এরূপ দারুণ পরিণাম একান্তই অবশ্যম্ভাবী, তবে সে কথা সর্ব্বতোভাবে আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক হইয়া পড়ে—পরকে অপবাদ দিয়া সান্ত্বনা গাইবার জন্য নহে, নিজেকে সময় থাকিতে সংযত করিবার জন্য।

আমরা আজকাল পলিটিক্স অর্থাৎ রাষ্ট্রগত একান্ত স্বার্থপরতাকেই সভ্যতার একটি মাত্র মুকুটমণি ও বিরোধপরতাকেই উন্নতিলাভের একটিমাত্র পথ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি; আমরা পলিটিক্সের মিথ্যা ও দোকানদারীর মিথ্যা বিদেশের দৃষ্টান্ত হইতে প্রতিদিন গ্রহণ করিতেছি; আমরা টাকাকে মনুষ্যত্বের চেয়ে বড় এবং ক্ষমতালাভকে মঙ্গলব্রতাচরণের চেয়ে শ্রেয় বলিয়া জানিয়াছি—তাই এতকাল যে স্বাভাবিক নিয়মে আমাদের দেশে লোকহিতকর কর্ম্ম ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হইতেছিল, তাহা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেছে। ইংরেজ-গোয়ালা বাঁটে হাত না দিলে আমাদের কামধেনু আর একফোঁটা দুধ দেয় না—নিজের বাছুরকেও নহে। এমনি দারুণ মোহ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে! সেই মোহজাল ছিন্ন করিবার জন্য যে সকল তীক্ষ্ণবাক্য প্রয়োগ করিতে হইতেছে, আশা করি তাহা বিদ্বেষবুদ্ধির অস্ত্রশালা হইতে গৃহীত হইতেছে না, আশা করি তাহা স্বদেশের মঙ্গল-ইচ্ছা হইতে প্রেরিত। আমরা গালি খাইয়া যদি জবাব দিতে উদ্যত হইয়া থাকি, সে জবাব বিদেশী গালিদাতার উদ্দেশে নহে—সে কেবল আমাদের নিজের কাছে নিজের সম্মান রাখিবার জন্য, আমাদের নিজের প্রতি

ভয়প্রবণ বিশ্বাসকে বাঁধিয়া তুলিবার জন্য, শিশুকাল হইতে বিদেশীকে একমাত্র গুরু বলিয়া মানা অভ্যাস হওয়াতে তাঁহাদের মুখকে বেদবাক্য বলিয়া স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন হইবার মহাবিপদ্ হইতে নিজেরা রক্ষা পাইবার জন্য। ইংরেজ যে পথে যাইতে চায় যাক্, যত দ্রুতবেগে রথ চালাইতে চাহে চালাক্, তাহাদের চঞ্চল চাবুকটা যেন আমাদের পৃষ্ঠে না পড়ে এবং তাহাদের চাকার তলায় আমরা যেন অন্তিমগতি লাভ না করি, এই হইলেই হইল। ভাণ্ আমরা চাহি না; উত্তরোত্তর দুর্লভতর আঙুরের গুচ্ছ অক্ষমের অদৃষ্টে প্রতিদিন টকিয়া উঠিতেছে বলিয়াই হউক আর যে কারণেই হউক, আমাদের আর ভিক্ষায় কাজ নাই—এবং এ কথা বলাও বাহুল্য, কৃতাতেও আমাদের প্রয়োজন দেখি না। শিক্ষাই বল, চাকরীই বল, যাহা পরের কাছে মাগিয়া-পাতিয়া লইতে হয়, পাছে কবে আবার কাড়িয়া লয় এই ভয়ে যাহাকে পাঁচজনের কাছে সবলে চাপিয়া ধরিয়া বক্ষ ব্যথিত করিয়া তুলি, তাহা খোওয়া গেলে অত্যন্ত বেশি ক্ষতি নাই; কারণ, মানুষের প্রাণ বড় কঠিন, সে বাঁচিবার শেষ চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহার যে কতটা শক্তি আছে, নিতান্ত দায়ে না পড়িলে তাহা সে নিজেই বোঝে না; নিজের সেই অন্তরতর শক্তি আবিষ্কার করিবার জন্য বিধাতা যদি ভারতকে সর্ব্বপ্রকারে বঞ্চিত হইতে দেন, তাহাতে শাপে বর হইবে। এমন জিনিষ আমাদের চাই যাহা সম্পূর্ণ আমাদের স্বায়ত্ত, যাহা কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না—সেই জিনিষটি হৃদয়ে রাখিয়া আমরা যদি কৌপীন পরি, যদি সন্ন্যাসী হই, যদি মরি, সে-ও ভাল। 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।' আমাদের খুব বেশি ব্যঞ্জনে দরকার নাই, যেটুকু আহার করিব, নিজে যেন আহরণ করিতে পারি, খুব বেশি সাজসজ্জা না হইলেও চলে, মোটা কাপড়টা যেন নিজের হয়, এবং দেশকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আমরা যতটুকু নিজে করিতে পারি, তাহা যেন সম্পূর্ণ নিজের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এক কথায়, যাহা করিব আত্মত্যাগের দ্বারায় করিব, যাহা পাইব আত্মবিসর্জ্জনের দ্বারায় পাইব, যাহা দিব আত্মদানের দ্বারাতেই দিব; এই যদি সম্ভব হয় ত হউক, না যদি হয়, পরে চাকরী না দিলেই যদি আমাদের অন্ন না জোটে, পরে বিদ্যালয় বন্ধ করিবামাত্রই যদি আমাদিগকে গণ্ডমূর্খ হইয়া থাকিতে হয় এবং পরের নিকট হইতে উপাধির প্রত্যাশা না থাকিলে দেশের কাজে আমাদের টাকার থলির গ্রন্থিমোচন যদি না হইতে পারে, তবে পৃথিবীতে আর কাহারো উপর কোন দোষারোপ না করিয়া যথাসম্ভব সত্বর যেন নিঃশব্দে এই ধরাতল হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারি। ভিক্ষাবৃত্তির তারস্বরে, অক্ষম বিলাপের সানুনাসিকতায় রাজপথের মাঝখানে আমরা যেন বিশ্বজগতের দৃষ্টি নিজেদের প্রতি আকর্ষণ না করি! যদি আমাদের নিজের চেষ্টায় আমাদের দেশের কোন বৃহৎ কাজ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তবে হে মহামারি, তুমি আমাদের বান্ধব, হে দুর্ভিক্ষ, তুমি আমাদের সহায়!

প্রাণী ও উদ্ভিদ।

সজীব প্রাণিশরীরের কোন অংশে আঘাত দিলে, আঘাতের প্রকারভেদে তাহার সাড়ার চিত্র সাধারণত তিন প্রকারের হইতে দেখা যায়। একখণ্ড মাংসপেশীতে একটা নির্দ্দিষ্ট-কালের শেষে সমবলে পুনঃপুন আঘাত দিতে থাকিলে, সেই আঘাতজনিত পেশীর বিকৃতি ও স্বভাবপ্রাপ্তি রেখাচিত্রে স্পষ্ট অঙ্কিত হইতে থাকে এবং চিত্রের সমদীর্ঘ ঊর্দ্ধাধোরেখা মাপিলে, প্রত্যেক আঘাতে যে একইপ্রকার সাড়া পাওয়া যাইতেছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু এই নিয়মিত আঘাত আরো কিছুকাল চালাইলে মাংস-পেশীর সাড়া দিবার ক্ষমতাটা যেন হঠাৎ বাড়িয়া উঠে। পাঠক দেখিয়া থাকিবেন, বহুকাল নিশ্চেষ্ট অবস্থায় থাকিয়া হঠাৎ কোন কাজে নিযুক্ত হইলে, প্রথমে একটা বিশেষ চেষ্টার আবশ্যক হয়। আমাদের দেহের অলস অণুগুলিকে সজাগ করাই এই চেষ্টার কাজ। তার পর বহুক্ষণ সেই একই কাজে নিযুক্ত থাকিলে, আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অণুগুলি এরূপ হইয়া দাঁড়ায় যে, তখন অতি অল্প আয়াসেই তাহারা যথোপযুক্তরূপে সঞ্চালিত হইয়া কার্য্যটা যন্ত্রবৎ সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করে। কার্য্যের প্রারম্ভে যে চেষ্টার আব-শ্যক হয়, মাঝখানে তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প আয়াসেই কাজ সুসম্পন্ন হইয়া যায়। মাংসপেশীতে কিছু অধিককাল ধরিয়া নিয়-মিত আঘাত দিলে, তাহারও অণুসকল ঠিক পূর্ব্বোক্তকারণে সজাগ হইয়া বাহ্যিক তাড়নায় অধিকপরিমাণে সাড়া দিতে থাকে। এই সাড়ার রেখাচিত্র, প্রথম চিত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রথম চিত্রের নিয়মিত উত্তেজনা-জ্ঞাপক সেই সমদীর্ঘ রেখার পরিবর্ত্তে, কতকগুলি ক্রমদীর্ঘ অসমান রেখা অঙ্কিত হইয়া এক সোপানাকার চিত্রের রচনা করে।

উত্তেজনা থাকিলেই পরে অবসাদ আসে। দীর্ঘকালধরিয়া কোন একটা কার্য্য করিতে থাকিলে, আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন অবসন্ন হইয়া পড়ে, সুদীর্ঘকালব্যাপী পুনঃপুন আঘাতে মাংসপেশীতেও তদ্রূপ ক্লান্তি আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ক্লান্তি-বৃদ্ধির সহিত সাড়ার মাত্রাও ক্রমে কমিয়া যায়। কাজেই এই সাড়ায় যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহা একটা ক্রমহ্রসমান সোপানাকারে অঙ্কিত হইয়া পড়ে।

সম্প্রতি অধ্যাপক বসু মহাশয় উদ্ভিদকেও ঠিক তদনুরূপ অবস্থায় ফেলিয়া তাহার সাড়-শক্তির অবিকল সেই প্রকারের প্রমাণ পাইয়াছেন। একই নির্দ্দিষ্টকালের শেষে উদ্ভিদশরীরে সমান বলে আঘাত কর, উদ্ভিদ সমভাবে সাড়া দিতে থাকিবে এবং চিত্রও সমদীর্ঘ-রেখাময় হইয়া অঙ্কিত হইতে থাকিবে। তার পর এই নিয়মিত তাড়নাটা আরো কিছুকাল চালাও, উদ্ভিদের অণু-

সকল লাঘবতা লাভ করিয়া খুব সবলে সাড়া দিতে থাকিবে, এবং চিত্রটাও তদবস্থ মাংস-পেশীর চিত্রের অনুরূপ সোপানাকারে অঙ্কিত হইয়া পড়িবে। সুদীর্ঘকাল এইপ্রকার আঘাত দিতে থাকিলে, সজীব প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদ যে অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহাও অধ্যাপক বসু দেখাইয়াছেন। অবসন্ন উদ্ভিদ শত তাড়নায় কোনই সাড়া দেয় না, কাজেই চিত্রে সাড়ানির্দ্দেশক উঁচু-নীচু রেখা-পাত হয় না। আঘাত রোধ করিয়া ক্লান্ত উদ্ভিদকে একটু বিশ্রামের অবকাশ দাও, কিয়ৎকালমধ্যে সে আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িবে। তখন আঘাত কর, উদ্ভিদ ঠিক পূর্ব্ববৎ সাড়া দিবে।

পাঠক দেখিয়া থাকিবেন, মাংসপেশীর কোন অংশ দীর্ঘকাল একই ভাবে আন্দো-লিত করিলে বা তাহাতে অতিদ্রুত আঘাত দিতে থাকিলে, সেটা শীঘ্রই পূর্ণ অবসাদ বা ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় মাংসপেশী এপ্রকার জড়তা লাভ করে যে, কোন উত্তেজনায় তাহার সেই অসাড়তা দূর হয় না। কিন্তু কিয়ৎ-কাল বিশ্রামের অবকাশ দিলে, সেটি আপনা হইতেই আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া পড়ে। অধ্যাপক বসুর পরীক্ষায় জীবিত উদ্ভিদ-দেহেও ঠিক পূর্ব্বোক্তপ্রকারের ধনুষ্টঙ্কার দেখা গিয়াছে। এবং অবসাদ-অপনোদনের জন্য প্রাণীকে যে প্রধায় চিকিৎসা করিতে হয়, অবসাদ-মোচনের জন্য উদ্ভিদকেও যে তদ্রূপ চিকিৎসা করা আবশ্যক, তাহাও জানা গিয়াছে।

শীতাতপের মাত্রাভেদে উদ্ভিদদেহে আঘাতের ক্রিয়া কি প্রকারে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাও অধ্যাপক মহাশয় বহু পরীক্ষাদি দ্বারা আবিষ্কার করিয়াছেন। মানুষ ও অপর প্রাণী যেমন বায়ুর একটা নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায় স্ফূর্ত্তির সহিত কাজ করিতে পারে, জাতিবিশেষে উদ্ভিদের চরম কার্য্যক্ষমতাও সেইপ্রকার একএকটা নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায় স্ফূর্ত্তি পাইতে দেখা গিয়াছে। অত্যন্ত শীতল স্থানে একটি উদ্ভিদপত্র রাখিয়া তাহাকে আঘাত কর, সেটা শীতে আড়ষ্ট হইয়া থাকিবে, শীতার্ত্ত প্রাণীর ন্যায় সে কোনই সাড়া দিবে না। তার পর আর একটি পত্রকে অত্যন্ত গরমে রাখ, এই অবস্থায় সে এত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে যে, তখন অতি মৃদু সাড়া দিবার শক্তিটি পর্য্যন্ত তাহার থাকিবে না।

প্রকৃতিভেদে মানুষের শীতাতপসহিষ্ণু-তার যেমন পরিবর্ত্তন দেখা যায়, উদ্ভিদেও অবিকল তদনুরূপ পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে। ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডবাসী যে শীতে খুব স্ফূর্ত্তির সহিত কাজ করে, আফ্রিকাবাসীকে সেই শীতে মৃতপ্রায় হইতে দেখা যায়। অধ্যাপক বসু আইভি, হলি ও লিলি জাতীয় কয়েকটি উদ্ভিদ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে শৈত্যে আইভি-লতা ও হলি সজাগ থাকে, সেই শৈত্যেই লিলি মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। তখন বহু আঘাতে তাহার কোনই সাড়া পাওয়া যায় না। তাহার পর শৈত্যের মাত্রা বাড়াইলে লিলির মৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়।

নানাজাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে কোন্‌টি কোন্ উষ্ণতায় সর্ব্বাপেক্ষা স্ফূর্ত্তিসম্পন্ন থাকে এবং শৈত্যের পরিমাণ কতদূর বাড়িলে

তাহাদের মৃত্যু, তাহা অধ্যাপক বসু স্থির করিয়াছেন। ফাহরণহিটের ১৩০ অংশ উষ্ণ জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে আসিলে, অধিকাংশ উদ্ভিদেরই মৃত্যু উপস্থিত হয় দেখা গিয়াছে।

দ্রব্যবিশেষের অবসাদকর ও মাদক ক্রিয়ার সহিত আমরা সকলেই অল্পাধিক পরিচিত। ক্লোরোফরম্ বা অপর বিষ প্রয়োগ কর, প্রাণিদেহ অসাড় হইয়া পড়িবে এবং মাত্রা প্রচুর হইলে মৃত্যু ঘটিবে। এমোনিয়া বা অপর কোনও উত্তেজক পদার্থের সাহায্য গ্রহণ কর, শরীরের অবসাদ নাশ ও উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইবে। অধ্যাপক বসু উদ্ভিদদেহে নানা উত্তেজক ও অবসাদকর পদার্থের ক্রিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, প্রাণি ও উদ্ভিদ দেহে এই পদার্থগুলির কার্য্য অবিকল এক। উদ্ভিদদেহে উত্তেজক পদার্থ প্রয়োগ করিলে তাহার সাড়ের প্রবলতা স্পষ্ট বাড়িয়া উঠে এবং বিষ বা অপর অবসাদজনক পদার্থের প্রয়োগে প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদেরও অবসাদলক্ষণ দেখা যায়। বিষের মাত্রাটা প্রচুর হইলে ইহারও মৃত্যু ঘটে।

প্রয়োগমাত্রার উপর ঔষধের ক্রিয়া অনেক নির্ভর করে। যে ঔষধ স্বল্পমাত্রায় গ্রহণ করিলে প্রাণী রোগমুক্ত হয়, তাহারই অযথাপ্রয়োগে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। বেলেডোনা, আর্সেনিক্ ও অহিফেন প্রভৃতি দ্রব্য মাত্রাভেদে কিপ্রকারে কখনও ঔষধের এবং কখনও বিষের কাজ করে, তাহা সকলেই জানেন। অধ্যাপক বসু উদ্ভিদেও অবিকল অনুরূপ ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। উদ্ভিদদেহে অল্পমাত্রায় বিষপ্রয়োগ কর, উদ্ভিদ উত্তেজিত হইয়া প্রবল সাড়া দিতে থাকিবে। বিষের প্রয়োগমাত্রা বৃদ্ধি কর, উদ্ভিদ অবসন্ন হইয়া পড়িবে এবং শেষে সাড়ানির্দ্দেশক রেখাচিত্রে মৃত্যুরেখা অঙ্কিত হইয়া পড়িবে।

আঘাত-উত্তেজনায় সাড়া দিবার ক্ষমতা যে সজীব পদার্থমাত্রেরই একটি বিশেষত্ব, তাহা ইতিপূর্ব্বে জানা ছিল। কিন্তু প্রাণী, উদ্ভিদ ও ধাতব পদার্থের সাড়ার মধ্যে যে এতটা সৌসাদৃশ্য থাকিতে পারে, তাহা কোন জীববিদ্ এ পর্য্যন্ত অনুমানও করিতে পারেন নাই। প্রাণীর ন্যায় ধাতু ও উদ্ভিদের বেদনাবোধশক্তি আছে কি না, সে সম্বন্ধে কোনও কথা এখন বলা চলে না,—কিন্তু আঘাতজাত বেদনায় সচেতন প্রাণী যে সকল লক্ষণ প্রকাশ করে, সেই আঘাতে উদ্ভিদ এবং ধাতুও যে তদনুরূপ চিহ্নের বিকাশ করে, তাহা আর এখন অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এতদ্ব্যতীত জীবনক্রিয়ার মূলটা যে সাড়া-দেওয়া-ব্যাপারেই আছে, তাহাও অধ্যাপক বসুর পরীক্ষায় জানা গিয়াছে। জীবনক্রিয়ার কথা উঠিলেই, প্রাচীন ও আধুনিক জীববিদ্‌গণ "জীবনী শক্তি" নামে একটা কল্পনাতীত ব্যাপারের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া জৈবক্রিয়ামাত্রেরই ব্যাখ্যা দিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এই "জীবনী শক্তিটা" (Vitalism) যে কি, জিজ্ঞাসা করিলে দেহবিদ্‌গণ নিরুত্তর থাকিতেন। কোন্ পথে চলিলে পণ্ডিতগণের মনোরাজ্যের অধিবাসী সেই জীবনী শক্তির বাস্তবিক সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে, অধ্যাপক বসুর নবাবিষ্কার তাহা স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়া দিবে বলিয়া আশা হইতেছে। যদি জীবনরহস্যের মীমাংসা কখনও সম্ভবপর হয়, তবে অধ্যাপক বসুর আবিষ্কারদ্বারাই তাহার সমাধান হইবে। রহস্যময় জীবরাজ্যের মহাসিংহদ্বারের চাবি উদ্ভিদ ও তুচ্ছ ধাতুতে আবদ্ধ আছে। প্রাণীর জীবন ক্রিয়ার শতজটিলতার মধ্যে তাহার কোনই সন্ধান পাওয়া যাইবে না।

প্রাণী ও ধাতুর পরস্পর সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া আচার্য্যপ্রবর ইতিপূর্ব্বে যে প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক সমস্যার রচনা করিয়াছেন, তাহার মীমাংসা না হইতেই, তাঁহার আর-এক নূতন আবিষ্কার জগৎকে বিস্মিত করিয়া তুলিতেছে। অধ্যাপক বসুর এই সকল আবিষ্কার আধুনিক জীব ও জড় বিজ্ঞানে একটা প্রকাণ্ড বিপ্লব উপস্থিত করিবে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

মন্দ্র।

মন্দ্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নূতন প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থখানিকে আমরা সাহিত্যের আসরে সাদর অভিবাদনের সঙ্গে আহ্বান করিয়া আনিব—ইহাকে আমরা মুহূর্ত্তমাত্র দ্বারের কাছে দাঁড় করাইয়া রাখিতে পারিব না।

গ্রন্থসমালোচনা সম্পাদকদের কর্ত্তব্য বলিয়াই গণ্য। অনেকেই অতিমাত্র আগ্রহের সঙ্গেই এ কর্ত্তব্য পালন করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু আমাদের এ সম্বন্ধে ব্যগ্রতার যথেষ্ট অভাব আছে, সে কথা স্বীকার করি।

মন্দ্র কাব্যখানিকে অবলম্বন করিয়া আমরা অকস্মাৎ কর্ত্তব্য পালন করিতে আসি নাই। গ্রন্থপাঠ করিয়া যে আনন্দ পাইয়াছি, তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য আমাদের এই উদ্যম।

বড় ভাল লাগিল, এ কথাটি যতই অকৃত্রিম হউক্, কথাটা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এতটুকু কথা লইয়া সম্পাদকী করা চলে না—তাই ঐ কথাটাকে বড় করিয়া তুলিয়া কিছু স্থান জুড়িতে হইবে—নহিলে পদমর্য্যাদারক্ষা হয় না।

যদি ইচ্ছামত চলিবার স্বাধীনতা থাকিত, তবে কবির রচনা হইতে অনর্গল উদ্ধৃত করিয়া মাঝে মাঝে কেবল "বাহবা" বসাইয়া দিতাম—তাহাতে আমাদের কোন ক্ষমতা-প্রকাশ হইত কি না, জানি না; কিন্তু ভাবপ্রকাশ হইত।

মন্দ্র কাব্যখানি বাংলার কাব্য-সাহিত্যকে অপরূপ বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। ইহা নূতনতায় ঝল্‌মল্ করিতেছে এবং এই কাব্যে যে ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অবলীলাকৃত ও তাহার মধ্যে সর্ব্বত্রই প্রবল আত্মবিশ্বাসের একটি অবাধ সাহস বিরাজ করিতেছে।

সে সাহস কি শব্দনির্ব্বাচনে, কি ছন্দোরচনায়, কি ভাববিন্যাসে সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ। সে সাহস আমাদিগকে বারংবার চকিত

করিয়া তুলিয়াছে—আমাদের মনকে শেষ পর্য্যন্ত তরঙ্গিত করিয়া রাখিয়াছে।

কাব্যে যে নয় রস আছে, অনেক কবিই সেই ঈর্ষান্বিত নয় রসকে নয় মহলে পৃথক্ করিয়া রাখেন,—দ্বিজেন্দ্রলালবাবু অকুতোভয়ে এক মহলেই একত্রে তাহাদের উৎসব জমাইতে বসিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে হাস্য, করুণা, মাধুর্য্য, বিস্ময়, কখন্ কে কাহার গায়ে আসিয়া পড়িতেছে, তাহার ঠিকানা নাই।

এইরূপে মন্দ্রকাব্যের প্রায় প্রত্যেক কবিতা নব নব গতিভঙ্গে যেন নৃত্য করিতেছে, কেহ স্থির হইয়া নাই;—ভাবের অভাবনীয় আবর্ত্তনে তাহার ছন্দ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে এবং তাহার অলঙ্কারগুলি হইতে আলোক ঠিকরিয়া পড়িতেছে।

কিন্তু নর্ত্তনশীলা নটীর সঙ্গে তুলনা করিলে মন্দ্রকাব্যের কবিতাগুলির ঠিক বর্ণনা হয় না। কারণ ইহার কবিতাগুলির মধ্যে পৌরুষ আছে। ইহার হাস্য, বিষাদ, বিদ্রূপ, বিস্ময়, সমস্তই পুরুষের—তাহাতে চেষ্টাহীন সৌন্দর্য্যের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক সবলতা আছে। তাহাতে হাবভাব ও সাজসজ্জার প্রতি কোন নজর নাই।

বরং উপমা দিতে হইলে শ্রাবণের পূর্ণিমারাত্রির কথা পাড়া যাইতে পারে। আলোক এবং অন্ধকার, গতি এবং স্তব্ধতা, মাধুর্য্য ও বিরাটভাব আকাশ জুড়িয়া অনায়াসে মিলিত হইয়াছে। আবার মাঝে মাঝে এক-এক-পস্‌লা বৃষ্টিও বাতাসকে আর্দ্র করিয়া ঝরঝরশব্দে ঝরিয়া পড়ে। মেঘেরও বিচিত্র ভঙ্গী;—তাহা কখনো চাঁদকে অর্দ্ধেক ঢাকিতেছে, কখন পুরা ঢাকিতেছে, কখনো বা হঠাৎ একেবারে মুক্ত করিয়া দিতেছে—কখনো বা ঘোরঘটায় বিদ্যুতে স্ফুরিত ও গর্জ্জনে স্তনিত হইয়া উঠিতেছে।

দ্বিজেন্দ্রলালবাবু বাংলাভাষার একটা নূতন শক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রতিভাসম্পন্ন লেখকের সেই কাজ। ভাষাবিশেষের মধ্যে যে কতটা ক্ষমতা আছে, তাহা তাঁহারাই দেখাইয়া দেন—পূর্ব্বে যাহার অস্তিত্ব কেহ সন্দেহ করে নাই, তাহাই তাঁহারা প্রমাণ করিয়া দেন। দ্বিজেন্দ্রলালবাবু বাংলা কাব্যভাষার একটি বিশেষ শক্তি দেখাইয়া দিলেন। তাহা ইহার গতিশক্তি। ইহা যে কেমন দ্রুতবেগে, কেমন অনায়াসে ভাষা হইতে ভাষান্তরে, ভাব হইতে ভাবান্তরে চলিতে পারে, ইহার গতি যে কেবলমাত্র মৃদুমন্থর আবেশভাবাক্রান্ত নহে, তাহা কবি দেখাইয়াছেন।

ছন্দসম্বন্ধেও যেন স্পর্দ্ধাভরে কবি যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার "আশীর্ব্বাদ" ও "উদ্বোধন" কবিতায় ছন্দকে একেবারে ভাঙিয়া-চুরিয়া উড়াইয়া দিয়া ছন্দোরচনা করা হইয়াছে। তিনি যেন সাংঘাতিক সঙ্কটের পাশ দিয়া গেছেন—কোথাও যে কিছু বিপদ্ ঘটে নাই, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এই দুঃসাহস কোন ক্ষমতাহীন কবিকে আদৌ শোভা পাইত না।

এইবার নমুনা উদ্ধৃত করিবার সময় আসিয়াছে। কিন্তু আমরা ফুল ছিঁড়িয়া বাগানের শোভা দেখাইবার আশা করি না। পাঠকগণ কাব্য পড়িবেন—কেবল সমালোচনা চাখিয়া ভোজের পূর্ণসুখ নষ্ট করিবেন না।

শেষ করিবার পূর্ব্বে "কুসুমে কণ্টক" কবিতাটি সম্বন্ধে আমরা আপত্তি জানাইয়া রাখিতে চাই। ইহা বিশুদ্ধ কণ্টকমাত্র, ইহার মধ্য হইতে সুকোমল-সুন্দর কুসুমটিকে কই দেখা যাইতেছে! কবির নিকট হইতে আমরা এরূপ সৌন্দর্য্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এরূপ নিষ্ঠুরতা প্রত্যাশা করি নাই।

"রাধার প্রতি কৃষ্ণ" কবিতাটি এ গ্রন্থে স্থান পাইবার যোগ্য হয় নাই।

আলোচনা।

রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম্মনীতি।

এলাহাবাদে সোমেশ্বর দাসের কারাবরোধের কথা সকলেই জানেন। কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অবিচার মাসিকপত্রের আলোচ্য বিষয় নহে। কিন্তু বর্ত্তমান ব্যাপারটি ব্যক্তিবিশেষকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত ভারতবাসীর প্রতি লক্ষ্য নিবেশ করিয়াছে। সেইজন্য এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে গুটিকয়েক কথা বলিতে হইতেছে।

পায়োনিয়র লিখিতেছেন, ভারতবর্ষে নানাজাতীয় লোক একত্রে বাস করে। ইহাদের মধ্যে শান্তিরক্ষা করিয়া চলা ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের একটি দুরূহ কর্ত্তব্য। সুতরাং যে ঘটনায় ভিন্নজাতির মধ্যে সংঘর্ষ বাধিবার সম্ভাবনা হয়, সেটার প্রতি বিশেষ কঠিন বিধানের প্রয়োজন ঘটে। সে হিসাবে সোমেশ্বর দাসের কারাদণ্ডকে গুরুদণ্ড বলা যায় না।

সুযোগ্য ইংরেজি সাপ্তাহিক "নিয়ু ইণ্ডিয়া" পত্রে পায়োনিয়রের এই সকল যুক্তির অযথার্থতা ভালরূপেই দেখান হইয়াছে। ইংরেজের যে সকল ব্যবহারে ভারতবাসীর মনে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, ইংরেজ বিচারক তাহাকে যে কত লঘুভাবে দেখিয়া থাকে, তাহার শতশত প্রমাণ প্রত্যহ দেখিতে পাই। এই সেদিন একজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণকে কোন ইংরেজ পাদুকা বহন করাইয়াছিল—দেশের উচ্চতম আদালতে পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গেছে, ব্যাপারটা অত্যন্ত তুচ্ছ। তুচ্ছ হইতে পারে, কিন্তু পায়োনিয়রের যুক্তি অনুসারে তুচ্ছ নহে। ভদ্র ব্রাহ্মণের এরূপ নিষ্ঠুর অপমান ভারতবাসীর কাছে অত্যন্ত গুরুতর।

তাহা হইলে কথাটা কি দাঁড়াইতেছে, বুঝিয়া দেখা যাক্। যে সকল জাতি law-abiding অর্থাৎ বিনা বিদ্রোহে আইন মানিয়া চলে, তাহাদেরই অপমান আদালতের কাছে তুচ্ছ। যাহারা কিছুতেই শান্তিভঙ্গ করিবে না, তাহাদিগকে অন্যায় আঘাত করাও অল্প অপরাধ। আর, যাহারা অসহিষ্ণু, যাহারা নিজের আইন নিজে চালাইয়া বসে, সঙ্গত কারণেও তাহাদের গায়ে হাত দিবার উপক্রমমাত্র অপরাধ। ব্রিটিশরাজ্যে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খাওয়াইবার উপায়

বাঘকে দমন করিয়া নহে, গোরুটারই শিং ভাঙিয়া।

কিন্তু পায়োনিয়রের এ কথাটা লইয়া রাগ করিতে পারি না। পায়োনিয়র বন্ধুভাবে আমাদিগকে একটা শিক্ষা দিয়াছেন। বস্তুতই বারুদে আগুন দেওয়া বড়-বড় অপরাধ, ভিজা তুলায় আগুন দেওয়া তত বড় অপরাধ নহে। যাহারা চিরসহিষ্ণু, তাহাদের অপমানকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। অতএব আঘাত-অপমান-সম্বন্ধে আমরা আইন বাঁচাইব, কিন্তু আইন আমাদিগকে বাঁচাইবে না। Mild Hinduদের প্রতি পায়োনিয়রের ইহাই নিগূঢ় বক্তব্য।

আর একটা কথা। বিচারের নিক্তিতে সক্ষম-অক্ষম এবং কালো-শাদায় ওজনের কমবেশি নাই। কিন্তু পোলিটিকাল্ প্রয়োজন বলিয়া একটা ভারী জিনিষ আছে, সেটা যেদিকে ভর করে, সেদিকে নিক্তি হেলে। এ দেশে ইংরেজের প্রতি দেশী লোকের অদ্ধ সম্ভ্রম একটা পোলিটিকাল্ প্রয়োজন, অতএব সেরূপ স্থলে সূক্ষ্মবিচার অসম্ভব। ন্যায়বিচারের মতে এ কথা ঠিক বটে যে, ইংরেজের প্রতি দেশী লোক যে ব্যবহার করিয়া যে দণ্ড পায়, দেশী লোকের প্রতিও ইংরেজ সেই ব্যবহার করিয়া সেই দণ্ডই পাইবে। আইনের বহিতেও এসম্বন্ধে কোন বিশেষ বিধি নাই। কিন্তু পোলিটিকাল্ প্রয়োজন ন্যায়বিচারের চেয়েও নিজেকে বড় বলিয়া জানে।

এ কথা ঠিক বটে, পাশ্চাত্য সভ্যতার আধুনিক ধর্ম্মশাস্ত্রে পলিটিক্স সর্ব্বোচ্চে, ধর্ম্ম তাহার নীচে। যেখানে পোলিটিকাল্ প্রয়োজন আসন ছাড়িয়া দিবে, সেইখানেই ধর্ম্ম বসিবার স্থান পাইবে। পোলিটিকাল্ প্রয়োজনে সত্য কিরূপ বিকৃত হইয়া থাকে, অন্য প্রবন্ধে হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করা গেছে। পোলিটিকাল্ প্রয়োজনে ন্যায়বিচারকেও বিকার-প্রাপ্ত হইতে হয়, পায়োনিয়র তাহা এক-প্রকারে স্বীকার করিয়াছেন। জজ বাকিট্ সোমেশ্বরের ব্যবহারকে audacity অর্থাৎ দুঃসাহস বলিয়াছেন। স্বত্বরক্ষার উপলক্ষ্যে ইংরাজকে বাধা দেওয়া যে দুঃসাহস, বিচারকই তাহা দেখাইয়াছেন, এবং এই সাহসিকতার অপরাধে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে কারাদণ্ড দিয়া বিচারক যে মানসিক গুণের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাকে আমরা কোনমতেই সাহসের কোটায় ফেলিতে পারি না। বস্তুত তিনি অবান্তর কারণে সোমেশ্বরের প্রতি অপক্ষপাত ন্যায্য বিচার করিতে সাহসই করেন নাই। এস্থলে দণ্ডিত ব্যক্তি যদি audacious হয়, তবে দণ্ডদাতার প্রতি ইংরাজি কোন্ বিশেষণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে!

কিন্তু এইরূপ বিচারের ফলাফলকে আমরা তুচ্ছ বলিয়া সাপ্তাহিক পত্রের এক প্যারাগ্রাফের মধ্যে তাহার সমাধি দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। আমরা প্রতিদিন নানা দৃষ্টান্তের দ্বারা শিখিতেছি যে, পোলিটিকাল্ প্রয়োজনের যে বিধান, তাহা ন্যায়ের বিধান সত্যের বিধানের সঙ্গে ঠিক মেলে না।

ইহাতে আমাদের শিক্ষাদাতাদের ইষ্ট বা অনিষ্ট কি হইতেছে, তাহা লইয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবার প্রয়োজন দেখি না। ভয়ের কারণ

এই যে, আমাদের মন হইতে ধ্রুব ধর্ম্মে বিশ্বাস শিথিল, সত্যের আদর্শ বিকৃত হইয়া যাইতেছে। আমরাও প্রয়োজনকে সকলের উচ্চে স্থান দিতে উদ্যত হইয়াছি। আমরাও বুঝিতেছি, পোলিটিকাল্ উদ্দেশ্যসাধনে ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে দ্বিধা অনুভব করা অনাবশ্যক। অপমানের দ্বারা যে শিক্ষা অস্থিমজ্জার মধ্যে প্রবেশ করে, সে শিক্ষার হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিব কি করিয়া? ধর্ম্মকে যদি অকর্ম্মণ্য বলিয়া ঠেলিয়া রাখিতে আরম্ভ করি, তবে কিসের উপর নির্ভর করিব? বিলাতী সভ্যতার আদর্শের উপর? বিশ্বজগতের মধ্যে এই সভ্যতাটাই কি সর্ব্বাপেক্ষা স্থায়ী? দুর্ভাগ্যক্রমে, যে জিনিষটা প্রত্যক্ষভাবে আমাদের বুকের উপরে চাপিয়া বসে, সেটা আমাদের পক্ষে পৃথিবীর সব চেয়ে ভারী—আমাদের পক্ষে হিমালয়পর্ব্বতও তাহার চেয়ে লঘু। সেই হিসাবে বিলাতি সভ্যতার নীতিই আমাদের পক্ষে সব চেয়ে গৌরবান্বিত—তাহার কাছে ধর্ম্মনীতি লাগে না।

অতএব ইচ্ছা করি আর না করি বিলাত আমাদিগকে ঠেসিয়া-ধরিয়া যে সকল শিক্ষা দিতেছে, তাহা গলাধঃকরণ করিতেই হইবে। আমরা ক্লাইভকে, হেষ্টিংস্‌কে, ড্যাল্‌হৌসিকে আদর্শ নরোত্তম বলিয়াই স্বীকার করিব,—ইংরেজের সহিত ন্যায্য-অন্যায্য সর্ব্বপ্রকার সংঘাত-সংঘর্ষ-স্থলে আমরা ন্যায়বিচারের প্রত্যাশাই করিব না,—যেখানে ভারতশাসনের প্রয়োজনবশত প্রেষ্টিজের দোহাই পড়িবে সেখানে বিশ্ববিধাতার দোহাই মানিব না—ইহাই ঘাড় পাতিয়া লইলাম,—কিন্তু এই গুরুই যখন শিবাজির রাষ্ট্রনীতিকে অধর্ম্ম বলিয়া আমাদের নিকট নীতিপ্রচার করিতে আসিবেন, তখন আমরা কি করিব? তখনো কি ইহাই বুঝিব যে, ধর্ম্মনীতিশাস্ত্রও বর্ত্তমান ক্ষমতাশালীকেই ভয় করিয়া নিজের রায় লিখিয়া থাকেন, অতএব ধিক্ শিবাজি!

দ্বিধা।

তোমারে ফিরায়ে যদি দেন আরবার
দেবতারে দিতে পারি সর্ব্বস্ব আমার।
তুমি যে সর্ব্বস্ব মোর, তাই বড় ভয়
শপথ রাখিতে শক্তি হয় কি না হয়!

প্রশ্ন।

দ্রাবিড় সভ্যতা।

ইংরাজী ১৮৫৬ সালের এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় "সংস্কৃত ভাষার বিস্তৃতি" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত এ. কার্জ্জন সাহেব লিখিতেছেন—"তামুলীদিগের এমন কোনো ইতিহাস নাই, যাহা দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, তাহারা আর্য্য হিন্দু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাহাদের ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, নীতি ইত্যাদি বিষয়ে তাহারা যে আর্য্য হিন্দুগণের নিকট ঋণী নহে, এমন কোনো ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা আপনাদিগকে হিন্দু নহে বলিয়া কুত্রাপি পরিচিত করে নাই।.....এমন হইতে পারে যে, একসময়ে স্বতন্ত্রজাতিরূপে তাহাদের অভ্যুদয় হইয়াছিল—তাহারা দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব-স্থাপন করিয়াছিল—সমাজগঠনও করিয়াছিল—সেই সময়ে আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যগণ পূর্ণশক্তিতে বিরাজমান।... কিন্তু তাহারা আর্য্যাবর্ত্ত আর্য্যাধিকারে আসিবার পূর্ব্বে তথায় অধিকারলাভ করিয়াছিল, এমন কথা প্রমাণ করিবার কোন ইতিহাস নাই।"

Ragozinসাহেবের কৃত "Vedic India" নামক গ্রন্থ দেখিতে পাই যে, উত্তর ভারতের আর্য্যগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে শিল্পবিদ্যা প্রভৃতিতে পারদর্শিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তামুলীগণসম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন—"আর্য্য হিন্দুগণের প্রতিদ্বন্দ্বী দ্রাবিড়ীগণ দাক্ষিণাত্যে বাণিজ্য করিত।"

Ragozinসাহেব দ্রাবিড়ীগণকে আর্য্যগণের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন—কিন্তু কার্জ্জন সাহেব বহুপূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন—"তাহারা আপনাদিগকে অহিন্দু বলিয়া কুত্রাপি পরিচিত করে নাই।"

তামুলীদিগের ভাষাসম্বন্ধেও কার্জ্জন লিখিয়া গিয়াছেন—"তামুলীভাষার প্রত্যেক গ্রন্থে—কি ব্যাকরণ, কি ব্যবহার, কি ভৈষজ কি ধর্ম্মগ্রন্থ, কি কাব্য—সকল গ্রন্থেই দেখা যায় যে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক হিন্দুত্বের চিহ্ন তাহাদের মধ্যে স্পষ্ট পরিস্ফুট আছে।

দুইজন পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদের মত উপরে উদ্ধৃত হইল। কার্জ্জনসাহেবের মত প্রকাশিত হওয়ার পরে বহুবর্ষ অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ আলোচ্য বিষয়ে বহু অনুসন্ধান করিয়াছেন, এমন আশা করা যায়।

দ্রাবিড়ীগণ যে একটি স্বতন্ত্র জাতি, ইহাই অধুনাতন প্রচলিত মত। তাহাদের সভ্যতা, ধর্ম্ম ও রীতি-নীতি প্রভৃতির জন্য তাহারা কাহারও নিকট ঋণী নহে। যে সকল প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এই মতের সমর্থন করেন, তাঁহারা কি কি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াছেন, তাহা আমি জানিতে উৎসুক রহিয়াছি।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

সঙ্গীত-মুকুল। নীতিবিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। চতুর্থ সংস্করণ। মূল্য ৴১০ দেড় আনা।

এই পুস্তকখানি দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। ইহাতে যে সকল গান আছে, তাহা সুভাবান্বিত এবং অতি সরল ভাষায় রচিত। 'প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে' লিখিত আছে—"ব্রাহ্ম বালকবালিকাদিগের নিমিত্ত এই সঙ্গীতপুস্তকখানি প্রচারিত হইল।" শুধু ব্রাহ্ম কেন, সকল সম্প্রদায়ের শিশুদিগের পক্ষেই ইহা উপযোগী হইয়াছে। পুস্তকের শেষদিকে যে 'খেলা'গুলি আছে, তাহার কয়েকটি আমাদের খুবই ভাল লাগিয়াছে। ইহার যখন চতুর্থ সংস্করণ হইয়াছে, তখন ইহা যে আদৃত হইয়াছে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বঙ্গদর্শন।

মুক্তপাখীর প্রতি।

আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে, ওগো,
দিক্‌দিগন্ত ঢাকি'!—
আজিকে আমরা কাঁদিয়া শুধাই সঘনে, ওগো,
আমরা খাঁচার পাখী,—
হৃদয়বন্ধু, শুনগো বন্ধু মোর,
আজি কি আসিল প্রলয়রাত্রি ঘোর?
চিরদিবসের আলোক গেল কি মুছিয়া?
চিরদিবসের আশ্বাস গেল ঘুচিয়া?
দেবতার কৃপা আকাশের তলে
কোথা কিছু নাই বাকি?—
তোমাপানে চাই, কাঁদিয়া শুধাই
আমরা খাঁচার পাখী!

ফাল্গুন এলে সহসা দখিন পবন হ'তে
মাঝে মাঝে রহি' রহি'
আসিত সুবাস সুদূর কুঞ্জভবন হ'তে
অপূর্ব্ব আশা বহি'।
হৃদয়বন্ধু, শুনগো বন্ধু মোর
মাঝে মাঝে যবে রজনী হইত ভোর,
কি মায়ামন্ত্রে বন্ধনদুখ নাশিয়া
খাঁচার কোণেতে প্রভাতু পশিত হাসিয়া

ঘনমসী-আঁকা লোহার শলাকা,
সোনার সুধায় মাখি'!
নিখিল বিশ্ব পাইতাম প্রাণে
আমরা খাঁচার পাখী।

আজি দেখ ওই পূর্ব্ব অচলে চাহিয়া, হোথা
কিছুই না যায় দেখা,—
আজি কোনো দিকে তিমিরপ্রান্ত দাহিয়া হোথা
পড়েনি সোনার রেখা!
হৃদয়বন্ধু, শুনগো বন্ধু মোর,
আজি শৃঙ্খল বাজে অতি সুকঠোর!
আজি পিঞ্জর ভুলাবারে কিছু নাহিরে,
কার সন্ধান করি অন্তরে-বাহিরে!
মরীচিকা লয়ে জুড়াব নয়ন
আপনারে দিব ফাঁকি
সে আলোটুকুও হারায়েছি আজি
আমরা খাঁচার পাখী!

ওগো আমাদের এই ভয়াতুর বেদনা যেন
তোমারে না দেয় ব্যথা!
পিঞ্জরদ্বারে বসিয়া তুমিও কেঁদ না যেন
লয়ে বৃথা আকুলতা!
হৃদয়বন্ধু, শুনগো বন্ধু মোর,
তোমার চরণে নাহি ত লৌহডোর!
সকল মেঘের ঊর্দ্ধে যাওগো উড়িয়া,
সেথা ঢাল তান বিমল শূন্য জুড়িয়া,—
"নেবে নি, নেবে নি প্রভাতের রবি"
কহ আমাদের ডাকি'
মুদিয়া নয়ান শুনি সেই গান
আমরা খাঁচার পাখী!

পরনিন্দা।

পরনিন্দা পৃথিবীতে এত প্রাচীন এবং এত ব্যাপক যে, সহসা ইহার বিরুদ্ধে একটা যে-সে মত প্রকাশ করা ধৃষ্টতা হইয়া পড়ে। বয়স বিবেচনা করিয়া ইহার প্রতি কতকটা সম্মান এবং শ্রদ্ধা রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

সাধুলোকেরা ইহাকে পৃথিবী হইতে নির্ব্বাসন করিবার প্রস্তাব করিয়া থাকেন। যদি ইঁহাদের সে ক্ষমতা থাকিত, তবে, রামের পশ্চাতে লক্ষ্মণও যেমন বনে গিয়াছিলেন, পৃথিবীও তেমনি নির্ব্বাসিতার পশ্চাতে নির্ব্বাসন গ্রহণ করিতে উদ্যত হইত।

আমরা সাধুই হই আর অসাধুই হই, বিশ্ববিধানের প্রতি আমাদের কতকটা বিশ্বাস থাকা উচিত। যে পরনিন্দার চর্চ্চা সমস্ত মানবসমাজকে আগুস্তমধ্যে জুড়িয়া বসিয়া আছে, তাহাকে একেবারেই মন্দ বলিয়া শুদ্ধ অত্যন্ত সন্দিগ্ধপ্রকৃতির কাজ। আমরা ছোট, এবং আজ আছি কাল নাই, যাহা আমার চেয়ে অনেক বৃহৎ এবং অনেকদিন টিকিয়া আছে, তাহার প্রতি একটা অন্ধবিশ্বাস রাখাও আমি দোষের বিবেচনা করি না।

নোনা জল পানের পক্ষে উপযোগী নহে, এ কথা শিশুও জানে—কিন্তু যখন দেখি, সাত সমুদ্রের জল নুনে পরিপূর্ণ; যখন দেখি, এই নোনা জল সমস্ত পৃথিবীকে বেড়িয়া আছে, তখন এ কথা বলিতে কোনমতেই সাহস হয় না যে, সমুদ্রের জলে নুন না থাকিলেই ভাল হইত। নিশ্চয়ই ভাল হইত না—হয় ত লবণজলের অভাবে সমস্ত পৃথিবী পচিয়া উঠিত।

তেমনি, পরনিন্দা সমাজের কণায় কণায় যদি মিশিয়া না থাকিত, তবে নিশ্চয়ই একটা বড়রকমের অনর্থ ঘটিত। উহা লবণের মত সমস্ত সংসারকে বিকার হইতে রক্ষা করিতেছে। সংসারে আবর্জ্জনার অবধি নাই, সে সমস্ত পচিয়া প্রেমসমুদ্রকে বীভৎস করিয়া তুলিত—সমুদ্রের সর্ব্বত্র বিদ্বেষ এবং নিন্দার ক্ষার মিশিয়া আছে বলিয়াই নিস্তার! মানুষের রচিত ম্যুনিসিপালিটির ক্ষুদ্র ব্যবস্থায় সংসারের শোধনকার্য্য অতি অল্পপরিমাণেই চলে;—পুলিশ ও আইন বাহিরের জিনিষ, তাহা টোট্‌কা ওষুধের মত—পরনিন্দা সমাজের রক্তের সঙ্গে মিশিয়া অহরহ তাহাকে স্বাস্থ্যের পথে টানিয়া রাখিয়াছে।

পাঠক বলিবেন, "বুঝিয়াছি। তুমি যাহা বলিতে চাও, তাহা অত্যন্ত পুরাতন। অর্থাৎ নিন্দার ভয়ে সমাজ প্রকৃতিস্থ হইয়া আছে।"

এ কথা যদি পুরাতন হয়, তবে আনন্দের বিষয়। আমি ত বলিয়াছি, যাহা পুরাতন, তাহা বিশ্বাসের যোগ্য।

বস্তুত নিন্দা না থাকিলে পৃথিবীতে জীব-

নের গৌরব কি থাকিত? একটা ভাল কাজে হাত দিলাম, তাহার নিন্দা কেহ করে না—সে ভাল কাজের দাম কি! একটা ভাল কবিতা লিখিলাম, তাহার নিন্দুক সমালোচক কেহ নাই, ভাল কাব্যের পক্ষে এমন মর্ম্মান্তিক অনাদর কি হইতে পারে! জীবনকে ধর্ম্মচর্চ্চায় উৎসর্গ করিলাম, যদি কোন লোক তাহার মধ্যে গূঢ় মন্দ অভিপ্রায় না দেখিল, তবে সাধুতা যে নিতান্তই সহজ হইয়া পড়িল!

সকল কাজে সকল চেষ্টায় বিশ্বসুদ্ধ লোকের কাছে সমানভাবে যে লোক বাহবা লইয়া গেছে, নিশ্চয় সে ফাঁকি দিয়াছে। নিশ্চয় সে কাজের চেয়ে লোকের স্তুতিকে বেশি করিয়া চাহিয়াছে। মহত্ত্বকে পদে পদে নিন্দার কাঁটা মাড়াইয়া চলিতে হয়, ইহাতে তাহার পদে পদে পরীক্ষা হইয়া থাকে। ইহাতে যে হার মানে, ইহাতে যুদ্ধক্ষেত্রে যাহার পতন হয়, বীরের সদ্গতি সে লাভ করে না। পৃথিবীতে নিন্দা দোষীকে সংশোধন করিবার জন্য আছে তাহা নহে, মহত্ত্বকে গৌরব দেওয়া তাহার একটা মস্ত কাজ!

নিন্দা-বিরোধগায়ে বাজে না, এমন কথা অল্প লোকই বলিতে পারে। কোন সহৃদয় লোক ত বলিতে পারে না। যাহার হৃদয় বেশি, তাহার ব্যথা পাইবার শক্তিও বেশি। যাহার হৃদয় আছে, সংসারে সেই লোকই কাজের মত কাজে হাত দেয়। আবার লোকের মত লোক এবং কাজের মত কাজ দেখিলেই নিন্দার ধার চারগুণ শাণিত হইয়া উঠে। ইহাতেই দেখা যায়, বিধাতা যেখানে অধিকার বেশি দিয়াছেন, সেইখানেই দুঃখ এবং পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন করিয়াছেন। বিধাতার সেই বিধানই জয়ী হউক্! নিন্দা, দুঃখ, বিরোধ যেন ভাল লোকের, গুণী লোকের, যোগ্য লোকের ভাগ্যেই বেশি করিয়া জোটে। যে যথার্থরূপে ব্যথা ভোগ করিতে জানে, সেই যেন ব্যথা পায়! অযোগ্য ক্ষুদ্র ব্যক্তির উপরে যেন নিন্দা-বেদনার অনাবশ্যক অপব্যয় না হয়!

সরলহৃদয় পাঠক পুনশ্চ বলিবেন—"জানি, নিন্দায় উপকার আছে। যে লোক দোষ করে, তাহার দোষকে ঘোষণা করা ভাল; কিন্তু যে করে না, তাহার নিন্দায় সংসারে ভাল হইতেই পারে না। মিথ্যা-জিনিষটা কোন অবস্থাতেই ভাল নয়।"

এ হইলে ত নিন্দা টিকে না। প্রমাণ লইয়া দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করা, সে ত হইল বিচার। সে গুরুভার কয়জন লইতে পারে, এবং এত সময়ই বা কাহার হাতে আছে? তাহা ছাড়া পরের সম্বন্ধে এত অতিরিক্ত মাত্রায় গরজ কাহারো নাই। যদি থাকিত, তবে পরের পক্ষে তাহা একেবারেই অসহ্য হইত। নিন্দুককে সহ্য করা যায়, কারণ, তাহার নিন্দুকতাকে নিন্দা করিবার সুখ আমারো হাতে আছে, কিন্তু বিচারককে সহ্য করিবে কে?

বস্তুত আমরা অতি সামান্য প্রমাণেই নিন্দা করিয়া থাকি, নিন্দার সেই লাঘবতাটুকু না থাকিলে সমাজের হাড় গুঁড়া হইয়া যাইত। নিন্দার রায় চূড়ান্ত রায় নহে—নিন্দিত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে তাহার প্রতিবাদ না করিতেও পারে। এমন কি, নিন্দাবাক্য

হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়াই সুবুদ্ধি বলিয়া গণ্য। কিন্তু নিন্দা যদি বিচারকের রায় হইত, তবে সুবুদ্ধিকে উকীল-মোক্তারের শরণ লইতে হইত। যাঁহারা জানেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন, উকীল-মোক্তারের সহিত কারবার হাসির কথা নহে। অতএব দেখা যাইতেছে, সংসারের প্রয়োজনহিসাবে নিন্দার যতটুকু গুরুত্ব আবশ্যক তাহাও আছে, যতটুকু লঘুত্ব থাকা উচিত তাহারো অভাব নাই।

পূর্ব্বে যে পাঠকটি আমার কথায় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন—"তুচ্ছ অনুমানের উপরেই হউক বা নিশ্চিত প্রমাণের উপরেই হউক্, নিন্দা যদি করিতেই হয় তবে ব্যথার সহিত করা উচিত—নিন্দায় সুখ পাওয়া উচিত নহে।"

এমন কথা যিনি বলিবেন, তিনি নিশ্চয়ই সহৃদয় ব্যক্তি। সুতরাং তাঁহার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত—নিন্দায় নিন্দিত ব্যক্তি ব্যথা পায়, আবার নিন্দুকও যদি বেদনা বোধ করে, তবে সংসারে দুঃখবেদনার পরিমাণ কিরূপ অপরিমিতরূপে বাড়িয়া উঠে! তাহা হইলে নির্ম্মত্সরসভা নিস্তব্ধ, বন্ধুসভা বিষাদে ম্রিয়মাণ, সমালোচকের চক্ষু অশ্রুপ্লুত এবং তাঁহার পাঠকগণের হৃদ্‌গহ্বর হইতে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ঘনঘন উচ্ছ্বসিত। আশা করি, শনিগ্রহের অধিবাসীদেরও এমন দশা নয়!

তা ছাড়া সুখও পাইব না অথচ নিন্দাও করিব, এমন ভয়ঙ্কর নিন্দুক মনুষ্যজাতিও নহে। মানুষকে বিধাতা এতই সৌখীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, যখন সে নিজের পেট ভরাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে যাইতেছে, তখনও ক্ষুধানিবৃত্তি ও রুচিপরিতৃপ্তির যে সুখ, সেটুকুও তাহার চাই—সেই মানুষ ট্রামভাড়া করিয়া বন্ধুর বাড়ী গিয়া পরের নিন্দা করিয়া আসিবে অথচ তাহাতে সুখ পাইবে না, যে ধর্ম্মনীতি এমন অসম্ভব প্রত্যাশা করে তাহা পূজনীয়, কিন্তু পালনীয় নহে।

আবিষ্কারমাত্রেরই মধ্যে সুখের অংশ আছে। শিকার কিছুমাত্র সুখের হইত না, যদি মৃগ যেখানে-সেখানে থাকিত এবং ব্যাধকে দেখিয়া পালাইয়া না যাইত। মৃগের উপরে আমাদের আক্রোশ আছে বলিয়াই যে তাহাকে মারি তাহা নহে, সে বেচারা গহন বনে থাকে এবং সে পলায়নপটু বলিয়া তাহাকে কাজেই মারিতে হয়।

মানুষের চরিত্র, বিশেষত তাহার দোষগুলি, ঝোপঝাপের মধ্যেই থাকে এবং পায়ের শব্দ শুনিলেই দৌড় মারিতে চায়, এইজন্যই নিন্দার এত সুখ। আমি নাড়ীনক্ষত্র জানি, আমার কাছে কিছুই গোপন নাই, নিন্দুকের মুখে এ কথা শুনিলেই বোঝা যায়, সে ব্যক্তি জাতশিকারী। তুমি তোমার যে অংশটা দেখাইতে চাও না, আমি সেইটাকেই তাড়াইয়া ধরিয়াছি। জলের মাছকে আমি ছিপ ফেলিয়া ধরি; আকাশের পাখীকে বাণ মারিয়া পাড়ি, বনের পশুকে জাল পাতিয়া বাঁধি—ইহা কত সুখের! যাহা লুকায় তাহাকে বাহির করা, যাহা পালায় তাহাকে বাঁধা, ইহার জন্যে মানুষ কি না করে!

দুর্লভতার প্রতি মানুষের একটা মোহ আছে। সে মনে করে, যাহা সুলভ তাহা

খাঁটি নহে, যাহা উপরে আছে তাহা আবরণ-মাত্র, যাহা লুকাইয়া আছে তাহাই আসল। এইজন্যই গোপনের পরিচয় পাইলে সে আর-কিছু বিচার না করিয়া প্রকৃতের পরিচয় পাইলাম বলিয়া হঠাৎ খুসি হইয়া উঠে। এ কথা সে মনে করে না যে, উপরের সত্যের চেয়ে নীচের সত্য যে বেশি সত্য তাহা নহে;—এ কথা তাহাকে বোঝানো শক্ত যে, সত্য যদি বাহিরে থাকে তবুও তাহা সত্য, এবং ভিতরে যেটা আছে সেটা যদি সত্য না হয়, তবে তাহা অসত্য। এই মোহবশতই কাব্যের সরল সৌন্দর্য্য অপেক্ষা তাহার গভীর তত্ত্বকে পাঠক অধিক সত্য বলিয়া মনে করিতে ভালবাসে এবং বিজ্ঞ লোকেরা শিশাচর পাপকে আলোক-চর সাধুতার অপেক্ষা বেশি বাস্তব বলিয়া তাহার গুরুত্ব অনুভব করে।

এইজন্যই মানুষের নিন্দা শুনিলেই মনে হয়, তাহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেল। পৃথিবীতে অতি অল্প লোকের সঙ্গেই আমাকে ঘরকন্না করিতে হয়, অথচ এত-শত লোকের প্রকৃত পরিচয় লইয়া আমার লাভটা কি? কিন্তু প্রকৃত পরিচয়ের জন্য ব্যগ্রতা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম—সেটা মনুষ্যত্বের প্রধান অঙ্গ—অতএব তাহার সঙ্গে বিবাদ করা চলে না;—কেবল যখন দুঃখ করিবার দীর্ঘ অবকাশ পাওয়া যায়, তখন এই ভাবি যে, যাহা সুন্দর, যাহা সম্পূর্ণ, যাহা ফুলের মত বাহিরে বিকশিত হইয়া দেখা দেয়, তাহা বাহিরে আসে বলিয়াই বুদ্ধিমান্ মানুষ ঠকিবার ভয়ে তাহাকে বিশ্বাস করিয়া তাহাতে সম্পূর্ণ আনন্দ ভোগ করিতে সাহস করে না। ঠকাই কি সংসারে চরম ঠকা! না-ঠকাই কি চরম লাভ!

কিন্তু এ সকল বিষয়ের ভার আমার উপরে নাই,—মনুষ্যচরিত্র আমি জন্মিবার বহু পূর্ব্বেই তৈরি হইয়া গেছে। কেবল এই কথাটা আমি বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টায় ছিলাম যে, সাধারণত মানুষ নিন্দা করিয়া যে সুখ পায়, তাহা বিদ্বেষের সুখ নহে। বিদ্বেষ কখনই সাধারণভাবে সুখকর হইতে পারে না এবং বিদ্বেষ সমস্ত সমাজের স্তরে স্তরে পরিব্যাপ্ত হইলে সে বিষ হজম করা সমাজের অসাধ্য। আমরা বিস্তর ভাললোক, নিরীহলোককেও নিন্দা করিতে শুনিয়াছি, তাহার কারণ এমন নহে যে, সংসারে ভাললোক, নিরীহলোক নাই; তাহার কারণ এই যে, সাধারণত নিন্দার মূল প্রস্রবণটা মন্দভাব নয়।

কিন্তু বিদ্বেষমূলক নিন্দা সংসারে একেবারে নাই, এ কথা লিখিতে গেলে সত্যযুগের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। তবে সে নিন্দা সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার নাই। কেবল প্রার্থনা এই যে, এরূপ নিন্দা যাহার স্বভাবসিদ্ধ, সেই দুর্ভাগাকে যেন দয়া করিতে পারি!

অমূর্ত্ত ও মূর্ত্ত।

উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আর্য্য ঋষিরা ব্রহ্মের দুইটি বিভাবের সহিত পরিচিত ছিলেন। একটি নির্ব্বিশেষ ভাব, অপরটি সবিশেষ ভাব। এই দুই বিভাবের ভেদ নির্দ্দেশ করিবার জন্য কোথাও নির্ব্বিশেষ বিভাবকে পরব্রহ্ম, কোথাও বা অশব্দব্রহ্ম বলা হইয়াছে; আর সবিশেষ বিভাবকে নির্দ্দেশ করিবার জন্য কোথাও শব্দব্রহ্ম, * আর কোথাও বা অপর-ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে।

[বৃহদারণ্যক ২।৩।১]

ব্রহ্মের দুই রূপ।

দ্বে বাব খল্বেতে ব্রহ্মজ্যোতিষো রূপকে।

[মৈত্রী ৬।৩৬]

ব্রহ্মজ্যোতির দুই রূপ।

এতদ্বৈ সত্যকাম! পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম।

[প্রশ্ন ৫।২]

হে সত্যকাম! এই ব্রহ্ম পর ও অপর।

দ্বে পরব্রহ্মণী অভিধ্যেয়ে শব্দশ্চ অশব্দশ্চ।

[মৈত্রী ৬।২২]

দ্বিবিধ পরব্রহ্ম ধ্যান করা উচিত—শব্দ ও অশব্দ।

ব্রহ্মের যে নির্ব্বিশেষ ভাব, তাহার অর্থ এই যে, সে ভাবের কোন বিশেষণ, লক্ষণ, চিহ্ন বা পরিচয় নির্দ্দেশ করা যায় না। কোন গুণেরই উল্লেখ করা যায় না, যাহার দ্বারা তাঁহার ধারণা করা যায়; কোন উপাধিরই অবতারণা করা যায় না, যদ্দ্বারা তাঁহাকে চিনিয়া লওয়া যায়। সেইজন্য এই নির্ব্বিশেষ ভাবকে নির্গুণ, নির্ব্বিকল্প, নিরুপাধি ইত্যাদি সংজ্ঞা দেওয়া হয়। এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে।

[তৈত্তিরীয় ২।৪।১]

বাক্য যাঁহার কাছে পৌছিতে পারে না।

সেইজন্য তাঁহাকে অনির্দ্দেশ্য, অনিরুক্ত, অবাচ্য ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়—

এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তে।

[তৈত্তিরীয় ২।৭]

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।

[কঠ ৬।১২]

তিনি বাক্যের, মনের, ইন্দ্রিয়ের অতীত।

তিনি বিদিত ও অবিদিত সমস্ত পদার্থ হইতে বিভিন্ন—

অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।

[কেন ১।৩]

তাঁহার উদ্দেশে ইহাও বলা হইয়াছে—

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ।

[কঠ ২।১৪]

তিনি ধর্ম্ম হইতে পৃথক্, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন; কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র, কারণ হইতে ব্যতিরিক্ত; অতীত হইতে বিভিন্ন এবং ভবিষ্যৎ হইতে অন্য।

* শব্দব্রহ্ম = Logos.

যিনি এরূপ অদ্ভুত, তাঁহার সম্বন্ধে পরিচয়স্থলে এইমাত্র বলা যায় যে, 'তিনি ইহা নহেন', 'তিনি ইহা নহেন।' ফলত দেখা যায়, উপনিষদ্ তাহাই করিয়াছেন—

অথাত আদেশো নেতি নেতি।

[বৃহদারণ্যক ২।৩।৬]

তাঁহার উপদেশ এইমাত্র যে, তিনি ইহা নহেন, তিনি ইহা নহেন।

সেইজন্যই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের নির্দ্দেশস্থলে, শ্রুতি "নঞের" এত ছড়াছড়ি করিয়াছেন।

অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্।

[বৃহদারণ্যক ৩।৮।৮]

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্।

[কঠ ৩।১৫]

তদেতদ্ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যম্।

[বৃহদারণ্যক ২।৫।১৯]

তিনি স্থূল নহেন সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন দীর্ঘ নহেন। তাঁহার শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, ক্ষয় নাই। ব্রহ্মের পূর্ব্বে বা পরে, অন্তরে বা বাহিরে অন্য কিছুই নাই।

যত্তদদৃশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্।

[মুণ্ডক ১।৬]

যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ; যাঁহার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, হস্ত নাই, পদ নাই।

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।

[মাণ্ডুক্য ৭]

যাঁহার প্রজ্ঞা বহির্ম্মুখও নহে, অন্তর্ম্মুখও নহে, উভয়মুখও নহে; যিনি প্রজ্ঞানঘন নহেন, প্রজ্ঞ নহেন, অপ্রজ্ঞও নহেন; যিনি দর্শনের অতীত, ব্যবহারের অতীত, গ্রহণের অতীত, লক্ষণের অতীত, চিন্তার অতীত, নির্দ্দেশের অতীত, আত্মপ্রত্যয়মাত্রসিদ্ধ, প্রপঞ্চাতীত (নিরুপাধি), শান্ত, শিব, অদ্বৈত, তাঁহাকে তুরীয় বলে।

তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্" অর্থাৎ তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই।

আত্মৈবেদং সর্ব্বম্।

[ছান্দোগ্য ৭।২৫।২]

আত্মাই এই সমস্ত।

নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

[বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৯]

এখানে ভেদ নাই, সবই এক।

"একমেবাদ্বিতীয়ং" বলাতে ইহাই বুঝায় যে, তিনি সমস্তভেদরহিত। বিজাতীয়, স্বজাতীয় ও স্বগত, এই ত্রিবিধ ভেদ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি নিরুপাধি—অর্থাৎ দেশ, কাল ও নিমিত্ত, এই ত্রিবিধ উপাধির সম্পর্কশূন্য। *

সেইজন্য যোগবাশিষ্ঠ (উৎপত্তি-প্রকরণে) বলিয়াছেন—"দেশ, কাল, নিমিত্ত, যখন তাঁহারই মধ্যে রহিয়াছে, তখন আর দ্বৈতই বা কি, আর অদ্বৈতই বা কি? ব্রহ্ম দ্বৈতও নহেন, অদ্বৈতও নহেন; জাতও নহেন, অজাতও নহেন; সৎও নহেন, অসৎও নহেন; ক্ষুব্ধও নহেন, প্রশান্তও নহেন।" তাঁহাতে সমস্ত দ্বন্দ্বের চিরসমন্বয়, সকল দ্বৈতের একান্ত অবসান।

* The three ultimate categories of time, space and causality. Time=কাল, Space=দেশ এবং Causality=নিমিত্ত, কার্য্যকারণসম্বন্ধ।

সেইজন্য পরব্রহ্মে সমস্ত বিরুদ্ধ লক্ষণের,—সমস্ত বিপরীত ধর্ম্মের আরোপ করা হয়। "তিনি আকাশ, অথচ আকাশ নহেন; তিনি কিছু, অথচ কিছু নহেন। তাঁহার গতি নাই, অথচ তিনি গতিশীল; স্থিতি নাই, অথচ স্থিতিমান্? তিনি চিৎ, অথচ জড়; তিনি সকলই, অথচ কেহ নহেন। তিনি অণু, অথচ মহান্; অন্ধকার অথচ আলোক; নিমেষ অথচ কল্প; সৎ অথচ অসৎ; প্রত্যক্ষ অথচ অপ্রত্যক্ষ; সুদূরে অথচ নিকটে। (যোগবাশিষ্ঠ)।

তাঁহাকে সৎ, চিৎ ও আনন্দও বলা যায় না। কারণ যাঁহাকে এরূপ বিশেষণে বিশেষিত করিতে পারা যায়, তিনি আর অনির্দ্দেশ্য অবাচ্য রহিলেন কিরূপে? আরও বক্তব্য এই যে, যখন পরব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন (নসন্নচাসৎ—শ্বেতাশ্বতর; ৪।১৮); চিৎও নহেন, জড়ও নহেন (চেতনোঽপি পাষাণঃ—যোগবাশিষ্ঠ); সুখও নহেন, দুঃখও নহেন (পরং ব্রহ্ম নিছুঃখমসুখঞ্চ যৎ—মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১৮০।২২), তখন তাঁহাকে কিরূপে সচ্চিদানন্দ বলা যায়?

শ্রুতি আরও বলেন যে, পরব্রহ্ম কেবল অনির্দ্দেশ্য ও অবাচ্য নহেন, তিনি অজ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞানাতীত—ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, কাহারই গোচর নহেন।

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।

[মুণ্ডক ৩।১।৮]

তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যের গ্রাহ্য নহেন, ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, তপস্যা বা কর্ম্মেরও গ্রাহ্য নহেন।

যন্মনসা ন মনুতে।

[কেনোপনিষদ্ ১।৬]

ব্রহ্মকে মনের দ্বারা মনন করা যায় না।

বুদ্ধিও তাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না। বুদ্ধির স্বভাব এই যে, যে বস্তুর ছায়া বুদ্ধিতে পতিত হয়, বুদ্ধি তদাকারে আকারিত হয়। বুদ্ধি সান্ত সগুণ পদার্থ, সে নির্গুণ অনন্ত পরব্রহ্মের আকারে কিরূপে আকারিত হইবে? তা' ছাড়া যাহা সাপেক্ষ, (relative), সম্বন্ধযুক্ত সোপাধিক, তাহাই জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে। পরব্রহ্ম নিরুপাধিক, নিরপেক্ষ (absolute) বস্তু—দেশ, কাল ও নিমিত্ত, সমস্তসম্বন্ধবর্জ্জিত; তিনি কিরূপে জ্ঞানের বিষয় হইবেন? তিনি চিরদিনই অজ্ঞেয় (Unknowable)। সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনো
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ।

[কেন ১।৩]

সেখানে চক্ষু যাইতে পারে না, বাক্য যাইতে পারে না, মন যাইতে পারে না, বুদ্ধি যাইতে পারে না; তাঁহাকে আমরা জানি না; কিরূপে তাঁহাকে উপদেশ দেওয়া যাইবে?

আর এক কথা। জানা অর্থে জ্ঞানের বিষয় হওয়া। যিনি বিষয় (object) এবং বিষয়ী (subject) উভয়েরই উপরে, তিনি কিরূপে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের বিষয় (object) হইবেন? তাঁহার সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যায় যে 'অস্তি'—তিনি আছেন। ইহার অতি-

রিক্ত কিছু বলাও যায় না, জানাও যায় না।

অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।

[কঠ ৬।১২]

'অস্তি'—এইমাত্র বলা যায়, তাহার অধিক উপলব্ধি হয় না।

জ্ঞানের উপর প্রজ্ঞান, বোধের উপর প্রতিবোধ। ইহার নাম সমাধি বা যোগজ মতি। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সমাধিরও গম্য নহেন। সমাধি দ্বিবিধ—সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। সবিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদ থাকে। কিন্তু নির্ব্বিকল্প সমাধিতে সমস্ত ভেদবুদ্ধি, সমস্ত দ্বৈত-দর্শন অন্তর্হিত হয়; তখন দ্রষ্টা ও দৃশ্য জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, বিষয় ও বিষয়ী একাকার হইয়া যায়। সবিশেষ ব্রহ্মই সবিকল্প সমাধির বেদ্য। তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যুপৈতি॥

[মুণ্ডক ৩।১।৩]

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥

[মুণ্ডক ৩।১।৮]

জীব যখন জ্যোতির্ম্ময়, কর্ত্তা, ঈশ্বর, ব্রহ্মযোনি (ব্রহ্মার জনক) পুরুষকে দর্শন করেন, তখন তিনি পুণ্যপাপ পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল হইয়া পরম সমত্ব প্রাপ্ত হন।

জ্ঞানপ্রসাদে বিশুদ্ধচিত্ত (সাধক) ধ্যানযোগে নিষ্কল (অখণ্ড) পরমাত্মাকে দর্শন করেন।

বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতার-
মীশং তং জ্ঞাত্বামৃতা ভবন্তি।

[শ্বেতাশ্বতর ৩।৭]

বিশ্বের এক ব্যাপক বস্তু মহেশ্বরকে জানিলে জীব অমৃতত্ব লাভ করে।

বেদান্তসূত্রে যে বলা হইয়াছে যে, সংরাধনকালে তিনি যোগীর প্রত্যক্ষ হন—

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।

[ব্রহ্মসূত্র ৩।২।২৪]

তাহা এই সবিশেষ ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিয়া। কারণ পরব্রহ্মসম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন যে, যিনি বিজ্ঞাতা তিনি কখনও বিজ্ঞাত হইতে পারেন না।

যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ তৎ কেন কং রসয়েৎ তৎ কেন কমভিবদেৎ তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং স্পৃশেৎ তৎ কেন কং বিজানীয়াদ্‌যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ।

[বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৫ ; ২।৪।১৫]

যখন সমস্তই আত্মা হইয়া যায় (আত্মা ভিন্ন আর কিছু থাকে না), তখন কে কাহাকে দর্শন করিবে, কে কাহাকে ঘ্রাণ করিবে, কে কাহাকে আস্বাদন করিবে, কে কাহাকে বলিবে, কে কাহাকে শ্রবণ করিবে, কে কাহাকে মনন করিবে, কে কাহাকে স্পর্শ করিবে, কে কাহাকে জানিবে? যাঁহা দ্বারা এ সমস্তই বিজ্ঞাত হয়, তাঁহাকে কিসের দ্বারা বিজ্ঞাত হইবে?

এই নির্ব্বিকল্প সমাধির একাকার অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া কেনোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

যস্যামতং তস্য মতং
মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং
বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥

[কেন ২।২—৩]

যিনি (ব্রহ্মকে) জানেন না, তিনিই জানেন; যিনি জানেন, তিনিই জানেন না। ব্রহ্ম যিনি জানেন, তাঁহার অজ্ঞাত; আর যিনি জানেন না, তাঁহারই জ্ঞাত।

প্রথমদৃষ্টিতে বিরুদ্ধভাবাপন্ন প্রলাপবাক্য মনে হইলেও কথাটি বড়ই ঠিক। যে পর্য্যন্ত জ্ঞাতা জ্ঞেয় ভেদদর্শন থাকে, ততক্ষণ ব্রহ্ম অজ্ঞাত থাকেন; কিন্তু ভেদ-বুদ্ধি রহিত হইয়া একাকার বোধ হইলে, তবে ব্রহ্ম জ্ঞাত হয়েন। এ অবস্থা বচনাতীত—এ বোধ জ্ঞান নহে, অজ্ঞানও নহে—অনির্ব্বচনীয় কোন-কিছু।

এই নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্ম, মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া নিজেকে যেন সঙ্কুচিত করেন। তখন তাঁহার যে বিভাব হয়, তাহাই সবিশেষ বা সবিকল্প ভাব। তখন তাঁহাকে মহেশ্বর বলা হয়।

যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ
স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ।

[শ্বেতাশ্বতর ৬।১০]

যেমন উর্ণনাভ জাল রচনা করিয়া নিজেকে আবৃত করে, সেইরূপ স্বভাবতঃ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, প্রধানজ জালে আপনাকে আবৃত করিলেন।

যেমন দুর্নিরীক্ষ্য তেজোমণ্ডলকে কাম্বুশের দ্বারা আবৃত করিলে তাহার তেজ যেন কতক সঙ্কুচিত হয়; পরব্রহ্মেরও তখন সেইরূপ ভাব হয়। এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবত বলিয়াছেন—

নারায়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতম্।
গৃহীতমায়োরুগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্বতঃ॥

[ভাগবত ২।৬।২৯]

এই জগৎ ভগবান্ নারায়ণে নিহিত আছে; তিনি স্বভাবতঃ নির্গুণ, কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভে মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া সগুণ হয়েন।

বলা বাহুল্য, এই সগুণ ও নির্গুণ একই বস্তু। সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষে কেবল ভাবের প্রভেদমাত্র; বস্তুতঃ কোনও ভেদ নাই। এ কথা বিষ্ণুপুরাণে স্পষ্ট উপদিষ্ট আছে—

সদক্ষরঃ ব্রহ্ম য ঈশ্বরঃ পুমান্
গুণোর্ম্মিসৃষ্টিস্থিতিকালসংলয়ঃ।

[বিষ্ণুপুরাণ ১।১।২]

যিনি প্রকৃতি-ক্ষোভ-জনিত সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের হেতুভূত পুরুষ ঈশ্বর, তিনিই সৎ অক্ষর ব্রহ্ম।

এ সম্বন্ধে ভাগবত এইরূপ বলিয়াছেন—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।

[ভাগবত ১।২।১১]

সেই অদ্বিতীয় চিৎ বস্তুকে তত্ত্বজ্ঞানীরা "তত্ত্ব" আখ্যা প্রদান করেন। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ভগবান্ (সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বর)।

উপনিষদ্ প্রায়ই নির্গুণ ব্রহ্মের নির্দ্দেশ-স্থলে ক্লীবলিঙ্গ এবং সগুণ ব্রহ্মের নির্দ্দেশ-স্থলে পুংলিঙ্গ প্রয়োগ করিয়াছেন। যেমন—"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" [কঠ ৫।১।৫] (নির্গুণের নির্দ্দেশ); আবার "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ [ছান্দোগ্য ৩।১৪।২] (সগুণের নির্দ্দেশ)। কোথাও কিন্তু দেখা যায় যে, একই মন্ত্রে পুংলিঙ্গ ও ক্লীব-লিঙ্গ উভয়েরই প্রয়োগ করা হইয়াছে। যেমন—

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ-
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ
সমাভ্যঃ।

[ঈশ ৮]

এখানে প্রথম অংশ নির্গুণ ব্রহ্মের নির্দ্দেশক, সেইজন্য ক্লীবলিঙ্গের প্রয়োগ; আর শেষাংশ সগুণ ব্রহ্মের নির্দ্দেশক, সেইজন্য পুংলিঙ্গের প্রয়োগ। একই মন্ত্রে সগুণ ও নির্গুণ এই উভয় ভাবেরই নির্দ্দেশ করিয়া, শ্রুতি এই উপদেশ দিলেন যে, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষে কেবলমাত্র ভাবের প্রভেদ; সগুণ ও নির্গুণ, বস্তুতঃ একই বস্তু।

এই সগুণ ব্রহ্মের পরিচয় দিবার জন্য ঋষিরা উপনিষদে বহুতর সুন্দর গম্ভীর মহান্ মন্ত্রের সমাবেশ করিয়াছেন।

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্য্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্।

[মাণ্ডুক্য ৬]

ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্য্যামী, ইনি বিশ্বের কারণ; ইনিই ভূতসকলের উৎপত্তি ও প্রলয় স্থান।

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।

[শ্বেতাশ্বতর ৩।১৯]

তাঁহার হস্ত নাই অথচ গ্রহণ করেন, পদ নাই অথচ গমন করেন, চক্ষু নাই অথচ দর্শন করেন, কর্ণ নাই অথচ শ্রবণ করেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ অথচ তাঁহাকে কেহ জানে না; তাঁহাকেই মহান্ পরমপুরুষ বলে।

এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ।

[ছান্দোগ্য ৮।১।৫]

এই আত্মা অপাপবিদ্ধ, জরাহীন, মৃত্যুহীন, শোকহীন, ক্ষুধাতৃষ্ণাহীন; ইনি সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্।

[কঠ ৫।১৩]

তিনি অনিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন।

সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ
স্বশক্তিলেশাদ্ধৃতভূতবর্গঃ।
তেজোবলৈশ্বর্য্যমহাবোধ-
স্ববীর্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ॥
পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র
ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে॥

[ব্রহ্মসূত্র ৩।২।১১ সূত্রের শ্রীভাষ্যধৃত]

সমস্ত কল্যাণগুণের আধার ভগবান্ তেজ, বল, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, বীর্য্য, শক্তি প্রভৃতি গুণের রাশি। তিনি নিজশক্তির কণিকামাত্রে সমস্ত ভূতগণকে ধারণ করিতেছেন। তিনি শ্রেষ্ঠতম, পরাৎপর, তাঁহাতে পঞ্চক্লেশের তিলমাত্র নাই।

সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নো এবাসাধুনা কনীয়ান্ এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়।

[বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২]

ইনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি; সাধু কর্ম্মের দ্বারা ইঁহার উপচয় হয় না, অসাধু কর্ম্মের দ্বারা অপচয় হয় না; ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি ভূতাধিপতি, ইনি ভূতপাল; ইনি লোকসমূহের বিভাজক, ধারক সেতু।

ব্রহ্মের যে মায়া-আবরণ, তাহা স্বেচ্ছা-

কৃত। তজ্জন্য তিনি সোপাধিক হইলেও সসীম হয়েন না। কারণ তিনি বিশ্বানুগ (Immanent) হইয়াও বিশ্বাতিগ (Transcendent); প্রপঞ্চাভিমানী হইয়াও প্রপঞ্চাতীত। সেইজন্য শ্রুতি বলেন—

তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।

[ঈশ ৫]

তিনি সমস্ত জগতের অন্তরে আছেন, আবার তিনি জগতের বাহিরেও আছেন।

বৃহদারণ্যকও এই কথাই বলিয়াছেন—

অয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ।

[বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৩]

পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।

[পুরুষসূক্ত ৩]

সমস্ত ভূত তাঁহার একপাদমাত্র, তাঁহার আর তিন পাদ অমৃত—বিশ্বাতীত।

গীতাও এই কথা বলিয়াছেন—

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥

[গীতা ১০।৪২]

আমি একাংশ দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছি।

এই যে সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বর, ইনিই সচ্চিদানন্দ। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম," [তৈত্তিরীয় উঃ ২।১।১] "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" [বৃহদারণ্যক ৩।৯।২৮] এই সকল সবিশেষ শ্রুতি তাঁহাকেই লক্ষ্য করিতেছে। ব্রহ্মসংহিতায় আছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। [৫।১]

পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ।

শ্রীকৃষ্ণের নমস্কারে বলা হইয়াছে—

সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে।

সচ্চিদানন্দরূপ অক্লিষ্টকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।

এই অবস্থায় তাঁহাতে তিনটি শক্তির প্রকাশ হয়। এই শক্তিত্রয়ের নাম যথাক্রমে সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সংবিৎ। সন্ধিনীশক্তিযোগে মহেশ্বর সৎ, সংবিৎশক্তিযোগে চিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি যোগে আনন্দস্বরূপ হয়েন। সন্ধিনী শক্তি ক্রিয়া সত্তা বা সত্য, সংবিৎ শক্তির ক্রিয়া জ্ঞান এবং হ্লাদিনী শক্তির ক্রিয়া আনন্দ।

ইহা গেল সগুণ ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ। তাঁহাকে যে "তজ্জলান্" * বলা হয়, ইহা তাঁহার তটস্থলক্ষণ। "তজ্জলান্" অর্থে তজ্জ, তল্ল, তদন;—তাঁহা হইতে জগৎ জাত, তাঁহাতে জগৎ অবস্থিত, তাঁহাতেই জগৎ লীন।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।

[তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ৩।১]

যাঁহা হইতে এই সকল ভূত উৎপন্ন হইতেছে, উৎপন্ন হইয়া যাঁহা দ্বারা জীবিত রহিয়াছে, অন্তকালে যাঁহাতে বিলীন হইবে, তিনিই ব্রহ্ম।

যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।

[বৃহদারণ্যক ২।১।২০]

যেমন উর্ণনাভ তন্তু উদ্গীরণ করে, যেমন অগ্নি বিস্ফুলিঙ্গ উদ্গীরণ করে, সেইরূপ এই আত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত ভূত নিঃসৃত হইয়াছে।

* সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি। [ছান্দোগ্য ৩।১৪।১]

ইহাই সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বরের তটস্থ-লক্ষণ।

সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার—মহেশ্বরের এই তিন জগব্যাপার স্বতন্ত্রভাবে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার নাম দেওয়া হয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। রজোগুণপ্রধান সৃষ্টিকার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া তিনি ব্রহ্মা; সত্ত্বগুণপ্রধান পালন-কার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বিষ্ণু এবং তমোগুণপ্রধান লয়কার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া তিনি শিব। ইঁহাদিগকে ত্রিমূর্ত্তি বলে। এ তিন স্বতন্ত্র নহেন—ইঁহারা তিনেই এক, একেই তিন। সেইজন্য মহেশ্বরের স্তোত্রে বলা হইয়াছে—

ভক্তচিত্তসমাসীনব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মক !

[সূতসংহিতা ৩।৪৮]

তিনি ভক্তের চিত্তে অধিষ্ঠিত; তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবাত্মক।

কালিদাস এই ভাবের প্রতিধ্বনি করিয়া অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছেন—

নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাক্ সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে।
গুণত্রয়বিভাগায় পশ্চাদ্ভেদমুপেয়ুষে।

সৃষ্টির পূর্ব্বে তুমি কেবল, অদ্বিতীয়। পরে গুণত্রয়ের উপাধিভেদে তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবরূপে ত্রিমূর্ত্তিতে ভিন্নরূপ হও। তোমাকে নমস্কার।

এই সগুণ ব্রহ্মকে যে মহেশ্বর বলা হয়, তাহার বিশেষ সার্থকতা আছে। কারণ তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সমস্ত জগতের প্রভু, সকলই তাঁহার শাসনাধীন। সেইজন্য শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (৩।১) বলিয়াছেন—

য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ
সর্ব্বান্ লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ।

যিনি এক মায়াবী সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, সমস্ত লোককে শক্তিদ্বারা শাসন করেন।

বৃহদারণ্যক (৩।৮।৯) বলিয়াছেন—

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।

হে গার্গি! ইঁহারই শাসনে চন্দ্র ও সূর্য্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া অবস্থিত আছে।

ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাঽস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

[তৈত্তিরীয় ২।৮।১]

ইঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র এবং পঞ্চম মৃত্যু ধাবিত হইতেছে।

সেইজন্য বলা হইয়াছে—

পরাঽস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।

[শ্বেতাশ্বতর ৬।৮]

তাঁহার পরা শক্তি বিবিধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়; তাঁহার জ্ঞানশক্তি, বল-(ইচ্ছা)-শক্তি, ও ক্রিয়াশক্তি স্বাভাবিক।

এই শক্তিযোগেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সবিশেষ হইয়া নানাভাবে প্রতীয়মান হয়েন।

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্-
বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি।

[শ্বেতাশ্বতর ৪।১]

যিনি অদ্বিতীয়, অবর্ণ (নির্ব্বিশেষ) ব্রহ্ম, তিনিই বিবিধশক্তিযোগে স্বার্থনিরপেক্ষ হইয়া নানা বিভাব ধারণ করেন।

বাস্তবিক জগতে যেখানেই শক্তি, মহিমা বা ঐশ্বর্য্যের বিকাশ, সেখানে তাঁহারই প্রভাব বুঝিতে হইবে। সেইজন্য গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥

[গীতা ১০।৪১]

যে কিছু বস্তু বিভূতিযুক্ত, শ্রীযুক্ত অথবা ওজোযুক্ত, সে সমস্তই আমার তেজের প্রকাশ জানিবে।

সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল। এখন বিবেচ্য এই, উপাসনার পক্ষে কোন্ ভাব প্রশস্ত—সগুণ না নির্গুণ, সবিশেষ না নির্ব্বিশেষ। এসম্বন্ধে গীতার সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে দেখিতে পাই যে, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥ ১

যাঁহারা তদ্গতচিত্তে তোমার (সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বরের) উপাসনা করেন এবং যাঁহারা অক্ষর ও অব্যক্ত (নির্গুণ) ব্রহ্মের আরাধনা করেন, এই উভয়বিধ লোকের মধ্যে কাঁহারা শ্রেষ্ঠ যোগী?

ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছিলেন—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

[গীতা ১২।২—৫]

যাঁহারা আমাতে মন নিবেশ করিয়া পরমশ্রদ্ধাসহকারে নিত্য নিবিষ্টচিত্তে আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী; আর যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হইয়া সমস্তভূতের হিতে রত থাকিয়া ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, সর্ব্বব্যাপী, কূটস্থ, অচল, নিত্য পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারাও আমাকেই পান বটে, কিন্তু যাঁহারা অব্যক্ত ব্রহ্মের আরাধনা করেন, তাঁহাদিগকে অধিকতর ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। কারণ দেহধারী জীব অতি কষ্টে অব্যক্তগতি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

অতএব দেখা গেল যে, গীতাকারের মতে উপাসনার পক্ষে নির্ব্বিশেষ অপেক্ষা সবিশেষ ব্রহ্ম বা মহেশ্বরই প্রশস্ত। এই মহেশ্বরের দুই ভাব শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে—অমূর্ত্ত ও মূর্ত্ত ভাব।

দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ।

[বৃহদারণ্যক ২।৩।১]

ব্রহ্মের (মহেশ্বরের) দুই রূপ—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত।

বিষ্ণুপুরাণও (৬।৭।৪৭) এই কথা বলিতেছেন।

আশ্রয়স্তেতসো ব্রহ্ম দ্বিধা তচ্চ স্বভাবতঃ।
ভূপ! মূর্ত্তমমূর্ত্তঞ্চ পরঞ্চাপরমেব চ॥

হে রাজন্! উপাসকের চিত্তের আশ্রয় যে ব্রহ্ম (মহেশ্বর), তাঁহার স্বভাবতঃ দুই ভাব—পর বা অমূর্ত্ত ভাব এবং অপর বা মূর্ত্ত ভাব।

এই যে অমূর্ত্ত ভাব, ইহাই মহেশ্বরের স্বরূপ—সচ্চিদানন্দ ভাব।

অমূর্ত্তং ব্রহ্মণো রূপং যৎ সদিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।

[বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৬৯]

'ব্রহ্মের যে অমূর্ত্তরূপ, পণ্ডিতেরা তাহাকেই সৎ বলেন।

এই অমূর্ত্তরূপেরই উপাসনা উপনিষদে উপদিষ্ট দেখা যায়। উপনিষদের মতে উপাসনা ত্রিবিধ—অঙ্গাববদ্ধ, প্রতীক ও আত্মগ্রহ। প্রথমতঃ সাধক যজ্ঞের অঙ্গভূত পদার্থসমূহে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবেন ;—

ওঁ ইত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত।

[ছান্দোগ্য ১।১।১]

উদ্গীথকে ওঁকাররূপে উপাসনা করিবে।

য এবাসৌ তপতি তমুদ্গীথমুপাসীত।

[ছান্দোগ্য ১।৩।১]

এই যিনি তাপ প্রদান করেন, তাঁহাকে উদ্গীথ ভাবনা করিবে।

এই ভাবের উপাসনাকে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা।

[গীতা ৪।২৪]

অর্পণ (যজ্ঞপাত্র) ব্রহ্ম, হবিঃ ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, হোতা ব্রহ্ম, এইরূপে যিনি কর্ম্মে ব্রহ্মদৃষ্টি করেন, তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।

এই উপাসনার নাম অঙ্গাববদ্ধ উপাসনা।

মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত।

[ছান্দোগ্য ৩।১৮।১]

মন ব্রহ্ম, এইরূপ উপাসনা করিবে।

আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ।

[ছান্দোগ্য ৩।১৯।১]

সূর্য্য ব্রহ্ম, এইরূপ ভাবনা করিবে।

এইরূপে ব্রহ্মের ব্যাবহারিক বিকার জাগতিক পদার্থে ব্রহ্মদৃষ্টি করার নাম প্রতীক উপাসনা। এই প্রণালীতে সাধকের চিত্তশুদ্ধি হইলে তিনি অহংগ্রহ উপাসনার অধিকারী হইবেন। তখন সাধক জীব-ব্রহ্মের অভেদ চিন্তা করিবেন। "অহং ব্রহ্মাস্মি", "সোঽহং", "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্য এইরূপ উপাসনার উপদেশ করিতেছে। এ অবস্থায় সাধককে ভাবনা করিতে হয়—

যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ।

[তৈত্তিরীয় ৩।১০]

ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে অহং বৈ ত্বমসি দেবতে।

যিনি পুরুষে অধিষ্ঠিত, তিনিই আদিত্যে অধিষ্ঠিত। হে ভগবান্ দেবতা! তুমি হও আমি, আমি হই তুমি।

ইহা যোগের চরম অবস্থা। সাধারণ সাধকের গম্য নহে।

মহেশ্বরের যে মূর্ত্তরূপ, তাহা আবার দ্বিবিধ—এক বিরাট্ রূপ ও অন্য সাকার রূপ। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে এই বিরাট্ রূপের বর্ণনা আছে—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥ ১—২

ইত্যাদি।

বিরাট্ পুরুষের সহস্র শির, সহস্র নয়ন, সহস্র চরণ; তিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন এবং জগতের বাহিরেও আছেন। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, যাহা কিছু, সমস্তই সেই পুরুষ। মর্ত্ত্য ও অমর্ত্ত্য, তিনি সমস্তেরই অধীশ্বর।

এই বিরাট্ পুরুষকেই লক্ষ্য করিয়া শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

[শ্বেতাশ্বতর ৩।১৬]

তাঁহার সর্ব্বত্র কর-চরণ, সর্ব্বত্র চক্ষুঃ-শ্রবণ, সর্ব্বত্র শির-আনন, তিনি সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন।

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো
বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈ-
র্দ্যাবাভূমী জনয়ন্দেব একঃ॥

[শ্বেতাশ্বতর ৩।৩]

তাঁহার সর্ব্বত্র চক্ষু, তাঁহার সর্ব্বত্র মুখ, তাঁহার সর্ব্বত্র বাহু, তাঁহার সর্ব্বত্র পদ; সেই দ্যুতিময় দেবতা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যকে বাহু ও পক্ষীকে পক্ষ যুক্ত করিয়াছেন।

ইঁহারই সম্বন্ধে মুণ্ডকোপনিষদে লিখিত হইয়াছে যে, দ্যুলোক ইঁহার মস্তক, চন্দ্র-সূর্য্য ইঁহার চক্ষু, দিক্ ইঁহার কর্ণ, বেদ ইঁহার বাণী, বায়ু ইঁহার প্রাণ, বিশ্ব ইঁহার হৃদয়, পৃথিবী ইঁহার চরণ; ইনি সমস্ত ভূতের অন্তরাত্মা।

অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্‌বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥

[মুণ্ডক ২।১।৪]

এই বিরাট্ রূপকে বিশ্বরূপ বলা হয়। কারণ জগৎই জগদীশ্বরের মূর্ত্তি। এখানে জগৎ অর্থে আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবী-টুকু নহে। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, জন, তপঃ, মহঃ, সত্য, এই সপ্ত উর্দ্ধলোক এবং পাতাল, রসাতল, মহাতল, তলাতল, সুতল, বিতল ও অতল, এই সপ্ত অধোলোক জগতের অন্তর্গত। এই সমস্ত জগৎ ও জাগতিক পদার্থ—স্থাবর-জঙ্গম, তরু-লতা-গুল্ম, কীট-পতঙ্গ-সরীসৃপ, পশু-পক্ষি-মনুষ্য, দেব-দানব, যক্ষ-রক্ষ-কিন্নর-গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ-সাধ্য—যে কিছু পদার্থ আছে, ছিল বা হইবে, সেই সমস্তের যে বিরাট্ সমষ্টি—যে প্রকাণ্ড সংযোগ, তাহাই ভগবানের বিশ্বরূপ। এই বিশ্বরূপ গীতার একাদশ অধ্যায়ে বিস্তৃত-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার আরম্ভ-মাত্র এখানে উদ্ধৃত হইল—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ!॥

[গীতা ১১।১৫ । ১৬]

অর্জ্জুন বলিলেন—"হে দেব! আমি তোমার দেহে সমস্ত দেব, সমস্ত ভূত, পদ্ম-সনস্থিত ব্রহ্মা এবং দিব্য মহর্ষি ও উরগ-গণকে অবলোকন করিতেছি। হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ! আমি তোমার অনেক বাহু, উদর, মুখ ও নেত্র যুক্ত, সর্ব্বত্র অনন্ত রূপ নিরীক্ষণ করিতেছি; কিন্তু ইহার আদি, অন্ত ও মধ্য, কিছুই দেখিতে পাই-তেছি না।"

এই বিরাট্ পুরুষের কথা ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। তাহার সার মর্ম্ম এই যে, আদিতে ভগবান্ লোকসৃষ্টি ইচ্ছা করিয়া মহদাদি-গঠিত পুরুষমূর্ত্তি ধারণ করেন। কারণা-র্ণবশায়ী সেই ভগবানের নাভি হইতে ব্রহ্মা

আবির্ভূত হয়েন। তাঁহার অবয়বসন্নিবেশেই নিখিল ভুবন কল্পিত হয়। তাঁহার সেই রূপ বিশুদ্ধসত্ত্বময়। সেই রূপের চরণ, হস্ত, বক্ষ, বদন, শ্রবণ, নয়ন ও মস্তক প্রভৃতি সকলই অসংখ্য ও অপরিমেয়। ইনিই সকল অবতারের নিধান ও অক্ষয় বীজ। ইহারই অংশাংশে পশু, মনুষ্য, দেব প্রভৃতি সৃষ্টি হয়।

ভগবানের এই বিরাট্ রূপের উপাসনা যে ভাবে করিতে হয়, তাহা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে—

অণ্ডকোষে শরীরেঽস্মিন্ সপ্তাবরণসংযুতে।
বৈরাজঃ পুরুষো যোঽসৌ ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ॥
[ভাগবত ২।১।২৫]

এই সপ্ত আবরণ * আবৃত ব্রহ্মাণ্ড-শরীরে যে বিরাট্ পুরুষ বিরাজিত রহিয়াছেন, তাঁহাকে ধারণা করিতে হয়। সপ্ত পাতাল ও সপ্ত লোক তাঁহার শরীর—তাঁহার বিরাট্ দেহ। পাতাল তাঁহার পদতল, রসাতল তাঁহার চরণাগ্র, মহাতল তাঁহার গুল্ফ, তলাতল তাঁহার জঙ্ঘা, সুতল তাঁহার জানু, বিতল ও অতল তাঁহার উরুদ্বয়। ভূর্লোক তাঁহার জঘন, ভুবর্লোক তাঁহার নাভি, স্বর্লোক তাঁহার উরস্, মহর্লোক তাঁহার গ্রীবা, জনলোক তাঁহার বদন, তপোলোক তাঁহার ললাট এবং সত্যলোক তাঁহার শীর্ষ। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার বাহু, দিক্‌সমূহ তাঁহার প্রাণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার নাসাপুট, হুতাশন তাঁহার মুখ, সূর্য্য তাঁহার নয়ন, দিবারাত্রি তাঁহার অক্ষিপত্র, রস তাঁহার জিহ্বা, যম তাঁহার দংষ্ট্রা, মায়া তাঁহার হাস্য, সংসার তাঁহার কটাক্ষ, সমুদ্র তাঁহার কুক্ষি, পর্ব্বতসমূহ তাঁহার অস্থি, নদীসমূহ তাঁহার নাড়ী, বৃক্ষসকল তাঁহার রোম, বায়ু তাঁহার নিশ্বাস, কাল তাঁহার গতি, মেঘ তাঁহার কেশ, সন্ধ্যা তাঁহার বস্ত্র, প্রকৃতি তাঁহার হৃদয়, চন্দ্র তাঁহার মন, ইত্যাদিরূপে সেই বিরাট্ পুরুষের মূর্ত্তির ভাবনা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে।

এই বিশ্বরূপ, অর্জ্জুনকে ভগবান্ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধকালে দেখাইয়াছিলেন। অর্জ্জুন শ্রেষ্ঠ সাধক; তিনি পুরাকল্পের নর ঋষি,—ভগবানের কার্য্যে সহায় হইবার জন্য আবার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও এই বিশ্বরূপ সহিতে পারেন নাই। সাধারণ উপাসক কি পারিবে? বিশ্বরূপ দেখিয়া অর্জ্জুনও ভীতভীত হইয়া উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে ভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন—

দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস!।
[গীতা ১১।২৫]

আমার দিগ্‌ভ্রম হইতেছে, আমি সুখলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না; হে দেবদেব! হে জগন্নিবাস! তুমি প্রসন্ন হও।

অর্জ্জুনও ভগবান্‌কে ঐ রূপ প্রতিসংহার করিতে বলিয়াছিলেন—

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।
[গীতা ১১।৪৫]

* এই সপ্ত আবরণ জগতের সপ্ত মূলতত্ত্ব—প্রথমত ক্ষিতি, তাহার পরে পর পর জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্ব।

হে দেব! আমি তোমার অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া হৃষ্ট হইয়াছি, কিন্তু ভয়ে আমার মন অতিশয় ব্যথিত হইয়াছে; হে দেবদেব! হে জগন্নিবাস। তুমি প্রসন্ন হও, আমাকে তোমার সেই (পরিচিত) শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করাও।

এই বিশ্বরূপ সাধকের দুর্নিরীক্ষ্য এবং উপাসনার পক্ষে অপ্রশস্ত বলিয়াই, বোধ হয়, নিরাকার ভগবান্ সাকারমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। নিরাকার ভগবানের আবার আকার কি? এই সন্দেহ নিরসনের জন্য অদ্বৈতবাদী দার্শনিকশিরোমণি শ্রীশঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

স্যাৎ পরমেশ্বরস্যাপীচ্ছাবশান্মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম্।
[ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ১।১।২০]

অর্থাৎ সাধকের অনুগ্রহজন্য পরমেশ্বরও স্বেচ্ছাক্রমে মায়াময় রূপ পরিগ্রহ করেন। কারণ, তিনি অগুণ হইয়াও সগুণ, অরূপ হইয়াও সরূপ, নিরাকার হইয়াও সাকার। এ বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—

অস্ত্রভূষণযুক্তানি রূপং বিভর্ত্তি যোঽসৌ অশ্রেয়সে প্রাণিনাং হরিঃ॥
[বিষ্ণুপুরাণ ১।২২।৭৪]

মায়াময় হরি রূপবর্জ্জিত হইয়াও প্রাণীদিগের হিতের নিমিত্ত অস্ত্রভূষণসংযুক্ত দেহ ধারণ করিয়া থাকেন।

যতীনাং মন্ত্রিণাঞ্চৈব জ্ঞানিনাং যোগিনাং তথা।
ধ্যানপূজানিমিত্তং হি তনুং গৃহ্লাতি মায়য়া॥
[সূতসংহিতা ১।২ শ্লোকের মাধবাচার্য্যকৃত ভাষ্যে ধৃত 'সুপ্রভেদ'বচন।]

যতি, মন্ত্রী (মন্ত্রবিৎ), জ্ঞানী ও যোগী সাধকের ধ্যান ও পূজার নিমিত্ত ভগবান্ মায়াকৃত দেহ অঙ্গীকার করেন।

তন্ত্রের যে একটি বাক্য শুনা যায় যে—

সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।

'সাধকদিগের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপকল্পনা হয়'—ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, তাঁহার সাকার রূপ কল্পনামাত্র। আমরা এখন যে অর্থে 'কল্পনা' শব্দের প্রয়োগ করি, প্রাচীন গ্রন্থে অনেকস্থলে ঐ শব্দ সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। ঋগ্বেদ বলিতেছেন—

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।

বিধাতা পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, সেইরূপই সূর্য্যাচন্দ্রের কল্পনা করিলেন।—ইহার কি এই অর্থ যে, চন্দ্রসূর্য্য কাল্পনিক পদার্থ—উহাদের বস্তুত সত্তা নাই? তাহা নহে। বেদের মর্ম্ম এই যে, ভগবানের যে কল্পনা (ভাবনা), তাহাই জগৎরূপে প্রকাশিত হয়। * ব্রহ্মের যে রূপকল্পনার কথা বলা হইয়াছে, তাহাও ঐ ধরণের কথা।

ব্রহ্ম (মহেশ্বর) জীবের হিতার্থ আপনার যে সাকার রূপের কল্পনা (ভাবনা) করেন, সাধকের চক্ষে সেই রূপ প্রকটিত হয়। এইরূপে সাধকোত্তম আর্য্য ঋষিরা ভগবানের যে সকল মূর্ত্তি ধ্যাননেত্রে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, সেই সকল মূর্ত্তি পরবর্ত্তী যুগের সাধকদিগের হিতের জন্য যথাযথ বর্ণনা করিয়া চিরস্থায়ী করিয়া

* অর্থাৎ Thoughts are things। বাইবেল যেমন বলিয়াছেন—God willed—Let there be light and there was light.

গিয়াছেন। অতএব সে সকল মূর্ত্তি কল্পিত বা অলীক নহে।

ভগবানের সেই সাকার মূর্ত্তরূপ যে ভাবে চিন্তা করিতে হয়, তাহা বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে—

তচ্চ মূর্ত্তং হরে রূপং যাদৃক্ চিন্ত্যং নরাধিপ।
তচ্ছূয়তামনাধারে ধারণা নোপপদ্যতে॥
প্রসন্নচারুবদনং পদ্মপত্রোপমেক্ষণম্।
সুকপোলং সুবিস্তীর্ণললাটফলকোজ্জ্বলম্॥
সমকর্ণান্তবিন্যস্তচারুকর্ণবিভূষণম্।
কম্বুগ্রীবং সুবিস্তীর্ণশ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসম্॥
বলীত্রিভিন্না মধ্যেন্তিনা চোদরেণ বৈ।
প্রলম্বাষ্টভুজং বিষ্ণুমথবাপি চতুর্ভুজম্॥
সমস্থিতোরুজঙ্ঘঞ্চ সুস্থিরাঙ্ঘ্রিকরাম্বুজম্।
চিন্তয়েদ্ব্রহ্ম মূর্ত্তং পীতনিশ্চলবাসসম্॥

[বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৪৮—৮২]

নিরাকারে চিত্তের ধারণা সম্ভবে না; অতএব ভগবানের মূর্ত্ত রূপ যেরূপে চিন্তা করিতে হয়, বলিতেছি শুন। তিনি প্রসন্ন-চারুবদন, পদ্মপলাশনয়ন; তাঁহার কপোল-দেশ সুন্দর, বিশাল উজ্জ্বল ললাট; কর্ণযুগল চারুভূষণে সজ্জিত, বিস্তীর্ণ বক্ষস্থল শ্রীবৎসাঙ্কিত এবং গ্রীবা কম্বুর ন্যায়। তাঁহার উদরদেশ নিম্ননাভি ও বলিত্রয়বিশোভী; তিনি অষ্টভুজ বা চতুর্ভুজধারী। তাঁহার উরু ও জঙ্ঘাদেশ বর্ত্তুলাকার, হস্ত ও পদদ্বয় সুগঠিত; তাঁহার বসন নির্ম্মল ও পীতাভ। সেই মূর্ত্তব্রহ্ম বিষ্ণুকে ভাবনা করিবে।

ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধের ৮ম অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, নিম্নে তাহার পদ্যানুবাদ প্রদত্ত হইল।

প্রসাদসুমুখ সদা প্রসন্ন নয়ন-মুখ।
সুচারু কপোল নাসা সুন্দর চারু ভ্রূযুগ॥
তরুণ মোহন বপু অরুণাভ ওষ্ঠাধর।
ভকতবৎসলনিধি শরণা দয়াসাগর॥
শ্রীবৎসলাঞ্ছন তনু ঘনমালী ঘনশ্যাম।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চতুর্ভুজে অভিরাম॥
কিরীটকুণ্ডলধারী কেয়ূর বলয় আর।
পীতাম্বর, গলে দোলে কৌস্তুভ ভূষণসার॥
কটিতে শোভিত কাঞ্চী কনকনূপুর পায়।
নেত্রমনোমোহকর শান্ত সুদর্শন কায়॥
দীপিছে অতুল ভাতি চারু চরণনখরে।
অধিষ্ঠিত ভগবান্ ভক্ত-হৃদি-পদ্ম'পরে॥
বদনে মধুর হাসি নয়নেতে প্রেম ভায়।
একতান মনে ভাব-বরদাতা বিধাতায়॥

[৪।৮।৪৫—৫১]

বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত, বৈষ্ণব পুরাণ; ইহারা বিষ্ণুমূর্ত্তিধ্যানের উপদেশ দিতেছেন। কিন্তু সকল সাধকের রুচি ত সমান নহে;—সকল উপাসকের প্রবৃত্তি ত একরূপ নহে। সেইজন্য ঋষিরা ভগবানের ধ্যানদৃষ্ট ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির প্রচার করিয়াছেন। তন্মধ্যে বিষ্ণুমূর্ত্তি, শিবমূর্ত্তি ও শক্তিমূর্ত্তি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে যেমন বিষ্ণুমূর্ত্তির ধ্যান উপদিষ্ট আছে, সেইরূপ শিবপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি শৈবপুরাণে মহাদেবের এবং দেবীভাগবত প্রভৃতি শাক্তপুরাণে শক্তিমূর্ত্তির ধ্যান উপদিষ্ট হইয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে বিষ্ণুমূর্ত্তির ধ্যানের প্রকার বর্ণনা করিয়াছি; অতঃপর, শিবমূর্ত্তি ও শক্তিমূর্ত্তির ধ্যান সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া এই দীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

শিবমূর্ত্তির ধ্যান শাস্ত্রে এই ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে—

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং
চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরা-
ভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈ-
র্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং
পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥

প্রসন্ন বদন, অঙ্গে দীপ্ত রত্ন-অলঙ্কার রজতের গিরিনিভ, চারুচন্দ্র ভালে যাঁর, চতুর্ভুজে পরশু ও মৃগ আর বরাভয়, স্তবে রত চারিভিতে নিখিল অমরচয়, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধানে, ত্রি-অম্বক, পদ্মাসন, বিশ্ব-আদি, বিশ্ববীজ, নিখিলভয়হরণ, করহ নিয়ত ধ্যান মহেশ্বর পঞ্চানন॥

আর শক্তিমূর্ত্তির ধ্যান যে যে ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার অন্যতম এইরূপ—

কালাব্‌ভাভাং রবিকুলভবদাং
মৌলিবদ্ধেন্দুখণ্ডাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈ-
রুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং
তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং
সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥

অঙ্গে নীল-মেঘ-আভা, রবিকুলজ্যোতি হয়ে ত্রিনয়না, শঙ্খ চক্র অসি শূল শোভে করে। কেশরিবাহিনী দেবী, শিরে শোভে শশিকলা, জয়-দুর্গা, দীপ্ত তেজে নিখিল-ভুবন ভরা॥ দেবগণ চারিভিতে স্তুতিবাদ করে যাঁরে, কর ধ্যান নিরন্তর জগদ্ধাত্রী সে দুর্গারে॥

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

তৈলবট।

জনপ্রবাদমূলক গল্প।

১

সন্ধ্যার সময় গুইরাম মুচি মই ঘাড়ে করিয়া দুইটা বলদের ল্যাজ মলিতে মলিতে একহাঁটু কাদা মাখিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। আসিয়া দেখিল, তাহার পত্নী পদী ওরফে পদ্মমুখী প্রতিবাসী হলা বাগ্দীর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছে। দেখিয়া গুইরামের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল।

গুইরামের বয়স প্রায় ৬০বৎসর, কিন্তু তাহার পত্নীর বয়স ২০বৎসর মাত্র। গুইরাম যখন ৪২ বৎসরের, তখন ২১টাকা পণ দিয়া ২ বৎসরের মেয়ে পদীকে বিবাহ করিয়াছিল। এ বিবাহ দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষের নহে, প্রথম পক্ষের। বিবাহ করিয়া কন্যাকে এবং কন্যার মাসীকে গৃহে আনয়ন করিল। তদবধি তাহার মাস্‌শাশুড়ীও তাহার গৃহে বাস করিতে লাগিল। দুই বৎসরের শিশুপত্নীকে ক্রোড়ে করিয়া প্রৌঢ় গুইরাম যখন পাড়ায় বেড়াইয়া বেড়াইত, তখন

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত—"গুইরাম, এ মেয়েটি কে ?" তাহা হইলে গুইরাম সহর্ষে বলিত, "এজ্ঞে ইনি আমার ইস্তিড়ি।"

গুইরামের সেই দুই বৎসরের শিশু "ইস্তিড়ি" শৈশব হইতে বাল্য ও কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিল। "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী" হইলেও, বৃদ্ধ গুইরাম কিন্তু এই প্রাণাপেক্ষা গরীয়সীর প্রতি মধ্যে মধ্যে বড়ই অসদ্ব্যবহার করিত। পাড়ার হলা বাগ্দী গুইরামের নাতি সম্পর্কে। তাহার বয়স ৩০এর অধ্যে। নাতি ও ঠানদিদির মধ্যে সদ্ভাবটা অনুচিতমাত্রায় ঘনিষ্ঠতর হইতেছে বিবেচনা করিয়া গুইরাম পত্নীকে হলার সহিত যখন-তখন কথাবার্ত্তা কহিতে নিষেধ করিত। কিন্তু "পর্ব্বতগৃহ ছাড়ি * * কার সাধ্য রোধে তার গতি ?" এই গতিরোধ করিবার জন্য গুইরাম প্রথম-প্রথম চোখ রাঙাইতে আরম্ভ করিল। তার পর ক্রমে ক্রমে চড়চাপড়, কিল ও মুষ্টিযোগ ধরিল, শেষে মধ্যে মধ্যে লগুড় লইয়া তাড়া করিতে আরম্ভ করিল। পদ্মমুখীর শত অপরাধ থাকিলেও সে পতিকৃত লাঞ্ছনায় প্রতিবাদ করিত না ও পতিকৃত ভর্ৎসনা-তাড়নায় ব্যথিত হইত না। যখন প্রতিবাসী স্ত্রীলোকেরা আসিয়া গুইরামকে তিরস্কার করিত, তখন পদ্মমুখী সরোদনে তাহাদিগকে বলিত—"মাড়্‌গ্‌ মাড়্‌গ্‌, তোমড়া কিছু বোলো না, পুড়্‌ষ এগেচে, মাড়্‌গ্‌"। যখন নিতান্ত অসহ্য হইত, তখন স্বামীর প্রতি অভিমান করিয়া বলিত, "তুমি আকুনি যাও", প্রাণ ধরিয়া "যমের বাড়ী যাও" মুখে আনিত না। তথাপি গুইরামের কিন্তু তাড়নার বিরাম ছিল না।

ইদানীং তাহার পত্নী বৃদ্ধ স্বামীকে বড় ভয় করিত না। গুইরাম চড় মারিলে পতিব্রতা কিল মারিত। গুইরাম একবার পাঁচনবাড়ি লইয়া তাড়া করাতে তৎপত্নী সম্মার্জ্জনী দ্বারা স্বামীর পৃষ্ঠের বহুকাল-সঞ্চিত ধূলা ঝাড়িতে প্রবৃত্ত হইল। এমন-সময় ঘোষের পো দুধের বাঁক কাঁধে করিয়া তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়াতে অগত্যা লজ্জাশীলা পতিব্রতা পদ্মমুখী অবগুণ্ঠন টানিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে স্বগৃহে প্রত্যাগত হইল। ঘোষের পো গুইরামের দুর্দ্দশা দেখিয়া সমবেদনা প্রকাশ করিয়া গুইরামকে বলিল—"গুইরাম, তোর ইস্তিড়ি তোকে মারে, তুই কিছু বলিস্ না ?" গুইরাম সকাতরে বলিল—"কি করি দাদা, বাপ নয় যে পেথক্ হবো, মা নয় যে তেড়িয়ে দেবো, পেটের ছেলে নয় যে ত্যাজ্যপুত্তুর করবো, এ যে ইস্তিড়ি, অদ্ধড়ঙ্গ।"

সেই দিন বাড়ী ফিরিয়া গুইরাম পত্নীর পৃষ্ঠে নিজের দক্ষিণ পদতলের পঞ্চলাঞ্ছন মুদ্রিত করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

রাত্রে গুইরাম বাটীতে আসিল না। ছবির ভেড়িতে ভগ্নীর গৃহে চলিয়া গেল। তাহার ভগ্নী ছিল না, এক ভাগিনেয় ছিল। সে অসময়ে মাতুলকে আসিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, গুইরাম ভাগিনেয়কে সমস্ত কথা বলিল। শুনিয়া ভাগিনেয় বলিল—"মামা, তুই আর সে কালামুখীর কাছে যাস্‌নি। তুই আবার স্যাঙা কর্।" কিন্তু ভাগিনেয়ের এই প্রলোভনে সে সুস্থির হইতে পারিল না, মনে মনে অনুতাপ

হইল, পদীকে বাড়ীতে একলা ফেলে এসে ভাল কাজ করে নাই, হাজার হৌক্ "পাড়-বাড় অদ্ধড়ঙ্গ।" সুতরাং ভাগিনেয়ের সহস্র অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া পরদিবস প্রাতে আবার গৃহে প্রত্যাগত হইল। কিন্তু গৃহে আসিয়া দেখিল, যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাই হইয়াছে। গৃহে দ্বার বন্ধ করিয়া গুইরাম-পত্নী অদৃশ্য হইয়াছে।

গুইরাম সমস্ত দিন পত্নীর অন্বেষণ করিল, কিন্তু কোনও সন্ধান পাইল না। হলা বাগ্দীর বাড়ীতে কোনও সংবাদ পাইল না। অবশেষে বলদ-দুইটাকে সে হারাধন দুলের বাটীতে রাখিয়া আসিল। "ভুলো"-কুক্কুরটাকেও এক-এক-মুটা ভাত দিতে বলিয়া বাড়ীর আগড় বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

২

উক্ত ঘটনার প্রায় ছয়মাস পরে একদিন মধ্যাহ্নে একজন প্রাচীন শীর্ণকায় ভিক্ষুক চন্দননগরে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর অতিথিশালার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দ্বারবান্‌কে বলিল, "বাবা, চাট্টি খেতে দাও।"

দ্বারবান্ গম্ভীরস্বরে বলিল, "ভিতর যাও।"

আগন্তুক ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, প্রায় ৩০জন অতিথি এক স্থানে ভোজনে বসিয়াছে। ২জন পাচক ব্রাহ্মণ পরিবেষণ করিতেছে। এক দিকে ৪।৫ জন সন্ন্যাসী জটা-বিভূতি-ব্যাঘ্রচর্ম্ম ইত্যাদিতে বালকগণের ভীতি উৎপাদন করিয়া ডাল-রুটির জোগাড়ে ব্যস্ত আছেন। অন্য দিকে ২জন বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ স্বহস্তে পাক করিয়া আহারে বসিয়াছেন। ৬।৭জন আহারার্থী একস্থানে বসিয়া আছে। প্রাচীনকে আসিতে দেখিয়া একজন পরিচারক জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা, আপনারা ?"

"এজ্ঞে আমরা উইদাস।"

"রুহিদাস ? মুচি ?"

"এজ্ঞে।"

"আচ্ছা বোস। স্নান কর্‌বে ? তা যাও, স্নান করে এস।" বলা বাহুল্য যে, আগন্তুক গুইরাম। গুইরাম এই ছয় মাসের মধ্যে যেন ৬০ বৎসর হইতে ৭৫ বৎসরে উপনীত হইয়াছে। কৃষকসুলভ বলিষ্ঠ কর্কশ দেহ কতকটা নত হইয়া পড়িয়াছে। অঙ্গৌরিত মুখমণ্ডলে শুভ্র গুম্ফশ্মশ্রু জন্মিয়াছে। মাথার চুলগুলা বড় হইয়াছে। যে কয়েকটা দন্ত ছিল, অনাহারে দুশ্চিন্তায় সে কয়টাও অবসর বুঝিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। ফলত গুইরামকে দেখিয়া আর চিনিতে পারা যায় না। গুইরাম স্নান করিয়া আসিলে একজন পরিচারক একখানা নূতন বস্ত্র তাহাকে প্রদান করিল। স্নানান্তে নববস্ত্র পরিধান করাতে তাহার চেহারা অনেকটা বদ্‌লাইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে আরও তিন-চার-জন অতিথি সমাগত হইল। জাতিবিশেষে কেহ বা দালানে, কেহ বা রোয়াকে, আর কেহ বা প্রাঙ্গণে উপবেশন করিল। অনেকেই নববস্ত্র পরিধান করিয়াছে। যাহারা বিদেশী পথিক, কেবল আহারের জন্য আসিয়াছে, তাহারা অনেকেই বস্ত্র লইল না। সকলে যথাস্থানে উপবেশন করিলে একজন পরিচারিকা অবগুণ্ঠনে অর্দ্ধাবৃত হইয়া প্রত্যেকের সম্মুখে এক একখানি কদলীপত্র ও

মাটির জলপাত্র রাখিয়া গেল। আর এক-জন পরিচারিকা—ইহার বয়সটা একটু কাঁচা—একটা কলস কক্ষে আসিয়া শূন্য ভাণ্ডে জল দিয়া গেল।

গুইরাম এই শেষোক্ত পরিচারিকাকে দেখিয়া চম্‌কিয়া উঠিল। এ যে সেই হারাণ-ধন পদীর মত! বৃদ্ধের মাথা ঘুরিতে লাগিল, গা ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল। সে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িল। কতক্ষণ এরূপ অবস্থায় ছিল জানি না, অকস্মাৎ "খাওনা গো, হাঁ করে ভাব্‌ছ কি?" শব্দে চমকিত হইয়া দেখিল যে, তাহার কদলীপত্রে অন্নব্যঞ্জনাদি পরিবেষণ করা হইয়াছে এবং সঙ্গীরা দক্ষিণহস্তের ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

গুইরাম পরিচারিকার কথায় ভোজনে প্রবৃত্ত হইল-বটে, কিন্তু তখন তাহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা অন্তর্হিত হইয়াছে। সে বাতুলের মত কখনও ভাত খায়, কখনও ডাল খায়, কখনও কেবল বা লবণই খাইতে থাকে। পরি-বেষকেরা ও পরিচারকেরা মনে করিল, বুড়া পাগল। এমন-সময় সেই কনিষ্ঠা দাসী একজন পাচককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দাদাঠাকুর, অম্বুইঘরে আর জল চাই?"

কণ্ঠস্বরে গুইরাম স্থির সিদ্ধান্ত করিল, "সেই পাপিষ্ঠাই বটে! কিন্তু একি সর্ব্বনাশ! মুচির মেয়ে হ'য়ে বামুনের অম্বুইঘরে জল দেয়? হারামজাদী নিজে মজেছে, আর বাবুদেরও মজিয়েছে? এহকাল-পরকাল খেয়েছে? র হারামজাদি, আমি যদি উই-দাসের ছেলে হই, আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।" এইরূপ চিন্তা করিয়া গুইরাম আহারে মনোনিবেশ করিল। কিন্তু প্রতিগ্রাসে তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল। কর্ণদ্বয় হইতে যেন অগ্নির উত্তাপ বাহির হইতে লাগিল। তথাপি সে কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া কোনোরূপে ভোজন শেষ করিল। যখন ব্রাহ্মণেতর জাতিরা উচ্ছিষ্ট পরিষ্কারে প্রবৃত্ত হইল, তখন গুইরাম আচমন শেষ করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। একজন ভৃত্য বলিল, "সক্‌ড়ি ঘোচালে না?"

গুইরাম বলিল, "আমাদের বউ ঘোচাবে।"

ভৃত্য পূর্ব্ব হইতেই তাহাকে বাতুল মনে করিয়াছিল, সুতরাং হাসিয়া কহিল, "তোর আবার বউ কেরে পাগ্‌লা?"

"কেন? ওই যে—ও পদি, সক্‌ড়িটা ঘোচা না।" এই বলিয়া সেই পূর্ব্বকথিতা পরিচারিকাকে সম্বোধন করিল।

"পদী" এই শব্দ কর্ণগোচর হইবামাত্র পরিচারিকা পথে সর্পদষ্ট পথিকের ন্যায় চমকিত হইয়া গুইরামের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল। খানিক গুইরামের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মুখের বর্ণ শাদা হইয়া গেল। সে ইতস্তত চাহিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিল। দেখিয়া বৃদ্ধ গুইরাম গিয়া তাহার হস্তধারণ করিয়া বলিল, "হারামজাদি, আবার বামুনের জাত মার্‌তে এসেছিস্?"

তাহার কথা শুনিয়া এবং পরিচারিকার অবস্থা দেখিয়া সকলে বিষম কোলাহল করিয়া উঠিল। তাহাদের নূতন দাসী 'হরি-কামারণী' অকস্মাৎ পদ্ম-মুচিনীতে পরিণত হইল দেখিয়া সকলে যুগপৎ ক্রোধে ও বিস্ময়ে

আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িল। গুইরাম স্বয়ং সহধর্ম্মিণীর গণ্ডদেশে এক প্রকাণ্ড চড় বসাইয়া দিল।

তখন শ্রাবণের ধারার ন্যায় সেই হত-ভাগিনীর উপর প্রহারের পর প্রহার বৃষ্টি হইতে লাগিল। পাচকগণ বেড়ি লইয়া, পরি-বেষকগণ হাতা লইয়া, আর অন্যান্য ভৃত্যবর্গ যে যাহা পাইল, তাহাদ্বারা পদ্ম-মুচিনীর সেবা করিতে লাগিল। একা গুইরাম হইলে পদ্ম-মুচিনী তাহাকে গ্রাহ্য করিত না, কিন্তু এই সপ্তরথীর হাত হইতে উদ্ধারের আর উপায় নাই দেখিয়া সে ছুটিয়া গিয়া একজন শ্বেতশ্মশ্রুধারী স্থূলকায় সন্ন্যাসীর পদতলে লুটাইয়া পড়িল এবং ওষ্ঠাগত প্রাণটুকু ভিক্ষা চাহিল। সন্ন্যাসী উভয় বাহু প্রসা-রিত করিয়া বিপন্নাকে রক্ষা করিতে করিতে সকলকে নিরস্ত হইতে বলিলেন। এমন-সময় তাহাদের চীৎকার-কোলাহল শ্রবণ করিয়া স্বয়ং ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় তথায় উপস্থিত হইলেন।

৩

চৌধুরী মহাশয়কে দেখিয়া পরিচারক-বর্গ সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইলে, তিনি কোলাহলের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গুইরাম তখন সাহসে ভর করিয়া কর্ত্তাকে প্রণাম করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত একে একে বলিতে লাগিল। গুইরামের নিকট সমস্ত শুনিয়া চৌধুরী মহাশয় ক্ষোভে, লজ্জায় ও পরিতাপে মস্তকে করাঘাত করিয়া বলিলেন—"হারামজাদি, সর্ব্বনাশ করেছিস্! তুই জাত ভাঁড়ালি কেন? তুই তোর জাতের পরিচয় দিলেও আমি তোকে তোর উপযুক্ত চাক্‌রির বন্দোবস্ত করিয়া দিতাম। তুই অবলা স্ত্রীলোক, তা না হ'লে আজ তোর মাথা কেটে ফেল্‌তেম। স্ত্রীলোক অবধ্য বলিয়াই তুই বাঁচিয়া গেলি।" এই বলিয়া তিনি সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বাবা, আপনি সাধুপুরুষ, এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত করিব বলিয়া দিন। আমি প্রাণ দিয়াও তাহা করিব। হায় হায়, এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? আপনি আমাকে যথাকর্ত্তব্য উপদেশ দিয়া রক্ষা করুন।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসীর পদে লুটাইয়া পড়িলেন। তখন সন্ন্যাসী ভূপতিত গৃহ-স্বামীকে উঠাইয়া আশ্বস্ত হইতে বলিয়া বলি-লেন—"বাবা, আমি সন্ন্যাসী। প্রায়শ্চিত্তের বিধান প্রদানে অশক্ত। এ বিষয়ে তোমার সমাজ ও সমাজপরিচালক স্মার্ত্ত পণ্ডিত-গণের উপদেশ গ্রহণ কর। এক্ষণে আমার মতে এই হতভাগিনীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া সমস্ত মৃৎপাত্র পরিত্যাগ কর। ধাতুপাত্র পরিমার্জ্জন কর ও সকলে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া এই অতিথিশালা ও এই নারীদ্বারা স্পৃষ্ট দ্রব্যাদি গঙ্গাজলে অথবা গোময়দ্বারা সংস্কৃত করাইয়া লও। ঐ দুষ্টার যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে, উহাকে ছাড়িয়া দাও। তোমার অনুচরবর্গ ও অতিথিগণ, যাহারা অজ্ঞাতে ঐ দুষ্টা-কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট জল পানাদি করিয়াছে, তাহাদের শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যয় তুমিই বহন কর। কেন না, তুমি দ্বিতীয় অপরাধী। দেব-সেবায় অথবা অতিথিসেবায় অজ্ঞাত-কুলশীলাকে নিযুক্ত করিয়াছিলে। তোমার সমাজের নেতাদিগকেও এই পাপের সামা-

ক্তিক দণ্ড কি, জিজ্ঞাসা করিয়া তাহা গ্রহণ কর, ইহাই আমার পরামর্শ।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, "আপনারা সাধুপুরুষ, মুক্তাত্মা, দেবতাবিশেষ—আপনারা সমাজকে ভয় করেন না, কিন্তু আমরা সমাজের দাস। শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলেও সমাজ আমাকে সহজে ক্ষমা করিবে না। যাহা হউক, এক্ষণে আপনার আদেশমত সমস্ত প্রতিপালিত হইবে।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "এই বৃদ্ধ চর্ম্মকারকে পুরস্কার দেওয়া উচিত। কারণ এ-ই আপনাকে অজ্ঞানকৃত পাপ ধরাইয়া দিয়া অধিক পাপানুষ্ঠান হইতে বিরত করিয়াছে।"

সন্ন্যাসীর কথায় চৌধুরী মহাশয় গুইরামকে সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়া তাহাকে একশত মুদ্রা প্রদান করিলেন। গুইরাম আনন্দে উন্মত্ত হইয়া চৌধুরী মহাশয়কে বলিল, "বাবা, আপুনি ছেরঞ্জীবী হও, আজা হও, নক্ষীশ্বর হও। তুমি বামুন, আমি উইদাস, তোমাকে আমি কি বলে' আশীর্ব্বাদ করবো। আজ আপুনি যেমন আমাকে চরণে থান দিলে, এমনি যত গরিবদুঃখী লোক যেন তোমাকে চরণে আকে।"

বৃদ্ধের আশীর্ব্বাদ শুনিয়া এত বিষাদেও চৌধুরী মহাশয় হাসিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। বৃদ্ধ আর স্বগ্রামে গেল না। বরাবর ছবির ভেড়িতে ভাগিনেয়ের নিকট চলিয়া গেল। হরি-কামারণী ওরফে পদ্মমুখী ওরফে পদী মুচিনী কোথায় গেল এবং গুইরাম ভাগিনেয়ের পরামর্শে আর বিবাহ করিয়াছিল কি না, তাহার প্রামাণিক ইতিহাস সংগ্রহে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ উদাসীন আছেন।

৪

ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। তাঁহার অনুচরগণও সকলেই প্রায়শ্চিত্তের খরচ লইল এবং কেহ কেহ প্রায়শ্চিত্তও করিল। এই প্রায়শ্চিত্ত-ব্যাপারে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয়িত হইল। আবার তাঁহার অতিথিশালায় প্রত্যহ অতিথি আসিতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে চৌধুরী মহাশয় নিষ্কৃতি পাইলেন না। শাস্ত্রসম্মত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও সমাজকে সহজে সম্মত করাইতে পারিলেন না।

ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বহুকাল পূর্ব্ব হইতে চন্দননগরের গোঁদলপাড়ায় হালদার-মহাশয়রা বিশেষ ধনবান্, ক্ষমতাশালী ও সমাজপতি বলিয়া খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আসিতেছিলেন। ইন্দ্রনারায়ণের অভ্যুদয়ের কিছু পূর্ব্ব হইতে এই হালদার-দিগের অবস্থা হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়িতেছিল। প্রকাণ্ড অট্টালিকা এবং প্রকাণ্ড স্থূলোদর সত্ত্বেও গ্রামের লোকে বলাবলি করিত—"হালদার-মহাশয়-দিগের আর তেমন বোলবোলাও নাই, ভাঙা পড়িয়া আসিতেছেন।" এমন-সময় একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণবালক নিজ অসাধারণ প্রতিভায় ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের দেওয়ানপদে উন্নীত হইলেন। ইনিই প্রাতঃস্মরণীয় ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। রাজারাম নামে ইন্দ্রনারায়ণের এক অগ্রজ সহোদর ছিলেন, তিনিও পরে মুরশিদাবাদে নবাবসরকারে একটি ভাল পদে প্রতিষ্ঠিত হন। উভয় ভ্রাতায় একত্র থাকিয়া যথেষ্ট ধনোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং

অল্পদিনের মধ্যে প্রাচীন হালদারগোষ্ঠীকেও ক্রিয়াকর্ম্মে ও দানধ্যানে সূর্য্যোদয়ে শশাঙ্কের ন্যায় নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিলেন।

এরূপ অবস্থায় যে প্রাচীন বুনিয়াদী-বংশজাত হালদারগণ স্বনামখ্যাত ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর প্রতি ঈর্ষাপূর্ণ কটাক্ষপাত করিবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণ ফরাসী গভর্ণমেণ্টের দেওয়ান, সুতরাং হালদারগণ তাঁহাকে একটু ভয়ও করিতেন। বিশেষত ইন্দ্রনারায়ণ অত্যন্ত উন্নতমনা ও নির্ব্বিরোধী লোক ছিলেন। সেইজন্য ইচ্ছাসত্ত্বেও হালদারগণ তাঁহাকে কোনও প্রকারে বিপাকে ফেলিতে পারেন নাই। এক্ষণে এই পদ্ম-মুচিনী-সংক্রান্ত সূত্র পাইয়া তাঁহারা ইন্দ্রনারায়ণকে অপদস্থ করিবার উপায় দেখিতে পাইলেন। অনুচর-মুখে হালদারবাবুরা শুনিলেন যে, ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী জানিয়া-শুনিয়া এক রূপযৌবন-শালিনী চর্ম্মকাররকন্যাকে স্বীয় গৃহে পরিচারিকারূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার স্বামী জানিতে পারিয়া স্বীয় পত্নীকে লইয়া গিয়াছে। ইন্দ্রনারায়ণ এই চর্ম্মকারকন্যার হস্তে জল ও তাম্বুল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেন। হালদারদিগের অনুগ্রহে অবশেষে কথাটা প্রকারান্তরে চৌধুরী মহাশয়ের চরিত্রে নানাপ্রকার কুৎসা ছড়াইতে ছড়াইতে গৃহ হইতে গৃহান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী "এক-ঘরে" বা সমাজচ্যুত হইলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন আলিবর্দ্দী খাঁ বাংলার নবাব। তখন ক্রোরপতিকেও সমাজপতির নিকট মস্তক নত করিতে হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হালদারগণ গোষ্ঠীপতি ও সমাজপতি ছিলেন। তাঁহাদের নিষেধে কোনও সদ্ব্রাহ্মণ চৌধুরীবাটীতে অন্নজলাদি গ্রহণ করিতে সাহস করিলেন না। ইন্দ্রনারায়ণ অধিকতর ধনশালী হইলেও সমাজের নিকট মস্তক নত করিলেন। চন্দননগর এবং তন্নিকটবর্ত্তী অধিকাংশ স্থানের স্বভাব-কুলীন ব্রাহ্মণগণ হালদারগণের সহিত কুটুম্বিতাসূত্রে বদ্ধ। ইন্দ্রনারায়ণ ক্রিয়া-কর্ম্ম উপলক্ষে স্বগ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণের সাহায্য পাইলেন না।

এই সময় পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী ভূরসুট পরগণার জমীদার স্বনামখ্যাত মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় বর্দ্ধমানাধিপতির ক্রোধানলে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অবশেষে প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া চন্দননগরে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইন্দ্রনারায়ণ অতিযত্নে কবিবরকে স্বগৃহে আশ্রয়প্রদান করিলেন, কিন্তু চৌধুরী মহাশয়ের এই জাতীয় অপবাদ থাকাতে কবি তাঁহার বাটীতে আহারাদি করিতেন না। ওলন্দাজ কোম্পানির দেওয়ান গোঁদলপাড়ানিবাসী রামলোচন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে তিনি আহারাদি করিতেন এবং ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বাটীতে অবস্থান করিতেন।

৫

যাঁহারা ভারতচন্দ্রের জীবনী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞাত আছেন যে, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সময়-সময় আট-দশ লক্ষ টাকা ঋণ করিবার জন্য চন্দননগরে

ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বাটীতে আগমন করিতেন। মহারাজা যখন চন্দননগরে আসিতেন, তখন তিনি চৌধুরী মহাশয়ের প্রাসাদে অবস্থান করিতেন। হালদারগণ নিজ সমাজের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেও নবদ্বীপাধিপতির নিকট তৃণবৎ, তাহার আর সন্দেহ নাই। বিশেষত সমগ্র বঙ্গদেশের শীর্ষস্থান নবদ্বীপের সমাজপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র চন্দননগরের ক্ষুদ্র সমাজের ঈর্ষা-জনিত কলহবিবাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন, ইহা মনে করাও বাতুলের কর্ম্ম।

ভারতচন্দ্রের অনুরোধে একদিন ইন্দ্র-নারায়ণ কবিবরকে মহারাজার নিকট পরি-চিত করিয়া দিলেন। গুণগ্রাহী মহারাজা মুহূর্ত্তমধ্যে বুঝিতে পারিলেন যে, ভারতচন্দ্র "ভারতচন্দ্র"ই বটেন। অনন্যসাধারণ-প্রতিভা-শালী কবিবর মহারাজার অনুরোধে মুখে মুখে যে সকল কবিতা রচনা করিতে লাগি-লেন, তাহা বিশেষ প্রতিভাশালী কবিরাও রচনা করিতে পারিলে গর্ব্ব অনুভব করি-তেন। মহারাজা যতই কবির সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার গুণপনায় মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। বাংলা, সংস্কৃত এবং ফারষী, এই তিন ভাষাতেই কবি পরমপণ্ডিত। রাজার কৌতূহল যতই উত্তেজিত হইতে লাগিল, তিনি ততই কবির নূতন নূতন কবিতা শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভারতচন্দ্রও কখনও বাংলায়, কখনও ফারষীতে, কখনও সংস্কৃতে এবং কখনও বা তিন ভাষা একত্র করিয়াই কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন। রাজার মনে হইল, বুঝি স্বয়ং দেবী সরস্বতী কবির জিহ্বায় অধিষ্ঠিত হইয়া বীণাসহযোগে গান করিতেছেন।

মহারাজার মনে একটি বড় সদিচ্ছা ছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, রাজা বিক্রমাদিত্য যেমন সমস্ত ভারতের পণ্ডিত-গণের মধ্য হইতে নয়টি অত্যুজ্জ্বল রত্ন লইয়া নিজের সভার শোভা সম্পাদন করিয়া স্বয়ং চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন, তিনিও সেইরূপ সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর আশ্রয় হইয়া পণ্ডিত-সমাজ নবদ্বীপের রাজসভায় নবরত্ন আহরণ করিয়া জীবন সার্থক করিবেন। ফলত পুরা-কালে মধ্যভারতে মহারাজ বিক্রমাদিত্য এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে পূর্ব্বভারতে নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যেরূপ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, এরূপ বিদ্যোৎসাহী নৃপতি ভূমণ্ডলে আর কখনও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না, সন্দেহ। মহারাজার নিতান্ত ইচ্ছা হইল যে, এই অমূল্যরত্ন মহাকবি ভারতচন্দ্রকে নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার আশা ফলবতী করিবেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে অনেক কবিকেই আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া নবদ্বীপে সংস্থা-পিত করিয়াছিলেন, কিন্তু বিক্রমাদিত্যের কালিদাসের ন্যায় এমন স্বভাবকবি তাঁহার রত্নমালামধ্যে এ পর্য্যন্ত গ্রথিত হয় নাই। তিনি ভারতচন্দ্রকে বঙ্গদেশের কালিদাসের পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু পাছে চৌধুরী মহাশয় এই আশ্রিত ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা না করেন, এই ভয়ে নিজের ইচ্ছা নিজের মধ্যেই দমন করিয়া রাখিলেন।

৬

ভাগীরথীবক্ষে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বাঁধা-

ঘাটে মহারাজার প্রকাণ্ড বজরা বাঁধা রহিয়াছে। বজরার বর্ণনা যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে "দেবী চৌধুরাণীর" বজরার বর্ণনা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। রাজার বজরার উপর ৩।৪জন সশস্ত্র সিপাহী বন্দুক ঘাড়ে করিয়া চিত্রিত পুত্ত-লিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বজরার ভিতরের সকল কক্ষই উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত।

তাহারই একটি কক্ষের মধ্যে বহুমূল্য বিছানার উপর মহারাজা ও ইন্দ্রনারায়ণ সমা-সীন রহিয়াছেন। কক্ষমধ্যে আর কেহ নাই। অতি মৃদুস্বরে উভয়ের কথাবার্ত্তা হইতেছে। রাজার নিকট একটি স্বর্ণনির্ম্মিত মুক্তাধার ও স্বর্ণমণ্ডিত হংসপুচ্ছলেখনী পড়িয়া আছে। তখন ইংরাজ বণিক্‌গণ এ দেশে খাগ্‌ড়া ও কঞ্চির পরিবর্ত্তে হংসপুচ্ছলেখনীর ব্যবহার প্রচার করিয়াছেন। ২।৩দণ্ড কথাবার্ত্তার পর মহারাজা একখণ্ড কাগজ লইয়া তাহাতে লিখিলেন :—

শ্রীশ্রী৺জগদ্ধাত্রী
মাতা সহায়।—

৺ধর্ম্ম ইসাদি।—

স্বধর্ম্মবৎসল ধার্ম্মিকবর অশেষগুণিগণ-গণনাগ্রগণ্য স্বনামখ্যাত পুরুষবর শ্রীল শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ফরাসী কোম্পানী বাহাদুরের সদর দেওয়ান মহাত্মা মহাশয় সুচরিতেষু।—

নবাব নাজিম সাহেবের দপ্তরখানায় বর্ত্তমান শকের রাজস্ববাবদ আমি আপন-কার নিকট সাড়েসাতলক্ষ তঙ্কা কর্জ্জ লইয়া এই খৎ লিখিয়া দিলাম। বৎসরের মধ্যে ইহা মায় সুদ পরিশোধ করিব, ইহাতে অন্যথা হইবে না। ইহার কারণ ধর্ম্ম সাক্ষী ইতি।—

রায় রাজশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মণঃ।"

খৎ লিখিয়া রাজা যথারীতি স্বীয় নামা-ঙ্কিত মোহর অঙ্কিত করিয়া ২।৩বার ভাল করিয়া পড়িয়া চৌধুরী মহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন। চৌধুরী মহাশয় সসম্মানে উহা গ্রহণ করিয়া একবার পাঠ করিলেন এবং ললাটে স্পর্শ করাইয়া সযত্নে উত্তরীয়-প্রান্তে বাঁধিয়া রাখিলেন।

এমন-সময় ফরাসীদুর্গ "দে অর্লিয়া" হইতে কামানের শব্দ হইল। রাজা ঈষৎ চমকিত হইয়া উঠিলেন। চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, "রাত্রি একপ্রহর অতীত হইল।" পরে উভয়ে বজরা হইতে কূলে অবতরণ করিয়া শ্যামশষ্পাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ডে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ২জন সিপাহি নিঃশব্দে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল।

জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে গঙ্গার তীরে নবদূর্ব্বামণ্ডিত ক্ষেত্রে তাঁহারা নিঃশব্দে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। নানাকথার পর মহারাজা বলিলেন—"চৌধুরী মহাশয়, আজকাল আপনাকে প্রায় বিমর্ষ দেখি কেন? কোনপ্রকার শারীরিক বা মানসিক পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন কি?"

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রনারা-য়ণ বলিলেন, "মহারাজ, আপনার জনক-জননীর শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে শারীরিক কোনও পীড়া নাই, কিন্তু সম্প্রতি একটা সামাজিক কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া বড় ক্ষুণ্ণ হইয়াছি।"

"আমি আপনার এই সামাজিক নিগ্রহের কথা শ্রবণ করিয়াছি। হালদারমহাশয়েরা এই কাণ্ড করিতেছেন বলিয়া অনুমান হয়।"

"সকলি বিধাতা করিতেছেন, হালদারদের দোষ কি?"

"আপনি ত যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন?"

"সাধ্যমত সে বিষয়ে ত্রুটি করি নাই।"

"এক্ষণে কি করিতে মনস্থ করিয়াছেন?"

"কিছুই স্থির করিতে পারি নাই, অথচ এরূপ সমাজচ্যুত হইয়া থাকা বিড়ম্বনামাত্র। বিধাতা আমার প্রতি নিতান্তই বাম হইয়াছেন—"

"আপনাকে বিধাতা নিতান্তই সদয়।"

বাধা দিয়া ইন্দ্রনারায়ণ কহিলেন—"আমি আপনার কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। বিধাতা আমার প্রতি সদয়, কিসে জানিতে পারিলেন?"

"আপনি প্রায়শ্চিত্তের জন্য কোথা হইতে ব্যবস্থা আনাইয়াছিলেন?"

"চন্দননগরের নিকটবর্ত্তী সমস্ত স্মার্ত্ত অধ্যাপক ও আপনার নবদ্বীপ এবং মিথিলা হইতেও ব্যবস্থা আনাইয়াছিলাম।"

"তাঁহারা শাস্ত্রে পণ্ডিত, শাস্ত্রসম্মত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়াছেন, সামাজিক ব্যবস্থা তাঁহারা কোথায় পাইবেন? এ বিষয়ে সামাজিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা উচিত।"

রাজার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চৌধুরী মহাশয় সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সামাজিক ব্যবস্থা কিপ্রকার? কোথায় সে ব্যবস্থা পাইব?"

বাধা দিয়া রাজা বলিলেন—"আমি নবদ্বীপের সমাজপতি, সামাজিক ব্যবস্থা আমি দিব।" এই বলিয়াই সহাস্যে বলিলেন, "নবদ্বীপের অধ্যাপকেরা তৈলবট না পাইলে ব্যবস্থা দেন না—আমারও তৈলবট চাই।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, "মহারাজ, আপনি সমস্ত বঙ্গদেশের মধ্যে অদ্বিতীয় ব্যক্তি, আপনাকে তৈলবট আমি কি দিব? আমার যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও আমি আমার লুপ্ত সামাজিক মর্য্যাদা পাইতে প্রস্তুত আছি।"

রাজা আবার সহাস্যে বলিলেন—"সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতে হইবে না—তৈলবটের কথা পরে হইবে—এক্ষণে আমার পরামর্শে আপনি অচিরেই সমাজপতি হইতে পারিবেন। ভগবতী আপনাকে যেমন অতুল ধন ও সম্মানের অধিপতি করিয়াছেন, সেইপ্রকার সর্ব্ব-সুলক্ষণ-সম্পন্না চারিটি কন্যাও দিয়াছেন। আপনি শ্রোত্রীয়, অবিলম্বে চারি মেলের চারিজন গুণবান্ প্রতিপত্তিশালী স্বভাবকুলীনের সন্তান আনিয়া আপনার কন্যাচতুষ্টয়কে সম্প্রদান করুন। চারি মেলের চারিজন কুলীনের সন্তান আপনার অনুগত থাকিলে আপনিই স্বতন্ত্র দল বাঁধিতে পারিবেন। আপনার জামাতার জ্ঞাতিকুটুম্বগণকেও আপনার আনুগত্য স্বীকার করাইবেন, তাহা হইলেই আপনি অচিরে সমাজমধ্যে পূজনীয় হইবেন। আমার মতে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুব্যবস্থা।"

ব্যবস্থা শুনিয়া ইন্দ্রনারায়ণ হাতে স্বর্গ পাইলেন। তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে যেন একখানা যবনিকা সরিয়া গেল। তাঁহার

সামাজিক উন্নতির উপায় তাঁহার গৃহেই বর্ত্তমান, অথচ এতদিন তিনি তাহা দেখিতে পান নাই! রাজার এই যুক্তিপূর্ণ ব্যবস্থা পাইয়া তিনি কৃতার্থ হইলেন।

৭

পরদিনই চৌধুরী মহাশয়ের অনুমতি পাইয়া চারিদিকে ঘটক ছুটিল এবং অল্পকালমধ্যেই রূপে, গুণে ও কুলে সর্ব্বাংশেই মনোমত পাত্র প্রাপ্ত হইলেন। ফুলিয়া, খড়দহ, বল্লভী ও সর্ব্বানন্দী, কুলীনদিগের এই চারি শ্রেষ্ঠ মেলের চারিটি পাত্র আনাইয়া তিনি একদিনে আপনার কন্যাচতুষ্টয়কে সম্প্রদান করিলেন। পাত্রগণের সহিত তাঁহাদের আত্মীয়-জ্ঞাতিকুটুম্বগণও সমাগত হইলেন। চারি স্থানের চারিটি বর বরযাত্রী সহ একত্র সমাগত হওয়াতে চৌধুরী মহাশয়ের বাটী লোকে লোকারণ্য হইল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সমস্ত নবদ্বীপসমাজের প্রভিভূ হইয়া উপস্থিত হইলেন। নবদ্বীপ হইতে অসংখ্য পণ্ডিত এবং রাজকর্ম্মচারী মহারাজার সহিত উপস্থিত হইলেন। চৌধুরী মহাশয় স্বগ্রামস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণকেই নিমন্ত্রণ করিলেন এবং বাটীতে পদরেণু দিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ-প্রকাশও করিলেন। হালদার-মহাশয়গণও নিমন্ত্রণে বাদ পড়িলেন না, কিন্তু তাঁহারা এই সমারোহব্যাপারে যোগদান করিলেন না। সুতরাং তাঁহাদের আত্মীয়-কুটুম্বগণও কেহ আসিলেন না। কিন্তু তাঁহারা না আসিলেও নিমন্ত্রিতের অভাব হইল না।

যথারীতি বিবাহ সমাধা হইল। অন্যূন তিনসহস্র ব্রাহ্মণসন্তান সে রাত্রে চৌধুরী-বাটীতে জলপান করিলেন। রাজার ব্যবস্থাগুণে ইন্দ্রনারায়ণ আবার নূতন দল বাঁধিবার সূত্র খুঁজিয়া পাইলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে ভাট, ভিখারী, রারোয়ারীর পাণ্ডা ইত্যাদি সকলে চৌধুরী মহাশয়ের নিকট নিজ নিজ প্রাপ্য অংশ আদায় করিতে আসিয়া সকলেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া প্রস্থান করিল। চৌধুরী মহাশয় প্রত্যেক জামাতাকেই স্বীয় আবাসবাটীর সন্নিকটে এক একখানি বাটী এবং বাগান যৌতুক দিয়া তাহাতে বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। ভাট-ভিখারী বিদায় হইলে মহারাজা সহাস্যে চৌধুরী মহাশয়কে বলিলেন—"মহাশয়, আমার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া আপনার মনস্কাম পূর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে আমাকে তৈলবট প্রদান করিয়া অঋণী হউন।"

"মহারাজ, আপনাকে আমার অদেয় কি আছে? কি আজ্ঞা হয়, বলুন।"

রাজা তখন মহাকবি ভারতচন্দ্রের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন—"অনেকদিন হইতে নবরত্নে সভা সাজাইব বাঞ্ছা ছিল, কিন্তু কালিদাসের অভাবে আমার অভীষ্ট পূর্ণ হয় নাই। এক্ষণে এই কবিরত্ন ভারতচন্দ্রকে আমায় অর্পণ করুন, আমি ইঁহাকে নবদ্বীপে লইয়া গিয়া আমার সভা ও নবদ্বীপের মুখ উজ্জ্বল করি।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন- "কবিবর আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং আমি উঁহাকে ধর্ম্মত পরিত্যাগ করিতে পারি না। তবে উঁহার উপর আমার কোনও অধিকার নাই, যদি কবি স্বেচ্ছায়

আমাকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমার বিবেচনায় আপনার ন্যায় গুণগ্রাহী মহারাজার আশ্রয়ই মহাকবির পক্ষে উপযুক্ত। নবদ্বীপাধিপতির আশ্রিত লোক বর্দ্ধমানাধিপতির ক্রোধানলে ভস্ম হইবেন না।"

তখন কবিবর রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"হে রাজরাজেশ্বর, বহুকালের মনোবাঞ্ছা আজ আপনি পূর্ণ করিলেন। চৌধুরী মহাশয় যথার্থই আজ্ঞা করিয়াছেন যে, মহারাজার ন্যায় গুণগ্রাহী মহাত্মাই আমার ন্যায় সামান্য দরিদ্র কবির আশ্রয়দাতা। আমি আজ হইতে আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী অনুচর হইলাম।"

রাজা স্বীয় কণ্ঠ হইতে রত্নমাল্য উন্মোচনপূর্ব্বক কবির কণ্ঠে সংস্থাপন ও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "পুরাকালের কবিদিগের অনুগ্রহে যেমন রাজারা গ্রন্থমধ্যে অমর হইয়া আছেন, আপনার অনুগ্রহে আমিও সেইপ্রকার গৌড়ীয় ভাষার কবিতামধ্যে অমর হইয়া থাকিব, তাহার আর সন্দেহ নাই।

* * * * *

ভারতচন্দ্র নবদ্বীপের রাজকবি, রাজবয়স্য এবং রাজসখা হইলেন। মহারাজা তাঁহাকে "রায় গুণাকর" উপাধি দিলেন, তিনিও স্বরচিত অন্নদামঙ্গলে মহারাজকে অমরত্ব প্রদান করিলেন।

হালদারমহাশয়েরা দেখিলেন, চৌধুরীবংশের উন্নতি বিধাতার অভিপ্রেত, সেইজন্য তাঁহারা আর চৌধুরীদিগের বিপক্ষতাচরণ করিলেন না। এইসময় ছকড়িবাবু নবাবের অজ্ঞাতে অনেকগুলি জমি শেওড়াফুলির রাজাদিগকে পত্তনি দিলে নবাব পরে তাহা জানিতে পারিয়া ছকড়িবাবুর প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। ইন্দ্রনারায়ণ এই সংবাদ অবগত হইয়া ফরাসী কোম্পানীর দ্বারা অনুরোধ করাইয়া হালদারমহাশয়ের প্রাণ ও প্রতিষ্ঠা রক্ষা করেন। ইন্দ্রনারায়ণকর্ত্তৃক প্রাণ পাইয়া প্রত্যুপকারস্বরূপ ছকড়িবাবু নিজ কন্যার সহিত ইন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠপুত্র বলরাম চৌধুরীর বিবাহ দেন এবং যৌতুকস্বরূপ ১০০১বিঘা জমি ও গোষ্ঠীপতিত্বরূপ সামাজিক সম্মান জামাতাকে প্রদান করেন। ঐ হাজার-বিঘা জমি আজিও "বলরাম-বাটী" নামে বিখ্যাত। শুদ্ধশ্রোত্রীয়গণ কুলীনপুত্র ভিন্ন অপরকে কন্যাদান করেন না, কিন্তু বলরাম চৌধুরী শ্রোত্রীয়, সেইজন্য তাঁহাকে কন্যাদান করিয়া ছকুবাবু তাঁহার কুলগৌরব কিছু ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বংশধরগণ চন্দননগর হইতে লোপ পাইয়াছেন। ২।১জন ইতস্তত চন্দননগরের বাহিরে বাস করিতেছেন। ইন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠ রাজারামের বংশ এখনও চন্দননগরে বিদ্যমান আছেন এবং তাঁহারাই এক্ষণে গোষ্ঠীপতি। ইন্দ্রনারায়ণের প্রতিষ্ঠিত এক নাটমন্দির এবং "চৌধুরীর ঘাট" নামে বিখ্যাত গঙ্গার ঘাট এখনও বর্ত্তমান আছে। পলাশীর যুদ্ধের কিছুকাল পূর্ব্বে ইন্দ্রনারায়ণ কালগ্রাসে পতিত হন।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

দুর্ভাগা।

পথের পথিক করেছ আমায়
সেই ভালো, ওগো সেই ভালো!
আলেয়া জ্বালালে প্রান্তরভালে
সেই আলো মোর সেই আলো!
ঘাটে বাঁধা ছিল খেয়া-তরি,
তাও কি ডুবালে ছল করি'?
সাঁতারিয়া পার হব বহি ভার,
সেই ভালো মোর সেই ভালো!

ঝড়ের মুখে যে ফেলেছ আমায়
সেই ভালো, ওগো সেই ভালো!
সব সুখজালে বজ্র জ্বালালে
সেই আলো মোর সেই আলো!
সাথী যে আছিল নিলে কাড়ি',
কি ভয় লাগালে, গেল ছাড়ি!
একাকীর পথে চলিব জগতে
সেই ভালো মোর সেই ভালো!

কোনো মান তুমি রাখনি আমার
সেই ভালো, ওগো সেই ভালো!
হৃদয়ের তলে যে আগুন জ্বলে
সেই আলো মোর সেই আলো!
পাথেয় যে ক'টি ছিল কড়ি
পথে খসি' কবে গেছে পড়ি',
শুধু নিজবল আছে সম্বল
সেই ভালো মোর সেই ভালো!

সার সত্যের আলোচনা।

আত্মা হইতে সত্যে উপসংক্রমণ।

বিগত প্রবন্ধের শেষভাগে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল এই যে, প্রকৃত আত্মজ্ঞান সাধকের পক্ষে কতদূর সম্ভাবনীয়—কি প্রকারেই বা সম্ভাবনীয়? এই প্রশ্নটিকে আগে ভাল করিয়া খুলিয়া-বালিয়া নির্ব্বাচন করা যা'ক, তাহার পরে তাহার মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করা যাইবে।

প্রশ্নটির প্রকৃত তাৎপর্য্য এই :—

যিনি জানিতেছেন তিনি জ্ঞাতা এবং যাঁহাকে জানা হইতেছে তিনি জ্ঞেয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যিনি জানিতেছেন, তাঁহাকে জানা কি প্রকারে সম্ভাবনীয়? জ্ঞাতাকে জ্ঞেয় করা কি প্রকারে সম্ভাবনীয়? জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের একীকরণ কি প্রকারে সম্ভাবনীয়?

ইহার সোজা উত্তর এই যে, জলে সাঁতার দেওয়া তোমার পক্ষে কতদূর সম্ভাবনীয় তাহা যদি তুমি জানিতে চাও, তবে অন্তত এক-কোমর জলে নাবিয়া হাত-পা ছুঁড়িতে আরম্ভ কর—তাহা হইলেই সঙ্কল্পিত কার্য্যটির সম্ভাবনীয়তার সম্বন্ধে ক্রমে তোমার চক্ষু ফুটিবে; তাহা না করিয়া তুমি ডাঙার দাঁড়াইয়া "আগে মাথা উঁচা করিব কি আগে হাত ছুঁড়িব" "আগে হাত ছুঁড়িব কি আগে পা ছুঁড়িব" এইরূপ নানাবিধ প্রণালীর মধ্যে কোন্‌টি সবিশেষ ফলদায়ক, তাহার পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া মাথা ঘুরাইয়া সারা হইতেছ—কাজেই জলে সাঁতার দেওয়া যে কতদূর সম্ভাবনীয় সে বিষয়ে কিছুতেই তোমার মনের ধন্দ মিটিতেছে না। তাই বলি যে, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের একীকরণ কতদূর সম্ভাবনীয়, তাহা জানিতে হইলে তাহা ভাবিয়া দেখা অপেক্ষা করিয়া দেখাই সহজ উপায়। কিন্তু তাহা করিয়া দেখিবার পূর্ব্বে একটি বিষয় সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। কোনো নূতন ব্রতী যদি সাঁতার শিখিবার মানসে জলে নাবিতে উদ্যত হ'ন, তবে সম্মুখবর্ত্তী জলের প্রকৃতি অবগত হইয়া সেরূপ কার্য্যে সাবধানতার সহিত প্রবৃত্ত হওয়াই তাঁহার পক্ষে উচিত। যে স্থানটিতে তিনি নাবিতে ইচ্ছা করিতেছেন, সেখানে এক-হাঁটু জল, কি এক-কোমর জল, কি অগাধ জল, তাহার সবিশেষ সন্ধান লওয়া তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। আত্ম-জ্ঞানের সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াই যদি অভিনব ব্রতী এমন এক স্থানে পদ-সংক্রমণ করেন—যেখানে থই পাওয়া যায় না, তবে তিনি দুই পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই পদ-স্খলিত হইয়া বিপদে পড়িবেন—তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। অতএব আত্মজ্ঞানের সাধনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আত্মাকে কোন্ স্থানে ধরিতে হইবে, তাহার সন্ধান লওয়া সাধকের প্রথম কর্ত্তব্য, তাহাতে আর ভুল নাই।

জ্ঞাতার ঠিকানা-নির্দ্দেশ।

ছুঁচের আগা দিয়াই কাঁথ ফোঁড়া হইয়া থাকে—ছুঁচের আগা দিয়াই কাপড় সেলাই

করা হইয়া থাকে—ছুঁচের আগাটিই ছুঁচের মুখ্য অঙ্গ, তাহা আমি জানি; কিন্তু ছুঁচের আর-সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাদে শুদ্ধকেবল তাহার ঐ মুখ্য অঙ্গটি, শুদ্ধকেবল তাহার আগামাত্রটি, আমাকে আনিয়া দেও দেখি—তাহা যদি তুমি আমাকে আনিয়া দিতে পারো, তবেই বলিব যে, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় বাদে শুদ্ধকেবল জ্ঞাতামাত্রকে জ্ঞানের উপলব্ধি-গোচরে আনয়ন করা সম্ভবে। কিন্তু ছুঁচের শুদ্ধকেবল আগামাত্রটি ধরিতে-ছুঁতে পাইবার বস্তু নহে—তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। তাহা ধরিতে-ছুঁতে পাইবার বস্তু নহে—কেন? না, যেহেতু তাহা একটি জ্যামিতিক বিন্দুমাত্র। জ্যামিতিক বিন্দুর থাকিবার মধ্যে আছে কেবল স্থিতি (position); তা বই তাহার আয়তন (magnitude) নাই; আয়তন যখন নাই, তখন কাজেই তাহা ধরিতে-ছুঁতে পাইবার বস্তু নহে। "যিনি দৃশ্য বস্তু দেখিতেছেন" এতথানি কথা বলিলে তবে তাহার মধ্য হইতে দ্রষ্টা-শব্দের অর্থ টানিয়া বাহির করা যাইতে পারে। যিনি'র একটি বাহন হ'চ্ছে দৃশ্য-বস্তু এবং আর-একটি বাহন হ'চ্ছে "দেখিতেছেন" অর্থাৎ দর্শনক্রিয়া; যিনি'র এই দুইটি বাহন-বাদে শুদ্ধকেবল যিনি-মাত্রটি নিঃসঙ্গ জ্যামিতিক বিন্দুরই সহোদর ভ্রাতা, তাহা ধরিতে-ছুঁতে পাইবার বস্তু নহে। একজন রাজচক্রবর্ত্তী, যিনি রাজকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, তিনিও তিনি, আর, একজন গরিব ব্রাহ্মণ, যিনি রাজদ্বারে আতিথ্য যাচ্ঞা করিতেছেন, তিনিও তিনি। ও-তিনি হইতে রাজকার্য্য এবং এ-তিনি হইতে যাচ্ঞা-কার্য্য বাদ দিলে দুই তিনির অনেকটা ভার-লাঘব হয়, তাহাতে আর ভুল নাই; কিন্তু যদি ঐরূপ প্রণালীতে দুই তিনির মধ্য হইতে দোঁহার সমস্ত কার্য্য এবং সমস্ত গুণ বাদ দিয়া নিঃসম্বল তিনি-দুটিকে আলোচনা-ক্ষেত্রে উপস্থিত করানো যায়, তাহা হইলে দুয়ের মধ্যে কোনো প্রভেদই দর্শকের নয়নগোচর হইতে পারে না। কেন না, সে তিনি যে কোন্ তিনি—রাজকার্য্যের কর্ত্তারূপী মহা-তিনি অথবা ভিক্ষা-কার্য্যের কর্ত্তা-রূপী ক্ষুদ্র তিনি—তাহা তাঁহার গায়ে লেখা নাই; তাহা যখন নাই, তখন কাজেই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ নির্দ্দেশ করিতে পারা কাহারো কর্ত্তৃক সম্ভবে না। সুষুপ্তির অবস্থায় রাজাধিরাজ মহারাজ এবং ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্র চাসা দোঁহারই পদবী সমান—সে অবস্থায় দোঁহার দুই আত্মার মধ্যে সরিষা-ভোর প্রভেদেরও স্থানাভাব। অতএব এটা স্থির যে, আত্মায় আত্মায় যত-কিছু প্রভেদ এবং প্রত্যেক আত্মার যত-কিছু বিশেষত্ব, সমস্তই আত্মার শক্তি-স্ফূর্ত্তি এবং গুণপ্রকাশের পশ্চাৎ ধরিয়া চলিয়া জ্ঞেয়-স্থানে উপনীত হয়—উপনীত হইয়া সেই জ্ঞানালোকিত প্রদেশে গৃহপ্রতিষ্ঠা করে; এতদ্ব্যতীত আত্মার কোনো বিশেষত্বই জ্ঞাতৃ-স্থানের অব্যক্ত পুরীতে শুদ্ধকেবল আছি-মাত্রে ভর করিয়া জীবনধারণ করিতে পারে না। যদি কেবল আছি-মাত্রে ভর করিয়া জ্ঞাতৃস্থানে বর্ত্তমান থাকিলেই আত্মজ্ঞানে সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারিত, তবে বিনা সাধনে সকলেই সিদ্ধ। প্রকৃত কথা এই

যে, জ্ঞাতৃস্থানে আত্মা যাহা আছেন, তাহাই আছেন; তদ্ব্যতীত জ্ঞানস্থানে আত্মার শক্তিস্ফূর্ত্তি চাই এবং জ্ঞেয়স্থানে আত্মার গুণপ্রকাশ চাই; তাহা যতক্ষণ না হইতেছে, ততক্ষণ আত্মজ্ঞান কেবল একটা কথার কথা মাত্র। অর্থাৎ কি না—জ্ঞানস্থানে আত্মার শক্তিস্ফূর্ত্তি না হইলে জ্ঞেয়স্থানে আত্মার গুণপ্রকাশ হইতে পারে না; জ্ঞেয়স্থানে আত্মার গুণপ্রকাশ না হইলে আত্মজ্ঞান কেবল শব্দমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। ফল কথা এই যে, প্রথম উদ্যমেই আত্মাকে জ্ঞাতৃস্থানে উপলব্ধি করিতে গেলে থই পাওয়া যায় না—কাজেই অকূল পাথারে হাবুডুবু খাইতে হয়। অতএব, আত্মাকে যাহাতে জ্ঞেয়স্থানে উপলব্ধি করা যাইতে পারে, তাহারই চেষ্টা দেখা সাধকের প্রথম কর্ত্তব্য।

আত্মজ্ঞানের সাধনপদ্ধতি।

পাতঞ্জলদর্শনে যোগের দুইরূপ সাধন-পদ্ধতি নির্দ্দেশিত হইয়াছে। প্রথম পদ্ধতি শুদ্ধকেবল সাধনেরই ব্যাপার, দ্বিতীয় পদ্ধতি সাধন এবং ভজন দুয়ের একত্র সমাবেশ। যোগোক্ত প্রথম পদ্ধতি এইরূপ :—

কোনো একটি ইচ্ছাস্বরূপ বস্তুতে বা প্রদেশে মনকে নিবদ্ধ করিবে। তাহার পরে লক্ষ্য বিষয়টির প্রতি মনের একটানা স্রোত নিরবচ্ছেদে প্রবাহিত করিতে থাকিবে। প্রথম কার্য্যটির নাম ধারণা এবং দ্বিতীয় কার্য্যটির নাম ধ্যান। তাহার পরে লক্ষ্য-বিষয়টির প্রতি মনোবৃত্তি যখন সর্ব্বতোভাবে সমাহিত হইবে—যখন সাধকের জ্ঞানে সেই লক্ষ্যবস্তুটি ছাড়া আর কিছুই প্রতিভাত হইবে না; প্রতীয়মান হইবে তখন এইরূপ—যেন সেই লক্ষ্য-বস্তুটিই সমস্ত জগৎ, সেই লক্ষ্যবস্তুটি ছাড়া আর-যেন কোনো কিছুই নাই—এমন কি, সাধক নিজেও যেন নাই। ইহারই নাম সমাধি। সমাধিতে লক্ষ্য প্রদেশটিতেই—জ্ঞেয়স্থানটিতেই—জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় দুইই জ্ঞানের সমক্ষে একীভূত ভাব ধারণ করিয়া আত্মারূপে প্রকাশিত হয়।

যোগোক্ত দ্বিতীয় পদ্ধতি হ'চ্চে ঈশ্বর-প্রণিধান। ঈশ্বর-প্রণিধান কি? না, সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরকে পরমগুরু জানিয়া পরম-ভক্তি-সহকারে তাঁহাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করা। প্রথম পদ্ধতি এবং দ্বিতীয় পদ্ধতির মধ্যে প্রভেদ খুবই আছে—যদিচ পাতঞ্জলদর্শনে সে প্রভেদের গুরুত্বের প্রতি বড়-একটা ভ্রূক্ষেপ করা হয় নাই; কেন যে ভ্রূক্ষেপ করা হয় নাই, তাহার বিশেষ একটি কারণ আছে;—সে কারণ এই :—সাধনই পাতঞ্জলদর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। ভজন পাতঞ্জলদর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয় নহে। এইজন্য, ভগবান্ পতঞ্জলি-মুনি "ভজন সাধনের একটি প্রবলতম সহায়" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে, বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয় একমাত্র কেবল সত্য, তা বই, কোনো বিশেষ দর্শনের বিশেষ সত্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয় নহে। এইজন্য, সাধনের গৌরব-রক্ষার অনুরোধে ভজনকে তাহার উচ্চ-পদবী হইতে সরাইয়া রাখা বর্ত্তমান-স্থলে

কোনো গতিকেই মার্জ্জনীয় বলিয়া আদর পাইতে পারে না। সত্য এই যে, ভজন সাধনের একটি প্রবলতম সহায় তো বটেই, তা ছাড়া, ভজন সাধনের একটি অপরিহার্য্য মুখ্য অঙ্গ। ভজন-বর্জ্জিত সাধন এক-প্রকার হৃদয়-বর্জ্জিত হস্ত—তাহা নিতান্তই অঙ্গহীন। যাহাই হো'ক্—ক্রিয়াযোগের সাধন এবং ভক্তিযোগের সাধন, দুইই পরে পরে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক; তাহা হইলেই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি কতদূর ফলদায়ক, তাহা আপনা হইতেই ধরা পড়িবে।

আত্মজ্ঞানের ঐকাঙ্গিক সাধন।

আত্মজ্ঞানের সাধনপদ্ধতি দুইস্থানে দুই-রূপ। যে স্থানে ভাব-জগতের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করা হয়, সে স্থানে একরূপ, এবং যে স্থানে সত্য-জগতের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করা হয়, সে স্থানে একরূপ। ভাব-জগতের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করিলে সাধকের নিকটে আত্মশক্তির কার্য্যকারিতা সর্ব্বোপরি প্রকাশ পায়; সত্য-জগতের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করিলে সাধকের নিকটে ঐশী শক্তির কার্য্যকারিতা সর্ব্বোপরি প্রকাশ পায়। দুই স্থানের দুইপ্রকার সাধনপদ্ধতির মধ্যে এইরূপ মর্ম্মান্তিক প্রভেদ সত্ত্বেও দুয়ের মধ্যে এক জায়গায় ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় এই যে, দুয়েরই সাধনীয় কার্য্য হ'চ্চে জ্ঞাতাকে জ্ঞেয়স্থানে আনয়নপূর্ব্বক জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের একীকরণ।

ভাব-জগতের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করাই বা কিরূপ, আর, সত্য-জগতের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করাই বা কিরূপ, তাহার একটি মোটামুটি-রকমের উপমা দিতেছি, তাহা হইলেই দুয়ের মধ্যগত প্রভেদ সুস্পষ্টরূপে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

একজন কাশ্মীরযাত্রী আমাকে বলিলেন, "তুমি যদি কাশ্মীর দেখিতে চাও, তবে আমার সঙ্গে আইস।" আমি বলিলাম, "তথাস্তু।" অনতিপরে দুইজনে আমরা রেল-গাড়ির দুই কোণে সুখাসীন হইয়া পশ্চিমা-ভিমুখে প্রধাবিত হইলাম। কিন্তু রেল-গাড়ির ঢিমাচালে আমার বড়ই দেক্ ধরিতে লাগিল। রেলগাড়িকে "দূর হ" বলিয়া এক ধাক্কায় দূরে সরাইয়া দিয়া মনোরথে আরোহণ করিলাম এবং চকিতের মধ্যে কাশ্মীরের রমণীয় উদ্যান-কাননে উপনীত হইয়া সুগন্ধ সমীরণ সেবন করিতে লাগিলাম। মনোরথের ধোঁয়াকলে ধোঁয়ার জোগাড় পূর্ব্ব হইতেই হইয়া রহিয়াছিল—তাহার জন্য আমাকে ভাবিতে হয় নাই। অর্থাৎ কাশ্মীর যে কিরূপ চমৎকার স্থান, তাহা নানা পরিব্রাজকের মুখে শুনিয়া-শুনিয়া আমার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। আমি সেই সকল শ্রুতপূর্ব্ব বৃত্তান্ত জোড়াতাড়া দিয়া চিদাকাশে (অর্থাৎ আত্মার জ্ঞেয়স্থানে) কাশ্মীরনগর উদ্ভাবন করিলাম; উদ্ভাবন করিয়া তাহার ধ্যানে নিমগ্ন হইলাম। ইহারই নাম ভাব-জগতের প্রতি লক্ষ্য-নিবেশ। কিয়দ্দিবস পরে আমি যখন সশরীরে কাশ্মীরে উপনীত হইয়া তথাকার সুরম্য নদ-নদী-গিরি-কাননের প্রতি চাহিয়া-দেখিয়া অবাক্ হইলাম, তখন আমার নেত্রযুগল কি-যে স্বর্গভোগ করিতে লাগিল, তাহা বলিবার কথা নহে। ইহারই নাম সত্য-জগতে লক্ষ্য

নিবিষ্ট করা। রেলগাড়িতে চক্ষু মুদিত করিয়া যে কাশ্মীর দেখিয়াছিলাম, তাহাও কাশ্মীর, এবং তাহার কিছুদিন পরে চক্ষু মেলিয়া যে কাশ্মীর দেখিলাম, তাহাও কাশ্মীর; দুই কাশ্মীরের মধ্যে প্রভেদ এই যে, ভাব-জগতের সে-যে কাশ্মীর, তাহা আমার আত্মশক্তিরই ব্যাপার; পক্ষান্তরে, সত্য-জগতের এ-যে কাশ্মীর, ইহা সাক্ষাৎ ঐশী শক্তির ব্যাপার। কাশ্মীর-দর্শন যেমন দুইরূপ—(১) ভাব-জগতের কাশ্মীর-দর্শন এবং (২) সত্য-জগতের কাশ্মীর-দর্শন; আত্ম-জ্ঞানও তেমনি দুইরূপ—(১) ভাব-জগতের আত্মজ্ঞান এবং (২) সত্য-জগতের আত্মজ্ঞান। পুনশ্চ, ভাব-জগতের কাশ্মীর-দর্শনে যেমন আত্মশক্তির প্রাধান্য এবং সত্য-জগতের কাশ্মীর-দর্শনে যেমন ঐশী শক্তির প্রাধান্য প্রকাশ পায়; ভাব-জগতের আত্মজ্ঞানে তেমনি আত্মশক্তির প্রাধান্য এবং সত্য-জগতের আত্মজ্ঞানে তেমনি ঐশী শক্তির প্রাধান্য প্রকাশ পায়।

প্রথমে, ভাব-জগতের আত্মজ্ঞানের সাধন-পদ্ধতি কিরূপ, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যা'ক্। (এটা যেন মনে থাকে যে, দুই পদ্ধতিরই সাধনীয় কার্য্য একই; কি? না, জ্ঞাতাকে জ্ঞেয়স্থানে আনয়নপূর্ব্বক জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের একীকরণ।)

পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্রে যেরূপ ধারণা-ধ্যানের প্রণালী-পদ্ধতি উপদিষ্ট হইয়াছে, তদনুসারে প্রথমে চিদাকাশের কোনো একটি বিন্দু-পরিমিত জ্ঞেয়স্থানে মনের লক্ষ্য নিবদ্ধ কর। তাহার পরে পড়া মুখস্থ করিবার সময় বালক যেমন একই শব্দ পুনঃ-পুন উচ্চারণ করে, অথবা জপ করিবার সময় যেমন ভক্ত বৈষ্ণব বা শাক্ত একই বীজমন্ত্র পুনঃপুন উচ্চারণ করেন, তেমনি সেই লক্ষ্য বিন্দুটিতে মনকে পুনঃপুন সন্নিবিষ্ট করিবে—যেন সেখান হইতে মন অন্য কোনো স্থানে সরিয়া পলাইতে অবসর না পায়। দুই হ্রস্ব ই ক্রমাগত উচ্চারণ করিতে থাকিলে ক্রমে যেমন দুই ই মিলিয়া এক দীর্ঘ ঈ হইয়া দাঁড়ায়, এবং ই ই ই ই ক্রমাগত উচ্চারণ করিতে থাকিলে ক্রমে যেমন দুই দীর্ঘ-ঈ মিলিয়া এক মহাদীর্ঘ ঈ হইয়া দাঁড়ায়, তেমনি সেই লক্ষ্য বিন্দুটিতে মন ক্রমাগত পরিচালিত হইতে থাকিলে ক্রমে মনের খণ্ড খণ্ড প্রযত্ন একতানে মিলিত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান-প্রবাহে পরিণত হইবে। তাহার পরে ধ্যানের সেই একটানা স্রোত লক্ষ্য-বিন্দুটির প্রতি এরূপ একাগ্রতা সহকারে অনন্যমানসে প্রধাবিত করিবে—যেন লক্ষ্য-বিন্দুটি ছাড়া অপর কোনো কিছুই জ্ঞেয়স্থানে তিলমাত্রও অধিকার না পায়। তাহা হইলে সমস্ত জানিবার বস্তু, এবং সেই সঙ্গে জ্ঞাতা আপনি, সেই লক্ষ্য-বিন্দুটিতে কেন্দ্রীভূত হইয়া যাইবে; তাহাতে দাঁড়াইবে এই যে, আত্মা জ্ঞাতৃস্থানে যেরূপ এক অপরিবর্ত্তনীয় সত্যরূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন, জ্ঞেয়স্থানে সেইরূপ এক অপরিবর্ত্তনীয় সত্যরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। পরিবর্ত্তন কাহাকে বলে? একটি হইতে আরেকটিতে যাওয়ার নাম পরিবর্ত্তন। কাজেই, যদি এরূপ হয় যে, জ্ঞানের সন্নিধানে একটি বস্তু ছাড়া দ্বিতীয় কোনো বস্তুই প্রকাশ পাইতেছে

না—তবে তাহারই নাম অপরিবর্ত্তনীয়রূপে প্রকাশ পাওয়া। তবেই হইতেছে যে, সাধকের সমস্ত মনোবৃত্তি যখন লক্ষ্য-বিন্দুটিতে সর্ব্বতোভাবে সমাহিত হয়, তখন আত্মা জ্ঞাতৃস্থানে যেরূপ এক অপরিবর্ত্তনীয় সত্যরূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন, জ্ঞেয়স্থানে সেইরূপ এক অপরিবর্ত্তনীয় সত্যরূপে প্রকাশিত হ'ন। ইহাই ভাব-জগতের আত্মজ্ঞান।

ভাব-জগতের আত্মজ্ঞানের সাধনপদ্ধতি এই যাহা প্রদর্শিত হইল, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দৃষ্টিক্ষেত্রে আনয়ন না করিলে তাহার ভিতরকার অনেকগুলি কথা চাপা দেওয়া রহিয়া যাইবে; তাহা হইতে দেওয়া উচিত হয় না। এইজন্য, সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পৃথক্ পৃথক্ রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা নিতান্তই আবশ্যক;—তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

পূর্ব্বে ইহা যথেষ্ট দেখা হইয়াছে যে, ছুঁচের আর-সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাদে কেবলমাত্র তাহার আগাটি যেমন ধরিতে-ছুঁতে পাইবার বস্তু নহে, তেমনি আত্মার সমস্ত কার্য্য এবং গুণ বাদে—জ্ঞান-স্থানের শক্তি-স্ফূর্ত্তি এবং জ্ঞেয়-স্থানের প্রকাশ বাদে—কেবলমাত্র তাঁহার জ্ঞাতৃস্থানের সত্তাটি (শুদ্ধকেবল আছি-মাত্রটি) ধরিতে-ছুঁতে পাইবার বস্তু নহে। এক্ষণে দ্রষ্টব্য এই যে, ছুঁচের সর্ব্বাবয়ব যখন আমার চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত হয়, তখন সেই সঙ্গে যেমন ছুঁচের আগাটিও আমার চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত হয়, তেমনি আত্মার জ্ঞানস্থানীয় শক্তি-স্ফূর্ত্তি এবং জ্ঞেয়স্থানীয় গুণপ্রকাশ যখন আমার জ্ঞানসমক্ষে উপস্থিত হয়, তখন সেই সঙ্গে আত্মার জ্ঞাতৃস্থানীয় সত্তাও আমার জ্ঞান-সমক্ষে উপস্থিত হয়। তাহা যখন হয়, তখন আত্মার সবটা ধরিয়া আমি দেখি এই যে, আত্মা আত্মশক্তি খাটাইয়া জ্ঞাতৃস্থানের অপ্রকাশ হইতে জ্ঞেয়স্থানের প্রকাশে বাহির হইতেছেন; দেখি যে, আত্মশক্তির মূলস্থানে যে-আত্মা জ্ঞাতৃভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন, আত্মশক্তির ফলস্থানেও সেই-আত্মা জ্ঞেয়ভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। তবেই হইতেছে যে, আত্মশক্তির এ-পারে জ্ঞাতৃ-আত্মা এবং ও-পারে জ্ঞেয় আত্মা;—দুই আত্মা একই আত্মা। কেন না, যে আত্মা মূলে অব্যক্ত ছিলেন—আত্মশক্তির কর্ত্তৃত্ব-বলে সেই আত্মাই ফলে ব্যক্ত হইলেন। আত্মার সেই যে শক্তিস্ফূর্ত্তি, যাহার এ-পারে অব্যক্ত জ্ঞাতৃ-আত্মা এবং ও-পারে ব্যক্ত জ্ঞেয় আত্মা, সে শক্তিস্ফূর্ত্তি জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের সন্ধিস্থলে থাকিয়া দুয়েরই সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া একীভূত; তাহা জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়, সমস্তই একাধারে; কেন না, জ্ঞাতা তাহারই মূল-প্রান্ত, জ্ঞেয় তাহারই ফল-প্রান্ত, এবং জ্ঞান তাহাতেই ওতপ্রোত। এইরূপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, আত্মশক্তির প্রাধান্যই ভাব-জগতের আত্ম-জ্ঞান-সাধনের গোড়ার কথা। অতঃপর সত্য-জগতের আত্মজ্ঞানের সাধনপদ্ধতি কিরূপ, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।—কিন্তু এবারে নয়;—বারান্তরে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রতীক্ষা।

প্রেম এসেছিল, চলে গেল সে যে খুলি' দ্বার,
আর কভু আসিবে না।
বাকি আছে শুধু আরেক অতিথি আসিবার
তারি সাথে শেষ চেনা।
সে আসি' প্রদীপ নিবাইয়া দিবে একদিন,
তুলি' ল'বে মোরে রথে।
নিয়ে যাবে মোরে গৃহ হ'তে কোন্ গৃহহীন
গ্রহতারকার পথে!

ততকাল আমি একা বসি' র'ব, খুলি' দ্বার,
কাজ করি' ল'ব শেষ।
দিন হ'বে যবে আরেক অতিথি আসিবার
পাবে না সে বাধালেশ!
পূজা আয়োজন সব সারা হ'বে একদিন,
প্রস্তুত হ'য়ে র'ব,
নীরবে বাড়ায়ে বাহু-দুটি সেই গৃহহীন
অতিথিরে বরি' ল'ব!

যে জন আজিকে ছেড়ে' চলে' গেল খুলি' দ্বার,
সেই বলে' গেল ডাকি',
মোছ আঁখিজল, আরেক অতিথি আসিবার
এখনো রয়েছে বাকি!
সেই বলে' গেল, গাঁথা সেরে নিয়ো একদিন
জীবনের কাঁটা বাছি',
নবগৃহমাঝে বহি' এনো, তুমি গৃহহীন,
পূর্ণ মালিকাগাছি!

নাস্‌পাতির গান।

(ফরাসী লেখক পৌল-ফেবাল হইতে)

মোদের সে গাঁয়ের মাঝে
একটি নাস্‌পাতি আছে
তার তলায় আনা-গোনা
তানা নানা তানা নানা।
(প্রাচীন গ্রাম্য-গাথা)

১

গ্রামটির প্রান্তভাগে একটি বড় নাস্‌পাতির গাছ ছিল; বসন্তকালে ফুলে-ফুলে একেবারে ছাইয়া যাইত—তখন মনে হইত, ঠিক্ যেন একটা প্রকাণ্ড ফুলের ছাতা। রাস্তার অপর পার্শ্বে একজন জোৎ-দার কৃষকের গৃহ। গৃহের প্রবেশদ্বার প্রস্তর-নির্ম্মিত। কৃষকের একটি কন্যা—নাম তার পেরীন্।

সেই পেরীনের সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল।

২

তাহার বয়স ষোলো-বৎসর। তাহার টুক্‌টুকে গালটিতে যেন কত গোলাপ-ফুল ফুটিয়া থাকে! তেমনি নাস্‌পাতির গাছটিও ফুলে-ফুলে ভরা। এই নাস্‌পাতির তলায় আমি তাকে বলিলাম:—"পেরীন্!—পেরীন্!—আমাদের বিবাহ কবে হবে?"

৩

এই কথায় তার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সমস্তই যেন হাস্যময় হইয়া উঠিল! তাহার সেই কেশগুচ্ছ—যাহা বাতাসের সহিত খেলা করিতেছিল;—তাহার সেই কাঠের জুতা-পরা পা-দুখানি;—তাহার সেই হাত-দুটি—যে হাতে সে গাছের একটি ডাল নোয়াইয়া পুষ্প আঘ্রাণ করিতেছিল;—তাহার সেই বিমল শুভ্র ললাটদেশ—তাহার সেই বিম্বাধরবিমুক্ত মুক্তাপ্রভ দন্তরাজি—সবই যেন হাসিতে ভরিয়া গেল।

আমি তাকে বড়ই ভাল বাসিতাম। সে বলিল:—"যদি সম্রাট্ তোমাকে সৈন্যদলে গ্রহণ না করেন, তা হ'লে ফসল কাটিবার সময় আমাদের বিবাহ হইবে।"

৪

সম্রাটের সৈন্যসংগ্রহের কাল উপস্থিত হইল। ঈশ্বরের প্রসন্নতা-লাভের জন্য

গির্জায় আমি একটা বাতি পুড়াইলাম। কেন না, পেরীন্‌কে ছাড়িয়া যদি দূরদেশে যাইতে হয়, এই আশঙ্কায় আমার মন বড়ই অধীর হইয়াছিল। ঈশ্বরের জয় হোক্! সৈন্য-তালিকায় আমার নাম উঠিল না। জাঁ-নামে একটি যুবক, ধাত্রী-পুত্র-সম্পর্কে আমার ভাই হইত, তাহারই নাম উঠিল। দেখিলাম সে কাঁদিতেছে, আর এই কথা বলিতেছে :—"তা হ'লে আমার অভাগী মায়ের দশা কি হইবে ?"

৫

—"শান্ত হও জাঁ, তুমি কেঁদো না ; দেখ, আমার মা-বাপ নাই ; তোমার হয়ে আমিই যাব।"—এই কথা সহসা যেন সে বিশ্বাস করিতে চাহিল না। পেরীন্ নাস্‌পাতির তলায় সেই সময় আসিল ;—তার চোখ-দুটি জলে ভিজিয়া গিয়াছে। আমি ইতি-পূর্ব্বে কখনও তাকে কাঁদিতে দেখি নাই। তার মুখের হাসিটির চেয়ে তার কান্নাটি যেন আরও সুন্দর !

সে আমাকে বলিল :—"তুমি বেশ কাজ করেছ, তোমার খুব দয়া ; পিয়ের ! তুমি যাও ; যতদিন না তুমি ফিরে এসো, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে' থাক্‌ব।"

৬

রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল—সেনাধ্যক্ষ হুকুম দিতে লাগিলেন :—"ডাইনে, বাঁয়ে,—ডাইনে, বাঁয়ে !—এগোও—চল !" ওয়াগ্রাম পর্য্যন্ত আমরা চলিলাম। মনে মনে বলিলাম :—"পিয়ের ! বুক বাঁধো, শত্রু সম্মুখে !" একটি দীর্ঘ-প্রসারিত অগ্নি-রেখা এইবার দেখিতে পাইলাম। পাঁচ-শো কামান এই সময়ে একসঙ্গে গর্জ্জন করিতেছিল ; তাহার ধূমে আমার নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল এবং ভূলগ্ন রক্তে আমার পা পিছ্‌লাইয়া যাইতে লাগিল। আমার ভয় হইল, আমি পিছনে একবার তাকাইয়া দেখিলাম।

৭

পিছনে ফরাসীদেশ এবং সেই গ্রামখানি ; আর, সেই নাস্‌পাতির সমস্ত ফুলগুলি এখন ফলে পরিণত হইয়াছে। আমি চোখ বুজিলাম—চোখ বুজিয়া দেখিলাম, যেন পেরীন্ আমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছে। ঈশ্বরের জয় হোক্! আমার এখন সাহস হইয়াছে। "এগোও, এগোও !—ডাইনে, বাঁয়ে !—ছোঁড়ো বন্দুক !—উচাও সঙিন্ !"—"সাবাস্ ! সাবাস্ ! নবাগত সৈনিকটি তো বেশ দক্ষতা দেখাইতেছে"—"তোমার নাম কি বৎস ?"—"মহারাজ ! আমার নাম পিয়ের।"—"পিয়ের ! আমি তোমাকে ব্রিগেডিয়ার করিয়া দিলাম।"

৮

পেরীন্, পেরীন্ !—আমি এখন ব্রিগেডিয়ার ! যুদ্ধের জয় হোক্।—যুদ্ধের দিন তো উৎ-সবের দিন ! যুদ্ধযাত্রায় চলা তো অতি সহজ, পায়ের পর পা ফেলিয়া চলিলেই হইল !—"ডাইনে, বাঁয়ে ! পিয়ের ! এবারও তুমি সকলের আগে ?"—"আচ্ছা, একটা কাপ্তে-নের ঝাপ্পা (epaulette) তুমি কুড়াইয়া লও।" ঝাপ্পা-ওয়ালা কত মৃত কাপ্তেন তখন ভূ-লুণ্ঠিত—একটা ঝাপ্পা কুড়াইয়া লইয়া স্কন্ধে পরিলাম।

৯

—"মহারাজ ! আপনার অত্যন্ত অনুগ্রহ !"

"এগোও !—চল মস্কো পর্য্যন্ত !" কিন্তু আর বেশি দূর নয় ; যতদূর দৃষ্টি যায়, বরফের মরু ধূধূ করিতেছে—যাত্রার পথ মৃতশরীরে বরা-বর চিহ্নিত ; এদিকে নদী, ওদিকে শত্রু-সৈন্য ; দুই ধারে কেবলি মৃতশরীর ! "নৌ-সেতুর প্রথম নৌকা কে ভাসাইতে প্রস্তুত ?" —"আমি মহারাজ !"—"সব সময়েই তুমি কাপ্তেন ?"

এইবার তিনি নাইট্-উপাধির ক্রস্-চিহ্ন আমাকে পুরস্কার দিলেন।

১০

ঈশ্বরের জয় হোক্ ! পেরীন্, পেরীন্ !—এই-বার আমার জন্য তুমি অহঙ্কার করিতে পারিবে। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, আমি ছুটি পাইয়াছি। এইবার আমাদের বিবাহের উদ্যোগ কর—গির্জার ঘড়ি-ঘণ্টা সব বাজা-ইতে বল !—পথ অতি দীর্ঘ, কিন্তু আশা শীঘ্রগামী। ঐ দেখা যায়—ঐ উচ্চভূমির পিছনেই আমাদের দেশ।

ঐ যে আমাদের গির্জার চূড়া, মনে হয় যেন গির্জায় ঘড়ি বাজিতেছে।

১১

ঘড়ি বাজিতেছে সত্য—কিন্তু সেই নাস্‌পাতির গাছটি কোথায় ? এই তো ফুল ফুটিবার মাস, কিন্তু কৈ, সেই ফুলে-ভরা গাছটি তো দেখিতে পাইতেছি না। পূর্ব্বে তো দূর হই-তেই দেখা যাইত। কৈ, আর তো সে গাছটি নাই। আমার সেই কৈশোর-সখা গাছটি, কে তাকে কাটিয়া ফেলিয়াছে ! উহার সেই উজ্জ্বল ফুলগুলি ফুটিয়াছিল বোধ হইতেছে—কিন্তু উহার কাটা ডালগুলি এখন ঘাসের উপর ছড়ানো রহিয়াছে।

১২

—"গির্জার ঘণ্টা কেন বাজিতেছে মাথু !"

—"একটা বিবাহ হবে কাপ্তেন্-মশাই।"

মাথু আমাকে চিনিতে পারে নাই।

একটা বিবাহ !—ঠিক বলিয়াছে। বিবা-হের বর-কন্যা গির্জার সিঁড়িতে ঐ যে উঠি-তেছে—আহা ! আমার পেরীন্ এখনও সেই-রকম হাস্যময়ী—লাবণ্যময়ী। পেরীন্‌ই কনে', আর বর আমার সেই ভাই জাঁ।

১৩

আমার চারিধারে লোকেরা বলিতেছে :—"দুজনই দুজনকে খুব ভালবাসে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম :—"এখন পিয়েরের কি হবে ?"—"পিয়ের ?—কোন্ পিয়ের ?"—সে উত্তর করিল।

ওরা আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে।

১৪

তখনই আমি গির্জার তলদেশে জানু পাতিয়া বসিলাম। পেরীনের কল্যাণকামনায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম—জাঁর কল্যাণকামনায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইলাম। ঐ দুইজনকেই আমি ভাল বাসিতাম। গির্জার উপাসনা শেষ হইয়া গেলে, আমি নাস্‌পাতির একটি ফুল কুড়াইয়া লইলাম—সে একটি মৃত শুষ্ক ফুল। তার পর, আবার আমি পথ ধরিয়া চলিতে লাগি-লাম—পশ্চাতে আর ফিরিয়া দেখিলাম না। ঈশ্বরের জয় হোক্। ওরা দুজনেই দুজনকে ভালবাসে ; ওরা সুখী হবে !

১৫

"এই যে, পিয়ের ! তুমি ফিরে এলেছ যে !"—"হাঁ মহারাজ !"—"তোমার বয়স ২২বৎসর,

ইহারই মধ্যে তুমি সেনাধ্যক্ষ—ইহারই মধ্যে তুমি নাইট্! যদি ইচ্ছা কর, একজন কৌন্‌টেসের সহিত তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিতে পারি।"

পিয়ের নাস্‌পাতির ভাঙা ডাল হইতে যে ফুলটি কুড়াইয়া লইয়াছিল, সেই শুষ্ক মৃত ফুলটি বক্ষ হইতে বাহির করিল।

—"মহারাজ! এই ফুলটির মত আমার হৃদয়ের অবস্থা। সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে অগ্রবর্ত্তী রক্ষিদলে নিযুক্ত হ'য়ে যাতে আমি ধর্ম্মযুদ্ধে বীরের মত মরতে পারি, এখন আমি শুধু তাই চাই।"

১৬

পিয়ের "অগ্রবর্ত্তী রক্ষিদলে" নিয়োজিত হইল।

১৭

গ্রামটির প্রান্তভাগে, বিজয়ের দিনে নিহত, ২২বৎসর-বয়স্ক একটি কর্ণেলের সমাধি-স্তম্ভ এখনও বর্ত্তমান। নামের পরিবর্ত্তে, পাথরের উপর শুধু এই কথাটি লেখা আছে :—

ঈশ্বরের জয় হোক্!

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পথিক।

আলো নাই দিন শেষ হ'ল, ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ!
ঘণ্টা বাজিল দূরে,
ও-পারের রাজপুরে,
এখনো যে পথে চলেছিস্ তুই
হায়রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ!

দেখ্ সবে ঘরে ফিরে এল, ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ!
পূজা সারি' দেবালয়ে
প্রসাদী কুসুম লয়ে',
এখন ঘুমের কর্ আয়োজন
হায়রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ।

রজনী আঁধার হয়ে আসে, ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ!
ওই যে গ্রামের 'পরে
দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে,
দীপহীন পথে কি করিবি একা
হায়রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ!

এত বোঝা লয়ে কোথা যাস্, ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ!
নামাবি এমন ঠাঁই
পাড়ায় কোথা কি নাই?
কেহ কি শয়ন রাখে নাই পাতি'
হায়রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ!

পথের চিহ্ন দেখা নাহি যায়
পান্থ, বিদেশী পান্থ!
কোন্ প্রান্তরশেষে
কোন্ বহুদূরদেশে,
কোথা তোর রাত হবে যে প্রভাত
হায়রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ!

স্বদেশভক্তি।

য়ুরোপের জীবিত দার্শনিকদিগের মধ্যে যিনি শীর্ষস্থানীয়, সেই পণ্ডিতচূড়ামণি হার্বার্ট-স্পেন্‌সার "তথ্য ও ভাষ্য" (Facts and Comments) নামক তাঁহার নব-প্রকাশিত গ্রন্থে আধুনিক ইংলণ্ডের স্বদেশ-ভক্তিসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদ নিম্নে দিতেছি। মূল-গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিতে অবসর পান নাই, অনুবাদ-পাঠে কতকটা তাঁহাদের কৌতূহল নিবৃত্ত হইতে পারে :—

যদি কেহ আমাকে বঞ্চক বা অসত্য-পরায়ণ বলে, আমি মর্ম্মাহত হই; কিন্তু যদি কেহ আমাকে অ-স্বদেশভক্ত বলে, তাহাতে আমি বিচলিত হই না। "তবে কি তোমার স্বদেশভক্তি কিছুমাত্র নাই?"—এ প্রশ্নের উত্তর এক-নিশ্বাসে দেওয়া যায় না।

সর্ব্বাগ্রে ইংলণ্ডেই কৃষকের দাসত্ব রহিত হয়; সর্ব্বাগ্রে ইংলণ্ডেই অপেক্ষাকৃত-স্বাধীন ব্যবস্থাপদ্ধতি পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়; এবং সামন্ত-তন্ত্রের প্রভাব হ্রাস হইবার পর, জনসাধারণ যখন কৃষিভূমির বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইল, তখন সর্ব্বাগ্রে ইংলণ্ডেই প্রজা-বর্গের নিজস্ব অধিকার অধিকতররূপে স্বীকৃত হয়। ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনে, জাতীয় চরিত্রের এই সব বিশেষ-লক্ষণগুলি স্মরণ করিলে অন্তঃকরণে স্বভাবতই গর্ব্ব উপস্থিত হয়। যে সময়ে এইরূপ নির্দ্ধারিত হয়, যে-কোন ক্রীতদাস ইংলণ্ডের ভূমিতে পদার্পণ করিবে, সেই স্বাধীনতা লাভ করিবে; যখন, মার্কিনদেশের ক্রীতদাসদিগের দাসত্ব-মোচনের জন্য দুইকোটি মুদ্রা প্রদত্ত হয়, এবং যখন, (সুপরামর্শ না হইলেও) ক্রীতদাস-দিগের ব্যবসায় রহিত করিবার জন্য, কতক-গুলি যুদ্ধ-জাহাজ রক্ষিত হয়;—তখন, আমাদের দেশের লোকেরা এই-যে-সব কার্য্য করিয়াছিল, তাহা প্রশংসনীয়। আবার যখন ইংলণ্ড, পররাষ্ট্রের পলাতক শরণাগত ব্যক্তিগণকে আশ্রয় দিয়াছিলেন; এবং যে সকল ক্ষুদ্ররাজ্য স্বাধীনতা-লাভের জন্য যুঝা-যুঝি করিতেছিল, তাহাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন; তখনও জাতীয় চরিত্রের যে-সব মহত্ত্বের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাতে স্বভাবতই অনুরাগ আকৃষ্ট হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের জাতীয় চরিত্রের এমনও কতকগুলি লক্ষণ বিদ্যমান (সম্প্রতি পুনঃপুন দেখা দিয়াছে), যাহাতে শ্রদ্ধা-ভক্তির বিপরীত ভাব উদ্রেক করে।

যেরূপ-করিয়া ইংলণ্ড ৮০টিরও অধিক রাজ্য অধিকার করিয়াছেন (তাহার মধ্যে কতকগুলি বসতি-পত্তন, উপনিবেশ ও আশ্রিত রাজ্য), তাহা চিন্তা করিলে সন্তোষের উদয় হয় না। সূচ হইয়া ধর্ম্মপ্রচারক-দিগের প্রথম প্রবেশ, তাহার পর স্থায়ী প্রতিনিধি স্থাপন, তাহার পর শস্ত্রসজ্জিত-সৈন্যসহায়সম্পন্ন কর্ম্মচারী নিয়োগ, তাহার পর—যাহাকে "শান্তি স্থাপন করা" বলা হয়—সেই শান্তিস্থাপনকার্য্যে সমস্ত ব্যাপারের পর্য্যবসান;—এই যে সন্ধিকালগুলি,—এই যে পররাজ্যগ্রাসের পদ্ধতিগুলি (কখন ক্রমশ-সাধিত, কখন আকস্মিক), এই সমস্ত দেখিলে সেই অন্যায়কারীদিগের প্রতি কখনই মমতা জন্মিতে পারে না। তাহার দৃষ্টান্ত, যখন ভারতের একটি নূতন প্রদেশ ব্রিটিশরাজ্যে সংযোজিত হইল, যখন "বার-টজিলণ্ডে"র একটি প্রদেশ ব্রিটিশ-উপনিবেশ বলিয়া পরিঘোষিত হইল, তখন তৎপ্রদেশ-বাসী পশুদিগেরই ন্যায়—অধিবাসী প্রজা-পুঞ্জের ইচ্ছার প্রতি কিছুমাত্র দৃক্‌পাত করা হইল না। আমাদের প্রধান অমাত্য প্রথমে ঘোষণা করেন, খেদিভের হইয়া সৌদানের পুনর্জয় সাধন করিতে আমরা তাঁহার নিকট ধর্ম্মত বাধ্য; তাহার পর, যখন পুনর্জয় সাধিত হইল, অমনি আমরা আমাদের রাণী ও খেদিভের নামে ঐ রাজ্যের শাসনভার

গ্রহণ করিলাম—অর্থাৎ কার্য্যত উহাকে ব্রিটিশরাজ্যভুক্ত করিয়া লইলাম। আবার দেখ, ট্রান্‌সভালের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে আমরা হস্তক্ষেপ করিব না—এইরূপ অঙ্গী-কারবাক্য দুই দুই-জন উপনিবেশসচিবের মুখ দিয়া ব্যক্ত করিয়াও, পরে সেই দেশের রাষ্ট্রীয় নির্ব্বাচনকার্য্যে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম স্থাপন করিবার জন্য আমরা জিদ্ করিতে লাগিলাম; এবং যখন ট্রান্‌সভাল-বাসিগণ তাহাতে বাধা দিল, তখন সেই ছুতা ধরিয়া আমরা সর্ব্বোচ্ছেদকারী এক মহাযুদ্ধ বাধাইয়া দিলাম। * এই সকল কথা স্মরণ করিলে স্বদেশভক্তি কিছুতেই হৃদয়ে পোষণ করা যায় না। তা ছাড়া, যে সময়ে জনসাধা-রণ একজন দস্যুদলপতিকে সমারোহে অভ্য-র্থনা করে, যে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ-গণ সেই ষড়্‌যন্ত্রিদলের সর্দ্দারকে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সম্মান-উপাধি প্রদান করে; অথবা, যিনি নিজের পররাজ্য-আক্রমণ-মন্ত্রণার বিরোধিপক্ষদিগকে "তৈলাক্ত পিচ্ছিল ন্যায়-পরতা"র উল্লেখ করিয়া উপহাস করিয়া-ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধস্তন ছাত্রমণ্ডলী সিংহনাদ-সহকারে যে সময়ে তাঁহার স্তুতিবাদ করে;—সেই সময়ে আমাদের জাতীয় চরি-ত্রের যেরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাতে অনুরাগ আকৃষ্ট হয় না।

এই সকল এবং আরও অন্যান্য বিপরীত অভিজ্ঞতার ফলে, যদি আমার স্বদেশভক্তি তিষ্ঠিয়া থাকিতে না পারে এবং সেইজন্যই যদি আমাকে অ-স্বদেশভক্ত বলা হয়,—ভাল, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট আছি।

"ন্যায় হোক্, অন্যায় হোক্, আমাদের দেশ"—এই ঘোষণাবাক্য আমার নিকট অতি জঘন্য বলিয়া মনে হয়। স্বদেশভক্তির সহিত সাধারণত যে স্মৃতি জড়িত, তাহাতে এই ঘোষণাবাক্য কিয়ৎপরিমাণে সমর্থিত হইতে পারে। কিন্তু উহার আচ্ছাদনটি টানিয়া লও, দেখিবে উহার অন্তর্নিহিত ভাবের কথাটি যার-পর-নাই জঘন্য। এক্ষণে, অন্যপ্রকারের দৃষ্টান্তগুলি আলোচনা করা যাউক।

এখন মনে কর, যেন আমাদের দেশই ন্যায়পথে অবস্থিত—মনে কর, যেন আমাদের দেশই বিদেশীয়দিগের আক্রমণ-প্রতিরোধে প্রবৃত্ত; এরূপ স্থলে ঐ ঘোষণাবাক্যের মধ্যে যে ধারণা—যে ভাবটি নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ন্যায়ানুগত। এ কথা খুব জোরের সহিত তর্কস্থলে বলা যায় যে, আত্মরক্ষা শুধু ন্যায়ের সমর্থনীয় বিষয় নহে—উহা একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এখন ইহার বিপ-রীতে মনে কর, আমাদের দেশ অপরের রাজ্য অধিকার করিয়াছে, অথবা শস্ত্রবলে অন্য জাতির স্কন্ধে এরূপ পণ্যদ্রব্য চাপাইবার চেষ্টা করিতেছে, যাহা তাহারা চাহে না; কিংবা, যাহারা এই কারণে প্রতিশোধ লইয়াছে, তাহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য আমাদের

* দোষখণ্ডনের চেষ্টায় এখনও অনেকের মুখে এই কথা পুনঃপুন শুনা যায় যে, বোয়ারেরাই প্রথমে যুদ্ধ আরম্ভ করে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সুদূর পশ্চিমে—যেখানে প্রাণ হাতে করিয়া সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতে হয়—সেখানকার লোকেরা যুদ্ধের নিয়ম ভালরূপই বুঝে। তাহারা বলে, সেই প্রথম-আক্রমণকারী, যে সর্ব্বপ্রথমে নিজের অস্ত্রের দিকে হস্তচালনা করে। প্রস্তাবিত স্থলে, এই নিয়মের কিরূপ প্রয়োগ হইতে পারে, তাহা বুঝাই যাইতেছে।

দেশ স্বকীয় প্রতিনিধিগণকে সাহায্য করিতেছে; কিংবা মনে কর, আমাদের দেশ এমন কোন কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে, যাহা অন্যায় বলিয়া স্বীকৃত; তাহা হইলে ঘোষণা-বাক্যটির অর্থাপত্তি (implication) কিরূপ দাঁড়ায়?—অর্থাৎ ঐ বাক্য বলায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর কি কথা অব্যক্তভাবে বলা হইয়া যায়?—তাহা এই:—ন্যায় তাহাদেরই পক্ষে, যাহারা আমাদের আক্রমণের প্রতিরোধী এবং অন্যায় আমাদেরই পক্ষে।" তাহা হইলে সে স্থলে—যাহাকে স্বদেশভক্তি বলা হয়—সেই স্বদেশভক্তি কিরূপ কথায় ব্যক্ত হইবে?—স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, তাহা হইলে কথাগুলি এইরূপ দাঁড়াইবে:—"ন্যায়ের পতন হোক্, অন্যায়ের জয় হোক্!" জীবনের অপরাপর কার্য্যের সময় এইরূপ কথা বলিলে, শঠতার পরাকাষ্ঠা বলিয়া গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই। পুরাকালের লোকদের মনে এইরূপ একটি বিশ্বাস ছিল—এমন কি, এখনও অনেকের মনে এই বিশ্বাস আছে যে, মূর্ত্তিমান্ পাপের রূপে একজন পাপপুরুষ আছেন;—তিনি ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া এবং পাপের জয়ে সাহায্য করিয়া জগতের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন। সেই পাপ-পুরুষের যে সঙ্কল্প, তাহা নিম্নলিখিত কথায় যেরূপ সংক্ষেপে ব্যক্ত হয়, এমন আর কিছুতে হয় না।—সে কথা এই:—"ন্যায়ের পতন হোক্, অন্যায়ের জয় হোক্!" যাঁহারা স্বদেশভক্ত-নামে পরিচিত, তাঁহারা এই নীতির প্রতিজ্ঞাপত্রে নিজ নাম স্বাক্ষর করিতে প্রস্তুত আছেন কি?

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, এই সম্বন্ধে আমার মনের কথা প্রকাশ করিয়াছিলাম (অবশ্য এই মনের কথাটি স্বদেশভক্তির বিপরীত বলিয়া কথিত হইবে), আবার এমন ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলাম, যাহাতে সকলে চমকিয়া উঠিয়াছিল। সেই সময়টি দ্বিতীয় আফ্‌গান-যুদ্ধের সময়। আফ্‌গানিস্থান আক্রমণ করা আমাদের "স্বার্থ"—এই বিবেচনায় আমরা তখন ঐ দেশ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। সংবাদ আসিয়াছিল, আমাদের সৈন্য বিপদ্‌গ্রস্ত। অ্যাথিনিয়ান্-ক্লবে একজন প্রখ্যাত সৈনিক-পুরুষ—(তখন তিনি কাপ্তেন ছিলেন, এখন জাঁদ্রেল) তিনি একটি তারের সংবাদের প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। উক্ত বিপদের কথা সেই তারের সংবাদটিতে ছিল এবং তিনি এইভাবে আমার নিকট সংবাদটি পাঠ করিলেন যে, আমিও তাঁহার উদ্বেগের অংশভাগী হইলাম। কিন্তু আমি তাঁহাকে নিম্নলিখিত কথাটি বলিয়া স্তম্ভিত করিয়া দিলাম। "যাহারা নিজের শরীর ভাড়া দিয়া হুকুমে অন্য লোককে গুলি করে, তাহারা নিজে যদি গুলি খাইয়া মরে, আমার তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখ হয় না।"

আমার এই কথায় কিরূপ উচ্ছ্বাসোক্তি বাহির হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতেই আমি দেখিতে পাইতেছি। কেহ কেহ এইরূপ বলিবেন, "ঐ নীতি যদি অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে সৈন্য রাখা অসম্ভব হইবে—শাসনকর্ত্তৃত্ব শক্তিহীন হইয়া পড়িবে। যুদ্ধের উদ্দেশ্যসম্বন্ধে যদি প্রত্যেক সৈনিক বিচার করিতে বসে, তাহা হইলে কার্য্য চলিবে না। তাহা হইলে সামরিক ব্যবস্থা-

পদ্ধতি অসাড় হইয়া পড়িবে, এবং যে-কোন শত্রু প্রথম আক্রমণ করিবে, দেশ তাহারই কবলে পতিত হইবে।"

আমার উত্তর:—"একটু ধীরে! অত দ্রুত নয়।"

যুদ্ধার্থ সৈন্য এখনও যেমন সুলভ, অন্যপ্রকার যুদ্ধের জন্য তখনও তেমনি সুলভ হইবে।—সে যুদ্ধ স্বদেশরক্ষার্থ। এইরূপ যুদ্ধে প্রত্যেক সৈনিক মনে-মনে জানিবে, যে যুদ্ধে সে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা ধর্ম্ম-যুদ্ধ। যাহাদের বিষয়ে ভাল-মন্দ সে কিছুই জানে না, এরূপ লোকের সে প্রাণনাশ করিতেছে না; পরন্তু যাহারা তাহাকে এবং তাহার দেশ-ভাইদিগকে সে সংহার করিতে প্রবৃত্ত। অন্যায়পূর্ব্বক পররাজ্য-আক্রমণার্থ যে যুদ্ধ, তাহাই নিষিদ্ধ, স্বদেশ-রক্ষার জন্য যে যুদ্ধ, তাহা নিষিদ্ধ নহে।

অবশ্য এরূপ কেহ বলিতে পারে—বলিবার কতকটা হেতুও আছে—আক্রমণের যুদ্ধ না থাকিলে, আত্মরক্ষণের যুদ্ধও থাকিতে পারে না। যাহা হউক, ইহা তো স্পষ্টই বুঝা যায়,—কোন এক জাতি আত্মরক্ষণসীমার মধ্যে যুদ্ধকে বদ্ধ রাখিতে পারে, কোন কোন জাতি তাহা পারে না। অতএব, এই নীতির কার্য্যকারিতা সর্ব্বথা অক্ষুণ্ণ।

কিন্তু যাঁহাদের এইরূপ ঘোষণাবাণী—"ন্যায় হোক্, অন্যায় হোক্, আমাদের দেশ", এবং যাঁহাদের ইচ্ছা—ন্যূনাধিক অশীতি-সংখ্যক অধিকৃত রাজ্যের সহিত আরও অন্য রাজ্য চির-প্রণালী-অনুসারে সংযোজিত করেন, তাঁহারা যুদ্ধব্যাপারসম্বন্ধে এইরূপ নিষেধ-নিয়ম বিরক্তির চক্ষেই দেখিবেন। তাঁহারা মনে করেন,—রবিবারে যে নীতি মুখে আবৃত্তি করা যায়, সোমবারে তাহাই কাজে করিতে হইবে—ইহা অপেক্ষা বাতুলতা আর কিছুই নাই।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শেষ কথা।

তখন নিশীথরাত্রি, গেলে ঘর হ'তে
যে পথে চলনি কভু সে অজানা পথে।
যাবার বেলায় কোনো বলিলে না কথা,
লইয়া গেলে না কারো বিদায়-বারতা।
সুপ্তিমগ্ন বিশ্বমাঝে বাহিরিলে একা,
অন্ধকারে খুঁজিলাম না পেলেম দেখা।।

মঙ্গলমুরতি সেই চির-পরিচিত
অগণ্য তারার মাঝে কোথা অন্তর্হিত!

গেলে যদি একেবারে গেলে রিক্তহাতে?
এ ঘর হইতে কিছু নিলে না কি সাথে?
বিশ-বৎসরের তব সুখদুঃখভার
ফেলে রেখে দিয়ে গেলে কোলেতে আমার!
প্রতিদিবসের প্রেমে কতদিন ধরে'
যে ঘর বাঁধিলে তুমি সুমঙ্গল-করে,
পরিপূর্ণ করি' তারে স্নেহের সঞ্চয়ে
আজ তুমি চলে গেলে কিছু নাহি লয়ে?

তোমার সংসারমাঝে, হায়, তোমাহীন
এখনো আসিবে কত সুদিন-দুর্দ্দিন,—
তখন এ শূন্যঘরে চিরাভ্যাস-টানে
তোমারে খুঁজিতে এসে চাব কার পানে?
আজ শুধু এক প্রশ্ন মোর মনে জাগে—
হে কল্যাণি, গেলে যদি, গেলে মোর আগে,
মোর লাগি' কোথাও কি দুটি স্নিগ্ধ করে
রাখিবে পাতিয়া শয্যা চিরসন্ধ্যাতরে?

প্রাচীন ভারতের ব্যাপ্তি।

আর সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। অবশ্য ইহা বলি না যে, আমাদের সবই ছিল, আর যাহা ছিল তা সবই ভাল। সে অন্ধ দেশপ্রিয়তা আমার নাই। সে অন্ধতার কোন প্রয়োজনীয়তাও ত দেখি না। শুনিয়াছি জাপানের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে উন্মেষমাণ জাতীয় জীবনকে উৎসাহিত করিবার জন্য সত্য-মিথ্যা জড়াইয়া এক ইতিহাস গঠিত হইয়াছিল। আমাদের সে অবস্থা হইলে কি করিতাম, বলিতে পারি না। আপাতত সে চেষ্টার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। ভারতের প্রকৃত গৌরবের ইতিহাস অধিকাংশই নানাপ্রকারে গুপ্ত বা লুপ্ত হইয়াছে। এ দুর্দ্দশা আমাদের

কেন হইল, কে করিল—সে কথার আলোচনা না করিয়া নিজ নিজ অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিব। কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে তাহার যেটুকু উদ্ধার হইয়াছে বা হইতেছে, সহস্র-বৎসরের ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে আমাদের জগৎপূজ্য পিতামহদিগের যে গৌরব-কাহিনীটুকু আপনা হইতেই জাগিয়া উঠিতেছে, তাহাকে কেমন করিয়া উপেক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব?

শুনিতে পাই, পাশ্চাত্যজাতি আজি-কালি খুব সভ্য হইয়া উঠিয়াছেন। অস্বীকার করিতে পারি না, কেন না, অস্বীকার করিবার জো নাই। বাস্তবিকই তাঁহাদের সভ্যতার নিদর্শন খুঁজিতে হয় না। জীবন-সংগ্রামের নিয়মেও (Survival of the fittest) আমার আস্থা আছে। সুতরাং যখনই কোন জাতিকে সম্মান বা ক্ষমতায় অগ্রণী দেখিতে পাই, তখনি সেই জাতির সম্মানের এবং ক্ষমতার উপযোগিতা বা সার্থকতা মনে মনে স্বীকার করিয়া লই। কাজেই আজ পাশ্চাত্য-সভ্যতার অভ্যুদয়ের দিনে সাদরে এবং সসম্মানে পাশ্চাত্যজাতিকে বরণ করিয়া লইতে সঙ্কোচ বোধ করি না। কেন না, "গুণাঃ পূজাস্থানম্"। যে-কোন এক জাতির গৌরবেই সমগ্র মনুষ্যজাতির মনুষ্যত্বের পরিচয় ঘোষণা করে। গৃহস্থের কোন-এক সন্তানের গুণে সমগ্র বংশের মুখোজ্জ্বল হইয়া থাকে।

সমগ্র মনুষ্যজাতিকে এইরূপে এক-পরিবারভুক্ত মনে করি বলিয়াই এক জাতির অন্য জাতির প্রতি বিদ্বেষকে ভ্রাতৃদ্রোহিতা, এবং কোন-এক প্রাচীন জাতির অতীত গৌরবের প্রতি অনাস্থা বা মূর্খ অসদ্ভাব-প্রকাশ অস্বাভাবিক পিতৃদ্রোহিতাসদৃশ পাপ বলিয়া অনুমান করিয়া থাকি। কাজেই ইংরাজলিখিত সাধারণ ইতিহাসে অতিরঞ্জিত আত্মশ্লাঘার সহিত উদ্ধত এক-দেশদর্শিতা এবং প্রাচ্য প্রাচীন জাতির অতীত গৌরবের প্রতি উপহাসপূর্ণ বক্রদৃষ্টি দেখিলে মর্ম্মাহত হইতে হয়। যে সভ্যতায় গুণগ্রাহিতা, কৃতজ্ঞতা, পরপ্রেমিকতার এতদূর অসদ্ভাব, তাহা কখনই আদর্শ-সভ্যতারূপে পরিগণিত হইতে পারে না। ভারতের প্রাচীন হিন্দুজাতির মানসিক উন্নতির এবং অসাধারণ ধীশক্তির সহস্র উদাহরণ প্রাপ্ত হইয়াও এবং সহস্র প্রমাণ সত্ত্বেও ইহাদের লিখিত পুস্তকাদিতে কেমন-যেন-একটা রোম এবং গ্রীসীয় সভ্যতাকে উচ্চস্থান দিবার অযথা প্রয়াসের ভাব দেখিলে সভ্যতানামের উপর ধিক্কার জন্মে। এ ক্ষুদ্রচিত্ততা মনুষ্যমাত্রেরই শোভা পায় না। প্রাচীন ভারতবর্ষের সাহিত্য বা দর্শন সম্বন্ধে যদিও বা দুই-একটা কথা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোথাও স্বীকৃত হয়, প্রাচ্যজাতির, বিশেষত ভারত-বর্ষীয়দের বীর্য্যের কথা ত আমলেই আনা হয় না। এখন আমাদের সহিত য়ুরোপীয় জাতির যে সম্বন্ধ, তাহাতে বাহুবলে ভারতবর্ষীয়ের খর্ব্বতা প্রমাণের আগ্রহের কারণ উপলব্ধি করা অবশ্য নিতান্ত কঠিন নহে। কিন্তু কোন কালেই আমাদের দেশের লোকের কোন গুণই ছিল না—ভারত চিরকালই পরাধীন এবং পৃথিবীর যত দস্যুদানবগণের রঙ্গভূমি, এ ধারণা

বদ্ধমূল করিবার এত প্রয়াস কেন? আমাদের উপর এ বিজাতীয় হিংসার, এ পাশব বিদ্বেষের কারণ কি?

মুদ্রাতত্ত্ববিদেরা (Numismatists) ভারত-ইতিহাসের যে তথ্যসকল আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত একটি আভাস দিয়া তাহার উপর মুদ্রাতত্ত্ববিৎ কোন ইংরাজ লেখকের দুটি-একটি টিপ্পনীর উল্লেখ করিব। কুসংস্কারপূর্ণ বিদ্বেষবুদ্ধি দ্বারা ঐতিহাসিক সাক্ষ্য আচ্ছন্ন করাই সে টিপ্পনীগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। আলেক্‌জাণ্ডারের ভারত-আক্রমণ অবশ্য সকলেই অবগত আছেন। সমগ্র আশিয়া-বিজয়ী মদোন্মত্ত গ্রীক্‌সেনা পঞ্জাবে দুটি-একটি-মাত্র যুদ্ধ করিয়াই আর অগ্রসর হইতে একেবারেই অস্বীকার করিল। আশিয়ার মধ্যে ভারতবর্ষীয়েরা বলবীর্য্যে এবং সাহসে অগ্রণী, এ কথা গ্রীক্ ঐতিহাসিকই বলিয়াছেন। তাহারা পঞ্জাবের যতদূর পর্য্যন্ত আসিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বদিকে আরও অধিকতর বলশালী এবং সাহসী জাতির রাজ্য, এই সংবাদে যে গ্রীক্‌সেনা আর অগ্রসর হইতে চাহিল না, তাহাও তাহাদিগেরই ঐতিহাসিকদিগের নিকট হইতে শুনিতে পাই। এখন শুনি যে, তাহারা কেবল গ্রীষ্মাতিশয্যের জন্যই ভারতবিজয়ের লোভ পরিত্যাগ করিয়া গৃহপ্রত্যাগত হইয়াছিল, ভারতবর্ষীয়দের কোন শক্তির প্রভাবে নহে। কেন না, কোন য়ুরোপীয় জাতি ভারতবাসীর নিকট বাধা পাইতে পারে, ইহা বাতুলের কল্পনারও অতীত! কিন্তু দিগ্বিজয়ী বিশ্বগ্রাসী কোন সেনা গ্রীষ্ম বা শীতাধিক্য বশত সহজসাধ্য কোন বিজয়ের প্রলোভন অবহেলায় ত্যাগ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল, এ অনুমান পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম শুনিলাম। তার পর খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৩০ বৎসর হইতে ২৩০ অব্দ পর্য্যন্তের কোন বিশ্বাসযোগ্য লিখিত ইতিহাস অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। তবে মুদ্রাতত্ত্ববিদেরা কতকগুলি তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই :—

আলেক্‌জাণ্ডারের মৃত্যুর পর গ্রীক্‌সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী ব্যাক্‌ট্রিয়া-প্রদেশ সেণ্ডসিডীদের অংশভূত হওয়াতে স্থানীয় কোন শাসনকর্ত্তার হস্তে তথাকার শাসনভার ন্যস্ত হয়। এই শাসনকর্ত্তা অতি অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। তখন আন্তিওকাস্ চন্দ্রগুপ্তের সাহায্যে তাহাকে এবং তাহার সহকারী রাজগণকে পরাজিত করিয়া ককেশাস্ পর্ব্বতের দক্ষিণস্থ লোয়ার ব্যাক্‌ট্রিয়ার কতকগুলি প্রদেশ চন্দ্রগুপ্তকে অর্পণ করেন। কিছুকাল পরে ব্যাক্‌ট্রিয়ার গ্রীক্‌দিগের সহিত সেণ্ডসিডীদিগের যুদ্ধ হয়, তাহাতে ভারতেশ্বর সুভগসেনের সাহায্যে সেণ্ডসিডীরা যুদ্ধে বিজয়ী হইলে ককেশাসের দক্ষিণস্থ অবশিষ্ট সমগ্র ব্যাক্‌ট্রিয়ান্ প্রদেশগুলি মহারাজ সুভগসেনের অধিকারভুক্ত হয়। ভারতসাম্রাজ্য ককেশাস্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। পরে ইউক্র্যাটাইডিস্-নামক কোন এক ব্যাক্‌ট্রিয়ারাজের সময় জুডাস্ পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাক্‌ট্রিয়া-রাজ্য পুনর্ব্বার ব্যাক্‌ট্রিয়ান্‌দিগের হস্তগত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা-

দের এই আকস্মিক শ্রীবৃদ্ধি অধিককাল স্থায়ী হইল না। ইহার পুত্র হেলিওক্লেসের সময়েই ব্যাক্‌ট্রিয়ান্‌দিগের উপর পার্থিয়ান্‌দিগের আক্রমণের আরম্ভ। কিছুদিনের মধ্যেই ইহারা ব্যাক্‌ট্রিয়া-রাজ্যের সমূলে উচ্ছেদসাধন করিয়া ফেলিল। কিন্তু ইহারা হিন্দুকুশের দক্ষিণে আসিতে পারে নাই। দিগ্বিজয়ী গ্রীকের ন্যায় নবোত্থিত পার্থিয়ান্ বীর্য্যও সমগ্র আশিয়া প্লাবিত করিয়া ভারতবাসীর নিকট বাধা পাইল। অতঃপর খৃষ্টপূর্ব্ব ১২৭অব্দে শকেদের অভ্যুদয়ে আশিয়াখণ্ডে গ্রীক্‌রাজ্যের শেষচিহ্ন পর্য্যন্ত নির্ম্মূল হইয়া গেল। এই দুর্দ্ধর্ষ শকগণ অপ্রতিহতবেগে সমস্ত মধ্য-আশিয়া গ্রাস করিয়া প্রচণ্ডবেগে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল। সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষ অচিরেই তাহাদের করতলগ্রস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু ইহার ২০।২৫বৎসরের মধ্যেই খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৬অব্দে ইহারা শকারি বিক্রমাদিত্যের হস্তে বিধ্বস্ত এবং পরাজিত হইয়া ভারতশাসনের সুখস্বপ্ন পরিত্যাগ করিয়া গৃহপ্রত্যাগত হইতে বাধ্য হইল।

আপাতত এই পর্য্যন্ত। ইহা হইতে ভারতবর্ষীয়দিগের এই অন্তত পাঁচ-সাত-শত বৎসরের ইতিহাস শৌর্য্যবীর্য্যহীন কি না, তাহা সকলেই বিবেচনা করিয়া লইতে পারেন। এই ত গেল মুদ্রাতত্ত্ববিদ্যার (Numismatics) সাক্ষ্য। বড় অল্প কথা বটে, কিন্তু আমরা আমাদের এই দুর্দ্দিনে ইহা অগ্রাহ্য করিতে পারি বলিয়া বোধ হয় না। তবে এস্থলে লেখকের দুটি-একটি টিপ্পনী নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ব্যাক্‌ট্রিয়ার বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তাদিগের—আন্তিওকাস্ প্রভৃতির—যুদ্ধের সময় চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, সুভগসেন ইত্যাদি ভারতরাজ্যাধিকারীদিগের পলিসি-সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন যে, তাঁহারা যখন যে দল প্রবল হইতেন, তখন সেই দলের সহিত যোগ দিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইতেন। (Their policy was to profit by the dissensions, which tore the Macedonian empire, and to side with whichever party had the upper hand.) 'যখন যে দল প্রবল হইত', হা অদৃষ্ট! সবলকে সাহায্য করিয়া দুর্ব্বল তাহার স্বকীয় রাজ্যের ভাগ সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বংশানুক্রমে লাভ করিতে করিতে নিজের রাজ্য বৃদ্ধি করিতে লাগিল, ইহা অন্য কোথাও সম্ভব হইয়াছিল বলিয়া শুনি নাই, হইতেছে বলিয়াও জানি না। তবে বীর্য্যহীন দুর্ব্বল আধুনিক ভারতবর্ষে অসম্ভবকেও সম্ভব হইতে হইবে!

আর একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। ইহাতে লেখক অজ-নামক (Azes) কোন রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। মুদ্রায় ইঁহার ভারতবর্ষীয়-ভাবে খোদিত চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি আলেক্‌জাণ্ডারের পর আশিয়ার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান নরপতি ছিলেন। ইঁহার রাজ্য ককেশাসের উত্তরভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চীনেরা বলেন যে, ইনি রাজা অশোক। লেখক কিন্তু বলেন যে, ইনি ভারতবর্ষীয় হইতে পারেন না। কারণ, কোনও ভারতবর্ষীয় যে ককেশাসের উত্তরভাগ পর্য্যন্ত

রাজ্যবিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহা কোনমতেই সম্ভবপর হইতে পারে না। (It is improbable that an Indian ever could have reigned north of the Caucasus, as Azes certainly did.) এ যুক্তির উত্তর কে কি দিবে? মুদ্রাতত্ত্ববিদ্যার সাক্ষ্য, চীনেদের ইতিহাস, সমস্তই অগ্রাহ্য—কেন না, "যারে দেখ্‌তে নারি তার চলন বাঁকা", তা সোজা হইলেও বাঁকা।

এরূপ আরও দুটি-একটি ঘটনা এবং আরও দুটি-একটি এই ভাবের টিপ্পনী এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত আছে। আবশ্যক হইলে সেগুলি অতঃপর আলোচনা করা যাইতে পারিবে।

অধ্যাপক।

প্রার্থনা।

আমার ঘরেতে আর নাই সে যে নাই,
যাই আর ফিরে আসি, খুঁজিয়া না পাই!
আমার ঘরেতে নাথ একটুকু স্থান—
সেথা হতে যা হারায় মেলে না সন্ধান!
অনন্ত তোমার গৃহ, বিশ্বময় ধাম,
হে নাথ খুঁজিতে তারে সেথা আসিলাম।
দাঁড়ালেম তব সন্ধ্যাগগনের তলে,
চাহিলাম তোমাপানে নয়নের জলে।
কোনো মুখ, কোনো সুখ, আশাতৃষা কোনো
যেথা হতে হারাইতে পারে না কখনো,
সেথায় এনেছি মোর পীড়িত এ হিয়া,
দাও তারে, দাও তারে, দাও ডুবাইয়া!
ঘরে মোর নাহি আর যে অমৃতরস,
বিশ্বমাঝে পাই সেই হারানো পরশ!

আহ্বান।

ঘরে যবে ছিলে মোরে ডেকেছিলে ঘরে
তোমার করুণাপূর্ণ সুধাকণ্ঠস্বরে।
আজ তুমি বিশ্বমাঝে চলে গেলে যবে
বিশ্বমাঝে ডাক মোরে সে করুণ রবে!
খুলি' দিয়া গেলে তুমি যে গৃহদুয়ার
সে দ্বার রুধিতে কেহ কহিবে না আর।
বাহিরের রাজপথ দেখালে আমায়,
মনে রয়ে' গেল তব নিঃশব্দ বিদায়!
আজি বিশ্বদেবতার চরণ-আশ্রয়ে
গৃহলক্ষ্মী দেখা দাও বিশ্বলক্ষ্মী হয়ে!
নিখিল নক্ষত্র হতে কিরণের রেখা
সীমন্তে আঁকিয়া দিক্ সিন্দুরের লেখা!
একান্তে বসিয়া আজি করিতেছি ধ্যান
সবার কল্যাণে হোক্ তোমার কল্যাণ!

পরিচয়।

যতকাল কাছে ছিলে বল কি উপায়ে
আপনারে রেখেছিলে এমন লুকায়ে?
ছিলে তুমি আপনার কর্ম্মের পশ্চাতে
অন্তর্যামী বিধাতার চোখের সাক্ষাতে।
প্রতি দণ্ড-মুহূর্ত্তের অন্তরাল দিয়া
নিঃশব্দে চলিয়া গেছ নম্র-নত-হিয়া।
আপন সংসারখানি করিয়া প্রকাশ
আপনি ধরিয়াছিলে কি অজ্ঞাতবাস!

আজ যবে চলি' গেলে খুলিয়া দুয়ার
পরিপূর্ণ রূপখানি দেখালে তোমার!
জীবনের সব দিন সব খণ্ড কাজ
ছিন্ন হয়ে পদতলে পড়ি' গেল আজ।—
তব দৃষ্টিখানি আজি বহে চিরদিন
চিরজনমের দেখা পলক-বিহীন।

মিলন।

মিলন সম্পূর্ণ আজি হল তোমাসনে
এ বিচ্ছেদবেদনার নিবিড় বন্ধনে!
এসেছ একান্ত কাছে, ছাড়ি' দেশকাল
হৃদয়ে মিশায়ে গেছ ভাঙি' অন্তরাল।
তোমারি নয়নে আজ হেরিতেছি সব,
তোমারি বেদনা বিশ্বে করি অনুভব।
তোমার অদৃশ্য হাত হেরি মোর কাজে,
তোমারি কামনা মোর কামনার মাঝে।
দুজনের কথা দোঁহে শেষ করি লব
সে রাত্রে ঘটেনি হেন অবকাশ তব!
বাণীহীন বিদায়ের সেই বেদনায়
চারিদিকে চাহিয়াছি ব্যর্থ বাসনায়!
আজি এ হৃদয়ে সর্ব্বভাবনার নীচে
তোমার আমার বাণী একত্রে মিলিছে!

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বঙ্গদর্শন।

স্বদেশ।

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কি বেশে!
দেখিনু তোমারে পূর্ব্বগগনে,
দেখিনু তোমারে স্বদেশে!
ললাট তোমার নীল নভতল,
বিমল আলোকে চির-উজ্জ্বল,
নীরব আশিষসম হিমাচল
তব বরাভয় কর,—
সাগর তোমার পরশি চরণ
পদধূলি সদা করিছে হরণ;
জাহ্নবী তব হার-আভরণ
দুলিছে বক্ষ'পর।
হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে,
হেরিনু আজিকে নিমেষে—
মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা
মোর সনাতন স্বদেশে!

শুনিনু তোমার স্তবের মন্ত্র
অতীতের তপোবনেতে,—
অমর ঋষির হৃদয় ভেদিয়া
ধ্বনিতেছে ত্রিভুবনেতে।
প্রভাতে, হে দেব, তরুণ তপনে
দেখা দাও যবে উদয়-গগনে
মুখ আপনার ঢাকি আবরণে
হিরণ-কিরণে গাঁথা,—

তখন ভারতে শুনি চারিভিতে
মিলি কাননের বিহঙ্গগীতে,
প্রাচীন নীরব কণ্ঠ হইতে
উঠে গায়ত্রীগাথা!
হৃদয় খুলিয়া দাঁড়ানু বাহিরে
শুনিনু আজিকে নিমেষে,
অতীত হইতে উঠিছে, হে দেব,
তব গান মোর স্বদেশে!

নয়ন মুদিয়া শুনিনু, জানি না
কোন্ অনাগত বরষে
তব মঙ্গলশঙ্খ তুলিয়া
বাজায় ভারত হরষে!
ডুবায়ে ধরার রণহুঙ্কার
ভেদি বণিকের ধন-ঝঙ্কার
মহাকাশতলে উঠে ওঙ্কার
কোনো বাধা নাহি মানি!
ভারতের শ্বেত হৃদিশতদলে
দাঁড়ায়ে ভারতী তব পদতলে,
সঙ্গীততানে শূন্যে উথলে
অপূর্ব্ব মহাবাণী!
নয়ন মুদিয়া ভাবিকালপানে
চাহিনু, শুনিনু নিমেষে
তব মঙ্গল-বিজয়শঙ্খ
বাজিছে আমার স্বদেশে।

রঙ্গমঞ্চ।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যমঞ্চের বর্ণনা আছে। তাহাতে দৃশ্যপটের কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না। তাহাতে যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল, এরূপ আমি বোধ করি না।

কলাবিদ্যা যেখানে একেশ্বরী, সেইখানেই তাহার পূর্ণগৌরব। সতীনের সঙ্গে ঘর করিতে গেলে তাহাকে খাটো হইতেই হইবে। বিশেষত সতীন যদি প্রবল হয়। রামায়ণকে যদি সুর করিয়া পড়িতে হয়, তবে আদিকাণ্ড হইতে উত্তরাকাণ্ড পর্য্যন্ত সে সুরকে চিরকাল সমান একঘেয়ে হইয়া থাকিতে হয়; রাগিণী-হিসাবে সে বেচারার কোনকালে পদোন্নতি ঘটে না। যাহা উচ্চদরের কাব্য, তাহা আপনার সঙ্গীত আপনার নিয়মেই জোগাইয়া থাকে, বাহিরের সঙ্গীতের সাহায্য অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করে। যাহা উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত, তাহা আপনার কথা আপনার নিয়মেই বলে; তাহা বলার জন্য কালিদাস-মিল্‌টনের মুখাপেক্ষা করে না—তাহা নিতান্ত তুচ্ছ তোম্-তানা-নানা লইয়াই চমৎকার কাজ চালাইয়া দেয়। ছবিতে, গানেতে, কথায় মিশাইয়া ললিতকলার একটা বারোয়ারি ব্যাপার করা যাইতে পারে—কিন্তু সে কতকটা খেলা-হিসাবে—তাহা হাটের জিনিষ—তাহাকে রাজকীয় উৎসবের উচ্চ আসন দেওয়া যাইতে পারে না।

কিন্তু শ্রাব্যকাব্যের চেয়ে দৃশ্যকাব্য স্বভাবতই কতকটা পরাধীন বটে। বাহিরের সাহায্যেই নিজেকে সার্থক করিবার জন্য সে বিশেষভাবে সৃষ্ট। সে যে অভিনয়ের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, এ কথা তাহাকে স্বীকার করিতেই হয়।

আমরা এ কথা স্বীকার করি না। সাধ্বী স্ত্রী যেমন স্বামীকে ছাড়া আর কাহাকেও চায় না, ভাল কাব্য তেমনি ভাবুক ছাড়া আর কাহারো অপেক্ষা করে না। সাহিত্য পাঠ করিবার সময় আমরা সকলেই মনে মনে অভিনয় করিয়া থাকি—সে অভিনয়ে যে কাব্যের সৌন্দর্য্য খোলে না, সে কাব্য কোন কবিকে যশস্বী করে নাই।

বরঞ্চ এ কথা বলিতে পার যে, অভিনয়-বিদ্যা নিতান্ত পরাশ্রিতা। সে অনাথা নাটকের জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে। নাটকের গৌরব অবলম্বন করিয়াই সে আপনার গৌরব দেখাইতে পারে।

স্ত্রৈণ স্বামী যেমন লোকের কাছে উপহাস পায়, নাটক তেমনি যদি অভিনয়ের অপেক্ষা করিয়া আপনাকে নানাদিকে খর্ব্ব করে, তবে সেও সেইরূপ উপহাসের যোগ্য হইয়া উঠে। নাটকের ভাবখানা এইরূপ হওয়া উচিত যে,—"আমার যদি অভিনয় হয় ত হইতে পারে, না হয় ত অভিনয়ের পোড়াকপাল—আমার কোনই ক্ষতি নাই!"

যাহাই হউক, অভিনয়কে কাব্যের অধীনতা স্বীকার করিতেই হয়। কিন্তু তাই

বলিয়া সকল কলাবিদ্যারই গোলামি তাহাকে করিতে হইবে, এমন কি কথা আছে! যদি সে আপনার গৌরব রাখিতে চায়, তবে যে-টুকু অধীনতা তাহার আত্মপ্রকাশের জন্য নিতান্তই না হইলে নয়, সেইটুকুই সে যেন গ্রহণ করে;—তাহার বেশি সে যাহা কিছু অবলম্বন করে, তাহাতে তাহার নিজের অবমাননা হয়।

ইহা বলা বাহুল্য, নাট্যোক্ত কথাগুলি অভিনেতার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। কবি তাহাকে যে হাসির কথাটি জোগান, তাহা লইয়াই তাহাকে হাসিতে হয়; কবি তাহাকে যে কান্নার অবসর দেন, তাহা লইয়াই কাঁদিয়া সে দর্শকের চোখে জল টানিয়া আনে। কিন্তু ছবি কেন? তাহা অভিনেতার পশ্চাতে ঝুলিতে থাকে—অভিনেতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তোলে না, তাহা আঁকামাত্র—আমার মতে তাহাতে অভিনেতার অক্ষমতা, কাপুরুষতা প্রকাশ পায়। এইরূপে যে উপায়ে দর্শকদের মনে বিভ্রম উৎপাদন করিয়া সে নিজের কাজকে সহজ করিয়া তোলে, তাহা চিত্রকরের কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া আনা।

তা ছাড়া যে দর্শক তোমার অভিনয় দেখিতে আসিয়াছে, তাহার কি নিজের সম্বল কাণা-কড়াও নাই? সে কি শিশু? বিশ্বাস করিয়া তাহার উপরে কি কোন বিষয়েই নির্ভর করিবার জো নাই? যদি তাহা সত্য হয়, তবে ডবল্ দাম দিলেও এমন সকল লোককে টিকিট্ বেচিতে নাই।

এ ত আদালতের কাছে সাক্ষ্য দেওয়া নয় যে, প্রত্যেক কথাটাকে হলফ করিয়া প্রমাণ করিতে হইবে? যাহারা বিশ্বাস করিবার জন্য—আনন্দ করিবার জন্য আসিয়াছে, তাহাদিগকে এত ঠকাইবার আয়োজন কেন? তাহারা নিজের কল্পনাশক্তি বাড়ীতে চাবি বন্ধ করিয়া আসে নাই। কতক তুমি বোঝাইবে, কতক তাহারা বুঝিবে, তোমার সহিত তাহাদের এইরূপ আপোষের সম্বন্ধ।

দুষ্যন্ত গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সখীদের সহিত শকুন্তলার কথাবার্ত্তা শুনিতেছেন। অতি উত্তম। কথাবার্ত্তা বেশ রসে জমাইয়া বলিয়া যাও! আস্ত গাছের গুঁড়িটা আমার সম্মুখে উপস্থিত না থাকিলেও সেটা আমি ধরিয়া লইতে পারি—এতটুকু সৃজনশক্তি আমার আছে। দুষ্যন্ত-শকুন্তলা অনসূয়া-প্রিয়ংবদার চরিত্রানুরূপ প্রত্যেক হাবভাব এবং কণ্ঠস্বরের প্রত্যেক ভঙ্গী একেবারে প্রত্যক্ষবৎ অনুমান করিয়া লওয়া শক্ত—সুতরাং সেগুলি যখন প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান দেখিতে পাই, তখন হৃদয় রসে অভিষিক্ত হয়—কিন্তু দুটো গাছ বা একটা ঘর বা একটা নদী কল্পনা করিয়া লওয়া কিছুই শক্ত নয়, সেটাও আমাদের হাতে না রাখিয়া চিত্রের দ্বারা উপস্থিত করিলে আমাদের প্রতি ঘোরতর অবিশ্বাস প্রকাশ করা হয়।

আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐজন্য ভাল লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে। কাব্যরস, যেটা আসল জিনিষ, সেইটেই অভিনয়ের সাহায্যে ফোয়ারার মত চারিদিকে দর্শকদের পুলকিত

চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে। মালিনী যখন তাহার পুষ্পবিরল বাগানে ফুল খুঁজিয়া বেলা করিয়া দিতেছে, তখন সেটাকে সপ্রমাণ করিবার জন্য আসরের মধ্যে আস্ত আস্ত গাছ আনিয়া ফেলিবার কি দরকার আছে—একা মালিনীর মধ্যে সমস্ত বাগান আপনি জাগিয়া উঠে। তাই যদি না হইবে, তবে মালিনীরই বা কি গুণ, আর দর্শকগুলোই বা কাঠের মূর্ত্তির মত কি করিতে বসিয়া আছে?

শকুন্তলার কবিকে যদি রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপটের কথা ভাবিতে হইত, তবে তিনি গোড়াতেই মৃগের পশ্চাতে রথ ছোটান বন্ধ করিতেন। অবশ্য, তিনি বড় কবি—রথ বন্ধ হইলেই যে তাঁহার কলম বন্ধ হইত, তাহা নহে—কিন্তু আমি বলিতেছি, যেটা তুচ্ছ তাহার জন্য যাহা বড় তাহা কেন নিজেকে কোন অংশে খর্ব্ব করিতে যাইবে? ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানে যাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল, কোন কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।

অতএব যখন দুষ্যন্ত ও সারথি একই স্থানে স্থির দাঁড়াইয়া বর্ণনা ও অভিনয়ের দ্বারা রথবেগের আলোচনা করেন, সেখানে দর্শক এই অতি সামান্য কথাটুকু অনায়াসেই ধরিয়া লন যে, মঞ্চ ছোট, কিন্তু কাব্য ছোট নয়;—অতএব কাব্যের খাতিরে মঞ্চের এই অনিবার্য্য ত্রুটিকে প্রসন্নচিত্তে তাঁহারা মার্জ্জনা করেন এবং নিজের চিত্তক্ষেত্রকে সেই ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিয়া মঞ্চকেই মহীয়ান্ করিয়া তোলেন। কিন্তু মঞ্চের খাতিরে কাব্যকে যদি খাট হইতে হইত, তবে ঐ কয়েকটা হতভাগ্য কাষ্ঠখণ্ডকে কে মাপ করিতে পারিত?

শকুন্তলা-নাটক বাহিরের চিত্রপটের কোন অপেক্ষা রাখে নাই বলিয়া আপনার চিত্রপটগুলিকে আপনি সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। তাহার কণ্বাশ্রম, তাহার স্বর্গপথের মেঘলোক, তাহার মারীচের তপোবনের জন্য সে আর কাহারো উপর কোন বরাত দেয় নাই। সে নিজেকে নিজে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। কি চরিত্রসৃজনে, কি স্বভাবচিত্রে, নিজের কাব্যসম্পদের উপরেই তাহার একমাত্র নির্ভর।

আমরা অন্য প্রবন্ধে বলিয়াছি, য়ুরোপীয়ের বাস্তব সত্য নহিলে নয়। কল্পনা যে কেবল তাহাদের চিত্তরঞ্জন করিবে তাহা নয়, কাল্পনিককে অবিকল বাস্তবিকের মত করিয়া বালকের মত তাহাদিগকে ভুলাইবে। কেবল কাব্যরসের প্রাণদায়িনী বিশল্যকরণীটুকু হইলে চলিবে না, তাহার সঙ্গে বাস্তবিকতার আস্ত গন্ধমাদনটা পর্য্যন্ত চাই। এখন কলিযুগ, সুতরাং গন্ধমাদন টানিয়া আনিতে এঞ্জিনিয়ারিং চাই—তাহার ব্যয়ও সামান্য নহে। বিলাতের ষ্টেজে শুদ্ধমাত্র এই খেলার জন্য যে বাজে খরচ হয়, ভারতবর্ষের কত অভ্রভেদী দুর্ভিক্ষ তাহার মধ্যে তলাইয়া যাইতে পারে।

প্রাচ্যদেশের ক্রিয়া-কর্ম্ম খেলা-আনন্দ সমস্ত সরল-সহজ। কলাপাতায় আমাদের ভোজ সম্পন্ন হয় বলিয়া ভোজের যাহা

প্রকৃততম আনন্দ—অর্থাৎ বিশ্বকে অবারিত-ভাবে নিজের ঘরটুকুর মধ্যে আমন্ত্রণ করিয়া আনা—সম্ভবপর হয়। আয়োজনের ভার যদি জটিল ও অতিরিক্ত হইত, তবে আসল জিনিষটাই মারা যাইত।

বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি, তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য;—তাহাতে লক্ষ্মীর পেঁচাই সরস্বতীর পদ্মকে প্রায় আচ্ছন্ন করিয়া আছে। তাহাতে কবি ও গুণীর প্রতিভার চেয়ে ধনীর মূলধন ঢের বেশি থাকা চাই। দর্শক যদি বিলাতি ছেলেমানুষিতে দীক্ষিত না হইয়া থাকে এবং অভিনেতার যদি নিজের প্রতি ও কাব্যের প্রতি যথার্থ বিশ্বাস থাকে, তবে অভিনয়ের চারিদিক্ হইতে তাহার বহুমূল্য বাজে জঞ্জালগুলো ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া তাহাকে মুক্তিদান ও গৌরব-দান করিলেই সহৃদয় হিন্দুসন্তানের মত কাজ হয়। বাগানকে যে অবিকল বাগান আঁকিয়াই খাড়া করিতে হইবে এবং স্ত্রী-চরিত্র অকৃত্রিম স্ত্রীলোককে দিয়াই অভিনয় করাইতে হইবে, এরূপ অত্যন্ত স্থূল বিলাতি বর্ব্বরতা পরিহার করিবার সময় আসিয়াছে।

মোটের উপরে বলা যাইতে পারে যে, জটিলতা অক্ষমতারই পরিচয়; বাস্তবিকতা কাঁচপোকার মত আর্টের মধ্যে প্রবেশ করিলে তেলাপোকার মত তাহার অন্তরের সমস্ত রস নিঃশেষ করিয়া ফেলে এবং যেখানে অজীর্ণবশত যথার্থ রসের ক্ষুধার অভাব, সেখানে বহুমূল্য বাহ্য প্রাচুর্য্য ক্রমশই ভীষণরূপে বাড়িয়া চলে—অবশেষে অন্নকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া চাট্‌নিই স্তূপাকার হইয়া উঠে।

যযাতি-কেশরী।

অতি প্রাচীনকালে, উৎকলদেশের একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল না; কোন স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজা উৎকলাধিপতি ছিলেন না; দেশটি কলিঙ্গের অন্তর্ভূত ছিল। প্রবাদ আছে যে, এক সময়ে ১৪৬বৎসর পর্য্যন্ত উৎকলদেশ যবনদের অধিকারে ছিল; এবং তাহার পর যযাতি-কেশরী যবনদের হস্ত হইতে দেশ উদ্ধার করিয়া একটি স্বতন্ত্র আর্য্যরাজ্য স্থাপন করেন। সে কতদিনের কথা? মাদলাপাঁজি নামে জগন্নাথদেবের দৈনিক-কর্ম্মলিপি-সংবলিত এক ইতিহাস আছে; ঐ ইতিহাস বড় প্রামাণিক জিনিষ নহে; কিন্তু তবুও উহা হইতে এমন অনেক কথা পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে একটা চলনসই ইতিহাসের কাঠাম প্রস্তুত করিবার পক্ষে অনেক সাহায্য হইয়াছে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ষ্টর্লিং-সাহেব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং হণ্টর প্রভৃতি পণ্ডিতেরা পুরাতন জীর্ণ তালপাতার পুঁথি

হইতে অনেক সার সংগ্রহ করিয়াছেন। ইঁহাদের মাহাত্ম্যে উৎকল-ইতিহাসের সহিত আমাদের পরিচয়। ষ্টর্লিং-সাহেব অনেক গবেষণা করিয়া, তালপাতার ইতিহাসে যে সকল রাজার নাম পান, তাঁহাদের অভ্যুদয়কাল নির্ণয় করিয়াছিলেন। এটা ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের কথা। একে তখন কাল-নির্ণয়াদি করিবার উপযোগী উপাদানের অত্যন্ত অভাব ছিল, তাহার উপর আবার সাহেব-মহোদয়কে সম্পূর্ণরূপে তালপাতার ইতিহাসকেই প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া লইতে হইয়াছিল; কাজেই তিনি যে রাজার যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা আর এখন গ্রহণ করিতে পারা যায় না। হণ্টর-সাহেব তাঁহার উৎকল-ইতিহাস-সঙ্কলনের সময় মোটের উপর ষ্টর্লিং-সাহেব-প্রদত্ত সন-তারিখগুলিই গ্রহণ করিয়াছেন; কেবল কদাচিৎ একালের গোটাকতক তারিখ নিজে অনুসন্ধান করিয়া বসাইয়াছেন।

এখন, তালপাতার পুঁথি, ষ্টর্লিং এবং হণ্টরকে অবলম্বন করিলে, ৪৭৬ হইতে ৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যযাতি-কেশরীর রাজত্ব-কাল স্বীকার করিতে হয়। একটুখানি অনুসন্ধান করিলেই এই নির্দ্ধারণটি অত্যন্ত ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে হইতে থাকে। বিক্রমাদিত্য এবং তাঁহার ভ্রাতার রাজত্বকালের পর হইতে যবনাধিকার পর্য্যন্ত, উৎকলে ৬জন রাজা রাজত্ব করিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই হিসাবে ৩১৯ খৃষ্টাব্দে উৎকলে যবনাধিকারের সময় দেওয়া হইয়াছে। এই ছয়জন রাজার রাজত্বের কথার ঐতিহাসিকতা থাকুক বা নাই থাকুক, যদি তর্কস্থলেও কথাটি মানিয়া লওয়া যায়, তথাপি ৬জন রাজার রাজত্বের পর ৩১৯খৃষ্টাব্দে যবনাধিকারের কাল নির্ণীত হয় না। যাঁহারা এ কালের ঐতিহাসিক আবিষ্কারের সহিত পরিচিত, তাঁহারা জানেন যে, হর্ষবিক্রমাদিত্যের কাল ৫৫০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি। সে হিসাবে, যদি বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতার একটা রাজত্বকাল না গড়িয়াও ঐ ছয়জন রাজার রাজত্বকালের হিসাব করা যায়, তাহা হইলেও কি ফল হয় দেখা যাউক। কর্ম্মজিৎ ৬৫বৎসর, হাটকেশ্বর ৫১বৎসর, বীর ভুবনদেব বা ত্রিভুবনদেব ৪৩বৎসর, নির্ম্মলদেব ৪৫বৎসর, ভীমদেব ৩৭বৎসর এবং শোভনদেব ৪বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, লেখা আছে। তাহা হইলে যবনাধিকারের সময়টা ৩১৯ না হইয়া ৭৯৫ খৃষ্টাব্দ হয়। তাহার পর আবার ১৪৬বৎসর পরে যবনদিগকে পরাজিত এবং দেশ-বহিষ্কৃত করিয়া যযাতি-কেশরীর রাজত্বের আরম্ভ। এ গণনায় যযাতি-কেশরীর কাল ৯৪১ খৃষ্টাব্দ হয়। এই গণনাটি কাহাকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বলিতেছি না; মাদলাপাঁজির কথা অবলম্বন করিলেও যে যযাতির কাল ৪৭৪ খৃষ্টাব্দ হয় না, তাহাই দেখাইলাম; এবং ঐ প্রকারের ইতিহাসকে প্রামাণিক বলিয়া ধরিলে যে পদে পদে ভ্রমে পতিত হইতে হয়, তাহাই দেখাইলাম।

এখন একবার হণ্টর-সাহেবের তালিকা লইয়া, জ্ঞাত সময় হইতে অজ্ঞাত সময়ের দিকে অগ্রসর হইয়া দেখা যাউক, যযাতি-কেশরীর সময়সম্বন্ধে কিপ্রকার সিদ্ধান্ত হয়। মুসলমানেরা সন-তারিখ দিয়া ইতি-

হাস লিখিতেন; এবং সময়নির্ণয়বিষয়ে কল্পনার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতেন না। হণ্টর-সাহেব মুসলমানদের একটা উৎকল-আক্রমণের তারিখ ধরিয়া ১৫৬৭—৬৮ খৃষ্টাব্দ তেলিঙ্গামুকুন্দদেবের রাজত্বকাল স্থির করিয়াছেন; তাঁহার রাজত্বের ১৭বৎসর পূর্ব্বে গোবিন্দবিদ্যাধর কালুয়দেবকে বধ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। কালুয় নাকি এক বৎসরের অধিক রাজত্ব করেন নাই। এই কালুয়দেব প্রসিদ্ধ প্রতাপরুদ্রদেবের পুত্র। কথিত আছে, প্রতাপরুদ্র ২৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এ হিসাবে প্রতাপ-রুদ্রের রাজত্বকাল ১৫২২—১৫৫০ হয়। এই তারিখটিতে অসম্ভাব্যতা নাই। কারণ প্রতাপরুদ্রের সময়েই চৈতন্যদেব উৎকলে আসিয়াছিলেন, এবং ইঁহারই রাজত্বসময়ে পুরীতে তাঁহার অন্তর্দ্ধান হয়। চৈতন্যদেবের তিরোভাবকাল ১৫২৭ বলিয়া নির্দ্ধারিত হই-য়াছে। চোরগঙ্গ হইতে প্রতাপরুদ্র পর্য্যন্ত ২০জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। ধরিয়া লওয়া যাউক,উহা সত্য কথা। তালপাতার ইতিহাসের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন না করিয়া, গড়ে যদি ১৫ বৎসর করিয়া ইঁহাদের রাজত্বকাল ধরা যায়, তাহা হইলে চোরগঙ্গ ১২২৭ খৃষ্টাব্দে আসিয়া পড়েন; এবং জগন্নাথমন্দিরের জন্ম উহার ৬০বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৮৭তে পড়ে। চোরগঙ্গের পূর্ব্বে, যযাতি হইতে সুবর্ণকেশরী পর্য্যন্ত, ৪৪জন কেশরী রাজার রাজত্ব করার কথা উল্লিখিত আছে। দেশের প্রাচীনতাপ্রতিষ্ঠার জন্য, অনেক সময়েই তালিকাগুলি বড় ভারি করা হইত; যাঁহারা একই রাজার রাজত্বসময়ে একটু বিদ্রো-হিতা করিয়াও এখানে-সেখানে ৫।৩খানি গ্রাম লইয়া রাজা হইয়া বসিতেন, তাঁহাদের নামও যে পরে পরে সাজাইয়া দেওয়া হইত, এরূপ দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। সে সকল আনুমানিক কথা না হয় নাই তুলিলাম এবং মাদলাপাঁজিতে ইঁহাদের রাজত্বকালসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ধরিয়া লওয়া যাউক। এই রাজাদের রাজত্বকাল ৬৫৮ বৎ-সর ধরা হইয়াছে; এখন ১২২৭ হইতে ঐ অঙ্কটি বাদ দিলে, যযাতি-কেশরীর ৫৬৯ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হওয়ার কথা। এ হিসাবে ৪২৩—৫৬৯ উৎকলে যবনাধিকারের কাল। এই তারিখগুলিও পাঠকবর্গকে বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বলিতে পারি না।

প্রবাদ বা ইতিহাসের কথা এই যে, যখন যবনেরা উৎকল অধিকার করে, তখন তাহাদের ভয়ে জগন্নাথঠাকুরটিকে শোণপুরের এক পর্ব্বতগুহায় লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। এবং যযাতি যবনদের পরাজয় করিয়া সেই মূর্ত্তি পুনর্ব্বার পুরীতে ফিরাইয়া আনেন। যযাতি-কেশরী আর্য্যরাজ্য স্থাপন করিয়া বাঙ্গালার সেন রাজাদের মত, আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ব্রাহ্মণ আনিয়া, দেশটা আর্য্যজাতির নিবাসস্থান করিয়া তুলেন; এবং তিনিই শিবলিঙ্গাধিষ্ঠিত ভুবনেশ্বরমন্দির নির্ম্মাণ করেন। কালনির্ণয়ের জন্য এ সকলগুলি কথারই বিচার করিবার প্রয়োজন হইবে।

প্রথমে যবনাধিকারের সময়ের কথার আলোচনা করা যাউক। দক্ষিণাঞ্চলে অন্ধ্রুরাজগণকে পরাভূত করিয়া, অষ্ট যবন

মেকলে রাজত্ব করিবে, বিষ্ণুপুরাণের এই ভবিষ্যদ্বাণী। মেকলরাজ্যটি একালের মধ্যপ্রদেশের ছত্তিশগড়-বিভাগের রায়পুর এবং বিলাসপুরের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়া ছিল। মেকলপর্ব্বত বাকাটকরাজ্যের পূর্ব্বসীমায়; এবং মাহেষ্মতীর দক্ষিণ হইতে অর্থাৎ মণ্ডলার দক্ষিণ হইতে একালের কাঁকের পর্য্যন্ত প্রসারিত। এই প্রদেশ বহুকাল হইতে পুলিন্দ, শবর এবং গণ্ড-জাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ছিল। কানিংহামের সিদ্ধান্ত যে, অনার্য্যধর্ম্মমিশ্রিত বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী এই অনার্য্যেরাই সেই যবন। কালিদাসের শকুন্তলায় পর্য্যন্ত কিরাতাদি অনার্য্যজাতি যবন বলিয়াই উল্লিখিত দেখিতে পাই। শিশুনিতে যে প্রাচীনলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত সপ্ত-যবনের কলিঙ্গ এবং পূর্ব্বসাগরকূল পর্য্যন্ত রাজত্ব করার কথা আছে। এই লিপির বিবরণ বোম্বাইপ্রদেশের আসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালের ৮ম ভাগে দ্রষ্টব্য। এ সকল কথার পর কানিংহামের সিদ্ধান্তটা গ্রহণ করিতে আপত্তির কারণ নাই। বাকাটকের রাজারা উৎকলের যবন, ভাও-দাজির এই অনুমান ভ্রমাত্মক মনে করিয়া পরিহার করিলাম। বিষ্ণুপুরাণে অষ্ট-যবনের রাজত্বের কথা বলা হইল; অথচ যবনদের পরাভূত করিয়া যযাতি আর্য্যরাজ্য স্থাপন করিলেন, সে কথার উল্লেখ নাই। আর্য্যদের কাছে এটা বড় কথা; যবন-রাজত্বের শেষেই যযাতির অভ্যুদয়; যবন-দের রাজত্বের শেষ দেখিয়াই ভবিষ্যদ্বাণী; অথচ যযাতির নাম পাই না কেন? কানিং-হাম প্রমাণ করিয়াছেন যে, যবনকর্ত্তৃক অন্ধ্রদের পরাজয় এবং সাগরসীমা পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তৃতি ৫১৫ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল। সকল কথাই নিক্তির ওজনে তুলিয়া লওয়া যায় না; সম্ভাব্যতার হিসাবে এ সময় ৫১৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নহে, বরং পরে হইতে পারে। এখন ইহার সহিত ১৪৬ বৎসর যোগ করিলে ৬৬১ খৃষ্টাব্দ পাই। এই ৬৬১ কি যযাতির সময়? আমার মনে হয়, তাহাও নহে। মেকলের যবনজাতিকে পরাজয় করিয়া ঠিক্ কোন্ তারিখে দক্ষিণকোশলে আর্য্যরাজত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে দক্ষিণকোশলের ইন্দ্রবল যে প্রায় ৬৬১তে রাজত্ব করিয়া-ছিলেন, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। ঐ স্থানের তিবরদেবের যে লিপি শবরীপুর বা শিরপুরে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে উহা যে অষ্টম শতাব্দীর লিপি, সে বিষয়ে বড় একটা সন্দেহ হয় না। ফ্লীট-সাহেব অতি দক্ষতার সহিত তিবরদেবকে ৮ম শতাব্দীর রাজা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইন্দ্রবল তিবরদেবের পিতামহ; তিবরদেবের রাজত্বকাল যদি ৭২১ হয়, তাহা হইলে ইন্দ্র-বলের রাজত্বকাল ৬৬১ বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলে। কেহই জন্মপত্রিকা রাখিয়া যান নাই; তবে এ অনুমানে সকল দিক্ রক্ষা পায়। এই অনুমানের উপযোগিতা পরে আরও দেখাইতেছি। তিবরদেব একটা খাঁটি আর্য্যনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন; সেটি চন্দ্রগুপ্ত। তাঁহার পর হর্ষগুপ্ত, শিবগুপ্ত, ভবগুপ্ত এবং শিবগুপ্তের রাজত্ব। তাঁহারা শুধু কোশলে কেন, পূর্ব্বে যতদূর যবনরাজ্য

ছিল, ততদূর পর্য্যন্ত রাজত্ববিস্তার করিয়াছিলেন। আমি, উভয় শিবগুপ্তের এবং ভবগুপ্তের যে তিনখানি তাম্রলিপি পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহাদের এই বর্ণনা আছে যে, তাঁহারা "সোককুলতিলক", "ত্রিকলিঙ্গাধিপতি" এবং "প্রখ্যাতদ্বৈষিবংশপ্রবিদলনপটু।" এই প্লেট-তিনখানি কুটিল অক্ষরে লিখিত। ঐ অক্ষর এবং প্লেটগুলির প্রকৃতি এবং অবস্থা দেখিয়া ওগুলিকে ৮ম শতাব্দীর পূর্ব্বকালের বলিয়া কোনপ্রকারে অনুমান করা অসম্ভব। প্লেটতিনখানির প্রতিলিপি এবং ইংরাজি অনুবাদ বাঙ্গালার এসিয়াটিক সোসাইটির হস্তে দিয়াছি; এবং একখানি প্লেট, আমার অনুবাদসহ, নাগপুর মিউজিয়মে আছে। তিবরদেব হইতে শেষ শিবগুপ্ত পর্য্যন্ত যদি ৯০ বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলেও শেষ শিবগুপ্তের কাল ৮১০ হয়।

এসিয়াটিক সোসাইটিতে যযাতি-কেশরীর যে লিপি রক্ষিত আছে, তাহাতে লেখা আছে যে, তিনি যখন উৎকলে আসিলেন, তখন সমগ্র দেশ (ত্রিকলিঙ্গ, মেকল, কোশল) শিবগুপ্তদেবের শাসনাধীনে ছিল। তাহা হইলে এ গণনায় যযাতি-কেশরী নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে আসিয়া পড়িতেছেন। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, বিক্রমাদিত্যের সংবতের পর ৬জন রাজা ধরিয়া, এবং যবনাধিকারে ১৪৬বৎসর যোগ করিয়া ৯৪১ পাওয়া যায়। সেটা বেশি আনুমানিক বলিয়া, যযাতির সময় ৮১০ বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলে। ফ্লীটসাহেবের তীক্ষ্ণবিচারে হয় ত সময়টা আরও পরবর্ত্তী হইবার কথা।

ইতিহাসের অন্যদিক্ হইতে আমার সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতা দেখাইতেছি। মধ্যপ্রদেশ হইতে তাড়িত হইবার পর, যবনেরা পশ্চিমপ্রদেশে এবং দাক্ষিণাত্যে গিয়া প্রাধান্যস্থাপন করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের মলবর-উপকূলের প্রাচীন রাজবংশের বিবরণীতে পাওয়া যায় যে, ঐ প্রদেশে শবরযবনেরা ৭৮২ খৃষ্টাব্দে অধিকার করিয়াছিল। তাহা হইলে তিবরদেবের সময়সম্বন্ধে ফ্লীট্ সাহেব যাহা বলেন, তাহা প্রমাণসিদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। একটা কথা স্থির হইলে, পরবর্ত্তী কথায়ও বেশি গোল থাকে না। শিবগুপ্তের পর মাহেষ্মতীর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বংশধর চেদি বা হৈহয় রাজারা যে কোশলে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহাও জানা গিয়াছে। এ বিষয়ের বিশেষ তত্ত্ব কানিংহাম-সাহেবের অর্কিয়লজিকল্ সর্ভে নামক গ্রন্থাবলীতে আছে। কৌতূহলী পাঠকেরা ঐ গ্রন্থের ৭ম, ৯ম এবং ১৭শ ভাগ পড়িতে পারেন।

হুয়েনসঙ্গ ৬২৯—৬৪৫ পর্য্যন্ত ভারতভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনায় উড্রদেশের কথা আছে বটে, কিন্তু যাজপুরের বা ভুবনেশ্বরের নাম নাই। যদি যাজপুরে রাজধানী কিংবা ভুবনেশ্বরে কোন নূতন কীর্ত্তি স্থাপিত হইত, তাহা হইলে তাহার উল্লেখ থাকিত। ভুবনেশ্বরের মন্দির নূতন রকমের জিনিষ; দেশের মধ্যে একটা বড় রকমের নামজাদা শিল্পের দৃষ্টান্ত; শিবমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত; সেটাকে কেহ কখনো দশটার মধ্যে একটা বলিয়া গণনা করিতে পারিতেন না। সে

সময়ের তাম্রলিপ্তির বর্ণনা আছে, চিল্কাতটে হিন্দুদের কাঞ্জোধরাজ্য স্থাপিত থাকিবার কথা আছে; উড্রদেশ তখনও বৌদ্ধপরিপ্লুত এবং বৌদ্ধদের বিশেষ আশ্রয়স্থান বলিয়া উল্লিখিত আছে। ইহাতে কি বুঝিব? তাহার পর আবার তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, চিল্কাতটের কাঞ্জোধরাজ্যে আর্য্যাবর্ত্তের অক্ষর এবং আর্য্যাবর্ত্তের বাক্যকথনের ভাষা প্রচলিত। কিন্তু উড্রদেশসম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, সেখানকার ভাষা স্বতন্ত্র, লোকগুলি বলিষ্ঠ, কৃষ্ণবর্ণ এবং প্রায়শ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। কাঞ্জোধে অনার্য্য ছিল না, তাহা নয়; তবে উড্রদেশসম্বন্ধে এই বিশেষ বর্ণনা কেন? মনে হয় না কি যে, তখনও উৎকলদেশ বৌদ্ধযবনকর্ত্তৃক শাসিত ছিল? ৪৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ব্রাহ্মণাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া, জগন্নাথ আনিয়া, ভুবনেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া, কি এই হইয়াছিল যে, হুয়েনসঙ্গের চক্ষে কেশরীদের গৌরবদীপ্তি প্রতিভাত হইল না? উৎকলের ভাষা পুরাতন প্রাক্তের যতটা নিকটবর্ত্তী, তাহাতে কি কেহ বলিতে পারেন যে, উৎকলের আর্য্যেরা তখন দুর্বোধ্য অনার্য্যভাষায় কথা কহিত?

কবি কালিদাসের সময়টা ষষ্ঠ শতাব্দী বলিয়াই স্থির হইয়াছে। তিনি রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে যে দিগ্বিজয়বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সময়ের ভারতবর্ষের অবস্থা অতি সুন্দর পরিস্ফুট। কবি যখন জৈত্রযাত্রার সৈন্যদলটি বঙ্গদেশ হইতে কলিঙ্গে লইয়া যাইতেছেন, তখন উৎকলের পথ দিয়া লইয়া যাইতেছেন, দেখিতে পাই। উৎকলের যদি তখন স্বাতন্ত্র্য থাকিত, উৎকলে যদি তখন স্বতন্ত্র রাজা ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে জয় না করিয়া একেবারে কলিঙ্গে চলিয়া যাওয়াটা সম্ভবপর কি? সৈন্যেরা কপিশা-নদী পার হইল, অথচ যাজপুরটা চোখে ঠেকিল না?

স তীর্ত্বা কপিশাং সৈন্যৈর্বদ্ধিরদসেতুভিঃ।
উৎকলাদর্শিতপথঃ কলিঙ্গাভিমুখং যযৌ।

ষষ্ঠশতাব্দীর মধ্যভাগে এই কথায় উৎকলের কথা শেষ হইল। কালিদাস হুয়েনসাঙ্গ নহেন, তিনি হিন্দু। তাঁহার চোখেও ভুবনেশ্বরের মন্দির পড়িল না; তিনিও যবনকুলজেতা আর্য্যধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনকারী কেশরিরাজগণকে দেখিতে পাইলেন না। তবুও স্বীকার করিতে হইবে যে, যযাতির কাল ৪৭৪?

কালিদাসের সময়ে বরাহমিহিরের লেখায় যে সকল অনার্য্যজাতির নাম পাওয়া যায়, তাহা এই:—অন্ধ্রাদি দ্রাবিড়জাতি, শাকারি, শাবরি, উৎকল, অভিরক। সকল দেশেই অনার্য্য ছিল; কিন্তু যে স্থান প্রধানত আর্য্যশাসনে ছিল এবং অনার্য্যেরা যেখানে প্রজামাত্র ছিল, সেস্থলের অনার্য্যদের স্বাতন্ত্র্যগণনা হয় নাই। ইহাতে কি মনে হয় যে, উৎকলে তখন আর্য্যনিবাস স্থাপিত হইয়া কেশরীদের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল?

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের দেবতা শিবমূর্ত্তি নহেন, শিবলিঙ্গ। সেইজন্যই ভুবনেশ্বরের নূতনত্ব। লিঙ্গপূজাপ্রবর্ত্তনের কাল-নিরূপণ করিলেও যযাতি-কেশরীর কাল নিরূপিত হইতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে একেবারে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিব, সঙ্কল্প করিয়াছি। এখানে যযাতির অনুরোধে দু-

চারিটি কথা লিখিয়া অতবড় কথার একটা সিদ্ধান্ত করা উপযুক্ত বলিয়া মনে হইল না।

যযাতির সময় ৮১০ বলিয়া ধরিয়া লওয়া গেল। এখন যদি কেশরিবংশের রাজত্বকাল ৪০০বৎসর ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে পরবর্ত্তি-সময়-সম্বন্ধেও কোন গোল হয় না। ৪০০বৎসরের অধিক কখনও কোন রাজবংশ এ দেশে রাজত্ব করিয়াছেন, দেখি নাই। যাহা পূর্ব্বকালে হয় নাই, তাহা যে উচ্ছৃঙ্খল সময়ে সম্ভব হইয়াছিল, ইহা মনে হয় না।

যযাতি কোনও প্রকারে ৬৪৫এর পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন না, তাহা অন্য ইতিহাস হইতে প্রমাণীকৃত হয়। তিনি নিজে আপনাকে শিবগুপ্তের সমসাময়িক লোক বলিয়াছেন; কাজেই তাঁহার অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ অথবা নবম শতাব্দীর পূর্ব্বভাগের রাজা হওয়াই সম্ভব। যে শ্রেণীর কুটিল অক্ষরে তাঁহার নিজের সময়ের লিপি, তাহাও ঐ সময়ের অক্ষর। এই সকল কারণে যযাতি-কেশরীকে ৮১০ খৃষ্টাব্দের রাজা বলিয়া স্থির করা গেল। লিঙ্গপ্রতিষ্ঠার সাক্ষ্যটিও বড় প্রবল; কিন্তু সে-কথা এখন বলিব না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

নারী।

সাঙ্গ হয়েছে রণ!
অনেক যুঝিয়া অনেক খুঁজিয়া
শেষ হল আয়োজন।
তুমি এস, এস নারি,
আন তব হেমঝারি!
ধুয়ে-মুছে দাও ধূলির চিহ্ন,
জোড়া দিয়ে দাও ভগ্ন-ছিন্ন,
সুন্দর কর, সার্থক কর
পুঞ্জিত আয়োজন!
এস সুন্দরি নারি
শিরে লয়ে হেমঝারি!

হাটে আর নাই কেহ।
শেষ করে' খেলা ছেড়ে' এনু মেলা,
গ্রামে গড়িলাম গেহ।

তুমি এস, এস নারি,
আন গো তীর্থবারি!
স্নিগ্ধ-হসিত বদন-ইন্দু,
সিঁথায় আঁকিয়া সিঁদুর-বিন্দু
মঙ্গল কর' সার্থক কর'
শূন্য এ মোর গেহ!
এস কল্যাণি নারি
বহিয়া তীর্থবারি!

বেলা কত যায় বেড়ে'।
কেহ নাহি চাহে খর-রবি-দাহে
পরবাসী পথিকেরে!
তুমি এস, এস নারি,
আন তব সুধাবারি!
বাজাও তোমার নিষ্কলঙ্ক
শত-চাঁদে-গড়া শোভন শঙ্খ,
বরণ করিয়া সার্থক কর'
পরবাসী পথিকেরে!
আনন্দময়ি নারি,
আন' তব সুধাবারি!

স্রোতে যে ভাসিল ভেলা।
এবারের মত দিন হল গত
এল বিদায়ের বেলা।
তুমি এস, এস নারি,
আন গো অশ্রুবারি!
তোমার সজল কাতরদৃষ্টি
পথে করে' দিক্ করুণাবৃষ্টি,
ব্যাকুল বাহুর পরশে, ধন্য
হোক্ বিদায়ের বেলা!
অয়ি বিষাদিনি নারি
আন গো অশ্রুবারি!

আঁধার নিশীথরাতি।
গৃহ নির্জ্জন, শূন্য শয়ন,
জ্বলিছে পূজার বাতি!
তুমি এস, এস নারি,
আন তর্পণবারি!
অবারিত করি ব্যথিত বক্ষ
খোল হৃদয়ের গোপন-কক্ষ,
এলো-কেশপাশে শুভ্র-বসনে
জ্বালাও পূজার বাতি!
এস তাপসিনি নারি,
আন তর্পণবারি!

সার সত্যের আলোচনা।

মাঝপথ।

বিশেষ কোনো কার্য্য-উপলক্ষে দূরদেশে যাত্রা করিবার সময় মাঝপথে কালবিলম্ব করা যাত্রীর পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে—তাহাতে কার্য্যহানি হইতে পারে। তবে, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য মাঝপথের স্থানে স্থানে ন্যূনাধিক কালবিলম্ব না করিলে নয়—কাজেই করিতে হয়। আমরা এক্ষণে আত্মা হইতে সত্যে যাইবার পথে উপনীত হইয়াছি। এই মাঝপথটিতে কিয়ৎকাল থামিয়া-দাঁড়াইয়া কতকগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা নিতান্তই আবশ্যক।

ভাব-জগতের আত্মজ্ঞান কিরূপ পদার্থ, তাহা আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে দেখিয়াছি। আমাদের গম্যস্থান হ'চ্চে সত্য-জগৎ। ভাব-জগতের মধ্য দিয়া সত্যজগতে উপনীত হইতে হইবে; তাহার পথ হ'চ্চে আত্মজ্ঞান। সম্মুখবর্ত্তী পথের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল আলোচিতপূর্ব্ব আত্মজ্ঞানের মধ্য হইতেই সংগ্রহ করিতে হইবে। তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি যে, সাধক আত্মশক্তি খাটাইয়া আপনাকে জ্ঞাতৃস্থান হইতে জ্ঞেয়স্থানে আনয়ন করেন। তাহা না করিয়া তিনি যদি বলেন—"'আমি আছি' এ কথাটিতে আমার তিলমাত্রও সংশয় নাই; এই তো আমার আত্মজ্ঞান হইয়াছে; ইহার অধিক তুমি কি চাও?" তবে সে যে তাঁহার আত্মজ্ঞান, সেরূপ আত্মজ্ঞান সকলেরই আছে; তাহার জন্য সাধনের কোনো আবশ্যকতা নাই। সেরূপ আত্মজ্ঞানে যদি তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারিত, তবে তো কোনো গোলই থাকিত না! দুঃখের বিষয় এই যে, সেরূপ আত্মজ্ঞানে কোনো তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরই আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না। আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না কেন? না, যেহেতু সেরূপ আত্মজ্ঞানে শুদ্ধকেবল আত্মার সত্তামাত্রের প্রতি লক্ষ্য করা হয়; তা বই, আত্মার আর-যে-দুইটি ভাব সেই সত্তার সঙ্গাশ্রিত, সে দুইটি ভাবের প্রতি আদবেই ভ্রূক্ষেপ করা হয় না। সে দুইটি ভাব কি? জ্ঞানের দিক্ দিয়া দেখিলে সে দুইটি ভাব হ'চ্চে আত্মার (১) জ্ঞানক্রিয়া এবং (২) জ্ঞেয় ভাব; কার্য্যের দিক্ দিয়া দেখিলে সে দুইটি ভাব হ'চ্চে আত্মার (১) শক্তিস্ফূর্ত্তি এবং (২) গুণপ্রকাশ। আত্মার শক্তি এবং গুণের প্রতি কিছুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া শুদ্ধকেবল আত্মার সংজ্ঞা-নির্ব্বাচনকেই কিছু আর আত্মজ্ঞান বলা যাইতে পারে না। আত্মার সংজ্ঞা-নির্ব্বাচন খুবই সহজ—"যিনি জানিতেছেন তিনিই আত্মা" এইমাত্র। "যিনি জানিতেছেন তিনি আত্মা" এইরূপে আমি আত্মাকে সংজ্ঞিত করিলাম, কিন্তু যিনি জানিতেছেন তিনি কিরূপ পদার্থ—কিরূপেই বা তাঁহাকে জ্ঞানে উপলব্ধি করা সম্ভবে—তাহা জানিলাম না, এরূপ আত্মজ্ঞান নিতান্তই অঙ্গহীন, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে, সাধক যখন আত্মশক্তি খাটাইয়া আপনাকে আপনার জ্ঞানগোচরে আনয়ন করেন, তখন তিনি আত্মাকে জ্ঞানের কর্ত্তা জ্ঞাতা, জ্ঞানের লক্ষ্য জ্ঞেয় এবং জ্ঞানের ক্রিয়া জ্ঞানক্রিয়া, এই তিন ভাবে একসঙ্গে উপলব্ধি করেন; আত্মার কোনো মর্ম্মাশ্রিত ভাবকেই তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে দূরে সরাইয়া রাখেন না। এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীন আত্মজ্ঞানই—গোটা আত্মজ্ঞানই—প্রকৃত আত্মজ্ঞান। তাহারও পরের কথা এই যে, সর্ব্বাঙ্গীন আত্মজ্ঞানেও সাধকের মনের চাঞ্চল্য, সংশয় এবং তজ্জনিত কষ্ট দূর হয় না—যতক্ষণ না তাঁহার সেই স্বশক্তিসম্ভূত আত্মজ্ঞান সর্ব্বমূলাধার বাস্তবিক সত্যের অবলম্বন পায়; কিন্তু সে কথা পরে আসিবে। আপাতত ভাব-জগতের ঐরূপ সর্ব্বাঙ্গীন আত্মজ্ঞান হইতে কতকগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা চাই; তাহাতেই অন্বেষণচেষ্টা নিয়োগ করা বিধেয়।

ভাব-জগতের সর্ব্বাঙ্গীন আত্মজ্ঞান হইতে আমরা প্রধান যে-চারিটি বিষয় সংগ্রহ করিয়া পাইতেছি, তাহা ক্রমান্বয়ে এই :—

(১) আত্মার সত্তা।
(২) আত্মার শক্তিস্ফূর্ত্তি।
(৩) আত্মার গুণপ্রকাশ।
(৪) আত্মার গুণপ্রকাশে আত্মার উপলব্ধি।

এই চারিটি বিষয়। এতদ্ব্যতীত ঐ চারিটি বিষয়ের পরস্পরাধীন সম্বন্ধ হইতে (অথবা যাহা আরো ঠিক্—একাত্মভাব হইতে) আরেকটি বিষয় পাইতেছি; তাহা এই যে, আত্মার সত্তা যাহা সাধনের পূর্ব্বে জ্ঞাতৃস্থানে অব্যক্ত থাকে, সাধনের পথ দিয়া তাহাই জ্ঞেয়স্থানে ব্যক্ত হয়; তাহা যখন হয়, তখন আত্মার শক্তিস্ফূর্ত্তি এবং গুণ-

প্রকাশ দুইই সেই সত্তার সহিত ওতপ্রোত-ভাবে একযোগে ব্যক্ত হয়। এইরূপ যখন কর্ত্তা-কর্ম্ম-ক্রিয়া-সমন্বিত সমগ্র আত্মা জ্ঞেয়-স্থানে ব্যক্ত হ'ন, তখন সেইরূপ ব্যক্ত হওয়ার নামই সমগ্র আত্মজ্ঞান, এবং তাহা আত্মশক্তিরই ফলস্বরূপ। এই স্থানটিতে একটি সোজা কথা গোলোকধাঁদার ন্যায় বিষম এক পাকচক্রময় জটিল এবং দুরূহ আকার ধারণ করে। কথাটি হ'চ্চে—আত্মসত্তা, আত্মশক্তি এবং আত্মজ্ঞান, তিনের মধ্যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। একসঙ্গে অভেদ এবং প্রভেদ বুঝাও কঠিন—বুঝানোও কঠিন। পক্ষান্তরে, যদি অভেদ এবং প্রভেদ এই দুই সম্বন্ধকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বুঝিতে এবং বুঝাইতে যাওয়া যায়, তাহা হইলে আর-এক বিপদ্ উপস্থিত হয়;—(১) অভেদ-সম্বন্ধ পৃথক্‌রূপে আলোচনা করিতে গেলে প্রভেদের পথ একেবারেই অবরুদ্ধ হইয়া যায়; (২) প্রভেদসম্বন্ধ পৃথক্‌রূপে আলোচনা করিতে গেলে অভেদের পথ একেবারেই অবরুদ্ধ হইয়া যায়। জানিয়া-শুনিয়া আমি এক্ষণে এই অপরিহার্য্য বিপদ্‌টিকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইতেছি;—প্রথমে—আত্মসত্তা, আত্মশক্তি এবং আত্মজ্ঞান তিনের মধ্যে অভেদ কিরূপ এবং তাহার পরে তিনের মধ্যে প্রভেদ কিরূপ;—পৃথক্ পৃথক্ রূপে এই দুইটি বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছি। যাহারই যখন তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব, তাহারই দিকে তখন সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ঢলিয়া পড়িব, তাহা আমি জানি; আর, সেই কারণে অপর পক্ষের কোপে পড়িব, তাহাও আমি জানি; জানিয়াও, আমি ফাঁদে পা না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহা এই যে, আমি দেখিয়া-শেখা অপেক্ষা ঠেকিয়া-শেখা পছন্দ করি। আমার এইরূপ বিশ্বাস যে, যাহা ঠেকিয়া শেখা যায়, তাহা যেমন মনোমধ্যে পাকাপোক্ত-রকমে বদ্ধমূল হয়—দেখিয়া-শেখা জিনিষ কখনই তেমনটি হয় না। অতএব প্রথমে প্রভেদের কথা দূরে সরাইয়া রাখিয়া—জ্ঞান এবং সত্তার মধ্যে অভেদ কিরূপ, তাহা দেখা যা'ক্।

সম্যক্ জ্ঞান সত্তা হইতে তিলমাত্রও পৃথক্ নহে—সম্যক্ জ্ঞান এবং সত্তা একই। যদি বল যে, জ্ঞান এবং সত্তা পরস্পর হইতে ভিন্ন, তবে আমি বলিব যে, যে-অংশে জ্ঞান সত্তা হইতে ভিন্ন, সে অংশে তাহা জ্ঞান নহে। যদি হাতী হাতি-রূপে প্রকাশ পায়, তবে তাহারি নাম হস্তিবিষয়ক জ্ঞান; পক্ষান্তরে, যদি হাতী ঘোড়া-রূপে প্রকাশ পায়, তবে তাহার নাম হস্তিবিষয়ক অজ্ঞান বা ভ্রম। তবেই হইতেছে যে, জ্ঞেয়বস্তুর প্রকাশ যে-অংশে জ্ঞেয়বস্তুর সহিত অভিন্নরূপী, সেই অংশেই তাহা জ্ঞাননামের যোগ্য। ইহা হইতে আসিতেছে এই যে, জ্ঞেয়বস্তুর প্রকাশ যদি জ্ঞেয়বস্তু হইতে তিলমাত্রও ভিন্ন হয়, তবে যে-অংশে তাহা জ্ঞেয়বস্তু হইতে ভিন্ন, সেই অংশে তাহা ভ্রম-শব্দের বাচ্য। কথায় বলে "যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়"—যে বিপদের আশঙ্কা করিতেছিলাম, সেই বিপদ্ এক্ষণে সম্মুখে দণ্ডায়মান। উপরের যুক্তি অনুসারে অগত্যা

দাঁড়াইতেছে এই যে, জ্ঞেয়বস্তুর সত্তা এবং সম্যক্ জ্ঞান দুয়ের মধ্যে তিলমাত্রও প্রভেদ নাই,—জ্ঞান এবং সত্তা একই। প্রভেদের পক্ষ এতক্ষণ চুপিচুপি অস্ত্র শানাইতেছিল—এক্ষণে অবসর বুঝিয়া তাহা তীব্র-বেগে বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল।

সত্তাই যদি জ্ঞান হয়, তবে সত্তা তো গোড়া হইতেই আছে। সত্তাই যদি জ্ঞানের আর-এক নাম হয়, তবে তো জ্ঞান যতদূর হইবার, তাহা গোড়া হইতেই হইয়া বসিয়া আছে। তবে আর জ্ঞানকে পাইবার জন্য এত আগ্রহই বা কেন;—জ্ঞানকে বাড়াইবার জন্য এত সাধ্যসাধনাই বা কেন? সত্তার তো উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই, পরিবর্ত্তনও নাই, সত্তা স্বতঃসিদ্ধ; অতএব, সত্তা এবং জ্ঞান যদি একই হয়, তবে কাজেই দাঁড়াইতেছে যে, জ্ঞানের উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই, পরিবর্ত্তনও নাই; জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ। ভ্রম কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ নহে; ভ্রমের উৎপত্তিও আছে, বিনাশও আছে, পরিবর্ত্তনও আছে। ভ্রম একটা আগন্তুক পদার্থ অর্থাৎ উড়িয়া-আসিয়া-জুড়িয়া-বসা-রকমের পদার্থ। ভ্রম যখন আগন্তুক পদার্থ, তখন তাহা না থাকিলেও না থাকিতে পারে। মনে কর, জ্ঞান হইতে সমস্ত ভ্রম ঝাঁটাইয়া ফ্যালা হইল, আর, সেই গতিকে জ্ঞান যতদূর নিখুঁত পরিষ্কার হইতে হয়, তাহা হইল। তুমি বলিতেছ যে, ওরূপ অবস্থায় সত্তার সহিত জ্ঞানের তিলমাত্রও প্রভেদ থাকে না। ইহাতে প্রকারান্তরে বলা হইতেছে এই যে, ওরূপ অবস্থায় জ্ঞানের কার্য্য ফুরাইয়া যায়, আর, সেই সঙ্গে জ্ঞান আপনিও ফুরাইয়া যায়;—থাকে কি? না, যাহা গোড়া হইতেই আছে—সত্তা-মাত্র। তবেই হইতেছে যে, জ্ঞানের পরম পরিশুদ্ধ অবস্থা জ্ঞানের অন্তিম দশা; সে অবস্থায় জ্ঞান সত্তার সাগরে ঝম্প প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করে।

বাদী, প্রতিবাদী, উভয় পক্ষেরই কথা এই তো শোনা হইল। বাদী যাহাকে বলিতেছেন—জ্ঞানের পরম পরিশুদ্ধ অবস্থা, প্রতিবাদী তাহাকে বলিতেছেন—জ্ঞানের অন্তিম দশা। এই দুই কথার কাহার কি মূল্য, তাহা একবার মনের বাজারে যাচাই করিয়া দেখা যা'ক্। মন বলে এই যে, জ্ঞানের পরম পরিশুদ্ধ অবস্থা সকলেরই প্রার্থনীয়—জ্ঞানের অন্তিম দশা কাহারো প্রার্থনীয় নহে। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, জ্ঞানের পরম পরিশুদ্ধ অবস্থার নিকটে জ্ঞানের অন্তিম দশাকে ঘেঁসিতে না দেওয়া সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। কিন্তু এই প্রার্থনীয় কার্য্যটি ঘটাইয়া তুলিবে কে? তাহা যদি ঘটাবার না হয়, তবে তুমিও তাহা ঘটাইয়া তুলিতে পার না—আমিও তাহা ঘটাইয়া তুলিতে পারি না; আর, তাহা যদি ঘটাবার হয়, তবে তাহার একটা বন্দোবস্ত গোড়া হইতেই হইয়া আছে, তাহাতে আর ভুল নাই। জ্ঞান এবং সত্তার মধ্যে প্রভেদ রক্ষা করা যাহার কার্য্য, সে তাহা চিরকালই করিয়া আসিতেছে এবং চিরকালই করিবে—তুমি বলিলেও করিবে—না বলিলেও করিবে। সে কার্য্য কাহার কার্য্য? সে কার্য্য যাহার কার্য্য এবং যে তাহা চিরকালই অতন্দ্রিতভাবে করিয়া আসিতেছে

এবং করিবেও, তাহার নাম শক্তি। শক্তিই জ্ঞান এবং সত্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দুয়ের প্রভেদ চিরকাল রক্ষা করিয়া আসিতেছে এবং করিবেও তাহা চিরকাল। শক্তির কার্য্যই হ'চ্চে তাই। এই শক্তির অভ্যাগমনে আমরা ফাঁকা সত্তার বদলে গোটা সত্তা পাইতেছি। গোটা সত্তা হ'চ্চে সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান, তিনই একাধারে। একটি বীণাযন্ত্রের তিনটি তার। বীণাযন্ত্র হ'চ্চে আত্মা; আর, তাহার তিনটি তার হ'চ্চে—সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান। এই তিনটি তার পরস্পরের সহিত এরূপ অভেদ-প্রাণ যে, একটিতে অঙ্গুলি-কোণ ঠেকাইবামাত্রই তিনটি একসঙ্গে বাজিয়া উঠে। তা শুধু নয়—সামান্য বীণাযন্ত্রের তন্ত্রীস্থান হাতের তেলোর মতো চ্যাপ্‌টা—এইজন্য কোন্ তারটি মাঝের তার, এবং কোন্ দুটি তার পার্শ্বের তার, তাহা দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে, আলোচ্য বীণাটির তন্ত্রীস্থান বংশখণ্ডের ন্যায় চোঙাকৃতি। এইজন্য, এ বীণার তিনটি তারের প্রত্যেকটিই মাঝের তার বলিয়া গৃহীত হইতে পারে; আর যেটিকে যখন মাঝের তার বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তখন অপর দুইটি তার সেইটিরই দুই পার্শ্বের দুইটি তার হইয়া দাঁড়ায়। ফলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাজের লোকেরা শক্তিকেই মাঝের তার বলিয়া গ্রহণ করেন—পণ্ডিত লোকেরা জ্ঞানকেই মাঝের তার বলিয়া গ্রহণ করেন—ভাবের লোকেরা সত্তাকেই মাঝের তার বলিয়া গ্রহণ করেন। শাক্তের নিকটে শক্তিই জ্ঞান; বৈষ্ণবের নিকটে জ্ঞানই শক্তি; ভক্তের নিকটে সত্তা বা বস্তুই সার—যেমন "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর!" যখন শক্তিকে সত্তা এবং জ্ঞানের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া ধরা যায়, তখন মনে হয় যে, জ্ঞান অপেক্ষা শক্তি সত্তার নিকটের বস্তু; তেমনি আবার, যখন জ্ঞানকে শক্তি এবং সত্তার মধ্যবর্ত্তী বলিয়া ধরা যায়, তখন মনে হয় যে, শক্তি অপেক্ষা জ্ঞান সত্তার নিকটের বস্তু। প্রকৃত কথা এই যে, শক্তি এবং জ্ঞান, দুইই সত্তার সহিত ওতপ্রোত;—কাজেই দুইকে যদি সত্তা হইতে ভিন্ন করিয়া দেখিতে হয়, তবে উভয়কে সত্তা হইতে সমদূরবর্ত্তী বলাই যুক্তিসঙ্গত; আর, যদি দুইকে সত্তার সহিত অভিন্নভাবে দেখিতে হয়, তবে তো কথাই নাই;—তবে সত্তাও যা, শক্তিও তা, জ্ঞানও তা, তিনই এক হইয়া দাঁড়ায়। ন্যায়-দর্শনের একটি গোড়ার কথাই হ'চ্চে—"শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ" শক্তি এবং শক্তিমান্ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ নাই। কথাগুলা বড্ড দার্শনিক হইয়া পড়িতেছে; অতএব একটা স্থূল উদাহরণ দিতেছি, তাহা হইলেই এখানকার প্রকৃত মন্তব্য কথাটি পাঠকের সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।

আমার মনোমধ্যে আমি একটা গল্প সাজাইয়া তাহার রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। গল্পটি সংক্ষেপে এই :—

অবন্তীরাজ্যের প্রধান মন্ত্রী নানাপ্রকার ছলে-বলে-কৌশলে রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন এবং অবশেষে আপনার পাকচক্রে আপনি জড়াইয়া-পড়িয়া অশেষ দুর্গতি প্রাপ্ত হইলেন।

গল্পের মাঝখানটিতে দুষ্ট মন্ত্রী যখন সুখ-সমৃদ্ধিতে স্ফীত হইয়া ধরাকে সরা-জ্ঞান করিতেছে, তখনকার সে কথাটি আমার প্রকৃত মনের কথা নহে; অথচ সেই কথাটির নানাপ্রকার ডালপালা সাজাইয়া তাহাই আমাকে সর্ব্বাগ্রে রচনা করিতে হইতেছে। আমার যাহা প্রকৃত মনের কথা, তাহা সকলের শেষে বাহির হইবে। দুষ্ট মন্ত্রীর দুর্গতি-আকাঙ্ক্ষা রচিতব্য উপন্যাসটির বীজ। সেই বীজটি এক্ষণে আমার মনের মধ্যে মাটি-চাপা রহিয়াছে। গল্পের শেষভাগে ঐ বীজটি যখন প্রকাশ্যে বহির্গত হইবে, তখন তাহা শস্যের আকার ধারণ করিবে; অথবা, যাহা একই কথা—নিজমূর্ত্তি ধারণ করিবে। এখন, যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, বীজের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটের বস্তু কে? তবে তাহার দুই ভাবের উত্তর দুইপ্রকার। এক ভাবের উত্তর এই যে, বীজের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটের বস্তু হ'চ্চে অঙ্কুর; আর-এক ভাবের উত্তর এই যে, বীজের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটের বস্তু হ'চ্চে শস্য। প্রথম ভাবের উত্তরটির ভাবার্থ যে কি, তাহা তাহার গায়ে লেখা রহিয়াছে; তাহা এই যে, বীজের অব্যবহিত-পরবর্ত্তী দেশকালে অঙ্কুর ফুটিয়া বাহির হয়। দ্বিতীয় ভাবের উত্তরটির একটু টীকা করা আবশ্যক। সে টীকা এই :—

শস্যই বীজের নিজমূর্ত্তি। অঙ্কুর বীজের ব্যক্তিমূর্ত্তি। উপন্যাসের শেষের কথাটিই আমার মনের নিকটতম বস্তু;—মাঝের ডালপালা সেই নিকটতম বস্তুটিকে দূরে সরাইয়া রাখিতেছে। মাঝের ডালপালা আমার মনের এত যে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে—তথাপি তাহাকে আমি একটিবারও নিবারণ না করিয়া ক্রমিকই প্রশ্রয় দিতেছি। কেন এরূপ করিতেছি? তাহার কারণ কি? কারণ আর কিছু না—বিপরীত ভাবের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া মনোগত ভাবটিকে বিধিমতে ফুটাইয়া তুলিবার ইচ্ছা। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, গল্পের ডালপালা সাজাইয়া যে কথাটিকে আমি সেই জঙ্গলাকীর্ণ প্রাচীরের ও-পিটে সরাইয়া রাখিতেছি, সেই শেষের কথাটি গোড়াতেই আমার মনে উপস্থিত হইয়াছিল এবং গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত ক্রমাগতই তাহা আমার মনে নিরবচ্ছেদে লাগিয়া রহিয়াছে। তবেই হইতেছে যে, সেই শেষের কথাটই সর্ব্বাপেক্ষা আমার মনের নিকটের বস্তু। এখন কথা হ'চ্চে এই যে, বীজ যেমন ডালপালার মধ্য দিয়া শস্যাকারে ফুটিয়া বাহির হইয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করে, সত্তা সেইরূপ শক্তিস্ফূর্ত্তির মধ্য দিয়া জ্ঞানাকারে ব্যক্ত হইয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করে। যে হিসাবে শস্য বীজের নিকটতম বস্তু (অর্থাৎ যে হিসাবে গল্পের শেষের কথাটিই গোড়ার কথা) সেই হিসাবে, জ্ঞান, সত্তার নিকটতম বস্তু; আর যে হিসাবে অঙ্কুর বীজের নিকটতম বস্তু, সেই হিসাবে, শক্তি, সত্তার নিকটতম বস্তু। যদি শক্তির প্রতি আদবেই দৃক্‌পাত না করা যায়, তবে জ্ঞান এবং সত্তা একাকারে পরিণত হয়, তাহা আমরা একটু পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। এটাও তেমনি দেখা উচিত যে, যদি জ্ঞানের প্রতি আদবেই দৃক্‌পাত করা না যায়, তবে সত্তা এবং শক্তি একাকারে পরিণত হয়; কেন না, জ্ঞানের ভোগে না আসিলে শক্তির সমস্ত কার্য্যই ব্যর্থ হইয়া গিয়া একান্তপক্ষেই

তাহা ভূতের ব্যাগার হইয়া দাঁড়ায়। মনে কর—আর সবই হইয়াছে, কেবল চেতন-পদার্থ হয়ও নাই, আর, ভবিষ্যতে যে হইবে, তাহার সম্ভাবনাও নাই; এরূপ অবস্থায় শক্তি কেন-যে শুধুশুধু খাটিয়া মরিবে, তাহার কোনো অর্থ থাকে না; কাজেই, ওরূপ উদ্দেশ্য-বিহীন, লক্ষ্য-বিহীন, অর্থ-বিহীন অবস্থায় শক্তি সত্তাতে বিলীন হইয়া গেলেই বাঁচে; তা শুধু নয়—ওরূপ অবস্থায় শক্তি আগেভাগেই সত্তাতে বিলীন হইয়া বসিয়া আছে; কেন না, জ্ঞানের নিকটে শক্তির কার্য্য প্রকাশ পাওয়াতেই শক্তির শক্তিত্ব হয়—শক্তির প্রকাশ বন্ধ হওয়ার নামই শক্তির প্রলয়-অবস্থা। জ্ঞান না থাকিলে শক্তির প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়; শক্তির প্রকাশ বন্ধ হইয়া গেলেই শক্তি সত্তাতে বিলীন হইয়া যায়। এইরূপ আমরা দেখিতেছি যে, একদিকে, শক্তি,—জ্ঞান এবং সত্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া জ্ঞান এবং সত্তার প্রভেদ রক্ষা করিতেছে; আর এক দিকে, জ্ঞান,—সত্তা এবং শক্তির মাঝখানে দাঁড়াইয়া সত্তা এবং শক্তির প্রভেদ রক্ষা করিতেছে।

এতক্ষণের ধস্তাধস্তির পরে প্রকৃত কথাটির দর্শন পাওয়া গেল; তাহা কি? না সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞানের প্রভেদাত্মক অভেদ এবং অভেদাত্মক প্রভেদ, এক কথায়—একাত্মভাব।

গোড়াতেই আমাদের মনে বিষম এক আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল এই যে, জ্ঞানের পরম পরিশুদ্ধ অবস্থা যদি জ্ঞানের অস্তিম-দশারই আর-এক নাম হয়, তবেই তো বিপদ্! এক্ষণে দেখিতেছি যে, সে আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক। কেন না, সত্তা বলিলেও সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান একসঙ্গে বুঝায়—জ্ঞান বলিলেও সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান একসঙ্গে বুঝায়,—শক্তি বলিলেও সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান একসঙ্গে বুঝায়; প্রভেদ কেবল এই যে, সত্তা বলিলে সত্তা-প্রধান জ্ঞান-এবং-শক্তি বুঝায়, শক্তি বলিলে শক্তি-প্রধান সত্তা-এবং-জ্ঞান বুঝায়, জ্ঞান বলিলে জ্ঞান-প্রধান শক্তি-এবং-সত্তা বুঝায়। সত্তাকে যদি সত্তা-প্রধান জ্ঞান-এবং-শক্তি না বলিয়া তাহাকে জ্ঞান এবং শক্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌রূপে গ্রহণ করিতে চাও; শক্তিকে যদি শক্তি-প্রধান জ্ঞান-এবং-সত্তা না বলিয়া জ্ঞান-এবং-সত্তা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌রূপে গ্রহণ করিতে চাও; জ্ঞানকে যদি জ্ঞান-প্রধান শক্তি-এবং-সত্তা না বলিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ পৃথক্‌রূপে গ্রহণ করিতে চাও; তবে তাহা করিয়া দেখ—তাহা হইলেই তোমার চক্ষু ফুটিবে। সত্তাকে তুমি যদি শক্তি হইতে পৃথক্ কর, তবে সত্তার সহিত তোমার কোনো সম্বন্ধই ঘটিতে পারিবে না; সত্তাকে যদি জ্ঞান হইতে পৃথক্ কর, তবে সত্তা তোমার নিকটে প্রকাশই পাইতে পারিবে না। এরূপ অবস্থায়, তোমার মুখে সত্তা-শব্দ একটা নিতান্তই উড়া-সামগ্রী, তাহা বায়ুর অধিক আর কিছুই নহে। তেমনি, জ্ঞানকে সত্তা-এবং-শক্তি হইতে পৃথক্ করিলে জ্ঞানও কিছুই-না হইয়া যাইবে; শক্তিকে সত্তা-এবং-জ্ঞান হইতে পৃথক্ করিলে তাহারও ঐ দশা ঘটিবে। ফল কথা এই যে, দীপ যেমন দীপশিখা, দীপরশ্মি এবং দীপালোক তিনই

একাধারে, আত্মা তেমনি আত্মসত্তা, আত্ম-শক্তি এবং আত্মজ্ঞান, তিনই একাধারে। অতএব এটা স্থির যে, সাধকের জ্ঞানে যদি আত্মা প্রকাশিত হ'ন, তবে আত্মার সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান, তিনই একসঙ্গে প্রকাশিত হইবে; এরূপ হইবে না যে,

(১) জ্ঞান এবং শক্তি অন্তর্হিত হইয়া শুদ্ধকেবল সত্তামাত্র প্রকাশ পাইতেছে;

অথবা

(২) শক্তি এবং সত্তা অন্তর্হিত হইয়া শুদ্ধকেবল জ্ঞানমাত্র প্রকাশ পাইতেছে;

অথবা

(৩) সত্তা এবং জ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া গিয়া শুদ্ধকেবল শক্তিমাত্র প্রকাশ পাইতেছে।

মাঝপথের ব্যাপার অনেকটা বলিয়া চুকিলাম। অল্প-একটু যাহা বাকি আছে, তাহা বারান্তরের জন্য স্থগিত রাখা হইল। বিষয়টি এই:—আত্মজ্ঞানের ভিতরে ঐ তিন পদার্থের (সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞানের) তারতম্যই বা কিরূপ—সামঞ্জস্যই বা কিরূপ—তাহার পর্য্যালোচনা।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিশ্ব-দোল।

চিরকাল একি লীলা গো—
অনন্ত কলরোল!
অশ্রুত কোন্ গানের ছন্দে
অদ্ভুত এই দোল!
দুলিছ গো, দোলা দিতেছ!
পলকে আলোকে তুলিছ, পলকে
আঁধারে টানিয়া নিতেছ!
সমুখে যখন আসি,
তখন পুলকে হাসি,
পশ্চাতে যবে ফিরে যায় দোলা
ভয়ে আঁখিজলে ভাসি!
সমুখে যেমন পিছেও তেমন
মিছে করি মোরা গোল!
চিরকাল এক(ই) লীলা গো
অনন্ত কলরোল!

ডান হাত হতে বাম হাতে লও,
বাম হাত হতে ডানে!
নিজধন তুমি নিজেই হরিয়া
কি যে কর কেবা জানে!
কোথা বসে আছ একেলা!
সব রবিশশী কুড়ায়ে লইয়া
তালে তালে কর এ খেলা!
খুলে দাও ক্ষণতরে,
ঢাকা দাও ক্ষণপরে,
মোরা কেঁদে ভাবি আমারি কি ধন
কে লইল বুঝি হরে'?
দেওয়া-নেওয়া তব সকলি সমান,
সে কথাটি কেবা জানে!
ডান হাত হতে বাম হাতে লও,
বাম হাত হতে ডানে।

এইমত চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা!
চির দিনরাত আপনার সাথ
আপনি খেলিছ পাশা!
আছে ত যেমন যা' ছিল!
হারায়নি কিছু ফুরায়নি কিছু
যে মরিল যেবা বাঁচিল!
বহি' সব সুখদুখ
এ ভুবন হাসিমুখ!
তোমারি খেলার আনন্দে তার
ভরিয়া উঠেছে বুক!
আছে সেই আলো, আছে সেই গান,
আছে সেই ভালবাসা!
এইমত চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা!

মহাকাব্যের লক্ষণ।

ইংরাজি এপিক্-শব্দের অনুবাদে মহাকাব্য-শব্দের প্রয়োগ চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু এপিকের সমস্ত লক্ষণের সহিত মহাকাব্যের সমস্ত লক্ষণ মিলে কি না, তাহা বলিতে পারি না। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে আমার কিছু-মাত্র জ্ঞান নাই, কিন্তু শুনিয়াছি যে, আলঙ্কারি-কেরা মহাকাব্যের লক্ষণ যেরূপ সূক্ষ্মভাবে বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহাতে মহাকবিগণের চিন্তার কারণ কিছুই রাখেন নাই। কালিদাস, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি কবিগণের রচিত মহাকাব্য এ দেশে চলিত আছে, এবং ঐ সকল মহাকাব্য সম্ভবত অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য। রামায়ণ ও মহাভারত, এই দুই গ্রন্থকে মহাকাব্য বলা চলে কি না, তাহা লইয়া একটা তুমুল সমস্যা গোড়াতেই দাঁড়ায়। ইংরাজি পুস্তকে রামায়ণ ও মহাভারত এপিক্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, কিন্তু আমাদের পণ্ডিতেরা উহাদিগকে মহাকাব্য বলিতে সর্ব্বদা সম্মত হন না। প্রথমত এ দুই গ্রন্থ অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মাবলি অত্যন্ত উৎ-কটরূপে লঙ্ঘন করিয়াছে। দ্বিতীয়ত মহাকাব্য বলিলে উহাদের গৌরবহানির সম্ভাবনা জন্মে। ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদি আখ্যা দিলে বোধ করি এই দুই গ্রন্থের মর্য্যাদারক্ষা হইতে পারে। কিন্তু মহাকাব্য বলিলে উহাদের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হয়।

বস্তুতই মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হয়। কুমার-সম্ভব ও কিরাতার্জ্জুনীয় যে অর্থে মহাকাব্য, রামায়ণ-মহাভারত কখনই সে অর্থে মহাকাব্য নহে। কুমারসম্ভব, কিরাতার্জ্জুনীয় যে শ্রেণীর—যে পর্য্যায়ের গ্রন্থ, রামায়ণ-মহা-ভারত কখনই সে শ্রেণীর—সে পর্য্যায়ের গ্রন্থ নহে। একের নাম মহাকাব্য দিলে, অন্যকে মহাকাব্য বলা কিছুতেই সঙ্গত হয় না।

রামায়ণ-মহাভারতের ঐতিহাসিকত্বে ও ধর্ম্মশাস্ত্রত্বে সম্পূর্ণ আস্থাবান্ থাকিয়াও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, উহাতে কাব্যরসও যথেষ্টপরিমাণে বিদ্যমান। মহর্ষি বাল্মীকি ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখ্য উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, উঁহারা যাহা লিখিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে প্রচুরপরিমাণে কবিত্ব রহিয়া গিয়াছে,—হয় ত উঁহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু কবিত্ব যে আছে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ করিবার উপায় নাই।

রামায়ণ-মহাভারতে কবিত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলেই, মহর্ষিদ্বয়কে মহাকবি ও তাঁহাদের কাব্যদ্বয়কে মহাকাব্য না বলিলে চলে না। কেন না, ভাষাতে আর কোন শব্দ নাই, যদ্দ্বারা এই কাব্যদ্বয়ের সঙ্গত নামকরণ চলিতে পারে। কুমারসম্ভব-কিরাতার্জ্জু-নীয়কে আপাতত মহাকাব্যের শ্রেণী হইতে খারিজ করিয়া দিয়া আমরা রামায়ণ-মহাভারতকেই মহাকাব্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

মনে হইতেছে মেকলে কোথায় বলিয়াছেন, সভ্যতার সহিত কবিত্বের কতকটা খাদ্য-খাদক বা অহি-নকুল সম্বন্ধ রহিয়াছে। সভ্যতা কবিত্বকে গ্রাস করে; অথবা সভ্যতার আওতায় কবিতার লতা বাড়িতে পায় না। বলা বাহুল্য, মেকলের অনেক উক্তির মত এই উক্তিটিকেও সুধীজনে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। বিগত উনবিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার আস্ফালন সত্ত্বেও ইউরোপখণ্ডে কবিত্বের যেরূপ স্ফূর্ত্তি দেখা গিয়াছে, তাহাই তাহার প্রমাণ। অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

কিন্তু আমার বোধ হয় মেকলের ঐ উক্তির ভিতর একটু প্রচ্ছন্ন সত্য আছে। সভ্যতা কবিত্বের মস্তক চর্ব্বণ না করিতে পারে, কিন্তু মহাকাব্যকে বোধ করি সশরীরে গ্রাস করিয়া ফেলে। আবার বলা আবশ্যক, মহাকাব্য-শব্দ আমি আলঙ্কারিক-সম্মত অর্থে ব্যবহার করিতেছি না। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও প্যারাডাইস্ লষ্টকে আমি এস্থলে মহাকাব্যের মধ্যে ফেলিতেছি না। রামায়ণ-মহাভারত যে পর্য্যায়ের কাব্য, সেই পর্য্যায়ের কাব্যকেই আমি মহাকাব্য বলিতেছি। পৃথিবীতে কত কবি কত কাব্য লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, কিন্তু মহাকাব্য সে-ই কোন্-কালে রচিত হইয়া গিয়াছে, তাহার পর আর একখানাও রচিত হইল না। পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যে লেখকের কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি নাই; কিন্তু সন্দেহ হয়, কেবল হোমারের নামে প্রচলিত গ্রন্থদুইখানি ব্যতীত আর কোন কাব্যকে রামায়ণ-মহাভারতের সমান পর্য্যায়ে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। পাশ্চাত্যদেশে সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত কবিত্বের অবনতি হইয়াছে, এ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না; কিন্তু শেক্স্পীয়ারের নাম মনে রাখিয়াও অকুতোভয়ে বলা যাইতে পারে, ইউরোপ-মহাদেশেও একবারের বেশী হোমারের জন্ম হয় নাই।

বস্তুতই পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে ও সভ্যতার ইতিহাসে কোন্ প্রাচীনকালে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের উদ্ভব হইয়াছিল; তাহার পর কত-হাজার বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু মহাকাব্যের আর উৎপত্তি হইল না। কেন এরূপ হইল, তাহার কারণ চিন্তনীয়; কিন্তু সেই কারণ আবিষ্কারে লেখকের ক্ষমতা নাই। তবে একএকবার মনে হয়, মনুষ্যসমাজের বর্ত্তমান অবস্থাই বোধ করি আর সেই-শ্রেণীর মহাকাব্য উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল নহে।

রামায়ণ-মহাভারত ও হোমারের মহাকাব্যে আমরা মনুষ্যসমাজের যে চিত্র অঙ্কিত দেখি, তাহাতে সেই সমাজকে আধুনিক হিসাবে সভ্য বলিতে পারা যায় না। মনুষ্যসমাজের সে অবস্থা আবার কখনও ফিরিয়া আসিবে কি না, তাহা জানি না; কিন্তু তাৎকালিক সমাজে যে সকল ঘটনা প্রতিদিন সংঘটিত হইত, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা ঘটিতে পারে না। আমরা এমন কল্পনায় আনিতে পারি না যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি কোন ইউরোপের রাজসভায় আতিথ্যস্বীকার করিয়া অবশেষে রাজলক্ষ্মীকে ষ্টীমারে তুলিয়া প্রস্থান করিতেছেন, ও তাহার প্রতিশোধ-গ্রহণার্থ ইউরোপের নরপালবর্গ ওয়াশিংটন

অবরুদ্ধ করিয়া দশবৎসরকাল বসিয়া আছেন। ডিলারী বন্দীকৃত লর্ড মেথুয়েন্‌কে গাড়ির চাকায় বাঁধিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার বন্ধুর উপত্যকায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছেন, ইহা কোন দিনের টেলিগ্রামে দেখিবার কেহ আশা করেন নাই। সিডান্‌ক্ষেত্রে বিসমার্ক লুই নেপোলিয়ন্‌কে হস্তগত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার বুক চিরিয়া নেপোলিয়ন্-বংশের শোণিতের আস্বাদগ্রহণ আবশ্যক বোধ করেন নাই। ত্রেতাযুগ-অবসানের বহুদিন পরে বুয়রদেশে লঙ্কাকাণ্ডের অপেক্ষাও তুমুল ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু কোন বিজয়ী মহাবীরকে তজ্জন্য লাঙ্গুলের ব্যবহার করিতে হয় নাই।

সেকালের এই অসভ্যতা আমাদের চোখে বড়ই বীভৎস ঠেকে, সন্দেহ নাই; কিন্তু সেকালের সামাজিকতার আর একটা দিক্ আছে, একালে সে দিক্‌টাও তেমন দেখিতে পাই না। বার্ক একসময় আপনার মহাপ্রাণতার ঝোঁকে বলিয়াছিলেন, শিভাল্‌রির দিন গত হইয়াছে। শিভাল্‌রি-নামক অনির্ব্বাচ্য বস্তু নগ্ন বর্ব্বরতার সহিত নিরাবরণ মনুষ্যত্বের অপূর্ব্ব মিশ্রণে সমুৎপন্ন। একালে মানুষ মানুষের রক্তপান করিয়া জিঘাংসার তৃপ্তি করিতে চাহে না বটে; কিন্তু আবার জ্যেষ্ঠভ্রাতার কটাক্ষমাত্রশাসনে, পত্নীর অপমান স্বচক্ষে দেখিয়াও, আত্মসংযমে সমর্থ হয় কি না, বলা যায় না। একালের রাজারা মালকোঁচা মারিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গদাহস্তে অবতীর্ণ হন না সত্য বটে, কিন্তু ভীমরতিগ্রস্ত পিতার একটা কথা রাখিবার জন্য ফিজি-দ্বীপে নির্ব্বাসন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকেন কি না, বলিতে পারি না। অশ্বত্থামা ঘোর নিশাকালে সুখসুপ্ত বালকবৃদ্ধের হত্যাসাধন করিয়া ভীষণ ক্রূরতা দেখাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু সভা ডাকিয়া ও খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া সেই ক্রূরতার সমর্থন তাঁহার নিতান্তই আবশ্যক হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণ যখন জয়বিষয়ে নিতান্ত হতাশ হইয়া নিশাকালে শত্রুশিবিরে ভীষ্মের নিকট দীনভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ভীষ্মকে তাঁহার জীবনটুকু দান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের লৌহবর্ম্মের অন্তরালে কারেন্‌সি নোটের গোছা লইয়া যাওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই।

গত চারি-হাজার বৎসরের মধ্যে মনুষ্যসমাজের বাহিরের মূর্ত্তিটা অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে সত্য কথা, কিন্তু তাহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতির কতটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা বলা দুষ্কর। মনুষ্যের বাহিরের পরিচ্ছদটা সম্পূর্ণ বদ্‌লাইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যের ভিতরের গঠন অনেকটা একরূপই আছে। সেকালের রাজারাজড়াও বোধ করি সময়মত কৌপীনধারী হইয়া সভামধ্যে বাহির হইতে লজ্জিত হইতেন না; কিন্তু এখনকার অন্নহীন শ্রমজীবীরাও সমস্ত অঙ্গের মালিন্য ও বিরূপতা পোষাকের আচ্ছাদনে আবৃত রাখিতে বাধ্য হয়। সেকালে ক্রূরতা ছিল, বর্ব্বরতা ছিল, পাশবিকতা ছিল, এবং তাহা নিতান্ত নগ্ন, নিরাবরণ অবস্থাতেই ছিল। তাহার উপর কোনরূপ আচ্ছাদন,

কোনরূপ পালিশ্, কোনরূপ রঙ্-ফলান ছিল না। একালেও ক্রূরতা, বর্ব্বরতা ও পাশবিকতা হয় ত ঠিক তেমনি বর্ত্তমান আছে; তবে তাহার উপর একটা কৃত্রিম ভণ্ডামির আবরণ স্থাপিত হইয়া তাহার বীভৎস ভাবকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে। সম্প্রতি চীনদেশে সভ্য ইউরোপের সম্মিলিত সেনা যে পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে আটিলা ও জঙ্গিস্‌খাঁর প্রেতাত্মার আর লজ্জিত হইবার কোন কারণই নাই।

বস্তুতই চারি-হাজার বৎসরের ইতিহাস সূক্ষ্মভাবে তলাইয়া দেখিলে বুঝা যায়, মনুষ্যচরিত্র অধিক বদ্‌লায় নাই; তবে সমাজের মূর্ত্তিটা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এবং মনুষ্যসমাজের অবস্থা যে কাব্যগ্রন্থে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, সেই কাব্যের মূর্ত্তিও যে তদনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। বিস্ময়ের কারণ থাক্ আর নাই থাক্, আধুনিক কালের সাহিত্যে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের আর আবির্ভাব হয় নাই, এবং আর যে কখনও হইবে, তাহা আশা করাও দুষ্কর। সাহিত্যে মহাকাব্যের যুগ বোধ হয় অতীত হইয়া গিয়াছে। কালের যখন অবধি নাই ও পৃথ্বী যখন বিপুলা, তখন বড় কবির ও বড় কাব্যের অসদ্ভাব কখন হইবে না, কিন্তু মনুষ্যসমাজের সেই প্রাচীন অবস্থা ফিরিয়া আসিবার যদি সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে মহাকবির ও মহাকাব্যের বোধ করি আবির্ভাব আর হইবে না।

বস্তুতই আর আবির্ভাবের আশা নাই। মহাকাব্যের মধ্যে একটা উন্মুক্ত অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা আছে, তাহা বোধ করি আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না। সুনিপুণ শিল্পী একালে তাজমহল গড়িতে পারেন, কিন্তু পিরামিডের দিন বুঝি একবারে চলিয়া গিয়াছে। মহাকাব্যগুলিকে আমরা মহাকায় অদ্ভুত পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। একএকবার মনে হয়, উহাদিগকে কোন মানবহস্তনির্ম্মিত কৃত্রিম কারুকার্য্যের সহিত তুলনা না করিয়া প্রকৃতির হস্তনির্ম্মিত নৈসর্গিক পদার্থের সহিত উপমিত করা উচিত।

আমাদের ভারতবর্ষের মহাভারতকে একএকবার ভারতবর্ষের হিমাচলের সঙ্গে তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। হিমাচল যেমন তাহার বিপুল পাষাণকলেবরের অঙ্কদেশে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছে, মহাভারতের বিপুল কলেবর তেমনি ভারতীয় সাহিত্যকে কত-সহস্র-বৎসর কাল অঙ্কে রাখিয়া লালন-পালন ও পোষণ করিয়া আসিতেছে। হিমাচলের বিশাল বক্ষোদেশ হইতে বিনিঃসৃত সহস্র উৎস হইতে সহস্র স্রোতস্বিনী অমৃতরসপ্রবাহে ভারতভূমিকে আর্দ্র ও সিক্ত করিয়া 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' পুণ্যভূমিতে পরিণত করিয়াছে, সেইরূপ মহাভারতের মধ্য হইতে সহস্র উপাখ্যান, সহস্র কাহিনী, সহস্র কথা সমগ্র জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে সহস্র ধারা প্রবাহিত করিয়া পুণ্যতর ভাবপ্রবাহে জাতীয় সাহিত্যকে চিরহরিৎ রাখিয়া বহুকোটি লোকের জাতীয় জীবনে পুষ্টি ও কান্তি প্রদান করিয়া আসিতেছে। ভূতত্ত্ববিৎ যেমন হিমাচলের ক্রম-বিন্যস্ত স্তরপরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া

তাহার মধ্য হইতে কত বিস্ময়কর জীবের অস্থিকঙ্কাল উদ্ধার করিয়া অতীতের লুপ্ত-স্মৃতি কালের কুক্ষি হইতে উদ্ঘাটন করেন; সেইরূপ প্রত্নতত্ত্ববিৎ এই বিশাল গ্রন্থের স্তরপরম্পরা হইতে ভারতীয় জনসমাজের অতীত ইতিহাসের বিস্মৃত নিদর্শনের চিহ্ন ধরিয়া ইতিহাসের অতীত অধ্যায় আবিষ্কার করেন।

ভূতত্ত্ববিৎ তাঁহার মানসচক্ষু অতীত-কালের পরপারে প্রসারিত করিয়া দেখিতে পান, বসুন্ধরার ইতিহাসে এমন একদিন আসিয়াছিল, যখন মহাকাল স্বয়ং আপনার ভীমবাহু প্রসারণ করিয়া উত্তপ্ত ধরাগর্ভে বিপুল শক্তিরাশি কেন্দ্রীভূত করিতেছিলেন, দেখিতে দেখিতে সেই পুঞ্জীকৃত শক্তিসমষ্টি আপনাকে প্রসারিত করিয়া ভূবক্ষ বিদারণ করিয়া বহির্গত হইল। ভীষণ ভূকম্পে ধরাপৃষ্ঠ মুহুর্মুহু আলোড়িত হইল। সাগর-বক্ষ উচ্ছ্বসিত হইয়া পুনরায় ভীতিভরে অপসরণ করিল। পূর্ব্বসাগরের বেলাভূমি হইতে পশ্চিমসাগরের বেলাভূমি পর্য্যন্ত ভূগর্ভ বিদারণ করিয়া মহাকায় পাষাণ-কলেবর' হিমাচল গাত্রোত্থান করিল। তাহার তুহিনমণ্ডিত সূর্য্যকিরণোজ্জ্বল শৃঙ্গ-সমূহ বেষ্টিত করিয়া ঝঞ্ঝাবায়ু ঘোররাবে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। ধূম্রবর্ণা কাদম্বিনীর বক্ষোদেশে সৌদামনী স্ফুরিত হইতে লাগিল। শৃঙ্গের উপর শৃঙ্গ আসিয়া ভাঙিয়া পড়িল; দ্রোণিদেশ অধিত্যকায় উত্থিত হইল ও অধিত্যকা দ্রোণিদেশে নামিয়া গেল; অরণ্যানী জ্বলিয়া উঠিল, জীবকুল নীরব হইল, মহাকালের তাণ্ডব-নর্ত্তনের সহকারে অট্টহাস্যে দিগন্ত নিনাদিত হইতে লাগিল।*

কেন এমন হয় জানি না, কিন্তু নিসর্গের ইতিবৃত্তে যেমন মহাকাল মাঝে মাঝে এইরূপ তাণ্ডবনর্ত্তনের উন্মত্ত ক্রীড়া প্রদর্শন করেন, মানবসমাজের ইতি-বৃত্তেও সেইরূপ সময়ে সময়ে তাঁহার অট্ট-হাস্যের নির্ঘোষধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের ঘটনা প্রাচীন ভারতসমাজের একদেশে সংঘটিত হইলেও, ইহাকে আমরা সমগ্র মনুষ্যসমাজের একটা মহাবিপ্লবের চিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। মনুষ্যহৃদয়ের ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, জিগীষা ও জিঘাংসা প্রভৃতি উৎ-কট দুর্দ্দম প্রবৃত্তিসমূহ কালে কালে কেন্দ্রা-কৃষ্ট ও পুঞ্জীকৃত, ঘনীভূত ও স্তূপীকৃত হইয়া যখন আপনার শক্তিতে আপনি বাহির হইতে চাহে, তখন উহা লেলিহান অগ্নি-জিহ্বা ব্যাদান করিয়া সমাজমধ্যে আপনার জ্যোতির্ম্ময়ী জ্বালা প্রসারণ করে; ভক্তিশ্রদ্ধা, প্রীতিপ্রেমের উৎস পর্য্যন্ত সেই ভীষণ উত্তাপে শুকাইয়া যায়; সমগ্র সমাজের পৃষ্ঠ-দেশ বিপ্লবের ভূমিকম্পে মুহুর্মুহু আন্দো-লিত হইয়া উঠে। অন্তর্নিহিত শক্তিরাশি সমাজের কলেবরকে বিদীর্ণ করিয়া, সহস্র খণ্ডে চূর্ণ করিয়া, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করে; লক্ষ বৎসরের সঞ্চিত সৌন্দর্য্যরাশি ও রূপরাশি সেই তরল অনলপ্রবাহে ভস্মী-ভূত হইয়া যায়। মহাভারতের বর্ণিত ঘটনার

* ভূতত্ত্ববিদের মধ্যে যাঁহারা লায়ালের শিষ্য, তাঁহাদের হিমালয়োৎপত্তির এই কাল্পনিক বর্ণনায় শঙ্কিত হইবার কারণ নাই। প্রাদেশিক catastrophe লায়ালের মতের বিরোধী নহে।

মধ্যে আমরা মহাকালের অট্টহাস্যের প্রতিধ্বনি দূর হইতে শুনিতে পাইয়া স্তব্ধ হই ও মুহ্যমান হই। এ সেই মানবসমাজের চিরন্তন বিপ্লবের ইতিহাস—যাহা যুগযুগান্তরে ঘুরিয়া-ফিরিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে; যাহা সাগরগর্ভকে মালক্ষেত্রে উত্তোলিত করিয়া মালক্ষেত্রকে সাগরগর্ভে নিমগ্ন করে; যাহা পর্ব্বতচূড়ার সহিত পর্ব্বতচূড়ার সংঘর্ষ উপস্থিত করিয়া প্রলয়াগ্নির সৃষ্টি করে। সেই অগ্নিশিখায় অরণ্যানী মরুভূমিতে পরিণত হয়, জীবকুল ধরাপৃষ্ঠে অস্থিকঙ্কাল রাখিয়া কালের কুক্ষিতে অন্তর্হিত হয়। ইহা সেই সদাতন অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, যাহা দলিত, পীড়িত ও সঙ্কুচিত করিয়া ধর্ম্মের পুনঃস্থাপনের জন্য মহেশ্বরের মহৈশ্বর্য্যের অবতারণা আবশ্যক হয়; ভীত, বিস্মিত মানবচিত্ত যখন সেই ঐশ্বর্য্যের মহিমায় মোহপ্রাপ্ত হইয়া তাহার চরণোপান্তে আপনাকে লুণ্ঠিত করে।

মহাভারতের বর্ণিত ইতিহাস মানবসমাজের বিপ্লবের ইতিহাস। ভারতবাসীর জাতীয় ইতিহাসে বাস্তবিকই কোনদিন এইরূপ মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল কি না, তাহা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ অনুসন্ধান করিবেন। হয় ত কোন ক্ষুদ্র প্রাদেশিক ঘটনার স্মৃতিমাত্র অবলম্বন করিয়া মহাকবি আপনার চিত্তবৃত্তির সমাধিকালে মানবসমাজের মহাবিপ্লবের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; এবং সেই স্বপ্নদৃষ্ট ধ্যানলব্ধ মহাবিপ্লবের,—ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের মহাসমরের চিত্র ভবিষ্যৎ যুগের লোকশিক্ষার জন্য অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। ভূগর্ভে সঞ্চিত যে শক্তির বলে হিমাচল ভূগর্ভ ভিন্ন করিয়া গাত্রোত্থান করিয়াছিল, সে শক্তি এখন সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উপশান্ত হইয়াছে; এখন হিমাচলের সানুদেশ নিবিড় বনস্থলীতে শ্যামায়মান হইয়াছে; তাহার আয়ত বক্ষে এখন নিবিড় জলদমালা বারিবর্ষণ করিয়া সেই শ্যামভূমির হরিৎকান্তি অব্যাহত রাখিয়াছে; আর সেই জলদমালার বহু ঊর্দ্ধে ধবলগিরি ও গৌরীশঙ্করের শুভ্রোজ্জ্বল দেহ দূর হইতে দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে।

যে সামাজিক বিপ্লবে, যে অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে প্রাচীন ভারতসমাজে অশান্তির ঝটিকা বহিয়াছিল, ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার পর সেই ব্যাপারের স্মৃতি পর্য্যন্ত প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; ঝটিকা শান্ত হইয়াছে; মহাসিন্ধুর কল্লোল স্তব্ধ হইয়াছে, বনানীর দাবাগ্নিগর্জ্জন নীরব হইয়াছে; এখন সেই মহাভারত হইতে সহস্র সাহিত্যধারা প্রবাহিত হইয়া আমাদের জাতীয় সাহিত্যে ও জাতীয় জীবনে শাখাপল্লবের ও পত্রপুষ্পের উদ্গম করিয়া তাহাকে বিকসিত ও প্রফুল্ল রাখিয়াছে; আর আমরা দূর হইতে ভীমার্জ্জুন, কর্ণ-দুর্য্যোধন, ভীষ্ম দ্রোণ, অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মার দৃঢ়গঠিত, উন্নতশীর্ষ, জ্যোতির্দ্দীপ্ত কলেবরকে ধবলমুকুটধারী কিরণোজ্জ্বল ধবলগিরির ন্যায় ভারতসমাজক্ষেত্রের দূরস্থিত দিগ্বলয়ে দণ্ডায়মান দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইতেছি।

এই হিমালয়ঘটিত উপমাটা এতক্ষণ অনুগ্রহপরায়ণ পাঠকবর্গের নিতান্তই কর্ণশূল হইয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু

এই সম্পর্কে আর একটা কথা না বলিয়া নিরস্ত হইতে পারিতেছি না। মহাভারতকে আদর্শ মহাকাব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া এবং হিমগিরির সহিত তাহার তুলনা করিতে গিয়া লেখক মহাকাব্যের একটা লক্ষণ নির্দ্ধারণ করিয়া ফেলিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই আবিষ্কার জগতের যাবতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের রোমহর্ষ উৎপাদন করিবে। তাহা জানিয়াও সেই আবিষ্কারটি পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিবার দুঃসাহস আশ্রয় করিলাম; আশা করি, তাঁহাদের শুভোজ্জ্বল দশনচ্ছটা লেখককে রণারম্ভেই পৃষ্ঠপ্রদর্শনে বাধ্য করিবে না।

লেখকের মতে যে কাব্য পড়িতে হয় না, তাহারই নাম মহাকাব্য। না পড়িয়াই আমরা মহাকাব্যের কাব্যরসাস্বাদনে অনেকটা অধিকারী হইতে পারি। রামায়ণের চতুর্বিংশতিসহস্র শ্লোকের ও মহাভারতের লক্ষশ্লোকের অধিকাংশই অপঠিত রহিয়াছে, ইহা স্বীকার করিলে বোধ করি পাঠকসমাজের অধিকাংশই লজ্জিত হইবেন না। তথাপি এই পাঠকসমাজ উভয় মহাকাব্যের কাব্যরসের আস্বাদন জানেন না, ইহা স্বীকার করিতে তাঁহারা কখনই সম্মত হইবেন না। রামচরিত্র ও কৃষ্ণচরিত্র, লক্ষণচরিত্র ও কর্ণচরিত্র, দশাননচরিত্র ও দুর্য্যোধনচরিত্র, ভরতচরিত্র ও ভীষ্মচরিত্র, মহাকাব্যের গহনবন ভেদ করিয়া এই সকল মহামানবচরিত্রের স্পর্শলাভ আমাদের অধিকাংশের ভাগ্যেই ঘটে নাই। আমরা দূর হইতে উহা নিরীক্ষণ করিয়াছি মাত্র; তথাপি দূর হইতেই তাহার মাহাত্ম্যে আমরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছি। জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, ভারতবর্ষে আর্য্যসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি মাতৃস্তন্য পান করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে, অথচ রামচরিত ও সীতাচরিতের পুণ্যধারা সেই মাতৃস্তন্যের প্রবাহের মত তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হয় নাই, স্নায়ুতন্ত্রীতে তাড়িতস্রোতের সঞ্চালন করে নাই, তাহার অস্থিতে, তাহার মজ্জায়, তাহার পেশীতে বল বিধান করে নাই, সেই হতভাগোর—সেই পিণ্ডীভূত জড়ের ভারতসমাজে স্থান কোথায়? পঞ্চবিংশতি-কোটি হিন্দুসন্তানের অধিকাংশ, অন্য কারণ না থাকিলেও, শুদ্ধ ভাষাজ্ঞানের অভাবে, সেই পুণ্য স্রোতস্বিনীর মূল প্রস্রবণে গিয়া তৃষ্ণানিবারণে অশক্ত আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু লক্ষ্মণের মত ভাই, হনুমানের মত দাস, ভীষ্মের ন্যায় পিতামহ ও কর্ণের ন্যায় বৈরীর জাগ্রত-জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি কয়জনের মানসচক্ষুর সম্মুখে দণ্ডায়মান নাই? আমাদের বঙ্গদেশেরই অসংখ্য নরনারী মাতৃমুখে লঙ্কাদহনের ও লক্ষ্মণভোজনের কথা শুনিয়াছে; কথকের মুখে, গায়কের মুখে মন্থরার লাঞ্ছনা ও অঙ্গদরাবণসংবাদের অতিরঞ্জনে আমোদিত হইয়াছে; যাত্রায়, গানে ভরতমিলন ও সীতানির্ব্বাসন অভিনীত হইতে দেখিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছে; কৃত্তিবাসী রামায়ণ হস্তে অবকাশরঞ্জন করিয়াছে; এবং শেষের সেদিন রামনাম শুনিতে শুনিতে জগৎসংসারের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু সেই আদিকবির

অমৃতলেখনীর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় তাহাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু আপনি জ্ঞানী, আপনি পণ্ডিত, আপনি কলাবিৎ, আপনি সমালোচক, আপনি সমুদ্দার, আপনি সন্তরণ দিয়া সংস্কৃতসাহিত্যসমুদ্রের পার দেখিয়াছেন, আপনার সপ্তকাণ্ড রামায়ণ আজন্ম কণ্ঠস্থ রহিয়াছে, আপনার যদি বিশ্বাস থাকে যে, ঐ পল্লীবাসিনী মুখ বৃদ্ধার অপেক্ষা আপনি নিঃসংশয়ে রামরসায়নে অধিকতর রসগ্রাহী হইয়াছেন, তাহা হইলে আপনাকে ভ্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিব।

বস্তুতই আমার বিশ্বাস, মহাকাব্যের লক্ষণ এই যে, উহার আগাগোড়া অক্ষরে-অক্ষরে পড়িবার প্রয়োজন নাই। মূল হোমার পৃথিবীতে কয়জন লোক পড়িয়াছে? পণ্ডিত-সমাজের মধ্যে কয়জন লোক হোমারের তর্জ্জমা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছেন? অধিকাংশের পক্ষে কেবল হোমারের গল্প শুনা আছে মাত্র। অথচ ট্রয়-নগরের প্রাকারসম্মুখে সমুদ্রবেলা পূর্ণ করিয়া আমরা আগামেমনন্-পরিচালিত গ্রীক্ অক্ষৌহিণীর সন্নিবেশ বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে চক্ষের সম্মুখে স্পষ্ট তুলিকায় চিত্রিত দেখিতেছি। সেই বিস্তীর্ণ স্তব্ধ সেনা-কুলিত রণাঙ্গনের উপর দিয়া একিলীস্, আজাক্স্ ও দায়োমীদের বিশালবক্ষা পরিগন্ধকন্ধর শালপ্রাংশু জীবন্ত মূর্ত্তি বিচরণ করিতেছে; বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হইতেছে, কিন্তু ট্রয়-নগরের দুর্ভেদ্য প্রাকার ভগ্ন হইল না; গ্রীক্ বীরগণের শিবির-মধ্যে মানবহৃদয়ের সনাতন ঈর্ষ্যাবিদ্বেষ ধূমায়মান হইতে লাগিল। সেই ধূম হইতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, গ্রীক্ বীরগণ ক্ষণেকের জন্য উদ্দেশ্যভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পরস্পর আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইলেন; তার পর-অঙ্কের যবনিকা তুলিবামাত্র অকস্মাৎ পাত্রোক্লেসের চিতাধূম প্রশমিত হইতে না হইতে একিলীসের রোষাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; রোষাগ্নিদীপ্ত রুদ্রমূর্ত্তি হুঙ্কার করিয়া গর্জ্জন করিল; পরক্ষণেই দেখিতে পাই, মহাবীর হেক্টরের শবদেহ সেই ভীমকর্ম্মার রথচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া রুধিরধারায় রণক্ষেত্র শোণিতাক্ত করিতেছে ও মর্ত্ত্যে নরগণের ও আকাশে দেবগণের মুগ্ধনেত্র বিস্ফারিত হইয়া সেই ক্রূর কর্ম্মের প্রতি নীরবে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

পাঠকবর্গ যদি এতক্ষণ বুঝিয়া থাকেন, কৃত্তিবাস পড়িলেই বাল্মীকি পড়ার কাজ হইবে, এবং যে সকল পাঁচালী-পয়ার শুনিয়া কাশীদাস ভারতকথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সেই পাঁচালী পড়িলেই আর দ্বৈপায়ন-ঋষির শরণ লইতে হইবে না, তাহা হইলে লেখকের নিতান্ত দুর্ভাগ্য। বদরিকাশ্রমযাত্রী যাঁহারা হিমালয়ের চড়াই-উতরাই অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, কৈলাসযাত্রী যিনি ষোলহাজার ফুট উপরে উঠিয়া 'নীতি-পাস্' অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, এমন কি দার্জ্জিলিঙে কিংবা সিমলা-শৈলের আলোকমণ্ডিত রাজপথে যাঁহারা বিহার করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা হিমালয়ের যে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন, হিমালয়ের পাদদেশের সমতলবাসীর পক্ষে তাহা ইন্দ্রিয়মনের অগোচর, সন্দেহ নাই। কিন্তু আশঙ্কা হয়, হিমালয়ের এক এক দেশে,

এক এক অঙ্গে, তাহার কিন্নরীসেবিত গুহামধ্যে, তাহার সরলদ্রুমাচ্ছন্ন সানুদেশে, তাহার গৈরিকখচিত উপত্যকায়, তাহার মারুতপূরিত, আপাদিতবেণুকৃত্য কীচক-বনে, তাহার হিমশীকরবাহি-পবন সেবিত গিরিনির্ঝরপ্রান্তে চিত্তবিভ্রমকর অতুল্য শোভা আছে সত্য; কিন্তু সেই একদেশ-ব্যাপী শোভা, সেই প্রাদেশিক মূর্ত্তি, সমগ্র হিমাচলের প্রতি নিরীক্ষণের বড় অবকাশ দেয় না। হিমাচলের বিরাট্ মূর্ত্তির শোভা হৃদ্গত করিতে হইলে যেন দূরে থাকিয়া তাহার তুঙ্গ শিখররাজির দিকে অবলোকন আবশ্যক। সেইরূপ রামায়ণ-মহাভারতের বিশাল মহাকাব্যের মধ্যে অসংখ্য খণ্ডকাব্য নিবিষ্ট রহিয়াছে; অনেক বনজঙ্গল ভেদ করিয়া, অনেক প্রস্তরকঙ্কর অতিক্রম করিয়া, অনেক চড়াই-উতরাই পার হইয়া, ক্লান্ত-শরীরে সেই সকল খণ্ডকাব্যের সৌন্দর্য্য-দর্শনে অধিকারী হইতে পারিলে, দর্শকের মন আনন্দরসে অভিপ্লুত হয়, সন্দেহ নাই; সেই সকল খণ্ডকবিতার উপমাও অজস্র দুর্লভ, সন্দেহ নাই; কিন্তু সমগ্র মহাকাব্যের মাহাত্ম্য-উপলব্ধির বিষয়ে সেই খণ্ডকাব্যের আলোচনা বিশেষ সাহায্য করে না। সমগ্র মহাকাব্যের মহিমা উপলব্ধি করিতে হইলে, যেন মহাকাব্য হইতে কতকটা দূরে থাকাই সঙ্গত। সেই সকল খণ্ডকাব্যের খণ্ড সৌন্দর্য্যকে চক্ষুর সম্মুখ হইতে সরাইয়া মহাকাব্যের বিশালায়তনের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করাই সঙ্গত।

আমাদের মধ্যে অনেকেই মূল মহাকাব্য পড়েন নাই, কিন্তু সকলেই দূর হইতে সেই মহাকাব্য দেখিয়াছেন; ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-অশ্বত্থামার উন্নত চরিত্র হিমগিরির উন্নত শৃঙ্গের ন্যায় দূর হইতে সকলেরই নেত্রগত হইয়াছে। তথাপি আমরা মহাকাব্যের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি। ইউরোপীয় সমালোচকদের অবস্থা অন্যরূপ। রামায়ণ-মহাভারতের ইউরোপীয়গণের লিখিত সমালোচনা পড়িয়া আমাদিগকে নিরাশ হইতে হয়। তাঁহারা আমাদের মত দূর হইতে নয়ন ভরিয়া মহাকাব্যের কাব্যসৌন্দর্য্য দেখিতে পান নাই; নিকটে গিয়াও সমগ্র মহাকাব্য অধ্যয়নের অবকাশ তাঁহাদের পক্ষে ঘটে না। বিশেষত পর্ব্বতে উঠিবার সময় তাহার বনজঙ্গল, তাহার প্রস্তরকঙ্কর, তাঁহাদিগকে ক্লান্ত ও অবসন্ন করিয়া দেয়; তাঁহাদের ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় পরাস্ত হইয়া যায়। তবে যিনি সৌভাগ্যক্রমে কোন একটা প্রদেশের, কোন একটা অঙ্গের, শোভাদর্শনে সফল হন, তিনি সেই শোভা বর্ণনা করিয়াই আপনার কাজ শেষ হইল, মনে করেন। মহাভারতের অন্তর্গত শকুন্তলার উপাখ্যান, নলোপাখ্যান, সাবিত্রীর উপাখ্যান প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডকাব্য সৌন্দর্য্যগৌরবে গরিষ্ঠ, সন্দেহ নাই; ইউরোপীয় সমালোচকেরা ঐ সকল উপাখ্যানের প্রশংসা করেন। কিন্তু আমরা জানি, ঐ সকল খণ্ডকাব্যের যতই সৌন্দর্য্য থাক্, মহাকাব্যের বিশাল সৌন্দর্য্যের নিকট তাহা স্থান পায় না। কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকের লেখনী এই সকল খণ্ডকাব্যের সমালোচনায় যেমন

উদার হইয়া পড়ে, মূল মহাকাব্যের প্রশংসায় তেমন উদারভাব দেখাইতে পারে না।

যাহা পড়িতে হয় না, তাহাই মহাকাব্য; মহাকাব্যের এই লক্ষণ নির্দ্দেশের অর্থ বোধ করি এতক্ষণে অনেকটা স্পষ্ট হইয়া থাকিবে। মহাকাব্য না পড়িলে চলিতেও পারে; কিন্তু যাহা মহাকাব্য নহে, তাহা না পড়িলে একেবারেই চলে না। কালিদাস খুব বড় কবি, হয় ত ব্যাস-বাল্মীকি হইতেও বড় কবি; কিন্তু তিনি মহাকাব্য লেখেন নাই। কুমারসম্ভব বুঝিতে হইলে তাহার গল্প শুনিলে চলিবে না, তাহার অনুবাদ পড়িলে চলিবে না; তাহা হইলে মূল কুমারসম্ভব তন্নতন্ন করিয়া স্কুলের ছাত্রের মত টীকাটিপ্পনীসহ পড়িতে হইবে। নহিলে কুমারসম্ভব পড়াই হইবে না। কালিদাসের ভাষা, কালিদাসের ছন্দ, কালিদাসের ধ্বনি, কালিদাসের নিকটে না গেলে শুনিতে পাইবে না; দূরে হইতে তাহার কিছুই বুঝিবে না। কালিদাস শিল্পী; তিনি পাতরের উপর পাতর বসাইয়া সৌধনির্ম্মাণ করিয়াছেন, শাদা ধপ্‌ধপে মার্ব্বেলের ইঁটের উপর ইঁট বসাইয়া দেয়াল তুলিয়াছেন, সেই দেয়ালের গায়ে মণিমাণিক্য-রত্ন-প্রবালের লতাপাতা কাটিয়া তাহাকে বিচিত্র শোভায় অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তিনি তাজ-মহল গাঁথিয়াছেন, আল্‌হাম্‌ব্রা গাঁথিয়াছেন; সেই সকল কারুশিল্পের শোভা দেখিতে হইলে নিকটে যাইতে হইবে; সকলেও সে শোভা দেখিবে না; সমজ্‌দারের চোখ লইয়া ও সমালোচকের রুচি লইয়া সেখানে যাইতে হইবে। নতুবা দেখিতে পাইবে না ও বুঝিতে পারিবে না।

শেক্‌স্‌পীয়র হয় ত আরও বড় কবি, তাঁহার স্থান হয় ত হোমারেরও অনেক উচ্চে, কিন্তু তিনিও মহাকাব্য লেখেন নাই। গ্রীক্ কবির হেলেনকে আমরা চোখে দেখি নাই, তাঁহার গল্প শুনিয়াছি মাত্র; কিন্তু যে রূপের আগুনে ট্রয়-নগর ভস্মীভূত হইয়াছিল, তাহা আমাদের কল্পনার নেত্রকেও অগ্নাপি ঝলসিয়া দিতেছে। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়ারের নায়িকাগণের সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইলে কেবল গল্প শুনিলে বা অনুবাদ পড়িলে চলিবে না। তাহা-দিগকে নিকটে গিয়া স্বচক্ষে দেখিতে হইবে; সমজ্‌দারের চোখ লইয়া দেখিতে হইবে। শেক্‌স্‌পীয়রের ভাষা, তাঁহার ছন্দ, তাঁহার ধ্বনি হইতে দূরে থাকিয়া শেক্‌স্‌পীয়রকে চিনিবার আশা করা যায় না। একএকবার মনে হয় বটে, শেক্‌স্‌পীয়রের একএকখানা খণ্ডকাব্যের ভিতর হইতে যেন সাগর-কল্লোলের অথবা ভূগর্ভতরঙ্গের মত শব্দ বাহির হইয়া আসিতেছে, যেন দাবদ্যহের গম্ভীর শব্দ দূর হইতে কাণে বাজিতেছে, কিন্তু নিকটে না গেলে সে শব্দের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। শেক্‌স্‌পীয়র হয় ত একালের মহাকবি, কিন্তু তিনি মহাকাব্য রচনা করেন নাই।

কৃত্রিম পদার্থের সৌন্দর্য্যের সহিত স্বাভাবিক পদার্থের সৌন্দর্য্যের ঠিক্ তুলনা হয় না। কোন্ সৌন্দর্য্য বড়, তাহার তুলাদণ্ডে পরিমাপ চলে না। মনুষ্যপ্রতিভা সময়ে সময়ে যেন বিধাতার সৃষ্টিকেও পরাস্ত করে। সেইজন্য কৃত্রিমের পার্শ্বে স্বাভা-

বিককে দাঁড় করাইয়া কে ছোট কে বড় নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া সমীচীন নহে। কৃত্রিমে যাহা আছে, তাহা স্বাভাবিকে থাকে না; আবার স্বাভাবিকে যাহা থাকে, তাহা কৃত্রিমে থাকে না। উভয় বস্তু ভিন্ন পর্য্যায়ের। মহাকাব্য চতুরাননের বদন হইতে বিনির্গত হয় নাই, উহা মনুষ্যেরই রচনা, সন্দেহ নাই; কিন্তু উহাতে একটা স্বাভাবিকত্ব আছে, তাহা সেই মনুষ্যের রচিত অন্য উৎকৃষ্ট বা উৎকৃষ্টতর কাব্যে নাই। তাহাতে বনজঙ্গল, প্রস্তরকঙ্কর থাকিলেও তাহার একটা গৌরব আছে, তাহাকে দূর হইতে দেখিলেই চেনা যায়; তাহার গল্প শুনিলে মন অভিভূত হয়; তাহাকে বুঝিতে হইলে সমজ্‌দার হইতে হয় না, শিক্ষানবিশী করিতে হয় না; চশ্‌মা পরিতে হয় না; স্বভাবদত্ত চক্ষু লইয়াই তাহাকে চিনিতে ও বুঝিতে পারা যায়। এই অলঙ্কারহীন, পরিচ্ছদহীন মুক্ত স্বাভাবিকতাই মহাকাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ। মনুষ্যের সভ্যতা, অন্তত বর্ত্তমানকালের সভ্যতা অত্যন্ত কৃত্রিম বস্তু। এই কৃত্রিমতার আমি নিন্দা করিতেছি না; হয় ত কৃত্রিম-তাই মনুষ্যত্বের প্রধান লক্ষণ; হয় ত কৃত্রি-মতা মনুষ্যত্ব হইতে অভিন্ন; অন্তত মান-বিকতার সহিত পাশবিকতার যাহা পার্থক্য, তাহারই নাম কৃত্রিমতা। সুতরাং কৃত্রিম-তার নিন্দা করিলে মনুষ্যের বিশিষ্ট ধর্ম্মকেই নিন্দা করা হয়। এইজন্য কৃত্রিমতার নিন্দা করিতে চাহি না। কৃত্রিমতাই মনু-ষ্যের গৌরব বলিলেও বিস্মিত হইব না। কৃত্রিমতাতেই মনুষ্যত্বের চরম স্ফূর্ত্তি, তাহাও বলা যাইতে পারে। কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিতেই মানবপ্রতিভার পরাকাষ্ঠা, তাহাও স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তথাপি কৃত্রিম শিল্প কৃত্রিম। উহাতে চাক্‌চিক্য আছে, গাঁথনি আছে, ওস্তাদি আছে, ও সকলের উপরে উহার চেষ্টাকৃত নির্ম্মাণ-কল্পনায়—উহার ডিজাইনে—মনুষ্যের সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্বের আভাস আছে; আর যাহা স্বাভা-বিক, তাহাতে চাক্‌চিক্য নাই, গাঁথনি নাই, তাহা অযত্নকৃত অযথাবিন্যস্ত ঝটিকাভগ্ন বারি-ধারাবর্ষিত বৃহৎ দ্রব্যের সমাবেশে গঠিত। মানুষের বর্ত্তমানকালের সভ্যতা অত্যন্ত কৃত্রিম। সেইজন্য মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণ যে স্বাভাবিকতা,সেই স্বাভাবিকতার অভাবে বোধ হয় বর্ত্তমান সভ্যতায় মহাকাব্যের উৎপত্তির প্রতিরোধ করে। আধুনিক সভ্যতা কবিত্বসৃষ্টির অন্তরায় নহে, কিন্তু মহাকাব্য-সৃষ্টির বোধ হয় অন্তরায়। এখন কর্ম্মযন্ত্রে ভ্রমমাণ মনুষ্যকে তাহার নিরবকাশ জীব-নের কথঞ্চিৎ-লব্ধ অবসরের ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত-গুলিকে খণ্ডকাব্যের ও খণ্ডসৌন্দর্য্যের জ্বালা ও বৈচিত্র্য দ্বারা পূর্ণ করিতে হয়, বৃহৎ পদার্থে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়া তাহার বিশাল সৌন্দর্য্যের উপভোগের অবকাশ থাকে না। সেইজন্যই বোধ হয়, সভ্যসমাজে শেক্‌স্‌পীয়র জন্মিয়াছেন, কালিদাস জন্মিয়াছেন, কিন্তু হোমার জন্মেন নাই বা বাল্মীকি জন্মেন নাই। ইহাতে মনুষ্যজাতির ক্ষতি কি লাভ, তাহা গণনার অবসর লেখকের নাই। আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহাতেই আমাদিগকে তৃপ্ত থাকিতে হইবে। সংসারের স্রোত উল্টাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা সহস্র চেষ্টা

করিলেও মহাকবির উৎপাদনে সমর্থ হইব না। তবে কাল নিরবধি ও পৃথ্বী বিপুলা; আবার যদি কালের স্রোতে মহাকবির উৎপত্তি ঘটে,তাহাতেও আমরা বিস্মিত হইব না।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

সৎপাত্র।

ঘরে তখন কেহই ছিল না। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন। বাঁশের ঝাড়ে পায়রা ডাকিতেছে। বৈশাখে গতকল্য বৃষ্টি হইয়া মাটি ভিজিয়াছে; তাড়াতাড়ি চাষ সারিয়া লইবার জন্য চাষীরা ব্যস্ত। সাধুচরণের বাড়ীতে যে চাকরটা থাকিত, তাহাকেও তাড়াহুড়া করিয়া মাঠে পাঠান হইয়াছে।

সাধু নদীতীরে হাটের উপরে যে নূতন দোকান ফাঁদিয়া বসিয়াছে, সেই দোকান তদন্ত করিতে গিয়াছিল।

বৃদ্ধা মাসী সাধুচরণের স্ত্রী বিমলাকে লইয়া ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া ঘুমের আয়োজন করিতেছিলেন। নিদ্রাবেশে তাঁহার যখন নিশ্বাস সশব্দে পড়িতে লাগিল, তখন বিমলা উঠিয়া সাবধানে দ্বার খুলিয়া দাওয়ায় আসিয়া বসিল।

তাহার দিবানিদ্রার বয়স নহে, সে সবে সতেরোয় পা দিয়াছে। মধ্যাহ্নে কিছুক্ষণমাত্র তাহার অবকাশ। এই অবকাশটুকুকে সে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইতে চাহে। বাহিরে বাঁশপাতার মর্ম্মরশব্দে, ঘুঘুর ডাকে, সুপ্ত গ্রামের নিস্তব্ধতায়, তাহার মনের মধ্যে যে বাল্যস্মৃতি সুদূরব্যাপী বেদনার করুণসুরে বাজিয়া উঠে, তাহা তাহার নিতান্তই নিজের, তাহা তাহার একলার;—এইটুকুকে সে সংসারের সমস্ত ব্যস্ততা, সমস্ত কর্ম্মের ভিড়ের মধ্য হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে—ইহাকে সে মধ্যাহ্নের প্রখর-রৌদ্রে মরীচিকার মত মেলিয়া-দিয়া তৃষার্ত্ত-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে।

বিমলা লিখিতে-পড়িতে শেখে নাই;—তাহার সকল বেদনা ও সকল সান্ত্বনাকেই স্বরচিত কল্পনাদোলায় দোলাইয়া মানুষ করিতে হয়, ইহাতে মনের কথাগুলি নিতান্তই আপনার ধন হইয়া উঠে; ইহাতে অন্তরের ভাবনাগুলিই সত্য এবং সংসারের ঘটনাগুলি ছায়ার মত হইয়া দাঁড়ায়।

ইতিমধ্যে পাড়ায় যখন রামায়ণপাঠ হইয়াছিল, সে শুনিয়াছিল। সীতার পাতিব্রত্য এবং রামের দাম্পত্যপ্রীতির কথায় বিমলার সমস্ত প্রাণটা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এমনি পতিনিষ্ঠা সে-ও লাভ করিবে, তাহার সংসার—তাহার জীবন পতিপ্রেমের দ্বারা এমনি চরিতার্থ হইয়া উঠিবে, ইহাই সে বারবার করিয়া কল্পনা করিয়াছিল।

কাব্য এবং সংসার এক জিনিষ নহে। অরণ্যে নির্ব্বাসনে, রাজ্যহীন দারিদ্র্যে প্রেমকে আঘাত করিতে পারে না—কিন্তু

প্রতিদিনের শুষ্কতায়, সংসারের হৃদয়দৈন্যের মধ্যে পরিপূর্ণ প্রেমকে রস জোগাইয়া বিকশিত করিয়া রাখা ক্ষুদ্র শক্তির কাজ নহে।

বিমলা বুঝিতেছিল,তাহার কল্পনার দাবী সে সংসারে মিটাইতে পারিতেছিল না। কোথায় সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তী, আর কোথায় সে—কোথায় কাব্যলোক, আর কোথায় তাহার গৃহ! কথকে যাহা শিখায়, রামায়ণে যাহা শোনে, তাহাতে সমস্ত বিগলিত চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া ছোটে, কিন্তু পাষাণ-সংসারে ঘা খাইয়া যখন সে ফিরিয়া আসে, তখন জগতের কোন্‌খানে তাহার বেগকে সে সংবরণ করিবে!

স্বামীর সহিত তাহার সম্বন্ধটা সংক্ষেপে এইরূপ:—এক-একটা পুরুষ থাকে, যে এদিকে যেন গো-বেচারা, কিন্তু নিজের স্ত্রীর কাছে শ্বাপদবিশেষ। গর্জ্জনেও যেমন, তর্জ্জনেও তেমনি। সাধু সেইরকম লোকটা। বাহিরে সে চুপচাপ, মুখে কথা নাই, কিন্তু অন্তঃপুর তাহার দৌরাত্ম্যে কম্পমান। মুখে যাহা না বলিবার, তাহা ত বলেই এবং হাতে যাহা না করিবার, তাহাও করে। এই বয়সে দুটি স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া তিনি বিধিপূর্ব্বক সমাধা করিয়াছেন। প্রথমটি আত্মঘাতিনী; দ্বিতীয়টি গর্ভাবস্থায় মরিয়াছে এবং তাহার মৃত্যুঘটনা সংশয়জনক। পাড়ায় ভোলানাথ বলিয়া একটি এফে-ফেল্ যুবক বেকার বসিয়া আছে, সেই ভদ্রলোক নানা কৌশলে এই ভদ্রলোকটিকে বিচারের বজ্রমুষ্টি হইতে রক্ষা করিয়া পল্লীর সাধুবাদভাজন হইয়াছে।

সাধুচরণ কুলীন, তাহার বিবাহ হইতে বিলম্ব হইল না। বিবাহকালে নূতন স্ত্রী বিমলার বয়স পনেরো ছিল—দেখিতে সে সুন্দরী। পতিগৃহে আসিয়াই স্বামীর সহিত এমনি একপ্রকারের কঠিন ঘনিষ্ঠতা হইল যে, তাহার চাপে সে আপনাকে বিকাশদান করিতে পারিল না।

স্ত্রীলোকের পক্ষে পনেরো বৎসরের স্মৃতি নিতান্ত সামান্য নহে। এই বয়সে স্নেহের বন্ধন নানাদিকে নিবিড়ভাবে জড়িত হইয়া উঠে। এই সমস্ত বন্ধনকে শিথিল করিয়া দিয়া তাহাকে প্রবলশক্তিতে একমাত্র আপনার করিয়া লইতে পারে, এমন একটি বিপুল প্রেমের জন্য তাহার হৃদয় অপেক্ষা করিয়াছিল।

সেদিন সে তাহার বড়-বড় চোখ-দুটি মেলিয়া পূর্ব্বজীবনের কথা ভাবিতেছিল। চিরকাল সে বাপের আদরের মেয়ে ছিল। বাপ তাঁহার ছেলেদের খুব কঠিন শাসনেই রাখিতেন, কিন্তু মেয়েটির গায়ে হাত দেয়, এমন সাধ্য কাহারো ছিল না। মা তাহার দুরন্তপনা দমন করিতে গেলে বাপ তাহার পক্ষ অবলম্বন করিতেন। সেই পিতৃস্নেহমণ্ডিত তাহার গৃহ এবং পল্লীটি তাহার অনিমেষদৃষ্টির সম্মুখে জাগিয়া উঠিল। সেই আমবাগান, সেই পুকুর, সেই প্রতিবেশী বাঁড়ুয্যেদের চণ্ডীমণ্ডপ, সেই ভাঙা-প্রাচীর-সংলগ্ন নারিকেলের শ্রেণী, সেই তাহাদের গোয়ালের পশ্চিমধারে বাতাবিলেবুর গাছ। গদানামধারী যে কুকুরটাকে পাতের ভাত দিবার জন্য প্রত্যহ মধ্যাহ্নে সে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিত, সেই লুব্ধ, অনুগত, অনুরক্ত পশু-

টিকেও মনে পড়িল। তাহাদের পুরুষানুক্রমিক ভৃত্যবংশীয় যে দীনু-চাকরটা তাহাকে নানা বিকৃতনামে ক্ষ্যাপাইত, সর্ব্বদাই যাহার বিরুদ্ধে সজলচক্ষে বাবার কাছে নালিশ করিতে হইত, তাহার কথাও কোমল হৃদয়টুকুর মধ্যে স্নেহ আকর্ষণ করিয়া আনিল।

আর-একজনের কথাও বারবার তাহার মনে আসিতেছিল, কিছুতেই তাড়াইতে পারিতেছিল না—তাহার নাম বনমালী। পাড়ার অনাথ মজুমদারদের বাড়ীর ছেলে। এক সময়ে তাহার সঙ্গে খেলা করিয়াছে, বারংবার তাহার সঙ্গে তুমুল বিবাদও ঘটিয়াছে—অবশেষে এক সময়ে তাহার সঙ্গে খেলা বন্ধ হইয়া গেছে এবং তাহার নাম শুনিয়া বিমলা একদিন কপোল ও কর্ণমূল লাল করিয়া তুলিয়াছে। তাহার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব পাকাপাকি হইয়া গিয়াছিল—গায়ে-হলুদ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, এমন সময়ে তাহার অপেক্ষা কৌলীন্যে বড় সাধুচরণ স্বয়ং প্রার্থী হওয়াতে সে বিবাহ ভাঙিয়া গেল।

এ কথা কেহ না মনে করেন, বিবাহের রাত্রে বিমলার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে বনমালীর জন্য কোন শোক অনুভব করে নাই। সে স্বচ্ছন্দচিত্তে বিবাহ করিয়া পতিগৃহে চলিয়া গেল। এই বিবাহভঙ্গ-ব্যাপারে অনাথ মজুমদারদের সঙ্গে তাহাদের মনান্তর হওয়ায় বিদায়কালে বনমালীর সঙ্গে তাহার দেখাও হইল না। দেখা না হওয়াতে তাহার মনে বিশেষ ক্ষোভও উপস্থিত হয় নাই।

কিন্তু স্বামীর ঘরে আসিয়া স্নেহপ্রীতি হইতে প্রতিদিন বঞ্চিত হইয়া তাহার উপবাসী হৃদয় যখন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া উঠিল, তখন পিতৃগৃহের সমস্ত স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাল্যকালের সেই খেলার সাথী বনমালী তাহার চিত্ত অধিকার করিল। তাহাকে মনে করিলেই অলক্ষিতভাবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। বিমলা যে একটা সম্ভবপর সুখ ও সার্থকতা হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইয়াছে, এ কথা সে কোনমতেই মন হইতে দূর করিতে পারিত না। আজ তাহার কাছে এই নিবিড় মধ্যাহ্ন শূন্য, জ্যোৎস্নারাত্রির কোন অর্থ নাই, বৃষ্টিপাতমুখর শ্রাবণরজনী একেবারেই বিফল, কিন্তু এই সমস্তই কানায়-কানায় ভরিয়া উঠিতে পারিত, এবারকার মানবজন্মটা আবর্জ্জনার মত এমন করিয়া নিতান্তই ফেলা যাইত না। পরিতাপের বেদনা কঠিন বলে বনমালীর মূর্ত্তিকে বিমলার হৃদয়ের মধ্যে কাটিয়া কাটিয়া খুদিয়া দিতেছিল। নিকটে থাকিয়া যাহাকে চিরাভ্যাসের ঔদাসীন্যের সহিত দেখিত, দূরে আসিয়া বিমলা তাহাকে মনের মধ্য হইতে কিছুতেই ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না।

আজ বিমলা গৃহভিত্তিতে ঠেস্ দিয়া পা ছড়াইয়া যখন কোন-এক অলক্ষ্য-গোচর সুদূর দেশের দিকে চাহিয়া ছিল, তখন কাহার অদৃশ্য আকৃতি তাহার দুটি করুণ চক্ষুর উপরে অশ্রুহীন বেদনার ছায়া ফেলিয়াছিল, তাহা সে নিজে স্পষ্ট বুঝিতেছিল কি না, জানি না। এমন সময়ে তাহার অপরিস্ফুট মনের ভাবনা মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল।

এ কি! এ যে বনমালী! একমুহূর্ত্তে বিমলার হৃৎপিণ্ডের সমস্ত রক্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল তাহার হাত-পা হিম হইয়া আসিল। ক্ষণকাল পরে আত্মসংবরণ করিয়া সে মাথার উপরে কাপড় টানিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বনমালী কহিল—"বিমি, তোমাকে দেখিতে আসিলাম।"

বিমি! তাহার পিতৃগৃহের এই আদরের নামটি শুনিয়া বুকের ভিতর হইতে বিমলার সমস্ত প্রাণটা সাড়া দিয়া উঠিল। হায়, মানুষের প্রাণ কতটুকু সুখের জন্য কতখানি তৃষিত হইয়া থাকে! পৃথিবীতে আর কাহারো কাছে এই ছোট শব্দটির কোনই মূল্য নাই—তবু ইহা এত দুর্লভ!

বিমলা কম্পিতস্বরে কহিল—"বাবা তোমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন?"

বনমালী। না, আমি আপনি আসিয়াছি।

বিমলা। কেন তুমি এমন কাজ করিলে? মাথা খাও, তুমি এখনি চলিয়া যাও!

বনমালী বলিল, "আমি তোমার বাবার নাম করিয়া তোমাকে লইতে আসিয়াছি। এখানকার যে-রকম খবর পাই, তাহাতে আমাকে কিছুতে স্থির থাকিতে দিল না।"

বিমলা বারবার বলিতে লাগিল—"আমি এখানে বেশ ভাল আছি, সুখে আছি, আমার জন্য ভাবিয়ো না। আমার মাথার দিব্য, তুমি এখনি পালাও।"

এমন সময়ে বাহির হইতে একটা পায়ের শব্দ শুনা গেল। বিমলা ক্ষণকালের জন্য বিবর্ণ হইয়া মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া লইল এবং হঠাৎ কণ্ঠ উচ্চ করিয়া বনমালীকে পিতৃগৃহের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল।

সাধুচরণ ভিতরে প্রবেশ করিয়া একবার বনমালীর, একবার স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল।

বনমালী কহিল, 'বিমলাকে সে তাহার বাপের পক্ষ হইতে লইতে আসিয়াছে।' বলিয়া ফলমূলমিষ্টান্নের ঝুড়ির উপরকার আবরণ খুলিয়া দিল। বিমলা ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

সাধুচরণ কহিল, "কই, তোমাকে ত কখনো আমার শ্বশুরবাড়ীতে দেখি নাই!"

সে উত্তর করিল, "মশায় ক'বারই বা শ্বশুরবাড়ী গেছেন!"

"আচ্ছা, আপনি এই ঘরে আসিয়া বসুন"—বলিয়া সাধুচরণ বনমালীকে ঘরের ভিতরে আনিয়া বাহির হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া তালা লাগাইয়া দিল। তাহার স্ত্রী যে ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, সে ঘরেও আর-এক তালা পড়িল। তাহার পরে দুই দোদুল্যমান পায়ের আঘাতে টাট্টু ঘোড়াকে উত্তেজিত করিতে করিতে চষা মাঠের মধ্যে ধুলা উড়াইয়া সাধুচরণ শ্বশুরবাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। মধ্যাহ্নভোজনের পরে ঘরের বিড়ালটি প্রতিদিন যেমন ঘুমায়, তেমনি আরামে প্রাঙ্গণকোণের ছায়ায় পড়িয়া ঘুমাইতে লাগিল—এবং বহুদূর মাঠ হইতে রাখাল-বালকের গানের উচ্চতান আসিয়া ঘুঘুর ডাকের সহিত আপনার করুণা মিশাইল।

* * * *

রাত্রে গ্রাম নিসুপ্ত। কি কৌশলে জানি না, বনমালীর কারাদ্বার খুলিয়া বিমলা চুপি-চুপি কহিল—"তুমি পালাও!"

বনমালী বলিল—"তুমি সঙ্গে এস!"

বিমলা কহিল—"সে হইবে না—আমার মাথা খাও, তুমি পালাও!"

বনমালী বলিল—"তোমাকে এমন বিপদে ফেলিয়া আমি কেমন করিয়া যাই!"

বিমলা। না গেলে আমি মরিয়া যাইব—তোমার সঙ্গে গেলেও আমাকে গলায় দড়ি দিয়া মরিতে হইবে!

শুনিয়া বনমালী নিজেকে ধিক্কার দিয়া চলিয়া গেল।

সাধুচরণ রাত্রি দুটার সময় ফিরিয়া-আসিয়া দেখিল, বনমালী পালাইয়াছে—স্ত্রীর ঘর ভিতর হইতে বন্ধ। দ্বার ভাঙিয়া বিমলাকে প্রশ্ন করিল—"সে লোকটা কোথায় গেল?"

বিমলা কোন উত্তর করিল না!

সাধুচরণ। তুই তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিস্?

বিমলা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

সাধুচরণ তাহার পরে তাহাকে আরো কিছু বলিল—সে নীল হইয়া হিম হইয়া কোণে বসিয়া রহিল।

• • • •

ভোলানাথের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি সংবাদপত্রের সংবাদদাতা। পুলিশের ঘুষ এবং অন্যায় অত্যাচার সম্বন্ধে তিনি অনেক লেখনী ক্ষয় করিয়াছেন।

রাত্রি শেষ না হইতেই তাঁহার দ্বারে ঘা পড়িল। সাধুচরণের চাদর হইতে স্খলিত হইয়া তাঁহার বাক্সর মধ্যে কিছু টাকা ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

পরদিন রাষ্ট্র হইল, সাধুচরণের যুবতী স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে। বিমলার পিতা অবিশ্বাস প্রকাশপূর্ব্বক ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়া দোহাই দিয়া পড়িলেন। কিন্তু এবারেও এক ভদ্রলোক আর-এক ভদ্রলোককে রক্ষা করিল। ভোলানাথ পরোপকারী। সে নিজের জন্যও উপায় করিতে জানে!

অনতিবিলম্বে অনেকগুলি বিবাহের প্রস্তাব আসিয়া উপস্থিত হইল। কন্যা-বৎসল পিতারা সৎকুলীনের মর্য্যাদা বোঝে!

স্ত্রীর হিসাবে সাধুচরণের 'দ্বত্র আর্য্য তত্র ব্যয়।'

"চিরদিন।"

[ফরাসী কবি কম্পে হইতে]

মাথাটি রাখিয়া মোর বুকের উপরে
বলিলে—"তোমারি আমি চিরদিনতরে।"
কিন্তু তবু ছাড়াছাড়ি হবে একদিন
—সেই তো বিধির বিধি—দারুণ কঠিন!

কে জানে মোদের মাঝে আসিয়া মরণ
হরিয়া লইয়া যাবে কাহারে প্রথম।

প্রবীণ নাবিকগণ তরীঘাটে মনসুখে
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
দেখিয়াছে শতবার তরিখানি আসিয়াছে
কূলেতে ফিরিয়া।
কিন্তু একদিন সেই তরিখানি পাড়ি দিল
উত্তরপ্রদেশে;
আর দেখা নাহি তার;— মেরুর বরফে বুঝি
চূর্ণ হ'ল শেষে।

দেখিয়াছি কতবার— বহিত বসন্ত-বায়
যবে ধীরে ধীরে,
ভ্রমন্ত বিহঙ্গগুলি মোর এই গৃহতলে
আসিত গো ফিরে।
এইবার কিন্তু হায়! সেই সে বসন্ত এল
—তারা নাই নীড়ে!

তব ভালবাসা প্রিয়ে রবে চিরদিনতরে
বলিছ আমায়,
কিন্তু আমি ভাবি মনে,— কত লোক গেল চলি'
—না ফিরিল হায়!
তাই বলি, "চিরদিন" এই কথা নাহি সাজে
মর্ত্ত্য রসনায়!

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বপ্নপ্রয়াণ। [২য় সংস্করণ]

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

বাংলাসাহিত্যের প্রবাহে, কিছু পশ্চাতে, একখানি কবিতার দ্বীপ নিজের সূর্য্যাস্তবর্ণ-বিলাসে,ঘনান্ধকারে,শৈলপ্রাকারে,—নিজের অধ্যাত্ম আনন্দের স্বপ্নে অভিনিবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছে—এখনো সেখান হইতে আমাদের জীবনের সঙ্গে বৃহৎ সেতু পড়িয়া যায় নাই। বাস্তবিক সেকালের অন্যান্য কবিতার পার্শ্বে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যখানিকে ধরিয়া দেখিলে অনেক কথা মনে হয়। ম্যাথু আর্নল্ড কবি গ্রের সমালোচনায় বলিয়াছেন যে, গ্রে একজন অতি সুন্দর কবি ছিলেন, কিন্তু পোপ্-ড্রাইডেনের গদ্যময় যুগে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বেশি কবিতা লিখিতে পারেন নাই,—তাঁহার শ্রেষ্ঠতর কবিত্ব চারিদিকে গদ্যের চাপে প্রচুররকমে উৎসারিত হইতে পারে নাই। এই উক্তিতে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে একটি ছবি জাগিয়া পড়ে। মনে হয়, যেন চারিদিকে একটা ধূম্রমণ্ডল—দূরে এককোণে কোথায় একটি কিংশুকবর্ণ জ্যোতিঃশিখা কাঁপিতেছে, ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে—এখনো তাহাকে কেহই দেখিতেছে না। বাস্তবিক জন্‌সন্ গ্রেকে সরাসরি 'Barren rascal' বলিয়াই সমালোচনা সাঙ্গ করিয়াছিলেন।

সেকালের কবিতার অনেক গুণ থাকিতে পারে—কিন্তু স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যখানি হইতে যে একটি মধুর রঙীন জ্যোতি বাহির হইয়া আসিতেছে, স্বপ্নপ্রয়াণের মধ্যে যে একটি জীবনের আন্দোললীলা দেখিতে পাই—এবং এই কাব্যের ভাষায় যে একটি অপূর্ব্ব নূতনত্বের আস্বাদ পাওয়া যায়—তাহাতে আমাদের চিত্ত আনন্দের রশ্মিঘাতে জাগিয়া উঠে, একটি বিরল কবিত্বলোকের মধ্যে উদ্ভ্রান্ত হইয়া যায়—ইহা সেকালের অন্যান্য কবিতায় প্রায় একেবারে দুর্লভ।

চিত্র ও তাহার সঙ্গে ভাষার মনোহারিত্বই স্বপ্নপ্রয়াণে প্রথমত চোখে পড়ে। অনেকের লেখা যেন বিমর্ষভাবে শুইয়া থাকে,—পাঠক তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া লইয়া, পাঠক তাহাতে নিজের কল্পনা প্রয়োগ করিয়া—তবে কোনোমতে ভাবটাকে জাগাইয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। আবার কোন কোন লেখায় বেশ ভদ্রলোকের মত পাঠকের সঙ্গে হাতাহাতি চলিতে থাকে—যতই সুন্দর, যতই গম্ভীর ভাব ব্যক্ত করা তাহার উদ্দেশ্য হোক্ কথা-বার্ত্তাটি বেশ ভব্যরকমের। আর-এক-রকম লেখা আছে, যেখানে পাঠককে ক্ষণে ক্ষণে শ্বাস রুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়,অনেকগুলি শুষ্ককথার জাল ঘুরিয়া-ফিরিয়া তবে একটি চিত্র উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু স্বপ্নপ্রয়াণের লেখায় পদে পদে বিস্ময়ের আবির্ভাব, কথায় কথায় অপ্রত্যাশিত, অভাবিতপূর্ব্ব অথচ চিরপরিচিত চিত্ররাজি। ভাষা চোখেই

পড়ে না, চিত্রই জাগিয়া উঠে। যেখানে বা চিত্র নাই,সেখানেও ভাষার একটি অবলীলাকৃত সজীব ভঙ্গীতে পাঠকের মন উদ্যত হইয়া থাকে।—এইরূপে আদ্যোপান্ত মনটি সজাগ হইয়া বসিয়া থাকে এবং অবিরাম একটি বিচিত্র জীবনের আনন্দে মাতিতে থাকে।

"সুপ্তিতে ছুঁইয়া গেল জাগরণ—
সাগরসীমায় যথা অস্ত যায় জলন্ত তপন।
স্বপনরমণী আইল অমনি।"—

এই প্রথম তিন ছত্র পড়িতেই বোধ হয় যেন দৃশ্যপটের উপর অস্তগামী তপনের বর্ণচ্ছটাকে অনুসরণ করিয়া একটি গভীর স্বপ্নাবেশ চক্ষের উপরে আসিয়া আবির্ভূত হইতেছে। ক্রমে—

"ছোঁয় কি না ছোঁয় মাটি,
আঁচল ধরায় পড়ে লুটি"—

এইরূপ গমনে স্বপ্ন আসিয়া দু'চার ছত্র পরে যখন একটি পদ্মফুল—

"বুলাইল কবির মুখে চক্ষে নাসিকায় শিরে—

তখন আবেশটি আরও নিবিড় হইয়া উঠে। ক্রমে দেখা যায়, সমস্ত প্রথম প্রয়াণটি ব্যাপিয়া কেমন একটি শিথিল, লুণ্ঠিত, অলস ও একটি স্তম্ভিত-বিস্মিত ভাবের ঘোর লাগিয়া রহিয়াছে।

উদাহরণস্বরূপে এতখানি বলা হইল। কিন্তু সকল স্থলেই এইরূপ—যখন যে ভাব, তখন সেই ভাবের আশ্চর্য্যরকমে, পরিপূর্ণরকমে উদ্বোধন দেখা যাইবে। বহির্জগতের এত চিত্র, এত পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র বাংলার আর কোন কাব্যেই নাই। শব্দের এমন ক্ষমতা যে, উচ্চারণমাত্র চক্ষে চিত্র উপস্থিত হয়, যথা—

নদী,—

সরিৎ ত্বরিৎ বহে তট চুমি' চুমি'।

ফোয়ারা,—

ছুটেছে ফোয়ারা হর্ষে মাতোয়ারা
শূন্যে চড়ি উঠিয়া ধরিতে যায় গগনের তারা
না পেয়ে নাগাল ছাড়ি দিয়া হাল
মনোদুখে অধোমুখে কাঁদি হয় সারা।

সুরভি মন্দানিল—

আহা আহা সুমন্দ মৃদু সমীর
ফুলের প্রাণের কথা আনিতেছে করিয়া বাহির।

ভাঙা-দালানে বায়ু—

জানালা ঠেলিয়া বায়ু চলি যায় বলি 'সর সর'।

পাতাল—

শ্রবণশ্রবণ গহ্বরভবন

* * * *

টুঁশব্দটি হইলেই তাড়াতাড়ি
তাহারে লুফিয়া লয় দশদিক্ করি কাড়াকাড়ি।

—ইত্যাদি। এইরূপ প্রতি ছত্রে। শুধু বাস্তব নহে, মনের একেকটি ভাবও অপূর্ব্ব কাল্পনিক চিত্রে উদ্ভাসিত হইয়াছে। যেমন,—মনোরাজ্যের নামে কবি আনন্দে বিভোর হইয়া বলিতেছেন—

"মনোরাজ্য নাম্নী মধুতে ভরা
ফুটে যথা পারিজাত বিচরে গন্ধর্ব্ব অপ্সরা
দলি স্বর্ণরেণু চরে কামধেনু
কল্পতরুছায়াতলে রত্নে হাসে ধরা।"

এই শ্লোক কালিদাস লিখিতে পারিতেন। এই শ্লোকে আনন্দের অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্য অলকাপুরীর চিত্রে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এইটি আবার বিশেষ করিয়া বারবার বলি যে, এইরূপ চিত্র যে শুধু একটি-দুটি হঠাৎ এখানে-ওখানে পাওয়া যায়, তাহা নহে,—এইরূপ চিত্রাবলী প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত। বাস্তবিক, স্বপ্নপ্রয়াণ ব্যক্তিত্ব-বিহীন গভীর ভাব উদ্বোধনেরই কাব্য—মানবের অধ্যাত্মজীবনের একটি পরিণতি-

ক্রমই ইহাতে উদ্ভাসিত হইয়াছে। প্রথম সেই অধ্যাত্মরাজ্যের পরিণামক্রমটি মনের মধ্যে স্থির করিয়া ধরা; ক্রমে বহির্জগতের যথাযথ চিত্রে সেইটিকে পরিস্ফুট করা, মনোভাবের ভূতগুলিকে যাদু করিয়া মানুষমানুষীবেশে নদীকান্তারগিরিবনে পরিভ্রমণ করানো; চিত্রের যথাকাল ও যথাভাবগুলিকে অনুরূপ ছন্দের লীলায় প্রকাশ করিয়া তোলা; এবং ছন্দগুলিকে সজীব ও উজ্জ্বল শব্দমালায় গাঁথিয়া উঠানো—এইরূপে স্বপ্নপ্রয়াণের আদ্যোপান্তই একটি অতি উজ্জ্বল পরিস্ফুটনক্রিয়া চলিয়াছে। এই অপন্থ, পরিপূর্ণ পরিস্ফুটনক্রিয়াটির মধ্যে একটি অসাধারণ মনঃশক্তির বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতেছে। এই মনটির কল্পনাসম্পদ্, ছন্দসম্পদ্ ও ভাষাসম্পদ্ সাগরের মত অশেষ। ইহার অনুভাব—গাম্ভীর্য্যেরই হোক্ আর সৌন্দর্য্যেরই হোক্—ইহার অনুভাব এবং প্রকাশক্ষমতা—অর্থাৎ কবির প্রধান দুটি গুণ—প্রচুররূপে বর্ত্তমান। প্রকাশের কথায় আবার অনেক চিন্তা মনে উঠে। কোন কোন কবিতায় বাস্তব-চিত্রগুলিকে জড়াইয়া চারিদিকে এমন-একটা সঙ্গীতের মেঘ জমিয়া উঠে যে, চিত্রগুলিকে ভালমত দেখা যায় না, তাহার চারিদিক্ আবিষ্ট করিয়া একটা কুহেলিকার ঘোরের মত থাকে—এটা অবশ্য আমাদের মনের বিভ্রমের ফল, আমাদের মনটাই সঙ্গীতের দ্বারা একেবারে আবিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এই মেঘটা কাটিয়া-ফেলিয়া শব্দগুলিকে বেশ লঘু, শুষ্ক রকমের করিয়া লইতে পারিলেই চিত্রগুলিকে বিশেষ উজ্জ্বল করিয়া ফলানো যায়। স্বপ্নপ্রয়াণে এইরূপ ভাষাই দেখিতে পাই—অথচ সর্ব্বত্রই একটি মৃদুল, ললিত রকমের ধ্বনি খেলা করিয়া যাইতেছে। এখন দেখা যাউক, ঠিক এইরূপ শব্দ এবং খুব ভাবপ্রকাশক্ষম শব্দ কোন্‌গুলা। সহজেই বুঝা যাইতে পারে—সে আমাদের ঘরের ভাষা, সে আমাদের প্রতিদিনের কথাবার্ত্তার জীবন্ত idiomatic বা যোগরূঢ় ভাষা! স্বপ্নপ্রয়াণের কবির যেমন বাংলার এই যোগরূঢ় ভাষার উপর হাত আছে, এরূপ আর আমাদের কোন কবিরই নাই। এই কাব্যে, আমাদের জীবন্ত, সক্রিয়, ঘাতসহ প্রতিদিনের গদ্য হইতে শব্দ বাছিয়া-আনিয়া সেই ভাষার মধ্যেই নানারসের জোয়ার ছুটাইয়া দেওয়া হইয়াছে,—বিচিত্র সংস্কৃত শব্দগুলিকেও দেশী বাংলার সঙ্গে গলাইয়া, নানা বিচিত্র মিলের তটে বাঁধিয়া, নানারূপ ছন্দের খাতে প্রবাহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমাদের চিরপরিচিত বন্ধু যে এত কথা কহিতে পারে, আমাদের গৃহদ্বারের স্রোতটি যে গিরিশিখর পর্য্যন্ত উঠিতে পারে, পাতাল পর্য্যন্ত ডুব মারিতে পারে—ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। স্বপ্নপ্রয়াণের এইরূপ দেশী ভাষা বলিয়াই, ইহার চিত্রগুলি এত অনায়াসে আমাদের চক্ষের উপর নাচিয়া উঠে, ভাবগুলি নেশায় ধরার মত এত চট্ করিয়া আমাদের মনটিকে ধরিয়া ফেলে!—স্বপ্নপ্রয়াণ নিতান্তই দেশী। এই কাব্যখানির এত ঔজ্জ্বল্যের অন্যতম কারণ এই দেশীয়তা। কেবল ভাষাই নহে, ইহার ভাবসঙ্গতিও নিতান্তরূপে দেশী। আনন্দরাজার সভা, হরষ-উল্লাস

দুটি বালকের ব্যবহার; নন্দনপুরের বননদী-কান্তারের দৃশ্য; চিত্রলেখার হস্তে সরস্বতী, যশোদা, সীতা প্রভৃতির চিত্র;—নৌকায় চড়িয়া প্রমোদপুরে গমন; প্রমোদপুরের চটুল, বিলাসী অধিবাসিগণ ও সভার রঙ্গময় নৃত্যগীত;—বিষাদপুরের তালবেতাল, পেতনী মাসী, বীভৎস অরণ্য;—বিষাদপুরের বিড়ালের খঞ্জনী বাজান, কাকাতুয়ার 'টাকুটাকু আহারে' 'কালো যেন লোহা' রসনা নড়ান, হাড়গিলার থলিয়া ঝুলান;—বিষাদপুরের হাহা-হুহু গন্ধর্ব্ব, জাড্য মন্ত্রী, অন্ধকার-সভা; রসাতলের গভীর অন্ধকারে ভৈরব কাপালিক, কালীপূজা, শ্মশান, উল্কামুখী, বড়াইবুড়ী প্রভৃতি;—সমরপ্রয়াণে যুদ্ধের বর্ণনা; মৈত্রদেবের 'বন্ধনপাশ' ত্যাগ করা; দুর্ভিক্ষের অগ্নিবাণবৃষ্টি, বাণে বাণে কাটাকাটি; এবং অবশেষে শান্তিপ্রয়াণের তপোগিরি, শ্রেয়, শ্রেয়ঃপথ, স্বর্ণবেত্রহস্তে সুসঙ্গ; গিরিশিরে দাঁড়াইয়া ঋষিদলের স্তবগান—সর্ব্বত্রই আমাদের স্বদেশী প্রাকৃতিক দৃশ্য, দেশী বিচিত্র রূপকথা ও কাহিনী, আমাদের পরিচিত তান্ত্রিক-সাধনার ভীষণতা, দেশী ছবি, দেশী রামায়ণ-পুরাণের যুদ্ধবর্ণনা এবং আমাদের স্বদেশী ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা আমাদের মনে পড়িয়া যায়। ইহার অধ্যাত্মতত্ত্বটিও আমাদের স্বদেশী।

এই-ই স্বপ্নপ্রয়াণের শক্তির অন্যতম মূলকারণ। স্বপ্নপ্রয়াণের এই দৃঢ়, অনন্ত, স্বদেশী ভাবটির কাছে বাংলার অন্যান্য কাব্য নিস্তেজ—কারণ, একে ত বিদেশী ভাবের অনুকরণ কিছুতেই দেশী ভাবের মত স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না তার পরে আবার স্বপ্নপ্রয়াণের মত বাস্তবানুভূতি, ভাষায় এমন সম্পূর্ণ অধিকার কোনো কাব্যেই দেখা যায় না। তবেই দেখিতে পাই, স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যখানি নিতান্ত দৃঢ়। এই দৃঢ়ত্বের যাহা অন্যতম প্রধান কারণ, এখন তাহাতেই অবতীর্ণ হওয়া যাউক।

অনেকেই কোন একটা বিষয়ে কাব্য লিখিতে হইবে, অন্যকে নিজের শক্তি দেখাইতে হইবে—এইজন্য কাব্য লিখিবার একটা বিষয় অনুসন্ধান করিতে নামিয়া পড়েন। ইহার ফল এই হয় যে, যাঁহারা ভাগ্যক্রমে নিজের শক্তির উপযোগী বিষয় পাইয়া যান, তাঁহাদের যা-হোক্-কিছু-একটা দাঁড়ায়; কিন্তু যাঁহারা তাহা না পান, তাঁহারা এদিক্-ওদিক্ করিয়া একটা মূঢ় বিশৃঙ্খলরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকেন। কিন্তু সেই কবি কোথায়, যিনি নিজের একটি আনন্দে সর্ব্বাগ্রে বিভোর হইয়া, ভরপুর হইয়া আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া গাহিয়া উঠিয়াছেন? এইরূপ কবিগণ যখন কবিতা লিখিতে থাকেন, তখন ইঁহাদের কোন লোকের কথা মনে থাকে না, যশ মনে থাকে না,—মনে, সকলের উর্দ্ধে জাগিয়া থাকে—আনন্দের জ্যোতির্ম্ময় গিরিচূড়া এবং তাহারি পাদমূলে তাহারি স্তবগীতচ্ছন্দে মনের সমস্ত শক্তি হিল্লোলিত হইয়া নৃত্য করিয়া বেড়াইতে থাকে! এইরূপ কাব্যের পাঠকেরা একটি সুদূর, আপনাতে-আপনি-বিলসিত আনন্দের আভাস পাইয়া ধন্য মানিয়া যায়। আমরা স্বপ্নপ্রয়াণে এইরূপ আনন্দের আভাস পাইয়াছি। যে অধ্যাত্মজীবনের বিবৃতি স্বপ্নপ্রয়াণে দেখা

যায়—তাহা কবি কাব্য লিখিবার মানস করিয়া খুঁজিয়া বাহির করেন নাই—আগে হইতেই তাহার মধ্যে ডুবিয়া ছিলেন। পরিচয় কোথায়? পরিচয় এই কাব্যের উদার স্ফূর্ত্তিতে, পরিচয় ইহার যথাযথ পরিমাণে। কিন্তু পরিষ্কার-বলিয়া-দেওয়া পরিচয়ও আছে—কাব্যের আরম্ভেই আছে, যেমন সংস্কৃত-কাব্যে থাকিত—তাহার কতক অংশ এই প্রবন্ধেরই আরম্ভভাগে উদ্ধৃতও করিয়াছি; অপর অংশ এই :—

কবি কল্পনাকে বলিতেছেন,—

"রাজ্য পাইলাম হাতে 'মনোরাজ্য' শুনি।
তোমা সঙ্গে তথায় না যাব যদি
কেন তবে এতেক সাধ্যসাধনা শৈশব-অবধি!
অই মম জপ, অই মম তপ
অই চাঁদে উনমাদ বাসনা-জলধি।"

এই আবেগপূর্ণ উক্তিতেই সেই আনন্দের পরিচয়।

আমি যতদূর বুঝি, ততদূর স্বপ্নপ্রয়াণের মূল সৌন্দর্য্যগুলি বিবৃত করিলাম। এখন একটি প্রশ্ন করিবার সময় উপস্থিত। এত সুন্দর, এত অলঙ্কার মায়াময়, এত অদ্ভুত-পৌরুষবিশিষ্ট কাব্যখানি—তবু ইহার আদর কেন হয় নাই? কাব্যামোদী অল্পসংখ্যক লোকের কাছে আদর হইলেও স্বপ্নপ্রয়াণ বাঙ্গালাদেশে প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই, ইহা স্থির। কেন? ইহার কারণ কি? কারণ সেই গো এবং গোপ্। কারণ সহজ ভাষা ও গভীর সৌন্দর্য্যের অমূল্য মাহাত্ম্য অনেকেরই তখন অধিগম্য ছিল না। কিন্তু আরও কারণ থাকিতে পারে। সে হচ্ছে এই যে, স্বপ্নপ্রয়াণ রূপক। রূপক ব্যক্তিত্বের সার্ব্বভৌমিক ভিত্তির উপর দাঁড়ায় না, সে মনোরাজ্যের সুদূর গুহায় ভিত্তি পাতিত করে। ভাবিয়াও দেখি, স্বপ্নপ্রয়াণে ব্যক্তিত্বের সংঘাতোৎঘূর্ণা নাই—ইহার স্বপ্নসৃষ্ট দল, একের পর আরেকটি, স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে;—এগুলির উপর মানুষের কতকটা আকার-প্রকার দেওয়া হইয়াছে মাত্র—হৃদয়ের গভীর করুণা, শোক, সন্দেহ প্রভৃতির বিচিত্র কুটিল আবর্ত্ত ইহার মধ্যে দেখা যায় না—এ কাব্যে ব্যক্তিত্বের ইন্দ্রজাল নাই। এইরূপ একটা কারণ থাকিতে পারে—কিন্তু তথাপি যদি কবিত্ব আদৃত হইত, তবে এ দোষটা গণনা না করা যাইতেও পারিত। যে ভাবে আছে, ইহাকে সেই ভাবেই কেন গ্রহণ করা যাউক না! এই কাব্যখানি অধ্যাত্মরাজ্য এবং তাহার অনুরূপ-ভাবময় বহির্জ্জগৎ, এই দুয়েরই মধ্যে সরল জীবনলীলার আনন্দে পরিপূর্ণ—এই ভাবেই কেন ইহাকে গ্রহণ করা যাউক না? ইহা স্বপ্নপ্রয়াণ নাম ধরিয়া, ইহার সুন্দর বিকটগম্ভীর অত্যুজ্জ্বল স্বপ্নরাজ্য সৃজনের দ্বারা নিজের নাম সার্থক করিয়াছে—আমরা সেই ভাবেই কেন ইহার মধ্যে প্রবেশ না করি? সেই ভাবে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা থাকিলে আমরা স্বপ্নপ্রয়াণে আমাদের চিত্তকে বহুবহু দূরে—বহু রত্নদ্বীপের উপকূলে, বহু গুহার শ্রবণপ্রবণ অন্ধকারে সাঁতার দেওয়াইয়া, একটি অদ্ভুত শক্তির আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিতে পারিব—নিরঞ্জন নেত্রে সহসা জগৎ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া দেখা দিবে, নির্ম্মুক্ত শ্রবণকুহরে আনন্দের বিশ্বব্যাপী বন্দনাগান ধ্বনিত হইয়া উঠিবে।

তবুও কিন্তু অনেকেই আদর করিল না—তাহার কারণ আছে, যথা :—পরিপূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইলেও, স্বপ্নলোকে প্রয়াণ করিবার শক্তি সকলেই রাখে না। অনেক লোকই কর্ম্মিষ্ঠ সংসারী ব্যক্তি,—কাজকর্ম্মের অবসানে দিব্য নিদ্রা দিয়া আরাম লাভ করে। সেই নিদ্রার মধ্যে বিকৃত স্বপ্ন অনিবার্য্যরূপে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়ে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই—কিন্তু জাগিয়াও এতটা নিষ্ফল স্বপ্ন লইয়া বসিয়া থাকিবার শক্তি অনেকেরই নাই। অথচ যদি রীত্যনুসারে সংস্কৃতশব্দের হাতীতে চড়াইয়া, অতি বিকৃত সাজসজ্জাতেও, কতগুলা ক্ষণিক বাহ্যিক রূপদেবতাকে বাহির করিতে পার—তবে ইহারা দাঁড়াইয়া চীৎকারস্বরে বাহবা দিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বপ্নামোদিগণ এই দলের জন্য কৃপা রাখিয়া অচিরেই আবার সেই বিচিত্র স্বর্গ-রসাতল-অভিমুখে পলায়ন করিয়া থাকেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

পাদ্রির কঙ্কাল।

(ফরাসী লেখক গ্যাব্রিয়েল মার্ক হইতে)

১

অধ্যাপক আল্‌সিবিয়াড্-রেণোকে যাঁহারা জানেন, তাঁহারা সকলেই বলেন, তিনি একজন বাতিকগ্রস্ত বৃদ্ধ। সকলেই এই কথা বলেন বটে, কিন্তু কেন বলেন, জিজ্ঞাসা করিলে কোন যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে পারেন না। আমরা যখন কাহাকে 'ভালমানুষ' বলি, তখন যেমন ঠিক্ তার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারি না, 'বাতিকগ্রস্ত' শব্দটিও আমরা ঐরূপ অনির্দ্দিষ্টভাবেই প্রয়োগ করিয়া থাকি। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, ঐ শব্দটির দ্বারা যে ভাব ব্যক্ত হয়, অন্য কোন শব্দে ঠিক্ সে ভাবটি ব্যক্ত করা যায় না।

সেই সর্ব্বজনসমাদৃত শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক আল্‌সিবিয়াড্-রেণো সংসার হইতে অবসর লইয়া সুদূর বিজনে বাস করিতেন। কৃপণ, শঠ, স্বার্থপর সাংসারিক ব্যক্তিদিগের সঙ্গ সযত্নে বর্জ্জন করিয়া তিনি উন্মত্তভাবে অতীন্দ্রিয় ভৈষজ্য ও দর্শন শাস্ত্রের গূঢ়রহস্য-আলোচনায় নিমগ্ন থাকিতেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর তারিখে তিনি একখানি পুরাতন পুঁথির অক্ষর-বাচন ও অর্থোদ্ঘাটনে ব্যাপৃত ছিলেন। সেই পুরাতন পুঁথিখানিতে কতকগুলি অলৌকিক ঘটনার কথা বিবৃত ছিল এবং সেই সম্বন্ধে একজন ধর্ম্মিষ্ঠ মঠ-সন্ন্যাসীর টীকাটিপ্পনীও যথেষ্ট ছিল। কতকগুলি মহাপাপীকে ঈশ্বর কিরূপ শারীরিক দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন; পাপের শাস্তিস্বরূপ কাহার বাক্-ঔরাধ

হইয়াছিল, রূপগর্ব্বের জন্য কাহার সুন্দর দেহ কুৎসিত হইয়া গিয়াছিল, এই সমস্ত কথাতেই পুঁথিখানি পরিপূর্ণ। সেই পুঁথির অন্তর্গত একটি প্রবন্ধের প্রতি তাঁহার মনোযোগ বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। সেই প্রবন্ধটি এই:—"একজন নিরস্বীকৃত ব্যক্তির অত্যাশ্চর্য্য প্রামাণিক ইতিহাস।"

সেই প্রবন্ধে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে;—একজন মঠ-সন্ন্যাসী ব্রহ্মচর্য্যব্রত ভঙ্গ করায় সেই পাপের শাস্তিস্বরূপ, তাহার শরীর হইতে কঙ্কাল বাহির করিয়া লওয়া হয়। এইরূপ অস্থিশূন্য অবস্থায় সমস্ত উদ্দাম বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে অনেক-বৎসর কাল জীবনধারণ করিতে হইয়াছিল। কেন না, সেই পাণ্ডুলিপির লেখক বলেন, মনুষ্যের চিন্তাবল ও ইচ্ছাশক্তির উপর দেহস্থ অস্থিসমূহের বিলক্ষণ প্রভাব আছে। তিনি আরও বলেন, এইরূপেই মনুষ্য এই পৃথিবীতেই কিয়ৎপরিমাণে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। অধ্যাপক, অনেক-দিন হইতে এই সকল অদ্ভুত সিদ্ধান্তের কোনরূপ যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিতে না পারিয়া, বিরক্ত হইয়া পুঁথিখানি বন্ধ করিলেন।

বিশ্রামের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া, তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহ হইতে বাহির হইলেন। সেই প্রদেশে কৃষকদিগের একটি সরোবর ছিল, সেই সরোবরের ধারে তিনি নিত্য বেড়াইতে যাইতেন। কুসংস্কারাপন্ন কৃষকেরা সেই সরোবরটিকে 'মোহিনীর সরোবর' বলিত। এইখানে, অধ্যাপকমহাশয়, উৎপাটিত 'উইলো'গাছের গুঁড়ির উপর বসিয়া, নিশ্চলভাবে, নিবিষ্টচিত্তে অনেক-ক্ষণ ধরিয়া মাছ ধরিতেন। এইরূপ আত্ম-বিনোদন অধ্যাপকের পক্ষে অদ্ভুত বটে! একে তো, অধ্যাপক এ পর্য্যন্ত একটি মৎস্যও ধরিতে পারেন নাই; তাতে আবার ঋতু-সুলভ শীত ও বিষাদের প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারিয়া, ক্রমশ তিনি বিষাদময় চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন।

শরৎকালের সায়াহ্ন; বিজন পল্লীগ্রামে ইহারই মধ্যে শীতের কাঁপুনি আরম্ভ হইয়াছে। বৃষ্টিজলে সরোবরটি ঈষৎ পীতবর্ণ হইয়া গিয়াছে; এবং সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠনের ন্যায় সরোবরের জল কুয়াশায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। উচ্চ পাড়ের উপর, শাখা-পল্লব-বিরহিত বৃক্ষগণ স্বীয় গুরুত্ব হারাইয়া যেন সেই স্বচ্ছ কুয়াশায় ভাসিতেছে। তত্রস্থ জনহীন মাঠ-গুলি একেবারে নিস্তব্ধ। কখন-কখন দুই-একটি দাঁড়কাক আসিয়া ইতস্তত বসিতেছে।

অধ্যাপক, প্রকৃতির এই বিষণ্ণভাবে অভি-ভূত হইয়া পড়িলেন। বিষাদের চিন্তাজাল আসিয়া যেন তাঁহাকে চারিদিক্ হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। তিনি যেন একপ্রকার বিষাদের বিলাস অনুভব করিতে লাগিলেন; স্বীয় অতীত জীবনের অশ্রুময় দিনগুলির স্মৃতিপ্রবাহে আপনাকে অসংযতভাবে ছাড়িয়া দিলেন। এখন যাহা-কিছু তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল, সমস্তই যেন তাঁহার যৌবনের স্মৃতির সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিল। শুষ্ক তরুপল্লবের মধ্যে থাকিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন তাঁহার যৌবনের সকল নিষ্ফল স্বপ্ন—অতৃপ্ত

বাসনা, মেঘের ন্যায় তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে ভাসিতেছে।

মনের ভাব টুকিয়া রাখা অধ্যাপকের অভ্যাস ছিল। বিভিন্ন সময়ের মনোভাব তুলনা করিয়া, তাহা হইতে তিনি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেন। তিনি এই সময়ে স্মৃতিলিপির বহি বাহির করিয়া, যে কথাগুলি তাহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, আমরা তাহার অবিকল প্রতিলিপি নিম্নে দিতেছি:—

"তেরেসিতা! যে প্রেম এখন অন্তর্হিত হইয়াছে, সেই প্রেমের তুমিই অধিষ্ঠাত্রী দেবী! তোমার একটি চাহনিতে আমার জীবনের রহস্য খুলিয়া গিয়াছিল! ঝটিকা-ভগ্ন শৈলরাশির মধ্য দিয়া—উৎপাটিত বৃক্ষ-সমূহের মধ্য দিয়া কত-কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, তবু আমি তোমাকে ভালবাসি..... কোথায় তুমি? বোধ হয় লোকান্তরে..... আহা! এই 'বোধ হয়' কথাটির মধ্যে কি মোহনমন্ত্রই নিহিত! আর আমি—সংসারের গলগ্রহ বৃদ্ধ আমি কিনা এখানে এই হাস্য-জনক তুচ্ছ ক্রীড়ামোদে আত্মবিনোদন করি-তেছি! আর তুমি রাফায়েল, স্বপ্নময় রহস্য-ময় ভাবে ভোর বিশুদ্ধচরিত্র যুবক—তুমি কি চাও?.....আমার চক্ষের সম্মুখ দিয়া তোমার সেই মূর্ত্তিখানি যেন চলিয়া যাই-তেছে—তোমার মুখে কি-এক অদ্ভুত হাসির রেখা যেন আমি অঙ্কিত দেখিতে পাইতেছি। মানবসুলভ দুঃখকষ্ট হইতে পলায়ন না করিয়া তুমি পাদ্রির বেশে সেই সব দুঃখ-কষ্ট আরও যেন আঁকড়াইয়া ধরিলে; পরে একদিন সহসা কোথায় অন্তর্হিত হইলে। ওঃ! সে কি ভয়ানক দিন! তেরেসিতা! রাফায়েল! আমি সমস্ত জীবন....."।

এই বাক্যগুলি একটু প্রলাপের মত শুনাইলেও, উহা হইতে বুঝা যায়, সেই বৃদ্ধ অধ্যাপকেরও একদিন ভালবাসার দিন ছিল; আর ইহাও নিশ্চিত, সে সময়ে বিজ্ঞান তাঁর একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল না।

যাহাই হউক, কুয়াশা ক্রমেই ঘনাইতে লাগিল; রাত্রিও নিকটবর্ত্তী, এখন গৃহে ফিরিবার কথা ভাবিবার সময় উপস্থিত হইল। অধ্যাপক লম্বা ছিপ্ কাঠির চারি-দিকে সূতা গুটাইয়া জড়াইতে লাগিলেন, তাহার ফাতনাটা সুদূর জলে একগুচ্ছ তৃণের মধ্যে ভাসিতেছিল। মনে হইল, সূতায় যেন টান পড়িতেছে, কিসে যেন আট্‌কাইয়াছে। চেষ্টা করিয়াও ছিপ্‌টা উঠাইতে পারিলেন না। মনে করিলেন, বঁড়শিতে একটা বড় মাছ বাধিয়াছে; তাই আস্তে আস্তে মৃদুভাবে সূতাটি টানিতে লাগিলেন; ক্রমে বঁড়শিশুদ্ধ বস্তুটা নিকট-বর্ত্তী হইলে, সেই বস্তুটি দেখিবামাত্র ভয়-মিশ্র বিস্ময় তাঁহার মুখে সহসা প্রকটিত হইল।

নিশ্চয়ই সামান্য একটা মৎস্য হইবে।

মনে হইল, বঁড়শি একটা জড়পিণ্ডে আট্‌কাইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, সে-সময় দিনের আলো একেবারে তিরোহিত হয় নাই; সেই আলোকে মানুষের মাথার খুলির মত কি যেন একটা পদার্থ দেখিতে পাইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, সেই মাথা একটা শরীরের সহিত স্বাভাবিক বন্ধনে সংযুক্ত, এবং যখন সেই মাংসহীন

কঙ্কাল জল হইতে আকৃষ্ট হইয়া পাড়ের বালির উপর প্রসারিত হইল, তখন তাঁহার মনে যে কিরূপ ত্রাস জন্মিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

যদিও অধ্যাপক মৃত্যু ও তাহার ফলাফল দর্শনে অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু এই মনুষ্য-কঙ্কাল অবলোকন করিয়া তাঁহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। তবুও তিনি ঐ কঙ্কাল ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছিলেন না; কি-যেন একটা দুর্দ্দমনীয় শক্তি তাঁহাকে কঙ্কালের সম্মুখে ধরিয়া রাখিল। তিনি কম্পিতদেহে সেই কঙ্কালটিকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; ক্রমে তাঁহার কৌতূহল আরও যেন উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি অচিরাৎ জানিতে পারিলেন, উহা মনুষ্য-কঙ্কাল; এবং সর্ব্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক অনুমান অনুসারে, মনুষ্যটি জরার প্রভাবেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, স্থির করিলেন। দাঁতগুলি সমস্তই বেশ সুরক্ষিত; এবং সেই বীভৎস শেঁটুকানো দন্তপাটি হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া আসিতেছিল; আর তাহার চক্ষুকোটর ও বিস্তৃত মুখের হাঁ, যেন অতলস্পর্শ গভীর বলিয়া মনে হইতেছিল।

কিন্তু অধ্যাপক কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না, কেমন করিয়া সমগ্র কঙ্কালটিকে দেহ হইতে অক্ষুণ্ণভাবে বাহির করা হইয়াছে; অস্থিতে-অস্থিতে এরূপ জোড় রহিয়াছে যে, মনে হয়, যেন সমস্ত কঙ্কালটি একখণ্ড অস্থিমাত্র। এই নিয়ম-বহির্ভূত ব্যাপারটি ভাল করিয়া নিজ কক্ষের মধ্যে অনুশীলন করিবার নিমিত্ত, অধ্যাপক সন্ধ্যার আবরণে অলক্ষিতভাবে কঙ্কালটিকে নিজগৃহে লইয়া যাইবেন, স্থির করিলেন। মাছ ধরিবার সরঞ্জামগুলি গুছাইয়া এবং ছিপ্‌গাছি কঙ্কালের একটা রন্ধ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া, এই অদ্ভুত বোঝাটি স্কন্ধে লইলেন এবং এইরূপ প্রেত-তণ্ডব-দৃশ্য বাস্তবজীবনে অভিনয় করিতে করিতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

২

গৃহে প্রবেশ করিয়া অধ্যাপক শয়ন-কক্ষে নিজশয্যার উপর কঙ্কালটিকে স্থাপন করিলেন; এই শয়নকক্ষেই তিনি বিজ্ঞান অনুশীলন করিতেন। এই ঘরটি খুব প্রশস্ত, ঘরের মেজে-ভিৎ খুব উচ্চ এবং ঘরের কড়ি-বরগাগুলি কালপ্রভাবে কালিমাগ্রস্ত। একটা পুরাতন কার্পেট্, যাহার রং জ্বলিয়া গিয়াছে, সেইটি ঘরের মেজের উপর পাতা; দেয়ালের গায়ে রাশিরাশি পুঁথি, বিবিধ ধাতুর নমুনা এবং আত্মীয়জনের কতকগুলি চিত্রপট সংরক্ষিত। ঘরের কোণে সেকেলে-ধরণের একটা পুরাতন 'পিয়ানো' রহিয়াছে—কিন্তু তাহা বহুকাল হইতে নিঃশব্দ ও সর্ব্বজনবিস্মৃত। ঘরের অপর প্রান্তে ছত্রি-ওয়ালা একটা প্রকাণ্ড খাট, খাটের উপর অর্দ্ধজীর্ণ একখানি বুটিদার রেশমের চাদর পাতা। এই শয্যার উপর কঙ্কালটি প্রসারিত, কঙ্কালটির মস্তক একটা বালিশের উপর রক্ষিত। দেখিলে মনে হয়, যেন কঙ্কালটি নিঃস্বপ্ন নিদ্রায় মগ্ন। একটা প্রকাণ্ড সেজের ভিতর একটি দীপ জ্বলিতেছে; সেই সেজের আবরণে দীপালোক ম্লানপ্রভ হইয়া, রহস্যময় একপ্রকার "আধো

আলো আধো ছায়া" ঘরের মধ্যে বিস্তার করিতেছে। অধ্যাপক একটি টেবিলের সম্মুখে উপবিষ্ট; টেবিলের উপর রাশিরাশি পুস্তক। সেইখানে তিনি বসিয়া, ঐ মৃত ব্যক্তি কি-না-জানি অসাধারণ পাপ করিয়াছিল, সেই বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের আবেগ কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলে, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল তাঁহার মনকে সবলে অধিকার করিল। কি অপূর্ব্ব প্রক্রিয়ায় এই কঙ্কালটিকে দেহ হইতে সমগ্রভাবে বাহির করা হইয়াছে—এমন কি, জলের অবিশ্রান্ত ক্রিয়াতেও তাহার স্বাভাবিক স্নায়ুবন্ধনগুলি ছিন্ন হয় নাই—এই প্রশ্নটি মনে মনে বারবার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। অস্থিবিদ্যাসম্বন্ধে পূর্ব্বে তাঁহার যে সকল ধারণা ছিল, তৎসমস্তই বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। ঐ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদি আলোড়ন করিয়াও ইহার কোন সদুত্তর পাইলেন না। তবে কি ইহলোকেই মনুষ্য কখন-কখন অজ্ঞাত জগতের সংস্পর্শে আইসে?—কখন-কখন কি মনুষ্য স্পর্শাতীত অধ্যাত্মরাজ্যের সীমান্তে নীত হয়? এইরূপ অতীন্দ্রিয় বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

তাঁহার কেশহীন ললাটের ভার হস্তের উপর ন্যস্ত করিয়া, কঙ্কালের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া, উদ্বিগ্নচিত্তে তিনি ভাবিতে লাগিলেন। কক্ষরক্ষিত অগ্নিকুণ্ডের শিখাপ্রভা সেই কঙ্কালের উপর পতিত হওয়ায়, মশারির ছায়ায়, সেই কঙ্কাল হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। এইরূপ মস্তিষ্ক-বিভ্রমের নিকটবর্ত্তী অবস্থায় উপনীত হইয়া অধ্যাপকের মনে হইল, যেন ঐ মৃতব্যক্তির মাংসহীন মুণ্ডটি চির-আবৃত মুখশ্রী ধারণ করিয়াছে; তিনি যেন সেই করাল কঙ্কালের মুখে একটি হাসির রেখা অঙ্কিত দেখিলেন; তখন তেরেসিতা ও রাফায়েলের নাম আবার তাঁহার মুখে বারংবার উচ্চারিত হইল।

সহসা কক্ষের দ্বারে একটা শব্দ শুনা গেল;—সে এক অদ্ভুত-রকমের শব্দ। পিয়ানো হইতে, প্রতিধ্বনির ন্যায় যেন একটা গোঁগানি-আর্ত্তনাদ নিঃসৃত হইল।

অধ্যাপক শিহরিয়া উঠিলেন।

ঠিক্ সেই সময়ে, কঙ্কালটিও সহসা ঝাঁকুনি দিয়া পাশ ফিরিল এবং দ্বারনিঃসৃত শব্দের স্বরে যেন স্বর মিলাইয়া এই কথাটি বলিয়া উঠিল:—"ভিতরে এসো।"

দ্বার খুলিয়া গেল। একজন পাদ্রি, দুই হাতে দুই লাঠির উপর ভর দিয়া, দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। মনে হইল, লোকটি জরাগ্রস্ত ও শ্রান্তিভারে ভারাক্রান্ত, কিন্তু এদিকে দেখিতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট। তাহার সাজসজ্জা একটু অদ্ভুত-ধরণের ও নিতান্ত অসঙ্গত। ক্রমে সে অগ্রসর হইল; চলিবার সময়, তাহার শরীর একএকবার দমিয়া নীচু হইয়া যাইতে লাগিল, আবার স্থিতিস্থাপক রবরের ন্যায় উঠিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার চলন এরূপ থপ্‌থপে ও থল্‌থলে যে, সহজেই মনে হয়, তাহার পাদ্রির আলখাল্লার মধ্যে অস্থিহীন মাংসপিণ্ড বই আর কিছুই নাই।

অধ্যাপক বলিয়া উঠিলেন:—"সর্ব্বনাশ! তবে এ কি সেই?"

পাদ্রি অধ্যাপকের নিকট অগ্রসর হইয়া তাঁহার পাশে আসিয়া বসিল এবং ক্ষীণ ঘর্ঘরকণ্ঠে —দন্তহীন বৃদ্ধের অর্দ্ধস্ফুট তরল-স্বরে তাঁহাকে বলিল :—"এখানে এসে যদি আপনার বিজনতার ব্যাঘাত করে' থাকি, তা হ'লে মার্জ্জনা কর্‌বেন ; আর, আপনার যদি অনুমতি হয়, খানিকক্ষণ আপনার সঙ্গে আমি মন খুলে বাক্যালাপ কর্‌তে ইচ্ছা করি।"

অধ্যাপক অতিমাত্র ভীত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমি কি জ্ঞান হারাইয়াছি ?—আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি ?" অবশেষে প্রবল চেষ্টার বলে তিনি উত্তর করিলেন :—"বলুন, আমি শুন্‌চি।"

তখন সেই অদ্ভুত অপরূপ হতভাগ্য পাদ্রি এইরূপ বলিলেন :—"আমি দূরদেশ থেকে আস্‌চি ; আমি সেখানে অনেক বৎসর ধরে' আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ছিলেম। আমি একজন মহাপাপী ; সেই পাপের কথা আপনার নিকটে বল্‌তে আমার সাহস হচ্ছে না। তবু না বল্লেও নয়।

"সে কথা বল্‌তে হ'লে সুদূর অতীতে ফিরে যেতে হয়। তখন আমার যৌবনের আরম্ভ। আমার তখন বয়স ২৫বৎসর। ঐ বয়সে সকল পদার্থের মধ্যেই কেমন-একটা নবীনতা, সরসতা ও দীপ্তির বিকাশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কিন্তু হায় ! দুঃখকষ্টে ও পাপের ফলে সে ভাব শীঘ্রই অন্তর্হিত হয়। কতকগুলি ভীষণ প্রতিজ্ঞাপাশে আপনাকে আপনি বদ্ধ করে' আমি চির-জীবনের জন্য ঈশ্বরের সেবায় ব্রতী হলেম। আমার একটি বন্ধু ছিল, তাকে আমি ভায়ের মত ভালবাস্‌তেম। সে বড় সাদাসিধা ও সচ্চরিত্র ; সে-ও আমাকে খুব ভালবাস্‌তো। সে তার সমস্ত গোপনীয় কথা আমাকে বল্‌ত। বিশুদ্ধ ভালবাসার কল্যাণে, সে অক্ষতশরীরে ও বিনা-অনুতাপে, যৌবনের সমস্ত বিপদ্ বেশ কাটিয়ে উঠেছিল। সে আমাকে তার সমস্ত সুখের অংশভাগী কর্‌ত। তার সমস্ত সঙ্কল্প, তার সমস্ত প্রাণের আশা আমার নিকট জানাতো। আমার কালো পাদ্রি-পোষাকের মধ্যে, প্রবল-আবেগ-পূর্ণ, প্রচণ্ড উদ্দাম বাসনাময় হৃদয় যে প্রচ্ছন্ন থাক্‌তে পারে, সে বিষয়ে সে কিছুমাত্র সন্দেহ করে নি—তাই সে তার বাগ্‌দত্তা প্রণয়িনীর সমস্ত রূপসৌন্দর্য্য অতি উজ্জ্বল বর্ণে আমার কাছে বর্ণনা কর্‌ত। তখন সে জান্‌তে পারে নি, তার সুখের কথা আমাকে বলায় কতটা বিপদ্ আছে।"

অধ্যাপকের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইল। তিনি মনে মনে করিলেন :—"তবে কি যা আমি সন্দেহ করেছিলেম, তাই ঠিক্ ?"

পাদ্রি যেন তাঁর মনের কথা বুঝিতে পারিয়াই বলিলেন :—"আমার কথাটা শেষ কর্‌তে দিন ; কারণ, সে সমস্ত কথা আপনার কাছে আমায় বল্‌তেই হবে !

"বন্ধুর মুখে যার এত রূপবর্ণনা শুনেছিলেম, তাকে যখন সাক্ষাৎ নিকটে দেখ্‌লেম, তখন দেখেই বুঝলেম, তার সেই রূপরাশির মধ্যে কতটা মোহিনী শক্তি, কতটা দাহিকা শক্তি নিহিত রয়েছে ! সাক্ষাৎ প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যেন আমার সম্মুখে উদয় হয়েছেন বলে' মনে হল !

আমি হঠাৎ প্রেমাসক্ত, ঈর্ষান্বিত, দুর্বৃত্ত ও দুঃসাহসী হয়ে পড়্‌লেম ! সেই অবধি বন্ধু আমার চক্ষুশূল হলেন, আর আমি সেই রমণীকে সমস্ত হৃদয়ের সহিত ভালবাস্‌তে লাগ্‌লেম। তার কেমন-একটি শিশুসুলভ সরলতা ছিল, আমার সঙ্গে সে বন্ধুর মত ব্যবহার কর্‌ত। আমি প্রায়ই তার সঙ্গে একলা দেখা-শুনা কর্‌তেম। আমার মনকে জয় কর্‌তে অনেক চেষ্টা কর্‌লেম—কিন্তু সকলই বৃথা হ'ল। শেষে আমিই হার মান্‌লেম।"

—"সেই রমণীও কি তোমাকে ভালবাস্‌ত ?"

—"এখনি সমস্ত জান্‌তে পার্‌বেন, শেষপর্য্যন্ত আমার কথাটা শুনুন।

"একদিন গ্রীষ্মকালের সায়াহ্নে,—যখন আমার শৈশববন্ধু কোন বিষয়কার্য্য উপলক্ষে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন—আমি তাঁর বাগ্‌দত্তা প্রণয়িনীকে বল্লেম—'চল, আমরা দুজনে একটু মাঠে বেড়িয়ে আসি।' কি সুন্দর সন্ধ্যা !—মেঠো পথের দুধারে কেমন সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে ! আহা, চারিদিকে কি আনন্দ !—কি সুগন্ধ ! সেই রমণীর দোদুল্যমান বেশ—আলুলিত কেশ—সাক্ষাৎ রতিদেবী বলে' মনে হতে লাগ্‌ল। আমি তার পিছনে-পিছনে চল্‌তে লাগ্‌লেম—আমার দৃষ্টি বিষণ্ণ। মুহূর্ত্তের জন্য স্বর্গ দেখ্‌তে পেয়ে পাপীর মনে যে ভাব হয়, আমার তাই হয়েছিল !

"আমরা একটা সরোবরের ধারে এসে পড়্‌লেম ; তার চারিদিকে 'উইলো'গাছের রজতরঞ্জিত শাখাপল্লব। রমণী সেইখানে দাঁড়ালেন ; দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ প্রকৃতির সেই সরস-নবীন প্রশান্ত শোভা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন ; সেখানকার বিমল সুগন্ধি বায়ু অনেকবার পূর্ণনিশ্বাসে গ্রহণ করলেন ; আনন্দে তাঁর হৃদয় উল্লসিত হ'য়ে উঠ্‌ল ; আর, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস মৃদুমধুর গুঞ্জনে তাঁর মুখ হতে মধ্যে-মধ্যে নিঃসৃত হতে লাগ্‌ল। আহা ! সেই মুহূর্ত্তে তাঁকে কি সুন্দরই দেখাচ্ছিল !"

—"উঃ ! এ যে অসহ্য যন্ত্রণা !"—অধ্যাপক বলিয়া উঠিলেন !

"একটু ধৈর্য্য ধরে' থাকুন। আমি সমস্তই আনুপূর্ব্বিক বল্‌চি—একটি কথাও বাদ দেব না। তার পর, আমি 'উইলো'-গাছের তলা হতে একটি বনফুল কুড়িয়ে নিয়ে কাঁপ্‌তে-কাঁপ্‌তে তার হাতে দিলেম ; রমণী আমার মনের আবেগ লক্ষ্য করতে পারে নি ; সে ফুলটি সহজ-ভাবে নিয়ে মাথায় পর্‌লে, আর বল্লে—'আপনার বড় অনুগ্রহ !'

"ঐ কথাটি মধুর সঙ্গীতের মত আমার কাণে যেন বাজ্‌তে লাগ্‌লো, নিজের উপর আমার আর কোন কর্ত্তৃত্ব রইল না ! আমি তাকে একদৃষ্টে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। তার পর সহসা উন্মত্তের ন্যায় অধীর হয়ে তার হাত-দুটি ধরে' বল্লেম :—'আমি তোমাকে ভালবাসি।'

"রমণী অবজ্ঞার দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে ভয়ে চীৎকার করে' উঠ্‌ল।

"তখন, আমি উদ্দাম বাসনার বশীভূত হয়ে, উন্মত্তভাবে, হাঁপাতে-হাঁপাতে, তাকে জলের ধারে টেনে-নিয়ে গেলেম ;—ক্রমে

গভীর জলে—আরও গভীর জলে গিয়ে পড়্‌লেম।"

অধ্যাপক যেন প্রহার করিতে উদ্যত, এইরূপ ভাবভঙ্গী সহকারে খাড়া হইয়া উঠিয়া বলিলেন :—"আরে নির্লজ্জ পাষণ্ড!"

—"আপনি আমাকে ঘোর অপরাধী বলে' মনে কর্‌চেন—কিন্তু আরও কতকগুলি কথা আপনাকে শুন্‌তে হবে।

"পরে সেখানকার চাষারা সরোবরের জল থেকে আমাদের টেনে তুল্‌লে। আমি দেশান্তরে চলে গেলেম। সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করে', কঠোর তপশ্চর্য্যা করে' আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব, স্থির কর্‌লেম।

"অনেক—অনেক বৎসর ধরে' কোনো অজ্ঞাত বুনো অসভ্যের দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেম। যন্ত্রণার একশেষ,—যতদূর শাস্তি ভোগ কর্‌বার, তা কর্‌লেম; মানুষের বল—মানুষের সমস্ত উদ্যম হারিয়ে অতি শোচনীয়ভাবে জীবনধারণ কর্‌তে লাগ্‌লেম। অতিজঘন্য এই মাংসপিণ্ডমাত্র আমার অবশিষ্ট রহিল—অস্থিকঙ্কাল হতে আমি একেবারে বঞ্চিত হলেম। তখন মাংসপিণ্ডসুলভ সমস্ত উদ্দাম লালসা আমাকে অবাধে পীড়ন কর্‌তে লাগ্‌ল; অথচ সেই সকল লালসা চরিতার্থ কর্‌বার কিংবা অতিক্রম কর্‌বার শক্তি আর আমাতে রইল না। আমার পাপের শাস্তিস্বরূপ, আমার নিজের কঙ্কাল হতে আমি বঞ্চিত হলেম। আমার সেই কঙ্কালটি সেই 'মোহিনীর সরোবরে' এতদিন ছিল, আজ তাকে আপনিই উদ্ধার করে' এনেচেন।

"ঈশ্বর জানেন, আমার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। এখন আপনার অনুগ্রহ হলেই আমার দেহের কঠিন অংশটি আমি ফিরে পেতে পারি।"

পাদ্রি যেমনি কথা শেষ করিলেন, অমনি সেই কঙ্কালটি শয্যার উপর পাশমোড়া দিয়া অধীরভাবে নড়িতে লাগিল।

অধ্যাপক একটি কথা উচ্চারণ করিবেন, সে শক্তি তাঁর ছিল না। শুধু ভাবভঙ্গী দ্বারা পাদ্রির প্রার্থনায় সায় দিয়া গেলেন।

তখন, যে দৃশ্যটি তাঁহার চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তাহা অশ্রুতপূর্ব্ব। তিনি দেখিলেন, কঙ্কালটি সজীব হইয়া পাদ্রির নিকট যাইবার জন্য উদ্যত হইয়াছে। সে উঠিয়া বসিল, পরে শয্যা হইতে নীচে নামিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইল।

পাদ্রি এবং তাহার কঙ্কাল স্নেহার্দ্র-দৃষ্টিতে—এমন কি, ভালবাসার দৃষ্টিতে ক্ষণেকের জন্য পরস্পরকে চাহিয়া দেখিল। যে অমানুষ কণ্ঠ ইতিপূর্ব্বে "ভিতরে এসো"—এই কথা উচ্চারণ করিয়াছিল, সেই কণ্ঠস্বরই আবার পাদ্রিকে বলিল:—"এসো!"

দুইজনে পরস্পর কাছাকাছি হইল; পরস্পরকে আবেগভরে আপ্‌টিয়া ধরিল; কোন-এক অলৌকিক শক্তির প্রভাবে কঙ্কালটি অদৃশ্য হইয়া পড়িল এবং সেই পাদ্রির নিরস্থীকৃত শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কঙ্কালটি নিজস্থান অধিকার করিল; পাদ্রির শরীর সহসা দৃঢ় ও বর্দ্ধিত হইল। এখন আবার পাদ্রি পূর্ব্ববৎ দৃঢ়পদে চলিতে লাগিলেন; তাঁর কণ্ঠস্বর পরিষ্কার ও পরিপুষ্ট হইল এবং তিনি অতি কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন :—"যে কথা সর্ব্বাপেক্ষা

ভয়ানক, এখন সেই কথা আপনার নিকট প্রকাশ করব। আমাকে মার্জ্জনা কর্‌বেন, যে নির্দ্দোষী রমণী আমাদের এই সব দুর্দ্দশার কারণ,—তিনি তেরেসিতা, আর সেই হতভাগ্য পাদ্রির নাম……"

—"রাফায়েল?"—অধ্যাপক বলিয়া উঠিলেন; এবং সেই একই সময়ে সবেগে পাদ্রিকে আক্রমণ করিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিলেন।

——"হতভাগা! তোকে আমি মার্জ্জনা কর্‌ব, এ কথা মনে কর্‌তেও তোর সাহস হয়? বল্, তুই তেরেসিতার কি কর্‌লি?—এখনও কি সে বেঁচে আছে?"

——"সেই সরোবরের জল থেকে চাষারা যখন আমাদের দুজনকে তোলে, তখন হতভাগ্য আমিই শুধু জীবিত ছিলেম—তেরেসিতা জলমগ্ন হয়ে"……এই কথা বলিতে বলিতে পাদ্রি পিছু হটিয়া ঘরের অপর প্রান্তের দিকে চলিতে লাগিল।

——"তবে তুই তার মৃত্যুর কারণ?"—এই বলিয়া অধ্যাপক সেই পাদ্রিকে জাপ্‌টিয়া-ধরিয়া শয্যার উপর পাড়িয়া ফেলিলেন। "হতভাগা! এই তোর প্রতিশোধ!"—এই বলিয়া একটা ছোরা লইয়া পাদ্রির বুকে বসাইয়া দিলেন।

কিন্তু একি কাণ্ড! সেই ছোরাটা শরীরের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, কি-যেন একটা শক্ত জিনিষে ঠেকিয়া পিছ্‌লাইয়া পার্শ্বের উপর আসিয়া পড়িল। ইতিপূর্ব্বেই পাদ্রি অন্তর্হিত হইয়াছিল। অধ্যাপক দেখিলেন, ছিপে-ধরা সেই কঙ্কালটিই তাঁর সম্মুখে প্রসারিত, তিনি সেই কঙ্কালের বুকেই ছোরা বসাইয়া দিলেন।

এই সব ঘটনার কয়েকমাস পরে, অধ্যাপক সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত ছত্রগুলি পাঠ করিলেন :—

"চীনদেশের উপকূলে লইচেউ-প্রায়দ্বীপে, পাদ্রি-রাফায়েল—যিনি অনেকবৎসর যাবৎ চীনে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, তিনি গত ২৫শে অক্টোবর তারিখে নিজশয্যায় শত্রুর ছুরিকাঘাতে নিহত হইয়াছেন।"

অধ্যাপক সেই অদ্ভুত কঙ্কালের বিবরণ ইতিপূর্ব্বে স্বীয় স্মৃতিলিপিপুস্তকে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে উহার সহিত মিলাইয়া দেখিলেন, ঠিক ঐ তারিখেই সেই কঙ্কালটিও অদৃশ্য হয়। ইহা হইতে তিনি যেন জ্ঞানের একটি নূতন রশ্মি দেখিতে পাইলেন। চৌম্বকাকর্ষণের ফলে দূরবর্ত্তী ঘটনায় ছায়া কিরূপে চিন্তার মধ্যে আসিয়া পড়ে—কিরূপে দুই সদৃশ ঘটনা এক সময়েই সংঘটিত হয়—এককথায়, "বুদ্ধির মরীচিকা" কিরূপে উৎপন্ন হয়, এক্ষণে তাহারই অনুসন্ধানে তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। পরে ঐ নামে তিনি এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করিলেন। সে প্রদেশের লোকেরা লক্ষ্য করিল, অধ্যাপক আর-যাহাই করুন না কেন, সেই অবধি ছিপ্ দিয়া আর মাছ ধরেন না।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অতৃপ্তি।

ঘেরিয়া রয়েছে প্রেম আমারে নিয়ত
পরিব্যাপ্ত অন্তহীন আকাশের মত।
বিরহ-তাপিত তবু এ শূন্য অন্তরে
কোনো পরিতৃপ্তি নাই নিমেষের তরে!

সার্থকতা।

সেই মোর প্রিয়জনে কত ভালবাসা
বেসেছিনু, এ মনের কত শত আশা
স্নেহকোমলতা, সঁপেছিনু তারি পরে,—
আজ সে একটু যেই দূরে গেছে সরে
আর তার পাই না সন্ধান,—হ'ত যদি
আকাশ-বাতাস-সম নিত্য নিরবধি
পরিপূর্ণ কাছে দূরে, তবে হে দেবতা,
অনন্ত প্রেমের মোর হ'ত সার্থকতা!

অশ্রান্ত।

দিন আসে দিন যায় চঞ্চল চরণ,
শুধু মোর গতিহীন অবসন্ন মন
তবুও বিরাম নাই, চলেছে সমান
প্রতি দিবসের কাজ আদান প্রদান!

কৃতজ্ঞতা।

ভাল বেসেছিলে যারে সেজন তোমার
হারায়ে গিয়েছে তাই এত হাহাকার!
পেয়েছিলে ক্ষণকাল তাই তুষ্ট মনে
আনন্দে অঞ্জলি দাও দেবতা চরণে!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বঙ্গদর্শন।

পনেরো-আনা।

যে লোক ধনী, ঘরের চেয়ে তাহার বাগান বড় হইয়া থাকে। ঘর অত্যাবশ্যক; বাগান অতিরিক্ত—না হইলেও চলে। সম্পদের উদারতা অনাবশ্যকেই আপনাকে সপ্রমাণ করে। ছাগলের যতটুকু শিং আছে, তাহাতে তাহার কাজ চলিয়া যায়, কিন্তু হরিণের শিঙের পনেরো-আনা অনাবশ্যকতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া থাকি। ময়ূরের লেজ যে কেবল রংচঙে জিতিয়াছে, তাহা নহে—তাহার বাহুল্যগৌরবে শালিক-খঞ্জন-ফিঙার পুচ্ছলজ্জায় অহরহ অস্থির।

যে মানুষ আপনার জীবনকে নিঃশেষে অত্যাবশ্যক করিয়া তুলিয়াছে, সে ব্যক্তি আদর্শপুরুষ সন্দেহ নাই, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহার আদর্শ অধিক লোকে অনুসরণ করে না;—যদি করিত, তবে মনুষ্যসমাজ এমন একটি ফলের মত হইয়া উঠিত, যাহার বীচিই সমস্তটা, শাঁস একেবারেই নাই। কেবলই যে লোক উপকার করে, তাহাকে ভাল না বলিয়া থাকিবার জো নাই, কিন্তু যে লোকটা বাহুল্য, মানুষ তাহাকে ভালবাসে।

কারণ, বাহুল্যমানুষটি সর্ব্বতোভাবেই আপনাকে দিতে পারে। পৃথিবীর উপকারী মানুষ কেবল উপকারের সঙ্কীর্ণ দিক্ দিয়াই আমাদের একটা অংশকে স্পর্শ করে;—সে আপনার উপকারিতার মহৎ প্রাচীরের দ্বারা আর-সকল দিকেই ঘেরা; কেবল একটি দরজা খোলা, সেখানে আমরা হাত পাতি, সে দান করে। আর, আমাদের বাহুল্যলোকটি কোন কাজের নহে, তাই তাহার কোন প্রাচীর নাই। সে আমাদের সহায় নহে, সে আমাদের সঙ্গিমাত্র। উপকারী লোকটির কাছ হইতে আমরা অর্জ্জন করিয়া আনি, এবং বাহুল্যলোকটির সঙ্গে মিলিয়া আমরা খরচ করিয়া থাকি। যে আমাদের খরচ করিবার সঙ্গী, সেই আমাদের বন্ধু।

বিধাতার প্রসাদে হরিণের শিং ও ময়ূরের পুচ্ছের মত সংসারে আমরা অধিকাংশ লোকই বাহুল্য, আমাদের অধিকাংশেরই জীবন জীবনচরিত লিখিবার যোগ্য নহে, এবং সৌভাগ্যক্রমে আমাদের অধিকাংশেরই মৃত্যুর পরে পাথরের মূর্ত্তি গড়িবার নিষ্ফল

চেষ্টায় চাঁদার খাতা দ্বারে-দ্বারে কাঁদিয়া ফিরিবে না।

মরার পরে অন্ন লোকেই অমর হইয়া থাকেন, সেইজন্যই পৃথিবীটা বাসযোগ্য হইয়াছে। ট্রেনের সব গাড়িই যদি রিজার্ভ গাড়ি হইত, তাহা হইলে সাধারণ প্যাসেঞ্জারদের গতি কি হইত? একে ত বড় লোকেরা একাই একশো—অর্থাৎ যতদিন বাঁচিয়া থাকেন, ততদিন অন্তত তাঁহাদের ভক্ত ও নিন্দুকের হৃদয়ক্ষেত্রে শতাধিক লোকের জায়গা জুড়িয়া থাকেন—তাহার পরে, আবার, মরিয়াও তাঁহারা স্থান ছাড়েন না। ছাড়া দূরে যাক্, অনেকে মরার সুযোগ লইয়া অধিকার বিস্তার করিয়াই থাকেন। আমাদের একমাত্র রক্ষা এই যে, ইহাদের সংখ্যা অল্প। নহিলে কেবল সমাধিস্তম্ভে সামান্য ব্যক্তিদের কুটীরের স্থান থাকিত না। পৃথিবী এত সঙ্কীর্ণ যে, জীবিতের সঙ্গে জীবিতকে জায়গার জন্যে লড়িতে হয়। জমির মধ্যেই হউক্ বা হৃদয়ের মধ্যেই হউক্, অন্য পাঁচজনের চেয়ে একটুখানি ফলাও অধিকার পাইবার জন্য কত লোকে জাল-জালিয়াতি করিয়া ইহকাল-পরকাল খোয়াইতে উদ্যত। এই যে জীবিতে-জীবিতে লড়াই, ইহা সমকক্ষের লড়াই, কিন্তু মৃতের সঙ্গে জীবিতের লড়াই বড় কঠিন। তাহারা এখন সমস্ত দুর্ব্বলতা, সমস্ত খণ্ডতার অতীত, তাহারা কল্পলোকবিহারী—আমরা মাধ্যাকর্ষণ, কৈশিকাকর্ষণ, এবং বহুবিধ আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বারা পীড়িত মর্ত্ত্যমানুষ, আমরা পারিয়া উঠিব কেন? এইজন্যই বিধাতা অধিকাংশ মৃতকেই বিস্মৃতিলোকে নির্ব্বাসন দিয়া থাকেন,—সেখানে কাহারো স্থানাভাব নাই। বিধাতা যদি বড়-বড় মৃতের আওতায় আমাদের মত ছোট-ছোট জীবিতকে নিতান্ত বিমর্ষ-মলিন, নিতান্তই কোণঘেঁষা করিয়া রাখিবেন, তবে পৃথিবীকে এমন উজ্জ্বল সুন্দর করিলেন কেন, মানুষের হৃদয়টুকু মানুষের কাছে এমন একান্ত-লোভনীয় হইল কি কারণে?

নীতিজ্ঞেরা আমাদিগকে নিন্দা করেন। বলেন, আমাদের জীবন বৃথা গেল। তাঁহারা আমাদিগকে তাড়না করিয়া বলিতেছেন—উঠ, জাগ, কাজ কর, সময় নষ্ট করিয়ো না!

কাজ না করিয়া অনেকে সময় নষ্ট করে সন্দেহ নাই—কিন্তু কাজ করিয়া যাহারা সময় নষ্ট করে, তাহারা কাজও নষ্ট করে, সময়ও নষ্ট করে। তাহাদেরই পদভারে পৃথিবী কম্পান্বিত এবং তাহাদেরই সচেষ্টতার হাত হইতে অসহায় সংসারকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন—"সম্ভবামি যুগে যুগে।"

জীবন বৃথা গেল! বৃথা যাইতে দাও! অধিকাংশ জীবনই বৃথা যাইবার জন্য হইয়াছে! এই পনেরো-আনা অনাবশ্যক জীবনই বিধাতার ঐশ্বর্য্য সপ্রমাণ করিতেছে। তাঁহার জীবনভাণ্ডারে যে দৈন্য নাই, ব্যর্থপ্রাণ আমরাই তাহার অগণ্য সাক্ষী। আমাদের অফুরান অজস্রতা, আমাদের অহেতুক বাহুল্য দেখিয়া বিধাতার মহিমা স্মরণ কর। বাঁশী যেমন আপন শূন্যতার ভিতর দিয়া সঙ্গীত প্রচার করে, আমরা সংসারের পনেরো-আনা আমাদের ব্যর্থতার দ্বারা বিধাতার গৌরব ঘোষণা করিতেছি। বুদ্ধ আমাদের

জন্যই সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, খৃষ্ট আমাদের জন্য প্রাণ দিয়াছেন, ঋষিরা আমাদের জন্য তপস্যা করিয়াছেন এবং সাধুরা আমাদের জন্য জাগ্রত রহিয়াছেন।

জীবন বৃথা গেল! যাইতে দাও! কারণ, যাওয়া চাই। যাওয়াটাই একটা সার্থকতা। নদী চলিতেছে—তাহার সকল জলই আমাদের স্নানে এবং পানে এবং আমনধানের ক্ষেতে ব্যবহার হইয়া যায় না। তাহার অধিকাংশ জলই কেবল প্রবাহ রাখিতেছে। আর-কোন কাজ না করিয়া কেবল প্রবাহ-রক্ষা করিবার একটা বৃহৎ সার্থকতা আছে। তাহার যে জল আমরা খাল কাটিয়া পুকুরে আনি, তাহাতে স্নান করা চলে, কিন্তু তাহা গান করে না; তাহার যে জল ঘটে করিয়া আনিয়া আমরা জালায় ভরিয়া রাখি, তাহা পান করা চলে, কিন্তু তাহার উপরে আলো-ছায়ার উৎসব হয় না। উপকারকেই একমাত্র সাফল্য বলিয়া জ্ঞান করা কৃপণতার কথা, উদ্দেশ্যকেই একমাত্র পরিণাম বলিয়া গণ্য করা দীনতার পরিচয়।

আমরা সাধারণ পনেরো-আনা, আমরা নিজেদের যেন হেয় বলিয়া না জ্ঞান করি। আমরাই সংসারের গতি। পৃথিবীতে, মানুষের হৃদয়ে আমাদের জীবনস্বত্ব। আমরা কিছুতেই দখল রাখি না, আঁকড়িয়া থাকি না, আমরা চলিয়া যাই। সংসারের সমস্ত কলগান আমাদের দ্বারা ধ্বনিত, সমস্ত ছায়ালোক আমাদের উপরেই স্পন্দমান। আমরা যে হাসি, কাঁদি, ভালবাসি; বন্ধুর সঙ্গে অকারণ খেলা করি; স্বজনদের সঙ্গে অনাবশ্যক আলাপ করি; দিনের অধিকাংশ সময়ই চারিপাশের লোকের সহিত উদ্দেশ্য-হীনভাবে যাপন করি, তার পরে ধুম করিয়া ছেলের বিবাহ দিয়া তাহাকে আপিসে প্রবেশ করাইয়া পৃথিবীতে কোন খ্যাতি না রাখিয়া মরিয়া-পুড়িয়া ছাই হইয়া যাই—আমরা বিপুল সংসারের বিচিত্র তরঙ্গলীলার অঙ্গ; আমাদের ছোটখাট হাসিকৌতুকেই সমস্ত জনপ্রবাহ ঝলমল্ করিতেছে, আমাদের ছোটখাট আলাপে-বিলাপে সমস্ত সমাজ মুখরিত হইয়া আছে।

আমরা যাহাকে ব্যর্থ বলি, প্রকৃতির অধিকাংশই তাই। সূর্য্যকিরণের বেশির ভাগ শূন্যে বিকীর্ণ হয়, গাছের মুকুল অতি অল্পই ফল পর্য্যন্ত টিঁকে। কিন্তু সে যাঁহার ধন, তিনিই বুঝিবেন। সে ব্যয় অপব্যয় কি না, বিশ্বকর্ম্মার খাতা না দেখিলে তাহার বিচার করিতে পারি না। আমরাও তেমনি অধিকাংশই পরস্পরকে সঙ্গদান ও গতিদান ছাড়া আর-কোন কাজে লাগি না; সেজন্য নিজেকে ও অন্যকে কোন দোষ না দিয়া, ছট্‌ফট্ না করিয়া, প্রফুল্ল হাস্যে ও প্রসন্ন গানে সহজেই অখ্যাত অবসানের মধ্যে যদি শান্তিলাভ করি, তাহা হইলেই সেই উদ্দেশ্য-হীনতার মধ্যেই যথার্থভাবে জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারি।

বিধাতা যদি আমাকে ব্যর্থ করিয়াই সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে আমি ধন্য; কিন্তু যদি উপদেষ্টার তাড়নায় আমি মনে করি আমাকে উপকার করিতেই হইবে, কাজে লাগিতেই হইবে, তবে যে উৎকট ব্যর্থতার সৃষ্টি করি, তাহা আমার স্বকৃত। তাহার জবাবদিহী আমাকে করিতে হইবে। পরের

উপকার করিতে সকলেই জন্মাই নাই—অতএব উপকার না করিলে লজ্জা নাই। মিশনারী হইয়া চীন উদ্ধার করিতে না-ই গেলাম ;—দেশে থাকিয়া শেয়াল শিকার করিয়া ও ঘোড়দৌড়ে জুয়া খেলিয়া দিন-কাটানকে যদি ব্যর্থতা বল, তবে তাহা চীন-উদ্ধারচেষ্টার মত এমন লোমহর্ষক নিদারুণ ব্যর্থতা নহে।

সকল ঘাস ধান হয় না। পৃথিবীতে ঘাসই প্রায় সমস্ত, ধান অল্পই। কিন্তু ঘাস যেন আপনার স্বাভাবিক নিষ্ফলতা লইয়া বিলাপ না করে—সে যেন স্মরণ করে যে, পৃথিবীর শুষ্কধূলিকে সে শ্যামলতার দ্বারা আচ্ছন্ন করিতেছে, রৌদ্রতাপকে সে চির-প্রসন্ন স্নিগ্ধতার দ্বারা কোমল করিয়া লইতেছে। বোধ করি, ঘাসজাতির মধ্যে কুশতৃণ গায়ের জোরে ধান্য হইবার চেষ্টা করিয়াছিল—বোধ করি, সামান্য ঘাস হইয়া না থাকিবার জন্য, পরের প্রতি একান্ত মনোনিবেশ করিয়া জীবনকে সার্থক করিবার জন্য তাহার মধ্যে অনেক উত্তেজনা জন্মিয়াছিল—তবু সে ধান্য হইল না। কিন্তু সর্ব্বদা পরের প্রতি তাহার তীক্ষ্ণলক্ষ্য নিবিষ্ট করিবার একাগ্র চেষ্টা কিরূপ, তাহা পরই বুঝিতেছে। মোটের উপর এ কথা বলা যাইতে পারে যে, এরূপ উগ্র পর-পরায়ণতা বিধাতার অভিপ্রেত নহে। ইহা অপেক্ষা সাধারণ তৃণের খ্যাতিহীন, স্নিগ্ধ-সুন্দর, বিনম্র-কোমল নিষ্ফলতা ভাল।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে মানুষ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—পনেরো-আনা এবং বাকি এক-আনা। পনেরো-আনা শান্ত এবং এক-আনা অশান্ত। পনেরো-আনা অনাবশ্যক এবং এক-আনা আবশ্যক। বাতাসে চলনশীল জলনধর্ম্মী অক্সিজেনের পরিমাণ অল্প, স্থির-শান্ত নাইট্রোজেন্‌ই অনেক। যদি তাহার উল্টা হয়, তবে পৃথিবী জ্বলিয়া ছাই হয়। তেমনি সংসারে যখন কোন-একদল পনেরো-আনা, এক-আনার মতই অশান্ত ও আবশ্যক হইয়া উঠিবার উপক্রম করে, তখন জগতে আর কল্যাণ নাই, তখন, যাহাদের অদৃষ্টে মরণ আছে, তাহা-দিগকে মরিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

হিন্দুরসায়নের ইতিহাস।

অধ্যাপক ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় কৃত হিন্দু-রসায়নের ইতিহাস * নামক অভিনব গ্রন্থ পাঠ করিয়া যে দুই-একটি কথা মনে হইয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, পুস্তকের সমালোচনা নহে, দোষ-গুণকীর্ত্তনও নহে। না পড়িয়া পণ্ডিত হইতে পারিলে সমালোচনা করিতে বসিতাম ; কিন্তু হিন্দুরসায়নের ইতিহাস যাহার অজ্ঞাত, তাহার পক্ষে সমালোচকপদগ্রহণ আদৌ সাজে না।

* A History of Hindu Chemistry. By P. C. Ray, D. Sc. Vol. I.

বোধ করি, এদেশে এরূপ গ্রন্থের সমালোচনা করিবার সময়ও আসে নাই। গ্রন্থ এখনও অসম্পূর্ণ বলিয়া নহে, গ্রন্থের অভিধেয় বিষয়ও প্রায় অজ্ঞাত। হিন্দুরসায়ন বলিলে কতখানি কি বুঝিব, তাহাই জানা নাই। এই গ্রন্থই এ বিষয়ের একমাত্র পুস্তক, বলিতে গেলে প্রথম পুস্তক।

তথাপি গ্রন্থকারকে ধন্য না বলিয়া থাকা যায় না। তিনি স্বদেশীয় বলিয়া নহে, প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলিয়া নহে ; গ্রন্থকার বিদেশীয় হইলেও, বিষয় অন্যদেশসংক্রান্ত হইলেও তাঁহাকে ধন্য বলিতাম। বাস্তবিক বিজ্ঞান-অভ্যাস তাঁহারই সার্থক হইয়াছে,—যাঁহার জীবনে ও প্রত্যেক কার্য্যে বিজ্ঞানের প্রভাব আধিপত্য করে। এই গ্রন্থের প্রতি-পৃষ্ঠায় বিজ্ঞানশিক্ষার ফলস্বরূপ সংযতভাব দেখিতে পাই। প্রত্যেক পৃষ্ঠাতেই রাসায়নিকের চিরপ্রসিদ্ধ ধৈর্য্যের নিদর্শন পাই। রাসায়নিক যখন কোন অজ্ঞাত জড়ের বিশ্লেষণে নিযুক্ত হন, যখন পুনঃপুন সূক্ষ্মতুলাতে প্রত্যেক দ্রব্য সাবধানে উন্মান করিয়া, প্রত্যেক যোজ্য পদার্থের যাথার্থ্য সাবধানে নিরূপণ করিয়া ধীরে ধীরে একের পর অন্যটি অনুসন্ধান করেন, তখন কোন অদীক্ষিত আগন্তুকের মনে হইতে পারে, রাসায়নিকের পক্ষপাত নাই, তাঁহাতে ব্যক্তি-সংস্পর্শ নাই, অজ্ঞাত জড়ে কি পাইয়াছেন, কি পান নাই, অবিচলিতচিত্তে তাহা লিপিবদ্ধ করাই তাঁহার কার্য্য। বস্তুত তুলাদণ্ড ব্যবহার করিতে করিতে তিনি নিজেও তুলাদণ্ডস্বরূপ হইয়া যান। ঐতিহাসিকের কাজও তুলাধারণ। ঐতিহাসিকের রাসায়নিক হওয়া আবশ্যক। যিনি ঐতিহাসিক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি জন-সমাজের সাধারণ ইতিহাস রচনা করুন, সম্প্রদায়ের মতামত বিশ্লেষণ করুন, রাজা-প্রজার সম্বন্ধ আলোচনা করুন, তাঁহার রাসায়নিকের ধীরতা ও তুলাদণ্ডব্যবহারে অভ্যাস থাকা আবশ্যক। যদি বিজ্ঞান ও অ-বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যের কারণ বলিতে হয়, তাহা হইলে দেখা যায়, বিজ্ঞানের মার্গই বিজ্ঞানকে অন্য শাস্ত্র হইতে ভিন্ন করিয়া তুলিয়াছে। যে ইতিহাসে বিজ্ঞানের এই মার্গ দেখিতে না পাওয়া যায়, তাহাকে ইতিহাস না বলিয়া, প্রাচীনদিগের ভাষায় ময়ূরচিত্রক বলা যায়।

উপস্থিত গ্রন্থে রাসায়নিকের ধীরতা, তুলাব্যবহারে অভ্যাস এবং বিজ্ঞানের মার্গ, সকলেরই পরিচয় পাওয়া যায়। সেদিন এই 'বঙ্গদর্শনে'ই 'অত্যুক্তি'নামক এক প্রবন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অত্যুক্তির সংবাদ পাঠ করিতেছিলাম। দক্ষ লেখক স্পষ্ট প্রদর্শন করিয়াছেন যে, প্রাচ্য বাস্তবের বাহিরে যায় বটে, কিন্তু বাহিরে গেলে, 'যাইতেছে' জানাইতে ভুলে না। বাস্তবিক, যাঁহারা সত্যের জয়কীর্ত্তন করিতে কখন বিরত হন নাই, সেই প্রাচীন আর্য্যগণ যখন অত্যুক্তি করিতেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশও করিতেন যে, তাহা অত্যুক্তি। এ কথা স্বীকার না করিলে তাঁহাদিগকে প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, ভণ্ড প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিতে হয়। এই সামান্য কথাটা বিস্মৃত হইয়া প্রতীচ্যেরা প্রাচ্যদিগকে সময়ে-অস-

ময়ে উপহাস করিতে থাকেন। অন্য পক্ষে, প্রতীচ্যের গর্ব্ব যে, তাঁহারাই যা সত্যের উপাসনা করেন, জগতের আর কেহ করে না। বোধ করি, এই গর্ব্বেই তাঁহাদিগের অত্যুক্তি প্রকাশ পাইতেছে। নতুবা তাঁহাদিগের নিকট প্রাচীন আর্য্যজাতি একবার পুরাতন একবার নূতন হইতেন না, সে জাতির কৃতি একবার প্রাচীন একবার অর্বাচীন বলিয়া গণ্য হইত না।

দেখিতেছি, আর্য্যজাতির আয়ুর্ব্বেদেও পাশ্চাত্য নব নব মততরঙ্গের আঘাত লাগিয়াছে। জ্যোতিষের বেলায় বেণ্ট্‌লী-প্রমুখ পাশ্চাত্য সমালোচক যেমন বলিয়াছিলেন, এবং অনেকে এখনও যেমন বলিতেছেন, আয়ুর্ব্বেদের বেলাতেও জর্ম্মাণ সমালোচক হাআস তেমনই অম্লানবদনে বলিয়াছেন যে, হিন্দুদের আয়ুর্ব্বেদের যাহা কিছু উন্নতি, তাহা খ্রীঃ ১০ম ও ১৬শ শতাব্দীর মধ্যেই হইয়াছে! ইহা অপেক্ষা অত্যুক্তি অধিকদূর যাইতে পারে না। ঠিক এই ভাবেই বেণ্ট্‌লী স্বীয় প্রগল্‌ভতার নিমিত্ত স্মরণীয় হইয়াছেন।

চরকই যখন হিন্দুদিগের প্রাচীনতম আয়ুর্ব্বেদ, তখন সেই গ্রন্থকে আধুনিক বলিয়া প্রতিপাদন করিতে পারিলে দূরপ্রান্তবাসী হিন্দুদিগের প্রাচীনত্বের অভিমান মিথ্যা মনে করিতে পারা যায়। বোধ করি, এই দুর্লভ শান্তির আশায় লিভি-নামক ফরাসী পণ্ডিত চরককে খ্রীঃ ২য় শতাব্দীতে টানিয়া আনিয়াছেন! কারণ তৎপূর্ব্বেই গ্রীকেরা এদেশে অধিকার স্থাপন করিয়াছিল। প্রায় এইপ্রকার যুক্তিবলে প্রতিপন্ন করা হইয়া থাকে যে, ভারতীয় জ্যোতির্গণিতও গ্রীক্‌দিগের নিকট চুরী বা ধার করা জিনিস। চরকের বেলা তবু ত ২য় শতাব্দী, গণিতের বেলা একদৌড়ে ৫ম শতাব্দী! উভয় স্থলেই তর্ক একইরূপ। গ্রীকেরা এ দেশে আসিয়াছিল, হিন্দুরা গ্রীসে যায় নাই। সুতরাং হিন্দুরা যাহা কিছু জানিত, সে সব জেতাদিগের নিকট পাইয়াছিল। যদি প্রমাণের নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করা যায়, তাহা হইলে শুনিতে পাই যে, হিন্দুদের পর্য্যবেক্ষণক্ষমতা, গবেষণাশক্তি ছিল না!

এই অদ্ভুত তর্ক শুনিয়া ডাঃ রায় সবিস্ময়ে লিখিয়াছেন, "যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত এ দেশে গ্রীক্‌বিদ্যার প্রভাব দেখিতে পান, তাঁহারা, জ্ঞানত না করিলেও, বাস্তবকে দলিত করিয়া নিজেদের মতের পোষক প্রমাণ অনুসন্ধান করেন এবং নিজেরা কালসম্বন্ধে সন্দেহের ফলভোগ করিতে প্রয়াসী হন। যখন কোন বিষয়ে হিন্দুদের প্রাচীনতার স্পষ্ট প্রমাণ থাকে, তখন বলা হয় যে, হাঁ, অমুক জাতি ও হিন্দুরা একত্র এই বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছিল এবং পরে উভয়ে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছিল। বিদ্যা-বিষয়ে য়ুরোপ ভারতের নিকট ঋণী,—এ কথা স্বীকার করিতে, ভাবে বোধ হয় যেন, তাঁহাদের গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। এই নিমিত্ত তাঁহারা ঐতিহাসিক সত্যকে মিথ্যাতর্কজালে বিলোপ করিতে সচেষ্ট হন।" *

ঠিক এই কথাই আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষের ইতিহাস আলোচনা করিবার

* Introduction, P. XXV.

সময় মনে হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যতদূর পারেন, প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তি আধুনিক কালের দিকে ততদূর আনিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। এ পর্য্যন্ত এই নিয়মের একটিও ব্যতিক্রম দেখিতে পাই নাই। পাশ্চাত্যদিগের এইপ্রকার অত্যুক্তির কারণও কতকটা বুঝিতে পারা যায়। শৈশবের শিক্ষা, হাজার মন্দ হউক, বৃদ্ধবয়সেও তাহার প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ ঘটে না। ইহাকে শিক্ষার স্পৃহা বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্যেরা যখনই কোন বিদ্যার আদি খুঁজিতে বসেন, তখনই তাঁহাদিগের চোখের সম্মুখে প্রাচীন গ্রীক্‌জাতি আসিয়া পড়ে। বাস্তবিকও প্রাচীন গ্রীক্‌সাহিত্যই বর্ত্তমান য়ুরোপের জ্ঞানের প্রত্যক্ষ খনি ছিল। *

আর-একটা কারণ পাশ্চাত্যদিগের মনে প্রচ্ছন্নভাবে কার্য্য করে। যতদিন প্রাচীন মিশর ও বেবিলন বর্ত্তমান মানবচক্ষুর অতীত ছিল, ততদিন ভূমণ্ডলে চীন ও ভারতের প্রাচীনত্বে সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। ভূমণ্ডলের মধ্যে প্রাচীন জাতি, যে জাতির প্রাচীনত্বের দলীল পর্য্যন্ত 'লেখা-পড়া' হইয়া আছে, সে জাতির প্রতি সহজেই ভক্তি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু যেমনই অন্য জাতির অনুসন্ধান পাওয়া গেল,—এমন জাতি যাহাদের জ্ঞানের পরিধি এখনও পরিমাণ করিতে পারা যায় নাই,—সে জাতি খুব জ্ঞানী, খুব পণ্ডিত ছিল! বিশেষত, যাহাদের ভাষা অনুমান করিতেই প্রাণান্ত পরিশ্রম, সে জাতি খুব প্রাচীন না হইয়াই যায় না। কারণ, এতখানি পরিশ্রম-অধ্যবসায় যে জাতি অকাতরে আকর্ষণ করিয়াছে, সে জাতির মধ্যে বেশী জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল না, বিশ্বাস করিতে কষ্টবোধ হয়। তার উপরে, সে জাতির নিবাস বেশী দূরে ছিল না, ঘরের পাশেই! যে জাতির পৌরাণিক কাহিনী ধর্ম্মগ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে, সে জাতির প্রতি ভক্তির উদয় হওয়া স্বাভাবিক মনে করি। ফলে, অন্ধকারে কিছু দেখা যাক্ না যাক্, সে একরকম ভাল। কিন্তু যেখানে চোখে আলো-আঁধার লাগে, সেখানে এক দেখিতে অন্য মনে হয়, ছোট ছোট জিনিস প্রকাণ্ড বোধ হয়, আবার প্রকাণ্ড জিনিসের অস্তিত্বই লোপ পায়। যখন উজ্জ্বল আলোকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পাঠ করা সম্ভাব্য হইবে, তখনই চোখের আলো-আঁধার ঘুচিবে, নতুবা নহে। ডাঃ রায় এ বিষয়ের একটা দীপ জ্বালাইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আশা হইতেছে, বার্টলের ন্যায় রাসায়নিক-পণ্ডিত হাআস ও লিভির তুলাদণ্ড কূট বলিয়া বুঝিতে পারিবেন।

এই দুর্দ্দিনে, যে দিনে হিন্দুজাতিকে রবাহূত ভিক্ষুকের ন্যায় পৃথিবীর দ্বারস্থ বোধ হইতেছে, যে দিনে তাহার নিজস্ব বলিবার ছিন্নকন্থাটুকুও নাই, যে দিনে হিন্দুর আত্মসম্মানটুকুও লোপ পাইতেছে, সে দিনে এরূপ গ্রন্থ লিখিবার প্রয়োজন ছিল। জগতের

* পাশ্চাত্যদিগের এই bias of education চারি পাঁচ-বৎসর পূর্ব্বে প্রবন্ধলেখকের মনে প্রথম উদিত হইয়াছিল। ডাঃ রায়ের গ্রন্থে দেখিতেছি, মোক্ষমূলর-সাহেব ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার Auld Lang Syne এপর্য্যন্ত প্রবন্ধলেখকের অপঠিত আছে।

কাছে অন্তত বলিতে পারিবে, সে এখন হীন বটে, কিন্তু চিরকাল এরূপ ছিল না; কিছু করিতে না পারে, বনিয়াদীবংশগুণে মন্দ কাজটা করিতে পারিবে না। স্মরণযোগ্য যাহার কিছুই নাই, সে-ই অতীতকালের চর্চ্চা করিতে চায় না। অতীত-কীর্ত্তিস্মরণের সহিত ভগ্নহৃদয়ে আশাও আসে; মনে হয়,কে জানে কবে কোন্ সূত্রে অতীত অপেক্ষাও যশস্করী কীর্ত্তির সূচনা হইতে পারিবে। ডাঃ রায়ের পিতামহগরিমা ছিল বলিয়াই তিনি এই গ্রন্থ লিখিতে পারিয়াছেন। বোধ করি, এই গরিমাতেই শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ভারতের প্রাচীন সভ্যতা বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন।

আমাদের আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে ডাঃ রায় বেদ উদ্ঘাটন করিয়াছেন। বোধ করি, এদেশীয়ের নিকট বেদের প্রমাণ আবশ্যক ছিল না। কারণ, যাবতীয় বন্য ও অসভ্য জাতির মধ্যে রোগ আছে এবং রোগের চিকিৎসাও আছে। বেদের ঋষিগণ একেবারে বন্য বা অসভ্য ছিলেন, এ কথা কেহই বলিতে পারেন না। তাঁহাদেরও রোগ হইত, এবং রোগ হইলেই, তাঁহারা কালকবলে পড়িতেন না। তাঁহারাও যুদ্ধে শরবিদ্ধ হইতেন, এবং শল্য উদ্ধার করিতে না পারিয়া যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করিতেন না। মহাভারতের যুদ্ধের সময় বিজ্ঞ চিকিৎসক শস্ত্র ও বিশল্যকরণী ঔষধ লইয়া শিবিরে উপস্থিত থাকিতেন। অশ্ব এবং গো চিকিৎসায় নকুল এবং সহদেবের ন্যায় রাজপুত্রেরাও পারদর্শী ছিলেন। অতএব প্রাচীন পুঁথি বাহির না করিয়াও বলিতে পারা যায় যে, প্রাচীনকালের ঋষিগণ রোগচিকিৎসা জানিতেন। তথাপি বিদেশীয়কে এ কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

বস্তুত সুশ্রুত লিখিয়াছেন, ব্রহ্মা স্বয়ং আয়ুর্ব্বেদ করিয়াছিলেন। বাগ্‌ভটও লিখিয়াছেন, প্রথমে ব্রহ্মা আয়ুর্ব্বেদ স্মরণ করিয়া প্রজাপতিকে দিয়াছিলেন। প্রজাপতি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে, অশ্বিনীকুমারযুগল ইন্দ্রকে, ইন্দ্র আত্রেয়াদি মুনিগণকে এবং আত্রেয়াদি মুনিগণ অগ্নিবেশাদিকে দিয়াছিলেন। ব্রহ্মা আয়ুর্ব্বেদ করিয়াছিলেন—ইহার আধুনিক অর্থ এই যে, আয়ুর্ব্বেদ এত পুরাতন যে, তাহার আদি কেহ জানে না। যদি কোন শাস্ত্রের কর্ত্তা ব্রহ্মা বলিয়া লিখিত থাকে, সেইখানেই এই আধুনিক অর্থ স্মরণ করিলে প্রাচ্যের অত্যুক্তি বাস্তবে পরিণত হয়। জ্যোতিষে এই উক্তির ভূরি-ভূরি প্রমাণ আছে। তদ্ভিন্ন, আমাদের কোন্ শাস্ত্র সেই-প্রথমমুনি-কথিত নহে?

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের, বিশেষত জ্যোতিষের ইতিহাস, আলোচনা করিলে মনে হয়, যেন বেদসংহিতার পর প্রায় সহস্র-বৎসর, কি আরও অধিককাল, এ দেশে একটা বিপ্লব চলিয়াছিল। সেই বিপ্লবের অবসানে ঋষিগণ ব্রাহ্মণে পুরাতন সংহিতা নূতন করিয়া যেন পাঠ করিতে লাগিলেন। কত প্রাচীন কীর্ত্তি, কত প্রাচীন কাহিনী বিপ্লবের সময় তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, শান্তির শীতল ছায়ায় তাঁহারা সেই সকল কথা লইয়া তর্কবিতর্ক করিতে বসিলেন। ব্রাহ্মণের পর সূত্র,—

সেখানেও প্রায় সহস্রবৎসর অন্তর। সূত্রের ঋষিগণ ব্রাহ্মণের ঋষিগণ হইতে ভিন্ন। সূত্র বা বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইতে খ্রীঃ ৫ম শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রায় সহস্রবৎসর আবার এক বিপ্লবের ঝটিকা এ দেশে বহিয়া গিয়াছে। ৪র্থ কি ৫ম শতাব্দী হইতে ১২শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সে ঝটিকা ক্রমশ শান্তভাব ধারণ করিলে আর্য্যগণ কর্ম্মশীলতা প্রকাশ করেন। ১২শ শতাব্দী হইতে অদ্যাবধি আর-এক অবস্থা চলিতেছে। মনে হয়, যেন ভারতের ভাগ্যচক্র এক-এক সহস্রবৎসরে পরিবর্ত্তিত হইত। প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারত নিদ্রিত হয়, প্রায় তত বৎসর জাগ্রত থাকে, তার পর আবার নিদ্রামগ্ন হয়। বর্ত্তমান নিদ্রার আরম্ভ ১২শ শতাব্দীতে। আশ্চর্য্যের বিষয়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই কুম্ভকর্ণের নিদ্রার সময়ই বাছিয়া বাছিয়া এদেশের জাগ্রত অবস্থা মনে করেন। নিদ্রার সময় কচিৎ কদাচিৎ কোন মনস্বী জাগিয়া উঠিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের দ্বারাই নিদ্রার ঘোর আরও প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

এইরূপ চিন্তাধারা চরক ও সুশ্রুতের কাল অবশ্য নিরূপিত হইতে পারে না। কিন্তু ভারতভাগ্যচক্রে বিশ্বাস করিলে এবং চরক ও সুশ্রুতের মৌলিকতা দেখিলে মনে হয়, হয় তাঁহারা বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে ছিলেন, না হয় বুদ্ধদেবের সহস্রবৎসর পরে ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রাচীন সুশ্রুতের যে একখানি দলীল (বাওয়ার-সাহেবের পুঁথি) পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তিনি সহস্রবৎসর পরে আসিয়া পড়িয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের ঝঞ্ঝাবাতে ভারতের কত প্রাচীন দলীল উড়িয়া গিয়াছে। কি ঘোর বিপ্লবে হিন্দুজাতির অনুবন্ধের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে! খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর সহস্রবৎসর পূর্ব্বের যে দলীল আছে, তাহা নাকি এত জীর্ণ যে, পড়িতে পারা যায় না। নানাস্থানে সুশ্রুতের নাম আছে, পুরাণেও আছে, বর্ত্তমান সুশ্রুতের প্রথমেই আছে। প্রবন্ধান্তরে এই দুই দলীল পাঠ করিতে চেষ্টা করা গিয়াছে। * যাহা হউক, সুশ্রুতকে স্বস্থানে বসাইতে পারিলে, সঙ্গে সঙ্গে চরকের যথার্থ স্থান দেখিতে পাওয়া যাইবে। কারণ, যিনিই ঐ দুইখানি সংহিতার পাতামাত্র উল্টাইয়াছেন, কাহার পরে কে, এবং বোধ করি, কত পরে, তাহা আর

* আশ্বিনের 'প্রবাসী'। মহাভারতের একটি স্থলে (অনু॰ ৪ অ॰) সুশ্রুতের নাম পাইয়াছি। নারদ, যাজ্ঞবল্ক্য, গার্গ্য, জাবালি প্রভৃতি নামের সহিত বাতয়, চক্রক ও সুশ্রুতের নাম আছে। চক্রক চরক? চরক নাম পাই নাই বলিয়া মনে হইতেছে। অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ধন্বন্তরি, কাশীরাজ, দিবোদাস, নকুল ও সহদেব—এই সাত জন ব্যাধিঘাতক নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের সকলেরই নাম মহাভারতে আছে। দিবোদাস বেদেও আছেন। ইঁহার সম্বন্ধে মহাভারত (অনু॰ ৩০ অ॰) ও বায়ুপুরাণ প্রায় একমত। মহাভারতে চিকিৎসক আত্রেয় নাম স্পষ্ট লিখিত আছে। যথা (শান্তি ২১০ অ॰)—দেবর্ষিচরিতং গার্গ্যঃ কৃষ্ণাত্রেয়শ্চিকিৎসিতং [জগাদ]। অন্যত্র (শান্তি॰ ২১৪ অ॰) মহর্ষির্ভগবানত্রির্বেদ তদ্ভুক্তসম্ভবম্। বস্তুত মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে (১৯, ২৮, ২১৪, ২৮২, ৩১৮, ৩২২ অ॰) স্থানে স্থানে আয়ুর্ব্বেদ বর্ণিত আছে। স্থানে স্থানে (শা॰ ৩১৮, ৩২২) অবিকল সুশ্রুত মনে হয়। তবে বোধ হয় এই সকল উক্তি আত্রেয়-অগ্নিবেশাদিরও হইতে পারে। মহাভারতের সময় চরক ও সুশ্রুত তত প্রসিদ্ধ ছিলেন না বলিয়া বোধ হয়।

তাঁহাকে বলিয়া দিতে হয় না। সুশ্রুত-সংহিতার বর্ত্তমান আকার নাকি নাগার্জ্জুন দিয়াছিলেন। তিনি কে, কখন্ ছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিতে ডাঃ রায় বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যিনিই হউন, যখনই থাকুন, তিনি সুশ্রুতের নূতন সংস্করণ করিয়াছিলেন বলিয়া সুশ্রুতের প্রাচীনতা লুপ্ত হয় না। এরূপ স্থলে একটি দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা মনে আসে এবং অন্যত্র তাহা প্রয়োগ করা গিয়াছে। কাশীরাম দাস মহাভারত রচনা করিয়াছেন বলিয়া সৌতির মহাভারত নূতন হয় না, কিংবা ব্যাসমুনি ভারতকথা শুনাইয়াছেন বলিয়া ভারতযুদ্ধ আধুনিক হয় না।

চরক ও সুশ্রুতের পর—অর্থাৎ তাঁহাদের বর্ত্তমান আকার-পরিগ্রহের পর—বাগ্‌ভট, তদনন্তর বৃন্দ, তদনন্তর চক্রপাণিতে ধাতু-ঘটিত ঔষধ আয়ুর্ব্বেদে অল্পে অল্পে প্রবেশ-লাভ করে। চক্রপাণি খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীতে ছিলেন। তাঁহার একশত কি দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বৃন্দ, বৃন্দের একশত কি দুইশত বৎসর পূর্ব্বে মাধবকর * ছিলেন। ইহা ডাক্তার রায়ের ইতিহাস পাঠে জানিতেছি। তিনি বলেন, একাদশ শতাব্দীর সময়ে আয়ুর্ব্বেদে তন্ত্রের প্রভাব বিস্তৃত হয়, এবং তাহারই ফলস্বরূপ রসরত্নাকর, রসার্ণব, রসরত্নসমুচ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থে রসের (পারদের) প্রাধান্য। ঐ শতাব্দীর পূর্ব্বেও তান্ত্রিক মত চলিত হইয়াছিল। খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীতে উহা প্রচলিত ছিল, বলিতে পারা যায়। ডাক্তার রায় ৭ম শতাব্দীতে পর্য্যন্ত উহার প্রভাবের নিদর্শন দেখাইয়াছেন। সে সকল প্রমাণ ছাড়িয়া গরুড়পুরাণ (ও অগ্নি-পুরাণ) দেখিলেই বলিতে পারা যায় যে, ৯ম কি ১০ম শতাব্দীতে তান্ত্রিকমত বিলক্ষণ প্রচারিত হইয়াছিল। গরুড়পুরাণরচনার উত্তরসীমা ১০ম শতাব্দী, পূর্ব্বসীমা ৮ম কি ৯ম। উহার একস্থানে ব্যাড়ী-মুনির কথা আছে। সেখানে তিনি মহাপ্রভাবসিদ্ধ নামে বিশেষিত। তিনি কৃত্রিমমুক্তা-পরীক্ষার উপদেশ করিয়াছেন। রসরত্নসমুচ্চয়েও রসসিদ্ধিপ্রদায়কদিগের মধ্যে ব্যাড়ীর নাম আছে। এক বৈয়াকরণিক ব্যাড়ী বা ব্যালী পাণিনির সমসাময়িক ছিলেন। বৈয়াকরণিক হইলে যে আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ বা রসবেত্তা হইতে পারেন না, এমন বলিতে পারা যায় না। দৃষ্টান্ত পতঞ্জলি। যাহা হউক, দেখা যাইতেছে ৯ম শতাব্দীর পূর্ব্বে রসের প্রাধান্য ঘটিয়াছিল। ইহার কতকাল পূর্ব্বে তান্ত্রিকমত প্রচ্ছন্নভাবে ছিল, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। † অথর্ব্ববেদ হইতে তান্ত্রিক ক্রিয়ার আরম্ভ বলা যাইতে পারে। অথর্ব্ববেদের মারণোচ্চাটনাদি আভিচারিক কার্য্য মহা-

* মাধবকর ওড়িষা ছিলেন কি? ওড়িশার পণ্ডিতগণ তাঁহাকে ওড়িষা ব্রাহ্মণ মনে করেন। 'কর'-সংজ্ঞাটি তাঁহাদিগের মধ্যে বিস্তর আছে।

† কত পূর্ব্বকাল হইতে দুর্গাপূজার আরম্ভ? মহাভারতে দুই স্থানে (বিরাট ৬ অ., ভীষ্ম ২৩ অ.) মহিষাসুরনাশিনী দুর্গার স্তব পাওয়া যায়। জ্যোতিষের ইঙ্গিত দেখিলে খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে দুর্গাপূজার আরম্ভ মনে হয়।

ভারতেও লিখিত আছে। সেই অথর্ব্ববেদ হইতেই আয়ুর্বেদের উৎপত্তি। যদি রসায়নের সহিত রসপারদের সম্বন্ধ থাকে, * তাহা হইলে অন্তত মহাভারতের সময় হইতে রসায়নপ্রয়োগ (শান্তি• ৩২১ অ•, অনু• ২৮ অ•) এ দেশে চলিত আছে। মহাভারতেই 'হিঙ্গুল'শব্দ দুই তিন স্থলে আছে। পারদ, হিঙ্গুলের মধ্যে কথন-কথন ধাতুর আকারেই পাওয়া যায়। † পারদের আকর বলিয়া যে দরদ রসগ্রন্থে কীর্ত্তিত আছে, সেই দরদের নাম মহাভারতে পুনঃপুন উক্ত হইয়াছে। মনুস্মৃতিতে দরদ, পারদ, খশ জাতির উল্লেখ আছে। ঔষধে পারদপ্রয়োগের কথায় বরাহমিহিরের সাক্ষ্য ত আছেই। মনে রাখিতে হইবে, বরাহ পূর্ব্বশাস্ত্র সঙ্কলন করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই ঔষধে পারদ-প্রয়োগ চলিত ছিল।

অষ্টাঙ্গহৃদয়ের কর্ত্তা সিংহগুপ্তপুত্র বাগ্‌ভট ছিলেন। রসরত্নসমুচ্চয়কর্ত্তাও নিজেকে সিংহগুপ্তপুত্র বাগ্‌ভট বলিয়াছেন। এজন্য অধ্যাপক রায় মহাশয় বিস্মিত হইয়া দ্বিতীয় বাগ্‌ভটের নিজের নামপরিবর্ত্তনের সহিত অস্তিত্ববিলোপ-চেষ্টার প্রশংসা করিয়াছেন। জানি না, এই বাগ্‌ভট অষ্টাঙ্গহৃদয়ের কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করিয়াছেন কি না। কেবল বাগ্‌ভট নামটি দেখিলে বিস্মিত হইতাম না। হয় ত বাগ্‌ভট নামটি উপাধিবিশেষ ছিল। বস্তুত বাগ্‌ভট বা বাগবট্ট বলাও যাহা, কবিরাজ বলাও তাহা। কখনও বা গুরুর নামে শিষ্যের নাম হইত। দৃষ্টান্ত—প্রথম আর্য্যভটের শিষ্য দ্বিতীয় আর্য্যভট। কিন্তু এইপ্রকার ব্যাখ্যায় উভয় বাগ্‌ভটের পিতার নাম এক হইবার কারণ পাওয়া যায় না। উভয় বাগ্‌ভট এক ব্যক্তি হইতে পারেন না কি?

এই অনুমানের বিরুদ্ধে ডাঃ রায় দুইটি প্রমাণ দিয়াছেন—(১) অষ্টাঙ্গহৃদয় সুশ্রুতের ন্যায় বৈদিক, র•র•-সমুচ্চয় রসার্ণবের ন্যায় তান্ত্রিক; (২) ডাঃ রায়ের অনুমানে অষ্টাঙ্গহৃদয় ৮ম শতাব্দীর, এবং র•র•-সমুচ্চয় ১৩শ শতাব্দীর। কিন্তু এই দুই যুক্তি দ্বারা আমাদের সন্দেহ যাইতেছে না। আমরা সমগ্র র•র•-সমুচ্চয় দেখি নাই। ডাঃ রায় উহার যতটুকু উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং গ্রন্থের গুণসম্বন্ধে যতটুকু বলিয়াছেন, তাহা হইতে আমাদের সংশয় বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে। (১) অ•-হৃদয়ে যেরূপ বিষয়-বিভাগ এবং বর্ণনার ধারা দেখিতে পাই, র•র•-সমুচ্চয়েও সেইরূপ দেখিতেছি। এরূপ সুশৃঙ্খলা পরবর্ত্তী গ্রন্থেও অল্প দেখিতে পাই। (২) অ•-হৃদয়ে চক্ষুর তিমিররোগচিকিৎসায় পারদঘটিত অঞ্জন প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে। ডাঃ রায় বলেন, র•র•-সমুচ্চয়েও প্রায় সেই ব্যবস্থাই প্রদত্ত হইয়াছে। (৩) উভয় গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে একই ভাবের শ্লোক—বুদ্ধদেবকে নমস্কার। ১৩শ কি ১৪শ

* অমরকোষের টীকাকার রঘুনাথ "রসঃ সূতশ্চ পারদে" ইহার টীকায় বলিয়াছেন—"রসতে রসাহনাদিষু, সূতে বলারোগ্যে।"

† Mallet's Mineralogy of India.

শতাব্দীর আয়ুর্ব্বেদলেখককে বুদ্ধদেবের প্রতি ভক্তিমান্ দেখিলে সন্দেহ বৃদ্ধি পায়।

উপরের বিরোধী প্রমাণদ্বয় বিচার করিলে প্রথমেই দেখিতে পাই যে, (১) অ॰-হৃদয়ে পারদের ও র॰-র॰-সমুচ্চয়ের অন্যান্য ধাতুর কথা নাই। নাই বলিয়া উভয় গ্রন্থকার এক হইতে পারেন না, তাহা বলিতে পারা যায় না। বরং ডাঃ রায় এই অভাবরূপ প্রমাণের বিরুদ্ধে পুনঃপুন দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এমন হইতে পারে যে,অ॰-হৃদয়ে বাগ্‌ভট আত্রেয়াদির শাস্ত্র মন্থন করিয়াছেন এবং এজন্য গ্রন্থের নাম অ॰-হৃদয় সংহিতা বা সংগ্রহ রাখিয়াছেন। * বরাহ যেমন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন বহু জ্যোতিষীর মত সঙ্কলন করিয়া বৃহৎ-সংহিতা লিখিয়াছিলেন, বাগ্‌ভটও তেমনই প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ সঙ্কলন করিয়া থাকিতে পারেন। উহাতে বৈদিক আয়ুর্ব্বেদ, র॰-র॰-সমুচ্চয়ে তান্ত্রিক। এই দুই আয়ুর্ব্বেদ পৃথক্ রাখিবার অভিপ্রায়েও পৃথক্ গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। (২) ডাঃ রায়ের অনুমানে রসার্ণব খ্রীঃ ১২শ শতাব্দীতে রচিত। কারণ ১৪শ শতাব্দীর সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহকার মাধবাচার্য্য রসার্ণবের এবং র॰-র॰-সমুচ্চয় রসার্ণবের নাম করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রমাণে রসার্ণব ১২শ শতাব্দী অপেক্ষাও প্রাচীন হইতে পারে, এবং সঙ্গে সঙ্গে র॰-র॰-সমুচ্চয়ের কালও পিছাইয়া পড়িতে পারে। এইরূপে উভয় বাগ্‌ভট একই সময়ে উপস্থিত হইতে পারেন। (৩) অ॰-হৃদয়ের বাগ্‌ভটকে কেহ বা খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীর, কেহ বা খ্রীঃ পঃ ৮ম, এবং রাজতরঙ্গিণীকার ১২শ শতাব্দীর বলিয়াছেন। সংহিতার কালনিরূপণসম্বন্ধে এরূপ মতভেদ বিস্ময়ের বিষয় নহে। কারণ সংহিতায় লেখকের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের বিষয়ই অধিক থাকে। বরাহের কেবল বৃহৎ-সংহিতাখানি দেখিলে তাঁহার কাল নির্দ্দেশ করিতে পারা যাইবে না। হয় ত রাজতরঙ্গিণীর কথাই সত্য। কারণ এইরূপ সময় অনুমান করিলে উপরের সন্দেহগুলি নিরাকৃত হয়। যাহা হউক, আমরা আমাদের সন্দেহ জানাইয়া ক্ষান্ত হইলাম, ডাঃ রায় সন্দেহের মীমাংসা করিবেন। †

র॰-র॰-সমুচ্চয়ের যতটুকু ডাঃ রায় তাঁহার গ্রন্থের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করিয়াছেন, ততটুকু হইতেই উহাকে মূল্যবান্ বোধ হইল। এক এক শাস্ত্রের আদির যত নিকটে যাইতে পারা যায়, পরবর্ত্তী গ্রন্থের স্থূলতা বা সূক্ষ্মতা পরিমাণ করা ততই সহজ হইয়া পড়ে। পরে পরে এক এক শাস্ত্রের যেমন উন্নতি হইতে পারিত, গতানুগতিকের অন্ধবৎ

* মহাভারতের সময়েই আয়ুর্ব্বেদ অষ্টাঙ্গ হইয়াছিল। যথা, আদি॰ ১১ অ॰—আয়ুর্ব্বেদমষ্টাঙ্গোদ্দেহবাংস্তত্র ভারত।

† জ্যোতিষী শ্রীপতির টীকাকার মাধব (১১৫৫ শক) বাগ্‌ভটের নাম করিয়াছেন। এখানে কোন্ বাগ্‌ভট, তাহা এখন বলিবার উপায় নাই। এক মহর্ষি-সংহৃত রত্নসংগ্রহ দেখিতে পাই। মতদূর দেখিয়াছি, তাঁহাকে ১২শ শতাব্দীর বলিয়া মনে হইয়াছে। কালক্রমে রত্নপরীক্ষা আয়ুর্ব্বেদেও এদত্ত হইত। সুতরাং রত্নসংগ্রহকার সিংহ দ্বিতীয় বাগ্‌ভটের পিতা হওয়া অসম্ভব নহে।

অনুসরণও তেমনই প্রকট হইয়া উঠিত। প্রথম উদ্ভাবনার সময়ে যে প্রাণ থাকে, গতানুগতিকে তাহা লুপ্ত হইয়া অনুকরণের সমস্ত দোষ তাহার স্থান অধিকার করে।

ডাঃ রায় র॰-র॰-সমুচ্চয় হইতে যে ইংরাজি অনুবাদ দিয়াছেন, দুঃখের বিষয় কোন কোন স্থলে তাহা মূলপদানুসারী হয় নাই। যাঁহারা কাব্য ও পুরাণাদির সংস্কৃত বুঝেন, তাঁহারা যে আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় পারিভাষিকশব্দবহুল সংস্কৃত বুঝিবেন, এমন আশা করিতে পারা যায় না। অন্যপক্ষে, যাঁহারা সংস্কৃত বুঝেন না, তাঁহারা সংক্ষিপ্ত ইংরাজি অনুবাদকেই আশ্রয় করিবেন। এই উভয় শ্রেণীর পাঠকের নিমিত্ত মূল অনুসরণ করাই শ্রেয়। এখানে অনুবাদের ভাষা বিচারের বস্তু হয় না,—যে বিষয়ের অনুবাদ, তাহাই বিবেচ্য। কম্পিল্লনামক উপরসসম্বন্ধে র॰-র॰-সমুচ্চয়ে আছে—

ইষ্টিকাচূর্ণসঙ্কাশশক্তিকাঢ্যোঽতিরেচনঃ।
সৌরাষ্ট্রদেশে চোৎপন্নঃ স হি কম্পিল্লকঃ স্মৃতঃ।

ইহার অনুবাদে আছে—Kampilla is like brick-dust……a purgative…… natural product of Surat……and a vermifuge. ইহাতেও আপত্তি উঠিত না, যদি ডাঃ রায় মন্তব্য না করিতেন যে, কম্পিল্ল কমলাগুঁড়ি রঙ্গ। কম্পিল্ল কি পদার্থ, তাহা জানি না। দেখিতেছি বঙ্গদেশের অনেক কবিরাজ এবং ডাঃ উদয়চাঁদ ও বৈদ্যকশব্দসিন্ধু কম্পিল্ল অর্থে কমলাগুঁড়ি বুঝিয়াছেন। কিন্তু উদ্ধৃত লক্ষণ হইতে উহা কমলাগুঁড়ি রঙ্গ বলিয়া ঠিক বুঝা যায় না। কারণ এক কম্পিল্ল নাম এবং ইটগুঁড়ার ন্যায় বর্ণ* ব্যতীত উভয়ের মধ্যে অন্য সাদৃশ্য পাই না। বস্তুত কমলাগুঁড়িতে চন্দ্রিকা (চক্‌চকে দীপ্তি, যেমন অভ্রের) কই? বোধ করি,কমলাগুঁড়ির জন্য গুর্জরদেশে যাইবারও প্রয়োজন ছিল না। তদ্ভিন্ন, উপরসের মধ্যে উদ্ভিজ্জ পদার্থের নাম মনে হইলে বস্তুত তাহা উদ্ভিজ্জ কি না, তাহার সবিশেষ বিচার আবশ্যক। প্রাচীনেরা অবশ্য উদ্ভিজ্জ ও খনিজ পদার্থের প্রভেদ জানিতেন। কম্পিল্ল রঙ্গপদার্থ হইলে লক্ষণে রঙ্গের উল্লেখ থাকিত। কারণ কমলাগুঁড়িতে জল লাগিবামাত্র রঙ্গ বহির্গত হয়।

এইরূপ 'মুদ্দারশৃঙ্গকং' সম্বন্ধে ডাঃ রায় লিখিয়াছেন, "উহা হরিদ্রাবর্ণ, পত্রাকার (সদল), এবং গুর্জরদেশে ও আবুগিরিতে প্রাপ্তব্য।" কিন্তু মূলে আরও দুইটি গুণ লিখিত আছে। উহা সীসসত্ত্ব এবং গুরু। সদল অর্থে ডাঃ রায় পত্রাকার বুঝিয়াছেন। কিন্তু সদল অর্থে গুঁড়ার আকারও বুঝাইতে পারে। বোধ করি 'দলো গুড়ে' এই অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। সীসসত্ত্ব হইতে মনে হয়, উহা সীসধাতুর কোন উপরস। বস্তুত 'মুদ্দারশৃঙ্গকং' চলিত মুর্দাসঙ্গ বা মুদ্রাশঙ্খ নহে ত? মুর্দাসঙ্গ (litharge) হইলে উহা পত্রাকার ও

* বোধ হয়, ইষ্টিকাচূর্ণসঙ্কাশ—অনুবাদে has the *colour* of brick-dust করাই ভাল। কমলাগুঁড়ির গাছ পুন্নাগ বলিয়া জানিতাম। কিন্তু দেখিতেছি, তেলেগু নাম পুনাং পুন্নাগের অপভ্রংশস্বরূপ বিবেচিত হইতেছে। রকস্বরা কমলাগুঁড়ি-গাছের (Rottlera) জন্মস্থান করমণ্ডলপ্রদেশ বলিয়াছেন। কিন্তু বোম্বাইপ্রদেশের দক্ষিণেও বলা যাইতে পারে।

গুণ্ডিকাকার উভয়ই হইতে পারে। তবে সে দ্রব্য স্বভাবত এবং গুর্জ্জরদেশে ও অর্বুদ-গিরিতে পাওয়া যায় কি না, তাহা বলিতে পারি না।

ডাঃ রায়ের দৃষ্টি-আকর্ষণ নিমিত্ত অপর দুই-একটি উপরস সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলা যাইতেছে। বৈক্রান্তসম্বন্ধে হলাণ্ড-সাহেবের অনুমান আদৌ সন্তোষজনক নহে। বৈক্রান্তের বর্ণনা হইতে উহাকে গোমেদ (Zircon) বলিয়া মনে হয়। এ বিষয় গ্রন্থান্তরে বিচার করা গিয়াছে। * অনেকেই রাজাবর্ত্তকে lapis lazuli করিয়া থাকেন। কেন করেন,জানি না। বোধ হয়,রাজাবর্ত্তের অপভ্রংশ ফার্সী লাজাবর্দ্দ অর্থে lapis-lazuli বুঝিয়া আমাদের প্রাচীন রাজাবর্ত্তকেও তাহাই অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু রাজাবর্ত্ত অল্প রক্তমিশ্রিত গাঢ় নীলবর্ণ এবং উহা স্ফটিকের ভেদ বলিয়া শাস্ত্রে লিখিত আছে। অতএব উহা amethyst ভিন্ন আর কিছু নহে। 'বিমল' স্বচ্ছ স্ফটিক (rock crystal) বলিয়া জানি। কেহ কেহ 'বিমল'শব্দে রৌপ্যমাক্ষিক বুঝিয়াছেন। কিন্তু রৌপ্য-মাক্ষিককে বর্ত্তুল,কোণসংযুক্ত, স্নিগ্ধ, ফলকান্বিত বলিতে পারা যায় না। ক্ষারযোগে বিমল ধ্মাত হইলে কাচ পাইবার কথা। সস্যক ও তুত্থক রত্নস্বরূপ ব্যবহৃত হইত। সস্যক malachite, তুত্থক azurite ? চপল stilbite ? তুবরী alum না হইয়া alunogen ? তুবরীর একটা গুণের মধ্যে আছে, লেপাৎ তাম্রং চরেদয়ঃ। ইহা হইতে ডাঃ রায় অনুমান করিয়াছেন যে, এখানে লেপ-দ্বারা লৌহের তাম্রে পরিণতি (transmutation) বলা হইয়াছে। কিন্তু লেপদ্বারা এক ধাতুর উপরে অন্য ধাতুর লেপ (deposit) বুঝাইতে পারে না কি ? তুবরী দ্বারা লৌহে তাম্রলেপ অসম্ভব নহে। কারণ তুবরী শুদ্ধ ফট্‌কিরি নহে, উহাতে কাশীশ ও তুত্থক মিশ্রিত থাকে।

অঞ্জনসম্বন্ধে ডাঃ উদয়চাঁদের অনুমান বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয় না। তাঁহার অনেক-গুলি ভ্রমাত্মক অনুমানের পরিচয় ডাঃ রায়ও পাইয়াছেন। এস্থলে ডাঃ উদয়চাঁদের প্রমাণ না তুলিলেই ভাল হইত। পঞ্চবিধ অঞ্জনের মধ্যে র০-র০-সমুচ্চয় হইতে জানিতেছি যে, সৌবীরাঞ্জন ধূম্রবর্ণ, স্রোতোঽঞ্জন বল্মীক-শিখরাকার, ভাণ্ডিলে নীলোৎপলবর্ণ, ঘষিলে গৈরিকবর্ণ। ভাবপ্রকাশে অঞ্জন দ্বিবিধ,—সৌবীরাঞ্জন ও স্রোতোঽঞ্জন। প্রথমটি শ্বেত বা পাণ্ডুর, দ্বিতীয়টি কৃষ্ণ। রসেন্দ্রসারসংগ্রহের গোপালকৃত টীকায় সৌবীরাঞ্জন শুভ্রবর্ণ, রসাঞ্জন পীতবর্ণ, পুষ্পাঞ্জন শ্বেতবর্ণ †। স্রোতোঽঞ্জনের বর্ণ লিখিত নাই। নীলাঞ্জন অবশ্য নীলবর্ণ। কিন্তু লিখিত আছে, অঞ্জনসকলের সত্ত্ব, মনঃশিলার ন্যায় সংগ্রহ

* জহরীদিগকে হিন্দি নাম না বলিলে তাহারা মণি চিনিতে পারে না। এক পণ্ডিত হিন্দুস্থানী বৈদ্য রসপ্রদীপের টীকা হইতে বৈক্রান্ত অর্থে "গোটা হীরা" বলিয়াছিলেন। এক জহরী বৈক্রান্ত নামে গোমেদ বিক্রয় করিয়াছিল। কিন্তু পরীক্ষায় তাহা জার্কণ না হইয়া গার্ণেট (hyacinth) হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, কবিরাজ মহাশয়েরা অজারিত সহজ বৈক্রান্ত বিক্রয় করিতে একান্ত বিমুখ।

† 'সিত' পীত হইবে না ত ?

করিবে। অমরকোষে স্রোতোঽঞ্জনের অপর নাম সৌবীরাঞ্জন ও কপোতাঞ্জন। অতএব এই মতে স্রোতোঽঞ্জন ও সৌবীরাঞ্জন একই বস্তু, এবং উহারা কপোতবর্ণ। রসাঞ্জনের নাম রসগর্ভ এবং তার্ক্ষ্যশৈল। অতএব রসাঞ্জন পীত বা হরিতবর্ণ খনিজ-বিশেষ। কুসুমাঞ্জনের অপর নাম রীতি-পুষ্প। রীতি অর্থে পিত্তল, পুষ্প অর্থে মল। এইরূপ অর্থ অমরের টীকাকার রঘুনাথাদি করিয়াছেন। কোন টীকাকার রসাঞ্জনের নাম (দারুহরিদ্রার) কাথোদ্ভব এবং তুত্থ বলিয়াছেন। কালিকাপুরাণে (বৈদ্যকশব্দ-সিন্ধু) অঞ্জন ষড়্‌বিধ—সৌবীর, জাম্বল, ময়ূর ও শ্রীকর তুত্থ, দর্ব্বিকা, মেঘনীল। প্রবংরূপ (আঠার ন্যায় শীঘ্রদ্রাব ?) সৌবীর, জাম্বল প্রস্তর, ময়ূর ও শ্রীকর রত্নবিশেষ, মেঘনীল তৈজস, ঘৃততৈলাদিযোগে তাম্রাদিতে দীপশিখায় জাত দর্ব্বিকা।

এই সকল মত হইতে বুঝা যাইতেছে, শুধু একালে নহে, পূর্ব্বকালেও পাঁচটি অঞ্জনসম্বন্ধে গোলযোগ ছিল। নীলাঞ্জন= তুত্থাঞ্জন, এবং পুষ্পাঞ্জন=পিত্তলমল (calx of brass) রাখিলে, সৌবীর, স্রোত ও রসাঞ্জন থাকে। অমরের মতে সৌবীর ও স্রোতোঽঞ্জন এক এবং আকৃষ্ণরক্তবর্ণ। র০-র০-সমুচ্চয়মতে সৌবীরাঞ্জনের বর্ণ ঐ। ডাঃ-উদয়চাঁদ-কর্ত্তৃক উদ্ধৃত মদনপালেও উহা কৃষ্ণবর্ণ। স্রোতোঽঞ্জন শিখরাকার (pyramidal), ভঙ্গে নীল বা কৃষ্ণ এবং কষে লাল। অতএব galena হইতে পারে না, বরং stibnite হইতে পারে। Stibniteএর উপরিভাগ প্রায়ই Oxidesএ (Cervantite) পরিণত হয়। শেষোক্ত পদার্থ আপীত বা আরক্ত। এই সকল বিষয় স্মরণ করিলে সৌবীর ও স্রোতোঽঞ্জন,উভয়কেই stibnite-এর ভেদ বলিয়া মনে হয়। ডাঃ উদয়চাঁদ লিখিয়াছেন, রসাঞ্জন দারুদরিদ্রার কাথ, এবং তাহার চলিত নাম রসোত। কিন্তু বাজারে যাহা রসোত নামে বিক্রয় হয়, তাহা প্রায়ই কৃষ্ণবর্ণ। উহাতে লৌহ আছে। দারুহরিদ্রার কাথ দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া ঘন করিলে পাণ্ডুরবর্ণ হয়। হয় ত লৌহ-পাত্রে রাখিয়া রসোত প্রস্তুত হয়। দারুহরিদ্রার কাথ অম্লাত্মক। কিন্তু এতদ্দ্বারা রসাঞ্জনের নাম তার্ক্ষ্যশৈল হইবার কারণ পাওয়া যায় না। অন্যপক্ষে, বাজারে রসাঞ্জন নামে Stibnite বিক্রয় হয়। যাহা হউক, এ সকল তত্ত্ব ডাঃ রায় স্থির করিবেন।

দেখিতেছি, পৌরাণিক উক্তির প্রতি ডাঃ রায়ের আদৌ আস্থা নাই। র০-র০-সমুচ্চয়ে স্বর্ণ পঞ্চবিধ বলা হইয়াছে,—প্রাকৃত, সহজ, বহ্নিসম্ভূত, খনিসম্ভব ও পারদজাত। এ বিষয়ে পুরাণে কি আছে, জানি না। ডাঃ রায় সে অংশটুকু উদ্ধৃত করেন নাই। যাহাই থাকুক, এইপ্রকার উক্তির মধ্যে সত্য প্রায়ই লুক্কায়িত থাকে। যদি স্বর্ণের উক্ত পঞ্চবিধ উৎপত্তি শুনি, তাহা হইলে মনে হয় যে, প্রাকৃত impure, সহজ native, বহ্নি-জাত obtained by melting some ore, খনিসম্ভব quarried from mines, পারদ-জাত obtained by dissolving grains of gold (as among sand) in mercury। স্বর্ণের এইপ্রকার বিভাজন আধুনিক-বিজ্ঞানসম্মত না হইতে পারে।

কিন্তু পৌরাণিক বলিয়া প্রথম তিনটি উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। পারদ-জাত স্বর্ণ দ্বারা নিকৃষ্টধাতুর স্বর্ণে পরিণতি মনে করিবার বিশেষ কারণ পাইলাম না। দেশীয় অশিক্ষিত স্বর্ণকারেরা পারদদ্বারা এখনও গিল্টি করিয়া থাকে, এবং মৃত্তিকা-বালুকা-মিশ্রিত স্বর্ণকণা পারদে দ্রব করিয়া স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে দেখা গিয়াছে। তেমনই রূপা সহজ, খনিজ ও কৃত্রিম বলিলে পুরাণের অত্যুক্তি মনে আসে না। বস্তুত যাঁহারা বহুকাল হইতে সুবর্ণাদি ধাতুর অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা এক ধাতুর অন্যে পরিণতি বিশ্বাস করিতে পারিতেন কি? অন্তত সবিশেষ প্রমাণ না পাইলে আয়ুর্বেদে এই বিশ্বাসের অস্তিত্বে সন্দেহ থাকে। কোন কোন পুরাণে ও তন্ত্রে সুবর্ণ প্রস্তুত করিবার উপদেশ আছে বটে, কিন্তু সেখানে সুবর্ণ অর্থে কৃত্রিম সুবর্ণ (imitation gold) কিংবা সুবর্ণের লেপ বুঝিতে হইবে না ত? ভাবপ্রকাশে গন্ধকের পৌরাণিক উৎপত্তিবর্ণনায় দেখা যায়, "পূর্ব্বকালে দেবী শ্বেতদ্বীপে ক্রীড়া করিতে করিতে রজস্লাত বস্ত্র ক্ষীরসমুদ্রে ধৌত করিয়াছিলেন। তাহাতেই গন্ধকের উৎপত্তি হইয়াছে।" শুনিতে এই উৎপত্তি ঠিক পৌরাণিকী কথা বলিয়া মনে হয়। র৹-র৹-সমুচ্চয়মতে গন্ধক ত্রিবিধ—রক্ত,পীত, শ্বেত। তন্মধ্যে রক্তবর্ণ উত্তম,পীতবর্ণ মধ্যম, শ্বেতবর্ণ অধম। ভাবপ্রকাশ আর-এক ভেদ করিয়াছেন,—কৃষ্ণবর্ণ। গন্ধক বলিলে যদি বাজারের আজকালকার Sulphur মনে করি, তাহা হইলে গন্ধকের এই চতুর্ভেদ পৌরাণিকী অত্যুক্তির মধ্যে ফেলিতে হয়। কিন্তু পূর্ব্বকালে শাস্ত্রকারগণ যে আকারের বা যে বর্ণের গন্ধক দেখিতে পাইতেন, নিশ্চয়ই তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন। গন্ধকের সম্ভব তিনটি বলা যাইতে পারে—(১) আগ্নেয়গিরির নিকটবর্ত্তী স্থানে রক্তবর্ণ, (২) হিঙ্গুল, মাক্ষিক প্রভৃতি গন্ধকময় উপধাতুর খনিতে, এবং (৩) উষ্ণ ও গন্ধক প্রস্রবণের জলে। শেষোক্ত দুই স্থানে পীত ও শ্বেতবর্ণ গন্ধক পাওয়া যায়। তেমনই শিলাজতু প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত হইলে গন্ধক কৃষ্ণবর্ণ হয়। অতএব দেবীর রজস্লাবন হইতে গন্ধকের উৎপত্তি অর্থে প্রস্রবণের জলে উৎপত্তি। তবে,শ্বেতদ্বীপ অর্থে নেপল্‌স কি বেলুচিস্থান, তাহা পুরাণবিদেরা বলিতে পারেন। এ সকল স্থলে পুরাণকারের পক্ষসমর্থন নহে। তিনি বর্ত্তমান নাই, তাঁহার কি অভিপ্রায় ছিল, তাহা কেবল অনুমান করিয়া লইতে হয়। অতএব তাঁহাকে 'বিকল্পের ফল'টুকু দিতে আপত্তি হইতে পারে না।

হিন্দুরসায়নের শেষ অধ্যায়ে ডাঃ রায় গভীর দুঃখের সহিত এদেশের বিদ্যা ও কলার অবনতি বর্ণনা করিয়াছেন। ১১শ কি ১২শ শতাব্দী হইতে এদেশে বিজ্ঞানের মৃতাবস্থা চলিতেছে। তিনি মনে করেন, বৌদ্ধধর্ম্মের অবসানের পর ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সহিত বিদ্যার রুদ্ধগতি জড়িত। তাঁহার অনুমানে পৌরাণিক ধর্ম্মের বিস্তারে বিদ্যা ও কলা জাতিগত এবং কলা অশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ হওয়াতে এই শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এই দশার কারণ পুরাণপ্রসার

বা নব ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বলিয়া বোধ হয় না। বরং যে কারণে পুরাণের প্রসার ঘটিয়াছিল, সেই কারণেই আয়ুর্ব্বেদ ও অন্যান্য বিদ্যার গতি রুদ্ধ হইয়াছিল। কোন্ সময়ে এ দেশে জাতিভেদ না ছিল? মনুসংহিতার যত সংস্করণ হইয়া থাকুক, প্রচলিত অধিকাংশ পুরাণের পূর্ব্বে হইয়াছিল। মহাভারতমধ্যে চতুর্ব্বর্ণের বৃত্তি ও ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব বহু-বহু স্থানে বর্ণিত আছে। শবদেহস্পর্শে তখনও অশুচি হইতে হইত। এইজন্য উত্তর অর্জ্জুনের কথায় শমীবৃক্ষে আরোহণ করিতে চায় নাই। চিকিৎসক চৌরমধ্যপায়ীর ন্যায় উদকার্হ নহে, এ কথা বহুস্থলে লিখিত আছে (উ৹ ৩৪।৩৭,শা৹ ৩৬।৭৬, অনু৹ ৯৪ অ৹)। অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেববৈদ্য বটেন, কিন্তু দেবগণের ন্যায় সোমরস পাইতেন না। মহর্ষি চ্যবন বহুকষ্টে তাঁহাদিগকে দেবগণের সহিত সোমরস পান করাইতে পারিয়াছিলেন (আশ্ব৹ ৯ অ৹)। অথচ চিকিৎসকের ন্যায় হিতকারী অল্প ছিলেন (অনু৹ ৯ অ৹)। এই সকল কারণে মনে হয়, নব ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের কঠোরতায় বিদ্যার অবসাদ ঘটে নাই। প্রধান কারণ দেশের ঘোর অশান্তি ও অরাজকতা। রাজপ্রসাদ ব্যতিরেকে কোন কলার, কোন বিদ্যার উন্নতি হয় না। শ্রীসম্পৎ ভ্রষ্ট হইলে মানসিক সম্পৎ দাঁড়াইবার স্থান পায় না।

রসায়নের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে স্বর্ণালঙ্কারে রঙ্গকরণ সবিস্তরে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে কলিকাতার স্বর্ণকারগণ কিরূপে স্বর্ণে রং করে এবং তাহাতে কত স্বর্ণ অপচয় হয়, তাহা বাবু জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার লিপি হইতে ডাঃ রায় রঙ্গকরণকৌশলাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমাদের বোধ হয়, সংক্ষেপে প্রণালীটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইত। কারণ এই বিষয়ের সবিস্তর বর্ণনায় গ্রন্থের পূর্ব্বাপরসঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে নাই, রাসায়নিক ব্যাখ্যাও নির্দোষ নহে। জ্ঞানশরণবাবু স্বর্ণভূষণনির্ম্মাণে স্বর্ণের অপচয় বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু অপচয় ব্যতিরেকে নির্ম্মাণের সম্ভাবনীয়তা প্রদর্শন করেন নাই। সকল স্বর্ণকারই জানে, ৫০ ভরি সোনা রং করিতে আট-আনা কি দশ-আনা পর্য্যন্ত সোনা কম হয়। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশেও বর্ত্তমানকালেও এইরূপ অপচয় হইয়া থাকে, এবং সে দেশের ন্যায় এ দেশেও নেহারওয়ালার ব্যবসায় চলিতেছে। কলিকাতার অনেক রংওয়ালা জমকওয়ালাকে জমক বিক্রয় না করিয়া পারিশ্রমিক দিয়া ধাতু বহিষ্কৃত করিয়া আনে। তথাপি জমকওয়ালা পাশ্চাত্য সেকরাদিগের ন্যায় হীরাকশ দ্বারা স্বর্ণ অধঃপাতিত করিতে আরম্ভ করিলে তাহার বহু পরিশ্রমের লাঘব হইবে। এ দেশের কলাজীবীরা তাহাদের অবলম্বিত কলা প্রকাশ করিতে চায় না বলিয়া জ্ঞানশরণবাবু দুঃখ করিয়াছেন। কিন্তু বিলাতেও এইরূপ দুঃখ করিবার বিশেষ কারণ আছে। সে দেশের trade secrets, trade recipes সকল লোকেই জানিতে পারে কি? এ দেশের লোকে বলে না, এ কথাও একবারে বলিতে পারি না। না বলিলে এ দেশের কলাসকল ইংরাজিভাষায় বর্ণিত দেখিতে পাইতাম না।

শেষে আর একটি কথা বলিয়া এই দীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে। ডাঃ রায় যেমন আয়ুর্ব্বেদোক্ত রসপর্পটি, তাম্রপর্পটি, রসকর্পূর, মণ্ডুর, অপামার্গ ও শ্বেত পুনর্নবার রাসায়নিক উপাদান বলিয়াছেন, তেমনই অন্যান্য ধাতুঘটিত ও প্রধান প্রধান উদ্ভিজ্জাদি ঔষধের রাসায়নিক উপাদান প্রকাশ করিলে আয়ুর্ব্বেদের ও এ দেশের বিদ্যার বিস্তর উন্নতি সাধন করিবেন। তাঁহার হাতে পড়িয়াও যদি এই সকল ঔষধের পঙ্কোদ্ধার না হয়, তাহা হইলে দেশের রসায়নবিদ্যার উন্নতির আশা নাই। যবক্ষার পরিবর্ত্তে সোরা, পঞ্চলবণ নামে তিনটি লবণ, সাচিক্ষার অর্থে সাজিমাটি, বিমল নামে কাংস্যমাক্ষিক, তারমাক্ষিক নামে কাংস্য, বজ্রাভ্র নামে mica কিংবা talc কতকাল ব্যবহৃত হইবে? * এইজন্য ডাঃ রায়ের গ্রন্থের দেশীয় ভাষায় অনুবাদ দেখিবার আশা করিতেছি। আমাদের কি আছে, তাহা বিদেশীয় অপেক্ষা স্বদেশীয়কে প্রথমে প্রদর্শন অধিক আবশ্যক। বিদেশীয়কে দেখাইয়া হিন্দুজাতি কষ্টে একটু সম্মান পাইতে পারে, কিন্তু নিজেরা দেখিতে পাইলে আত্মসম্মানবুদ্ধির সহিত নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইতে পারে। আশা করি, ডাঃ রায় অজ্ঞানান্ধ স্বদেশীয়দিগকে তাঁহার পরিশ্রমের ফলভোগ হইতে বঞ্চিত করিবেন না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

ধর্ম্মের সরল আদর্শ।

যে বাষ্পসজল মেঘস্তর অস্ত প্রাতঃকালের উৎসবারম্ভকে ছায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল—সমগ্র জাগ্রত ধরণীতলের প্রতি অরুণ-কিরণের প্রাত্যহিক আশীর্ব্বাদকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা যেমন অপসারিত হইল, অমনি—কি আশ্চর্য্য—কেমন নিতান্ত সহজে এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সমস্ত বিশাল আকাশ আলোকে-আনন্দে আত্মস্ত পরিপূর্ণ হইয়া গেল—ইহাকে কোথাও সন্ধান করিতে হইল না, কোন উদ্যোগ করিতে হইল না! ঈশ্বর আমাদিগকে যে সকল বড়-বড় দান দিয়াছেন, তাহা এমনি করিয়াই দিয়াছেন। আমরা মাতাকে, পিতাকে, আলোককে, বায়ুকে, প্রাণকে, বুদ্ধিকে, জগতের সৌন্দর্য্যকে একান্ত সহজেই পাইয়াছি। তাহাদিগকে যদি আমাদের উপার্জ্জন করিয়া লইতে হইত, তবে কোনকালে পাইতাম না। ঈশ্বরের দান যেমন সহজ, তেমনি অজস্র।

আমার গৃহকোণের জন্য যদি একটি প্রদীপ আমাকে জ্বালিতে হয়, তবে তাহার জন্য আমাকে কত আয়োজন করিতে হয়—সেটুকুর জন্য কতলোকের উপর আমার নির্ভর! কোথায় সর্ষপ-বপন হইতেছে, কোথায় তৈল-নিষ্কাশন চলিতেছে, কোথায় তাহার ক্রয়বিক্রয়—তাহার পরে দীপ-সজ্জারই বা কত উদ্যোগ—এত জটিলতায় যে আলোকটুকু পাওয়া যায়, তাহা কত অল্প! তাহাতে আমার ঘরের কাজ চলিয়া যায়, কিন্তু বাহিরের অন্ধকারকে দ্বিগুণ ঘনীভূত করিয়া তোলে।

বিশ্বপ্রকাশক প্রভাতের আলোককে গ্রহণ করিবার জন্য কাহারো উপরে আমাকে নির্ভর করিতে হয় না,—তাহা আমাকে রচনা করিতে হয় না, কেবলমাত্র জাগরণ করিতে হয়। চক্ষু মেলিয়া ঘরের দ্বার মুক্ত করিলেই সে আলোককে আর কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না।

যদি কেহ বলে, প্রভাতের আলোককে দর্শন করিবার জন্য একটি অত্যন্ত নিগূঢ় কৌশল কোথাও গুপ্ত আছে, তবে তৎক্ষণাৎ এই কথা মনে হয়, নিশ্চয় তাহা প্রভাতের আলোক নহে—নিশ্চয় তাহা কোনো কৃত্রিম আলোক—সংসারের কোন বিশেষ-ব্যবহার-যোগ্য কোনো ক্ষুদ্র আলোক। কারণ, বৃহৎ আলোক আমাদের মস্তকের উপরে আপনি বর্ষিত হইয়া থাকে—ক্ষুদ্র আলোকের জন্যই অনেক কলকারখানা প্রস্তুত করিতে হয়।

যেমন এই আলোক, তেমনি ধর্ম্ম। তাহাও এইরূপ অজস্র, তাহা এইরূপ সরল। তাহা ঈশ্বরের আপনাকে দান,—তাহা নিত্য, তাহা ভূমা, তাহা আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া আমাদের অন্তর-বাহিরকে ওতপ্রোত করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহাকে পাইবার জন্য কেবল চাহিলেই হইল, কেবল হৃদয়কে উন্মীলিত করিলেই হইল। আকাশপূর্ণ দিবালোককে উদ্যোগ করিয়া পাইতে হইলে যেমন আমাদের পক্ষে পাওয়া অসম্ভব হইত, তেমনি আমাদের অনন্তজীবনের সম্বল ধর্ম্মকে বিশেষ আয়োজনের দ্বারা পাইতে হইলে সে পাওয়া কোনকালে ঘটিয়া উঠিত না।

আমরা নিজে যাহা রচনা করিতে যাই, তাহা জটিল হইয়া পড়ে। আমাদের সমাজ জটিল, আমাদের সংসার জটিল, আমাদের জীবনযাত্রা জটিল। এই জটিলতা আপন বহুধাবিভক্ত বৈচিত্র্যের দ্বারা অনেকসময় বিপুলতা ও প্রবলতার ভাণ করিয়া আমাদের মূঢ়চিত্তকে অভিভূত করিয়া দেয়। যে দার্শনিক গ্রন্থের লেখা অত্যন্ত ঘোরালো, আমাদের অজ্ঞবুদ্ধি তাহার মধ্যেই বিশেষ পাণ্ডিত্য আরোপ করিয়া বিস্ময় অনুভব করে। যে সভ্যতার সমস্ত গতিপদ্ধতি দুরূহ ও বিমিশ্রিত, যাহার কলকারখানা আয়োজন-উপকরণ বহুলবিস্তৃত, তাহা আমাদের দুর্ব্বল অন্তঃকরণকে বিহ্বল করিয়া দেয়। কিন্তু যে দার্শনিক দর্শনকে সহজ করিয়া দেখাইতে পারেন, তিনিই যথার্থ ক্ষমতাশালী ধীশক্তিমান্, যে সভ্যতা আপনার সমস্ত ব্যবস্থাকে সরলতার দ্বারা সুশৃঙ্খল ও

* একবার কোন কবিরাজমহাশয়ের অনুরোধে আমরা ভৈষজ্যরত্নাবলীর শঙ্খদ্রাবক প্রস্তুত করিতে গিয়াছিলাম। এ নিমিত্ত আবশ্যক দ্রব্যের মধ্যে ক্ষারের ভাগ দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম, কোন অম্লাত্মক দ্রাবক হইতে পারিবে না। ফলে তাহাই ঘটিল। শেষে যবক্ষার পরিবর্ত্তে সোরা, সর্জিক্ষার নামে বাজারের একটা Acid Sulphate of Potassium লইয়া করিতে হইয়াছিল। শঙ্খভস্ম ও নবসার বাদ দিয়া করাতে অবশ্য Nitro-muriatic Acid হইয়াছিল। কিন্তু এখানেও সর্জিক্ষার অর্থে উক্ত Acid Sulphate লইতে হইয়াছিল।

সর্ব্বত্রগ্রগম করিয়া আনিতে পারে, সেই সভ্যতাই যথার্থ উন্নততর। বাহিরে দেখিতে যেমনি হোক্, জটিলতাই দুর্ব্বলতা, তাহা অকৃতার্থতা,—পূর্ণতাই সরলতা। ধর্ম্ম সেই পরিপূর্ণতার, সুতরাং সরলতার, একমাত্র চরমতম আদর্শ।

কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য, সেই ধর্ম্মকেই মানুষ সংসারের সর্ব্বাপেক্ষা জটিলতা দ্বারা আকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। তাহা অশেষ তন্ত্রে-মন্ত্রে, কৃত্রিম ক্রিয়াকর্ম্মে, জটিল মতবাদে, বিচিত্র কল্পনায় এমনি গহন দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে যে, মানুষের সেই স্বকৃত অন্ধকারময় জটিলতার মধ্যে প্রত্যহ এক-একজন অধ্যবসায়ী এক-এক নূতন পথ কাটিয়া নব নব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতেছে। সেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদের সংঘর্ষে জগতে বিরোধ-বিদ্বেষ অশান্তি-অমঙ্গলের আর সীমা নাই।

এমন হইল কেন? ইহার একমাত্র কারণ, সর্ব্বাঙ্গকরণে আমরা নিজেকে ধর্ম্মের অনুগত না করিয়া ধর্ম্মকে নিজের অনুরূপ করিবার চেষ্টা করিয়াছি বলিয়া। ধর্ম্মকে আমরা সংসারের অন্যান্য আবশ্যক-দ্রব্যের ন্যায় নিজেদের বিশেষব্যবহারযোগ্য করিয়া লইবার জন্য আপন-আপন পরিমাপে তাহাকে বিশেষভাবে খর্ব্ব করিয়া লই বলিয়া।

ধর্ম্ম আমাদের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবশ্যক সন্দেহ নাই—কিন্তু সেইজন্যই তাহাকে নিজের উপযোগী করিয়া লইতে গেলেই তাহার সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবশ্যকতাই নষ্ট হইয়া যায়। তাহা দেশকালপাত্রের ক্ষুদ্র প্রভেদের অতীত, তাহা নিরঞ্জন বিকার-বিহীন বলিয়াই তাহা আমাদের চিরদিনের পক্ষে, আমাদের সমস্ত অবস্থার পক্ষে এত একান্ত আবশ্যক। তাহা আমাদের অতীত বলিয়াই তাহা আমাদিগকে নিত্যকাল সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে ধ্রুব অবলম্বন দান করে।

কিন্তু ধর্ম্মকে ধারণা করিতে হইবে ত। ধারণা করিতে হইলে তাহাকে আমাদের প্রকৃতির অনুযায়ী করিয়া লইতে হয়। অথচ মানবপ্রকৃতি বিচিত্র,—সুতরাং সেই বৈচিত্র্য অনুসারে যাহা এক, তাহা অনেক হইয়া উঠে। যেখানে অনেক, সেখানে জটিলতা অনিবার্য্য—যেখানে জটিলতা, সেখানে বিরোধ আপনি আসিয়া পড়ে।

কিন্তু ধর্ম্মকে ধারণা করিতে হইবে না। ধর্ম্মরাজ ঈশ্বর ধারণার অতীত। যাহা ধারণা করি, তাহা তিনি নহেন, তাহা আর-কিছু, তাহা ধর্ম্ম নহে, তাহা সংসার। সুতরাং তাহাতে সংসারের সমস্ত লক্ষণ ফুটিয়া উঠে। সংসারের লক্ষণ বৈচিত্র্য, সংসারের লক্ষণ বিরোধ।

যাহা ধারণা করিতে পারি, তাহাতে আমাদের তৃপ্তির অবসান হইয়া যায়, যাহা ধারণা করি, তাহাতে প্রতিক্ষণে বিকার ঘটিতে থাকে। সুখের আশাতেই আমরা সমস্ত-কিছু ধারণা করিতে যাই, কিন্তু যাহা ধারণা করি, তাহাতে আমাদের সুখের অবসান হয়। এইজন্য উপনিষদে আছে—

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

যাহা ভূমা তাহাই সুখ, যাহা অল্প তাহাতে সুখ নাই। সেই ভূমাকে যদি আমরা ধারণা-

যোগ্য করিবার জন্য অল্প করিয়া লই, তবে তাহা দুঃখসৃষ্টি করিবে,—দুঃখ হইতে রক্ষা করিবে কি করিয়া? অতএব সংসারে থাকিয়া ভূমাকে উপলব্ধি করিতে হইবে, কিন্তু সংসারের দ্বারা সেই ভূমাকে খণ্ডিত-জড়িত করিলে চলিবে না।

একটি উদাহরণ দিই। গৃহ আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, তাহা আমাদের বাস-যোগ্য। মুক্ত আকাশ আমাদের পক্ষে সেরূপ বাসযোগ্য নহে, কিন্তু এই মুক্ত আকাশকে মুক্ত রাখাই আমাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। মুক্ত আকাশের সহিত আমাদের গৃহস্থিত আকাশের অবাধ যোগ রাখিলেই তবেই আমাদের গৃহ আমাদের পক্ষে কারাগার, আমাদের পক্ষে কবররূপ হয় না। কিন্তু যদি বলি, আকাশকে গৃহেরই মত আমার আপনার করিয়া লইব—যদি আকাশের মধ্যে কেবলি প্রাচীর তুলিতে থাকি, তবে তাহাতে আমাদের গৃহেরই বিস্তার ঘটিতে থাকে, মুক্ত আকাশ দূর হইতে সুদূরে চলিয়া যায়। আমরা যদি বৃহৎ ছাদ পত্তন করিয়া সমস্ত আকাশকে আমার আপনার করিয়া লইলাম বলিয়া কল্পনা করি, তবে আলোকের জন্মভূমি, ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের অনন্ত ক্রীড়াক্ষেত্র আকাশ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করি। যাহা নিতান্ত সহজেই পাওয়া যায়, সহজে ব্যতীত আর-কোন উপায়ে যাহা পাওয়া যায় না, নিজের প্রভূত চেষ্টার দ্বারাতেই তাহাকে একেবারে দুর্লভ করিয়া তোলা হয়। বেষ্টন করিয়া লইয়া সংসারের আর-সমস্ত পাওয়াকে আমরা পাইতে পারি,—কেবল ধর্ম্মকে, ধর্ম্মের অধীশ্বরকে বেষ্টন ভাঙিয়া দিয়া আমরা পাই। সংসারের লাভের পদ্ধতিদ্বারা সংসারের অতীতকে পাওয়া যায় না। বস্তুত যেখানে আমরা না পাইবার আনন্দের অধিকারী, সেখানে পাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া আমরা হারাই মাত্র। সেইজন্য ঋষি বলিয়াছেন—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়, সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কিছু হইতেই ভয় পান না।

ধর্ম্মের সরল আদর্শ একদিন আমাদের ভারতবর্ষেই ছিল। উপনিষদের মধ্যে তাহার পরিচয় পাই। তাহার মধ্যে যে ব্রহ্মের প্রকাশ আছে, তাহা পরিপূর্ণ, তাহা অখণ্ড, তাহা আমাদের কল্পনাজালদ্বারা বিজড়িত নহে। উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—

তিনিই সত্য, নতুবা এ জগৎসংসার কিছুই সত্য হইত না। তিনিই জ্ঞান, এই যাহা কিছু তাহা তাঁহারই জ্ঞান, তিনি যাহা জানিতেছেন তাহাই আছে, তাহাই সত্য। তিনি অনন্ত। তিনি অনন্ত সত্য, তিনি অনন্ত জ্ঞান।

এই বিচিত্র জগৎসংসারকে উপনিষদ্ ব্রহ্মের অনন্ত সত্যে, ব্রহ্মের অনন্ত জ্ঞানে বিলীন করিয়া দেখিয়াছেন। উপনিষদ্ কোনো বিশেষ লোক কল্পনা করেন নাই, কোনো বিশেষ মন্দির রচনা করেন নাই, কোনো বিশেষ স্থানে তাঁহার বিশেষ মূর্ত্তি স্থাপন করেন নাই—একমাত্র তাঁহাকেই

পরিপূর্ণভাবে সর্ব্বত্র উপলব্ধি করিয়া সকল-প্রকার জটিলতা, সকলপ্রকার কল্পনার চাকচিক্যকে দূরে নিরাকৃত করিয়া দিয়াছেন। ধর্ম্মের বিশুদ্ধ সরলতার এমন বিরাট্ আদর্শ আর কোথায় আছে?

উপনিষদের এই ব্রহ্ম আমাদের অগম্য, এই কথা নির্ব্বিচারে উচ্চারণ করিয়া ঋষিদের অমর বাণীগুলিকে আমরা যেন আমাদের ব্যবহারের বাহিরে নির্ব্বাসিত করিয়া না রাখি। আকাশ লোষ্ট্রখণ্ডের ন্যায় আমাদের গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া আমরা আকাশকে দুর্গম বলিতে পারি না। বস্তুত সেই কারণেই তাহা সুগম। যাহা ধারণাযোগ্য, যাহা স্পর্শগম্য, তাহাই আমাদিগকে বাধা দেয়। আমাদের স্বহস্তরচিত ক্ষুদ্র প্রাচীর দুর্গম, কিন্তু অনন্ত আকাশ দুর্গম নহে। প্রাচীরকে লঙ্ঘন করিতে হয়, কিন্তু আকাশকে লঙ্ঘন করিবার কোন অর্থই নাই। প্রভাতের অরুণালোক স্বর্ণমুষ্টির ন্যায় সঞ্চয়যোগ্য নহে, সেই কারণেই কি অরুণালোককে দুর্লভ বলিতে হইবে? বস্তুত একমুষ্টি স্বর্ণই কি দুর্লভ নহে, আর আকাশপূর্ণ প্রভাতকিরণ কি কাহাকেও ক্রয় করিয়া আনিতে হয়? প্রভাতের আলোককে মূল্য দিয়া ক্রয় করিবার কল্পনাই মনে আসিতে পারে না—তাহা দুর্ম্মূল্য নহে, তাহা অমূল্য।

উপনিষদের ব্রহ্ম সেইরূপ। তিনি অন্তরে-বাহিরে সর্ব্বত্র—তিনি অন্তরতম, তিনি সুদূরতম। তাঁহার সত্যে আমরা সত্য, তাঁহার আনন্দে আমরা ব্যক্ত!

কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

কেই বা শরীরচেষ্টা করিত, কেই বা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই আনন্দ না থাকিতেন! মহাকাশ পূর্ণ করিয়া নিরন্তর সেই আনন্দ বিরাজ করিতেছেন বলিয়াই আমরা প্রতিক্ষণে নিশ্বাস লইতেছি, আমরা প্রতি-মুহূর্ত্তে প্রাণধারণ করিতেছি—

এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি—

এই আনন্দের কণামাত্র আনন্দকে অন্যান্য জীবসকল উপভোগ করিতেছে—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি—

সেই সর্ব্বব্যাপী আনন্দ হইতেই এই সমস্ত প্রাণী জন্মিতেছে—সেই সর্ব্বব্যাপী আনন্দের দ্বারাই এই সমস্ত প্রাণী জীবিত আছে—সেই সর্ব্বব্যাপী আনন্দের মধ্যেই ইহারা গমন করে, প্রবেশ করে। ঈশ্বরসম্বন্ধে যত কথা আছে, এই কথাই সর্ব্বাপেক্ষা সরল, সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। ব্রহ্মের এই ভাব গ্রহণ করিবার জন্য কিছু কল্পনা করিতে হয় না, কিছু রচনা করিতে হয় না, দূরে যাইতে হয় না, দিনক্ষণের অপেক্ষা করিতে হয় না—হৃদয়ের মধ্যে আগ্রহ উপস্থিত হইলেই, তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার যথার্থ ইচ্ছা জন্মিলেই, নিশ্বাসের মধ্যে তাঁহার আনন্দ প্রবাহিত হয়, প্রাণে তাঁহার আনন্দ কম্পিত হয়, বুদ্ধিতে তাঁহার আনন্দ বিকীর্ণ হয়, ভোগে তাঁহার আনন্দ প্রতিবিম্বিত দেখি। দিনের আলোক যেমন কেবল-মাত্র চক্ষু মেলিবার অপেক্ষা রাখে, ব্রহ্মের আনন্দ সেইরূপ হৃদয়-উন্মীলনের অপেক্ষা রাখে মাত্র।

আমি একদা একখানি নৌকায় একাকী বাস করিতেছিলাম। একদিন সায়াহ্নে একটি মোমের বাতি জ্বালাইয়া পড়িতে পড়িতে অনেক রাত হইয়া গেল। শ্রান্ত হইয়া যেমনি বাতি নিবাইয়া দিলাম, অমনি একমুহূর্ত্তেই পূর্ণিমার চন্দ্রালোক চারিদিকের মুক্ত বাতায়ন দিয়া আমার কক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া দিল। আমার স্বহস্তজ্বালিত একটিমাত্র ক্ষুদ্র বাতি এই আকাশপরিপ্লাবী অজস্র আলোককে আমার নিকট হইতে অগোচর করিয়া রাখিয়াছিল। এই অপরিমেয় জ্যোতিঃসম্পদ্ লাভ করিবার জন্য আমাকে আর-কিছুই করিতে হয় নাই, কেবল সেই বাতিটি এক ফুৎকারে নিবাইয়া দিতে হইয়াছিল! তাহার পরে কি পাইলাম! বাতির মত কোন নাড়িবার জিনিষ পাই নাই, সিন্ধুকে ভরিবার জিনিষ পাই নাই—পাইয়াছিলাম আলোক, আনন্দ, সৌন্দর্য্য, শান্তি। যাহাকে সরাইয়াছিলাম, তাহার চেয়ে অনেক বেশি পাইয়াছিলাম—অথচ উভয়কে পাইবার পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ব্রহ্মকে পাইবার জন্য সোনা পাইবার মত চেষ্টা না করিয়া আলোক পাইবার মত চেষ্টা করিতে হয়। সোনা পাইবার মত চেষ্টা করিতে গেলে নানা বিরোধ-বিদ্বেষ বাধা-বিপত্তির প্রাদুর্ভাব হয়, আর, আলোক পাইবার মত চেষ্টা করিলে সমস্ত সহজ, সরল হইয়া যায়। আমরা জানি বা না জানি, ব্রহ্মের সহিত আমাদের যে নিত্যসম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের মধ্যে নিজের চিত্তকে উদ্বোধিত করিয়া তোলাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনা।

ভারতবর্ষে এই উদ্বোধনের যে মন্ত্র আছে, তাহাও অত্যন্ত সরল। তাহা এক-নিশ্বাসেই উচ্চারিত হয়—তাহা গায়ত্রীমন্ত্র। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ—গায়ত্রীর এই অংশটুকুর নাম ব্যাহৃতি! ব্যাহৃতিশব্দের অর্থ—চারিদিক্ হইতে আহরণ করিয়া আনা। প্রথমত ভূলোক-ভুবর্লোক-স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হয়—মনে করিতে হয়, আমি বিশ্বভুবনের অধিবাসী—আমি কোন বিশেষ-প্রদেশবাসী নহি—আমি যে রাজ-অট্টালিকার মধ্যে বাসস্থান পাইয়াছি, লোক-লোকান্তর তাহার এক-একটি কক্ষ। এই রূপে, দিনি যথার্থ আর্য্য, তিনি অন্তত প্রত্যহ একবার চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারকার মাঝখানে নিজেকে দণ্ডায়মান করেন, পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া নিখিল জগতের সহিত আপনার চিরসম্বন্ধ একবার উপলব্ধি করিয়া লন—স্বাস্থ্যকামী যেরূপ রুদ্ধগৃহ ছাড়িয়া প্রত্যূষে একবার উন্মুক্ত মাঠের বায়ু সেবন করিয়া আসেন, সেইরূপ আর্য্য সাধু দিনের মধ্যে একবার নিখিলের মধ্যে, ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে নিজের চিত্তকে প্রেরণ করেন। তিনি সেই অগণ্যজ্যোতিষ্কখচিত বিশ্বলোকের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কি মন্ত্র উচ্চারণ করেন?—

তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি—

এই বিশ্বপ্রসবিতা দেবতার বরণীয় শক্তি ধ্যান করি। এই বিশ্বলোকের মধ্যে সেই বিশ্বলোকেশ্বরের যে শক্তি প্রত্যক্ষ, তাহাকেই ধ্যান করি। একবার উপলব্ধি করি—বিপুল বিশ্বজগৎ একসঙ্গে এই মুহূর্ত্তে

এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁহা হইতে অবিশ্রাম বিকীর্ণ হইতেছে। আমরা যাহাকে দেখিয়া শেষ করিতে পারি না, জানিয়া অন্ত করিতে পারি না, তাহা সমগ্রভাবে নিয়তই তিনি প্রেরণ করিতেছেন। এই বিশ্বপ্রকাশক অসীম শক্তির সহিত আমার অব্যবহিত সম্পর্ক কি সূত্রে? কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব?—

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—

যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহার প্রেরিত সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে ধ্যান করিব। সূর্য্যের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের দ্বারা জানি? সূর্য্য নিজে আমাদিগকে যে কিরণ প্রেরণ করিতেছেন, সেই কিরণেরই দ্বারা। সেইরূপ বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন—যে শক্তি থাকাতেই আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত প্রত্যক্ষ-ব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি—সেই ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি—এবং সেই ধীশক্তি দ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধ্যে অন্তরতমরূপে অনুভব করিতে পারি। বাহিরে যেমন ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের সবিতৃরূপে তাঁহাকে জগৎচরাচরের মধ্যে উপলব্ধি করি, অন্তরের মধ্যেও সেইরূপ আমার ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিরে জগৎ এবং আমার অন্তরে ধী, এ দুইই একই শক্তির বিকাশ, ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চিত্তের এবং আমার চিত্তের সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সঙ্কীর্ণতা হইতে, স্বার্থ হইতে, ভয় হইতে, বিষাদ হইতে মুক্তিলাভ করি। এইরূপে গায়ত্রীমন্ত্রে বাহিরের সহিত অন্তরের, এবং অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগসাধন করে।

ব্রহ্মকে ধ্যান করিবার এই যে প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি, ইহা যেমন উদার, তেমনি সরল। ইহা সর্ব্বপ্রকার-কৃত্রিমতা-পরিশূন্য। বাহিরের বিশ্বজগৎ এবং অন্তরের ধী, ইহা কাহাকেও কোথাও অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে হয় না—ইহা ছাড়া আমাদের আর কিছুই নাই। এই জগৎকে এবং এই বুদ্ধিকে তাঁহার অশ্রান্তশক্তি দ্বারা তিনিই অহরহ প্রেরণ করিতেছেন, এই কথা স্মরণ করিলে তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ যেমন গভীরভাবে, সমগ্রভাবে, একান্তভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়, এমন আর কোন্ কৌশলে, কোন্ আয়োজনে, কোন্ কৃত্রিম উপায়ে, কোন্ কল্পনানৈপুণ্যে হইতে পারে, তাহা আমি জানি না। ইহার মধ্যে তর্কবিতর্কের কোনো স্থান নাই, মতবাদ নাই, ব্যক্তিবিশেষগত প্রকৃতির কোনো সঙ্কীর্ণতা নাই।

আমাদের এই ব্রহ্মের ধ্যান যেরূপ সরল অথচ বিরাট্, আমাদের উপনিষদের প্রার্থনাটিও ঠিক সেইরূপ।

বিদেশীরা এবং তাঁহাদের প্রিয়ছাত্র স্বদেশীরা বলেন, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র পাপের প্রতি প্রচুর মনোযোগ করে নাই, ইহাই হিন্দুধর্ম্মের অসম্পূর্ণতা ও নিকৃষ্টতার পরিচয়। —বস্তুত ইহাই হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ। আমরা পাপপুণ্যের একেবারে মূলে গিয়াছিলাম। অনন্ত আনন্দস্বরূপের সহিত

চিত্তের সম্মিলন, ইহার প্রতিই আমাদের শাস্ত্রের সমস্ত চেষ্টা নিবদ্ধ ছিল—তাঁহাকে যথার্থভাবে পাইলে, এক কথায় সমস্ত পাপ দূর হয়, সমস্ত পুণ্য লাভ হয়। মাতাকে যদি কেবলি উপদেশ দিতে হয় যে, তুমি ছেলের কাজে অনবধান হইয়ো না, তোমাকে এই করিতে হইবে, তোমাকে এই করিতে হইবে না, তবে উপদেশের আর অন্ত থাকে না—কিন্তু যদি বলি তুমি ছেলেকে ভালবাস, তবে দ্বিতীয় কোন কথাই বলিতে হয় না, সমস্ত সরল হইয়া আসে। ফলত সেই ভালবাসা ব্যতিরেকে মাতার কর্ম্ম সম্ভবপর হইতেই পারে না। তেমনি যদি বলি, অন্তরের মধ্যে ব্রহ্মের প্রকাশ হউক, তবে পাপসম্বন্ধে আর কোনো কথাই বলিতে হয় না। পাপের দিক্ হইতে যদি দেখি, তবে জটিলতার অন্ত নাই—তাহা ছেদন করিয়া, দাহন করিয়া, নির্ম্মূল করিয়া কেমন করিয়া যে বিনাশ করিতে হয়, তাহা ভাবিয়া শেষ করা যায় না—সেদিক্ হইতে দেখিতে গেলে ধর্ম্মকে বিরাট্ বিভীষিকা করিয়া তুলিতে হয়—কিন্তু আনন্দময়ের দিক্ হইতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ কুহেলিকার মত অন্তর্হিত হয়। পাশ্চাত্য ধর্ম্মশাস্ত্রে পাপ ও পাপ হইতে মুক্তি নিরতিশয় জটিল ও নিদারুণ, মানুষের বুদ্ধি তাহাকে উত্তরোত্তর গহন করিয়া তুলিয়াছে এবং সেই বিচিত্র পাপতত্ত্বের দ্বারা ঈশ্বরকে খণ্ডিত করিয়া, দুর্গম করিয়া ধর্ম্মকে দুর্ব্বল করিয়াছে।

অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

অসৎ হইতে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও। আমাদের অভাব কেবল সত্যের অভাব, আলোকের অভাব, অমৃতের অভাব—আমাদের জীবনের সমস্ত দুঃখ, পাপ, নিরানন্দ, কেবল এইজন্যই। সত্যের, জ্যোতির, অমৃতের ঐশ্বর্য্য যিনি কিছু পাইয়াছেন, তিনিই জানেন, ইহাতে আমাদের জীবনের সমস্ত অভাবের একেবারে মূলচ্ছেদ করিয়া দেয়। যে সকল ব্যাঘাতে তাঁহার প্রকাশকে আমাদের নিকট হইতে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহাই বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে নানা দুঃখ এবং অকৃতার্থতার মধ্যে অবতীর্ণ করিয়া দেয়! সেইজন্যই আমাদের মন অসত্য, অন্ধকার ও বিনাশের আবরণ হইতে রক্ষা চাহে। যখন সে বলে আমার দুঃখ দূর কর, তখন সে শেষ পর্য্যন্ত না বুঝিলেও এই কথাই বলে—যখন সে বলে আমার দৈন্যমোচন কর, তখন সে যথার্থ কি চাহিতেছে, তাহা না জানিলেও এই কথাই বলে। যখন সে বলে আমাকে পাপ হইতে রক্ষা কর, তখনো এই কথা! সে না বুঝিয়াও বলে—

আবিরাবীর্ম্ম এধি!

হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও!

আমরা ধ্যানযোগে আমাদের অন্তর-বাহিরকে যেমন বিশ্বেশ্বরের দ্বারাই বিকীর্ণ দেখিতে চেষ্টা করিব, তেমনি আমরা প্রার্থনা করিব যে, যে সত্য, যে জ্যোতি, যে অমৃতের মধ্যে আমরা নিত্যই রহিয়াছি, তাহাকেই সচেতনভাবে জানিবার যাহা কিছু বাধা, সেই অসত্য, সেই অন্ধকার, সেই মৃত্যু যেন দূর হইয়া যায়। যাহা নাই তাহা চাই না, আমা-

দের যাহা আছে তাহাকেই পাইব, ইহাই আমাদের প্রার্থনার বিষয়,—যাহা দূরে তাহাকে সন্ধান করিব না, যাহা আমাদের ধীশক্তিতেই প্রকাশিত তাহাকেই আমরা উপলব্ধি করিব, ইহাই আমাদের ধ্যানের লক্ষ্য। আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্ম্ম এইরূপ সরল, এইরূপ উদার, এইরূপ অন্তরঙ্গ, তাহাতে স্বরচিত কল্পনাকুহকের স্পর্শ নাই।

জীবনযাত্রাসম্বন্ধেও ভারতবর্ষের উপদেশ এইরূপ সরল এবং মূলগামী। ভারতবর্ষ বলে—

সন্তোষং হৃদি সংস্থাপ্য সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।

সুখার্থী সন্তোষকে হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়া সংযত হইবেন। সুখ যিনি চান তিনি সন্তোষকে গ্রহণ করিবেন, সন্তোষ যিনি চান তিনি সংযম অভ্যাস করিবেন। এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সুখের উপায় বাহিরে নাই, তাহা অন্তরেই আছে—তাহা উপকরণজালের বিপুল জটিলতার মধ্যে নাই, তাহা সংযত চিত্তের নির্ম্মল সরলতার মধ্যে বিরাজমান। উপকরণসঞ্চয়ের আদি-অন্ত নাই, বাসনাবহ্নিতে যত আহুতি দেওয়া যায়, সমস্ত ভস্ম হইয়া ক্ষুধিতশিখা ক্রমশই বিস্তৃত হইতে থাকে, ক্রমেই সে নিজের অধিকার হইতে পরের অধিকারে যায়, তাহার লোলুপতা ক্রমেই বিশ্বের প্রতি দারুণভাব ধারণ করে। সুখকে বাহিরে কল্পনা করিয়া বিশ্বকে মৃগয়ার মৃগের মত নিষ্ঠুরবেগে তাড়না করিয়া ফিরিলে জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কেবল ছুটাছুটিই সার হয় এবং পরিণামে শিকারীর উদ্দাম অশ্ব তাহাকে কোন্ অপঘাতের মধ্যে নিক্ষেপ করে, তাহার উদ্দেশ পাওয়া যায় না।

এইরূপ উন্মত্তভাবে যখন আমরা ছুটিতে থাকি, তখন আমাদের আগ্রহের অসম্বরবেগে সমস্ত জগৎ অস্পষ্ট হইয়া যায়। আমাদের চারিদিকে পদে পদে যে সকল অযাচিত আনন্দ প্রভূত প্রাচুর্য্যের সহিত অহরহ প্রতীক্ষা করিয়া আছে, তাহাদিগকে অনায়াসেই আমরা লঙ্ঘন করিয়া, দলন করিয়া, বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাই। জগতের অক্ষয় আনন্দের ভাণ্ডারকে আমরা কেবল ছুটিতে ছুটিতেই দেখিতে পাই না। এইজন্যই ভারতবর্ষ বলিতেছেন—

সংযতো ভবেৎ

প্রবৃত্তিবেগ সংযত কর—চাঞ্চল্য দূর হইলেই সন্তোষের স্তব্ধতার মধ্যে জগতের সমস্ত বৃহৎ আনন্দগুলি আপনি প্রকাশিত হইবে। গতিবেগের প্রমত্ততাবশতই আমরা সংসারের যে-সকল স্নেহ-প্রেম-সৌন্দর্য্যকে, প্রতিদিনের শতশত মঙ্গলভাবের আদানপ্রদানকে লক্ষ্য করিতে পারি নাই, সংযত হইয়া স্থির হইয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহাদের ভিতরকার সমস্ত ঐশ্বর্য্য অতি সহজেই অবারিত হইয়া যায়।

যাহা নাই, তাহারই শিকারে বাহির হইতে হইবে, ভারতবর্ষ এ পরামর্শ দেয় না—ছুটাছুটিই যে চরম সার্থকতা, এ কথা ভারতবর্ষের নহে। যাহা অন্তরে-বাহিরে চারিদিকেই আছে, যাহা অজস্র, যাহা ধ্রুব, যাহা সহজ, ভারতবর্ষ তাহাকেই লাভ করিতে পরামর্শ দেয়,—কারণ, তাহাই সত্য, তাহাই নিত্য। যিনি অন্তরে আছেন তাঁহাকে

অন্তরেই লাভ করিতে ভারতবর্ষ বলে, যিনি বিশ্বে আছেন তাঁহাকে বিশ্বের মধ্যেই উপলব্ধি করা ভারতবর্ষের সাধনা—আমরা যে অমৃতলোকে সহজেই বাস করিতেছি, দৃষ্টির বাধা দূর করিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্যই ভারতবর্ষের প্রার্থনা—চিত্তসরোবরের যে অনাবিল অচাঞ্চল্য, যাহার নাম সন্তোষ, আনন্দের যাহা দর্পণ, তাহাকেই সমস্ত ক্ষোভ হইতে রক্ষা করা, ইহাই ভারতবর্ষের শিক্ষা। কিছু কল্পনা করা নহে, রচনা করা নহে, আহরণ করা নহে; জাগরিত হওয়া, বিকশিত হওয়া, প্রতিষ্ঠিত হওয়া,—যাহা আছে তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য অত্যন্ত সরল হওয়া। যাহা সত্য তাহা সত্য বলিয়াই আমাদের নিকটতম,—সত্য বলিয়াই তাহা দিবালোকের ন্যায় আমাদের সকলেরই প্রাপ্য, তাহা আমাদের স্বরচিত নহে বলিয়াই তাহা আমাদের পক্ষে সুগম, তাহা আমাদের সম্যক্ ধারণার অতীত বলিয়াই তাহা আমাদের চিরজীবনের আশ্রয়,—তাহার প্রতিনিধিমাত্রই তাহা অপেক্ষা সুদূর—তাহাকে আমাদের কোন আবশ্যক-বিশেষের উপযোগিরূপে, বিশেষ আয়ত্তগম্যরূপে সহজ করিতে চেষ্টা করিতে গেলেই তাহাকে কঠিন করা হয়, তাহাকে পরিত্যাগ করা হয়—অধীর হইয়া তাহাকে বাহ্যাড়ম্বরের মধ্যে খুঁজিয়া বেড়াইলে নিজের সৃষ্টিকেই খুঁজিয়া ফিরিতে হয়—এইরূপে চেষ্টার উপস্থিত উত্তেজনামাত্র লাভ করি, কিন্তু চরম সার্থকতা প্রাপ্ত হই না। আজ আমরা ভারতবর্ষের সেই উপদেশ ভুলিয়াছি, তাহার অকলঙ্ক সরলতম বিরাট্তম একনিষ্ঠ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শতধাবিভক্ত খর্ব্বতা-খণ্ডতার দুর্গম গহনমধ্যে মায়ামৃগীর অনুধাবন করিয়া ফিরিতেছি!

হে ভারতবর্ষের চিরারাধ্যতম অন্তর্যামি বিধাতৃপুরুষ, তুমি আমাদের ভারতবর্ষকে সফল কর। ভারতবর্ষের সফলতার পথ একান্ত সরল একনিষ্ঠতার পথ। তোমার মধ্যেই তাহার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, তাহার চিত্ত পরম ঐক্যলাভ করিয়া জগতের, সমাজের, জীবনের সমস্ত জটিলতার নির্ম্মল সহজ মীমাংসা করিয়াছিল। যাহা স্বার্থের, বিরোধের, সংশয়ের নানা শাখাপ্রশাখার মধ্যে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়, যাহা বিবিধের আকর্ষণে আমাদের প্রবৃত্তিকে নানা অভিমুখে বিক্ষিপ্ত করে, যাহা উপকরণের নানা জঞ্জালের মধ্যে আমাদের চেষ্টাকে নানা আকারে ভ্রাম্যমাণ করিতে থাকে, তাহা ভারতবর্ষের পন্থা নহে। ভারতবর্ষের পথ একের পথ, তাহা বাধাবিবর্জ্জিত তোমারি পথ—আমাদের বৃদ্ধ পিতামহদের পদাঙ্কচিহ্নিত সেই প্রাচীন প্রশস্ত পুরাতন সরল রাজপথ যদি পরিত্যাগ না করি, তবে কোনমতেই আমরা ব্যর্থ হইব না। জগতের মধ্যে অদ্য দারুণ দুর্গোগের দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে—চারিদিকে যুদ্ধভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে—বাণিজ্যরথ দুর্ব্বলকে ধূলির সহিত দলন করিয়া ঘর্ঘরশব্দে চারিদিকে ধাবিত হইয়াছে—স্বার্থের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রলয়গর্জ্জনে চারিদিকে পাক খাইয়া ফিরিতেছে—হে বিধাতঃ, পৃথিবীর লোক আজ তোমার সিংহাসন শূন্য মনে করিতেছে, ধর্ম্মকে অভ্যাসজনিত সংস্কারমাত্র মনে করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে যথেচ্ছাচারে

প্রবৃত্ত হইয়াছে—হে শান্তং শিবমদ্বৈতম্ এই ঝঞ্ঝাবর্ত্তে আমরা ক্ষুব্ধ হইব না, শুষ্ক-মৃত পত্ররাশির ন্যায় ইহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ধূলিধ্বজা তুলিয়া দিগ্বিদিকে ভ্রাম্যমাণ হইব না—আমরা পৃথিবীব্যাপী প্রলয়তাণ্ডবের মধ্যে একমনে একাগ্রনিষ্ঠায় এই বিপুল বিশ্বাস যেন দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া থাকি যে—

অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি,
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি !

অধর্ম্মের দ্বারা আপাতত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায়, আপাতত মঙ্গল দেখা যায়, আপাতত শত্রুরা পরাজিত হইতে থাকে, কিন্তু সমূলে বিনাশ পাইতে হয়।

একদিন নানা দুঃখ ও আঘাতে বৃহৎ শ্মশানের মধ্যে এই দুর্যোগের নিবৃত্তি হইবে—তখন যদি মানবসমাজ এই কথা বলে যে, শক্তির পূজা, ক্ষমতার মত্ততা, স্বার্থের দারুণ দুশ্চেষ্টা যখন প্রবলতম, মোহান্ধকার যখন ঘনীভূত এবং দলবদ্ধ ক্ষুধিত আত্মম্ভরিতা যখন উত্তরে-দক্ষিণে পূর্ব্বে-পশ্চিমে গর্জ্জন করিয়া ফিরিতেছিল, তখনো ভারতবর্ষ আপন ধর্ম্ম হারায় নাই, বিশ্বাস ত্যাগ করে নাই, একমাত্র নিত্যসত্যের প্রতি নিষ্ঠা স্থির রাখিয়াছিল—সকলের ঊর্দ্ধে নির্ব্বিকার একের পতাকা প্রাণপণ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়াছিল—এবং সমস্ত আলোড়ন-গর্জ্জনের মধ্যে মা ভৈঃ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলিতেছিল—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন—

একের আনন্দ, ব্রহ্মের আনন্দ, যিনি জানিয়াছেন, তিনি কিছু হইতেই ভয়প্রাপ্ত হন না—ইহাই যদি সম্ভবপর হয়, তবে ভারতবর্ষে ঋষিদের জন্ম, উপনিষদের শিক্ষা, গীতার উপদেশ, বহুশতাব্দী হইতে নানা দুঃখ ও অবমাননা, সমস্তই সার্থক হইবে—ধৈর্য্যের দ্বারা সার্থক হইবে, ধর্ম্মের দ্বারা সার্থক হইবে, ব্রহ্মের দ্বারা সার্থক হইবে—দম্ভের দ্বারা নহে, প্রতাপের দ্বারা নহে, স্বার্থসিদ্ধির দ্বারা নহে !

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

সম্রাটের প্রতিশোধ।

(ফরাসী লেখক চার্ল্-গলেট্ হইতে)

সৌম্য পাঠিকা ! নিশ্চিন্ত হও ; আমি এখন তোমাদের নিকট যাহা বলিতে যাইতেছি, তাহা নগর-অবরোধের কথা নয়, যুদ্ধবিগ্রহের কথা নয়, সম্রাট্ নেপোলিয়ান কিরূপ শান্তি-নীতি অবলম্বন করিয়া একটি রমণীর উপর প্রতিশোধ লইয়াছিলেন—ইহা তাহারই কথা।

স্ত্রীলোকটি সে-সময়কার একজন্ প্রখ্যাতা সুন্দরী ; তাঁহার এতটা রূপগর্ব্ব ছিল যে, তিনি সম্রাট্ নেপোলিয়ানের প্রতিও অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই।

এই সুন্দরীর নাম শ্রীমতী এতিয়েনেট্ বুর্গোয়্যা ; তিনি "কমেডি-ফ্রাঁসেজ"-নামক প্রখ্যাত ফরাসী থিয়েটারের উজ্জ্বলতম

নক্ষত্র ছিলেন ; এই কারণে, তাঁহার আত্মগরিমা ও গর্ব্বের পরিসীমা ছিল না। কিন্তু ইহার জন্য তাঁহাকে একবার অনুতাপ করিতে হইয়াছিল। তাহারই ইতিহাস নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

সম্রাট্ নেপোলিয়ান এই সুন্দরী অভিনেত্রীকে যে নিতান্ত ঔদাস্যের দৃষ্টিতে দেখিতেন, ঠিক এরূপ বলা যায় না ; কিন্তু এ-পর্য্যন্ত আকার-ইঙ্গিতেও তাঁহার মনোভাব কিছুমাত্র প্রকাশ পায় নাই ; কেবল একবার, তাঁহার রাজ্যের আভ্যন্তরিক বিভাগের সচিব "শ্যাপ্তাল"এর সহিত ঐ অভিনেত্রীর যে আসক্তি ছিল, সেই কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার মুখ দিয়া যে ঠাট্টা-টিট্‌কারি বাহির হয়, তাহা হইতেই তাঁহার মনোভাবের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা নিশ্চয়, শ্যাপ্তালের প্রতি তাঁহার ঈর্ষার ভাব কিছুমাত্র ছিল না, তিনি শুধু শ্যাপ্তালের প্রতি এই ভাবিয়া অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, যে স্ত্রীলোকের মানমর্য্যাদা-প্রতিপত্তির তিনিই একমাত্র কারণ, তাহার নেক্-নজরে তিনি না পড়িয়া পড়িল কিনা শ্যাপ্তাল !

একদিন ঐ সচিব, তাঁহার সম্রাটের নিকট রাজকার্য্যঘটিত কি-একটা প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, এমন সময়ে সম্রাট্ হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন ;—"ভাল কথা, শ্রীমতী বুর্গোয়্যা কেমন আছেন ?" শ্যাপ্তাল কিছু থতমত খাওয়ায় তিনি আবার বলিলেন :—"বল না হে, আমার কাছে ভাঁড়াভাঁড়ি কোরো না। আচ্ছা, সত্যি কথা বল দিকি, তোমার কি বিশ্বাস—তোমার প্রতি সে যথার্থই অনুরক্ত ?"

——"মহারাজ ! আমি তো এইরূপ আশা করি, অন্তত এইটুকু নিশ্চয় করে' বল্‌তে পারি, এ ক্ষেত্রে আমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।"

——"আর বল্‌তে হবে না। যখন বলেছ 'আমি তো এইরূপ আশা করি', তখনই বেশ বোঝা গেছে। দেখ, একনিষ্ঠাসম্বন্ধে সাধারণ স্ত্রীলোকের বড়-একটা মূল্য নাই, আর, থিয়েটারের স্ত্রীলোক, তাদের তো কোন মূল্যই থাকিতে পারে না !"

——"মহারাজের দৃষ্টি স্ত্রীলোক-সাধারণের প্রতি বড়-একটা সদয় ভাব নাই ; কিন্তু আমার বিনীত প্রার্থনা, যদি এই সাধারণ নিয়ম হ'তে একটি স্ত্রীলোককে মহারাজ বর্জ্জিত করেন"—

——"তোমার প্রাণেশ্বরীকে বুঝি ? আহা বেচারা শ্যাপ্তাল ! তোমার জন্য বড় দুঃখ হয়। এ তুমি বেশ জেনো, সে-ও অন্যেরই মত সমান অবিশ্বাসী ও চপলচিত্ত। যদি রাজকার্য্যের বাধা না থাক্‌ত, তা হ'লে আমি নিজেই সে বিষয় সপ্রমাণ করে' দিতে পার্‌তেম। কিন্তু এখন তোমার সঙ্গে আমার গুরুতর কাজের কথা আছে ; এখন ও-সব তুচ্ছ কথা থাক্। এসো, আবার রাজকার্য্যে মন দেওয়া যাক্।"

এক্ষণে সম্রাট্ আবার তাঁহার চিরাভ্যস্ত অবিচলিত-ভাব ধারণ করিয়া তাঁহার সচিবের কার্য্যবিবরণী শুনিতে লাগিলেন।

সম্রাটের সহিত রাজকার্য্যের কথা শেষ করিয়া, শ্যাপ্তাল তাঁহার প্রেয়সী শ্রীমতী বুর্গোয়্যার গৃহে গমন করিলেন ; গিয়া দেখিলেন, তিনি কাজে বড়ই ব্যস্ত। পর-

দিন সম্রাটের নিজস্ব থিয়েটারে অভিনয় করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাই অবিশ্রান্তভাবে স্বীয় বেশভূষার বিবিধ-আয়োজন-সংগ্রহে ব্যাপৃত!

যাহাই হউক, এক্ষণে উভয়ের মধ্যে অবকাশমত কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। রাজবাটীতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, শ্রীমতীর সম্বন্ধে সম্রাট্ যে-সমস্ত বেয়াদবীর কথা বলিয়াছিলেন, পোনেরো মিনিটের মধ্যে শ্রাপ্‌তালের নিকট হইতে শ্রীমতী সমস্তই অবগত হইলেন; এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিলেন:—"ও! কি দেমাক্! আমাদের সঙ্গে এইরূপ ভাবে ব্যবহার করেন যেন আমরা অধমের অধম; আর মনে করেন, তু-করে' ডাক্‌লেই বুঝি আমরা তাঁর দরজায় গিয়ে হাজির হব। সুলতান-বাহাদুর কখন যদি এখানে আসেন তো মজাটা দেখিয়ে দি। সম্রাট্—সম্রাট্—সম্রাট্‌কে আমি থোড়াই কেয়ার্ করি। তাঁর নিজের থিয়েটারে কাল আমি তো আর যাচ্চি নে।"

শ্রাপ্‌তাল উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন:—শ্রীমতি! তুমি এর ফলাফল ভাব্‌চ না। তুমি যদি না যাও, তা হ'লে যে বিদ্রোহ-অপরাধে অপরাধী হবে। তোমার সঙ্গে পূর্ব্ব হ'তে বন্দোবস্ত হয়ে আছে, আর এখন তুমি সম্রাজ্ঞীর সম্মুখে উপস্থিত হবে না। ভেবে দেখ, নিমন্ত্রণই তাঁর হুকুম—দস্তুরমত হুকুমেরই সামিল।"

——"সে তো আরো খারাপ! যা হবার তা' হবে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যাব না; আমার এক কথা বই দুই কথা নয়।"

সচিব স্বীয় প্রাণেশ্বরীর রোষশান্তির জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু, কি ভয়-প্রদর্শন, কি অনুনয়, কিছুতেই তাঁহাকে শান্ত করিতে পারিলেন না। শ্রীমতী বুর্গোঁয়ার একপ্রকার আদুরেপনার একগুঁয়েমি ছিল। আর, তিনি মনে করিতেন, সৌন্দর্য্যের রাজদণ্ড যখন তাঁহার হস্তে, অন্য রাজদণ্ড তাহার নিকট অতি তুচ্ছ!

কিন্তু তাহার পরদিন, বোনাপার্ট ইহার বিপরীত কথাটাই সপ্রমাণ করিয়া দিলেন। অবাধ্যতা-অপরাধে ধৃত করিয়া পরদিবসই তাঁহাকে কারাগারে পাঠাইয়া দিলেন। কারাগারে গিয়া শ্রীমতী বুঝিলেন, তিনি যে-সমস্ত বিষয়ে অভিমান রাখেন, তাহা নিতান্তই শূন্যগর্ভ।

এই প্রতিশোধ লইবার পর, আবার অন্যপ্রকার প্রতিশোধের উদ্যোগ চলিতে লাগিল। কেন না, শ্রীমতীর সেই প্রতিজ্ঞার কথা সম্রাটের কাণে আসিয়াছিল। তাই, সম্রাট্ একদিকে যেমন অভিনেত্রীর হিসাবে তাঁহাকে দণ্ডিত করিয়াছিলেন, অন্যদিকে রমণীর হিসাবেও তাঁহাকে আবার শাসিত করিবেন, সঙ্কল্প করিলেন।

কিন্তু এ কাজটি তেমন সহজ নহে; কেন না, ইহাতে শ্রীমতীর সম্মতি নিতান্তই আবশ্যক; এবং ইতিপূর্ব্বে যেরূপ নির্দ্দয়-ভাবে তাঁহাকে কারাবদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি যে সহজে তাঁহার সম্মতি পাইবেন, তাহারও বড়-একটা সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এই সকল বাধাবিঘ্ন সেই স্বেচ্ছাচারী সম্রাট্‌কে নিরুৎসাহ করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত এই কার্য্যসাধনে তাঁহাকে আরো উত্তেজিত করিল। তিনি প্রতি-

শোধের একটা ফন্দি মনে মনে ঠাওরাইলেন; এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত, সেই সময়ের সর্ব্বপ্রধান নীতিকৌশলী চতুরচূড়ামণি 'ট্যালেরাঁ'র (Talleyrand) উপর ভার দিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

একদিন শুভমুহূর্ত্তে, ট্যালেরাঁ সেই মনোমোহিনী অভিনেত্রীর নিকট উপস্থিত হইলেন। এবং যেন তাঁহার নিজেরই স্বার্থের জন্য আসিয়াছেন, এই ভাবে চাটুকারের ন্যায় শ্রীমতীর নিকট নানাপ্রকার মন-জোগানো কথা বলিতে লাগিলেন এবং ভক্তের ন্যায় যত্ন দেখাইয়া বিধিমতে তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করিলেন।

এইরূপে ট্যালেরাঁ যখন দেখিলেন, জমিটি বেশ প্রস্তুত হইয়াছে, তখন সেই প্রখ্যাত সম্রাট্-কঞ্চুকী শ্রীমতীর মন বুঝিবার জন্য, সম্রাটের গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন;—তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার যশ-কীর্ত্তির কথা সবিস্তারে বলিতে লাগিলেন; পরে থিয়েটারের কথা পাড়িয়া বলিলেন, 'থিয়েটারের রমণীরা সেই বীরপুরুষের একটি কটাক্ষলাভের জন্য কি উন্মত্ত!'

তাঁহার কথার মাঝখানেই শ্রীমতী বলিয়া উঠিলেন:—"হুজুর! মাপ করবেন, আমার সঙ্গিনীরা উন্মত্ত হতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে আমার কোন সংস্রব নেই, তাদের এইরূপ ব্যবহার আমি কিছুতেই মার্জ্জনা কর্‌তে পারি নে। আমার নিজের সম্বন্ধে আমি সাহস করে' বল্‌তে পারি, আপনার কসিকা-নিবাসীর—কি দৃষ্টি, কি মূর্ত্তি—কিছুই আমাকে এ-পর্য্যন্ত মুগ্ধ কর্‌তে পারে নি।"

——"এখন সমস্ত বুঝ্‌তে পার্‌লেম। সম্রাট্ যে তোমাকে ভালবাসেন, তোমার এই ঔদাস্যই তার কারণ।"

——"হাঁ, কিন্তু সম্রাট্-বাহাদুরের ভালবাসার ধরণটি ভারি অদ্ভুতরকমের—তিনি যাকে ভালবাসেন, তাকে তিনি সাধারণ অপরাধীর মত কারাগারে পাঠিয়ে দেন।"

——"তার কারণ, বোনাপার্ট ঈর্ষার আগুনে জ্বল্‌চেন; আর, জানই তো, ঈর্ষার বশে লোকে অন্ধ হয়ে কি না করে। তোমার প্রতি আর-একজনের ভালবাসা সন্দেহ করে' তিনি তোমাকে শাসন করেছিলেন।"

——"আর-একজন আবার কে?—কার উপর আমার ভালবাসা? হুজুর! খুলে বলুন—খুলে বলুন।"

——"আবার কে?—সেই ভাগ্যবান্ পুরুষ, যে তোমার মন হরণ করেছে—সেই শ্রাপ্‌তালের উপর তোমার ভালবাসা—না, ও-সব কথায় আর কাজ নেই—এখন অন্য কথা কওয়া যাক্। আমি একজনের হয়ে কেন মিছে বল্‌তে যাই, বিশেষ যখন সে আমার উপর বল্‌বার কোন ভার দেয় নি।"

ট্যালেরাঁ ভাবিলেন, একবারের পক্ষে যথেষ্ট বলা হইয়াছে; শ্রীমতীর চিন্তাপ্রবাহের পথ মুক্ত রাখাই এস্থলে সুপরামর্শ।

ইহার পর, যে-সব কথাবার্ত্তা হইল, তাহার মধ্যে চতুরচূড়ামণি সম্রাটের আর কোন কথা পাড়িলেন না; কেবল কথায়-কথায় একবার জানাইয়া দিলেন যে, "রোজিন্"এর ভূমিকা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সম্রাট্ শ্রীমতী মার্স্‌কে নিজের "মাল-মেজোঁ"-থিয়েটারে আহ্বান করিয়াছেন।

এই কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়া শ্রীমতী বলিলেন :—"বটে! তিনি কি রাজি হয়েছেন ?"

——"রাজি হবেন না কেন? রোজিনের সাজে তাঁকে বেশ মানায়; আর তিনি রাজদরবারে অভিনয় কর্‌বেন, এতে দুঃখিত হবার তো কোন কারণ নাই।"

অভিনয়ের পরদিন, ট্যালের্‌াঁ শ্রীমতী বুর্গোয়্যাঁর নিকটে গিয়া জানাইয়া আসিলেন, "তাঁহার স্থলাভিষিক্তা অভিনেত্রীর অভিনয় খুব উৎরাইয়া গিয়াছে। আর, সম্রাট্ অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া, আবার সেই নাটকের অভিনয় দেখিবেন, এইরূপ আদেশ করিয়াছেন। রাজদরবারে এখন শ্রীমতী মার্সের্‌ যে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি হইয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই!"—এই কথা শুনিয়া শ্রীমতী অর্থসূচক একটা মুখভঙ্গী করিলেন।

ইহার পর যখন আবার শুনিলেন, শ্রীমতী মার্স সম্রাট্-সম্রাজ্ঞীর কতটা প্রিয় হইয়াছেন, তখন শ্রীমতী বুর্গোয়্যাঁর মনের অবস্থা আরো খারাপ হইয়া উঠিল।

একদিন ট্যালের্‌াঁ শ্রীমতীর নিকট গিয়া বলিলেন :—"তোমার সখী সম্রাটের নিজস্ব থিয়েটারে খুব বাহবা পাচ্চেন। এখন যদি তাঁর তেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে, তা হ'লে তিনি ইচ্ছা কর্‌লে, কালই সম্রাট্‌কে তাঁর পদানত কর্‌তে পারেন। সম্রাট্-বাহাদুর আজকাল ক্রমাগত তাঁর চোখের প্রশংসা কর্‌চেন।"

শ্রীমতী বুর্গোয়্যাঁ নাক শিঁট্‌কাইয়া বলিলেন :—"সত্যি নাকি?—'আমার সখী' তবে পাষাণকেও গলিয়েচেন? আমি মনে কর্‌তেম, এরূপ অলৌকিক কাণ্ড অসম্ভব।"

শ্রীমতী মর্ম্মাহত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া সেই প্রখ্যাত কৌশলী আবার আরম্ভ করিলেন :—"এটা যে অসম্ভব নয়, সর্ব্বাগ্রে তোমারই তা' বোঝ্‌বার কথা।"

——"আমার বোঝ্‌বার কথা?—আমি কি করে' বুঝ্‌ব?"

——"তা না তো কি, মাসখানেক পূর্ব্বে সম্রাট্ তোমার জন্যই তো প্রথমে উন্মত্ত হন।"

শ্রীমতী বুর্গোয়্যাঁ মুখ আঁধার করিয়া বলিলেন :—"আমার বোঝ্‌বার কথা?—হুজুর! আপনি উপহাস কর্‌চেন। আমি যদি একটু চেষ্টা কর্‌তেম, তা' হলে হয় তো..... কিন্তু আমি সে প্রলোভনে কখনই পড়ি নি।"

——"ওগো বলি শোনো, চেষ্টা না করে' বড়ই ভুল করেচ। কেন না, তা হ'লে এতদিনে বোনাপার্টের হৃদয়ে তুমিই রাজত্ব কর্‌তে; আর, তাঁর আশ্রয়ে থাক্‌লে, 'কমেডি-ফ্রাঁসেজ'-থিয়েটারে তুমি সর্ব্বে-সর্ব্বা হ'তে পার্‌তে।"

——"আপনি কি তবে মনে করেন, আমি যদি ইচ্ছা করি, আজই সে স্থান অধিকার কর্‌তে পারি নে?"

——"আজকাল শ্রীমতী মার্সের্‌ ভাগ্য-নক্ষত্র উদয় হয়ে তোমার নক্ষত্রকে সর্ব্বগ্রাস করেছে।"

——"হুজুর! আজ দেখ্‌ছি আমার সম্বন্ধে আপনি খোস-মেজাজে নেই।"

——"সুন্দরি! এম্বলে আমার কথা হচ্চে না; আমি তো তোমার একজন ভক্তের মধ্যেই গণ্য—এখন নেপোলিয়ানের কথা হচ্চে। বলি, তুমি কি শুন্‌তে চাও, কাল সেই রোজিন্‌কে দেখে সম্রাট্ আমার সাম্‌নে কি বলেচেন?"

——"হাঁ, বলুন না।"

——"তা হ'লে তুমি যে বেয়াদবী মনে কর্‌বে।"

——"বরং আপনার অকপট ভাব দেখে আমি আরো খুসী হব।"

——"তবে বল্‌চি শোনো;—সম্রাট্ অতি কোমল স্বরে তাকে বল্লেন :—"যতই তোমার অভিনয় দেখি, ততই আমার মনে হয়, শ্রীমতী বুর্গোয়্যাঁকে যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার ভাল লেগেছিল, সেটা আমার পক্ষে অমার্জ্জনীয়।"

——"সত্যি?.....তাতে 'আমার সখী' কি উত্তর কর্‌লেন?"

——"তিনি উত্তর আর কি কর্‌বেন, ঐ প্রশংসায় তিনি একেবারে ঢলে' পড়্‌লেন।"

——"রঙ্গিণী আর কি!.....যদি রোজিনের জায়গাটা আমি নিতেম, তা হ'লে কি সে অত জারিজুরি কর্‌তে পার্‌তো?—আমি ছেড়ে দিলেম বলেই না সে ঐ জায়গাটা সহজে পেলে।"

——"আমারও তো তাই মনে হয়। 'রোজিন্' সেজে সে যে বাহবা পাচ্চে, সে তার নিজের গুণে নয়। তবে, সে যে বাহবা পাচ্চে, সেটা সত্যি।"

——"আমি ইচ্ছে কর্‌লে তার জারিজুরি এখুনি ভেঙে দিতে পারি—যতদিন আমার সে ইচ্ছে না হচ্চে, ততদিন সে বাহবা পাক্!"

——"আমি বলি, সে ইচ্ছেটা তোমার এখনি হোক্ না কেন। বুঝ্‌চ না, এই অপমানে তোমার যে পসার নষ্ট হচ্চে।"

শ্রীমতী একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন :—"আচ্ছা, আমি রাজি। দেখা যাক্, শ্রীমতী মার্সের্‌ কতটা ক্ষমতা। কিন্তু দেখুন, আপনি এ-সব কথা শ্যাপ্‌তালের কাছে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ কর্‌বেন না। আর, আমার বিষয় সম্রাটের কাছে যদি কিছু বল্‌তে হয়, তাঁর উপরে আমার যে বিদ্বেষ-ভাব আছে, সে কথা যেন তাঁকে কিছুমাত্র বলা না হয়।"

ট্যালের্‌াঁ তাহার অনুকূলে সমস্ত নীতি-কৌশল প্রয়োগ করিবেন বলিয়া শ্রীমতীর নিকট অঙ্গীকার করিলেন। সপ্তাহ অতীত না হইতে হইতেই তিনি উৎফুল্লমুখে তাঁহার নিকট আবার আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন :—"তোমার নাম করে' একটু আশা-উৎসাহের কথা বল্‌বামাত্রই শ্রীমতী মার্সের্‌ 'পরে নেপোলিয়ানের যে একটু মন ভিজেছিল, সেটা তৎক্ষণাৎ শুকিয়ে গেল। তাঁর প্রতি তুমি অনুকূল, এই কথা শুনে তিনি এত আনন্দিত হলেন যে, কি বলে' যে তোমাকে ধন্যবাদ দেবেন, সেটা ভেবেই পেলেন না।"

প্রত্যাশিত সুখের আস্বাদ পেলে রমণীর কণ্ঠস্বর যেরূপ হইয়া থাকে, সেই কণ্ঠস্বরে শ্রীমতী বলিলেন :—"সম্রাট্-বাহাদুরের খুব অনুগ্রহ।"

ট্যালের্‌াঁ আবার আরম্ভ করিলেন :—"সম্রাট্ শেষে এই কথা বল্লেন, 'আমার হয়ে শ্রীমতী বুর্গোয়্যাঁকে ধন্যবাদ দেবে, আর তাঁকে

জানাবে, "কমেডি-ফ্রাঁসেজ"-থিয়েটারে আমি তাঁর পঁচিশহাজার টাকা বেতন স্থির করে' দেব; তাঁর থাক্‌বার জন্য একটা বাড়ী দেব; আর সেই বাড়ী সাজাবার জন্য আরো পঞ্চাশহাজার টাকা নগদ দেব।"

এত সহজে তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইবে, শ্রীমতী তাহা ভাবেন নাই, তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। ভাবিলেন, দেখি যদি আরো কিছু মোড় দিয়া আদায় করিতে পারি। তাই, ট্যালের্‌াঁর কথা শেষ না হইতে হইতেই শ্রীমতী বলিলেন:—"আমাকে বিবেচনা করতে একটু সময় দিন। আপনার সম্রাট্ চিরকালই সমান; তিনি মনে করেন, একটু অনুগ্রহ দেখালেই অম্‌নি বুঝি লোকে তাঁর পায়ে এসে গড়িয়ে পড়্‌বে।"

ট্যালের্‌াঁ আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন:—'আর যদি শ্রীমতী ইতস্তত করেন দেখ, তা হ'লে তাঁকে বল্‌বে, তাঁর জন্য দশ-লক্ষ টাকার বার্ষিক অবসর-বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করে' দিয়ে তাঁকে আমি ডচেশ্-উপাধি দেব।' অভিনেত্রীর মুখ এইবার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল;—সে বলিল:—"ডচেশ্!—আমি ডচেশ্ হব?"

——"যদি আজ সন্ধ্যার সময় অনুগ্রহ করে' সম্রাট্-বাহাদুরের প্রাসাদে যাও, তা হ'লে সম্রাট্ আজ আহ্লাদের সহিত ডচেশ্-উপাধির দানপত্র স্বয়ং এসে তোমার হাতে দেবেন।"

শ্রীমতী রাজকীয় মহিমা ও গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়া সগর্ব্বে বলিলেন:—"আচ্ছা, আমি সম্মত হলেম।"

——"আচ্ছা, আজ তবে সন্ধ্যার সময় সম্রাটের গাড়ি হাজির হয়ে শ্রীমতী ডচেশের আদেশ প্রতীক্ষা কর্‌বে।" এই কথা বলিয়া ট্যালের্‌াঁ অভিনেত্রীর হস্তচুম্বন করিয়া হাস্যোদ্দীপক-গাম্ভীর্য্য-সহকারে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীমতী আজ কি করিয়া বিশ্ববিজয়িনী—বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তিতে সম্রাট্‌কে দেখা দিবেন, এই চিন্তায়, এই উদ্যোগ-আয়োজনে দিবসের অবশিষ্টভাগ উৎসর্গ করিলেন। প্রথমে সুগন্ধি-জলের চৌবাচ্ছায় অবগাহন করিলেন; পরে, পরিধেয় বসনাদি ও 'চিকণ চিকুর' সুবাসিত করিয়া বেশবিন্যাস আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পরিচারিকা খোঁপা বাঁধিতে লাগিল। দুই-দুই-বার বদ্‌লাইয়া এক ধাঁচার খোঁপা অবশেষে তাঁহার পছন্দ হইল। অনেকক্ষণ ভাবিয়া পরে দীর্ঘ-লম্বিত একজোড়া দুল কাণে দুলাইলেন। দশবার বদ্‌লাইয়া তবে একটি মনোমত সাটিনের পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। দেহের গঠন পরিস্ফুট করিয়া, উপরের অর্দ্ধ-ভাগ খোলা রাখিয়া, আঁটা-সাঁটা সেলুকা পরিলেন। তাঁহার অনিন্দ্যসুন্দর শুভ্র স্কন্ধের উপর দিয়া আজানুলম্বিত একটি কালো রঙের ওড়না ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর, আয়নার সম্মুখে আসিয়া প্রফুল্ল-নয়নে আপনাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে আপনার রূপে আপনিই মোহিত হইলেন; আর পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—"এখন বল্ দেখি, তোর কি মনে হয়, আমার এই সাজসজ্জায় আমাদের 'ক্ষুদে-সর্দ্দার'-এর * মন ভুল্‌বে?"

* নেপোলিয়ানের নিজ সৈন্যমধ্যে 'পেটি কর্পোর‍্যাল্' অর্থাৎ 'ক্ষুদে সর্দ্দার' এই আদুরে নাম প্রচলিত ছিল।

ঠিক আট-ঘটিকার সময় শাদা-চার-ঘোড়ার একটা জাঁকাল গাড়ি শ্রীমতীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। অভিনেত্রী ছুটিয়া-আসিয়া তাহাতে বসিয়া পড়িলেন; এবং অনতিবিলম্বেই 'সম্মানে'র সোপান দিয়া প্রাসাদের উপর উঠিতে লাগিলেন; "মার্‌শাঁ"-নামক সম্রাটের একজন পরিচারক আগে-আগে পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিল।

পরিচারক যে ঘরটিতে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বসাইল, তাহার সাজসজ্জা দেখিয়া তিনি অবাক্ হইলেন। আস্‌বাবের মধ্যে, একটি ঝাড়, একখানি কৌচ, আর একটি ছোট গোল টেবিল্—এইমাত্র।

কিন্তু সেই ভাবী ডচেশ্ নিজ পদ-গৌরবের সুখস্বপ্নে এম্‌নি নিমগ্ন ছিলেন যে, এই সব খুটিনাটি তাঁর মনে বড়-একটা স্থান পাইল না। তিনি সেই কৌচখানিতে যথাসম্ভব জুৎ করিয়া বসিয়া কল্পনার দোলায় মনকে দোলাইতে লাগিলেন।

এইভাবে সওয়া-ঘণ্টা-কাল কাটিয়া গেল। তখন তাঁহার মনে হইল, সম্রাট্ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যথেষ্ট আয়োজন করেন নাই। তথাপি এখনও তাঁহার আশা যায় নাই। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, সম্রাট্ এখনি আসিবেন। আরো সওয়া-ঘণ্টা-কাল তাঁহার পথ চাহিয়া রহিলেন। তথাপি সম্রাটের দেখা নাই। সম্রাটের এই 'খাতির-নদারদ্' ভাব দেখিয়া তিনি আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিলেন না। শ্রীমতী অধীর হইয়া হাত-ঘণ্টা বাজাইয়া দিলেন। সম্রাটের পরিচারক মার্শাঁ আসিয়া উপস্থিত হইল।

——"শ্রীমতীর কি আদেশ?"—বিনীতভাবে পরিচারক জিজ্ঞাসা করিল।

——"নিশ্চয়ই সম্রাট্ এখনও জান্‌তে পারেন নি যে, আমি এসেছি?"

——"শ্রীমতী আমাকে মার্জ্জনা কর্‌বেন, সম্রাট্ দুইজন জাঁদ্রেলের সঙ্গে এখন কথা কচ্চেন।"

——"একবার তাঁকে মনে করিয়ে দেবে কি, আমি তাঁরই আদেশমত এখানে এসেছি। তাঁর দর্শন পাবার আমারও অধিকার আছে।"

——"শ্রীমতি, আমি এখনি তাঁকে গিয়ে বল্‌চি।"

বিশ মিনিট্—সে বিশ মিনিট্ যেন ফুরায় না—এই ভাবে চলিয়া গেল। তথাপি কোন উত্তর নাই। শ্রীমতীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। আবার তিনি হাত-ঘণ্টাটা সজোরে ঝাঁকাইয়া দিলেন।

প্রশান্তমুখে পরিচারক আবার আসিয়া দেখা দিল।

——"কৈ?—সম্রাট্?"—কম্পিতস্বরে অভিনেত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন।

——"শ্রীমতি, সম্রাটের নিকট আমি গিয়াছিলাম।"

——"তিনি কি উত্তর দিলেন?"

——"তিনি আপনাকে একটুখানি সবুর কর্‌তে বল্লেন।"

——"একটুখানি?—আমি যে দু'-ঘণ্টা ধরে' এই পচা এঁদো ঘরে হাঁপিয়ে মর্‌চি। সম্রাট্‌কে বল, আমি এখনি তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে চাই।"

এবার পরিচারক অল্পসময়ের মধ্যেই

ফিরিয়া আসিল। কিন্তু শ্রীমতী দেখিলেন, তার মুখে নৈরাশ্য প্রকটিত। দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া সে বলিল :—"শ্রীমতি, কি আর বল্‌ব—"

——"কি খবর ?—বল না গো।"

——"আমার ভয় হচ্ছে, পাছে আপনি রাগ করেন।"

——"বল বল, যাই হোক্ না, আমি শোন্‌বার জন্য প্রস্তুত আছি।"

——"আমি তাঁকে যখন জানালেম, আপনি আর সবুর কর্‌তে পার্‌চেন না, তখন সম্রাট্‌-বাহাদুর আমাকে বল্লেন :—'দেখ মার্‌শা, শ্রীমতী বুর্গোয়্যাকে আমার অভিবাদন দিও,আর এই কথা বোলো,তিনি যদি আর অপেক্ষা কর্‌তে না পারেন, আমি অনুমতি দিচ্ছি, তিনি যেতে পারেন।'"

শ্রীমতী ক্রোধান্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন :—"কি অহঙ্কার! দেখ মার্শা, (সম্রাটের স্বর নকল করিয়া) নারীসম্মানজ্ঞ তোমার প্রভুকে আমার প্রত্যভিবাদন দিও, আর তাঁকে এই কথা বোলো,তাঁর অনুমতিক্রমে আমি যাচ্চি—তিনিও আমার হৃদয় হ'তে জন্মের মত গেলেন জান্‌বে।"

এই ক্রোধরঞ্জিত কথাগুলি বলিয়া—যে গাড়িতে আসিয়াছিলেন, সেই গাড়িতেই আবার আরোহণ করিয়া, মর্ম্মাহতা অপমানিতা শ্রীমতী বুর্গোয়্যা স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। যে সময়ে শ্রীমতী গাড়ির পা-দানে পা দিলেন, ঠিক সেই সময়ে ট্যালেরাঁ নষ্টামি করিয়া প্রাসাদের একটা গবাক্ষ হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন :—"সেলাম পৌঁছে শ্রীমতী ডচেশ্‌-বাহাদুর!—আর ডিউক্‌-বাহাদুর শ্যাপ্‌তালকেও আমার বহুৎ-বহুৎ সেলাম!"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস।

আমাদের দেশের প্রতি পল্লীতে ভদ্র ও চাষা, বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও সামান্য দোকানদার, পাঁচশত বৎসর যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়িয়া আসিতেছে, সেই রামায়ণে বাল্মীকিপ্রণীত আদি-মহাকাব্যের রসলহরী কতদূর অনূদিত হইয়াছে, তাহা বিচার্য্য। কৃত্তিবাস নিজে সংস্কৃতজ্ঞ প্রতিভাশালী পণ্ডিত ছিলেন, তিনি ভাষায় অনুবাদ করিতে যাইয়া আদিকবির পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু কৃত্তিবাসের আদৎ পাণ্ডুলিপি দুষ্প্রাপ্য। পরিষৎ প্রাচীন কয়েকখানি পুঁথি অবলম্বন করিয়া যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রকাশ করিতেছেন,তৎসম্পাদক মহাশয় অবশ্য দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারিবেন না যে, সেখানি ঠিক কৃত্তিবাস-প্রণীত রামায়ণেরই সংস্করণ। কৃত্তিবাস কি লিখিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে বর্ত্তমান বটতলার প্রকাশিত

কৃত্তিবাসীরামায়ণাখ্য কাব্যের অনেকাংশ যে কৃত্তিবাসের রচনা, তাহা সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ দেখা যায় না। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া আমাদের দেশীয়গণ এপর্য্যন্ত যে গ্রন্থ বুঝিয়া আসিয়াছেন, আমরা তাহারই প্রসঙ্গ এই প্রবন্ধে লিখিব। যে অনুবাদ আক্ষরিক, অল্পসংখ্যক বিশেষজ্ঞের প্রশংসিত হইলেও তাহা সর্ব্বসাধারণের গ্রাহ্য নহে। অনুবাদপুস্তক আপামর সাধারণের উপযোগী করিতে হইলে, তাহা অনেকটা দেশীয় আদর্শের ছাঁচে গড়িতে হইবে। রামায়ণ ও মহাভারত বঙ্গদেশের জন্য আমরা কতকটা নূতনভাবে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছি। হিন্দুস্থানের জন্য সুকবি তুলসীদাস একখানি রামায়ণ লিখিয়াছেন। এইরূপ প্রাদেশিক রামায়ণের সঙ্গে আদিকাব্যের কতটা সংস্রব, তাহাই আজ বিবেচ্য।

আমাদের দেশের চিরন্তন খ্যাতি কিংবা অখ্যাতি এই যে, বাঙালী যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য ততদূর প্রস্তুত নহে। এ কথা শুনিয়া কোন স্বদেশভক্ত মহোদয় যদি বাঙালী বিজয়সেনের সিংহলবিজয়ের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করেন কিংবা লেফ্‌টেনেণ্ট সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের কীর্ত্তিকীর্ত্তনে ব্যাপৃত হন, তথাপি এই সংস্কার অপনোদিত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের দেশের দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের মূর্ত্তি একবার অনুধাবন করুন। বঙ্গীয় কুম্ভকারশিল্পিগণ তাঁহাকে একটি ননীর পুতুল করিয়া গড়িয়া থাকেন,—তাঁহার মাথায় একরাশ সুবিন্যস্ত চুলের সংস্তর, বাবুর বেশ এবং তাঁহার বাহন সুপুচ্ছ শিখিবর। এই ফুলবাবুটির পূজা ও কদর্য্যস্থানেই বিশেষরূপে হইয়া থাকে। আমরা অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইয়া যোদ্ধাকে ফুলকোঁচা পরাইয়া নিরস্ত হই। আমাদের দেশে মহিষমর্দ্দিনী বিগ্রহেরও কম লাঞ্ছনা হয় নাই,—যিনি শূলহস্তে মহিষাসুরের প্রাণবধ করিতেছেন, তাঁহার আকর্ণবিস্তৃত প্রফুল্ল চক্ষু এবং বিম্বাধরে মধুরহাসির ঔজ্জ্বল্য খেলিতেছে। যেমন শিল্পে, তেমনই সাহিত্যে, এদেশে বীররসের দুর্গতি সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ হয়। জয়ানন্দের চণ্ডীতে দেখা যায়, ভগবতী ভগ্নকর যুদ্ধে মঙ্গলদৈত্যকে বিনাশ করিয়া অতিশয় পরিশ্রান্তা হইয়া সহচরীর নিকট একটি পান ও পাখা চাহিতেছেন; ঢেঁকিতে পাড় দিয়া গৃহস্থবধূর যে অবস্থা, পরিশ্রান্ত স্ত্রীলোকের তদপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ কল্পনা করিবার সুবিধা এদেশের কবি কোথায় পাইবেন! এই ফুলসম কোমল আব্‌হাওয়ার গুণে উইলিয়ম্‌দুর্গ নিকুঞ্জবনে পরিণত না হইলেই যথেষ্ট।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, রামায়ণের অনুবাদ এই দেশের রুচি ও আদর্শের উপযোগী করা হইয়াছে এবং তজ্জন্যই ইহা পল্লীতে পল্লীতে আদৃত হইয়া বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। আমরা দেখাইব, রামায়ণরূপ হিমাচলের উপর এই যাদুরাজ্যের মলয়সমীরণ প্রবাহিত হইয়া ইহার গৌরব কোথায় উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে,—অনুবাদে উহা যেন হিমগিরির একটি ছোটখাট ফুলতরুর মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাল্মীকির সময় হইতে কৃত্তিবাসের সময় অনেকটা দূরবর্ত্তী। এই সময়ের মধ্যে হিন্দু-

গণ আপনাদের শৌর্য্যবীর্য্য হারাইয়া নিতান্ত দীনতাপ্রাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে প্রমাণিত আছে। আমরা বাঙালী, অন্যান্যপ্রদেশবাসী অপেক্ষাও অধিকতর কোমল ও ক্ষীণজীবী হইয়া পড়িয়াছি; সুতরাং বাল্মীকির মহাকাব্যের যদি প্রকৃত অনুবাদ হইত, তাহা হইলে এদেশের সর্ব্বসাধারণে তাহার রস উপভোগ করিতে সমর্থ হইতেন না। এই বৈষম্য কৃত্তিবাসে ও বাল্মীকিতে ততটা নহে, যতটা এই দুই যুগের লোক-চরিত্রে,—আমরা যাঁহাদের বংশধর, তাঁহাদের সঙ্গে যতটা আমাদের।

প্রথমত রামচরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে এ বিষয়টা ভাল করিয়া বোঝা যাইবে। রামায়ণে রামের যে বর্ণনা আছে, তাহা পাঠ করিলে, Francesco Bartolozzi র অঙ্কিত এপোলো, জুপিটার্ কিংবা তদ্রূপ কোন গ্রীক্ দেবতার চিত্রের কথা মনে পড়িবে। রাম বিপুলাংশ—অংশ অর্থে ভুজশীর্ষ। তিনি মহোরস্ক এবং মহেষ্বাস। তাঁহার আর-একটি বিশেষণ গূঢ়জত্রু, অর্থ—বিপুল মাংসের দ্বারা অংশ ও বক্ষের সন্ধিগত অস্থিদ্বয় সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত। কম্বুগ্রীব অর্থাৎ মাংসলগ্রীবা রেখাত্রয়বিশিষ্ট, 'সমঃ সমবিভক্তাঙ্গঃ' অর্থাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব (Symmetrical) । সুগ্রীব, সুললাট, আজানুলম্বিত-বাহু এবং পীনবক্ষা। ইহাই সেই সময়ের পুরুষের আদর্শ রূপ। ইহারাই আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়াছিলেন, শৌর্য্যবলে জগতে অত্যদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কৌশল্যা যখন রামের বনবাস উপলক্ষে বিলাপ করিতেছেন, তখন তাঁহার বিবিধ আক্ষেপোক্তির মধ্যে আমরা শুনিতে পাই, যে রাম চর্ম্মাচ্ছাদনশোভী সুকোমল উপাধানের উপর শির রক্ষা করিয়া শয়ন করিতে অভ্যস্ত, তিনি স্বীয় পরিঘ-(লৌহমুখ মুদ্গর)-সঙ্কাশ বাহুর উপর শির রক্ষা করিয়া কিরূপে নিদ্রাসুখ লাভ করিবেন। কৃত্তিবাসী রামের বাহু পল্লবকোমল, তাহার সঙ্গে লৌহমুখ মুদ্গরের উপমা কখনই প্রত্যাশা করা যায় না। ভরত যখন ইঙ্গুদী-মূলে রামের তৃণশয্যা দেখিতে পাইলেন, তখন বলিলেন, 'এখানে নিশ্চয়ই রাম শয়ন করিয়াছিলেন, এই স্থানের কঠিন মৃত্তিকা ও তৃণরাশি তাঁহার অঙ্গপীড়নে পিষ্ট হইয়া রহিয়াছে।' আভরণময়ী সীতাদেবী যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন, সে স্থানে তাঁহার অঞ্চলবিক্ষিপ্ত স্বর্ণচূর্ণ তৃণের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে, ভরত তাহা বুঝিতে পারিলেন। কৃত্তিবাস সেই স্বর্ণচূর্ণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু রামের শরীরনিষ্পেষণে কঠিন ভূমি ও তৃণরাশি পিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এ কথা উল্লেখ করিতে তাঁহার সাহসে কুলায় নাই। রামের অঙ্গলিপ্ত চন্দনকে বাল্মীকি বারাহরুধিরাভ বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন; আমাদের রুচি এখন অতি মৃদু হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং রুধিরের উপমায় শিহরিত হইয়া উঠি। তৎপরে রামের তাম্রাক্ষ ও নীল মূর্দ্ধজের উল্লেখ দেখিতে পাই। তাম্রাক্ষ অর্থে যদি তামাটে চোখ ও নীলমূর্দ্ধজ অর্থে কটা চুল হয়, তবে কাবলিওয়ালার সঙ্গেই আমাদের অপেক্ষা রামচন্দ্রের বেশি নৈকট্য প্রতিপন্ন হইবে। ইহা এখন আদর্শ রূপ বলিতে গেলে বঙ্গীয় জনসাধারণ তাহা কখনই গ্রাহ্য

করিতে প্রস্তুত হইবে না। এদেশের আব্-হাওয়ায় আমাদের ঢের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কাবুলের বেদানা এখানে জন্মাইতে চেষ্টা করিলে, তাহার বংশধর ক্রমে টোকো ডালিমে দাঁড়াইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কবি মুকুন্দরামের বড় সাহস ছিল, তাই তিনি স্বীয় কাব্যনায়ক কালকেতু-ব্যাধের রূপবর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখিতে পারিয়াছিলেন, তাহার "দুই বাহু লোহার সাবল"। কিন্তু ব্যাধপুত্রের সম্বন্ধে যাহা প্রয়োগ করিয়াছেন, সাধুর পুত্রসম্বন্ধে তাহা লিখিতে পারেন নাই। কাঞ্চীপুরবাসী গুণসিন্ধু-রাজপুত্র সুন্দরই আমাদিগের কাব্যগুলির প্রকৃত নায়ক—পুরুষজাতির আদর্শ রূপ; তাহার ঈষৎ গোঁফের রেখার সঙ্গে চঞ্চল খঞ্জনলোচনের প্রকৃত সমাহার হইয়াছে।

কিন্তু এই যে মহোরস্ক, গূঢ়জত্রু, অরিন্দম রামচন্দ্র, ইঁহাকে কৃত্তিবাস কি করিয়া ফেলিয়াছেন, দেখা যাক্। তিনি লঙ্কাকাণ্ডে চাঁপানাগেশ্বর জটায় বান্ধিয়া যুদ্ধ করিতেছেন। তাঁহার ভুজ সুললিত এবং শৈশবে "নবনী জিনিয়া দেহ অতি সুকোমল।" বনবাসকালেও তাঁহার "চাঁচর চিকুর রক্ত ওষ্ঠাধর" এবং "মুখ সুধাংশুলাঞ্ছন"। রাম শৈশবে যখন মৃগয়া করিতেন, তখন "ফুলধনু রাম বেড়ান কাননে," এবং কখন "বনপুষ্পভূষিত ধনু রামের হাতে"। এখানে ফিরিয়া-ফিরিয়া সেই মদন-মন্মথ-মারেরই অভিনয়।

তাহার পর শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি মূল কাব্যের যে সকল নৈতিক গুণ আরোপিত হইয়াছে, তাহার কঠোরতা একান্ত মৃদু বাঙালীর চক্ষে কতকটা দুর্নিরীক্ষ্য। রাম ক্রোধে কালাগ্নিসদৃশ, ক্ষমায় পৃথিবী-তুল্য, নিয়তাত্মা, সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ, ধনুর্বেদে নিষ্ঠিত, ধর্ম্ম ও পরিজনের পরিরক্ষিতা, অদীনাত্মা, গাম্ভীর্য্যসমুদ্র, ধৈর্য্যে হিমাচল-তুল্য, চারিত্রযুক্ত ও সর্ব্বলোকপ্রিয়। এই গুণগুলি এক অতি মহিমান্বিত বিশাল পুরুষচরিত্রকে জ্যোতিষ্মৎ করিয়া নরত্বে দেবত্বের আভাস দেখাইতেছে। আমাদের দেশে এই মহাপুরুষের গৌরব উপলব্ধি করিতে পারেন,এরূপ লোক কয়জন? সুতরাং রামকে উপলক্ষ্য করিয়া দেশীয় উপকরণে এক মূর্ত্তি সৃষ্টি করা হইয়াছে, যাহা বাল্মীকি-অঙ্কিত চিত্রের নামে চালাইতে যাওয়া অপেক্ষা সত্যের অধিকতর অপলাপ আর কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। তবে বায়োস্কোপে বুয়রযুদ্ধদর্শনের ন্যায় এস্থলেও অনেকটা কল্পনার সাহায্যে পুরাইয়া লইতে পারা যায়। রামায়ণের নাম করিয়া অনেক-স্থলেই বাঙালীর ক্ষুদ্র গার্হস্থ্যজীবনের সুখ-দুঃখ চিত্রিত হইয়াছে। রাখালবালকগণ যেরূপ মৃৎস্তূপে বসিয়া রাজা ও কোটালের অভিনয় করে, এ দৃশ্য কতকটা সেইরূপ। কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেখা যাইতেছে, রামের বিবাহ-উৎসবের পরে রামসীতাকে অন্ধকার-ঘরে লইয়া যাওয়া হইল, সেখানে রামকে—"সীতার হাত ধরি তোল বলে বন্ধুগণ।" "তখন ভাবেন মনে সীতাঠাকুরাণী। পায় হাত দেন পাছে রাম গুণমণি॥ করিলেন সীতাদেবী হাতশব্দধ্বনি। হাতে ধরে সীতাকে তোলেন রঘুমণি॥" লঙ্কাকাণ্ডের

শেষে যে স্থলে সীতাকে রাম সন্দেহ করিয়া কটুবাক্য বলিতেছেন, সে স্থলে বাল্মীকি সীতার কেমন বিষাদপূর্ণ স্থির গাম্ভীর্য্য ও সম্রাজ্ঞী-উচিত ওজস্বী ভঙ্গি চিত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন। কৃত্তিবাসী সীতা বলিতেছেন —"বাল্যকালে খেলিতাম বালকমিশালে। স্পর্শ নাহি করিতাম বালকছাবালে॥" এ যেন সন্দেহাতুর বাঙালী স্বামীর কাছে ভয়ে গলদঘর্ম্ম বালিকাবধূর একান্ত কাতর আত্মনিবেদন। রামায়ণের নামে বাঙালীঘরের কয়েকখানি ছোট ছোট দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে; ইহাতে আমরা বিস্মিত হই নাই। রবিবর্ম্মার ছবিতে সীতা মারহট্টারমণীর পরিচ্ছদে আসিয়াছেন, এখানেও আমরা তাঁহাকে না হয় বাঙালিনী করিয়া ফেলিয়াছি।

রামায়ণের অপরাপর অংশের অনুবাদ কতকটা মূলানুযায়ী বলিয়া গণ্য হইতে পারে। গার্হস্থ্য শোকদুঃখের কথায় আমরা নিতান্ত পশ্চাৎপদ নহি। শ্রীরাম বনবাসের দুঃখ বীরোচিত-সহিষ্ণুতা-সহকারে সহ্য করিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃতই ধৈর্য্যে 'হিমবান্ ইব'। সে অংশে ততটা মূলের অনুকরণ করিতে কৃতকার্য্য না হইলেও, বাঙালী কবির কৌশল্যার ক্রন্দন ও রামবিরহে প্রকৃতি-পুঞ্জের আর্ত্তনাদ বর্ণনায় পশ্চাৎপদ হইবার কথা নহে। পা ছড়াইয়া কান্নাকাটি জুড়িয়া দিতে বাঙালী স্ত্রী-পুরুষ সকলেই বিশেষ মজ্‌বুত।

কিন্তু যুদ্ধকাণ্ড লইয়া মহাবিপদ্। বাঙালী কবিগণ এই অংশটি একেবারে নূতন সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের অদ্ভুত মৌলিকত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বাংলাদেশে যুদ্ধক্ষেত্র বেশি নাই, কিন্তু কীর্ত্তনভূমি অনেক। বীরভূম হইতে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত সকল স্থানেই সঙ্কীর্ত্তনের আড্ডা আছে। এই সকল আড্ডার আদর্শেই বাংলা রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডটা সঙ্কলিত হইয়াছে। এ অংশ একান্তরূপে মৌলিক এবং বাঙালীর নিজস্ব। বাঙালী যে বাক্যবীর, তাহার পরিচয় অঙ্গদরায়বারে যথেষ্ট আছে; বলা বাহুল্য, ইহা মূলবহির্ভূত। এ সকল অংশের কৃতিত্বের পর্য্যাপ্তরূপ প্রশংসাবাদ করা সুকঠিন। রাম ও লক্ষ্মণ যুদ্ধকাণ্ডে ঠিক চৈতন্য ও নিত্যানন্দের আদর্শে গঠিত হইয়াছেন। কৃত্তিবাসপণ্ডিত চৈতন্য ও নিত্যানন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী, সুতরাং এ আদর্শ তিনি কিরূপে পাইবেন, জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। ইহার উত্তরে আমরা এই বলিব যে, আদত কৃত্তিবাসের লঙ্কাকাণ্ড লুপ্ত, তৎস্থলে যে কাণ্ডটি জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাই এখন কৃত্তিবাসী রামায়ণের অন্তর্গত। সুতরাং এই কাণ্ডটি আমরা যেরূপ পাইয়াছি, সেই ভাবেই ইহার আলোচনা করিব।

রাম ও লক্ষ্মণ এই অধ্যায়ে ভক্ত সাজিয়া উপস্থিত। মূলে তরণীসেন, বীরবাহু প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাত্মাদিগের নাম পর্য্যন্ত লিখিত নাই। যুদ্ধক্ষেত্র যে সঙ্কীর্ত্তনভূমির আদর্শে গঠিত হইতে পারে, বাংলা রামায়ণ পাঠ করিলে সে বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র থাকিবে না। এ স্থান মধুর মৃদঙ্গ, সপ্তস্বরা, বীণা ও ভোরঙ্গের ধ্বনিতে আকুলিত। রাক্ষসগণ বৈষ্ণবমন্ত্রগ্রহণের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে

উপস্থিত। অতিকায় আসিয়াছেন— "চিন্তা করি মনে মনে বলিছে তখন। শ্রীচরণে স্থান দাও কৌশল্যানন্দন॥ রাবণ-সন্তান বলে দয়া না করিবে। দয়াময় রাম-নামে কলঙ্ক রটিবে॥" অপর একজন বলিতেছেন—"জন্মিয়া ভারতভূমি আমি দুরাচার। করেছি পাতক কত সংখ্যা নাহি তার॥" অতিকায়ের স্তব শুনিয়া রাম প্রীত হইলেন—"স্তব শুনি তুষ্ট হয়ে কন গদাধর। পরম ধার্ম্মিক তুমি লঙ্কার ভিতর॥" কিন্তু তরণীসেনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিবীর—"অঙ্গে লেখা রামনাম রামের চারিপাশে। তরণীর ভক্তি দেখে কপিগণ হাসে॥" বানরের দল হইতে নীল আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তরণী তাহাকে প্রকৃত বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের সহিত অভিবাদন করিলেন—"জোড়হস্তে বলে বিভীষণের নন্দন। পথ ছাড় দেখি গিয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥" পাঠক বাঙালীর যুদ্ধক্ষেত্র কিরূপ বস্তু,তাহার নমুনা কোন ইতিহাসেই পাইবেন না, যেমন এইখানে পাইবেন। তার পর তরণী শুণ্ডিচা পার হইয়া প্রভুর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিলেন, তাঁহার অঙ্গ কদম্বকোরকবৎ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। "রামের সর্ব্বাঙ্গ বীর নেহারিয়া দেখে। ব্রহ্মাণ্ড এক এক লোমকূপের ভিতর। চরণে তরঙ্গময়ী গঙ্গা ভাগীরথী।" বীরবাহু নূপুর পায়ে দিয়া যুদ্ধে যাইতেছেন, কবি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাকে সঙ্কীর্ত্তনে নাচিতে হইবে না। রামকে দেখিয়া তিনি "রাক্ষসবিনাশকারী ভুবনমোহন" বলিয়া স্তুতিপাঠ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু রাবণ আর জগাই বোধ হয় একদরের ভক্ত, ইহার অনুতাপ ও ভক্তি কোন্‌টি বেশি প্রশংসনীয়, তাহা ঠিক করা কঠিন। "জোড়হস্তে স্তব করে রাজা দশানন" ইত্যাদি অংশ পাঠ করুন। স্তবস্তুতি-পাঠ, চণ্ডীপাঠ ইত্যাদি মূলবহির্ভূত বিচিত্র কল্পনারাশি এই যুদ্ধকাণ্ড অবলম্বন করিয়া বাংলা রামায়ণে স্থান পাইয়াছে।

কি উপাদান ভাঙিয়া যে কিরূপ হইয়াছে, তাহা একান্ত বিস্ময়কর। কোথায় আদিকাব্যের যুদ্ধকাণ্ড!—যেখানে রাক্ষসগণ অসীম দোর্দ্দণ্ডপ্রভাবে মহাহবে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিতেছে এবং ভ্রূকুটীকুটিল-মুখে রাবণ শেষ পর্য্যন্ত স্বীয় ভুবনবিজয়ী প্রতাপ ও প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রাখিতেছেন,অদ্ভুত ধৈরথযুদ্ধে রামকে ধ্বস্তবিধ্বস্ত করিয়া দিতেছেন। যে রাবণকে দেখিয়া ভয়ে নদী-সকল স্তিমিতগতি ও বৃক্ষপত্র নিষ্কম্প হইয়া যাইত, যাঁহার নিকট মরুৎ শঙ্কিত হইয়া প্রবাহিত হইত, সেই ঐশ্বর্য্যময়, আত্মর তেজের সাক্ষাৎবিগ্রহস্বরূপ রাবণের মূর্ত্তি যে ভক্তির উপাদান দিয়া নবনীত-কোমলভাবে গঠিত হইতে পারে, ইহা কোন কবিশিল্পী বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে ধারণাও করিতে পারিতেন না। এই কাণ্ড হইতে কি অপূর্ব্ব ভক্তির কথা প্রচারিত হইয়াছে। এ যেন কামান ভাঙিয়া ফুলধনুর সৃষ্টি করা হইয়াছে, লৌহদণ্ডকে মঞ্জরিত করিয়া সপুষ্প লতিকায় পরিণত করা হইয়াছে। এই কাণ্ড অবশ্য যে অভিধানে অভিহিত হউক, কিন্তু আদিকবির নামের সঙ্গে ইহাকে সংশ্লিষ্ট করা সঙ্গত হইবে না। পৃথ্বীর উত্তর কেন্দ্র এবং দক্ষিণ কেন্দ্রেও এত পার্থক্য নাই।

এ রামায়ণ ও আদিরামায়ণ, ইহাদের মধ্যে যত প্রভেদ, তাহাতে উভয়কে দুইখানি স্বতন্ত্র বহি বলিয়া গণ্য করিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাল্মীকির পরে কৃত্তিবাস, যে স্থানে প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ ছিল, সেখানে যেন দীন-হীন কুটীর বাঁধিয়াছেন। মগধের রাজগৃহের ভগ্ন ইষ্টকস্তূপের পার্শ্বে রাখাল গরু চরাইতেছে, কিন্তু তাহার নামটি এখনও রায়গড় রহিয়াছে। সেই জলাঘাততীব্রহাসোগ্রা ফেননির্ম্মলহাসিনী গঙ্গার বর্ণনা মনে পড়ে—কোথাও জলরাশি বেণীকৃত, কোথাও আবর্ত্ত-শোভী, কোথাও তীরস্থ বৃক্ষ দ্বারা মালার ন্যায় সমলঙ্কৃত। কর্ণিকার-প্রতিসংচ্ছন্ন গিরিসানুদেশে তরুরাজি পীতাম্বর-পরিহিত নরের ন্যায় সুন্দর। চন্দনরঞ্জিত সন্ধ্যা ও পদ্মরেণুতে রক্তাঙ্গ চক্রবাক। বাল্মীকিবর্ণিত এই সকল বিচিত্র দৃশ্য মনে পড়ে। অপ্রমেয় কবিপ্রতিভার বিশাল অনুভূতিতে অপ্রমেয় সমুদ্রের কি ভৈরব-মধুর প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। কবি সমুদ্র-কল্পনায় আহ্লাদে ও বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া গিয়াছেন। "হসন্তমিব ফেনোঘৈর্নৃত্যন্তমিব চোর্ম্মিভিঃ" প্রভৃতি কথায় সমুদ্রের বর্ণনা আরম্ভ করিয়া শেষে বলিয়াছেন—সমুদ্রের উপমা আকাশ, আকাশের উপমা সমুদ্র,—ইহাদের পরস্পরের আর উপমা নাই—আকাশ সমুদ্রে মিশিয়াছে, সমুদ্র আকাশে মিশিয়াছে, সমুদ্রে বীচিমালা, আকাশে মেঘমালা।

বাতাহত বিপুলকম্পিত পয়োনিধি, সমুৎপতিত-মেঘ-মেদুর অম্বর, এই উভয়ের সদৃশ বিরাট্ দৃশ্য বিশ্বে আর কি আছে। এই বিচিত্র প্রকৃতির বর্ণনা একটিও বঙ্গীয় রামায়ণে প্রতিফলিত হয় নাই। আমরা আর্য্যজাতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিই, কিন্তু বাঙালীর সৌন্দর্য্যবুদ্ধির যে কতদূর অধোগতি হইয়াছিল, ইহার দ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

তবে রামায়ণে গার্হস্থ্যজীবনের যে সুনীতির প্রসঙ্গ আছে, তাহার কয়েকটি লহরী বাঙালী কবিগণ স্বীয় শুক্তিবৎ শক্তির দ্বারা বঙ্গীয় সাহিত্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন। সেই গার্হস্থ্যজীবনের পবিত্র ত্যাগ-স্বীকার এবং অসামান্য দুঃখসহিষ্ণুতার পবিত্র কথা যাহা-কিছু আমাদের দীনহীন গৃহে আসিয়াছে, তাহাতেই আমাদের ক্ষুদ্র গৃহ পবিত্র হইয়া গিয়াছে। পুরুষচরিত্র-গুলি যতদূরই খর্ব্ব ও বিকৃত হউক না কেন, নারীচরিত্রের পবিত্রতা এখনও আমাদের গৃহে সীতাসাবিত্রীর আদর্শবিচ্যুত হয় নাই। এখনও পল্লীতে পল্লীতে অনেক শ্মশানভূমি আছে, যেখানে স্বেচ্ছায় বঙ্গের সতীগণ পতঙ্গের ন্যায় স্বামীর সঙ্গে পুড়িয়া ছাই হইয়াছেন। কৃত্তিবাসের ন্যায় কবিগণ সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ চক্ষের নিকট ধরিয়া যদি সেইরূপ দুইএকটি সতীচরিত্রগঠনে, ভ্রাতা ও পিতার প্রতি আনুগত্যের আদর্শ প্রদানে কিছুমাত্র সহায়তা করিয়া থাকেন, তবেই যথেষ্ট লাভ মনে করি। বাংলা রামায়ণ পাঠে রামের ন্যায় বিক্রান্ত হইবার আশা বোধ হয় কেহ পোষণ করেন নাই, কৃত্তি-বাসও সেরূপ কোন সুবিধা দেন নাই। কিন্তু গার্হস্থ্যজীবনে কতকটা ত্যাগস্বীকার ও স্ত্রীলোকগণের পক্ষে সতীত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অনুকৃত হইলেই এই রামায়ণের

হিতকর প্রভাব এদেশে শেষ হইয়াছে, ইহা বলা যাইবে না। এ বিষয়ে কৃত্তিবাসের যত্ন সফল হইয়াছে, তিনি আমাদের সমস্ত জাতির কৃতজ্ঞতার ভাজন। কারণ আমাদের বর্ত্তমান জাতির প্রতিভার অনুরূপ করিয়া তিনি রামায়ণকে সমস্ত জাতির নিকট পৌছাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে যদি কিছু ত্রুটি হইয়া থাকে, তাহা আমাদের জাতির ত্রুটি। কিন্তু এই কাব্যের যত-কিছু প্রশংসা, সকলই তাঁহার প্রাপ্য।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

সার সত্যের আলোচনা।

ত্রিকের তারতম্য এবং সামঞ্জস্য।

বিগত-বারের সমালোচনায় এটা বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান, এই তিন মৌলিক পদার্থের প্রত্যেকেই অপর দুইটির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত—এরূপ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত যে, একটিকে টানিলেই অপর দুইটিতে টান পড়ে।

কোনো ব্যক্তি তর্কের তোড়ে বলিতে পারেন যে, "আমি কেবল সত্তা মানি—শক্তিও মানি না, জ্ঞানও মানি না"; অথবা "আমি কেবল শক্তি মানি—সত্তাও মানি না, জ্ঞানও মানি না"; অথবা, "আমি কেবল জ্ঞান মানি—সত্তাও মানি না, শক্তিও মানি না"। মুখে তিনি তাহা বলিতে পারেন, কিন্তু মুখের কথায় কাহার কি আসে যায়? কাজে তিনি একটিও এমন সত্তাবৎ বস্তু (সংক্ষেপে—সদ্‌বস্তু), বা জ্ঞান-পদার্থ, বা শক্তি-পদার্থ, আমাকে দেখা'ন্ দেখি, যাহা অপর দুইটির কোনো ধারই ধারে না? যতই ধস্তাধস্তি করুন্ না কেন—কিছুতেই তাহা তিনি পারিয়া উঠিবেন না। তিনি হয় তো একজন মস্ত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত;—আমার স্পর্দ্ধাবাক্য শুনিয়া তিনি হয় তো মনে মনে হাসিবেন; তিনি হয় তো বলিবেন—"জ্যামিতি-পুস্তকের পাত-উল্টানো বোধ করি হয় নাই! জ্যামিতিক রেখা কাহাকে বলে, তাহা জানো? যাহার দৈর্ঘ্য আছে—প্রস্থ নাই, তাহাই রেখা। প্রস্থবিহীন দৈর্ঘ্য যদি তোমার দেখিবার ইচ্ছা হয়, তবে এখন তুমি তাহা দেখিতে পাইবে না। কিছুকাল ধরিয়া জ্যামিতি-বিদ্যার মন্ত্রপূত অঞ্জনে তোমার জ্ঞানচক্ষুকে মার্জ্জিত কর, তাহা হইলেই অবলীলাক্রমে তুমি তাহা দেখিতে পাইবে; আর, তখন তুমি বুঝিতে পারিবে যে, জ্যামিতিক রেখা শুধুকেবল জ্ঞানেরই ব্যাপার—তাহা সত্তারও কোনো ধার ধারে না—শক্তিরও কোনো ধার ধারে না। রেখাও যেমন, সমতাও তেমনি, দুই-ই নিছক জ্ঞানেরই ব্যাপার; আর, সমস্ত জ্যামিতি-বিদ্যা ঐ দুই অতীব সূক্ষ্ম—যেমন সূক্ষ্ম তেমনি দৃঢ়—ভিত্তিমূলের উপরে প্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়া, যন্ত্রবিদ্যার

(Mechanics এর) ক-খ'র সঙ্গে যদি তোমার গুণাক্ষরেও পরিচয় থাকিত, তাহা হইলে বলিবামাত্রই বুঝিতে পারিতে যে, গতিরই সঙ্গে গতি মেশামিশি করে, গতিরই সঙ্গে গতি যোঝাযুঝি করে, গতিরই সঙ্গে গতি বেগ বিনিময় করে; গতির সমস্ত সম্বন্ধ স্বজাতির মধ্যেই—গতির মধ্যেই—আবদ্ধ; তাহা নিছক শক্তিরই ব্যাপার; তাহা জ্ঞানেরও সহিত কোনো সংস্রব রাখে না—সত্তারও সহিত কোনো সংস্রব রাখে না।" বুঝিলাম! ইনি যদি আমার স্পর্দ্ধা মার্জ্জনা করেন, তবে ইঁহাকে একটি কথা আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই :—

জ্যামিতি-বিদ্যা কি তাঁহার মুখস্থ-বিদ্যা-মাত্র—না আর-কিছু? শুধুই যদি তাহা মুখস্থ-বিদ্যা হয়, তাহা হইলে মুখে "রেখা" "সমতা" প্রভৃতি কতকগুলা বাঁধি-গৎ উচ্চারণ করিলেই সে বিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হয়—মনে কিছু না ভাবিলেও চলে। তাহা যদি না হয়—জ্যামিতি-বিদ্যা শুধুই যদি মুখস্থ-বিদ্যা না হয়, তবে মুখে রেখা-শব্দ উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে মনে রেখা ভাবনা করা আবশ্যক—দোকানের বহির্দ্বারের ললাটে জমকালো অক্ষরে "কাশ্মীরি শাল" মুদ্রাঙ্কিত করিবার পূর্ব্বে দোকানের ভিতর-মহলে কাশ্মীরি শাল গুছাইয়া রাখা আবশ্যক। মনে রেখা ভাবনা করিতে গেলেই চিদাকাশে রেখা টানা ব্যতিরেকে আর-কোনো উপায়ে তাহা সম্ভাবনীয় নহে। অতএব প্রতিবাদীর জ্যামিতি-বিদ্যা শুধুই যদি মুখস্থ বিদ্যা না হয়, তবে মুখে রেখা-শব্দ উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে মনের আলেখ্যপটে মনে মনে একটা রেখা টানা তাঁহার পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক। মনের আলেখ্যপটে মনে মনে রেখা টানা একপ্রকার ক্রিয়া— মানসিক ক্রিয়া। মানসিক ক্রিয়া মনের শক্তিস্ফূর্ত্তি। তবেই হইতেছে যে, "জ্যামিতিক-রেখা শুধুই কেবল জ্ঞানের ব্যাপার—শক্তির সহিত মূলেই তাহার কোনো সম্পর্ক নাই" এরূপ একটা কথা নিতান্তই গায়ের জোরের কথা, তাহা যুক্তির বড়-একটা ধার ধারে না। তোমার জ্যামিতিক-রেখার তো এই দশা—তাহার আবার একটা শনিবারের দোসর জুটাইয়াছ সমতা!

দুটা রেখা দেখিবামাত্রই—না ভাবিয়া না চিন্তিয়া—আমি যদি বলি যে, উভয়ে পরস্পরের সহিত সমান, তবে তাহা আমার একটা মুখের কথামাত্র হইয়াই ক্ষান্ত থাকিবে। পক্ষান্তরে, আমি যদি রেখা-দুটাকে পরস্পরের গায়ে-গায়ে মিলাইয়া মাপিয়া দেখিয়া, অথবা, সে-দুটাকে একে-একে তৃতীয় কোনো রেখার গায়ে-গায়ে মিলাইয়া মাপিয়া দেখিয়া বলি যে, উভয়ে পরস্পরের সহিত সমান, তাহা হইলেই আমার মুখের কথার সহিত মনের কথার মিল থাকিবে। মনে মনে মানসিক রেখা-দ্বয়কে গায়ে-গায়ে মিলানো একপ্রকার যোজনা-ক্রিয়া—মানসিক যোজনা-ক্রিয়া। মানসিক যোজনা-ক্রিয়া মনের শক্তিস্ফূর্ত্তি, তাহাতে আর ভুল নাই। তবে আর কেমন করিয়া বলিব যে, জ্যামিতিক সমতা শুধুই কেবল জ্ঞানের ব্যাপার—শক্তির সহিত মূলেই তাহার কোনো সম্পর্ক নাই? জ্যামিতিক রেখা, তথৈব জ্যামিতিক সমতা, জ্ঞানের

ব্যাপার তাহা কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু তা ছাড়া, দুইই তলে-তলে শক্তির ব্যাপার, এ কথাটিও স্বীকার করা চাই—তা নহিলে নিস্তার নাই। প্রধান দুইটি জ্ঞান-ঘাঁসা পদার্থ, রেখা এবং সমতা, শক্তির সহিত কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত—এই তো তাহা কষামাজা করিয়া দেখা গেল; অতঃপর, দুইই বাস্তবিক সত্তার সহিত কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত, তাহা কষিয়া-মাজিয়া দেখা যা'ক্।

ইউক্লিড্ তাঁহার জ্যামিতির চতুর্থ প্রস্তাবের গোড়াতেই বলিতেছেন—"অমুক ত্রিভুজকে অমুক ত্রিভুজের গাত্রে যোজনা (apply) কর।" তুমি বলিবে যে, ইউক্লিড্ ত্রিভুজ-দুটাকে মনে মনে পরস্পরের সহিত যোজনা করিতে বলিতেছেন। আমিও তাহাই বলি। কিন্তু আবার এটাও বলি যে, ত্রিভুজ-দুটাকে যদি দৃঢ়বস্তু (rigid body) বলিয়া ভাবনা করা না যায়, তবে মনে-মনেও সে-দুটাকে গায়ে-গায়ে মিলাইয়া মাপিয়া দেখা কাহারো কর্ত্তৃক সম্ভাবনীয় নহে।

ক-গোলাটিকে তুমি মনে মনে ক-স্থান হইতে খ-স্থানে সরাইয়া রাখিতে পার—ইহা কেহই অস্বীকার করিতেছে না; কিন্তু ক-গোলা আকাশের যে স্থানটি ভরাট্ করিয়া রহিয়াছে, সেই গোলাকৃতি শূন্য স্থানটিকে (Globular space-টিকে) মনে মনে খ-স্থানে সরাইয়া রাখো দেখি—কখনই তাহা তুমি পারিবে না। অতএব এটা স্থির যে, যে-সময়ে আমি মনে মনে দুই বস্তুকে পরস্পরের গায়ে-গায়ে মিলাইয়া মাপিয়া দেখিতে যাই, সে সময়েও মাপ্য বস্তু দুটাকে দৃঢ়বস্তু (rigid body) বলিয়া না ভাবিলে চলিতে পারে না; কেন না, বায়ুর ন্যায় উড়া বস্তু-দ্বয়কে, অথবা, জলের ন্যায় তরল বস্তুদ্বয়কে মনে-মনেও—কল্পনাতেও—গায়ে-গায়ে মিলাইয়া মাপিয়া দেখা কাহারো কর্ত্তৃক সম্ভাবনীয় নহে। ফলে, সমস্ত বস্তুই যদি বায়ুর ন্যায় অদৃঢ় হইত, তাহা হইলে কাহারো মনোমধ্যে "জ্যামিতিক সমতা" বলিয়া একটা ভাব বদ্ধমূল হইতে পারা দূরে থাকুক্—দাঁড়াইতেই পারিত না, ইহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। কাজেই বলিতে হইতেছে যে, জ্যামিতিক সমতা দৃঢ়বস্তুর সত্তার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত। এ সম্বন্ধে আর-একটি বিষয় দ্রষ্টব্য এই যে, "একটা বস্তু" বা "একটি বস্তু" বলিতে দৃঢ়-বস্তুই বুঝায়—অদৃঢ়-বস্তু বুঝায় না। তার সাক্ষী, দৃঢ়-বস্তুর ব্যালা আমরা বলি "একটি টাকা" "একটা লাঠি" ইত্যাদি, অদৃঢ়-বস্তুর ব্যালা বলি "এক-ঘটি জল" "একঘর ধোঁয়া" ইত্যাদি। শেষোক্তের ব্যালা "একটি জল" বা "একটা ধোঁয়া" এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহার অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া ভার হয়। ভার হয় কেন? তাহার কারণ কি? তাহার কারণ আর-কিছু না—অদৃঢ়-বস্তুর আয়তনের পরিমাণ স্থির রাখিতে হইলে তাহাকে দৃঢ়-বস্তু দিয়া ঘেরাও করা ব্যতিরেকে অন্য কোনো উপায়ে তাহা সম্ভাবনীয় নহে। আমরা যেমন বলি "একটি টাকা", তেমনি বলি "একটি রেখা"; ইহাতেই ভাবে বুঝা যাইতেছে যে, রেখা বলিতে আমরা দৃঢ়-রেখাই বুঝি।

ভাবে এ যাহা বুঝা যায়—যুক্তিতেও তাহাই পাওয়া যায়। যুক্তি এইরূপ :—

(১) রেখার আরেক নাম দৈর্ঘ্য।

(২) দৈর্ঘ্যমাত্রেরই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ থাকা চাই।

(৩) দৃঢ়-বস্তুর বিনা সাহায্যে অদৃঢ়-বস্তুর দৈর্ঘ্যকে (বায়ুর দৈর্ঘ্যকে বা জলের দৈর্ঘ্যকে) নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আটক করিয়া রাখা সম্ভবে না।

(৪) কাজেই নির্দ্দিষ্টপরিমাণ দৈর্ঘ্য বা রেখা ভাবনা করিতে গেলেই সেই সঙ্গে দৃঢ়-বস্তুর ভাবনা আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে।

এখন দ্রষ্টব্য এই যে, আমি যদি বলি "দৈর্ঘ্য একপ্রকার গুণ—সুতরাং তাহা বস্তু-সাপেক্ষ", তবে তাহার উত্তরে তুমি অনায়াসে বলিতে পার যে, দৈর্ঘ্য গুণ বটে, কিন্তু তাহা বস্তুর গুণ নহে—তাহা একপ্রকার অবস্তুর গুণ—শূন্য আকাশের গুণ। স্বীকার করিলাম যে, দৈর্ঘ্য শূন্য আকাশের গুণ—কিন্তু দৃঢ়তা তো আর শূন্য আকাশের গুণ নহে। দৃঢ়তা দৃঢ়বস্তুরই গুণ, তাহাতে আর ভুল নাই। পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, নির্দ্দিষ্টপরিমাণ রেখা ভাবিতে গেলেই দৃঢ়-রেখা ভাবনা করিতে হয়; এখন দেখিতেছি যে, দৃঢ়তা বাস্তবিক পদার্থেরই গুণ, তা বই, তাহা শূন্য আকাশের গুণ নহে। তবেই হইতেছে যে, জ্যামিতিক রেখা দৃঢ়-বস্তুর বাস্তবিক সত্তার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত। তোমার পক্ষের প্রধান দুইটি সাক্ষী হ'চ্ছে জ্যামিতি-বিদ্যার রেখা এবং যন্ত্র-বিদ্যার গতি। রেখা-সাক্ষী নিরস্ত হইল—এখন গতি-সাক্ষী কি বলে, তাহা দেখা যা'ক্।

"গতি" বলিলে শুনিতে শুনায় একটিমাত্র শব্দ, কিন্তু বুঝিতে বুঝায় দুইটি বিষয় এক-সঙ্গে—(১) চলমান বস্তু এবং (২) প্রতি-মুহূর্ত্তে তাহার স্থান-পরিবর্ত্তন। স্থান-পরিবর্ত্তন শক্তিরই ব্যাপার, তাহাতে আর ভুল নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া এটা ভুলিলে চলিবে না যে, চালক শক্তি চাল্য বস্তুর উপরেই কার্য্য করে—শূন্যের উপরে কার্য্য করে না। আপাতত মনে হইতে পারে যে, আলোক-পদার্থ, তথৈব তাড়িত-পদার্থ, নিছক গতি-ক্রিয়া; তাহার সহিত বাস্তবিক-পদার্থের মূলেই কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, ও-সকল বৈদ্যুতিক গতি এক-প্রকার সূক্ষ্মপদার্থের তরঙ্গলীলা—ঈথরের তরঙ্গলীলা।

কোনো-কিছুরই গতি নহে—অথচ গতি, এরূপ গতি বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অসম্ভব। তবেই হইতেছে যে, গতি বস্তুসত্তার সহিত, অথবা, যাহা একই কথা—বাস্তবিক সত্তার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত;—জ্ঞানেরও সহিত তদ্বৎ। জ্ঞানেরও সহিত যে, তাহা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত, তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ এই :—

ক-বস্তুর অচল অবস্থায় বা গতি-শূন্য অবস্থায়, ক-বস্তু প্রতিমুহূর্ত্তই ক-স্থান ভরাট্ করিয়া অবস্থিতি করে।

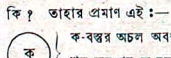

পক্ষান্তরে, ক-বস্তুর সচল অবস্থায়, সে ক-স্থান খালি করিয়া খ-স্থান ভরাট্ করে, খ-স্থান খালি করিয়া গ-স্থান ভরাট্ করে, ইত্যাদি। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, ক-স্থান যদি ক্রমাগতই ক-বস্তুর সত্তায় ভরাট্ থাকে, তাহা

হইলে ক-স্থানে ক-বস্তুর গতি থাকিতে পারে না; তেমনি আবার, খ-স্থান যদি ক্রমাগতই খালি থাকে, তবে খ স্থানেও ক-বস্তুর গতি থাকিতে পারে না। ক-বস্তুর গতি তবে থাকে কোন্ স্থানে? যখন ভরাট্ স্থান খালি হইবামাত্র খালি-স্থান ভরাট্ হয়—যখন ক-স্থান খালি হইবামাত্র খ-স্থান ভরাট্ হয়—তখন ক-বস্তুর গতি খালি-স্থানে এক পা রাখিয়া ভরাট্ স্থানে আরেক পা বাড়ায়। তবেই হইতেছে যে, গতি দাঁড়াইয়া থাকে অতীব একটি সঙ্কট-স্থানে; এক দিকে, অব্যবহিত পূর্ব্বমুহূর্ত্তে যাহা ভরাট্ ছিল, কিন্তু এখন খালি হইয়াছে, সেই খালি-স্থান; আর-এক দিকে, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে যাহা বস্তু-সত্তায় ভরাট্ হইল, সেই ভরাট্ স্থান (খালি-স্থান এবং ভরাট্ স্থান); এই দুই নৌকায় পা দিয়া—দ্বৈধীরাজ গতি দুয়ের সন্ধিস্থানে দাঁড়াইয়া থাকে। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, সেই যে খালি-স্থান—যাহাতে এক পায়ের ভর না রাখিলে গতির গতিত্ব হয় না—সে খালি-স্থান বস্তুটা কি? তাহা শূন্য আকাশমাত্র; তাহা বস্তুহিসাবেও কিছুই না—শক্তিহিসাবেও কিছুই না; তাহা জ্ঞানেরই ব্যাপার তবেই হইতেছে যে, গতি বলিয়া যে একটা ক্রিয়া, তাহা শক্তি এবং সত্তার সঙ্গেও যেমন—জ্ঞানের সঙ্গেও তেমনি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত। এ যাহা অতীব সংক্ষেপে বলিলাম, তাহা আর-একটু বিস্তার করিয়া না বলিলে—কথাটা হয় তো পাঠকের মনের ধারণা হইতে ফস্কিয়া যাইবে। অতএব ঐ কথাটাই আর-একটু খোলসা করিয়া বলি :—

একটা পাখী যখন চক্ষের সম্মুখ দিয়া উড়িয়া চলিতেছে, তখন তদ্দৃষ্টে কেহ বলিতে পারেন যে, "আমি ঐ পাখীটার গতি চক্ষে দেখিতেছি"। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, তিনি প্রত্যেক মুহূর্ত্তে সেই মুহূর্ত্তের ভরাট্ স্থানটিই কেবল চক্ষে দেখিতেছেন, তা বই, অতিবাহিত-পূর্ব্ব খালি-স্থান তিনি চক্ষে দেখিতেছেন না। যাহা চক্ষে দেখা যায় না, তাহা তিনি কিরূপে চক্ষে দেখিবেন? খালি-স্থান বস্তুশূন্য আকাশ—তাহা তিনি কিরূপে চক্ষে দেখিবেন? এ কথা সত্য যে, তিনি প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই একটি-না একটি ভরাট্ স্থান দেখিতেছেন; কিন্তু শুধুকেবল ভরাট্ স্থানেই তো আর গতি হয় না; পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী স্থান খালি হইবার সঙ্গে সঙ্গে পরপরবর্ত্তী স্থান ভরাট্ হইতে থাকিলে, সেইরূপ ক্রিয়াকেই আমরা গতি-নামে নির্দ্দেশ করি। তবেই হইতেছে যে, দর্শক ভরাট্ স্থানই চক্ষে দেখিতেছেন—গতি চক্ষে দেখিতেছেন না। তবে কেন তিনি বলেন যে, "আমি ঐ পাখীটার গতি দর্শন করিতেছি"। তাহা যে তিনি বলেন কেন, তাহার বিশেষ একটি কারণ আছে; তাহা এই :—

অতিবাহিত স্থান বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে খালি হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বমুহূর্ত্তে তাহা ভরাট্ ছিল। তাহা যে পূর্ব্বমুহূর্ত্তে ভরাট্ ছিল, এ কথাটি দর্শকের স্মরণে মুদ্রাঙ্কিত রহিয়াছে। দর্শক করিতেছেন দুইটি কার্য্য—দর্শন এবং স্মরণ; "অতিবাহিত স্থান পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে ভরাট্ ছিল" এটা তিনি স্মরণ করিতে-ছেন; "অধিকৃত স্থান বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে ভরাট্

হইল" এইটিই তিনি দর্শন করিতেছেন। করিতেছেন দর্শন এবং স্মরণ দুইই একসঙ্গে; বলিতেছেন "দর্শন করিতেছি"। তাঁহার কথার ভাবে এইরূপ বুঝাইতেছে—যেন তিনি খালি-স্থান এবং ভরাট্ স্থান দুইই একসঙ্গে দেখিতেছেন। কিন্তু সে দেখা'র মধ্যে চক্ষের দেখাও আছে—জ্ঞানের দেখাও আছে। গতির মধ্যে জ্ঞানের ব্যাপার যেটা রহিয়াছে, সেটা তিনি জ্ঞানেই দেখিতেছেন। সেটা কি? না, শূন্য আকাশের সহিত সম্বন্ধ। পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, জ্যামিতিক রেখা এবং জ্যামিতিক সমতা—জ্ঞান, শক্তি এবং সত্তা, তিনেরই সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত। এখন দেখিতে পাইতেছি যে, গ ত—(ক্ষেত্র

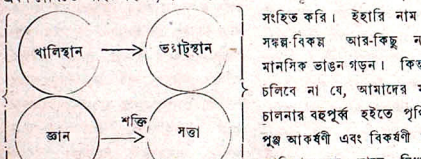

দেখ) জ্ঞান, শক্তি এবং সত্তা, তিনেরই সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত।

এ কথা আমি অস্বীকার করি না যে, জ্যামিতিক রেখা প্রধানত একটা মনের ভাব, সুতরাং তাহা জ্ঞানপ্রধান; শক্তি প্রধানত একপ্রকার ভৌতিক ক্রিয়া, সুতরাং তাহা শক্তিপ্রধান। আমার মনোগত অভিপ্রায় শুদ্ধকেবল এইটি দেখানো যে, জ্যামিতিক রেখা জ্ঞানপ্রধান হইলেও জ্ঞানই যে তাহার সর্ব্বস্ব তাহা নহে—তলে-তলে তাহা শক্তি এবং সত্তার সহিত অবিমোচ্য সম্বন্ধসূত্রে জড়িত; তেমনি, গতি শক্তিপ্রধান হইলেও শক্তিই যে তাহার সর্ব্বস্ব তাহা নহে—তলে-তলে তাহা সত্তা এবং জ্ঞানের সহিত অবিমোচ্য সম্বন্ধসূত্রে জড়িত।

অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, পৃথিব্যাদি বস্তু সত্তাপ্রধান হইলেও তলে-তলে তাহা শক্তি এবং জ্ঞানের সহিত অবিমোচ্য সম্বন্ধসূত্রে জড়িত।

আমরা যখন বলি যে, পৃথিবীর পরমাণুপুঞ্জ তাহার কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে জমাট্বদ্ধ হইয়া গোলাকারে বিধৃত রহিয়াছে, তখন আমরা মনে মনে পৃথিবীর পরমাণু-নিচয়কে পরস্পর হইতে বিশ্লেষিত করি এবং তাহার পরে সেই বিশ্লেষিত পরমাণুগণকে গোলাকারে সংহত করি। ইহারি নাম সঙ্কল্প-বিকল্প। সঙ্কল্প-বিকল্প আর-কিছু না—একপ্রকার মানসিক ভাঙন গড়ন। কিন্তু এটা ভুলিলে চলিবে না যে, আমাদের মানসিক-শক্তি-চালনার বহুপূর্ব্ব হইতে পৃথিবীর পরমাণুপুঞ্জ আকর্ষণী এবং বিকর্ষণী শক্তির কার্য্যকারিতায় স্বস্থানে বিধৃত হইয়া স্বস্ব কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। আমাদের জন্মিবার পূর্ব্বে পৃথিবীর পরমাণুপুঞ্জ অনেকানেক যুগযুগান্তর ধরিয়া কোটিকোটি যোজন আকাশ হইতে আকাশান্তরে পরিব্যাপ্ত ছিল, ক্রমে ক্রমে ক্রমে তাহা সংহত হইতে সংহত হইয়া-হইয়া এক্ষণে (ব্রহ্মার সাবে সেদিন কেবল) রূপ ধারণ করিয়াছে গোলাকৃতি এবং নাম ধারণ করিয়াছে পৃথিবী। এ ভাঙন-গড়ন আমাদের মানসিক ভাঙন-গড়ন নহে—এ ভাঙন-গড়ন বাস্তবিক ভাঙন-গড়ন। মানসিক

ভাঙন-গড়ন যেমন মনের শক্তিস্ফূর্ত্তি—বাস্তবিক ভাঙন-গড়ন তেমনি বাস্তবিক সত্তার শক্তিস্ফূর্ত্তি। সত্তার সহিত শক্তির সম্বন্ধ এইরূপ সুস্পষ্ট; সত্তার সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধও তদ্বৎ। শক্তির কার্য্যই হ'চ্চে সত্তাকে বিবৃত করিয়া প্রকাশ করা, এবং সত্তার প্রকাশের নামই জ্ঞান। আমরা যদি অন্তরে দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখিতে পাই যে, সঙ্কল্প-বিকল্প-রূপিণী মানসিক শক্তির পরিচালনা জ্ঞানেতেই পর্য্যবসিত হয়; আমরা যদি বাহিরে দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখিতে পাই যে, বাস্তবিক সত্তার শক্তিস্ফূর্ত্তি জ্ঞানবান্ মনুষ্যের অভিব্যক্তিতেই পর্য্যবসিত হয়।

উপরের আলোচনা হইতে মোট কথাটি যাহা সংগ্রহ করিয়া পাওয়া যাইতেছে, তাহা এই:—

যেমন রাজ্য বলিলেই রাজা এবং প্রজাবর্গ, রাজা বলিলেই রাজ্য এবং প্রজাবর্গ, প্রজা বলিলেই রাজা এবং রাজ্য, আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে; তেমনি সত্তা বলিলেই শক্তি এবং জ্ঞান, শক্তি বলিলেই সত্তা এবং জ্ঞান, জ্ঞান বলিলেই সত্তা এবং শক্তি আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে। পুনশ্চ, রাজা যদি রাজ্যের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া বনে চলিয়া যা'ন, রাজ্য যদি রাজা'র সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া অরাজক হইয়া উঠে, প্রজারা যদি রাজার সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া স্বস্বপ্রধান হইয়া উঠে, তাহা হইলে যেমন রাজা অরাজা হইয়া যান, রাজ্য অরাজ্য হইয়া যায়, প্রজা অপ্রজা হইয়া পড়ে; তেমনি, জ্ঞান এবং শক্তি হইতে সম্বন্ধচ্যুত হইলে সত্তা অসত্তা হইয়া যায়; সত্তা এবং জ্ঞান হইতে সম্বন্ধচ্যুত হইলে শক্তি অশক্তি হইয়া যায়, সত্তা এবং শক্তি হইতে সম্বন্ধচ্যুত হইলে জ্ঞান অজ্ঞান হইয়া যায়। তবে, এরূপ হইতে পারে যে, কোনো রাজ্যে রাজার, কোনো রাজ্যে প্রজাবর্গের, কোনো রাজ্যে রাজপুরুষদিগের, কোনো রাজ্যে তিনের সামঞ্জস্যের বেশী প্রাচুর্য্যভাব। তার সাক্ষী—বর্ত্তমান অব্দে জর্ম্মাণ-রাজ্যে রাজার, ফরাসী-রাজ্যে প্রজাবর্গের, ইংলণ্ডে রাজপুরুষদিগের এবং আমেরিকায় তিনের সামঞ্জস্যের অপেক্ষাকৃত বেশী প্রাচুর্য্যভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তত্ত্বজ্ঞানের ভারতখণ্ডে উহারই একপ্রকার উল্টাপিটের অন্ধস্ফোট দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, শঙ্কর-শাস্ত্রে জ্ঞানকে, কাপিল-শাস্ত্রে সত্তাকে, পাতঞ্জল-শাস্ত্রে আত্মশক্তিকে, এবং গীতা-শাস্ত্রে তিনের সামঞ্জস্যকে সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠান করানো হইয়াছে। তবে যে, আপাতদর্শী লোকের মনে সময়ে-সময়ে এইরূপ ভ্রম হয়—যেন বেদান্ত-শাস্ত্রে কেবলমাত্র জ্ঞান (শক্তি-ছাড়া এবং সত্তা-ছাড়া জ্ঞান), সাংখ্য-শাস্ত্রে কেবলমাত্র সত্তা (শক্তি-ছাড়া এবং জ্ঞান-ছাড়া সত্তা), যোগশাস্ত্রে কেবলমাত্র আত্মশক্তি (সত্তা-ছাড়া এবং জ্ঞান-ছাড়া আত্মশক্তি) একাকী সর্ব্বেসর্ব্বা, সেরূপ ভ্রমের কারণ আর-কিছু না—অনভিজ্ঞ সমালোচকের চক্ষে প্রাধান্যমাত্রই একাধিপত্যের আকার ধারণ

করে। একজন অনভিজ্ঞ লোক যদি শোনে যে, আমেরিকা-রাজ্য প্রজাতন্ত্র, তবে তাহার মনোমধ্যে সহসা এইরূপ একটা ভ্রম জন্মিতে পারে যে, তবে বুঝি আমেরিকা-রাজ্যে রাজকার্য্যের কোনোপ্রকার বিলিব্যবস্থা নাই—রাজা নাই, তার আবার রাজকার্য্য—মাথা নাই, তার আবার মাথা-ব্যথা! রাজা না-ই বটে? আমেরিকা-রাজ্যের মস্তক যিনি—যাঁহার নাম প্রেসিডেণ্ট্—তিনি তবে কি? তিনি রএ আকার রা, জএ আকার জা নহেন, ইহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু তথাপি রাজার যাহা কার্য্য, তাহা তাঁহাকে ষোলো-আনা মাত্রায় করা চাই, রাজোচিত গুণ তাঁহার ষোলো-আনা মাত্রায় থাকা চাই, রাজোচিত সম্মান তাঁহাকে ষোলো-আনা মাত্রায় দেওয়া চাই;—তবে আর রাজার বাকি রহিল কি? তুমি বলিতেছ যে, শঙ্করাচার্য্যের মতে চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিছুই না। তবে কি তিনি "কিছুই না" দলন করিবার জন্য দলবল সমভিব্যাহারে দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষময় দাপাদাপি করিয়া বেড়াইয়াছিলেন? অতএব মুখে যিনি যাহা বলুন না কেন—সকলেই মনে মনে জানেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিলক্ষণই একটা-কিছু! শঙ্করাচার্য্য না হয় বলিলেন অবিদ্যা, কপিলমুনি না হয় বলিলেন প্রকৃতি, পুরাণতন্ত্রকর্ত্তারা না হয় বলিলেন শক্তি, তাহাতে কি আইসে যায়? নামে কি আইসে যায়! শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তো "অবিদ্যা" বলিবেনই! তাঁহার শাস্ত্রে শুধু-কেবল জ্ঞানেরই সংস্থান রহিয়াছে, তা ছাড়া প্রকৃতির সংস্থান নাই; অথচ প্রকৃতি ব্যতিরেকে কোনো কাজই চলে না;—জ্ঞানের কাজও চলে না। কিন্তু প্রকৃতিকে তিনি আপন শাস্ত্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন—তাহাকে পাওয়া যাইবে কিরূপে? তিনি তাহার উপায় করিলেন এই যে, প্রকৃতিকে অজ্ঞান বা অবিদ্যা নামে অবগুণ্ঠিত করিয়া জ্ঞানেরই উল্টাপিট বলিয়া গ্রহণ করা যা'ক্। অবিদ্যা'র গোড়া'তে অ রহিয়াছে, প্রকৃতির গোড়া'তে প্র রহিয়াছে। অ কিনা না—কিছুই না; প্র কিনা প্রধান—সর্ব্বপ্রধান বস্তু। নামে, এইরূপ, দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কিন্তু কাজে শাঙ্কর-শাস্ত্রের অবিদ্যাও যা, সাংখ্য-শাস্ত্রের প্রকৃতিও তা, তন্ত্র-শাস্ত্রের শক্তিও তা—একই। "কাজে" শব্দের অর্থ এখানে তত্ত্বজ্ঞানের কাজে। ভজন-সাধনের কাজে তিনের মধ্যে বিশিষ্ট-রকমের প্রভেদ আছে, এ কথা আমি খুবই মানি; কিন্তু এ প্রভেদ বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রসঙ্গ-বহির্ভূত। প্রকৃত প্রস্তাব হইতে একটু যেন দূরে সরিয়া পড়া হইয়াছে, অতএব এখানে আর কালবিলম্ব না করিয়া গন্তব্যপথে প্রত্যাবর্ত্তন করা যা'ক্।

যদিও সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান পরস্পরের সহিত অবিমোচ্য সম্বন্ধসূত্রে জড়িত, তথাপি এরূপ হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে যে, কোনো বস্তু দেখিলে প্রধানত সত্তা চক্ষে পড়ে, কোনো বস্তু দেখিলে প্রধানত শক্তি চক্ষে পড়ে, কোনো বস্তু দেখিলে প্রধানত জ্ঞান চক্ষে পড়ে। অন্তঃকরণ-রাজ্যে প্রাণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সত্তা'র ভাব প্রধানত চক্ষে পড়ে; তার সাক্ষী—লোকে বলে

"বেঁচে-বর্ত্তে থাকা"। বর্ত্তিয়া থাকা (বর্ত্তমান থাকা) সত্তা'রই ধর্ম্ম। মনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে শক্তির ভাব প্রধানত চক্ষে পড়ে; তার সাক্ষী—লোকে বলে "মনের জোর"। বুদ্ধির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে জ্ঞানের ভাব প্রধানত চক্ষে পড়ে; তার সাক্ষী—লোকে বলে "বুদ্ধির পরামর্শ"। অন্তরিন্দ্রিয়-রাজ্যে এ যাহা দেখা গেল—বহিরিন্দ্রিয়-রাজ্যে দৃষ্টিপাত করিলে তাহারই আর-এক পিট স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা দেখিতে হইলে স্পর্শেন্দ্রিয়ের অর্থের পরিধিকে আভিধানিক সংজ্ঞার সীমা ছাড়াইয়া আর-একটু বেশীদূর বিস্তৃত করা আবশ্যক। আমরা দেখিতে পাই যে, হস্তের স্পর্শ যেমন হস্তের সহিত অব্যবহিতভাবে (অর্থাৎ মাথামাখি-ভাবে) গাত্রে অনুভূত হয়, রসের আস্বাদ তেমনি রসের সহিত অব্যবহিত-ভাবে রসনায় অনুভূত হয়; এবং পরিমলের ঘ্রাণ তেমনি পরিমলের সহিত অব্যবহিত-ভাবে নাসিকায় অনুভূত হয়। অতএব ইন্দ্রিয়ের বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার, এই দুয়ের মাথামাখি-ভাবকে যদি স্পর্শের বৈশেষিক লক্ষণ বলিয়া ধরা যায়, তবে ত্বক্, রসনা এবং নাসিকা, তিনকেই স্পর্শেন্দ্রিয়ের কোঠায় নিক্ষেপ করা যাইতে পারে। এখানে তাহাই করা হইল। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, স্পর্শেন্দ্রিয়ে প্রাণ এবং সত্তার ভাব প্রধানত স্ফুরিত হয়; তার সাক্ষী—সুস্নিগ্ধ সমীরণের সংস্পর্শে, সুস্বাদু অন্নপানীয়ের আস্বাদনে, সুরভি পুষ্পের আঘ্রাণে লোকে বলে "প্রাণ ঠাণ্ডা হ'ল"। আর, সেইরূপ প্রাণ ঠাণ্ডা হওয়া গতিকে শরীরে একপ্রকার স্বাস্থ্য অনুভূত হয়। স্বাস্থ্য-শব্দের অর্থ হ'চ্চে আপনাতে আপনি স্থিতি;—তাহা সত্তারই ধর্ম্ম। শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রধানত মন এবং শক্তির ভাব স্ফুরিত হয়; তার সাক্ষী—"শোনো" এবং "মন দেও", এ দুয়ের মধ্যে অত্যন্তই প্রভেদ। তা ছাড়া, যুদ্ধক্ষেত্রে সিংহনাদ, ভেরীনির্ঘোষ, হল্লারব প্রভৃতি শব্দ স্বপক্ষদলের বাহুতে শক্তি সঞ্চার করে, এবং বিপক্ষদলের বাহু হইতে শক্তি হরণ করে। চক্ষুরিন্দ্রিয়ে প্রধানত বুদ্ধি এবং জ্ঞানের ভাব স্ফুরিত হয়; তার সাক্ষী—যদি বলা যায় "দেক্‌চ না, এটা কেবল একটা স্তোকবাক্য"; তবে "দেক্‌চ না" কথাটির অর্থ "বুঝ্‌তে পারচ না" ছাড়া আর-কিছুই হইতে পারে না। মন এবং বুদ্ধির মধ্যে প্রভেদ যে, কিরূপ, তাহা বহুপূর্ব্বে বলিয়া চুকিয়াছি; শ্রবণেন্দ্রিয় এবং দর্শনেন্দ্রিয়ের মধ্যে তাহারই অবিকল প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। মন যেমন ভাবের-অনুবন্ধিতা-(association of ideas)-সূত্রে বিশেষ-বিশেষ হইতে বিশেষ-বিশেষে প্রধাবিত হয়, শ্রবণেন্দ্রিয় সেইরূপ ক হইতে খ-এ, খ হইতে গ-এ, গ হইতে ঘ-এ—এইরূপ ব্যষ্টি হইতে ব্যষ্টিতে প্রধাবিত হয়। পক্ষান্তরে, বুদ্ধি যেমন বিবিধপ্রকার বিশেষ-বিশেষ ব্যাপারকে সামান্যের অন্তর্ভূত করিয়া সামান্য এবং বিশেষ দুইকেই একযোগে অবধারণ করে, দর্শনেন্দ্রিয় সেইরূপ সমষ্টি এবং ব্যষ্টি—বন এবং বনস্থ বৃক্ষরাজি—দুইই একযোগে উপলব্ধি করে। এইরূপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, দর্শনেন্দ্রিয় বুদ্ধিপ্রধান, শ্রবণেন্দ্রিয় মনঃপ্রধান, স্পর্শেন্দ্রিয় প্রাণপ্রধান;

আর, তাহা হইতেই আসিতেছে এই যে, দর্শনেন্দ্রিয় জ্ঞানপ্রধান, শ্রবণেন্দ্রিয় শক্তি-প্রধান, স্পর্শেন্দ্রিয় সত্তাপ্রধান।

উপরে যাহা সংক্ষেপে—একপ্রকার সাঁটেসোঁটে—বলিলাম, তাহার সমস্ত বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলন করিতে হইলে তাহা দুই-এক ছত্রের কর্ম্ম নহে; তাহার আলোচনায় অধ্যায়কে-অধ্যায় পার হইয়া যাইতে থাকিলেও—যতগুলা অধ্যায় ছাড়াইয়া আসা যাইবে, ততগুলা ভাবী অধ্যায়ের খোরাক জমা হইতে থাকিবে—কিছুতেই আর জের মিটিবে না। মাঝপথে কালবিলম্ব করা শ্রেয়স্কর নহে, তাহা আমি গোড়াতেই বলিয়াছি—বলিয়া-কহিয়া তবে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এক্ষণে কেবল একটি বিষয় বলিবার আছে, সেইটি হইয়া চুকিলেই পাথেয়-সংগ্রহের দায় হইতে এ-যাত্রা আমি অব্যাহতি পাইতে পারি। সেটি হ'চ্ছে সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান, তিনের সামঞ্জস্য।

আমি যেরূপ ব্যক্তি এবং আমার যেরূপ শক্তি, তাহা ছাড়াইয়া আমার জ্ঞানের আদর্শ যদি এত উচ্চ হইয়া ওঠে যে, কোনো গতিকেই আমি তাহা হাত বাড়াইয়া নাগাল্ পাইতে পারি না, এক কথায়—জ্ঞান যদি সত্তা এবং শক্তিকে, অথবা যাহা একই কথা—প্রাণ এবং মনকে, অনেক-হাত নীচে ফেলিয়া মহোচ্চ সত্যের শিখরে আরোহণ করে, তাহা হইলে আমার জ্ঞানের সেই উচ্চ আদর্শ আমার মধ্যে একপ্রকার উল্টা ফল উৎপাদন করে—আপন মহোজ্জ্বল আলোকে আমার অপদার্থতা এবং অক্ষমতা ফুটাইয়া তুলিয়া আমার মনোমধ্যে অশান্তি এবং বিষাদের উৎস উদ্মুক্ত করিয়া দ্যায়। কিন্তু তাহাও স্বীকার—তথাপি জ্ঞানের আলোক আমার চক্ষের সম্মুখ হইতে একটুও সরাইয়া রাখা আমার প্রার্থনীয় হইতে পারে না। কেন না, তাহা করিলে আপাতত এক-প্রকার মনকে-প্রবোধ-দেওয়া-গোছের শান্তি লাভ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে উন্নতির দ্বারে কপাট পড়িয়া গিয়া তলে তলে অধোগতির সোপান প্রস্তুত হইতে থাকে। এরূপ স্থলে সৎপরামর্শ হ'চ্ছে—নীচের নীচের ধাপ মাড়াইয়া জ্ঞানের উচ্চশিখরে শক্তিকে এবং সত্তাকে—মনকে এবং প্রাণকে টানিয়া তোলা।

মনে কর, একজন চাসা'র বড়ই ইচ্ছা গিয়াছে যে, সে জমিদার হয়। সে আপনার লাঙলের কাজে জলাঞ্জলি দিয়া অষ্টপ্রহর কেবল জমিদারী সেরেস্তায় আনাগোনা করে, আর, সেই গতিকে জমিদারী কার্য্যের প্রণালী-পদ্ধতি-বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে মন্দ না। কিন্তু হইলে হইবে কি—এক-কাঠা জমি ক্রয় করে, সে সঙ্গতি তাহার নাই। যৎকিঞ্চিৎ যাহা তাহার ধান্যের পুঁজি ছিল—কৃষিকার্য্যে অনবধানতা-গতিকে সে তাহা অনেকদিন হইল খোয়াইয়া বসিয়া আছে। এ অবস্থায় তাহার কর্ত্তব্য হ'চ্ছে—প্রথমত জমিদারী সেরেস্তায় ঘুরিয়া-বেড়ানো বন্ধ করা। দ্বিতীয়ত কৃষিকার্য্যে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া ধান্যের সংস্থান করা। তৃতীয়ত ধান্যের মহাজনদিগকে আদর্শ করিয়া অল্প-স্বল্প বাণিজ্য-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া! চতুর্থত যখন সে দেখিবে হাতে

কিছু টাকা জমিয়াছে, তখন দুই-এক-বিঘা জমি ক্রয় করা! চাসাটির আদর্শ খুব উচ্চ—এটা ভাল বই মন্দ নহে; কিন্তু তা বলিয়া এটা ভুলিলে চলিবে না যে, নীচের নীচের ধাপ মাড়াইয়া আপনার শক্তি-সামর্থ্যকে সেই উচ্চ আদর্শের কাছ-বরাবর টানিয়া তুলিতে হইবে। এটা কেবল একটা উপমা-মাত্র। প্রকৃত কথা এই যে, জ্ঞানের সহিত শক্তি এবং সত্তার সামঞ্জস্য ব্যতিরেকে মনুষ্যমনের অশান্তি এবং বিষাদ কিছুতেই ঘুচিবার নহে। জ্ঞান, শক্তি এবং সত্তা, তিনের সামঞ্জস্যই আনন্দের প্রস্রবণ। প্রথমে সত্তা এবং শক্তি হইতে জ্ঞানকে কতকমাত্রা বিশ্লেষিত করা আবশ্যক; কেন না, তাহা না করিলে সদসদ্‌বিবেক জন্মিতে পারে না। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, পঠদ্দশায় বালক ব্যাকরণ এবং গণিত প্রভৃতি বিদ্যা যাহা শিক্ষা করে, তাহা নিছক জ্ঞানেরই ব্যাপার, তাহার সহিত কাজের কিংবা বাস্তবিক পদার্থের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কোনো সংস্রব নাই। ইহাতে—বালকের বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়; কাহাকে বলে কর্ত্তা, কাহাকে বলে কর্ম্ম, কাহাকে বলে ক্রিয়া, কাহাকে বলে রেখা, কাহাকে বলে ফলক, কাহাকে বলে পিণ্ড, ইত্যাদি বিষয়ে তাহার জ্ঞান জন্মে। প্রথমে জ্ঞানের এইরূপ বিশ্লেষণ আবশ্যক হয় বটে—কিন্তু চিরকালই যদি বালকের ব্যাকরণজ্ঞান শক্তি এবং সত্তা হইতে বিশ্লেষিত থাকে—বালক যদি যথাকালে ব্যাকরণে সুপণ্ডিত হইয়াও একছত্র চিঠি লিখিতে হইলে গলদ্‌ঘর্ম্ম-কলেবর হয়, তবে তাহার সে জ্ঞান থাকা না থাকা সমান। পুঁথিগত জ্ঞানের সঙ্গে সত্তা এবং শক্তির যোগ হইলে, তবেই তাহা কাজের জ্ঞান হইয়া ওঠে। প্রথম-বয়সে জ্ঞানকে সত্তা এবং শক্তি হইতে বিশ্লেষিত করা যেমন আবশ্যক—উত্তর-বয়সে বিশ্লেষিত জ্ঞানকে সত্তা এবং শক্তির সহিত যোজনা করা তেমনিই আবশ্যক। কিন্তু একটি বিষয় সর্ব্বকালেই আবশ্যক; সে বিষয়টি হ'চ্ছে—বিশ্লেষণ এবং সংযোজনের মধ্যে সামঞ্জস্যরক্ষা। প্রথম-বয়সেও জ্ঞানকে মাত্রাতীত বেশী বিশ্লেষিত করা বিধেয় নহে; আর, তাহা বিধেয় নহে বলিয়াই এক্ষণে পাশ্চাত্য প্রদেশের অভিভাবক-মহলে কিণ্ডারগার্টেন-(kindergarten)-নামক নূতন শিক্ষাপ্রণালীর এতাধিক আন্দোলন চলিতেছে। তেমনি আবার দ্বিতীয়-বয়সেও জ্ঞানকে কার্য্যের সহিত অতিমাত্র বিমিশ্রিত করিয়া জ্ঞানের বিশুদ্ধি সমূলে নষ্ট করাও বিধেয় নহে; আর, তাহা বিধেয় নহে বলিয়াই, পাশ্চাত্য-পণ্ডিত-মহলে বৈশেষিক-(specialist)-দিগের মাত্রাতীত দলবৃদ্ধির প্রতিবিধানের জন্য সর্ব্বসমন্বয়ের (synthetic philosophy'র) একটা প্রকৃষ্টপথ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। প্রকৃত কথা এই যে, শান্তি এবং আনন্দ লাভ করিতে হইলে, সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান—তিনের বিশ্লেষণ এবং সংযোজনের সামঞ্জস্য ব্যতিরেকে তাহা কোনোপ্রকারেই সম্ভাবনীয় নহে। এখন কথা হ'চ্ছে এই যে, সামঞ্জস্য হয় কিসে? বিশ্লেষণই বা কতমাত্রা হইলে ঠিক্ হয়—সংযোজনই বা কতমাত্রা

হইলে ঠিক্ হয়? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এক হিসাবে অতীব সহজ, আর-এক হিসাবে অতীব কঠিন। তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর যে, মধ্যাহ্নভোজনের সময় কি-পরিমাণ অন্ন ভক্ষণ এবং কি-পরিমাণ জল পান করিলে ঠিক হয়, তবে তাহার সহজ উত্তর এই যে, "তোমার ক্ষুধাতৃষ্ণা যেরূপ বলিবে—তুমি সেইরূপ করিবে।" কিন্তু সে কথায় সন্তুষ্ট না হইয়া তুমি যদি বলো "আমি প্রত্যহ কয়সের অন্ন ভক্ষণ করিব এবং কয়সের জল পান করিব, তাহার ঠিক্‌ঠাক্ পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দাও"—তবে সেটা বড়ই কঠিন সমস্যা।

ক্ষুধাতৃষ্ণা যেমন বলিয়া দ্যায়—এই-পরিমাণ অন্ন এবং এই-পরিমাণ জল সেবনীয়, আনন্দ তেমনি বলিয়া দ্যায়—সত্তা-শক্তি-জ্ঞানের এই-পরিমাণ বিশ্লেষণ এবং এই-পরিমাণ সংযোজন প্রার্থনীয়। ফল কথা এই যে, সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান একীভূত হইয়া, মৃত সত্তায়, অথবা ফাঁকা জ্ঞানে, অথবা অন্ধ শক্তিতে পরিণত হইলেও আনন্দ হয় না, আর, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যূথভ্রষ্ট মৃগের ন্যায় তিন বীর তিন পথে প্রধাবিত হইলেও আনন্দ হয় না। সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞানের যে-মাত্রা সংযোজন-বিশ্লেষণে আনন্দ হয়, তাহারই নাম সামঞ্জস্য।

সৌরজগতে আকর্ষণ এবং বিকর্ষণের সামঞ্জস্য কেমন চমৎকার! সূর্য্যের বন্ধনের টানে পড়িয়া সৌরজগৎ যদি সূর্য্যের সহিত একীভূত হইয়া যায়, তাহা হইলেও যেমন; আর, সূর্য্যের নিকট হইতে তাড়া খাইয়া সৌরজগৎ যদি দড়ি ছিঁড়িয়া পলায়ন করে, তাহা হইলেও তেমনি; দুয়েতেই সৌর-জগতের প্রলয়দশা উপস্থিত হয়। কত-মাত্রা কাল সূর্য্যের অভিমুখী হইতে হইবে এবং কতমাত্রা কাল সূর্য্য হইতে পরাঙ্মুখী হইতে হইবে—পৃথিবীকে তাহা বলিয়া দিতে হয় না;—পৃথিবী তাহা ভালরূপ জানে;—পৃথিবীর তালবোধ আছে; তালবোধ থাকিবারই কথা—কেন না, সর্ব্বত্র নাট্যের কর্ত্রী ঐশী শক্তি নিনিদ্রনয়নে জাগিতেছেন।

এবারকার আলোচনাপথের মধ্য দিয়া আমরা ত্রিক হইতে চতুষ্কে উপনীত হইলাম। ত্রিক কি? না, সত্তা-শক্তি-জ্ঞান। চতুষ্ক কি? না, সত্তা শক্তি-জ্ঞান-আনন্দ। আনন্দ হয় কিসে? সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞানের সামঞ্জস্যে। মাঝপথের কার্য্য এক-প্রকার হইয়া চুকিল—অতঃপর পোঁটলা পুঁটুলি বাঁধিয়া সত্যরাজ্যের অভিমুখে প্রয়াণের উদ্যোগ করা যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

লক্ষ্মী-সরস্বতী।

হে লক্ষ্মি তোমার আজি নাই অন্তঃপুর!
সরস্বতীরূপ আজি ধরেছ মধুর,
দাঁড়ায়েছ সঙ্গীতের শতদলদলে।
মানসসরসী আজি তব পদতলে
নিখিলের প্রতিবিম্বে রঞ্জিছে তোমায়।
চিত্তের সৌন্দর্য্য তব বাধা নাহি পায়—
সে আজি বিশ্বের মাঝে মিশিছে পুলকে
সকল আনন্দে আর সকল আলোকে
সকল মঙ্গল সাথে! তোমার কঙ্কণ
কোমল কল্যাণপ্রভা করেছে অর্পণ
সকল সতীর করে। স্নেহাতুর হিয়া
নিখিল নারীর চিত্তে গিয়েছে গলিয়া।
সেই বিশ্বমূর্ত্তি তব আমারি অন্তরে
লক্ষ্মীসরস্বতীরূপে পূর্ণরূপ ধরে!

কথা।

তোমার সকল কথা বল নাই, পার নি বলিতে,
আপনারে খর্ব্ব করি' রেখেছিলে তুমি, হে লজ্জিতে,
যতদিন ছিলে হেথা। হৃদয়ের গূঢ় আশাগুলি
যখন চাহিত তারা কাঁদিয়া উঠিতে কণ্ঠ তুলি'
তর্জ্জনী-ইঙ্গিতে তুমি গোপনে করিতে সাবধান
ব্যাকুল সঙ্কোচবশে, পাছে ভুলে পায় অপমান!
আপনার অধিকার নীরবে নির্ম্মম নিজকরে
রেখেছিলে সংসারের সবার পশ্চাতে হেলাভরে।
লজ্জার অতীত আজি মৃত্যুতে হয়েছ মহীয়সী,—
মোর হৃদিপদ্মদলে নিখিলের অগোচরে বসি
নতনেত্রে বল তব জীবনের অসমাপ্ত কথা
ভাষাবাধাহীন বাক্যে! দেহমুক্ত তব বাহুলতা
জড়াইয়া দাও মোর মর্ম্মের মাঝারে একবার—
আমার অন্তরে রাখ তোমার অন্তিম অধিকার!

নব পরিণয়।

মৃত্যুর নেপথ্য হতে আরবার এলে তুমি ফিরে'
নূতন বধূর সাজে হৃদয়ের বিবাহ-মন্দিরে
নিঃশব্দচরণপাতে! ক্লান্ত জীবনের যত গ্লানি
ঘুচেছে মরণস্নানে। অপরূপ নবরূপখানি
লভিয়াছ এ বিশ্বের লক্ষ্মীর অক্ষয়রূপা হ'তে।
স্মিতস্নিগ্ধমুগ্ধমুখে এ চিত্তের নিভৃত আলোতে
নির্ব্বাক্ দাঁড়ালে আসি! মরণের সিংহদ্বার দিয়া
সংসার হইতে তুমি অন্তরে পশিলে আসি, প্রিয়া,—
আজি বাজে নাই বাদ্য, ঘটে নাই জনতা-উৎসব,
জ্বলে নাই দীপমালা; আজিকার আনন্দ গৌরব
প্রশান্ত গভীর স্তব্ধ বাক্যহারা অশ্রু-নিমগন।
আজিকার এই বার্ত্তা জানে নি শোনে নি কোনোজন।
আমার অন্তর শুধু জ্বেলেছে প্রদীপ একখানি,—
আমার সঙ্গীত শুধু একা গাঁথে মিলনের বাণী!

পূর্ণতা।

আপনার মাঝে আমি করি অনুভব
পূর্ণতর আজি আমি। তোমার গৌরব
মুহূর্ত্তে মিশায়ে তুমি দিয়েছ আমাতে।
ছোঁয়ায়ে দিয়েছ তুমি আপনার হাতে
মৃত্যুর পরশমণি আমার জীবনে।
উঠেছ আমার শোকযজ্ঞহুতাশনে
নবীন নির্ম্মলমূর্ত্তি,—আজি তুমি সতি
ধরিয়াছ অনিন্দিত সতীত্বের জ্যোতি,—
নাহি তাহে শোকদাহ, নাহি মলিনিমা,—
ক্লান্তিহীন কল্যাণের বহিয়া মহিমা
নিঃশেষে মিশিয়া গেছ মোর চিত্তসনে।
তাই আজি অনুভব করি সর্ব্বমনে—
মোর পুরুষের প্রাণ গিয়েছে বিস্তারি'
নিত্য তাহে মিলি গিয়া মৃত্যুহীন নারি!

সার্থকতা।

তুমি মোর জীবনের মাঝে
মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।
চিরবিদায়ের আভা দিয়া
রাঙায়ে গিয়েছ মোর হিয়া,
এঁকে গেছ সব ভাবনায়
সূর্য্যাস্তের বরণচাতুরী।
জীবনের দিক্‌চক্রসীমা
লভিয়াছে অপূর্ব্ব মহিমা,
অশ্রুধৌত হৃদয়-আকাশে
দেখা যায় দূর স্বর্গপুরী।
তুমি মোর জীবনের মাঝে
মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।

তুমি ওগো কল্যাণরূপিণী
মরণেরে করেছ মঙ্গল।
জীবনের পরপার হতে
প্রতিক্ষণে মর্ত্ত্যের আলোতে
পাঠাইছ তব চিত্তখানি
মৌনপ্রেমে সজল-কোমল।
মৃত্যুর নিভৃত স্নিগ্ধঘরে
বসে আছ বাতায়ন'পরে,
জ্বালায়ে রেখেছ দীপখানি
চিরন্তন আশায় উজ্জ্বল।
তুমি ওগো কল্যাণরূপিণী
মরণেরে করেছ মঙ্গল।

তুমি মোর জীবন-মরণ
বাঁধিয়াছ দুটি বাহু দিয়া।
প্রাণ তব করি অনাবৃত
মৃত্যুমাঝে মিলালে অমৃত,
মরণেরে জীবনের প্রিয়
নিজহাতে করিয়াছ, প্রিয়া!

খুলিয়া দিয়াছ দ্বারখানি,
যবনিকা লইয়াছ টানি',
জন্মমরণের মাঝখানে
নিস্তব্ধ রয়েছ দাঁড়াইয়া।
তুমি মোর জীবন-মরণ
বাঁধিয়াছ দুটি বাহু দিয়া!

সঞ্চয়।

দেখিলাম খানকয় পুরাতন চিঠি—
স্নেহমুগ্ধ জীবনের চিহ্ন দু'চারিটি
স্মৃতির খেলেনা ক'টি বহু যত্নভরে
গোপনে সঞ্চয় করি' রেখেছিলে ঘরে।
যে প্রবল কালস্রোতে প্রলয়ের ধারা
ভাসাইয়া যায় কত রবিচন্দ্রতারা
তারি কাছ হতে তুমি বহু ভয়ে ভয়ে
এই ক'টি তুচ্ছ বস্তু চুরি করে' লয়ে
লুকায়ে রাখিয়াছিলে,—বলেছিলে মনে
অধিকার নাই কারো আমার এ ধনে!
আশ্রয় আজিকে তারা পাবে কার কাছে?
জগতের কারো নয়, তবু তারা আছে!
তাদের যেমন তব রেখেছিল স্নেহ,
তোমারে তেমনি আজ রাখেনি কি কেহ?

রচনা।

এ সংসারে একদিন নববধূবেশে
তুমি যে আমার পাশে দাঁড়াইলে এসে,
রাখিলে আমার হাতে কম্পমান হাত
সে কি অদৃষ্টের খেলা, সে কি অকস্মাৎ?
শুধু এক মুহূর্ত্তের এ নহে ঘটনা
অনাদিকালের এই আছিল মন্ত্রণা!
দোঁহার মিলনে মোরা পূর্ণ হব দোঁহে
বহুযুগ আসিয়াছি এই আশা বহে'!

নিয়ে গেছ কতখানি মোর প্রাণ হতে,
দিয়ে গেছ কতখানি এ জীবনস্রোতে!
কত দিনে কত রাত্রে কত লজ্জাভয়ে
কত ক্ষতিলাভে কত জয়ে পরাজয়ে
রচিতেছিলাম যাহা মোরা শ্রান্তিহারা
সাঙ্গ কে করিবে তাহা মোরা দোঁহে ছাড়া?

সন্ধান।

স্বল্প-আয়ু এ জীবনে যে কয়টি আনন্দিত দিন—
কম্পিত পুলকভরে, সঙ্গীতের বেদনা-বিলীন—
লাভ করেছিলে, লক্ষ্মি, সে কি তুমি নষ্ট করি যাবে?
সে আজি কোথায় তুমি যত্ন করি রাখিছ কি ভাবে
তাই আমি খুঁজিতেছি! সূর্য্যাস্তের স্বর্ণমেঘস্তরে
চেয়ে দেখি একদৃষ্টে,—সেথা কোন্ করুণ অক্ষরে
লিখিয়াছ সে জন্মের সায়াহ্নের হারানো কাহিনী!
আজি এই দ্বিপ্রহরে পল্লবের মর্ম্মর রাগিণী
তোমার সে কবেকার দীর্ঘশ্বাস করিছে প্রচার!
আতপ্ত শীতের রৌদ্রে নিজহস্তে করিছ বিস্তার
কত শীতমধ্যাহ্নের সুনিবিড় সুখের স্তব্ধতা!
আপনার পানে চেয়ে বসে বসে ভাবি এই কথা—
কত তব রাত্রিদিন কত সাধ মোরে ঘিরে আছে,
তাদের ক্রন্দন শুনি ফিরে ফিরে ফিরিতেছ কাছে!

অশোক।

বজ্র যথা বর্ষণেরে আনে অগ্রসরি'
কে জানিত তব শোক সেইমত করি
আনি দিবে অকস্মাৎ জীবনে আমার
বাধাহীন মিলনের নিবিড় সঞ্চার!
মোর অশ্রুবিন্দুগুলি কুড়ায়ে আদরে
গাঁথিয়া সীমন্তে পরি' ব্যর্থশোক'পরে
নীরবে হানিছ তব কৌতুকের হাসি!

ক্রমে সবা হতে যত দূরে গেলে ভাসি'
তত মোর কাছে এলে! জানি না কি করে'
সবারে বঞ্চিয়া তব সব দিলে মোরে!
মৃত্যুমাঝে আপনারে করিয়া হরণ
আমার জীবনে তুমি ধরেছ জীবন,
আমার নয়নে তুমি পেতেছ আলোক—
এই কথা মনে জানি' নাই মোর শোক!

জীবনলক্ষ্মী।

সংসার সাজায়ে তুমি আছিলে রমণি
আমার জীবন আজি সাজাও তেমনি
নির্ম্মল সুন্দর-করে। ফেলি' দাও বাছি'
যেথা আছে যত ক্ষুদ্র তৃণকুটাগাছি—
অনেক আলস্যক্লান্ত দিনরজনীর
উপেক্ষিত ছিন্নখণ্ড যত। আন নীর,
সকল কলঙ্ক আজি করগো মার্জ্জনা,
বাহিরে ফেলিয়া দাও যত আবর্জ্জনা।
যেথা মোর পূজাগৃহ নিভৃতমন্দিরে
সেথায় নীরবে এস দ্বার খুলি' ধীরে,—
মঙ্গলকনকঘটে পুণ্যতীর্থজল
সযত্নে ভরিয়া রাখ, পূজাশতদল
স্বহস্তে তুলিয়া আন। সেথা দুইজনে
দেবতার সম্মুখেতে বসি একাসনে।

বুদ্ধদেবের পাখী।

(ফরাসী কবি কম্পে হইতে)

লভিল সান্ত্বনা যবে বিশ্বজন তাঁর উপদেশে
পশিলেন বুদ্ধদেব মহাঘোর অরণ্য-প্রদেশে।
"নির্ব্বাণ" তাঁহার এবে একমাত্র চিন্তার বিষয়,
বসিলেন তারি ধ্যানে স্বর্গপানে তুলি বাহুদ্বয়।
বহুদিন বসি' এই সুপবিত্র ধ্যানের আসনে
যোগানন্দে মগ্ন তিনি অরণ্যের গভীর বিজনে।

অনন্ত স্বপনে করি' আপনার চিত্ত সমাধান
করিতে লাগিলা তপ লভিবারে স্বর্গীয় নির্ব্বাণ।
কালবশে এইরূপে জীর্ণশীর্ণ, অতি হীন-বল
অস্থিচর্ম্মসার দেহ— তবু ধ্যানে যতীন্দ্র অটল।
আর নাহি পায় তাপ দেহ তাঁর সূর্য্যকরজালে,
অসাড় সে দেহযষ্টি তরুসম ছাইল শৈবালে।
আঁধার আঁখির পাতা, নয়নের তারা দৃষ্টিহীন,
—মনে হয় যেন, উহা হয়ে গেছে প্রস্তর-কঠিন।
অনশনে, বুদ্ধদেব হইয়াছিলেন মৃতপ্রায়;
শুধু ছোট পাখীগুলি —যারা ভাল বাসিত তাঁহায়,
যাহারা করিত গান তরুশাখে বসি মনসুখে,—
—রাখিয়া যাইত ফল তাঁর সেই তৃষাশুষ্ক মুখে;
এইরূপ বহুদিন সেই সব ক্ষুদ্র বিহঙ্গম
ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেবে কোনমতে করিল পোষণ॥

সহস্রসহস্র বার সহস্রবরষ অগণন
মাথার উপর দিয়া চলি গেল চন্দ্রমা-তপন,
তথাপি মুহূর্ত্ততরে সেই মহাসমাধি তাঁহার
টুটিল না কোনমতে —প্রতি অঙ্গ নিষ্পন্দ অসাড়
দক্ষিণ বাহুটি, যাহা উত্তোলিত ঊর্দ্ধে নিরন্তর
শুখায়ে ধবলবর্ণ মনে হয় কঠিন প্রস্তর,
সেই হাতটিতে তাঁর —প্রবেশিয়া অরণ্য নিবিড়—
ক্ষুদ্র এক পাখী আসি, যতনে রচিল ক্ষুদ্র নীড়।
পাখীটি উড়িয়া গেল রাখি' নীড় বিশ্বস্ত পরাণে,
লঙ্ঘিয়া সাগর-গিরি গেল চলি' দূর-দূর স্থানে।
প্রতি শীতকালে, ফিরি' আসিত গো সেই নীড়ে তার,
দেখিত তেমনি ঠিক্ অটুট অক্ষয় প্রতিবার।
এইরূপ আসে যায় অতিক্রমি' কত সিন্ধু-গিরি
একবার কি হইল আর সে যে না আইল ফিরি।

যে সব ভ্রমন্ত পাখী দূরে যায় নিদাঘে চলিয়া,
আবার আইলে শীত পুন আসে স্বদেশে ফিরিয়া,
ফিরিবার কাল যবে তাহাদের হইল অতীত,

হিমাচল হল যবে
যখন সে পাখীগুলি
তখন গো বুদ্ধদেব
—শূন্য তাঁর করতল
দেখে নাই এতকাল
অসীম অনন্ত হেরি'
শূন্য আকাশের ধ্যানে
—নেত্রপক্ষ্মরাজি দগ্ধ
তপ্ত দুইফোঁটা জল
শূন্য ছিল মন যাঁর
আশা অনুরাগ যার
সংসার হইতে যিনি
সংসারের সুখদুঃখ
সেই ভগবান্ বুদ্ধ
পাখীটির তরে আহা

সুগভীর বরফে আবৃত,
আর নাহি আসে নিজ নীড়ে,
ফিরিয়া দেখেন ধীরে ধীরে
তখন যে নয়ন মুনির
কোন-কিছু বস্তু পৃথিবীর
যে নয়ন অন্ধ ঝলসিত,
যে আঁখির দৃষ্টি নির্ব্বাপিত,
রক্ত ছোটে আঁখিপাতা দিয়া—
উঠিল সে নয়ন ভরিয়া।
বস্তু হীন শূন্যের ধেয়ানে,
একমাত্র আছিল নির্ব্বাণে,
ঘোর বনে করি' পলায়ন
করিয়াছিলেন বিসর্জ্জন
নিতান্তই শিশুটির মত
বরষিলা অশ্রুজল কত॥

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুখদুঃখ।

উভয়ে সমান মম সুখ দুঃখ আর—
তুমি মোর দুঃখ, তুমি সুখ সে আমার!
তুমি চির বরণীয়, তাই এ অন্তরে
সুখদুঃখে বরিয়াছি তুল্য সমাদরে।

সঙ্গী।

হে দুঃখ, আমারে তুমি তিলেকের তরে
একাকী ফেলিয়া কভু যেয়ো না অন্তরে!
প্রিয় বিরহিত আমি, তুমি না রহিলে
বাঁচিতে নারিব আর এ শূন্য নিখিলে!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বঙ্গদর্শন।

জাগরণ।

জাগরে জাগরে চিত্ত জাগরে!
জোয়ার এসেছে অশ্রুসাগরে!
কূল তার নাহি জানে,
বাঁধ আর নাহি মানে,
তাহারি গর্জ্জনগানে জাগরে!
তরী তোর নাচে অশ্রুসাগরে!

আজি এ উষার পুণ্য-লগনে
উঠেছে নবীন সূর্য্য গগনে।
দিশাহারা বাতাসেই
বাজে মহামন্ত্র সেই
অজানা যাত্রার এই লগনে
দিক্ হতে দিগন্তের গগনে।

জানি না উদার শুভ্র আকাশে
কি জাগে অরুণদীপ্ত আভাসে।
জানি না কিসের লাগি
অতল উঠেছে জাগি
বাহু তোলে কারে মাগি' আকাশে,
পাগল কাহার দীপ্ত আভাসে!

শূন্য মরুময় সিন্ধু-বেলাতে
বন্যা মাতিয়াছে রুদ্র-খেলাতে।
হেথায় জাগ্রত দিন
বিহঙ্গের গীতহীন,
শূন্য এ বালুকা-লীন বেলাতে,
এই ফেন-তরঙ্গের খেলাতে।

দুলে রে, দুলে রে, অশ্রু দুলে রে
আঘাত করিয়া বক্ষ-কূলে রে।
সম্মুখে অনন্ত লোক,
যেতে হবে যেথা হোক্,
অকূল আকুল শোক দুলে রে
ধায় কোন্ দূর স্বর্ণ-কূলে রে!

আঁকড়ি থেকো না অন্ধ ধরণী,
খুলে দে খুলে দে বন্ধ তরণী।
অশান্ত পালের 'পরে
বায়ু লাগে হাহা করে',
দূরে তোর থাক্ পড়ে ধরণী!
আর না রাখিস্ রুদ্ধ তরণী!

শিবপূজা।

যিনি অনাদি, যিনি অনন্ত, যিনি বাক্যমনের অগোচর, আর্য্যেরা প্রাচীনকাল হইতেই তাঁহাকে শিবস্বরূপ—মঙ্গলময় বলিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছেন। আর্য্য ঋষিগণ রক্ষা এবং আশ্রয়ের জন্য রুদ্রস্বরূপ পরমেশ্বরের দক্ষিণমুখ ধ্যান করিতেন। কিন্তু রজত-গিরিনিভ ত্রিনেত্র শূলপাণি কোন্ সময় হইতে শিব, মহাদেব বা রুদ্ররূপে পূজ্য হইয়াছিলেন, এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বেদত্রয়ের রুদ্র, ব্রাহ্মণের রুদ্র এবং ঈশান, অথবা অথর্ব্ববেদের ভব এবং শর্ব্ব, পৌরাণিক মহাদেবের অনুরূপ নহেন; অথচ এই সকল দেবতা মিলিয়া, এবং বহুপরিমাণে অন্য গুণাদি লইয়া, পৌরাণিক মহাদেব। শত-পথব্রাহ্মণে অম্বিকা রুদ্রের ভগিনী, পুরাণে

তিনি রুদ্রের পত্নী। পুরাণের মহাদেব রুদ্রও বটেন, ঈশানও বটেন; কিন্তু রূপে, গুণে, কর্ম্মে এবং প্রভুতায়, তিনি বৈদিক রুদ্র ও ঈশান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কোন্ সময়ে কি অবস্থায় এই মহাদেবের উৎপত্তি হইল, তাহাই অনুসন্ধান করিব।

কেহ হয় ত বলিতে পারেন যে, এই-প্রকার দেবমিশ্রণ হিন্দুজাতির চিরপ্রচলিত দেবপূজার অনুরূপ; এবং কাজেই স্বাভাবিক। তাহা স্বীকার করি। বেদে ইহার দৃষ্টান্তও আছে যে, যিনি ইন্দ্র, তিনিই অগ্নি এবং তিনিই বরুণ। বেদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন কোন নূতন দেবতার নামে ঋক্ আরম্ভ হইল, তখন অন্যান্য দেবতা যেন তাঁহার প্রভায় মলিন হইয়া পড়িলেন। সকল দেবতার স্বরূপ লইয়া, নূতন দেবতার মহিমা কীর্ত্তিত হইল; এবং তাঁহাকেই সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর বলা হইল। অনেকে ইহাকে দেববিরোধ বলিয়া মনে করিতেন। এখন কিন্তু য়ুরোপীয়েরা ইহার এইপ্রকার মীমাংসা করিয়াছেন যে, হিন্দুজাতি মূলত সর্ব্বেশ্বরবাদী বলিয়া, এবং সকল দেবতা একই দেবসত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ বলিয়া, বেদ হইতে পুরাণ পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্রই এইপ্রকার বর্ণনা দেখা যায়। তাঁহারা বলেন যে, এই কারণেই এক সময়ের এক দেবতার পত্নী অন্য সময়ে অন্য দেবতার সহচরী; এবং এক সময়ের ভগিনী ও দুহিতা অন্য সময়ে পত্নী বলিয়া বর্ণিত। হইতে পারে, এই মীমাংসাই যথার্থ মীমাংসা। ইহাতে কেবল ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, পৌরাণিক কল্পনা,—বৈদিক পদ্ধতি এবং দেশীয় সংস্কারের বিরোধী ছিল না বলিয়াই, উহা দূষিত বলিয়া ত্যক্ত হয় নাই, বরং গৃহীতই হইয়াছে। কিন্তু কোন্ কাঠামোর উপর, প্রাচীন উপাদান দিয়া, নূতন শিব গড়িতে গিয়া মহাদেব হইয়া পড়িল; এবং কোন সময়েই বা উঁহার আবির্ভাব হইল; এখানে সেই তত্ত্বের অনুসন্ধান করিব।

পৌরাণিক মহাদেবের সহিত আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ এবং পরিচয় মহাভারত এবং রামায়ণে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোন সাহিত্য বা প্রস্তরলিপিতে পার্ব্বতীপতির অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় না। সম্ভবত যে সময়ে সৌতিবিবৃত নব মহাভারত রচিত হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্ব হইতেই এই মহাদেবের অভ্যুদয় হয়; কিন্তু কোন সাহিত্যে কিছু উল্লেখ নাই।

মহাভারতের আখ্যানবস্তু কৌরবযুদ্ধ যত প্রাচীনই হউক না কেন, সৌতিবিবৃত মহাভারত যে অনেক আধুনিক, তাহা নিঃসন্দেহ। যে কেহ মহাভারত পড়িয়াছেন, তিনিই স্বীকার করিবেন যে, এই গ্রন্থ,—ষড়্-দর্শন, ধর্ম্মসূত্র প্রভৃতি রচিত হইবার অনেক পরবর্ত্তী। অপিচ, মগধাধিপতির রাজগৃহ-নগরের কথা, তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চৈত্যদান, মগধরাজ্যের পর্ব্বতে চৈত্য এবং বিহারের অবস্থিতি, সৌগতধর্ম্মের নিন্দাকীর্ত্তন প্রভৃতি হইতে ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, এই মহাভারত বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের অনেক পরে রচিত। খৃষ্টোত্তর দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ সময় ভিন্ন, কাম্বোজ-জাতিকে ভারতবর্ষীয় বলিয়া বর্ণনা করা, অথবা তাহাদের কোন রাজার নাম চন্দ্রবর্ম্মা বলিয়া কল্পনা করা, কোনপ্রকারে সম্ভবপর

হইতে পারে না। বিস্তৃতভাবে প্রমাণ প্রয়োগ করিতে গেলে, উদ্দিষ্ট বিষয়টির অবতারণায় বড়ই বিলম্ব হইবে। এখানে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট যে, পূর্ব্বে মহাভারত-কথা-সংবলিত অন্যান্য গ্রন্থ প্রচারিত হইয়া থাকিলেও, আমাদের পরিচিত প্রচলিত মহাভারত অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিক; হয় ত তৃতীয় শতাব্দীর।

এই মহাভারতে পার্ব্বতীপতির যে-প্রকার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা উল্লেখ করিতেছি। সৌতির সময়ে বৈদিক রুদ্রের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিতে পাই; তবুও তিনি এবং মহাদেব সম্পূর্ণ এক ব্যক্তি নহেন। উদ্যোগপর্ব্বের ১১৬তম অধ্যায়ে আছে যে, যেমন ইন্দ্রের পত্নী শচী, নারায়ণের পত্নী লক্ষ্মী, তেমনি বরুণের পত্নী গৌরী, সাগরের পত্নী জাহ্নবী, এবং রুদ্রের পত্নী রুদ্রাণী। আবার যেখানে খাঁটি একালের মহাদেবের কথা পাই, সেখানে তাঁহার পত্নী পার্ব্বতী বা উমা। তখনও রুদ্রাণী, গৌরী কিংবা অম্বিকা, উমার সহিত একাত্মতা লাভ করেন নাই। শান্তিপর্ব্বের ২৮২তম অধ্যায়ে দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা আছে। ঐ যজ্ঞে সকল দেবতারাই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মহাদেবের নিমন্ত্রণ হয় নাই। শৈলরাজ-দুহিতা পার্ব্বতী ক্ষুণ্ণা হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহেশ্বর প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে, পূর্ব্বকাল হইতে দেবতারা যে বিধান করিয়াছেন, তাহাতে কোন যজ্ঞেই তাঁহার ভাগ কল্পিত হয় নাই। স্বামীর এত প্রভুতা সত্ত্বেও তিনি দেবগণের মধ্যে নগণ্য, ইহা দেবীর সহ্য হইল না। মহাদেব তখন আত্মমাহাত্ম্যপ্রতিষ্ঠার জন্য, দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিলেন। যজ্ঞনাশের পর, ব্রহ্মা মহাদেবকে স্তুতি করিয়া বলিলেন, "হে মহাদেব, কেহই তোমার ক্রোধে শান্তিলাভ করিতে পারে না; অতএব দেবতারা সকলেই তোমাকে যজ্ঞভাগ প্রদান করিবেন।" মহাদেব প্রীত হইয়া দক্ষকে যজ্ঞফল দান করিয়া চলিয়া গেলেন। ২৮৩তম এবং ২৮৪তম অধ্যায়ে এই কথাটির একটু পরিবর্ত্তিত ভাবে অযথা পুনরাবৃত্তি হইয়াছে বলিয়া, ঐ দুইটি অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়। তাহা মনে না করিলেও, মহাভারতে দক্ষযজ্ঞের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে জানিতে পারা যায় যে:—(১) দক্ষযজ্ঞসম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ পৌরাণিক উপাখ্যান সে সময়ে সৃষ্ট হয় নাই। এখানে যজ্ঞ-বধ আছে, কিন্তু দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ নাই; পার্ব্বতী আছেন, কিন্তু তিনি দক্ষরাজদুহিতাও নহেন এবং যজ্ঞে তাঁহার দেহত্যাগও হয় নাই। (২) রুদ্র বৈদিককালে যজ্ঞভাগী ছিলেন; কিন্তু মহাদেবকে যজ্ঞভাগের জন্য স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে হইল।

মহাদেব মহাভারতরচনার সময়ে চতুর্ম্মুখ, পিনাকপাণি, ত্রিনেত্র এবং নীলকণ্ঠ। কিন্তু তাঁহার এই সকল অবয়ববৃদ্ধিও যে ধীরে ধীরে হইয়াছিল, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। অনুশাসনপর্ব্বের ১৪০তম এবং ১৪১তম অধ্যায়ে আছে যে, একদিন শৈলজা উমা পরিহাসচ্ছলে পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে আসিয়া মহাদেবের চক্ষু-দুইটি আবরণ করিয়া ধরিলেন। ফল এই হইল যে, সমগ্র সৃষ্টি অন্ধকারসমাচ্ছন্ন হইল; প্রলয়কাল আসিল ভাবিয়া, চরাচর ত্রাসযুক্ত হইল। মহাদেব

তখন ললাটদেশে তৃতীয় নয়ন প্রকাশ করিলেন; এবং সেই নয়নের দীপ্তি বা তেজে পর্ব্বত, অরণ্য প্রভৃতি দগ্ধ হইতে লাগিল। দেবী তখন মহাদেবের চক্ষু-দুইটি হইতে ক্রীড়াবিন্যস্ত কর অপসারণ করিলেন। মদনভস্মের গল্প মহাভারতে নাই; কিন্তু এই উপাদানই উহার মূল। তিলোত্তমার অনুসন্ধানে চারিদিকে মুখ ফিরাইতে গিয়া চতুর্ম্মুখ হইয়াছিলেন, লিখিত হইয়াছে; এখনও পর্য্যন্ত ব্রহ্মাকে ছাড়াইয়া উঠিয়া পঞ্চবক্ত্র হন নাই। অন্যত্র দেখিতে পাই যে, মন্বন্তরসময়ে কৃষ্ণবর্ণ নারায়ণ উঁহার শুভ্র কণ্ঠে হাত দিয়াছিলেন বলিয়া, মহাদেব নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন। বুঝিতে পারা গেল যে, এই ইতিহাস সাগরমন্থনের পৌরাণিক গল্পের পূর্ব্বে। এক দিকে ব্রহ্মা যেমন স্তব-স্তুতি করিয়া নীচে পড়িয়া গেলেন, সেইরূপ পিনাকধারী শর্ব্বের মহিমাও অন্যপ্রকার ইতিহাস দিয়া মহাদেবে আরোপিত হইল। এই বর্ণনায় শর্ব্বদেব একা নহেন, সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাণি বুদ্ধও মহাদেবের নব ব্রহ্মত্বে নির্ব্বাণলাভ করিলেন। বুদ্ধমূর্ত্তির সহিত একতার কথা পরে লিখিতেছি। ধীরে ধীরে নূতন নূতন ব্যাখ্যা দিয়া যে, নবদেবতার সৃষ্টি হইল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না।

যদি কেহ বলেন যে, মহাভারতের এই অধ্যায়গুলি সর্ব্বৈব প্রক্ষিপ্ত, তাহাতেও মহাদেবের নূতনত্ব দূরীভূত হয় না। এই কথাগুলি যখন রামায়ণে এবং পুরাণে অধিক পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন যে উহা রামায়ণ এবং পুরাণগুলির পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা অস্বীকার করা যায় না। অধ্যায়গুলিকে প্রক্ষিপ্ত করিতে গেলে, মহাভারতের সময়েও, মহাদেবের নববিগ্রহ প্রকাশ পায় নাই, এই কথা স্বীকার করিতে হয়। প্রক্ষিপ্তের তর্কটা হয় ত উঠিবে না।

গুপ্তরাজাদের চতুর্থশতাব্দীর প্রারম্ভের প্রস্তরলিপিতে নূতন মহাদেবের তত প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই না। কিন্তু উঁহাদের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর লিপিতে মহাদেবের প্রভাব সুবিস্তৃত। ৪০১ খৃষ্টাব্দের পরে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, শম্ভুর জন্য, পর্ব্বতের গুহায় আয়তন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার পর স্কন্দগুপ্তের সময় সম্পূর্ণ পৌরাণিকবর্ণনাযুক্ত মহাদেব পাই। যশোধর্ম্মার ৫৩৩ খৃষ্টাব্দের মাণ্ডাসোরের প্রস্তরলিপির আরম্ভেই দেখিতে পাই, "স জয়তি জগতাং পতিঃ পিনাকী"। এই প্রস্তরলিপিতে আছে :—

স্বয়ম্ভুর্ভূতানাং স্থিতিলয়সমুৎপত্তিবিধিষু
প্রযুক্তো যেনাজ্ঞাং বহতি ভুবনানাং বিধুতয়ে।
পিতৃত্বক্কানীতো জগতি গরিমাণং গময়তা
স শম্ভুর্ভূয়াংসি প্রতিদিশতু ভদ্রাণি ভবতাম্।

এখানে ব্রহ্মা একেবারে মহাদেবের আজ্ঞাবাহক; ব্রহ্মার গৌরব, প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই প্রস্তরলিপিতে একটা পরবর্ত্তী শ্লোকে মহাদেবকে নাগবেষ্টিত বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে; এই স্বরূপটির উৎপত্তির কথা পরে বলিতেছি। তর্ক উঠিতে পারে যে, শত শত প্রস্তরলিপির মধ্যে হয় ত অল্প কয়েকখানি পাওয়া গিয়াছে, তখন উহা হইতে দৃষ্টান্ত দেওয়া কি সঙ্গত? উত্তরে এই কথা বলিতে পারি যে, একদিকে তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বের সাহিত্যে যখন নূতন দেবতার পরিষ্কার নিদর্শন পাওয়া যায় না,

এবং অন্যদিকে ষষ্ঠ শতাব্দীর কাব্যাদিতে যখন তাঁহার সম্পূর্ণ রাজত্ব, তখন মধ্যবর্ত্তী সময়ে যে উঁহার পূজা ধীরে ধীরে প্রবলতা লাভ করিয়াছিল, এই অনুমানই সঙ্গত। প্রস্তরলিপি হইতেও সেই কথাই সমর্থিত হয়। হইতে পারে যে, আরও প্রস্তরলিপি পাইলে, অনেক নূতন কথা পাওয়া যাইত; কিন্তু যাহা পাওয়া যায়, তাহা যখন অন্যদিকের কথার অনুরূপ নহে, তখন দৃষ্টান্তগুলি গ্রহণ করা চলে। অপর পক্ষে আবার, ঠিক বিরোধী কথার প্রস্তরলিপিগুলিই পাওয়া গেল না, এটাও আশ্চর্য্য।

পৌরাণিক যুগের উৎপত্তির ইতিহাসের একটু আভাস না পাইলে, যে অবস্থায় নবদেবকল্পনা সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহা বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে না বলিয়া, সংক্ষেপত সে-সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয় হইতে অশোকের সময় পর্য্যন্ত ঐ ধর্ম্মের ইতিহাস পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, গোড়ায় বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের বড় বিবাদ ছিল না। ব্রাহ্মণেরা বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব যাহা বলিবেন, লোকে তাহাই গ্রহণ করিবে, এবং শূদ্রাদি জাতি সেই ধর্ম্মে অধিকারী নহেন, এইটিই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ ছিল। বুদ্ধদেব এই বিশেষত্বের এবং যজ্ঞাদির বিরোধী ছিলেন, তাহা সত্য। কিন্তু বুদ্ধদেব যেমন যজ্ঞাদি অসার বলিয়া নূতন পন্থা বাহির করিয়াছিলেন, হিন্দুরাও তেমনি উপনিষদাদিতে যজ্ঞাদির অসারত্বের কথা বলিতেছিলেন, বেদকেও অপরা বিদ্যার মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইজন্যই, বিশেষ শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের সহিত সদ্ভাব না থাকিলেও, বৌদ্ধধর্ম্ম এবং হিন্দুধর্ম্ম নির্বিবাদে পাশাপাশি বর্দ্ধিত হইতেছিল। পৌরাণিক যুগের আরম্ভ পর্য্যন্তও, হিন্দুরা বৌদ্ধদের চৈত্যাদিতে, এবং বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণদিগকে, দানাদি দ্বারা তুষ্ট করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু পরে অন্যান্য কারণে, এবং বিশেষত একটি রাজনৈতিক কারণে, বৌদ্ধবিদ্বেষের সূত্রপাত হইয়াছিল। রাজনৈতিক কারণটি এই:—মৌর্য্যরাজগণ ভারতবর্ষের বাহিরে বহুদেশে ভারতগৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের রাজত্বের অবসানে নানাশ্রেণীর যবনেরা বৌদ্ধধর্ম্মের দোহাই দিয়া বা সূত্র ধরিয়া, ভারতবর্ষে আসিয়া, যুদ্ধবিগ্রহ এবং রাজত্বস্থাপন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তখন বৌদ্ধবিদ্বেষ স্বাভাবিক; তখন বৌদ্ধদিগকে হিন্দু করিয়া লইবার চেষ্টাও, দেশরক্ষার জন্য স্বাভাবিক। একটু মিলাইয়া না লইলে চলে না বলিয়া, মিলনের উপায়ও অবলম্বিত হইয়াছিল। সামাজিক অবস্থাও এই মিলনের অনকূল ছিল। এই অবস্থা হইতেই নূতন পৌরাণিক যুগের সৃষ্টি। সেই কথাটাই এখানে বলিব।

ধর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হইবার পক্ষে, এবং মুক্তিলাভ করিতে, সকলের অধিকার ছিল বলিয়া, দলে দলে নানা শ্রেণীর লোক বৌদ্ধ হইয়াছিল। এই ধর্ম্মবিপ্লবে অনেক শূদ্রের শূদ্রত্ব ঘুচিয়া গিয়াছিল; এবং আর্য্য-অনার্য্য-মিশ্রণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। মহাভারতকার, শান্তিপর্ব্বের ৬৯তম অধ্যায়ে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে, কালবশে ব্রাহ্মণেরা দাস হইয়া গিয়াছেন, এবং শূদ্রেরা

ব্রাহ্মণের ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। দেশে আর খাঁটি আর্য্যজাতি নাই, আর্য্য ক্ষত্রিয় নাই, সকলেই শূদ্র; এই কথা আবার সভাপর্ব্বে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন। আক্ষেপের কথা যাহাই হউক, শূদ্রেরা যে মহাভারতরচনার যুগে বিলক্ষণ গণ্যমান্য হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা শান্তিপর্ব্বের ৮৫তম অধ্যায়ে রাজাদের মন্ত্রিসভার গঠননীতিতে দেখিতে পাই। লিখিত হইয়াছে যে, মন্ত্রিসভায় অন্যূন ৫০বর্ষবয়স্ক ৪জন ব্রাহ্মণ, ৮জন ক্ষত্রিয়, ২১জন বৈশ্য এবং ৩জন শূদ্র থাকিবেন। নানাশ্রেণীর লোকেরা যখন দলে দলে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, তখন তাহারা অনেক বিষয়ে আপনাদের কুলরীতি পরিত্যাগ করে নাই। বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরতত্ত্বাদির কথা কখনো মীমাংসিত হইতে পারে না; এজন্য, ঐ সকল কথার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, কেবল ব্যবহার ও আচারনীতির সুশিক্ষা এবং সাধনা দ্বারা চরিত্রের উৎকর্ষ লাভ করিয়া দুঃখাতীত নির্ব্বাণ লাভ করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। বংশগত সংস্কার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয় নাই বলিয়াই, অনেক লোক অতিশীঘ্র বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধদের দলপুষ্টি করিয়াছিল। যে যাহার যে কুলদেবতা অথবা ভূতপ্রেতজীবজন্তুর পূজা করিত, সেগুলি বজায় রাখিয়াই সে বৌদ্ধ হইয়াছিল। অন্যদিকে আবার, যখন মৌর্য্যগৌরবের অবসানে বৌদ্ধধর্ম্মের জলন্তভাব নিবিয়া আসিতেছিল, তখন নিরীশ্বরতা এবং সংসার-বৈরাগ্য বড় কঠোর হইয়া উঠিল। কেহ আর পূর্ব্বের আদর্শ বজায় রাখিতে পারিল না। শূন্যবাদ লইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া, বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিকেই উপাস্য করিয়া, স্বাভাবিক পূজা করিবার প্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধনের বন্দোবস্ত হইল। মৌর্য্যরাজত্বের অবসানে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে যে এইপ্রকার অনুষ্ঠানের আরম্ভ, তাহা বৌদ্ধ ইতিহাসেই পাই। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির সম্মুখে প্রদীপ জ্বালিয়া, পুষ্পাদি উপহার দিয়া, পূজা আরম্ভ হইল। এমন কি, ধর্ম্মচক্র এবং বোধিদ্রুমেরও পূজা চলিল। কিছুদিন পরেই আবার বৌদ্ধ সাধুগণের মূর্ত্তিও পূজিত হইল; এবং পরে আবার তাঁহাদের মূর্ত্তিগুলি রথে স্থাপন করিয়া, রথ টানিয়া উৎসব চলিতে লাগিল। এই সময়ে বুদ্ধদেবের নামে পুরাণাদি রচিত হইয়া তাঁহাকেই ঈশ্বর করিয়া তোলা হইল। যেমন করিয়া হউক, শূন্য পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

অবশ্য হিন্দুদের দেবতাগণ চিরদিনই এমন ভাবে বর্ণিত যে, তাঁহাদের একটা ছবি পাওয়া যাইত। কিন্তু যজ্ঞবেদিতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া আহুতিদ্বারাই পূজার ব্যবস্থা ছিল; কোন মূর্ত্তি, রচিত বা স্থাপিত হইত না। প্রায় খৃঃ পূঃ ১৩০ অব্দে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা দেবতাদের ছোট ছোট মূর্ত্তি গড়িয়া, লোকের গৃহে লইয়া বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা এই অভিনব কার্য্যের জন্য 'দেবল'নাম পাইয়াছিলেন। নূতন প্রথাটা বৌদ্ধদের অনুকরণ বলিয়া, পরবর্ত্তী সময়ের মনুসংহিতায়ও দেবল ব্রাহ্মণেরা অতি নীচ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। প্রথাটা যে উল্লিখিত সময়ে নূতন প্রবর্ত্তিত, কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলি তাহার সাক্ষী। কাত্যায়ন

এবং পতঞ্জলি যে ঐ সময়ে প্রাদুর্ভূত, তাহা তাঁহাদের গ্রন্থে গ্রীক্ যবন এবং শকদের তৎসাময়িক যুদ্ধাদির কথার উল্লেখে প্রমাণিত। কিন্তু দেবলেরা তখনও প্রতিমাপূজা প্রবর্ত্তিত করাইতে পারেন নাই। প্রমাণ মহাভারত। ঐ গ্রন্থে ধর্ম্মের অনুশাসনে সকলপ্রকার যাগযজ্ঞের কথা আছে, কিন্তু কোথাও, দৃষ্টান্তচ্ছলেও, প্রতিমা বা মন্দির গড়িবার কথা নাই। প্রতিমাপূজার ব্যবস্থা না থাকিলেও, কালোচিত কল্পনায়, নূতন পুরাণ এবং নূতন দেবতা সৃষ্ট হইতেছিলেন।

বৌদ্ধবিপ্লবেই হউক, অথবা কালমাহাত্ম্যেই হউক, বৈদিক বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। কেবলমাত্র বৈদিক যজ্ঞে আর কুলাইল না বলিয়া, এবং সাধারণের মন বৌদ্ধ পুরাণ এবং অনুষ্ঠানের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল বলিয়া, বৈদিক ভিত্তিটা উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া নূতন পৌরাণিক আখ্যায়িকা রচিত হইতে লাগিল। এইজন্যই রামায়ণাদি শূদ্রাদি সর্ব্বজাতির পাঠ্য করিয়া রচিত; এইজন্যই দেখিতে পাই যে, বেদের সহিত মহাভারতের কোন প্রকৃত সংস্রব না থাকিলেও, এবং মহাভারতে নূতন আখ্যায়িকা এবং আদর্শের সৃষ্টি হইলেও, মহাভারত পঞ্চম বেদ হইয়া উঠিলেন। এমন কি, তুলাদণ্ডে বেদচতুষ্টয়ের সহিত ওজনে, মহাভারত অধিক ভারি হইয়াছিল।

রাজনৈতিক কারণে যে মিলন প্রার্থনীয় হইয়াছিল, তাহার সুবিধা এবং অবকাশ হইল। মিলনস্থাপন করিতে হইলে, পরের সামগ্রী কিছু লইতে হয়; তাই বুদ্ধমূর্ত্তিই হিন্দু শিব হইয়াছিলেন। বৌদ্ধদের মধ্যে গৌত্তলিক অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইবার বহুপূর্ব্বে, যখন বুদ্ধশিষ্যেরা মহাশূন্যের ধ্যান করিতেন, তখনও ধ্যানবলে অমানুষিক বা অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা লাভ হয় বলিয়া উঁহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। নিরবলম্ব ধ্যান এবং সাধনা হইতে বড়-কিছু পাওয়া গেল না দেখিয়া, বৌদ্ধেরা ভাবিয়াছিলেন যে, বুদ্ধদেব অতিপ্রাকৃত ক্ষমতায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সেই ক্ষমতার লোভে ইঁহারাও যোগ ধরিলেন, এবং বুদ্ধদেবকে যোগস্থ ঈশ্বর করিলেন। হিন্দুরাও সেই সময়ে কালের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই; তাঁহারাও যোগে অতিপ্রাকৃত শক্তি বিকসিত হয় বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের যোগশাস্ত্রের উপর যে বৌদ্ধবিশ্বাসের প্রভাব ছিল, তাহা ঐ গ্রন্থের সূত্রেই পাওয়া যায়। প্রয়োজন বোধ করিলে পাঠকেরা ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সোসাইটির ছাপা যোগশাস্ত্রের গ্রন্থ পড়িতে পারেন। যোগবলের অনেক ক্ষমতার মধ্যে বৌদ্ধেরা এ কথা বিশ্বাস করিতেন যে, যোগসাধন করিলে কোন হিংস্রজন্তু অনিষ্ট করিতে পারে না; এমন কি, বিষাক্ত সর্পের দংশনেও ক্ষতি হয় না। নির্ব্বাণ ধ্যান করিলে বাসনার দংশন হইতে মুক্তিলাভ করা যাইত; এখন তাঁহার পরিবর্ত্তে প্রত্যক্ষ শারীরিক ফলে বিশ্বাস জন্মিল। প্রতিযোগিতাতেই হউক অথবা মিলনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই হউক, হিন্দুগণ, যোগীশ্বররূপে মহাদেবের নাগবেষ্টিত ধ্যানস্থ মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। যাঁহারা এই যুগের বুদ্ধ এবং শিবের প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তটি সত্য

বলিবেন। পরেও বহুকাল পর্য্যন্ত এই শিব, —মহাদেব কি বুদ্ধ, এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল; তাই ভক্তিশতকে দেখিতে পাই :—

জ্ঞানং যস্য সমস্তবস্তুবিষয়ং যজ্ঞানবদ্যং বচো
যস্মিন্ রাগলবোঽপি নৈব ন পুনর্দ্বেষো ন মোহস্তথা।
যজ্ঞাহেতুরনন্তনিত্যসুখদানন্না কৃপামাধুরী
বুদ্ধো বা ত্রিরিশোঽথবা স ভগবাংস্তস্মৈ নমস্কুর্ম্মহে॥

কেবল যে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিটিকে বৈদিক আভরণে শিব সাজান হইয়াছিল, তাহাই নয়; বিষ্ণু এবং শিবের মন্ত্রে বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ সাধুদিগের প্রতিমূর্ত্তির পূজারও ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে অনেক বৌদ্ধ হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিল। মহারাজ গুপ্ত হইতে ১ম চন্দ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত সকলেই মনুর বিধান অনুসারে যজ্ঞাদির পুনঃস্থাপনার প্রয়াস পাইয়াছিলেন; এ কথা তাঁহাদের প্রস্তরলিপিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কার্য্যে, বৌদ্ধচৈত্যাদির অনুরূপ হিন্দুচৈত্য নির্ম্মাণ করিয়া দেবতাস্থাপন করিতেছিলেন। তাহার পর সমুদ্রগুপ্ত, ২য় চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত এবং স্কন্দগুপ্ত যখন নূতনভাবে দেবমন্দির এবং প্রতিমাদি প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে অর্হত মহাবীর, স্বামী মহাসেন প্রভৃতি বৌদ্ধসাধুগণের জন্যেও আয়তন স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময়টা খৃষ্টোত্তর ৩৫০ হইতে ৪৬৮ পর্য্যন্ত। অল্পদিনের মধ্যেই এই মহাবীর এবং মহাসেন প্রভৃতি মহাদেব বলিয়া পূজ্য হইয়া উঠিলেন।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা গেল, তাহাতে বৌদ্ধ উপাদান দিয়া যে শিব গঠিত হইয়াছিল, তাহা যথাসাধ্য দেখাইয়াছি। এ সম্বন্ধে আমার আর-একটি অনুমান আছে, তাহাও বলি। তুরাণীয় শকেরা খৃষ্টোত্তর ১ম শতাব্দীতে কাশ্মীর অধিকার করিয়া ভারতবাসী হইয়াছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন, সকলেই জানেন। ইঁহাদের এই প্রথম শতাব্দীর মুদ্রাতেই বৌদ্ধচিহ্নের সঙ্গে সঙ্গে শৈবচিহ্ন দেখা যায়। ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াই কিছু ইঁহারা হিন্দুদিগের শৈবধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই; বিশেষত ইঁহারা বৌদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলে কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইত না, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এইজন্য মনে হয় যে, এই শিব তাঁহাদের কুলদেবতা ছিলেন। ক্ষমতাশালী রাজারা সকলেই ক্ষত্রিয় হইতেন, ইঁহারাও পরে ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়দের কুলদেবতারা যে নূতন দেবতা হইয়া গিয়াছেন, তাহারও প্রমাণ আছে। শিবের গোড়াপত্তনটা এই শকদিগের শিব হইতে নহে ত? রজতগিরিনিভ মহাদেব উত্তরদেশ হইতে আসিয়াছিলেন, কৈলাসপর্ব্বতে তাঁহার আবাস, এবং কেবল বৈবাহিক সম্বন্ধে হিমালয়ের সহিত সংযুক্ত, এ কথায় যেন অনুমানটা বড় অসঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছে না। কণিষ্ক বড় ক্ষমতাশালী ছিলেন; ইঁহার শকাব্দ পর্য্যন্ত হিন্দুগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিলনস্থাপন করিতে হইলে প্রতিপক্ষীয়ের বড় একটা রাজার জিনিষ লইয়াই মিলন সম্ভব।

এখনও পর্য্যন্ত নূতন মহাদেবের সকল স্বরূপ পাওয়া যায় নাই। নিম্নস্তরের বৌদ্ধ এবং দেশব্যাপী অনার্য্যজাতির প্রভাবে, যে সকল দেবস্বরূপ, মহাদেবে প্রযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিয়াছি, তাহার উল্লেখ বারান্তরে করিব।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বসন্ত।

পাগল বসন্তদিন কতবার অতিথির বেশে
তোমার আমার দ্বারে বীণাহাতে এসেছিল হেসে
লয়ে তার কত গীত কত মন্ত্র মন ভুলাবার,
যাদু করিবার কত পুষ্পপত্র আয়োজনভার!—
কুহুতানে হেঁকে গেছে "খোলো ওগো খোলো দ্বার খোলো!
কাজকর্ম্ম ভোলো আজি, ভোলো বিশ্ব, আপনারে ভোলো!"
এসে এসে কতদিন চলে গেছে দ্বারে দিয়ে নাড়া,—
আমি ছিনু কোন্ কাজে, তুমি তারে দাও নাই সাড়া!
আজ তুমি চলে গেছ, সে এল দক্ষিণ বায়ু বাহি',
আজ তারে ক্ষণকাল ভুলে থাকি হেন সাধ্য নাহি!
আনিছে সে দৃষ্টি তব, তোমার প্রকাশহীন বাণী,
মর্ম্মরি তুলিছে কুঞ্জে তোমার আকুল চিত্তখানি।
মিলনের দিনে যারে কতবার দিয়েছিনু ফাঁকি,
তোমার বিচ্ছেদ তারে শূন্যঘরে আনে ডাকি ডাকি!

চীন-কাহিনী।

১

দেব-দেবী।

১৯০১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর ভারত ছাড়িয়াছি। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতসন্তানের চিরপ্রিয় পরিচিত দেবমূর্ত্তিগুলি কতকাল দেখি নাই। ভারতে থাকিতে তাঁহাদের কথা বড়-একটা ভাবিতাম না; কিন্তু এই অপরিচিত বিদেশে মাতা অন্নপূর্ণার জননীমূর্ত্তি, রাধিকারমণের প্রেমপূর্ণ মধুর বদনশোভা এই অধম ভক্তিহীনকে, জানি না কেন, সবলে আকর্ষণ করিতেছিল। যুদ্ধের কোলাহল, সৈনিকের রণবাদ্য, রক্তপাতী বিজয়ীর শার্দ্দূলোচিত উন্মত্ত তাণ্ডবে বিরক্ত হইয়া চিত্ত যেন সেই পবিত্র সুন্দর মন্দিরাভ্যন্তরে দেবতার অগুরু-সুবাসিত চন্দনবিলিপ্ত চরণতলে শান্তির জন্য আশ্রয়গ্রহণ করিতে চাহিতেছিল!

তাই যখন আমার সঙ্গী চীনেম্যান আসিয়া আমায় তাহার স্বদেশীয় দেবীমূর্ত্তি দেখাইবার প্রস্তাব উত্থাপন করিল, তখন আমি সাগ্রহে সম্মতি দিলাম।

আমরা উভয়ে দেবীমন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইলাম। মন্দির কাষ্ঠনির্ম্মিত, রথের ন্যায় আকারবিশিষ্ট। মন্দিরে আজ বিস্তর লোকসমাগম। দুরন্ত-সমর-দর্শনে ভীত নরনারী স্বদেশের কল্যাণকামনায় মন্দিরে পূজা দিতে আসিতেছে। পূজার্থী সকলেরই পায়ে পাদুকা। ইহাদের পাদুকা মখমল ও বস্ত্র নির্ম্মিত বলিয়াই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, ইহারা দেবালয়ে প্রবেশকালে পাদুকা ত্যাগ করার প্রয়োজন মনে করে না। জুতা পায়ে দিয়া বিগ্রহস্পর্শও ইহাদের মতে দোষাবহ নহে। আমাকেও কেহ পাদুকা ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল না।

দেবীর আকৃতি প্রায় আমাদের অন্নপূর্ণামূর্ত্তির অনুরূপ। এখানকার দেবতারা প্রায় বাহনবর্জ্জিত। কদাচিৎ দুইএকজনের হাঙর বা কচ্ছপ বাহন আছে।

দেবী আমাদের দেবীগণের ন্যায় অলঙ্কারবিমণ্ডিতা নহেন—কেবল হস্তে ২।৩গাছি বলয়, কর্ণে ফুলঢেঁড়ী এবং বক্ষে সমুজ্জ্বল কাঁচুলি। দেবীর সর্ব্বাঙ্গে কতকগুলি শিশুমূর্ত্তি—কেহ পৃষ্ঠে, কেহ বাহুতে, কেহ স্কন্ধে, কেহ চরণতলে—সন্তানপরিবেষ্টিতা জননীমূর্ত্তির সুস্পষ্ট প্রতিরূপ! কুঙ্কুম ও অপর একপ্রকার সুগন্ধিদ্রব্যে সুবাসিত অভিষেকজলে স্নাত দেবীমূর্ত্তি হইতে সৌরভ বিকিরিত ও বারিবিন্দু ক্ষরিত হইতেছিল। চীনেরা একে একে সকলে দেবীমূর্ত্তি স্পর্শ করিয়া যাইতেছিল।

মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ইহারা প্রথমে বিগ্রহের সম্মুখস্থিত বৃহৎ শঙ্খ ধ্বনিত করিতে করিতে মূর্ত্তি প্রদক্ষিণ করিল, তার পর শঙ্খটি যথাস্থানে রাখিয়া প্রত্যেকে কেহ বা ৫ সেণ্ট কেহ বা ১০ সেণ্ট দেবীর নিকট প্রণামী দিল, শেষে ভক্তিভরে দেবীর শিরোদেশ স্পর্শ করিয়া বাহির হইয়া গেল। এইরূপে একদল আসিতে, একদল যাইতে লাগিল। স্ত্রী-পুরুষ কাহারও আসিতে বাধা নাই। তবে স্ত্রীর ভাগ কিছু কম। আমাদের দেশে কিন্তু ইহার বিপরীত। আমরা ধর্ম্মকর্ম্ম স্ত্রীলোকের হাতে দিয়া নিজেরা সভ্যতালাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছি। সেই মন্দিরগৃহে আর একটি বাঙালীবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। বাবুটির নাম অমৃতলাল দে—নিবাস ২৪পরগণার অন্তর্গত রাজীবপুর গ্রামে—এখানে Pay Officeএ কর্ম্ম করেন। ইনিও আমারই মত দেবীদর্শনে আসিয়াছিলেন। কোন কোন বৃদ্ধ চীনবাসী দেবীর সম্মুখে আসিয়া প্রথমে মাথাটা একটু নোয়াইয়া ও দক্ষিণ জানুতে হাত রাখিয়া মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করিতেছিলেন। শুনিলাম, ইহা ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনের চিহ্ন।

মন্দিরের প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা বলিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে স্থান যথেষ্ট। প্রাচীরগাত্রে নানাবিধ নরনারীমূর্ত্তি এবং তীর-ধনু প্রভৃতি প্রহরণ সুচিত্রিত। দেবীর চতুর্দ্দিকে আরও অনেকগুলি বিগ্রহমূর্ত্তি অবস্থিত—কিন্তু ইঁহাদের কেহই আমার পরিচিত নহেন। অসি, শেল, শূল, পট্টিস, মুদ্গর—পরিশোভিত অষ্ট হস্ত, দ্বাদশ বদন, এক বীরমূর্ত্তি দেখিলাম। তাঁহার পার্শ্বে হনুমানের ন্যায় কয়েকটি বিগ্রহমূর্ত্তিও দৃষ্টিগোচর হইল। বাল্মীকির মানসপুত্রগণ সুদূর চীনদেশে আসিয়া

জলবায়ুর গুণে কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন কি না, কে বলিতে পারে!

দেবীর সমক্ষে (সম্ভবত) মেষচর্ম্মাসনে সমাসীন এক তাম্রবর্ণবেণী ও বিলম্বিত-গুম্ফ-শ্মশ্রু-পরিশোভিত মহাপুরুষকে দর্শন করিলাম। শুনিলাম, ইনিই দেবীর পুরোহিত।

ক্রমশ দিবালোক ম্লান হইয়া সন্ধ্যাসমাগম সূচিত করিল। দেবীর আরতির সময় আসিল। জনকোলাহল এখন প্রায় স্তব্ধীভূত—দেবালয় নিঃশব্দ, নির্জ্জন।

পুরোহিত একটি বাতি লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং বাতিটি দেবীর বামদিকে একটি কাষ্ঠাসনে স্থাপিত করিয়া তিনচারিবার সুগভীর শঙ্খধ্বনি করিলেন, তাহার পর একতাড়া পুঁথি বাহির করিয়া বিচিত্র-সুরে দেবীর নিকট পাঠ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, ইহার এক বর্ণও আমার বোধগম্য হইল না। আমার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাঁহার অবস্থাও এ বিষয়ে আমার অপেক্ষা বিশেষ উন্নত নহে।

এই সকল মন্ত্র মঙ্গোলীয় ভাষায় রচিত—কেবল যৎসামান্য চীনভাষা মিশ্রিত।

ইতিমধ্যে আরতি সমাপ্ত হইয়া ভোগের সময় আসিল। পুরোহিত-মহাশয় পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ হইতে ভোগসামগ্রী আনিয়া ভক্তিভরে দেবীর সম্মুখে স্থাপন করিলেন এবং মন্ত্রপাঠ করিয়া নিবেদন করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

আমি কিন্তু ভোগসামগ্রী দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম—প্রসাদ পাইবার বাসনা সুদূরে প্রস্থান করিল।

দেবীর ভোগ্যসামগ্রী—গোধূমচূর্ণের পিষ্টক, কিঞ্চিৎ ফলমূল, ভাজা আরশুলা, ভেক এবং শূকরের তরকারি! আমার সঙ্গী চীনেম্যান আমায় প্রবোধ দিবার জন্য বলিলেন, দেবীর পক্ষে সবই সমান—তাঁহার খাদ্যাখাদ্য কিছুই নাই, সুতরাং তাঁহাকে সবই দিতে পারা যায়। কিন্তু এই তত্ত্বকথায় আমার চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করিল না।

অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে ভোগদান সমাপ্ত হইয়া গেল। আমরা অতিথি, সুতরাং প্রসাদলাভে অধিকারী; পুরোহিত-মহাশয় আমাদের বঞ্চিত করিলেন না। যথেষ্টপরিমাণ ভোগসামগ্রী লইয়া আমাদের উপহার দিতে আসিলেন। আমার সঙ্গী প্রসাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন, আমি কিন্তু কিছুতেই আমার প্রসাদ-বিমুখ চিত্তকে ফিরাইয়া আনিতে পারিলাম না।

ফলে পুরোহিত-মহাশয় এই ভক্তিহীনের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং আমার জন্য আমার নিরপরাধ সঙ্গী বেচারাও যথেষ্ট তিরস্কৃত হইল।

অতঃপর আহারার্থে পুরোহিত-মহাশয় বাহির হইয়া গেলে আমি আমার সঙ্গীর সহিত দেবসেবার ব্যয়াদিসম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিলাম।

সঙ্গী বলিলেন, দেবসেবার জন্য পুরোহিত প্রত্যহ দেড় ডলার বা ২।০ হিসাবে, যাঁহাদের ঠাকুর, তাঁহাদের নিকট হইতে পাইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন কেহ কেহ অবস্থাবিশেষে কিছু কিছু বেতনও পান। ঠাকুরের জন্য বাজার হইতে নিত্য "তোলা" তোলা পুরোহিত-মহাশয়দের একচেটিয়া। দেবতার সম্মুখে পূজার জন্য যে সকল দ্রব্যাদি পড়ে, তাহাতেও পুরোহিতের অধিকার—পয়সাকড়ি অধিকারীরা প্রাপ্ত হন। ঠাকুরের

অনেক ভূসম্পত্তিও আছে, কিন্তু সে-সকলের ভার আমাদের দেশের মত পুরোহিতের উপর নহে; যাঁহাদের ঠাকুর, তাঁহারাই সে-সকল সম্পত্তির আদায়-উসুল করিয়া থাকেন, পুরোহিত তাহা হইতে কেবল দেবসেবার নিয়মিত খরচা পান।

আলোচনা করিতে করিতে রাত্রি প্রায় ৯টা বাজিয়া গেল। পুরোহিত-মহাশয় আহারান্তে তিনটি সঙ্গী সমভিব্যাহারে মন্দির-মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। সঙ্গি-তিনটি আমাকে দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিন্তু আমার সঙ্গীর নিকট আমার পরিচয় পাইয়া আশ্বস্তচিত্তে মাদুর পাতিয়া খেলা জুড়িয়া দিল। এই খেলা কতকটা আমাদের পাশাখেলার অনুরূপ। পুরোহিত-মহাশয় পাতলা-পাতলা ৬অঙ্গুলিপরিমাণ লম্বা ১৬খানি খাঁদি বাঁখারি বাহির করিলেন—বাঁখারিগুলির গায়ে চক্রের ন্যায় ছিদ্র—ছিদ্রসংখ্যা সবগুলিতে সমান নহে—ইহারাই আমাদের পাশাখেলার পাশাস্থানীয়।

আগন্তুক তিনজন এক-এক-তোড়া মধ্যস্থলে চক্রাকার-ছিদ্র-বিশিষ্ট পিতলের পয়সা বাহির করিল। এই পয়সার নাম "তাগালু," ভারতের ১ পয়সায় তিনটি তাগালু পাওয়াযায়।

তার পর তোড়া হইতে যাহার যত ইচ্ছা তাগালু বাহির করিয়া সম্মুখে রাখা হইল এবং বাঁখারিগুলি পাশার মত চালিত হইতে লাগিল। যাঁহার যেমন "দান" পড়িল, তিনি সেইরূপ হারিতে বা জিতিতে লাগিলেন। খেলা শেষ হইতে রাত্রি ১২টা বাজিয়া গেল। এই খেলায় পুরোহিত-মহাশয়ের উল্লাস ও আনন্দ চিরকাল আমার মনে থাকিবে।

আমি সে-দিন মন্দিরেই রাত্রিযাপন করিব স্থির করিয়া আসিয়াছিলাম, সুতরাং একখানি মেষচর্ম্ম পাতিয়া তাহার উপর শয়ন করিলাম। আমার সঙ্গীটিকে পুরোহিত-মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আপনার গৃহপার্শ্বে আশ্রয়দান করিলেন।

ক্রমে রজনীর অন্ধকার বিদূরিত হইল। উষার অরুণকিরণে চরাচর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দয়েলের মত রং, ঈষৎ বড় বড়, একপ্রকার কাক "কা কা" রবে ডাকিতে আরম্ভ করিল। মেষসমূহ বাহিরে যাইবার জন্য আকুল হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। পশু, পক্ষী, জীবগণের কলরবে মন্দির যেন মুখরিত হইল—দেবীও বুঝি জাগিয়া উঠিলেন।

পুরোহিত-মহাশয় ঘুমচোখে নলে দোক্তার ধূম পান করিতে করিতে আমার সঙ্গীকে লইয়া মন্দিরে দর্শন দিলেন।

এমন-সময় একদল নরনারী একটি উষ্ট্র শাবক ও একটি শূকর লইয়া মন্দিরসম্মুখে উপস্থিত হইল। দলের মধ্যে দুইটি স্ত্রীলোক ও একজন জাপানী। স্ত্রীলোক দুইটি পরমা রূপবতী।

জাপানী পুরুষটি ব্যতীত আর সকলেই শঙ্খধ্বনি করিয়া দেবীপ্রদক্ষিণান্তে ৫ সেণ্ট করিয়া প্রণামী দিলেন। তার পর বলিদানের পালা।

বলিদানের জন্য শাণিত ভেঁটে আকারের একখানি তলোয়ার পুরোহিতের নিকট উৎসর্গ করিতে দেওয়া হইল। তরবারি উৎসর্গীকৃত হইলে—পশুদুইটিকে একে একে একটি গর্ত্তে নামাইয়া ধরা হইল। (এখানে

আমাদের দেশের মত হাঁড়িকাঠের ব্যবস্থা নাই, গর্ত্তেই হাঁড়িকাঠের কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।) অমনি ভীমরবে চড়্‌চড়্‌-শব্দে ঢক্কা নিনাদিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে পশুদ্বয়ের ছিন্ন মুণ্ড দেবীর চরণ-তলে পতিত হইল। একজন চীনেম্যান তাড়াতাড়ি সেই পশুরক্তে দেবীকে স্নান করাইয়া দিল। রক্তস্নাতা দেবী অসুর-নাশিনী চামুণ্ডার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

দুইটি পশুর বলিদান হইলে, একটি পুরোহিত-মহাশয়ের প্রাপ্য, সুতরাং শূকরের ধড়টি তাঁহার জন্য পড়িয়া রহিল। তিনি আনন্দে বিভোর হইয়া সেটিকে গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন। মন্দিরগৃহ কিয়ৎকালের জন্য নিস্তব্ধ হইল।

আমার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এ পূজা বারবনিতার অনুষ্ঠিত—অনুষ্ঠাত্রী ঐ দুই রূপসী। উহারা পণ্যনারী—পুরুষগণ উহাদের ভৃত্য—আশ্রয়দাত্রীদের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের সহায়তাসাধন এবং তাহাদের পরিচর্য্যা করাই ইহাদের কার্য্য। এই স্ত্রীলোক-দুইটির কর্ণ অলকাবৃত দেখিলাম। শুনিলাম, এ শ্রেণীর স্ত্রীলোককে চিনিবার ইহাই উপায়। ইহারা কি তবে বাংলাদেশের কাটা-কাণ ও চুল সম্বন্ধীয় সেই প্রসিদ্ধ প্রবাদ-বচনের সম্মানরক্ষা করিয়া থাকে?

পুরোহিত-মহাশয়ের আজ অত্যন্ত উল্লাসের দিন, সন্দেহ নাই। বেলা ১০টার সময় তিনি ভোগের সামগ্রী আনিয়া দেবীর সম্মুখে থরে থরে সাজাইতে লাগিলেন। আজ ভোগের আয়োজনেও যথেষ্ট সমারোহ!—আরশুলার তিন-চারি-প্রকার খাদ্য, শূকরের দুই-তিন-প্রকার তরকারি! পুরোহিত-মহাশয়ের বোধ হয় "ভোগের আগেই প্রসাদ" পাইবার জন্য রসনা লোলুপ হইয়া উঠিতেছিল!

ভোজ্যবস্তুসমূহ রক্তবর্ণ বস্ত্রে আবৃত হইল। পুরোহিত-মহাশয় একটি টুপিতে মস্তক আবৃত করিয়া ভক্তিভরে চর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইলেন। দুইজন চীনেম্যান মুহুর্ম্মুহু শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। একজন সানাইয়ের ন্যায় একরকম বাঁশীতে সুর ধরিল। একটি পেয়ালা হইতে সুরভি ধূম উদ্গত হইতে লাগিল।

পুরোহিত-মহাশয় দুইটি অঙ্গুলি দ্বারা কুঙ্কুম ও "মিয়াই" মিশ্রিত জল ছিটাইয়া খাদ্যাদি দেবীকে নিবেদন করিয়া দিতে লাগিলেন। একঘণ্টা পরে পূজা সমাধা হইল।

শঙ্খধ্বনি নীরব হইল, সানাইয়ের সুরও থামিল—পুরোহিত-মহাশয় হাত-দুইটি ঊর্দ্ধে উত্থিত করিলেন। তদ্দর্শনে মন্দিরস্থ সকলেই হস্তোত্তোলন করিল। উত্তোলিত হস্তদ্বয় জানুদেশে স্থাপিত হইয়া দেবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইল। পুরোহিত-মহাশয় আসন ত্যাগ করিলেন।

তাহার পর প্রসাদবণ্টনের পালা উপস্থিত হইল, সকলেই প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন—আমি কিন্তু প্রসাদ গণিলাম। পূর্ব্বরাত্রে প্রসাদ গ্রহণ করি নাই বলিয়া পুরোহিত-মহাশয় আজ আর আমায় সেজন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলেন না। একজন কেবল "অন্তত ভোগের

আরশুলা দুইটি খান" বলিয়া আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমার বিরক্তিপূর্ণ মুখ দেখিয়া তাঁহাকেও অচিরে নিরস্ত হইতে হইল।

আমি দেবীকে আমায় এই প্রসাদবিপত্তি হইতে রক্ষা করার জন্য শতশত ধন্যবাদ দিয়া বৌদ্ধ চীনে বলিদানের কথা ভাবিতে ভাবিতে সঙ্গীর সহিত গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রী:—

উৎসব।

এস বসন্ত এস আজ তুমি
আমারো দুয়ারে এস!
ফুল তোলা নাই, ভাঙা আয়োজন,
নিবে গেছে দীপ, শূন্য আসন,
আমার ঘরের শ্রীহীন মলিন
দীনতা দেখিয়ো হেসো,
তবু বসন্ত তবু আজ তুমি
আমারো দুয়ারে এসো।

আজিকে আমার সব বাতায়ন
রয়েছে—রয়েছে খোলা!
বাঁধাহীন দিন পড়ে আছে আজ,
নাই কোনো আশা, নাই কোনো কাজ,
আপনা-আপনি দক্ষিণ বায়ে
দুলিছে চিত্তদোলা।
শূন্যঘরের সব বাতায়ন
আজিকে রয়েছে খোলা!

কত দিবসের হাসি ও কান্না
হেথা হয়ে গেছে সারা।
ছাড়া পাক্ তারা তোমার আকাশে,
নিশ্বাস পাক্ তোমার বাতাসে,
নব নব রূপে লভুক জন্ম
বকুলে চাঁপায় তা'রা,
গত দিবসের হাসি ও কান্না
মত হয়ে গেছে সারা।

আমার বক্ষে বেদনার মাঝে
কর তব উৎসব!
আন তব হাসি, আন তব বাঁশী,
ফুলপল্লব আন রাশিরাশি,
ফিরিয়া ফিরিয়া গান গেয়ে যাক্
যত পাখী আছে সব,
বেদনা আমার ধ্বনিত করিয়া
কর তব উৎসব।

সেই কলরবে অন্তরমাঝে
পাব, পাব আমি সাড়া!
দ্যুলোকে ভূলোকে বাঁধি এক দল
তোমরা করিবে যবে কোলাহল,
হাসিতে হাসিতে মরণের দ্বারে
বারে বারে দিবে নাড়া—
সেই কলরবে অন্তরমাঝে
পাব, পাব আমি সাড়া!

প্রেম।

বহুরে যা এক করে; বিচিত্রেরে করে যা সরস;—
প্রভূতেরে করি' আনে নিজ ক্ষুদ্র তর্জ্জনীর বশ;
বিবিধপ্রয়াসক্ষুব্ধ দিবসেরে লয়ে আসে ধীরে
সুপ্তিসুনিবিড় শান্ত স্বর্ণময় সন্ধ্যার তিমিরে
ধ্রুবতারাদীপদীপ্ত সুতৃপ্ত নিভৃত অবসানে;
বহুবাক্যব্যাকুলতা ডুবায় যা একখানি গানে
বেদনার সুধারসে,—সেই প্রেম হ'তে মোরে প্রিয়া
রেখো না বঞ্চিত করি;—প্রতিদিন থাকিয়ো জাগিয়া
আমার দিনান্তমাঝে! কঙ্কণের কনককিরণ
নিদ্রার আঁধারপটে আঁকি দিবে সোনার স্বপন;
তোমার চরণপাত মোর স্তব্ধ সায়াহ্ন-আকাশে
নিঃশব্দে পড়িবে ধরা আরক্তিম অলক্ত-আভাসে।
এ জীবন নিয়ে যাবে অনিমেষ নয়নের টানে
তোমার আপন কক্ষে পরিপূর্ণ মরণের পানে!

সার সত্যের আলোচনা।

আছি এবং আছে।

এই সময়ে পথের কতকগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা আবশ্যক বিবেচনায় বিগত দুইবারে সত্তা, শক্তি, জ্ঞান এবং আনন্দের মধ্যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ একাত্মভাব, তাহা বিধি-মতে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ঐ তিনটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাথেয়-সম্বলের সহিত গাঁটরী বাঁধিয়া লওয়া হইয়াছিল।

এক্ষণে প্রয়াণ-পথের কোন্ স্থান হইতে কোন্ স্থানে আসিয়াছি এবং কতদূর অবধি গিয়া কোন্ স্থানে তাঁবু গাড়িতে হইবে, তাহা একবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা আবশ্যক।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, দ্রব্যাদি-সংগ্রহের জন্য মাঝ-পথে থামিয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বে আমরা আত্মজ্ঞানের দুই বিভিন্ন মূর্ত্তি পৃথক্ পৃথক্ রূপে পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। সে দুই মূর্ত্তি হ'চ্চে—ভাব-মূর্ত্তি এবং সত্য-মূর্ত্তি। কিন্তু সঙ্কলিত পর্য্যালোচনা-কার্য্যের অর্দ্ধেকটা শেষ হইতে-না-হইতেই মাঝ-পথের ব্যাপারে আটক পড়িয়া গেলাম। আত্মজ্ঞানের ভাব-মূর্ত্তি কিরূপ, তাহার আলোচনা আমরা যথা-সাধ্য করিয়া চুকিয়াছি; তা বই, তাহার সত্য-মূর্ত্তি কিরূপ, সে সম্বন্ধে এখনো পর্য্যন্ত একটি কথারও উল্লেখ করি নাই। আমরা দেখাইয়াছি যে, আত্মশক্তি খাটাইয়া আত্ম-জ্ঞানের ভাব-মূর্ত্তি উদ্ভাবন করা যাইতে পারে; আর, তাহার সাধনপদ্ধতি হ'চ্চে যোগশাস্ত্রের উপদেশানুযায়ী ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি। এ বিষয়ে যোগশাস্ত্রের প্রথম মন্তব্য এই যে, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। তুমি যেরূপ বিষয়ের প্রয়াসী, তোমার সিদ্ধিও সেইরূপ হইবে;—কিন্তু অমনি হইবে না, তাহার জন্য সাধন করা চাই। সাধন যেরূপে করিতে হইবে, তাহাই তোমাকে বলিয়া দেওয়া হইল।

দ্বিতীয় মন্তব্য এই যে, নীচের নীচের ভূমি মাড়াইয়া উচ্চোচ্চ ভূমিতে সংযম প্রয়োগ করা (অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি প্রয়োগ করা) কর্ত্তব্য। ভূমি-বিভাগ কিরূপ, তাহা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহা মোটামুটি এইরূপ:—

প্রথম ভূমি পৃথিবী-তত্ত্ব; দ্বিতীয় জল-তত্ত্ব; তৃতীয় অগ্নি-তত্ত্ব; চতুর্থ বায়ু-তত্ত্ব; পঞ্চম আকাশ-তত্ত্ব; ষষ্ঠ মনস্তত্ত্ব; সপ্তম অহঙ্কার-তত্ত্ব; অষ্টম বুদ্ধি-তত্ত্ব; নবম প্রকৃতি। যোগশাস্ত্রের উপদেশ এই যে, পৃথিবী-তত্ত্ব হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া নীচের নীচের ভূমি একে একে মাড়াইয়া উপরের উপরের ভূমিতে আত্মশক্তি বা সংযম প্রয়োগ কর; অর্থাৎ, যে পথ দিয়া প্রকৃতির ক্রম-বিকাশ হইয়াছে, সেই পথ দিয়া প্রকৃতি ভেদ করিয়া উচ্চে ওঠো; উচ্চে উঠিয়া পুরুষে—স্বরূপে—আত্মাতে—স্থিতি কর।

নীচের নীচের ভূমি মাড়াইয়া উপরের

উপরের ভূমিতে উত্থান করিতে হইবে—এটা সাধারণ ব্যবস্থা; তা ছাড়া, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। কোনো ব্যক্তির পাঠ আরম্ভ করা আবশ্যক ক-খ হইতে; কাহারো বা—ব্যাকরণ হইতে; কাহারো বা—সাহিত্য হইতে। যাহার যোগ্যতার যতটা দৌড়, সেই অনুসারে তাহার সাধনের গোড়া'র পঁইটা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু কে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবে? যে ব্যক্তি যাহা মনে করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতেই তাহার যোগ্যতার দৌড় প্রকাশ পায়; এবং তদনুসারে সাধক আপনিই আপনার সাধনের প্রথম পঁইটা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন; তাহাই তিনি করুন্; তাহা হইলেই তিনি আন্তরিক ইচ্ছার সহিত সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন; আর, তাহা হইলেই সাধন আশু-ফলপ্রদ হইবে। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, সঙ্গীতের দিকে যাহার স্বভাবতই মনের দৌড়, সে সঙ্গীতের চর্চ্চায় নিযুক্ত হইলে তাহার যেরূপ সহজে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে, অপরের পক্ষে তাহা সম্ভাবনীয় নহে। এইজন্য যোগশাস্ত্রের প্রধান একটি মন্তব্য কথা এই যে, যেরূপ লক্ষ্যবস্তু তোমার মনের ইচ্ছার অনুধায়ী, তাহাতেই প্রথমে তুমি আত্মশক্তি বা সংযম প্রয়োগ কর—প্রয়োগ করিয়া সেই অভীষ্ট বিষয়টি আপনার সম্যক্ বশে আনয়ন কর; তাহার পরে ক্রমশ নীচের নীচের বিষয় বশীভূত করিয়া উচ্চ উচ্চ বিষয়ের সাধনে প্রবৃত্ত হও। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সাধনের লক্ষ্যবস্তু তত নয়—সাধনের পদ্ধতিই যত যোগশাস্ত্রের উপদেষ্টব্য বিষয়। যোগশাস্ত্রের একটি স্থানে কেবল সাধনের লক্ষ্যবস্তু সুনির্দ্দিষ্ট। কোন্ স্থানে? না, যেখানে বলিতেছেন—"ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা।" এই স্থানটিতেই আত্মশক্তির পরিবর্ত্তে ঐশী শক্তির পরাকাষ্ঠা বলবত্তা এবং ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরে কর্ম্ম-সমর্পণের বিধেয়তা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই স্থানটির কথা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা আবশ্যক; এবং তাহা বুঝিয়া দেখিতে হইলে আমাদের জ্ঞানরাজ্যে আত্মকর্ত্তৃত্বেরই বা কার্য্যকারিতা কিরূপ, ঐশী শক্তিরই বা কার্য্যকারিতা কিরূপ, তাহার প্রতি রীতিমত অনুসন্ধান প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

আত্মকর্ত্তৃত্বের মূলে ঐশী শক্তির কার্য্যকারিতা কিরূপ, তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হইতে হইলে সাধনের কথা ছাড়িয়া দিয়া সহজে আমরা আত্মাকে কিরূপে উপলব্ধি করি, তাহারই প্রতি সর্ব্বপ্রথমে প্রণিধান করা কর্ত্তব্য।

আপামর-সাধারণ সকল ব্যক্তিই "আমি আছি" এই কথাটি খুবই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করে; হৃদয়ঙ্গম করিয়াও শুদ্ধকেবল সেই কথাটির বলে আপনার ধ্রুব অস্তিত্ব-বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে পারে না। অতএব, সহজ জ্ঞানের এই যে একটি কথা—"আমি আছি"—এ কথাটির বলবত্তার দৌড় কতদূর পর্য্যন্ত, তাহা একবার তোলাপাড়া করিয়া দেখা নিতান্তই আবশ্যক।

"আছি" এবং "আছে" এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কি? "আছি" এবং "আছে"র মধ্যে

ব্যাকরণঘটিত উত্তমপুরুষ এবং প্রথমপুরুষের প্রভেদ তো আছেই—কিন্তু সে প্রভেদ তত্ত্বজিজ্ঞাসুর বড়-একটা গায়ে লাগে না; তা ছাড়া, দুয়ের মধ্যে নিগূঢ়-রকমের একটি প্রভেদ আছে—সেইটিই এখানে দ্রষ্টব্য; তাহা এই:—

আমি যদি বলি যে, "হিমালয়-পর্ব্বত আছে," তবে শ্রোতা বলিতে পারে যে, "তাহা যে আছে, তাহার প্রমাণ কি?" পক্ষান্তরে, আমি যদি বলি যে, "আমি আছি," তবে আমার সেই কথাটিই আমার অস্তিত্বের প্রমাণ; কেন না, আমি না থাকিলে "আমি আছি" এ কথাটি আমার মুখ দিয়া বাহির হইতে পারিত না। "আমি আছি" এ কথাটি আমি যদি মুখে না-ও উচ্চারণ করি—শুধু যদি কেবল মনে মনে বলি যে, "আমি আছি," তবে তাহাই আমার অস্তিত্বের যথেষ্ট প্রমাণ; কেন না, আমি না থাকিলে "আমি আছি" এ কথাটি আমার মনেও আসিতে পারিত না। তা শুধু না—আমি "আছি" না বলিয়া আমি যদি মনে মনে বলি যে, "আমি নাই" অথবা "আমি আছি কি নাই, তাহা আমি জানি না," তবে তাহাতেও প্রকারান্তরে বলা হয় যে, "আমি আছি"; কেন না, আমি যদি না থাকিতাম, তবে "আমি নাই" এ কথাও আমার মনে আসিতে পারিত না, অথবা, "আমি আছি কি নাই, তাহা জানি না" এ কথাও আমার মনে আসিতে পারিত না। এই স্থানটিতে দেকর্ত্তা-(Des-cartes)-নামক ফরাসীস্ তত্ত্ববিদের প্রসিদ্ধ মহাবাক্যটি মনে পড়ে; কি? না, Cogito ergo sum—"আমি চিন্তা করিতেছি, অতএব আমি আছি।" কথাটি খুব ঠিক্; কিন্তু উহার বলবত্তার দৌড় যে 'চিন্তা করিতেছি'র মধ্যেই আবদ্ধ, দেকর্ত্তা তাহা বুঝিয়াও বোঝেন নাই; তাহা বুঝিলে তিনি 'আছি' এবং 'আছে'র মধ্যে একটা অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর সন্নিবেশিত করিবার বৃথা চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতেন না।

প্রকৃত কথা যাহা, তাহা এই:—

যখনই আমার মনোমধ্যে যে-কোনো চিন্তা উপস্থিত হইতেছে, তখনই সেই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে 'আমি-আছি' এই কথাটি আমার জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে; কিন্তু সে যে আমি আছি, তাহা তখন আমি আছি; আর, সেই তখন-'আমি-আছি'র প্রমাণ তখনকার সেই চিন্তা। পক্ষান্তরে, আমি গত-কল্য যাহা চিন্তা করিয়াছিলাম, সে চিন্তা সাক্ষাৎসম্বন্ধে এখন-আমি-আছি'র প্রমাণ নহে। আমার এখনকার চিন্তাই এখন আমি আছি'র প্রমাণ। দে-কর্ত্তার মতে "আছি"রই কেবল প্রমাণ আছে—'আছে'র কোনো প্রমাণ নাই। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, আছে'র যদি কোনো প্রমাণ না থাকিত, তবে "আছে" এরূপ একটা কথা আমাদের বুদ্ধিতে আমল পাইতেই পারিত না। আছি'র যেমন প্রমাণ হাতে-হাতে—আছে'রও তেমনি; প্রভেদ কেবল এই যে, আছি'র প্রমাণ অপেক্ষাকৃত নিরবচ্ছিন্ন, আছে'র প্রমাণ অপেক্ষাকৃত ব্যবচ্ছিন্ন। আমি এখন লিখিতব্য বিষয় চিন্তা করিতেছি, আর, সেই সঙ্গে এই কথাটি জ্ঞানে উপলব্ধি করি-

তেছি যে, এখন আমি আছি; আমার এখনকার চিন্তা আমার এখনকার অস্তিত্বের এ যেমন প্রমাণ, তেমনি, আমার সম্মুখে আমি ঐ যে উদ্যান দেখিতেছি, ঐ উদ্যানের রশ্মি-প্রতিক্ষেপণী ক্রিয়া (অর্থাৎ ঐ উদ্যান সূর্য্যরশ্মি প্রতিহত করিয়া আমার চক্ষু-গোলকে যে বিচিত্র বর্ণ ক্ষেপণ করিতেছে—সেই প্রতিক্ষেপণী ক্রিয়া) উদ্যানের অস্তিত্বের প্রমাণ। প্রভেদ কেবল এই যে, যখন আমি ঘরে ঢুকিয়া জানালা বন্ধ করিব, তখন উদ্যান আমার নিকটে অদৃশ্য হইয়া যাইবে, আর, সেই সঙ্গে "উদ্যান আছে" এ কথাটির সাক্ষাৎ প্রমাণ আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া পালাইবে। পক্ষান্তরে, আমার জাগরিত অবস্থার মুহূর্ত্ত-পরম্পরায় আমার মনোমধ্যে একটার পর আরেকটা চিন্তা উদিত হইতেছে এবং উদিত হইতে থাকিবেও; আর যখনই যে চিন্তা উদিত হইতেছে, তখনই তাহা "এখন আমি আছি" এই কথাটির প্রমাণ যোগাইতেছে। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, "এখন আমি চিন্তা করিতেছি, অতএব এখন আমি আছি" এবং "এখন উদ্যান আমার দৃষ্টি আক্রমণ করিতেছে, অতএব এখন উদ্যান আছে", এই দুই কথার মাঝখানকার দুই অতএবের মূল্য নিক্তির ওজনে সমান। তবে কি না, চিন্তা নিরবচ্ছেদে একটার পর একটা মুহুর্মুহু মনোমধ্যে উপস্থিত হইতেছে; উদ্যান কখনো বা আমার দৃষ্টিক্ষেত্রে উপস্থিত, কখনো বা অনুপস্থিত। যদি আমি অষ্টপ্রহর অনিমেষ-চক্ষে উদ্যানের প্রতি চাহিয়া থাকি, তাহা হইলে—আমি আছি এবং উদ্যান আছে—দুইই এক সঙ্গে আমার মনকে ক্রমাগতই আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিবে। উদ্যানটি যখন মেঘাবৃত অমানিশার প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, তখন তাহার অস্তিত্বের সাক্ষাৎ প্রমাণ সেই সঙ্গে তিরোহিত হয়—ইহা কাহারো অবিদিত নাই; ইহাও তেমনি কাহারো অবিদিত নাই যে, সুষুপ্তির মন্ত্রগুণে যখন আমার জ্ঞানের ক্রিয়াস্ফূর্ত্তি একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়, তখন সেই সঙ্গে আমার অস্তিত্বের সাক্ষাৎ প্রমাণ অন্তর্ধান করে। সুষুপ্তির অবস্থায় যখন আমার মনের কপাট বন্ধ থাকে, তখন "আমি আছি" বা "আমি নাই" বা "আমি আছি কি নাই, তাহা জানি না" এই তিন রকমের তিন কথার কোনোটিই আমার মনে প্রবেশ পাইতে পারে না। আমার সে অবস্থায় "আমি আছি" ঘুচিয়া যায়—অথচ আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দর্শক বলে যে, "ইনি আছেন—কিন্তু নিদ্রায় নিমগ্ন।" ইনি যে আছেন, তাহার প্রমাণ কি? "ইনি আছেন" এ কথা তুমি বলিতেছ—আমি তো বলিতেছি না। আমার অস্তিত্বের প্রমাণ তোমার কথায় হইতে পারে না। তোমার মুখের কথা বা মনের ভাবনা বা জ্ঞানের ক্রিয়াস্ফূর্ত্তি তোমার অস্তিত্বেরই প্রমাণ; তা বই, তাহা আমার অস্তিত্বের প্রমাণ নহে। তবেই হইতেছে যে, আছে'র সাক্ষাৎ প্রমাণ যেমন সময়ে সময়ে জাগিয়া উঠে এবং সময়ে সময়ে অন্তর্হিত হয়, আছি'র প্রমাণও সেইরূপ পরিবর্ত্তনশীল। অতএব, এ কথা যদি সত্য হয় যে, পরিবর্ত্তনশীল ঘটনাবলীর মূলে অপরিবর্ত্তনীয় একটা-কিছু থাকা চাই, তবে আছি এবং আছে দুয়েরই মূলে তাহা থাকিবার কথা; এইজন্য দুয়ের সন্ধিস্থানেই তাহা অন্বেষিতব্য।

উপরে যে ভাবের আছি এবং আছে'র দুই পরিচ্ছিন্ন আছি এবং আছে'র সন্ধিস্থানে প্রমাণ দেখানো হইল, তাহা কেবল এখন সমস্ত লইয়া যে এক আছি বিরাজমান, আছি এবং এখন আছে মাত্র; সুতরাং তাহাই সত্যজগতের প্রবেশদ্বার। আগামী তাহা কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন। এতদ্ব্যতীত ঐ বারে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পূজা।

আজিকে তুমি ঘুমাও আমি জাগিয়া রব দুয়ারে,
রাখিব জ্বালি' আলো।
তুমি ত ভাল বেসেছ আজি একাকী শুধু আমারে
বাসিতে হবে ভালো।
আমার লাগি তোমারে আর হবে না কভু সাজিতে,
তোমার লাগি আমি
এখন হ'তে হৃদয়খানি সাজায়ে ফুল-রাজিতে
রাখিব দিনযামি'।

তোমার বাহু কত না দিন শ্রান্তিদুখ ভুলিয়া
গিয়েছে সেবা করি'।
আজিকে তারে সকল তার কর্ম্ম হ'তে তুলিয়া
রাখিব শিরে ধরি'।
এবার তুমি তোমার পূজা সাঙ্গ করি চলিলে
সঁপিয়া মনপ্রাণ,
এখন হ'তে আমার পূজা লহ গো আঁখিসলিলে,
আমার স্তবগান।

রাজা গণেশ।

মহাপুরুষমাত্রেই সংসারগগনে এক এক প্রদীপ্ত জ্যোতিষ্ক; সমাজজীবনের লক্ষ্যভ্রষ্ট অন্ধকার-পথের সহায়। অন্যান্য শ্রেণীর মহাত্মার ন্যায় কর্ম্মবীরগণের কীর্ত্তিকলাপও ঐতিহাসিক আলোচনার এক প্রধান মর্ম্মগ্রন্থি। ইহাকে ব্যক্তিগত কাহিনীমাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলে না; কারণ এরূপ কাহিনী ও আদর্শ অবলম্বন বা পরিহারের বিষয় হইয়া ভবিষ্যৎ সমাজে লোকশিক্ষার যথেষ্ট সহায়তা করে। রাজনৈতিক জগতে বঙ্গবাসীর গৌরব করিবার বেশী কিছু নাই। বাঙালীর আত্মদ্রোহিতা বড়ই প্রবলা; স্বজাতিপ্রতিষ্ঠায় সমবেত চেষ্টার বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই কারণেই প্রতাপাদিত্য বা সীতারামের মত প্রতিভাবান্ পুরুষের প্রয়াসও ব্যর্থ হইয়াছে। দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের অভাব বলিয়া মরজগতে দুর্বল বাঙালীর গৌরবের যে দুইএকটি দৃষ্টান্ত আছে, তাহাও লোকচক্ষুর অনধিগম্য হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ণ মুসলমানিপ্রভাবের সময়ে যে অসামান্যপ্রতিভাশালী হিন্দু রাজা যবনের হস্ত হইতে গৌড়ের রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়াছিলেন, সেই মহাতেজা রাজা গণেশের কীর্ত্তিকলাপও অন্যান্য কালের বিবরণের মত অন্ধতমসাচ্ছন্ন রহিয়া গিয়াছে।*

রাজা গণেশের রাজ্যকাল বা কীর্ত্তিকলাপের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার নাম লইয়াই ঐতিহাসিকসমাজে বিস্তর বাগ্‌বিতণ্ডা চলিয়াছে। হস্তলিখিত মুসলমানী ইতিহাসে সর্ব্বত্র 'কংশ'নাম উল্লিখিত দেখা যায়। ইংরেজ আমলের প্রথম ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল্ রিপোর্টার ডাক্তার বুকানন্-সাহেব দিনাজপুরের বিবরণীমধ্যে লিখিয়াছেন:—"তদনন্তর দীনাজের হিন্দু হাকিম গণেশ রাজদণ্ড কাড়িয়া লন।" এই 'দীনাজ' দিনাজপুর হইতে পারে বলিয়া বুকানন্ ইঙ্গিত করিয়াছেন।†

* গত ১৩০৬ সালে 'ঐতিহাসিক চিত্র' পত্রিকার নিমিত্ত রিয়াজ-উস্-সালাতীন গ্রন্থের টীকা-সঙ্কলন-কালে রাজা কংশের সম্বন্ধে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিবার পরে নব্যভারতে স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'কুল্‌কভট্ট' প্রবন্ধ দেখিতে পাই (শ্রাবণ—১৩০৬)। ভট্টাচার্য্যমহাশয় কুল্‌কভট্ট হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষে রাজা গণেশের নাম নির্দ্দেশ করেন। এ বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় সে সময়ে কিছুদিন অন্যান্য সন্ধান করিয়াছিলাম। বিশ্বকোষ-সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর এক লিখিত মন্তব্যও পাইয়াছিলাম। এক্ষণে আরও যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, প্রবন্ধে তাহাই সঙ্কলিত হইল।

† A Geographical, Statistical and Historical description of Dinajpur—by Dr. Francis Buchanan (Calcutta—1833). p. 23. Also Martin's Eastern India—Vol. II. p. 618.

মিঃ বেভারিজ্ অনুমান করেন, এই 'দীনাজ্' বঙ্গের শেষ স্বাধীন হিন্দুনৃপতি 'দনুজ' (দনুজমাধব) হইতে পারেন। কিন্তু দনুজ রায় বলবনের সমসাময়িক; ১৩০০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে ইনি চন্দ্রদ্বীপে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন বলিয়া প্রথিত আছে। অতএব রাজা গণেশের দনুজের 'হাকিম' হওয়া কিরূপে সম্ভবপর।

বুকানন্ গণেশসম্বন্ধে পরবর্ত্তী যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা রিয়াজ-উস-সালাতিন-উল্লিখিত বিবরণীর অনুরূপ, কেবল কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত, এইমাত্র প্রভেদ। রিয়াজ-গ্রন্থকার একখানি প্রাচীন পারসী পুস্তিকা হইতে তাঁহার গ্রন্থের এই অংশ সঙ্কলন করিয়াছেন। সুতরাং হয় রিয়াজ বা রিয়াজধৃত প্রাচীন পুঁথিই বুকাননের অবলম্বন; অথচ তিনি 'গণেশ' কোথায় পাইলেন? এই লইয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে তর্ক চলিতেছে। ডাঃ বুক্‌মান্ পারসী ইতিহাসের কংশের পক্ষপাতী; অন্য কেহ কেহ বুকানন্-মতে গণেশ-উপাসক। বেভারিজ্ দেখাইয়াছেন, পারসী লেখকগণ ক্বচিৎ স্বরবর্ণ যোগ করিয়া থাকেন, এরূপে গণেশ বা 'গণশ' পারসী বর্ণবিন্যাসে কনিশ্ বা কংশ হইয়া পড়া সম্ভব; কারণ পারসী কাফ্ একটি ক্ষুদ্র অর্দ্ধমাত্রার যোগে 'গাফ্' হইয়া যায়। কংশ-নামের আপত্তিখণ্ডনে ডাঃ বুক্‌মান্ বলেন, চৈতন্যের পরবর্ত্তী কালে কংশ-নাম বঙ্গে ব্যবহৃত না হইলেও, পূর্ব্বে ইহা অসাধারণ ছিল বোধ হয় না। তাঁহার এ যুক্তির সমর্থনে আরও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, মুসলমানী গ্রন্থে বা কাগজপত্রে পূর্ব্বে হিন্দুর পূর্ণ নাম প্রায়ই দেওয়া হইত না; শুদ্ধ 'কংশে' আপত্তি হইলেও 'কংশনারায়ণ' বা 'কংশারিলাল' নাম কোনকালেই অসাধারণ নহে। রিয়াজ-গ্রন্থকার কংশকে ভাতুড়িয়ার হিন্দু জমিদার বলিয়া উল্লেখ করায়, 'রাজশাহী'নামও এই শাহী রাজা (বাদশাহ রাজা) কংশের সহিত সংযোগ করিবার চেষ্টায় পণ্ডিতপ্রবর বুক্‌ম্যান্ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।*

সম্প্রতি আমরা যে প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি, তাহাতে গৌড়ের বাদশাহী সিংহাসনে যে হিন্দু রাজা নিজভুজবলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহার গণেশ-নামে আর কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। ১৪৯০ শকে রচিত ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশে বৈষ্ণবজগতে সুপরিচিত অদ্বৈতাচার্য্যের বৃদ্ধ প্রপিতামহ নরসিংহ নাড়িয়াল সম্বন্ধে লিখিত আছে:—(৩য় পৃঃ)

"যেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাত।
সিদ্ধ শ্রোত্রিয়াখ্য আরু ওঝার বংশজাত॥
যেই নরসিংহের যশ ঘোষে ত্রিভুবন।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ॥
যাহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়িয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে হৈলা রাজা॥
যার কন্যা-বিবাহে হয় কাপের উৎপত্তি।
লাউর প্রদেশে হয় যাহার বসতি॥"

এক্ষণে প্রচলিত মুসলমানী ইতিহাসের মতে কংশের বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। সুপ্রসিদ্ধ ফেরিস্তার গ্রন্থে "সমসুদ্দীনের মৃত্যুর পর রাজা কংশ মুসলমানপ্রতাপের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া রাজ্যগ্রহণে সক্ষম হন; কিন্তু ভগবান্ অচিরে কৃপা প্রত্যাহার করায় সাতবৎসর রাজ্যের পর তাঁহার মৃত্যু ঘটে, ৭৯৫ হিঃ" (১৩৯২ খৃঃ) এইমাত্র নির্দ্দেশ আছে। তবকাৎ আকবরীর গ্রন্থকার লিখিয়াছেন;—"রাজা মুসলমান না হইলেও মুসলমানগণের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল; এইজন্যই অনেক

* রাজশাহী-নাম-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা লেখকের "নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাসে" দ্রষ্টব্য। প্রাচীন রাজশাহী মুর্শিদাবাদজেলার পশ্চিমোত্তর কোণে অবস্থিত।

মুসলমান তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির পরে তাঁহার মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার কথা শপথ করিয়া বলিয়া মুসলমানশাস্ত্রমতে তাঁহাকে সমাহিত করিবার প্রস্তাব করেন। সাতবৎসর প্রবল প্রতাপে রাজ্য করিয়া তাঁহার মৃত্যুসংঘটন হইলে, তাঁহার পুত্র সিংহাসনে অধিরূঢ় হন; ইনি পবিত্র ইসলাম্‌ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।" রিয়াজ-উস্‌-সালাতিন্‌-গ্রন্থকার একথানি ক্ষুদ্র পারসী পুস্তক হইতে মুসলমানমুখরোচক কোন গোঁড়া বিরুদ্ধবাদীর সঙ্কলিত প্রবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। উহার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সমসুদ্দীনের মৃত্যুর পর হিন্দু জমিদার রাজা কংশ বাহুবলে সমগ্র বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিলেন। রাজদণ্ডগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই অত্যাচার ও মুসলমানরক্তস্রোত প্রবাহিত হইল। বাংলা হইতে ইস্‌লামধর্ম্মের উচ্ছেদই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল; পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক মুসলমানগণের উপর ভয়াবহ অত্যাচার হইতে লাগিল। অভিবাদন না করার অপরাধে সেখ বদর উল্‌ ইস্‌লামকে নিহত করা এবং তৎপরে মুসলমান উলামা-(শাস্ত্রবেত্তা)-গণকে নৌকাসহ নদীগর্ভে নিমজ্জিত করাইবার গল্পে গ্রন্থকার গোলাম হোসেন তাঁহার গ্রন্থের এক পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছেন।

শেষে এইরূপ অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডে মৌলবী পীর হজরৎ নুরকুতবাল্‌ আলমের * আসন টলিল। পীরসাহেব স্বয়ং প্রতিবিধানে অসমর্থ, সুতরাং সুদীর্ঘ পত্রে কংশের অত্যাচার জ্ঞাপন করিয়া জৌনপুরের সুল্‌তান এব্রাহিমকে বাংলা আক্রমণ করিয়া কাফেরের উচ্ছেদসাধন জন্য অনুরোধ করা হইল। সুল্‌তান মুসলমানগুরুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন; কংশরাজ তখন বিপন্ন হইয়া ফকিরের পদতলে লম্বমান। পীরসাহেবও কল্‌মা পড়িয়া রাজাকে সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া রাজ্যভোগে অভয়দানে প্রস্তুত হইলেন। রাজার ইচ্ছা থাকিলেও স্ত্রীর মন্ত্রণায় তিনি স্বর্গের সোজা পথ দেখিতে পাইলেন না। দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র যদুকে পীরের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া বলিলেন,"ভগবন্‌, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, অচিরেই ভবলীলা সাঙ্গ হইবে; অতএব এই পুত্রকে দীক্ষিত করিয়া রাজ্যভার অর্পণ করুন।" দীক্ষার প্রথম সূচনায় কুতবাল্‌ কিঞ্চিৎ চর্ব্বিত তাম্বূল ভাবী শিষ্যের বদনে প্রদান করিলেন; পরে দীক্ষা এবং জালালুদ্দীন্‌ নামে যদুর অভিষেকক্রিয়া সম্পাদিত হইল। পীরসাহেব তখন স্বধর্ম্মীর রাজ্য হইয়াছে বলিয়া সুলতান্‌ এব্রাহিম্‌কে স্বদেশপ্রতিগমনের অনুরোধ করিলেন। সুলতান্‌ কিঞ্চিৎ উগ্রভাব দেখাইলে 'নিপাত যাও'

* পাণ্ডুয়ায় 'হোটী-দরগা'-নামক মসজীদে এই ধার্ম্মিক মুসলমান পীরের সমাধিস্থান অদ্যাপি বর্ত্তমান। কুতব আলমের মৃত্যুকালসম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে। আইন্‌ আকবরীতে ৮৮৮ হিঃ নির্দ্দেশ আছে; ব্লক্‌মান্‌ প্রভৃতি সমাধিমন্দিরের তারিখ ধরিয়া ৮৫১ হিঃ করিতে চান। মালদহনিবাসী ইলাহীবক্স তাঁহার খুরসেদ্‌ জাঁহানামায় খাদিমের নিকট যে পুস্তক আছে, তাহা হইতে 'নুর ব নুর শোদ' কথায় ৮১৮ হিঃ (১৪১৫ খৃঃ) কুতবের মৃত্যুর প্রকৃত সময়, তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন।

বলিয়া অভিশাপ দেওয়া হইল; তিনি বাসায় গিয়া মরিলেন।

এদিকে রাজা কংশ আবার রাজদণ্ড কাড়িয়া লইলেন। স্বর্ণনির্ম্মিত একটি গাভী প্রস্তুত করাইয়া জালালকে মুখবিবর দ্বারা প্রবেশ করাইয়া পশ্চাদ্ভাগ হইতে পুনরায় 'ঘছ' করিয়া বাহির করিয়া লওয়া হইল; স্বর্ণ-গো ব্রাহ্মণকে দান করা হইল। কিন্তু পীরের শিক্ষা (না, মুখচন্দ্রবিনিঃসৃত পীযূষের) গুণে জালালের সত্যধর্ম্ম হইতে মতি বিচলিত হইল না। পুনরায় রাজার অত্যাচার ভীষণ হইল; পুত্র পর্য্যন্ত কারাগারে রহিলেন। আবার কুতব্‌ আলম্‌ আসরে নামিলেন। এবারে গল্পের মাধুর্য্য পূর্ব্ব বর্ণনাকেও অতিক্রম করিয়াছে। হজরতের পুত্র আনোয়ার্‌ পিতৃসমীপে মর্ম্মবেদনা জানাইয়া বলিলেন, "পিতঃ, আপনি থাকিতে মুসলমানগণের বিধর্ম্মীর হস্তে এ লাঞ্ছনা আর সহ্য হয় না।" ঋষি তখন ধ্যানস্থ ছিলেন; নেত্র উন্মীলন করিয়াই পৌরাণিক দুর্ব্বাসার মত সক্রোধে কহিলেন, "তোমার রক্তে পৃথিবী অনুরঞ্জিত না হইলে এ অত্যাচারের অবসান হইবে না।" ভ্রাতুষ্পুত্র জেহাদ্‌সম্বন্ধে কি আদেশ জিজ্ঞাসা করিলে হজরৎ উত্তর দিলেন "যাবচ্চন্দ্রদিবাকর তাহার কীর্ত্তিগাথা প্রচারিত থাকিবে।"

কংশের অত্যাচার এক্ষণে পূর্ণমাত্রায় দর্শন দিল। আনোয়ার ও জেহাদ্‌ বন্দীভূত হইলেন; কিন্তু জেহাদের বিবরণ অবগত হইয়া উহাদের প্রাণবধ না করিয়া রাজা তাহাদিগকে সুবর্ণগ্রামে প্রেরণ করিলেন। কংশরাজ শুনিয়াছিলেন, সেখানে উহাদের পৈতৃক অর্থ মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত আছে। সুবর্ণগ্রামের প্রধান রাজকর্ম্মচারীকে ঐ ধনরাশি হস্তগত করিয়া উহাদের প্রাণবধ করার আদেশ দেওয়া হইল। বহুবিধ ভয়প্রদর্শনেও তাহারা লুক্কায়িত ধনের সন্ধান দিল না। আনোয়ার প্রথমে নিহত হইল; পরে জেহাদ্‌কেও হত্যা করিবার উদ্যোগ হইলে তিনি বৃহৎ করাস প্রোথিত আছে বলিয়া স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। খনন করিয়া দেখা গেল, একটি কলসে একটিমাত্র আস্‌রফি (মোহর) আছে। বাকী কোথায় গেল, কথার উত্তরে জেহাদ্‌ বলিলেন, "বোধ হয় চোরে লইয়াছে।" জেহাদ্‌ রক্ষা পাইলেন; বাস্তবিক, টাকার কথা তিনি কিছুই জানিতেন না, দৈবানুগ্রহেই এরূপ ঘটিল। যে মুহূর্ত্তে সেখ আনোয়ারের পবিত্র রক্তপাতে ধরা সিক্ত হইল, সেই মুহূর্ত্তেই কংশের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া নরকধামে গমন করিল। মতান্তরে তাঁহার বন্দী পুত্র কারাগার হইতে অনুচরগণসাহায্যে কংশবধপূর্ব্ব নির্ব্বাহ করেন।

এখন জালালুদ্দীনের পালা। তিনি বিস্তর হিন্দুকে পবিত্রধর্ম্মে দীক্ষিত করাইলেন। স্বর্ণগাভীদানগ্রাহী ব্রাহ্মণগণকে গোমাংসদ্বারা জাতিভ্রষ্ট করা হইল। অতঃপর তিনি সেখ জেহাদের নিয়োগানুসারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া পরমসুখে কালাতিপাত

* জৌনপুরের সুলতান্‌ এব্রাহিমের বাংলা-আক্রমণের কথা জৌনপুরের ইতিহাসে নাই। এব্রাহিম্‌ কথিত সময়ে বর্ত্তমান থাকিলেও তাঁহার মৃত্যু অনেক পরে ঘটিয়া থাকিবে, কারণ ৮৪৪ হিঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, নির্দ্দেশ আছে।

করিতে লাগিলেন। এখানে 'আমার কথাটি ফুরালো' বলিবার বড়ই লোভ হয়।

ধর্ম্মান্ধ মুসলমানলেখকের আজগুবী গল্প বাদ দিয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে দেখা যায়, রাজা গণেশ সম্পূর্ণ যবনপ্রভাবের সময়েই বলে ও কৌশলে বঙ্গের রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গে মুসলমানেরই তখন সম্পূর্ণ প্রাধান্য; মুসলমান সামন্ত ও জায়গীরদারগণই ঐ ভাগে সমধিক প্রবল। তাঁহারা বিরুদ্ধাচারী হইলে সুব্যবস্থা বা রাজ্যশাসন অসম্ভব। প্রামাণিক ইতিহাস তবকাৎ আকবরী সাক্ষ্য দিতেছে, রাজা সর্ব্বথা মুসলমানপ্রজার চিত্ত আকর্ষণ করিয়া সদয় ব্যবহারে অপক্ষপাতে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। এই কারণেই তাঁহার অল্পকালব্যাপী অধিকারে প্রজার সুখশান্তি বর্দ্ধিত হইয়াছিল, এই কারণেই মৃত্যুর পরে মুসলমানগণও রাজার পবিত্র দেহ সমাহিত করিবার আগ্রহ দেখাইয়াছিল। এই মুসলমান-প্রভাবের ফলেই রাজপুত্র যদু শেষে ইসলাম্‌ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। নুর কুতবাল আলমের প্রভাবে যদুর মুসলমানধর্ম্মগ্রহণের প্রবাদে সত্য নিহিত থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব। কুতব আলম পূর্ব্বতন রাজগুরু; ধার্ম্মিক বলিয়া তাৎকালিক মুসলমানসমাজে সবিশেষ সমাদৃত ছিলেন। তাঁহার উপদেশ বা দৃষ্টান্তে হিন্দুরাজার মুসলমান হওয়া বিচিত্র নহে।

রাজা গণেশের অল্পকাল পরে উত্তরবঙ্গে তাহেরপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রাজা কংশ-নারায়ণ প্রাদুর্ভূত হন। হোসেনশাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে গৌড়ের বাদশাহী আসনে দুর্বল হাব্‌সী নৃপতিগণের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহাদির অবকাশে অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন কংশনারায়ণ উত্তরাঞ্চলে বহুদূর পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়া অর্দ্ধস্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই ক্ষমতাপ্রভাবেই তিনি বারেন্দ্রসমাজে সমাজপতি বলিয়া স্বীকৃত হন। রিয়াজগ্রন্থে স্বাধীন রাজা কংশ ভাতুড়িয়ার জমিদার বলিয়া উল্লিখিত; পরগণা ভাতুড়িয়াও বর্ত্তমান রাজশাহী জেলায়, এবং অবশ্যই কংশ-নারায়ণের রাজ্যভুক্ত ছিল। স্বর্গীয় ত্রৈলোক্য-নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পূর্ব্বে উল্লিখিত ১৩০৬ সালের 'কুল্লূকভট্ট' প্রবন্ধে গৌড়ে ব্রাহ্মণ হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন একটি বংশাবলী উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, বারেন্দ্রবংশে শাণ্ডিল্যগোত্রে নন্দনাবাসী (নান্নাসী) গ্রামী জগৎগুরু দিবাকর ভট্টের জ্যেষ্ঠপুত্র পুরুষোত্তম বেঁদান্তীর বংশে একত্রিংশ পর্য্যায়ে স্বনামখ্যাত তাহেরপুরের রাজা কংশনারায়ণ এবং দিবাকরের তৃতীয় পুত্র পণ্ডিতবর কুল্লূকভট্টের বংশে ষড়্‌বিংশ পর্য্যায়ে রাজা গণেশ রায় জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, কংশনারায়ণের বংশের দৌহিত্রকুলে তাঁহা হইতে অধস্তন দশম পুরুষে বর্ত্তমান তাহেরপুররাজ শশিশেখর। এই অবস্থায় রাজা কংশনারায়ণের বংশ থাকিলে বলিতে হয়, এই বংশে ভট্টনারায়ণ হইতে ৪১শ পুরুষ হইত। কিন্তু কি রাঢ়ীয়, কি বারেন্দ্র, ভট্টনারায়ণবংশে কুত্রাপি এই পর্য্যায় দৃষ্ট হয় না। রাঢ়ীয়কুলে ৩০ হইতে ৩২শ এবং বারেন্দ্রমধ্যে ৩৫।৩৬শ পর্য্যন্তই দেখা যায়। গৌড়ে ব্রাহ্মণে উদ্ধৃত এই অংশের বংশাবলী স্বীকার করিলে ৪২শ পুরুষ হইয়া পড়ে; সুতরাং এই বংশপত্রিকা ভ্রমাত্মক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।*

* গৌড়ে ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় সংস্করণ ১০৪—৬ পৃঃ ও ৮৭—৮৮ পৃঃ।

ত্রৈলোক্যবাবু কুল্লূকভট্টের বংশে রাজা গণেশের নাম কোথায় পাইয়াছিলেন, এই এক বিষম সমস্যা। বারেন্দ্রকুলশাস্ত্রবিৎ 'গৌড়ে-ব্রাহ্মণ'-রচয়িতা মহিমা চন্দ্র মজুমদার লিখিয়া গিয়াছেন, "কুল্লূকভট্টের বংশে কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বর্ত্তমান নাই, অথবা কুল্লূকভট্টের পরে জন্মগ্রহণ করেন নাই।"* অন্য কোন বারেন্দ্রকুলজ্ঞের নিকটেও উক্তরূপ বংশ-পত্রিকা পাওয়া যায় না। এরূপ স্থলে রাজা গণেশকে কুল্লূকভট্টের বংশধর বলিয়া গ্রহণ করা অসাধ্য। ফেরিস্তা, রিয়াজ ও বুকাননের গ্রন্থ হইতে রাজা গণেশের পুত্রের নাম জিৎ-মল বা যদুসেন পাওয়া যাইতেছে; ইহাতে ব্রাহ্মণত্বের বিরুদ্ধে সন্দেহ উৎপাদন করিয়া দিতেছে।† দিনাজপুরে প্রবাদ আছে, রাজা গণেশ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ; যে শ্রীমন্ত চৌধুরী দিনাজপুরের বর্ত্তমান রাজকুলের প্রতিষ্ঠাতা, তিনিই রাজা গণেশের বংশধর। বর্ত্তমান দিনাজপুর-রাজবংশ শ্রীমন্ত চৌধুরীর দৌহিত্র-বংশ। এই প্রবাদ পরবর্ত্তী কালে প্রচলিত হইয়াছে কি না, তাহাও নিঃসংশয়িতরূপে নির্দ্ধারিত হইবার উপায় নাই।

রাজা গণেশের সময়।

মুসলমানী ইতিহাসের মতে কংশ ৭৮৭ হিঃ অব্দে সমসুদ্দিনকে নিহত করিয়া রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। ৭৯৪ হিঃ (১৩৯২ খৃঃ) অব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। সমসুদ্দিনের পূর্ব্বে সইকুদ্দিন হামজা শার নামাঙ্কিত একটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে; তাহাতে সালের শেষ অঙ্কটি ৪ এবং কংশের পুত্র যদু জালালুদ্দিনের নামাঙ্কিত একটি মুদ্রার তারিখ ৮১৮ হিঃ অব্দ। এই কারণে ডাঃ বুক্‌ম্যান্ ইতিহাসের নির্দ্দেশমত পূর্ব্ব-রাজদ্বয়ের রাজ্যকাল ঠিক রাখিয়া অস্পষ্ট মুদ্রার তারিখ ৮০৪ ধরিয়াছেন। তিনি ৮০৮ হইতে ৮১৭ হিঃ (১৪০৫—১৪১৪) কংশের রাজ্যকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন;† কিন্তু ইহাতে কংশের রাজ্যকাল নয়-বৎসর হইয়া পড়ে। পরন্তু ৮১২ হিঃ সালের সইফুদ্দিনের পিতা গিয়াসুদ্দিন আজাম শার নামাঙ্কিত একটি মুদ্রা এবং ৮১২ (?) ও ৮১৬ হিঃ সালের শাহাবুদ্দীন বাইজিদ্ শার নামের মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে। আজাম শার মুদ্রা তাঁহার মৃত্যুর পরে মুদ্রিত ও এই শাহাবুদ্দীন রাজা কংশের বেনামদার মাত্র, ইহাই বুক্‌ম্যানের মত। কিন্তু তৎপরে কানিংহাম-সাহেব পথিয়ার কর্ত্তৃক অনুদিত চীনদেশীয় প্রাচীন এক আখ্যায়িকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, ৮১১ হিঃ (১৪০৮ খৃঃ) অব্দে গিয়াসুদ্দীন চীনদেশীয় সম্রাটের নিকটে উপহার পাঠাইয়াছেন। ১৪০৯ খৃঃ অব্দে পুনরায় এইরূপ প্রীতি-উপহার-প্রেরণের উল্লেখ আছে।‡ তৎপরে ১৪১২ খৃঃ অব্দে (৮১৫ হিঃ) চীনদেশীয় দূতগণ পথিমধ্যে বঙ্গীয় দূতগণের নিকট সংবাদ পাইলেন,

* গৌড়ে ব্রাহ্মণ ১০৫—৬ পৃঃ। দুঃখের বিষয়, যে সময়ে আমরা এই ত্রৈলোক্যবাবুকে এ সম্বন্ধে পত্র লিখিবার মানস করি, তখনই তাঁহার লোকান্তরের সংবাদ পাওয়া যায়।

† Journal. As. Soc. 1875. Contribution to the History and Geography of Bengal.

‡ Cunningham's Archæological Report for 1879—80, pp. 173—74, quoting Pauthier in the Journal Asiatique, Dec. 1839 "In A. D. 148 the king of Pang-kola (Bengala) named Ai-ya-sse-ting (Giasuddin) sent an ambassador to offer tribute (presents) &c. &c."

গিয়াসুদ্দীনের মৃত্যু হইয়াছে; তাঁহার পুত্র সইফুদ্দীন রাজা হইয়াছেন। কানিংহাম এই কারণে পূর্ব্বোক্ত অস্পষ্ট মুদ্রার তারিখ ৮১৪ হিঃ সালে বলেন; তাঁহার মতে বাইজিদ্ শার মুদ্রাও ৮১৪ ও ৮১৬ হিঃ সালের।

অতঃপর গিয়াসুদ্দীনের ৮১২ হিঃ সালের মুদ্রা আর তাঁহার মৃত্যুর পর মুদ্রিত, এ কথা বলা যায় না; কোন রাজার মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে অন্যে তাঁহার মুদ্রা প্রচলন করে কি না, তাহাও বিচার্য্য। ৮১৪ হিঃ পর্য্যন্ত গিয়াসুদ্দীনের রাজ্যকাল ধরিয়া ইতিহাসের মতে সইফুদ্দীন ও সামসুদ্দীনের সাতবৎসর সময় দিতে হইলে ৮২১ আসিয়া পড়ে। এদিকে গণেশের পুত্র যদু জালালুদ্দীনের ৮১৮ হিঃ সালের মুদ্রা রহিয়াছে; সুতরাং এই দুইজন রাজার সম্বন্ধে প্রচলিত মুসলমানী ইতিহাসের কথা গ্রহণ করা যায় না। বিরাজ গ্রন্থে দেখিতে পাই, রাজা কংশের চক্রান্তেই গিয়াসুদ্দীনের প্রাণনাশ ঘটে। এ কারণে আমাদের বিশ্বাস, গিয়াসুদ্দীনের পরেই প্রকৃতপক্ষে রাজা গণেশের রাজ্যারম্ভ। সইফুদ্দীন ও শাহাবুদ্দীনকে (ইতিহাসের সামসুদ্দীন) ৮১৬ হিঃ পর্য্যন্ত মুদ্রা প্রচলন করিতে দেখা আশ্চর্য্য নহে। তাঁহারা গণেশের প্রতাপে পলায়িত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে বা অন্যত্র কিয়ৎকাল নামে-মাত্র রাজা থাকিতে পারেন। শাহাবুদ্দীনের নামে গণেশের মুদ্রাপ্রচারের কোনই কারণ দেখা যায় না। যদুর ৮১৮ হিঃ সালের মুদ্রা তাঁহার রিয়াজ্‌গ্রন্থে উল্লিখিত মুসলমানধর্ম্ম পরিগ্রহ করার সমকালে মুদ্রিত হইতে পারে বলিয়া বেভারিজ্ ইঙ্গিত করিয়াছেন।* দ্বাদশবর্ষীয় যদুর কথিতরূপে মুসলমান হইয়া সিংহাসনপ্রাপ্তির প্রবাদ সমগ্রভাগ বিশ্বাস্য ও যুক্তিসঙ্গত, তাহা বোধ হয় কেহই স্বীকার করিবেন না। এ মতে কষ্টেসৃষ্টে গণেশের সাতবৎসর খাড়া করিলেও যদু পঞ্চদশবৎসর বয়সেই জালালুদ্দিন আবুল মজঃফর মহম্মদ শা নাম ধারণ করিয়া দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে সমগ্র বঙ্গে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, স্বীকার করিতে হয়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, বিরাজ-গ্রন্থকার কংশকে ভাতুড়িয়ার জমিদার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সংগৃহীত ও আদর্শ ক্ষুদ্র পারসীপুস্তকেই এই কংশনারায়ণ ও স্বাধীন রাজা গণেশ সম্বন্ধে গোল আছে কি না, তাহা আর এক্ষণে নির্ণীত হইবার উপায় নাই।† সম্প্রতি কংশনারায়ণের কালনির্ণয় করা যাইতেছে। গৌড়ে ব্রাহ্মণে ধৃত

* Journal, Asiatic Society, 1892 (Raja Kans).

† ফেরিস্তা প্রভৃতির ইতিহাসের এই ভাগ মহম্মদ কান্দাহারীর রচিত বাংলার প্রাচীন বিবরণী হইতে সম্ভবত সংগৃহীত হইয়া থাকিবে। দুর্ভাগ্যবশত কান্দাহারীর গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না। রিয়াজ্‌গ্রন্থকার রাজার নামের সময়ে কান্দাহারীর নির্দ্দেশ গ্রহণ করিয়াছেন মনে হয়, নতুবা তাঁহার গ্রন্থে কংশ এবং বুকাননে 'গণেশ' হইবে কেন? যে কোন কারণেই হউক, পারসী ইতিহাসে কংশনারায়ণ ও গণেশ নাম লইয়া গোল হইয়াছে, স্পষ্ট দেখা যায়। কংশনারায়ণ এই স্বাধীন গৌড়াধিপ হইতে পারেন না, কারণ তাঁহার বংশাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে এবং তিনি পরবর্ত্তী কালের লোক তাহারও সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রদত্ত হইল। তবে তাঁহার ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন অর্দ্ধস্বাধীন হিন্দুরাজাকে পরবর্ত্তী কালে পূর্ব্বতন স্বাধীন গৌড়েশ্বর বলিয়া ভ্রম করা সম্পূর্ণ সম্ভব।

বংশাবলী বা ত্রৈলোক্যবাবুর নির্দ্দিষ্ট বংশপত্রিকায় ভ্রম আছে, পূর্ব্বেই দেখান গিয়াছে। গৌড়ে ব্রাহ্মণ হইতে অন্য দুইটি বংশপত্রিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

কাশ্যপগোত্রে
সুষেণ হইতে ১৭শ পুরুষে
উদয়নাচার্য্য (পরিবর্ত্তমর্য্যাদাকার)
|
পঞ্চপতি
|
ঘগাই
|
বলাই
|
অংশুমান্
|
মুকুন্দ ভাদুড়ী
|
শ্রীকৃষ্ণ
|
সুবুদ্ধি খাঁ কেশব খাঁ জগদানন্দ রায় (২৪)
(ইঁহারা রাজা কংশনারায়ণের ভাগিনেয়)

ভরদ্বাজগোত্রে
গৌতম হইতে ১৬শ পুরুষে
আরু ওঝা নাড়িয়াল।
|
নরসিংহ নাড়িয়াল (২২)
|
বিদ্যাধর
|
ঢুকড়ি
|
কুবেরাচার্য্য
|
অদ্বৈতাচার্য্য (২৬)

তালিকার অদ্বৈতাচার্য্য বৈষ্ণবজগতে সুপরিচিত; শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক, অথচ কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধ; ১৩৫৬ শকে ইঁহার আবির্ভাব এবং ১৪৮১ শকে (১৫৫৯ খৃঃ) ইঁহার তিরোধান ঘটে। ১৪৯০ শকে রচিত পূর্ব্বোক্ত ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশের উক্তির সহিত উল্লিখিত জন্মপত্রিকার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। নরসিংহ নাড়িয়ালের কীর্ত্তিকলাপ ও বারেন্দ্রসমাজে কাপের উৎপত্তির বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা হইলে 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। অদ্বৈতের পাঁচপুরুষ পূর্ব্বতন নরসিংহ অথবা রাজা গণেশকে মোটামুটি ১২৫বর্ষপূর্ব্ববর্ত্তী ধরিলে গণেশের ইতিহাসনির্দ্দিষ্ট রাজ্যকালের সহিত গরমিল হয় না। এক্ষণে কংশনারায়ণের ভাগিনেয়গণের বংশাবলী দেখুন। আমরা অন্যত্র দেখাইয়াছি,* কংশনারায়ণের প্রথম ভাগিনেয় এই সুবুদ্ধি খাঁ বৃদ্ধবয়সে হোসেন্ শার রাজ্যকালে যবনহস্তে নিগৃহীত হইয়া শেষে বৃন্দাবনে রূপগোস্বামীর সহিত মিলিত হন।† ইঁহাকে চৈতন্যের একপুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী ধরিলে মাতুল কংশনারায়ণ চৈতন্যের অন্তত ৫০। ৬০ বর্ষ পূর্ব্বের লোক হইতেছেন। সম্প্রতি কৃত্তিবাসী রামায়ণের যে হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথির উদ্ধার হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হয়, কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়া দেখিলেন—

* সাহিত্য—ফাল্গুন, ১৩০৮ (হোসেন শা)।

† চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যখণ্ড, ২৫শ পরিচ্ছেদ।

ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরণী।
সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ * আদি ধর্ম্মাধিকারিণী॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিতপ্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর॥

উদ্ধৃত বংশাবলীর সহিত এই সভাবর্ণন মিলাইয়া দেখিলে মনে হয়, কৃত্তিবাস যে পণ্ডিতপ্রধান মুকুন্দের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিই সম্ভবত জগদানন্দের পিতামহ এবং কংশনারায়ণের ভগিনীর শ্বশুর এবং ধর্ম্মাধিকারী মহাপাত্র শ্রীকৃষ্ণ জগদানন্দের পিতা এবং রাজার ভগিনীপতি। এদিকে রাঢ়ীয় ঘটক দেবীবরের কুলগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ১৪০২ শকে অর্থাৎ চৈতন্যদেবের জন্মের পাঁচবর্ষ পূর্ব্বে দেবীবরকর্ত্তৃক রাঢ়ীয় কুলীনগণের মেলবন্ধন সাধিত হয়। কৃত্তিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্র মালাধর খাঁকে লইয়া মালাধর-খাঁনী থাক্ হয়। এরূপে কৃত্তিবাস ও জগদানন্দ বা সুবুদ্ধির মাতুল কংশনারায়ণ এক সময়ের লোক হইতেছেন। কৃত্তিবাস স্বয়ং ভরদ্বাজগোত্র শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন ২২শ পুরুষ; ইহাতেও সময়ের ঠিক মিল হইতেছে। কৃত্তিবাসের রাজসভাবর্ণনে যে যবনপ্রভাব একবারে দৃষ্ট হয় না, তাহার কারণও এই। এই সমস্ত প্রমাণের পরে স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বা নগেন্দ্রবাবুর মতে কৃত্তিবাসের চন্দ্রদ্বীপের রাজসভায় গমন অথবা দীনেশবাবুর মতে এই গৌড়েশ্বরই স্বাধীন রাজা কংশ, ইত্যাদি ভ্রমসঙ্কুল, ইহা নির্দ্দেশ করা বাহুল্যমাত্র। †

বর্ত্তমান প্রবন্ধে গণেশের সমকালবর্ত্তী বঙ্গের অবস্থা আলোচনা করিবার অবকাশ নাই। এক কথায় এইমাত্র বলা যায়, যে যে কারণে বাঙালীর কার্য্যকারিতাশক্তি ধ্বংসপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, সেকালে সেই সমস্ত কারণের আবির্ভাব হয় নাই। যখন পূর্ণ মুসলমানপ্রভাবের মধ্যে চাণক্যের মত মনস্বী বারেন্দ্রব্রাহ্মণসন্তান নরসিংহের মন্ত্রণায় বঙ্গের সিংহাসন হিন্দুর পক্ষে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছিল, সে কালের কথা স্মরণ করিলে বর্ত্তমানে আমাদের মত বাক্যবাগীশ বাঙালীর কিঞ্চিন্মাত্র চৈতন্যোদয়ও কি আশা করা যায় না?

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্ধৃত পাঠ "শ্রীবৎস," কিন্তু শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর সংগৃহীত একখানি পুঁথিতে "শ্রীকৃষ্ণ" পাঠ আছে।

† বিগত ১৩০৪ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় কৃত্তিবাসপ্রবন্ধে স্বর্গীয় প্রফুল্লবাবু রাঢ়ীয়-কুলীনবংশাবলী হইতে কৃত্তিবাসের সময়নিরূপণের যে উদ্যম করিয়াছেন, তাহাতে তিনি কৃত্তিবাসকে চৈতন্যদেবের ১৫০বর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে চান, কিন্তু পত্রিকাসম্পাদক নগেন্দ্রবাবু জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' হইতে দেখাইয়াছেন, চৈতন্য ও কৃত্তিবাসে দুইপুরুষ মাত্র ব্যবধান হইতে পারে। নগেন্দ্রবাবু এক্ষণে পূর্ব্বমত প্রত্যাহার করিয়া, কংশনারায়ণই কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বর, এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

সন্ধ্যাদীপ।

আলো ওগো আলো ওগো সন্ধ্যাদীপ আলো!
হৃদয়ের একপ্রান্তে ওইটুকু আলো
স্বহস্তে জাগায়ে রাখ! তাহারি পশ্চাতে
আপনি বসিয়া থাক আসন্ন এ রাতে
যতনে বাঁধিয়া বেণী সাজি রক্তাম্বরে
আমার বিক্ষিপ্ত চিত্ত কাড়িবার তরে
জীবনের জাল হতে। বুঝিয়াছি আজি
বহুকর্ম্মকীর্ত্তিখ্যাতি আয়োজনরাজি
শুষ্ক বোঝা হয়ে থাকে, সব হয় মিছে
যদি সেই স্তূপাকার উদ্যোগের পিছে
না থাকে একটি হাসি; নানা দিক্ হতে
নানা দর্প নানা চেষ্টা সন্ধ্যার আলোতে
এক গৃহে ফিরে যদি নাহি রাখে স্থির
একটি প্রেমের পায়ে শ্রান্ত নতশির।

গোধূলি।

গোধূলি নিঃশব্দে আসি আপন অঞ্চলে ঢাকে যথা
কর্ম্মক্লান্ত সংসারের যত ক্ষত যত মলিনতা,
ভগ্ন-ভবনের দৈন্য, ছিন্ন-বসনের লজ্জা যত—
তব লাগি স্তব্ধ শোক স্নিগ্ধ দুই হাতে সেইমত
প্রসারিত করে' দিক্ অবারিত উদার তিমির
আমার এ জীবনের বহু ক্ষুব্ধ দিনযামিনীর
স্খলন খণ্ডতা ক্ষতি ভগ্ন-দীর্ণ জীর্ণতার 'পরে,—
সব ভালমন্দ নিয়ে মোর প্রাণ দিক্ এক করে'
বিষাদের একখানি স্বর্ণময় বিশাল বেষ্টনে।
আজ কোনো আকাঙ্ক্ষার কোনো ক্ষোভ নাহি থাক্ মনে,
অতীত অতৃপ্তিপানে যেন নাহি চাই ফিরে ফিরে—
যাহা কিছু গেছে যাক্, আমি চলে যাই ধীরে ধীরে
তোমার মিলনদীপ অকম্পিত যেথায় বিরাজে
ত্রিভুবনদেবতার ক্লান্তিহীন আনন্দের মাঝে!

বাঁচিবার তৃষা।

(ফরাসী লেখক ইউজেন মরে হইতে)

১

রেমো-লুল পণ্ডিতের পুত্র, নিজেও সুপণ্ডিত। মার্গারীট্-নামে একটি বালিকাকে তিনি আবৈশব ভাল বাসিতেন। এক্ষণে মার্গারীট্ তাঁহার বাগ্‌দত্তা প্রণয়িনী। মার্গারীট্‌ও তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত এবং তাঁহার বিদ্যার গৌরবে নিজেকেও গৌরবান্বিতা মনে করিত। মার্গারীট্ যদিও পরমার্থ-বিদ্যার ক-অক্ষরও জানিত না, তথাপি পণ্ডিতবর স্বীয় প্রণয়িনীর অনুপম রূপ-লাবণ্যের জন্য মনে-মনে গর্ব্ব অনুভব করিতেন। বাস্তবিক-পক্ষে, ওরূপ রূপলাবণ্য পারি-নগরীর গলি-ঘুঁজির মধ্যেই কচিৎ-কখন দেখিতে পাওয়া যায়।

দুর্ভাগ্যক্রমে রেমো শুধু পরমার্থবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না, তা ছাড়া তিনি উপ-রসায়নবেত্তা ও যাদুকরও ছিলেন; এবং মন্ত্রৌষধি প্রভৃতি অলৌকিক ভৈষজ্যতত্ত্বেও পারদর্শী ছিলেন। বলিতে কি, সমস্ত মহা-রহস্যের চাবি যেন তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি "তত্ত্বজ্ঞানীর প্রস্তর" আবিষ্কারে ও অমরজীবনলাভের নিমিত্ত অমৃতরসের আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। মার্গারীটের খুল্লতাত ও শিক্ষক জেনেব্রার কোন-এক গির্জ্জার পুরোহিত ছিলেন। তিনি রেমোর এই-সব অসাধ্যসাধনের চেষ্টাকে 'পাগ্‌লামি' বলিয়া উপহাস করিতেন।

একদিন প্রাতঃকালে রেমো এই-সব অলৌকিক-রহস্য-ঘটিত একখানি নব-প্রকাশিত গ্রন্থ উৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেছিলেন, মার্গারীটের খুল্লতাত তাহা শুনিতে পাইয়া ক্রোধে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। তিনি ঐ যাদুকরের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিবেন না বলিয়া স্থির করিলেন; পরে, মার্গারীট্‌কে ডাকিয়া বলিলেন, "আর তুমি রেমোর ভরসায় থাকিও না। এখন হইতে উহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া দাও।" মার্গারীট্ বলিল:—"শুধু একবারটি দেখা করব কাকা।"

পাদ্রি প্রথমে তাহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই, কিন্তু মার্গারীটের নিতান্ত ব্যগ্রতা দেখিয়া অবশেষে সম্মত হইলেন। উভয়ের মধ্যে শেষদিনের দেখাসাক্ষাৎ ঘটিল।

মার্গারীট্ ভাবিয়াছিল, রেমোর হৃদয় তো তাহার হস্তগত, একবার বলিবামাত্রই তিনি তাঁহার শাস্ত্র, বিজ্ঞান, মন্ত্রতন্ত্র তাহার পদতলে বিসর্জ্জন করিবেন। তাই সে নিঃসন্দিগ্ধভাবে তাঁহাকে বলিল:—"দেখ, শাস্ত্রালোচনা তোমাকে ছাড়্‌তে হবে, তা নৈলে আমরা সুখী হতে পারব না।" রেমো বলিলেন:—"জ্ঞান বিনা সুখ কোথায়?"

মার্গারীট্ মাথা হেঁট করিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে আবার বলিল:—

"সুখী হবার জন্য জ্ঞানের কি দরকার?—জ্ঞানলাভ করে' তুমি করবে কি?" রেমো বলিলেন:—"আমি যে একটা বৃহৎ কাজে হাত দিয়েছি, তা কি তুমি জান না?"

"সরলা বলিল:—"আমি এইমাত্র জানি, আমার কাকা ও-সব বিষয়ের কোন খোঁজ রাখেন না, কিছুই জানেন না। না জেনে তিনি ভালই আছেন; ঈশ্বরকে ভালবেসেই তিনি সন্তুষ্ট। তিনি ধীর, শান্ত, বিজ্ঞ ও দয়ালু। যে ঈশ্বরের উপর তিনি নির্ভর করে' আছেন, সেই ঈশ্বরই তাঁকে দীর্ঘজীবী করবেন।" রেমো বলিলেন:—"হুঁ!—দীর্ঘ-জীবী! একদিন যদি মর্‌তেই হয়, তা হ'লে দীর্ঘজীবনেই বা সুখ কি?"

——"কিন্তু···আমার মনে হয়"···

——"তোমার মনে হয়, তোমার মনে হয়·····দেখ, আমি যমের সঙ্গে সংগ্রাম করব, মৃত্যুকে পৃথিবী হ'তে দূর করে' দেব, জীবনকে চিরস্থায়ী করব—এই আমার সঙ্কল্প।"

মার্গারীট্ একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া ভাবিতেও প্রবৃত্তি হইল না; কেন না, সে তাঁহাকে ভালবাসিত।

তখন রেমো উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন; বিজ্ঞানের সহিত তাঁহার কিরূপ সংগ্রাম চলিয়াছে, দীপালোকে তিনি কত নিশি জাগরণ করিয়াছেন, প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনে কতদিন ধরিয়া চেষ্টা করিতেছেন, তৎসমস্ত তিনি বর্ণনা করিতে লাগিলেন। মার্গারীট্ বলিল:—"আমাদের বিবাহের কি হবে?"

——"তার জন্য আমরা কি অপেক্ষা করতে পারব না?—আমাদের সম্মুখে তো অনন্ত জীবন পড়ে রয়েছে।"

মার্গারীট্ একটু মৃদুকি হাসিয়া, আকাশের দিকে অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া বিশ্বাসভরে বলিল:—"ঐ হোথা!"

রেমোও দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত বলিলেন:—"না, এই পৃথিবীতেই।"

তখন সেই সরলা বালা এইটুকুমাত্র বুঝিল, তাহার জীবনের সুখ জন্মের মত ফুরাইয়াছে, সে কাঁদিতে লাগিল। পরে বলিল:—"আচ্ছা বল, এখন কি কর্‌তে হবে।"

রেমো বলিলেন:—"শপথ কর, আমা ছাড়া তুমি আর-কারও হবে না।"

——"আচ্ছা, আমি শপথ করলেম।"

——"আমার জন্য অপেক্ষা করে' থাক্‌বে?"

——"চিরকাল?"

——"অন্তত, অনেকদিন পর্য্যন্ত।··· আমি এখন বিজনে গিয়ে বাস করব; একটা ঘরে বন্ধ হ'য়ে থাকব—এখন হয় তো কত-কত বৎসর ধরে' হাপরের কাছে আমাকে বসে' থাক্‌তে হ'বে। কিন্তু এ আমি নিশ্চয় করে' বল্‌তে পারি, একদিন-না-একদিন আমার পরীক্ষা সফল হবেই। তখন আমি তোমার নিকটে এসে উপস্থিত হব, আর তখন আমরা দুজনে অনন্ত সুখের ভাগী হব।"

এই কথায়, মার্গারীটের নেত্র-বিগলিত অশ্রুজলে যেন একটু হাসির ছায়া প্রতি-বিম্বিত হইল।

——"সে দিন কবে আস্‌বে কে জানে,

ততদিনে হয় তো আমাদের সুখের যৌবন চলে যাবে।"

——"কি পাগলের মত কথা বল্‌চ! জীবন চিরস্থায়ী হ'লে, যৌবনও চিরস্থায়ী হবে।"

——"আচ্ছা যাও তবে। আমি তোমার ও-সব জ্ঞানের কথা বুঝি নে। আমি শুধু এই বুঝেচি, আমার কপাল পুড়েচে। যাই হোক্, তুমি শীঘ্র শীঘ্র ফিরে এসো। আর, শীঘ্রই হোক্, বিলম্বই হোক্, এ তুমি বেশ জেনো, আমি তোমারই—চিরকাল আমি তোমারই থাক্‌ব।"

২

সেই অবধি উভয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হইল—আর দেখাসাক্ষাৎ হইল না···অন্তত অনেকদিন পর্য্যন্ত। সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান অনুশীলন করিবার নিমিত্ত এবং পরীক্ষার প্রয়োজনীয় বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত রেমো কিছুকাল পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। তাহার পর 'পারি'তে ফিরিয়া-আসিয়া কোন জনশূন্য গলি-ঘুঁজির মধ্যে একটি পরিত্যক্ত গৃহে বাস করিতে লাগিলেন; এবং তাহার একটি কক্ষে পরীক্ষাগার প্রস্তুত করিয়া, রাশিরাশি পুরাতন গ্রন্থে—'পার্চমেণ্ট'-কাগজে—চোয়াইবার পাত্রাদিতে দিবারাত্রি পরিবেষ্টিত থাকিয়া, অবিশ্রান্তভাবে নানাবিধ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার একজন ঝি ছিল, সে আপন-ইচ্ছামত তাঁহার ক্ষুৎপিপাসা-নিবৃত্তির কথঞ্চিৎ ব্যবস্থা করিত। সে শুধু দ্বারে আঘাত করিত—ঘরে প্রবেশ করিতে পারিত না। এইরূপে তিনি অনেক-অনেক বৎসর ধরিয়া তাঁহার বিজন আবাসে কালাতিপাত করিলেন; কত কাল অতিবাহিত হইল, সে বিষয়ে তাঁহার কোন হুঁস্ ছিল না—তাঁহার বয়সেরও তিনি কোন খবর রাখিতেন না।

এই অদ্ভুত জীবনে, কত যুঝাযুঝি, কত বিভ্রম, কত বিড়ম্বনা, কত আশাভঙ্গ ঘটিয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে।

কিন্তু একদিন তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল—পরিশ্রম সার্থক হইল;—অমর-জীবনের অমৃতরস আবিষ্কার করিলেন।

এবার তিনি এতটা নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন যে, নিজ-শরীরের উপর পরীক্ষা করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। ইতিপূর্ব্বে তিনি কেবল জীবজন্তুর উপরেই পরীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু কোনপ্রকার সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। যখনই জীবনকে আহ্বান করিতেন, তখনই মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইত। কিন্তু এবার আর কোন সন্দেহ রহিল না। জীবনের কোথায় উৎপত্তি, কোথায় নিবৃত্তি—তাহার রহস্য এবার তিনি উদ্ভেদ করিলেন। এবার মৃত্যুকে জয় করিয়া তিনি মৃত্যুঞ্জয় হইলেন।

সেই আবিষ্কৃত অমৃতরস যেমন তিনি পান করিলেন, অমনি দেহে নব বল, নব স্ফূর্ত্তি, নব উদ্যম সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিতে লাগিলেন। কেন না, অনেকদিন হইতে তাঁহার শরীর শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; এতটা দুর্ব্বল হইয়াছিলেন যে, থাকিয়া-থাকিয়া তাঁহার মস্তক স্কন্ধের উপর ঢলিয়া পড়িত। কিন্তু এক্ষণে, অভিনব উষ্ণ শোণিত তাঁহার ধমনীতে মহাবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন:—"বিজ্ঞানের জয়!"

কিন্তু উল্লাসে তিনি এতটা অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, সেই অমৃতরসের শিশিটা তাঁহার হাত হইতে ফস্‌কাইয়া ভূতলে পড়িয়া ভাঙিয়া গেল। তিনি উন্মত্তের ন্যায় সেই ভগ্নাবশিষ্ট শিশির দিকে ছুটিয়া গেলেন এবং নিকটস্থ জ্বলন্ত হাপরের নীলাভ প্রভায় দেখিতে পাইলেন, সেই ভগ্নাবশিষ্ট শিশির তলায় শুধু একটি-ফোঁটা রস ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

——"এক ফোঁটা—শুধু একটি ফোঁটা। মার্গারীট্, এই ফোঁটাটি তোমার জন্য—এখন জগৎ মরে মরুক্, তাতে কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। আমাদের দু'জনের জন্য তো অনন্ত জীবন সঞ্চিত রইল।" এই কথা বলিয়া তিনি গৃহ হইতে বাহির হইলেন এবং বিক্ষিপ্তচিত্তে রাস্তা পার হইয়া, সহরের ভিতর দিয়া গিয়া, মার্গারীটের খুল্লতাত—গির্জ্জার সেই বৃদ্ধ পুরোহিতের ভবন পর্য্যন্ত ছুটিয়া গেলেন।

তাঁহার খোঁজ করায় সেখানকার লোকে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তিনি যে ৩০ বৎসর হইল, লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। আচ্ছা, কিন্তু মার্গারীট্!···তাহার ঠিকানা পাইতেও অনেক বিলম্ব হইল; কেন না, সে-অঞ্চলে মার্গারীট্‌কে কেহই জানিত না। কেবল একজন বৃদ্ধা বলিল, "মার্গেরীট্-নামে একটি যুবতীকে পূর্ব্বে সে জানিত, এক্ষণে অস্পষ্ট স্মৃতিমাত্র তাহার মনে রহিয়াছে। সেই বৃদ্ধা তাহার সন্ধানে তাঁহার সঙ্গে যাইবে বলিয়া স্বীকৃত হইল। এই বৃদ্ধার সাহায্য না পাইলে তিনি কখনই মার্গারীটের নিকট পৌঁছিতে পারিতেন না।

বৃদ্ধার কথামত কোন একটা রাস্তা ধরিয়া রেমো একটি ক্ষুদ্র দোতালা-বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাঁপিতে কাঁপিতে সেই বাড়ীতে উঠিয়া দ্বারে আঘাত করিলেন। দ্বার খুলিল। মার্গারীটের নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করায় কে-একজন উত্তর করিল:—"ওগো, এখানে না।"

রেমো গৃহে প্রবেশ করিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে আবার মার্গারীটের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন:—"মার্গারীট্ জেনেব্রার!—মার্গারীট্ জেনেব্রার।"—

পাণ্ডুবর্ণ বলিতচর্ম্ম অস্থিচর্ম্মসার একজন বৃদ্ধা একটা বড় আরাম-কেদারায় বসিয়া ছিল, সে স্খলিতপদে অতি কষ্টে উঠিয়া বলিল:—"মার্গারীট্ জেনেব্রার? তা হ'লে আমিই বোধ হয়।"

——"তুমি!···বৃদ্ধা, তুমি কি ক্ষেপেছ? আমি মার্গারীট্‌কে খুঁজ্‌চি;—সে সুন্দরী, সে যুবতী, তার সোনালি রঙের চুল, লাল টুক্‌টুকে ঠোঁট।"

তাহার পর ঘরের দেয়ালে একটি আয়তলোচনা তরুণীর চিত্র দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন:—"ঐ-ই আমার মার্গারীট্, ওকেই আমি ভালবাসি, আর ঐ-ই আমার জন্য অপেক্ষা করে' থাক্‌বে বলে' শপথ করেছিল।"

মার্গারীট্ প্রথমে চিত্রের উপর—তাহার পর রেমোর উপর বিষাদময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; পরে তাহার মুখে একটি বিষণ্ণ হাসির রেখা অঙ্কিত হইল। সে বলিল:—"আমিই সেই; আমি তোমাকে প্রবঞ্চনা করি নি; আমি সেই অবধি তোমার জন্য

অপেক্ষা করে' ছিলেম—কিন্তু তুমি ক্রমাগত বিলম্ব কর্‌তে লাগ্‌লে……তোমার আস্‌বার পূর্ব্বেই, দুরন্ত কাল এসে, এই দেখ, আমার সেই সুন্দর মুখে দুরপনেয় চিহ্ন রেখে গেছে।"

——"তুমি মার্গারীট্? তোমার এই দশা?"

ঐ রমণীর মুখে তখনও বিষাদের হাসিটি মিলাইয়া যায় নাই।

——"কিন্তু রেমো, তুমি কি মনে কর, তোমাকে পূর্ব্বে যে-রকম দেখেছিলেম, তুমিও সেই-রকমটিই আছ? তোমার মুখটা একবার আয়নায় দেখ-দিকি সখা।"—এই বলিয়া মার্গারীট্ তাঁহার হাত ধরিয়া একটা আয়নার সম্মুখে লইয়া গেল। রেমো আয়নায় মুখ দেখিয়া, চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল, যেন পূর্ণ-যৌবনে নিদ্রা গিয়াছিলেন, জরাজীর্ণ বৃদ্ধ হইয়া এখন জাগরণ করিলেন। বলিলেন:—"এ মানসিক শ্রমের ফল।"

——"না সখা, এ কালের ধর্ম্ম।"

——"আচ্ছা, আমাদের শেষ দেখা-শুনার পর কত বৎসর হ'য়ে গেছে বল দিকি।"

——"অর্দ্ধ-শতাব্দী।"

রেমো একটা কাঠের টুলের উপর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

——"বল কি? অর্দ্ধ-শতাব্দী?—এ কি কখন সম্ভব?"

এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার গতানুশোচনা উপস্থিত হইল—সমস্ত মনের সুখ বিলোপ গেল। কিন্তু তাহার পরক্ষণেই সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহার চোখে বিদ্যুৎ ছুটিল। তিনি বলিলেন:—"যার অনন্তকাল বাঁচ্‌বার কথা, তার পক্ষে অর্দ্ধ-শতাব্দী কি?" এই কথা বলিয়া অঙ্গুলী হইতে একটা সোনার আংটি টানিয়া বাহির করিলেন,—তাহার মণি-কোষে এক-ফোঁটা অমৃতরস সঞ্চিত ছিল। আংটিটি মার্গারীটের হস্তে অর্পণ করিয়া দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত বলিলেন:—"পান কর, পান কর, তোমাকে আমি অমর করে' দিচ্ছি।"

মার্গারীট্ আংটিটা একপাশে রাখিয়া, বুকের জামা ছিঁড়িয়া নিজ কুৎসিত বিলোল বিকলাঙ্গ দেহযষ্টি দেখাইল—রেমো শিহরিয়া উঠিলেন। মার্গারীট্ বলিল:—ঈশ্বর প্রতি-বসন্ত-ঋতুতে প্রকৃতিকে কি করে' নূতন যৌবনের সাজে সাজিয়ে দেন, তা ঈশ্বরই জানেন। তোমার মত আমার শাস্ত্র-জ্ঞান নেই বটে, কিন্তু আমার কাণ্ড-জ্ঞান আছে। এ শরীর তো একটা জড়পিণ্ড মাত্র, এক সময়ে নষ্ট হবেই; আমাদের আত্মাই অমর—ঈশ্বর মানুষের আত্মাতেই দিব্যপ্রাণ সঞ্চার করেছেন। এ বিষয়ে আমার কাকা যা বল্‌তেন, তাই ঠিক্। দেখ সখা, তুমি তোমার সময়ের অপব্যবহার করেছ।"

——"যাক্, তবে চুলোয় যাক্!—পূর্ব্বে যদি তুমি আমাকে এ কথা বল্‌তে"…এই বলিয়া আংটিটা সবলে পদদলিত করিলেন।

সেই অমৃতবিন্দুটি বাষ্পাকারে বায়ুতে মিলাইয়া গেল এবং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মূল-বীজে প্রাণশক্তি প্রত্যর্পণ করিয়া বিশ্বপদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

৩

একবৎসর পরে রেমো শুনিলেন, মার্গারীটের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ভক্তিভাবে

তাঁহার অন্তিম-নিবাস পর্য্যন্ত গমন করিলেন। পরে সঙ্গিহীন, প্রেমহীন, বন্ধুহীন হইয়া ব্যাধ-ধৃত অরণ্যপশুর ন্যায় স্বল্পায়তনবদ্ধ লৌহপিঞ্জরের মধ্যে যেন ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন। জীবনে কোন সুখ নাই, কোন আশা নাই, দূর দিগন্তেও কোন লক্ষ্যস্থল নাই—এই ভাবে তিনি এখন জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।

পশ্চাতে, সম্মুখে, সর্ব্বত্রই শূন্য।

তাঁহার জীর্ণশরীর কাল-তূষারে ভারাক্রান্ত; মন শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত;—চিন্তায় আর সরসতা নাই—দীপ্তি নাই। হৃদয় ক্ষতবিক্ষত, জর্জ্জরিত। অন্তরাত্মা নিরুৎসাহ, বিষণ্ণ—কোন আশ্রয়স্থল নাই।

অনন্তকাল তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত; দিনের পর দিন আসিতেছে, তাহার বিরাম নাই, অবসান নাই।

কে তাঁহার হৃদয়ে এখন বল-বিধান করিবে?—কে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবে? কার জন্য তিনি এই সমস্ত কষ্ট সহ্য করিবেন? তাঁহার জীবনের এখন প্রয়োজনই বা কি?

এই তমসাবৃত জীবনের ভীষণ মহাশূন্যের মধ্যে, তিনি মৃত্যুকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু তাঁহার হতাশ-হৃদয়ের আহ্বানে মৃত্যু সাড়া দিল না।

যে মৃত্যু দুর্ব্বলের বিভীষিকা ও সবলের আশ্রয়স্থল, যে মৃত্যুর সিংহদ্বার একদিন-না-একদিন মনুষ্যমাত্রেরই নিকট উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে, যেখান দিয়া মানবের সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা অপসারিত এবং যাহার পরপারে শান্তি ও প্রেমের জ্যোতির্ম্ময় দিগন্ত উন্মুক্ত হয়—সেই মৃত্যু তাঁহার আহ্বানে আসিল না।

তিনি এক্ষণে অশ্রুতপূর্ব্ব এক নূতনতর দুঃখের রহস্য জানিতে পারিলেন, কেন না, তাঁহার দুঃখ সাধারণ-মানব-সুলভ দুঃখ নহে।

কোনরূপ আত্মবিনোদনে ভুলিয়া থাকিবেন, সে উপায়ও নাই। লোকজনের সহিত মেলামেশা করিতে গিয়া দেখিলেন, তাহারা শিশুপ্রায় তুচ্ছ বিষয়েতেই রত। তাঁহার নিকট সকলেই শিশু এবং তিনিও আর-সকলের নিকট বৃদ্ধ বাতুল বই আর কিছুই নন। যখন তিনি বিজ্ঞানের কথা পাড়িতেন, লোকে পিছন-ফিরিয়া দাঁড়াইত। তাহাদের মনে হইত, তিনি যেন অন্য জগতের জীব। তারা বলিত:—"বৃদ্ধ, তোমার সময় ফুরিয়েছে; এখন তোমার প্রলাপ আরম্ভ হয়েছে; এখন অন্যদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে মানে-মানে তোমার সরে' পড়াই উচিত।"

একদিন বৃদ্ধ রেমো বিদ্রোহী হইয়া, বিজ্ঞানের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, এবং তাহার সাক্ষাৎপ্রমাণস্বরূপ স্বীয় বয়ঃক্রম ও বহুদর্শিতার কথা উল্লেখ করিলেন। সে-দিন সহরে মহা আমোদ পড়িয়া গেল। রাজপুরুষেরা তাঁহাকে পাগ্‌লা-গারদে বন্ধ করিয়া রাখিল। কিছুদিন পরে, নিরীহ পাগল ভাবিয়া তাহাকে আবার ছাড়িয়া দিল।

কিন্তু মুক্তিলাভ করিয়া এখন তিনি করিবেন কি?…আবার তাঁহার পরীক্ষাগারে গিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন। ১২ বৎসর ধরিয়া—এবার অমৃত নয়—অমৃতের উল্টা বিষের আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। সহস্রসহস্রপ্রকার বিষ প্রস্তুত করিলেন;

তাহার মধ্যে কোনটা বা বিলম্বে ফলদায়ী, কোনটা বা বিদ্যুৎবৎ আশুকার্য্যকারী। সেই সকল বিষ আততায়ী ও চিকিৎসকদের বেশ কাজে লাগিল, কিন্তু তাঁহার নিজের উপর কোন ফল ফলিল না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন :—"আমি এখন দেখ্‌চি, সে বিষ তেমন মারাত্মক নয়, যাতে মানুষ মরে ; সেই বিষই মারাত্মক, যাতে মানুষ বাঁচে।"

তিনি নিজের উপর ঐ সকল বিষের পরীক্ষা করিতে গিয়া ভীষণ মর্ম্মচ্ছেদী যাতনা ভোগ করিতে লাগিলেন। কেন না, যদিও তাঁহার শরীর মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল, কিন্তু তাই বলিয়া কষ্টযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পায় নাই। যন্ত্রণায় তাঁহার শরীর একএকবার বাঁকিয়া-চুরিয়া যাইত ; তাঁহার আর্ত্তনাদ দূর হইতেও লোকে শুনিতে পাইত। কিন্তু প্রতিবারই, সঙ্কট-মুহূর্ত্ত কোনরূপে উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার প্রাণযন্ত্র আবার যেন সবেগে চলিতে আরম্ভ করিত। অবশেষে তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন।

একজন বিজ্ঞানাচার্য্যের কথা তিনি ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন ; এক্ষণে নিজে কোন উপায় করিতে না পারিয়া, তাঁহারই নিকটে যাইবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। সেই বিজ্ঞানাচার্য্য তখন জরাপ্রভাবে মুমূর্ষু—রোগ-শয্যায় শয়ান।

রেমো নিজ নাম জানাইয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। আগন্তুকের মুখশ্রীতে মনুষ্যের স্বাভাবিক লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া গৃহের রমণী ও শিশুগণের আতঙ্ক উপস্থিত হইল। বিজ্ঞানাচার্য্যকে রেমো বলিলেন :—"আমাকে উদ্ধার করুন।"

——"তুমি কি চাও ?"

——"মরতে চাই।"

বিজ্ঞানাচার্য্য উত্তর করিলেন :—"কাল এসো, প্রত্যুষেই এসো ; কেন না, তোমা-অপেক্ষা আমি ভাগ্যবান্ ; আমার জীবন শেষ হয়ে এসেছে—আমার মৃত্যু আসন্ন।"

——"তার জন্য আপনি কি দুঃখিত নন ?"

——"আমার কার্য্য শেষ হয়েচে।"

তাহার পরদিন রেমো গিয়া দেখেন, বৃদ্ধ বিজ্ঞানাচার্য্যের মৃত্যু আসন্ন—তিনি যন্ত্রণায় কাতর ; তথাপি শয্যায় উঠিয়া-বসিয়া তাঁহাকে বলিলেন :—"রেমো, কাল থেকে আমি অনেক চিন্তা করেছি, অনেক আলোচনা করেছি, কিন্তু তোমার কাছে এই কথা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্চি, আমি কিছুই সন্ধান পাই নি। বিধাতার নির্ব্বন্ধ, তোমাকে অনন্ত জীবন ভোগ করতে হবে··· কিন্তু একেবারে হতাশ হয়ো না। আমার কথাগুলি শেষ পর্য্যন্ত শোনো।

"যে কাজ একজনের দ্বারা না হয়, কতকগুলি লোকের দ্বারা তা' সম্পন্ন হ'তে পারে। যে কাজ একপুরুষে অসাধ্য, ২০পুরুষে তা' সিদ্ধ হ'তে পারে। বিজ্ঞান একজনেরও নয়, একপুরুষেরও নয়, একযুগেরও নয় ; বিজ্ঞান সমস্ত মানবমণ্ডলীর সাধারণ সম্পত্তি। আমার সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করলে সত্যের একটি খণ্ডাংশমাত্র লাভ করতে পারবে। আমি সাধারণের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করেছিলেম বলে' কিয়ৎপরিমাণে সফল হয়েছি। তুমি আমার সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থসকল পাঠ কর,—আমার মৃত্যুর পর যে-সকল লেখক গ্রন্থ লিখ্‌বেন, তাঁহাদেরও গ্রন্থ পাঠ

কোরো। আর তুমি নিজেও অবিরাম বিজ্ঞানের অনুশীলন করতে থাক ; বোধ হয় তুমিও সৌভাগ্যক্রমে কোনদিন সাধারণের কাজ এগিয়ে দিতে পারবে। তখন সেইদিন তোমার নিকট ধ্রুব-সত্য—পরম-সত্য প্রকাশ পাবে—সেইদিন তুমি অনন্ত-শান্তি লাভ করবে।" রেমো বলিলেন :—"কিন্তু তুমি কি মনে কর, আমি এতদিন হাত গুটিয়ে বসেছিলেম, আমিও এর জন্য অনেক খেটেচি।"

—"হাঁ, তুমি তোমার নিজের জন্য খেটেচ ; সে খাটুনি মানব-সাধারণের কোন কাজে আসে নি, তাই নিষ্ফল হয়েচে। অন্যের জন্য যদি তুমি খাটতে, তা হ'লেই তোমার খাটুনির উচিত মূল্য পেতে পারতে।" এই কথা বলিতে বলিতে সেই বিজ্ঞানাচার্য্য ইহলীলা সংবরণ করিলেন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিত, যাহারা এই অন্তিম সময়ে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা কাঁদিতে লাগিল। তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণ যাহারা তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত—তাহারাও তাঁহাকে স্মরণ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিল।

এদিকে রেমো কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইলেন বটে, তথাপি উদ্বিগ্নচিত্তে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

এখনও দীর্ঘকাল তাঁহাকে কষ্টভোগ করিতে হইবে। কিন্তু এখন তাঁহার একটু আশার সঞ্চার হইয়াছে ; সেই বিজ্ঞানাচার্য্যের জ্ঞানগর্ভ কথায় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। তিনি এক্ষণে তাঁহার অন্তিম মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্বাস-ভরে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু সে মুহূর্ত্তের এখনও অনেক বিলম্ব আছে—এখনও দীর্ঘকাল তাঁহাকে কাজ করিতে হইবে। সার্ব্বভৌমিক বিজ্ঞানের অনুশীলনে এক্ষণে তাঁহার সমস্ত উদ্যম নিয়োগ করিলেন। পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা বিজ্ঞানক্ষেত্রে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টার ফলে, কোন শুভ মুহূর্ত্তে, সেই বীজ অঙ্কুরিত হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন :—"অন্ধকার দূর হয়েচে, আলো দেখা দিয়েচে।" এতদিনের পর, জীবনের পুরস্কারস্বরূপ তিনি মৃত্যুকে লাভ করিলেন।

তাঁহার সমাধি-স্তম্ভের প্রস্তরে তিনি নিম্নলিখিত কথাগুলি খুঁদিয়া রাখিতে বলিয়া গিয়াছিলেন :—

"আলোক যেমন অন্ধকারকে—বিজ্ঞান সেইরূপ অমঙ্গলকে দূর করিয়া দেয়। রহস্যের দ্বারা নহে, পরন্তু অর্জ্জিত বিজ্ঞানের দ্বারাই ঈশ্বর মনুষ্যের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। অবশেষে আত্মা স্বীয় পার্থিবসম্বন্ধ হইতে—অজ্ঞান হইতে—ভ্রান্ত বিশ্বাসসমূহ হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই মহাবিশ্বের মহাসমষ্টির মধ্যে প্রবেশ করে—যাহার আদি নাই, যাহার অন্ত নাই।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্ভোগ।

ভাল তুমি বেসেছিলে এই শ্যাম ধরা,
তোমার হাসিটি ছিল বড় সুখে ভরা।
মিলি নিখিলের স্রোতে
জেনেছিলে খুসি হতে,
হৃদয়টি ছিল তাই হৃদিপ্রাণহরা।
তোমার আপন ছিল এই শ্যাম ধরা।

আজি এ উদাস মাঠে আকাশ বাহিয়া
তোমার নয়ন যেন ফিরিছে চাহিয়া।
তোমার সে হাসিটুক,
সে চেয়ে-দেখার সুখ
সবারে পরশি চলে বিদায় গাহিয়া
এই তালবন গ্রাম প্রান্তর বাহিয়া।

তোমার সে ভালবাসা মোর চোখে আঁকি',
আমার নয়নে তব দৃষ্টি গেছ রাখি'।
আজি আমি একা-একা
দেখি দুজনের দেখা,
তুমি করিতেছ ভোগ মোর মনে থাকি'
আমার তারায় তব মুগ্ধদৃষ্টি আঁকি'।

এই যে শীতের আলো শিহরিছে বনে,
শিরীষের পাতাগুলি ঝরিছে পবনে ;—
তোমার আমার মন
খেলিতেছে সারাক্ষণ
এই ছায়া-আলোকের আকুল কম্পনে,
এই শীত-মধ্যাহ্নের মর্ম্মরিত বনে।

আমার জীবনে তুমি বাঁচ ওগো বাঁচ।
তোমার কামনা মোর চিত্ত দিয়ে যাচ!
যেন আমি বুঝি মনে
অতিশয় সঙ্গোপনে
তুমি আজ মোর মাঝে আমি হয়ে আছ!
আমারি জীবনে তুমি বাঁচ ওগো বাঁচ!

দর্পহরণ।

কি করিয়া গল্প লিখিতে হয়, তাহা সম্প্রতি শিখিয়াছি। বঙ্কিমবাবু এবং সার্ ওয়াল্‌টার্ স্কট্ পড়িয়া আমার বিশেষ ফল হয় নাই। ফল কোথা হইতে কেমন করিয়া হইল, আমার এই প্রথম গল্পেই সেই কথাটা লিখিতে বসিলাম।

আমার পিতার মতামত অনেকরকম ছিল ; কিন্তু বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে কোন মত তিনি কেতাব বা স্বাধীনবুদ্ধি হইতে গড়িয়া তোলেন নাই। আমার বিবাহ যখন হয়, তখন সতেরো উত্তীর্ণ হইয়া আঠারোয় পা দিয়াছি ; তখন আমি কলেজে থার্ডইয়ারে পড়ি—এবং তখন আমার চিত্তক্ষেত্রে যৌবনের প্রথম দক্ষিণবাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়া কত অলক্ষ্য দিক্ হইতে কত অনির্ব্বচনীয় গীতে এবং গন্ধে, কম্পনে এবং মর্ম্মরে আমার তরুণ জীবনকে উৎসুক করিয়া তুলিতেছিল, তাহা এখনো মনে হইলে বুকের ভিতরে দীর্ঘনিশ্বাস ভরিয়া উঠে।

তখন আমার মা ছিলেন না—আমাদের শূন্যসংসারের মধ্যে লক্ষ্মীস্থাপন করিবার জন্য আমার পড়াশুনা শেষ হইবার অপেক্ষা না করিয়াই বাবা বারো-বৎসরের বালিকা নির্ঝরিণীকে আমাদের ঘরে আনিলেন।

নির্ঝরিণী নামটি হঠাৎ পাঠকদের কাছে প্রচার করিতে সঙ্কোচবোধ করিতেছি। কারণ, তাঁহাদের অনেকেরই বয়স হইয়াছে—অনেকে ইস্কুল-মাষ্টারি, মুন্সেফি এবং কেহ কেহ বা সম্পাদকীও করেন, তাঁহারা আমার শ্বশুরমহাশয়ের নামনির্ব্বাচনরুচির অতিমাত্র লালিত্য এবং নূতনত্বে হাসিবেন, এমন আশঙ্কা আছে। কিন্তু আমি তখন অর্ব্বাচীন ছিলাম, বিচারশক্তির কোন উপদ্রব ছিল না—তাই নামটি বিবাহের সম্বন্ধ হইবার সময়েই যেমনি শুনিলাম, অমনি—

"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ!"

এখন বয়স হইয়াছে এবং ওকালতি ছাড়িয়া মুন্সেফিলাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি, তবু হৃদয়ের মধ্যে ঐ নামটি পুরাতন বেহালার আওয়াজের মত আরো বেশি মোলায়েম হইয়া বাজিতেছে।

প্রথম বয়সের প্রথম প্রেম অনেকগুলি ছোটখাটো বাধার দ্বারা মধুর। লজ্জার বাধা, ঘরের লোকের বাধা, অনভিজ্ঞতার বাধা—এইগুলির অন্তরাল হইতে প্রথম পরিচয়ের যে আভাস দিতে থাকে, তাহা ভোরের আলোর মত রঙীন—তাহা মধ্যাহ্নের মত সুস্পষ্ট, অনাবৃত এবং বর্ণচ্ছটাবিহীন নহে।

আমাদের সেই নবীন পরিচয়ের মাঝখানে বাবা বিন্ধ্যগিরির মত দাঁড়াইলেন। তিনি আমাকে হষ্টেলে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া তাঁহার বউমাকে বাংলা লেখাপড়া শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমার এই গল্পের সুরু হইল সেইখানে।

শ্বশুরমশায় কেবল তাঁহার কন্যার নামকরণ করিয়াই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না—তিনি তাহাকে শিক্ষাদানেরও প্রভূত আয়োজন করিয়াছিলেন। এমন কি, উপক্রমণিকা তাহার মুখস্থ শেষ হইয়াছিল। মেঘনাদবধকাব্য পড়িতে হেমবাবুর টীকা তাহার প্রয়োজন হইত না।

হষ্টেলে গিয়া তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম। আমি সেখানে থাকিতে নানা উপায়ে বাবাকে লুকাইয়া নববিরহতাপে অত্যন্ত উত্তপ্ত দুইএকখানা চিঠি তাহাকে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। তাহাতে কোটেশন্-মার্কা না দিয়া আমাদের নবাকবিদের কাব্য ছাঁকিয়া অনেক কবিতা ঢালিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম—প্রণয়িনীর কেবল প্রেম আকর্ষণ করাই যথেষ্ট নহে—শ্রদ্ধাও চাই। শ্রদ্ধা পাইতে হইলে বাংলাভাষায় যেরূপ রচনাপ্রণালীর আশ্রয় লওয়া উচিত, সেটা আমার স্বভাবত আসিত না—সেইজন্য—

"মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ"

অর্থাৎ অন্য জহরীরা যে-সকল মণি ছিদ্র করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমার চিঠি তাহা সূত্রের মত গাঁথিয়া পাঠাইত। কিন্তু, ইহার মধ্যে মণিগুলি অন্যের, কেবলমাত্র সূত্রটুকুই আমার, এ বিনয়টুকু স্পষ্ট করিয়া প্রচার করা আমি ঠিক সঙ্গত মনে করি নাই—কালিদাসও করিতেন না,—যদি সত্যই তাঁহার মণিগুলি চোরাই-মাল হইত।

চিঠির উত্তর যখন পাইলাম, তাহার পর হইতে যথাস্থানে কোটেশন্-মার্কা দিতে আর কার্পণ্য করি নাই। এটুকু বেশ বোঝা গেল, নববধূ বাংলাভাষাটি বেশ জানেন। তাঁহার চিঠিতে বানান ভুল ছিল কি না, তাহার উপযুক্ত বিচারক আমি নই—কিন্তু সাহিত্যবোধ ও ভাষাবোধ না থাকিলে এমন চিঠি লেখা যায় না, সেটুকু আন্দাজে বুঝিতে পারি।

স্ত্রীর বিদ্যা দেখিয়া সৎস্বামীর যতটুকু গর্ব্ব ও আনন্দ হওয়া উচিত, তাহা আমার হয় নাই—এমন কথা বলিলে আমাকে অন্যায় অপবাদ দেওয়া হইবে, কিন্তু তারি সঙ্গে একটু অন্যভাবও ছিল। সে ভাবটুকু উচ্চদরের না হইতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক। মুস্কিল এই যে, যে উপায়ে আমার বিদ্যার পরিচয় দিতে পারিতাম, সেটা বালিকার পক্ষে দুর্গম। সে যেটুকু ইংরাজি জানে, তাহাতে বার্ক্-মেকলের ছাঁদের চিঠি তাহার উপরে চালাইতে হইলে মশা মারিতে কামান দাগা হইত—মশার কিছুই হইত না, কেবল ধোঁয়া এবং আওয়াজই সার হইত।

আমার যে তিনটি প্রাণের বন্ধু ছিল, তাহাদিগকে আমার স্ত্রীর চিঠি না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "এমন স্ত্রী পাইয়াছ, ইহা তোমার ভাগ্য।" অর্থাৎ ভাষান্তরে বলিতে গেলে এমন স্ত্রীর উপযুক্ত স্বামী আমি নই।

নির্ঝরিণীর নিকট হইতে পত্রোত্তর পাইবার পূর্ব্বেই যে ক'খানি চিঠি লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম, তাহাতে হৃদয়োচ্ছ্বাস যথেষ্ট ছিল, কিন্তু বানান-ভুলও নিতান্ত অল্প ছিল না। সতর্ক হইয়া লেখা যে দরকার, তাহা তখন মনেও করি নাই। সতর্ক হইয়া লিখিলে বানান-ভুল হয় ত কিছু কম পড়িত, কিন্তু হৃদয়োচ্ছ্বাসটাও মারা যাইত।

এমন অবস্থায় চিঠির মধ্যস্থতা ছাড়িয়া মোকাবিলায় প্রেমালাপই নিরাপদ্। সুতরাং বাবা আপিসে গেলেই আমাকে কালেজ পালাইতে হইত। ইহাতে আমাদের উভয় পক্ষেরই পাঠচর্চ্চায় যে ক্ষতি হইত, আলাপচর্চ্চায় তাহা সুদসুদ্ধ পোষণ করিয়া লইতাম। বিশ্বজগতে যে, কিছুই একেবারে নষ্ট হয় না; এক আকারে যাহা ক্ষতি, অন্য আকারে তাহা লাভ—রিজ্ঞানের এই তথ্য প্রেমের পরীক্ষাশালায় বারংবার যাচাই করিয়া লইয়া একেবারে নিঃসংশয় হইয়াছি।

এমন সময়ে আমার স্ত্রীর জাঠ্‌তুত বোনের বিবাহকাল উপস্থিত—আমরা ত যথানিয়মে আইবুড় ভাত দিয়া খালাস—কিন্তু আমার স্ত্রী স্নেহের আবেগে এক কবিতা রচনা করিয়া লাল কাগজে লাল কালী দিয়া লিখিয়া তাহার ভগিনীকে না পাঠাইয়া থাকিতে পারিল না। সেই রচনাটি কেমন করিয়া বাবার হস্তগত হইল। বাবা তাঁহার বধূমাতার কবিতার রচনানৈপুণ্য, সদ্ভাবসৌন্দর্য্য, প্রসাদগুণ, প্রাঞ্জলতা ইত্যাদি শাস্ত্রসম্মত নানা গুণের সমাবেশ দেখিয়া অভিভূত হইয়া গেলেন। তাঁহার বৃদ্ধ বন্ধুদিগকে দেখাইলেন, তাঁহারাও তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন—"খাসা হইয়াছে!" নববধূর যে রচনাশক্তি আছে, এ কথা কাহারও অগোচর রহিল না। হঠাৎ এইরূপ খ্যাতিবিকাশে রচয়িত্রীর কর্ণমূল এবং কপোলদ্বয় অরুণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল—অভ্যাসক্রমে তাহা বিলুপ্ত হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোন জিনিষ একেবারে বিলুপ্ত হয় না—কি জানি, লজ্জার আভাটুকু তাহার কোমল কপোল ছাড়িয়া আমার কঠিন হৃদয়ের প্রচ্ছদকোণে হয় ত আশ্রয় লইয়া থাকিবে।

কিন্তু তাই বলিয়া স্বামীর কর্ত্তব্যে শৈথিল্য করি নাই। অপক্ষপাত সমালোচনার দ্বারা স্ত্রীর রচনার দোষ সংশোধনে আমি কখনই আলস্য করি নাই। বাবা তাহাকে নির্ব্বিচারে যতই উৎসাহ দিয়াছেন, আমি ততই সতর্কতার সহিত ত্রুটি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে যথোচিত সংযত করিয়াছি। আমি ইংরাজি বড়-বড় লেখকের লেখা দেখাইয়া তাহাকে অভিভূত করিতে ছাড়ি নাই। সে কোকিলের উপর একটা-কি লিখিয়াছিল, আমি শেলির স্কাইলার্ক্ ও কীট্‌সের নাইটিঙ্গেল্ শুনাইয়া তাহাকে একপ্রকার নীরব করিয়া দিয়াছিলাম। তখন বিদ্যার জোরে আমিও যেন শেলি ও কীট্‌সের গৌরবের কতকটা ভাগী হইয়া পড়িতাম। আমার স্ত্রীও ইংরাজি-সাহিত্য হইতে ভাল-ভাল জিনিষ তাহাকে তর্জ্জমা করিয়া শুনাইবার জন্য আমাকে পীড়া-

পীড়ি করিত, আমি গর্ব্বের সহিত তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতাম। তখন ইংরাজি-সাহিত্যের মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া আমার স্ত্রীর প্রতিভাকে কি ম্লান করি নাই? স্ত্রীলোকের কমনীয়তার পক্ষে এই একটু ছায়ার আচ্ছাদন দরকার, বাবা এবং বন্ধুবান্ধবেরা তাহা বুঝিতেন না—কাজেই আমাকে এই কঠোর কর্ত্তব্যের ভার লইতে হইয়াছিল। নিশীথের চন্দ্র মধ্যাহ্নের সূর্য্যের মত হইয়া উঠিলে দুইদণ্ড বাহবা দেওয়া চলে—কিন্তু তাহার পরে ভাবিতে হয়, ওটাকে ঢাকা দেওয়া যায় কি উপায়ে!

আমার স্ত্রীর লেখা বাবা এবং অন্যান্য অনেকে কাগজে ছাপাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। নির্ঝরিণী তাহাতে লজ্জাপ্রকাশ করিত—আমি তাহার সে লজ্জা রক্ষা করিয়াছি। কাগজে ছাপিতে দিই নাই, কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে প্রচার বন্ধ করিতে পারা গেল না।

ইহার ফুফল যে কতদূর হইতে পারে, কিছুকাল পরে তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম। তখন উকিল হইয়া আলিপুরে বাহির হই। একটা উইল্‌কেস্ লইয়া বিরুদ্ধপক্ষের সঙ্গে খুব জোরের সহিত লড়িতেছিলাম। উইল্‌টি বাংলায় লেখা। স্বপক্ষের অনুকূলে তাহার অর্থ যে কিরূপ স্পষ্ট, তাহা বিধিমতে প্রমাণ করিতেছিলাম, এমন-সময় বিরোধি-পক্ষের উকিল উঠিয়া বলিলেন—"আমার বিদ্বান্ বন্ধু যদি তাঁহার বিদুষী স্ত্রীর কাছে এই উইল্‌টি বুঝাইয়া লইয়া আসিতেন, তবে এমন অদ্ভুত ব্যাখ্যা দ্বারা মাতৃভাষাকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেন না।

চুলার আগুন ধরাইতে ফুঁ দিতে দিতে নাকের জলে চোখের জলে হইতে হয়, কিন্তু গৃহদাহের আগুন নেবানই দায়—লোকের ভাল কথা চাপা থাকে, আর অনিষ্টকর কথাগুলো মুখে মুখে হুহুঃশব্দে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। এ গল্পটিও সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। ভয় হইয়াছিল, পাছে আমার স্ত্রীর কানে ওঠে। সৌভাগ্যক্রমে ওঠে নাই—অন্তত এ-সম্বন্ধে তাহার কাছ হইতে কোন আলোচনা কখনো শুনি নাই।

একদিন একটি অপরিচিত ভদ্রলোকের সহিত আমার পরিচয় হইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিই কি শ্রীমতী নির্ঝরিণী দেবীর স্বামী?" আমি কহিলাম, "আমি তাঁহার স্বামী কি না, সে কথার জবাব দিতে চাহি না, তবে তিনিই আমার স্ত্রী বটেন।"—বাহিরের লোকের কাছে স্ত্রীর স্বামী বলিয়া খ্যাতিলাভ করা আমি গৌরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি না।

সেটা যে গৌরবের বিষয় নহে, সে কথা আমাকে আর-এক ব্যক্তি অনাবশ্যক স্পষ্টভাষায় স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। পূর্ব্বেই পাঠকগণ সংবাদ পাইয়াছেন, আমার স্ত্রীর জাঠ্‌তুত বোনের বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্বামীটা অত্যন্ত বর্ব্বর দুর্বৃত্ত। স্ত্রীর প্রতি তাহার অত্যাচার অসহ্য। আমি এই পাষণ্ডের নির্দ্দয়াচরণ লইয়া আত্মীয়সমাজে আলোচনা করিয়াছিলাম—সে কথা অনেক বড় হইয়া তাহার কানে উঠিয়াছিল। সে তাহার পর হইতে আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সকলের কাছে বলিয়া বেড়াইতেছে যে, নিজের নামে হইতে আরম্ভ করিয়া শ্বশুরের

নামে পর্য্যন্ত উত্তম-মধ্যম-অধম অনেকরকম খ্যাতির বিবরণ শাস্ত্রে লিখিয়াছে, কিন্তু নিজের স্ত্রীর খ্যাতিতে যশস্বী হওয়ার কল্পনা কবির মাথাতেও আসে নি।

এমন-সব কথা লোকের মুখে মুখে চলিতে আরম্ভ করিলে স্ত্রীর মনে ত দম্ভ জন্মিতেই পারে। বিশেষত বাবার একটা বদ্ অভ্যাস ছিল, নির্ঝরিণীর সাম্‌নেই তিনি আমাদের পরস্পরের বাংলাভাষাজ্ঞান লইয়া কৌতুক করিতেন। একদিন তিনি বলিলেন, "হরিশ যে বাংলা চিঠিগুলো লেখে, তাহার বানানটা তুমি দেখিয়া দাও না কেন বৌমা—আমাকে এক চিঠি লিখিয়াছে, তাহাতে সে জগদিন্দ্র লিখিতে দীর্ঘ ঈ বসাইয়াছে।" শুনিয়া বাবার বৌমা নীরবে একটুখানি স্মিতহাস্য করিলেন। আমিও কথাটাকে ঠাট্টা বলিয়া হাসিলাম, কিন্তু এ-রকম ঠাট্টা ভাল নয়।

স্ত্রীর দম্ভের পরিচয় পাইতে আমার দেরি হইল না। পাড়ার ছেলেদের এক ক্লাব্ আছে—সেখানে একদিন তাহারা এক বিখ্যাত বাংলালেখককে বক্তৃতা দিতে রাজি করিয়াছিল। অপর একটি বিখ্যাত লোককে সভাপতিও ঠিক করা হয়—তিনি বক্তৃতার পূর্ব্বরাত্রে অস্বাস্থ্য জানাইয়া ছুটি লইলেন। ছেলেরা উপায়ান্তর না দেখিয়া আমাকে আসিয়া ধরিল। আমার প্রতি ছেলেদের এই অহেতুকী শ্রদ্ধা দেখিয়া আমি কিছু প্রফুল্ল হইয়া উঠিলাম—বলিলাম, "তা বেশ ত, বিষয়টা কি বল ত?" তাহারা কহিল, "প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গসাহিত্য।"—আমি কহিলাম—"বেশ হইবে, দুটোই আমি ঠিক সমান জানি।"

পরদিন সভায় যাইবার পূর্ব্বে জলখাবার এবং কাপড়চোপড়ের জন্য স্ত্রীকে কিছু তাড়া দিতে লাগিলাম। নির্ঝরিণী কহিল—"কেন গো, এত ব্যস্ত কেন—আবার কি পাত্রী দেখিতে যাইতেছ?" আমি কহিলাম, "একবার দেখিয়াই নাকে-কানে খৎ দিয়াছি—আর নয়!" "তবে এত সাজসজ্জার তাড়া যে!"

স্ত্রীকে সগর্ব্বে সমস্ত ব্যাপারটা বলিলাম। শুনিয়া সে কিছুমাত্র উল্লাসপ্রকাশ না করিয়া ব্যাকুলভাবে আমার হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল, "তুমি পাগল হইয়াছ? না না, সেখানে তুমি যাইতে পারিবে না!"

আমি কহিলাম, "রাজপুতনারী যুদ্ধসাজ পরাইয়া স্বামীকে রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিত—আর বাঙালীর মেয়ে কি বক্তৃতাসভাতেও পাঠাইতে পারে না?"

নির্ঝরিণী কহিল—"ইংরাজি বক্তৃতা হইলে আমি ভয় করিতাম না, কিন্তু—থাক্ না, অনেক লোক আসিবে, তোমার অভ্যাস নাই—শেষকালে—"

শেষকালের কথাটা আমিও কি মাঝে মাঝে ভাবি নাই! রামমোহন রায়ের গানটা মনে পড়িতেছিল—

"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর!"

বক্তার বক্তৃতা-অন্তে উঠিয়া দাঁড়াইবার সময় সভাপতি যদি হঠাৎ "দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ হিমকলেবর" অবস্থায় একেবারে নিরুত্তর হইয়া পড়েন, তবে কি গতি হইবে! এই সকল কথা চিন্তা করিয়া পূর্ব্বোক্ত পলাতক সভাপতিমহাশয়ের চেয়ে আমার স্বাস্থ্য যে

কোন অংশে ভাল ছিল, এমন কথা আমি বলিতে পারি না।

বুক ফুলাইয়া স্ত্রীকে কহিলাম, "নিঝর, তুমি কি মনে কর—"

স্ত্রী কহিল—"আমি কিছুই মনে করি না—কিন্তু আমার আজ ভারি মাথা ধরিয়া আসিয়াছে—বোধ হয় জ্বর আসিবে—তুমি আজ আমাকে ফেলিয়া যাইতে পারিবে না!"

আমি কহিলাম, "সে আলাদা কথা। তোমার মুখটা একটু লাল দেখাইতেছে বটে।"

সেই লালটা সভাস্থলে আমার দুরবস্থা কল্পনা করিয়া লজ্জায়, অথবা আসন্ন জ্বরের আবেশে, সে কথা নিঃসংশয়ে পর্য্যালোচনা না করিয়াই আমি ক্লাবের সেক্রেটারিকে স্ত্রীর পীড়ার কথা জানাইয়া নিষ্কৃতিলাভ করিলাম।

বলা বাহুল্য, স্ত্রীর জ্বরভাব অতি সত্বর ছাড়িয়া গেল। আমার অন্তরাত্মা কহিতে লাগিল, "আর-সব ভাল হইল, কিন্তু তোমার বাংলা-বিদ্যা-সম্বন্ধে তোমার স্ত্রীর মনে এই যে সংস্কার, এটা ভাল নয়। তিনি নিজেকে মস্ত বিদুষী বলিয়া ঠাওরাইয়াছেন—কোন্‌দিন বা নাইট্‌স্কুল্ খুলিয়া তিনি তোমাকে বাংলা পড়াইবার চেষ্টা করিবেন!"

আমি কহিলাম, "ঠিক কথা—এই বেলা দর্প চূর্ণ না করিলে ক্রমে আর তাহার নাগাল পাওয়া যাইবে না।

সেই রাত্রেই তাহার সঙ্গে একটু খিটিমিটি বাধাইলাম। অল্পশিক্ষা যে কিরূপ ভয়ঙ্কর জিনিষ, পোপের কাব্য হইতে তাহার উদাহরণ উদ্ধার করিয়া তাহাকে শুনাইলাম। ইহাও বুঝাইলাম, কোনমতে বানান এবং ব্যাকরণ বাঁচাইয়া লিখিলেই যে লেখা হইল, তাহা নহে—আসল জিনিষটা হইতেছে আইডিয়া। কাশিয়া বলিলাম, "সেটা উপক্রমণিকার পাওয়া যায় না—সেটার জন্য মাথা চাই।" মাথা যে কোথায় আছে, সে কথা তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বলি নাই, কিন্তু তবু বোধ হয় কথাটা অস্পষ্ট ছিল না। আমি কহিলাম—"লিখিবার যোগ্য কোন লেখা কোন দেশে কোন দিন কোন স্ত্রীলোক লেখে নাই।"

শুনিয়া নির্ঝরিণীর মেয়েলি তার্কিকতা চড়িয়া উঠিল। সে বলিল—"কেন মেয়েরা লিখিতে পারিবে না! মেয়েরা এতই কি হীন!"

আমি কহিলাম—"রাগ করিয়া কি করিবে! দৃষ্টান্ত দেখাও না!"

নির্ঝরিণী কহিল—"তোমার মত যদি আমার ইতিহাস পড়া থাকিত, তবে নিশ্চয়ই আমি ঢের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিতাম।"

এ কথাটা শুনিয়া আমার মন একটু নরম হইয়াছিল, কিন্তু তর্ক এইখানেই শেষ হয় নাই। ইহার শেষ যেখানে, সেটা পরে বর্ণনা করা যাইতেছে।

'উদ্দীপনা' বলিয়া মাসিকপত্রে ভাল গল্প লিখিবার জন্য পঞ্চাশটাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিল। কথা এই স্থির হইল, আমরা দুই জনেই সেই কাগজে দুটা গল্প লিখিয়া পাঠাইব, দেখি কাহার ভাগ্যে পুরস্কার জোটে!

রাত্রের ঘটনা ত এই। পরদিন প্রভাতের আলোকে বুদ্ধি যখন নির্ম্মল হইয়া আসিল, তখন দ্বিধা জন্মিতে লাগিল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিলাম, এ অবসর ছাড়িয়া দেওয়া হইবে

না—যেমন করিয়া হৌক্, জিতিতেই হইবে। হাতে তখনো দুইমাস সময় ছিল।

প্রকৃতিবাদ অভিধান কিনিলাম—বঙ্কিমের বহগুলাও সংগ্রহ করিলাম। কিন্তু বঙ্কিমের লেখা আমার চেয়ে আমার অন্তঃপুরে অধিক পরিচিত—তাই সে মহদাশ্রয় পরিত্যাগ করিতে হইল। ইংরাজি গল্পের বই দেদার পড়িতে লাগিলাম। অনেকগুলা গল্প ভাঙিয়া-চুরিয়া একটা প্লট্ দাঁড় করাইলাম। প্লটটা খুবই চমৎকার হইয়াছিল, কিন্তু মুস্কিল এই হইল, বাংলাসমাজে সে-সকল ঘটনা কোন অবস্থাতেই ঘটিতে পারে না। অতি প্রাচীনকালের পাঞ্জাবের সীমান্তদেশে গল্পের ভিত্তি ফাঁদিলাম—সেখানে সম্ভব-অসম্ভবের সমস্ত বিচার একেবারে নিরাকৃত হওয়াতে কলমের মুখে কোন বাধা রহিল না। উদ্দাম প্রণয়, অসম্ভব বীরত্ব, নিদারুণ পরিণাম সার্কাসের ঘোড়ার মত আমার গল্প ঘিরিয়া অদ্ভুতগতিতে ঘুরিতে লাগিল।

রাত্রে আমার ঘুম হইত না—দিনে আহারকালে ভাতের থালা ছাড়িয়া মাছের ঝোলের বাটিতে ডাল ঢালিয়া দিতাম। আমার অবস্থা দেখিয়া নির্ঝরিণী আমাকে অনুনয় করিয়া বলিল, "আমার মাথা খাও, তোমাকে আর গল্প লিখিতে হইবে না—আমি হার মানিতেছি।"

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, "তুমি কি মনে করিতেছ, আমি দিনরাত্রি কেবল গল্প ভাবিয়াই মরিতেছি! কিছুই না! আমাকে মঙ্গলের কথা ভাবিতে হয়—তোমার মত গল্প এবং কবিতা চিন্তা করিবার অবসর পড়িয়া থাকিলে আমার ভাবনা কি ছিল!"

যাহা হউক্, ইংরাজি প্লট্ এবং সংস্কৃত অভিধানে মিলাইয়া একটা গল্প খাড়া করিলাম। মনের কোণে ধর্ম্মবুদ্ধিতে একটু পীড়াবোধ করিতে লাগিলাম—ভাবিলাম, বেচারা নিঝর ইংরাজিসাহিত্য পড়ে নাই, তাহার ভাবসংগ্রহ করিবার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ—আমার সঙ্গে তাহার এই লড়াই নিতান্ত অসমকক্ষের লড়াই।

উপসংহার।

লেখা পাঠান হইয়াছে। বৈশাখের সংখ্যায় পুরস্কারযোগ্য গল্পটি বাহির হইবে। যদিও আমার মনে কোন আশঙ্কা ছিল না, তবু সময় যত নিকটবর্ত্তী হইল, মনটা তত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

বৈশাখমাসও আসিল। একদিন আদালত হইতে সকাল-সকাল ফিরিয়া-আসিয়া খবর পাইলাম, বৈশাখের উদ্দীপনা আসিয়াছে, আমার স্ত্রী তাহা পাইয়াছে।

ধীরে ধীরে নিঃশব্দপদে অন্তঃপুরে গেলাম। শয়নঘরে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, আমার স্ত্রী কড়ায় আগুন করিয়া একটা বই পুড়াইতেছে। দেয়ালের আয়নায় নির্ঝরিণীর মুখের যে প্রতিবিম্ব দেখা যাইতেছে, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গেল, কিছু পূর্ব্বে সে অশ্রুবর্ষণ করিয়া লইয়াছে।

মনে আনন্দ হইল, কিন্তু সেই সঙ্গে একটু দয়াও হইল। আহা, বেচারার গল্পটি উদ্দীপনায় বাহির হয় নাই! কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারে এত দুঃখ! স্ত্রীলোকের অহঙ্কারে এত অল্পেই ঘা পড়ে!

আবার আমি নিঃশব্দপদে ফিরিয়া গেলাম। উদ্দীপনা-আপিস হইতে নগদ দাম

দিয়া একটা কাগজ কিনিয়া আনাইলাম। আমার লেখা বাহির হইয়াছে কি না, দেখিবার জন্য কাগজ খুলিলাম। সূচীপত্রে দেখিলাম, পুরস্কারযোগ্য গল্পটির নাম "বিক্রম-নারায়ণ" নহে, তাহার নাম "ননদিনী"—এবং তাহার রচয়িতার নাম—একি? এ যে নির্ঝরিণী দেবী!

বাংলাদেশে আমার স্ত্রী ছাড়া আর কাহারো নাম নির্ঝরিণী আছে কি? গল্পটি খুলিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, নিঝরের সেই হতভাগিনী জাঠতুত বোনের বৃত্তান্তটিই ডালপালা দিয়া বর্ণিত। একেবারে ঘরের কথা—সাদা ভাষা—কিন্তু সমস্ত ছবির মত চোখে পড়ে এবং চক্ষু জলে ভরিয়া যায়। এ নির্ঝরিণী যে আমারই "নিঝর", তাহাতে সন্দেহ নাই।

তখন আমার শয়নঘরের সেই দাহদুগ্ধ এবং ব্যথিত রমণীর সেই ম্লানমুখ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

রাত্রে শুইতে আসিয়া স্ত্রীকে বলিলাম, "নিঝর, যে খাতায় তোমার লেখাগুলি আছে, সেটা কোথায়?"

নির্ঝরিণী কহিল, "কেন, সে লইয়া তুমি কি করিবে?"

আমি কহিলাম—"আমি ছাপিতে দিব!"

নির্ঝরিণী। আহা, আর ঠাট্টা করিতে হইবে না!

আমি। না, ঠাট্টা করিতেছি না। সত্যই ছাপিতে দিব।

নির্ঝরিণী। সে কোথায় গেছে, আমি জানি না।

আমি কিছু জেদের সঙ্গেই বলিলাম—"না নিঝর, সে কিছুতেই হইবে না। বল, সেটা কোথায় আছে?"

নির্ঝরিণী কহিল—"সত্যই সেটা নাই।"

আমি। কেন, কি হইল?

নির্ঝরিণী। সে আমি পুড়াইয়া ফেলিয়াছি।

আমি চম্‌কিয়া উঠিয়া কহিলাম, "অ্যাঁ! সে কি! কবে পুড়াইলে!"

নির্ঝরিণী। আজই পুড়াইয়াছি। আমি কি জানি না যে, আমার লেখা ছাই লেখা! স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়া লোকে মিথ্যা করিয়া প্রশংসা করে!

ইহার পর হইতে এ পর্য্যন্ত নিঝরকে সাধ্যসাধনা করিয়াও একছত্র লিখাইতে পারি নাই। ইতি।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র হাসদার।

উপরে যে গল্পটি লেখা হইয়াছে, উহার পনেরো-আনাই গল্প। আমার স্বামী যে বাংলা কত অল্প জানেন, তাহা তাঁহার রচীত উপন্যাসটি পড়িলেই কাহারো বুঝিতে বাকি থাকিবে না। ছিছি নিজের স্ত্রিকে লইয়া এম্‌নি করিয়া কি গল্প বানাইতে হয়? ইতি।

শ্রীনির্ঝরিনি দেবী।

স্ত্রীলোকের চাতুরীসম্বন্ধে দেশী-বিদেশী শাস্ত্রে-অশাস্ত্রে অনেক কথা আছে—তাহাই স্মরণ করিয়া পাঠকেরা ঠকিবেন না। আমার রচনাটুকুর ভাষা ও বানান কে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, সে কথা আমি বলিব না—না বলিলেও বিজ্ঞ পাঠক অনুমান করিতে পারিবেন। আমার স্ত্রী যে-কয়-লাইন লিখিয়াছেন, তাহার বানান-ভুলগুলি দেখিলেই পাঠক বুঝিবেন, সেগুলি ইচ্ছাকৃত—

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বঙ্গদর্শন।

শিবপূজা।

২

নিম্নস্তরের বৌদ্ধ এবং দেশব্যাপী অনার্য্য-জাতির প্রভাবে, যে সকল দেবস্বরূপ, মহাদেবে প্রযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিয়াছি,—তাহার উল্লেখ করিতেছি।

যে সকল জাতি কৌলিক ভূতপ্রেত, জীবজন্তু এবং বৃক্ষলোষ্ট্রাদির পূজা লইয়া বৌদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা যখন পরে বৌদ্ধধর্ম্মের কৃপায় আর্য্যস্পৃষ্ট হইয়া হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতেছিল, তখনও তাহারা আপনাদিগের ঠাকুরদেবতাগুলি সঙ্গে করিয়া আনিতে ভুলে নাই। অনেক শূদ্রের শূদ্রত্ব ঘুচিয়াছিল, তাহা বলিয়াছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাবে মন্ত্রসংস্কৃত হইয়া উহাদের দেবতাদিগেরও যে হীনতা দূরীভূত হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ আছে। উপস্থিত প্রয়োজনের হিসাবে, কেবল দু-চারিটি দৃষ্টান্ত দিয়া, উদ্দিষ্ট বিষয়ের স্থাপনার জন্য একটু সুবিধা করিয়া লইব।

৫১০ খৃষ্টাব্দে রাজা সংক্ষোভ, অনার্য্যের পিষ্টপুরী দেবীকে আর্য্যের দেবী করিয়া, মন্দির গড়িয়া, স্থাপন করিয়াছিলেন। যে সকল অনার্য্যেরা আর্য্যসমাজ হইতে দূরে ছিল, তাহাদের দেবদেবী বড় সহজে আর্য্য-সমাজে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু কালক্রমে যখন ঐ সকল অনার্য্যের সহিত নৈকট্য স্থাপিত হইয়াছিল, তখন তাহাদের দেবতারাও হিন্দুসমাজে আসিয়া আসন পাতিয়াছিলেন। ৮ম শতাব্দী পর্য্যন্ত যে চণ্ডী অনার্য্য শবর-কিরাতাদির দেবতা; ভবভূতি, বাণভট্ট এবং দণ্ডী প্রভৃতি কবিগণ যাঁহাকে হীন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এ যুগে তাঁহাকে মহাদেবের পত্নীরূপে দেখিতে পাই। এখানে বলিয়া রাখি যে, দশকুমার-চরিতে যিনি চণ্ডীকে অনার্য্যের দেবী বলিয়াছেন, চণ্ডীর নামের স্তোত্রগুলি কদাপি তাঁহার রচনা নহে। ঐ গ্রন্থ নিশ্চয়ই অন্য লেখকের। যজুর্ব্বেদে রুদ্র এবং অগ্নি এক দেবতা বলিয়া পূজিত হইয়াছেন, দেখিতে পাই; পৌরাণিক যুগের মহাদেবেও অগ্নির স্বরূপ প্রযুক্ত হইয়াছিল; তথাপি, নবম শতাব্দী পর্য্যন্তও, অগ্নির কালী-করালী প্রভৃতি শিখা মহাদেবের পত্নী হইয়া, অনার্য্যের ডাকিনীগুলিকে মুক্তিদান করিতে পারেন নাই। তাঁহারা অনেকদিন পর্য্যন্ত

ডাকিনী হইয়াই ছিলেন। "কালিকা যোগিনী-ভেদে", অভিধানের এ কথা এখনও লুপ্ত হয় নাই। সম্বলপুরজেলায় অনার্য্যজাতির একটি প্রাচীন বিড়াল-দেবতা নৃসিংহ হইয়া পূজা পাইতেছেন। বঙ্গদেশে হইলে এটিকে ষষ্ঠীদেবীর বাহন করা হইত; কিন্তু মধ্য-প্রদেশে ইঁহার নামে একটি অন্যপ্রকারের মৌখিক পুরাণ রচিত হইয়াছে। পুরাণ বা গল্পটি এই :—বিষ্ণু দৈত্যবধ করিবার জন্য দৈত্যের পিছুপিছু ছুটিলেন। দুষ্ট দৈত্য নানারূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। দৈত্য হরিণ হইল, বিষ্ণু বাঘ হইলেন; দৈত্য চড়াই হইল, বিষ্ণু বাজ হইলেন; ইত্যাদি। অবশেষে দৈত্যটা ইঁদুর হইয়া গর্ত্তে ঢুকিল; বিষ্ণু তখন বিড়াল হইয়া গর্ত্তের মুখে থাবা পাতিয়া বসিলেন। ইঁদুরটা এপর্য্যন্ত গর্ত্ত হইতে বাহির হয় নাই; বিষ্ণুও বিড়াল হইয়া বুড়াসম্বরজঙ্গলে বাস করিতেছেন। এইরূপে অনেক গ্রাম্য-সিংহ নরসিংহ হইয়াছেন।

কোন্ অনার্য্যজাতির সহিত কিপ্রকার নৈকট্যে তাহাদের দেবতাদিগের গুণ আসিয়া মহাদেবে সংক্রামিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে হইলে, একবার অনার্য্য-সমাজের প্রাচীন এবং আধুনিক অবস্থার কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করার প্রয়োজন। কথায় কথা বাড়িতেছে; অথচ এক কথার সহিত অন্য কথা এমন ভাবে গাঁথা যে, একটি পরিহার করিলে অন্যটির মীমাংসা হয় না।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণে পাঁচটি অনার্য্যজাতির নাম পাওয়া যায়, যথা—অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ এবং মুতিব। বিদেশীয় প্লিনি এবং আরিয়ানের বর্ণনায় সাতটি অনার্য্যজাতির নাম আছে, যথা—অক্কারি (অন্ধ্র), শোয়ারি (শবর), মোলেন্দি (পুলিন্দ), মোছুবেই (মুতিব), কির্হাদই (কিরাত) এবং বর্ব্বর। টলেমিতে কেবল অন্ধ্র (Androi), শবর (Sabari) পুলিন্দ (Pulindai) এবং কিরাতের (Kirrhadai) নাম পাওয়া যায়। কিন্তু মহাভারতে ভারতবাসী দস্যু-জাতির মধ্যে উক্ত নামগুলি ছাড়া, অধিকন্তু যবন, শক এবং কাম্বোজদিগের নাম পাওয়া যায়। বৈদিক সময় হইতেই যে অনার্য্যেরা পরাক্রান্ত জাতি ছিল, তাহা এই বিশেষ উল্লেখ হইতেই বুঝিতে পারা যায়। অন্ধ্রেরা দক্ষিণপ্রদেশে রাজা হইয়াছিলেন, এবং পরে খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে মগধের সিংহাসনে বসিয়া রাজাধিরাজ হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কপালগুণে তাঁহারা হিন্দু হইয়া ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করেন। পুণ্ড্রজাতিও বঙ্গদেশের আশ্রয়ে কালক্রমে খাঁটি হিন্দু হইয়া গিয়াছিলেন। বাকী রহিলেন শবর, পুলিন্দ, কিরাতাদি। ইঁহারা কখনও যবন, কখনও ম্লেচ্ছ এবং কখনও বা দস্যু বলিয়া, মহাভারতের পরবর্ত্তী সাহিত্যে কীর্ত্তিত। মহাভারতেও দেখিতে পাই, এবং ৬ষ্ঠ হইতে ৮ম শতাব্দী পর্য্যন্তের কাব্যাদিতেও দেখিতে পাই যে, ইহারা বিন্ধ্যপ্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারত-সাগরের পূর্ব্বকূল পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া বাস করিতেছিল। বিষ্ণুপুরাণে যে অষ্টযবনের রাজত্বের কথা পাওয়া যায়, এবং প্রকৃত-পক্ষেও যাহারা নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত মাদ্রাজের উপকূলে রাজত্ব করে,

তাহারা যথার্থই বিষ্ণুপুরাণবর্ণিত মেকলে প্রাধান্যবিস্তার করিয়াছিল। ইহাও স্থির হইয়াছে যে, এই যবনেরা শবর এবং গোঁড়জাতি। ঐ দুই জাতি মূলত এক ছিল। স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় ইতিহাস হইতে জানা গিয়াছে যে, ইহারা এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। রামায়ণেও দেখিতে পাই যে, রামচন্দ্র একালের রায়পুরজেলার শিরপুর বা শবরীপুর গ্রামের নিকটে এক শবরীর আশ্রয় পাইয়াছিলেন। এই শবরী সিদ্ধশবরী এবং শ্রমণা। হর্ষচরিতেও বিন্ধ্যপ্রদেশ বৌদ্ধভিক্ষুপরিপ্লুত বলিয়া বর্ণিত আছে। সময়ে-সময়ে যে এই রাজ্যে ক্ষত্রিয়রাজারা অধিকারবিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। কাপ্তেন ফর্সিৎ-সাহেব (Captain Forsyth) বলিয়াছেন যে, যদি কোন ইতিহাস না-ও থাকিত, তাহা হইলেও গোঁড়দিগের শরীরস্তরে আর্য্যেরা যে চিরস্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেই উহাদের রমণীকুলের প্রতি ক্ষত্রিয়দিগের অনুরাগের কথা সূচিত হইত। মহাভারতে পদে পদে এই অনার্য্য রমণী-দিগের কৃষ্ণাঙ্গের মনোমোহিনী প্রভার পরিচয় পাওয়া যায়। কুরুকুলের আদি-পুরুষ উপরিচর পর্য্যন্ত এদেশীয় অনার্য্য-রমণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-দিগের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া গোঁড়েরা উপ-বীত পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের আর্য্যসংস্রবের বিষয়ে আরও দুএকটি ঐতি-হাসিক কথা বলিতেছি। সমগ্র চেদিরাজ্য, অর্থাৎ জব্বলপুর, দামো এবং মণ্ডলা প্রভৃতি গোঁড়দিগের রাজ্য ছিল; এখনও ঐ স্থান গোঁড়-(গণ্ড)-পরিপূর্ণ। কিন্তু এক সময়ে এই রাজ্যের মাহিষ্মতী-নগরীতে (মণ্ডলা) আর্য্যরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। চেদিরাজ্য-সম্বন্ধেও যে কথা, বাকাটক এবং মেকল বা দক্ষিণকোশল সম্বন্ধেও সেই কথা। বাকাটক এবং দক্ষিণকোশলে ৭ম শতাব্দীতে আর্য্য-উপনিবেশ স্থাপিত হয়।

গুপ্তরাজাদের সময়ে যখন বিশ্ববর্ম্মা এবং বন্ধুবর্ম্মা (৪৫৮ খৃষ্টাব্দে) দক্ষিণপশ্চিম মালবে চেদিরাজ্যের উত্তরভাগে মন্দিরস্থাপন করেন, তখন সেই উপলক্ষ্যে যে প্রস্তরলিপি ক্ষোদিত হইয়াছিল, তাহাতে লিখিত আছে যে, ঐ দেশ মাতৃকাপূর্ণ। ঐ লিপিতে আছে যে, যেখানে "ঘনাত্যর্থনিস্রাদিনী প্রমুদিতা মাতৃকাগণের" ভীমরবে "তস্তো-ভূত প্রবল পবন" উত্থিত হইয়া "সমুদ্রের জল আলোড়ন করে", সেই "ডাকিনী-সম্প্রকীর্ণদেশে" তাহাদের প্রভাব মন্দীভূত করিবার জন্য এবং পুণ্যার্জ্জনের উদ্দেশে এই মন্দির নির্ম্মাণ করা গেল। এই বিন্ধ্যপ্রদেশে চিরদিনই নায়িকা, ডাকিনী, শাখিনী প্রভৃতির আবাসভূমি বলিয়া বিখ্যাত। গোঁড় এবং শবরেরাও নানা-প্রকার তন্ত্রমন্ত্র ও দৈববিদ্যা জানিত এবং স্ত্রীবশীকরণচূর্ণ ব্যবহার করিত বলিয়া আর্য্যেরা বিশ্বাস করিতেন। শ্মশানে ইহা-দের কয়েকটি ভয়ঙ্কর দেবতা এবং নররুধির-প্রার্থিনী দেবীর পূজা হইত। শ্রীপর্ব্বতে ইহাদের প্রধান আড্ডা ছিল, এবং ইহারা শূন্য-পথে সর্ব্বত্র বিচরণ করিত। মালতীমাধব, বাসবদত্তা, কাদম্বরী, হর্ষচরিত এবং দশকুমার-চরিতে এই অঞ্চলের ঠিক এই সকল বর্ণনা

পাওয়া যায়। আর্য্যেরা আপনাদের ভাষায় এই ভীম দেবতাকে ভৈরব এবং ভীমরূপিণীকে চণ্ডী বা চামুণ্ডা নাম দিয়াছিলেন। অনার্য্য ভৈরবের পূজা যেখানে প্রচলিত, সেই মালবদেশে ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই ভৈরব আর্দ্রনাগাজিনধারী শূলপাণির রূপে পূজিত হইয়াছেন, দেখিতে পাই। তাঁহার তাণ্ডবনৃত্যে শবরদিগের তাণ্ডবনৃত্যের কথা মনে পড়ে। যিনি মহাদেব, তিনিই মহাকালস্বরূপ এবং ভৈরব। যিনি একদিন মরুদ্গণের অধিপতি বা পিতা ছিলেন, তাঁহাকে মরুদ্গণের মত ভয়ঙ্কর ভূতপ্রেতের পতি বলিলে বর্ণনাটি দেশকালবিরোধী হয় না। আর্য্যেরা পূর্ব্বকালেও ভূত মানিতেন, তন্ত্রমন্ত্রাদিতে বিশ্বাস করিতেন, এই কথা অথর্ব্ববেদের দোহাই দিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা দেখিতে পাই। ভূত-মানাটা সকল সমাজেই ছিল, তাহা বুঝিতে পারি। কিন্তু অথর্ব্ববেদ যখন অতি প্রাচীনকাল হইতেই দেশে বেশী মান্য লাভ করে নাই এবং পূর্ব্বকাল হইতেই যখন শবরেরা এদেশে প্রভাবশালী,তখন উহাদের নিকট হইতে যে অন্তত মন্ত্রতন্ত্রাদিগুলি সংক্রামিত হয় নাই, তাহা ত মনে হয় না। একালের ভূতপ্রেতাদির মন্ত্র, সাপের মন্ত্র, বশীকরণমন্ত্র ইত্যাদি সকলগুলিতেই যে শবরমন্ত্রের অংশাদি পাওয়া যায়, তাহা কানিংহাম-সাহেবের মন্ত্রসংগ্রহের মধ্যে স্পষ্টই দেখিতে পাই। এক সময়ে চণ্ডী এবং তন্ত্রমন্ত্র যে ঘৃণার চক্ষে দৃষ্ট হইত, বাণভট্ট, দণ্ডী এবং ভবভূতির গ্রন্থ তাহার প্রমাণ। অথচ উক্ত কবিদিগের পরবর্ত্তী যুগে যখন ঐগুলির প্রচলন, তখন অনার্য্যপ্রভাব অস্বীকার করা যায় কি? ঐ তন্ত্রাদির সহিত যোগবলেরও একটা বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। এখনও শবরাদির পল্লীতে কোন একজন স্ত্রীলোকের উপর দেবতা নামাইয়া (সভ্যভাষায় বলিতে হইলে, স্ত্রীলোকটিকে মিডিয়াম্ করিয়া) গণনাদি চলে; আমি ইহা অনেক স্থানে দেখিয়াছি। অন্যদিকে আবার হজ্‌সন্-সাহেবের গ্রন্থে পড়িয়াছি যে, নেপালের বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত শৈবধর্ম্ম মিশ্রিত; এবং সেখানকার তথাগত গুহ্যক প্রভৃতি তন্ত্রগুলি অনেক অশ্লীল অনুষ্ঠানে পূর্ণ। তন্ত্রের দেবতা সাধারণত শিব ও চণ্ডী; নেপালের তন্ত্রে একটা তারাও পাওয়া যায়। সম্ভবত এই তারাই এখন দশমহাবিদ্যার একটি। এরূপ অবস্থায় তন্ত্রমন্ত্রগুলি নীচ বৌদ্ধ এবং অনার্য্য জাতি হইতে সংক্রামিত বলিয়াই বিশ্বাস জন্মে। অনার্য্যজাতীয়েরাও যে একটা অনার্য্য মহাদেবের পূজা করিত, এবং তাহার নিকট নরবলি পর্য্যন্ত দিত, সম্ভবত অনার্য্য অন্ধ্র রাজাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ এই কথা মগধপতির বধের পূর্ব্বে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন।

রজতগিরিনিভ মহাদেব কিপ্রকারে পৌরাণিক বিগ্রহ ধারণ করিলেন, এবং কিরূপে ভূতাদির অধিপতি হইয়া শ্মশানবাসী হইলেন, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া গেল। এখন তিনি কি উপায়ে এবং কোন্ সময়ে লিঙ্গরূপ পরিগ্রহ করিলেন, সেই কথা বলিব।

প্রাচীন সাহিত্যাদির মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে রামায়ণে একটি অনার্য্য লিঙ্গদেবতার কথা

পাই। উত্তরাকাণ্ডের ৩১তম অধ্যায়ে আছে যে,রাবণ যখন মাহিষ্মতী-(একালের মণ্ডলা)-নগরীতে গমন করে, তখন নর্ম্মদাতীরে লিঙ্গপূজা করিয়াছিল; এবং হিন্দু চেদিপতি উহাকে জলস্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। এই বর্ণনাটা পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় যে—(১) লিঙ্গটি হিন্দুর উপাস্য ছিল না; (২) রাবণ মহাদেবের উপাসক হইলেও ঐ লিঙ্গটি মহাদেব ছিলেন না,—একটা স্বতন্ত্র লিঙ্গদেবতাই ছিলেন। রাবণের এ লিঙ্গপূজার স্থানটি গোঁড় ও শবরজাতির দেশ, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। রামায়ণের সময়ের কথা দূরে থাকুক, অন্তত ৭ম শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্তও যে, আর্য্যসমাজে লিঙ্গপূজা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, তাহা কতকটা সাহস করিয়াই বলিতে পারি। যখন প্রতিমাপূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তখন মহাদেব ধ্যানের অনুরূপ একটি পুরুষ; লিঙ্গ নহেন। ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতাব্দীর সাহিত্যে,—যেখানেই মহাদেবের বা তাঁহার মন্দিরের কথা আছে, সেইখানেই ধ্যানের অনুরূপ মূর্ত্তিবিশিষ্ট মহাদেব স্থাপিত আছেন বলিয়া বর্ণনা পাই। কাদম্বরী, দশকুমারচরিত প্রভৃতি পড়িলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধ হইবে। পঞ্চম এবং সপ্তম শতাব্দীর বিদেশীয় ভ্রমণকারীরাও বিগ্রহধারী শিবের কথাই বলিয়াছেন। কাশীতে তখন একটি প্রকাণ্ড শিবমূর্ত্তি ছিল বলিয়া বর্ণিত আছে।

মধ্যপ্রদেশের চাঁদা, বারদা, নাগপুর, সিরোঞ্চা প্রভৃতি লইয়া বাকাটক রাজ্য ছিল। এ বিষয়ে ফ্লীট্ এবং কানিংহামের বিভিন্ন মত; আমি কানিংহামের কথাই যুক্তিসিদ্ধ মনে করিয়া গ্রহণ করিয়াছি। বাকাটকের ২য় প্রবরসেন অষ্টম শতাব্দীর রাজা। তাঁহার প্রস্তরলিপিতে দেখিতে পাই যে, তাঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ গৌতমীপুত্র, নাগবংশীয় ভবনাগ রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন। দক্ষিণপ্রদেশের পাণ্ড্য রাজারা নাগ রাজা বলিয়া কালিদাস বর্ণনা করিয়াছেন। ইহারা যে কৃষ্ণকায় অনার্য্য, তাহাও কালিদাসের বর্ণনা হইতে সহজেই অনুমিত হয়। ২য় প্রবরসেনের ঐ প্রস্তরলিপিতে আছে যে, ভবনাগ নূতন করিয়া একটি শিবলিঙ্গ স্কন্ধে বহন করিয়া এক নূতন পুরীতে প্রতিষ্ঠা করেন। শিবের ভার বহন করিয়াছিলেন বলিয়া, নূতন পুরীর নাম দিয়াছিলেন 'ভারশিব'। সময়টি আনুমানিক ৬২০ খৃষ্টাব্দ। এই সময়ে সর্ব্বপ্রথম একটি শিবকে লিঙ্গরূপে পাওয়া গেল। এটাও সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে, অনার্য্যপ্লুত দূর দক্ষিণপ্রদেশে।

সম্ভবত কবি দণ্ডীর দশকুমারচরিত ৫৯০ খৃষ্টাব্দের; কাহারও মতে ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভের। প্রভেদ অতি সামান্য। দশকুমারচরিতে শবরাদির শ্মশানভূমিচারিণী চণ্ডিকা আছেন, তাহা বলিয়াছি। ঐ গ্রন্থে আরও দেখিতে পাই যে, বিন্ধ্যপ্রদেশে অনেক আর্য্যেরা পুলিন্দের অন্নগ্রহণ করিয়া অনার্য্যাচারী হইয়া গিয়াছিলেন। এ বর্ণনা প্রস্তরলিপিলব্ধ ইতিহাসের অনুরূপ। এই স্থানের উক্তপ্রকার অনার্য্যভাবদুষ্ট একজন সুশীল যুবকের সহিত কুমার রাজবাহনের সৌহার্দ্দ জন্মে; যুবকটির নাম

মাতঙ্গ। মাতঙ্গ অনার্য্য আচার পরিহার করিয়া আর্য্যকুলাচার এবং বৈদিকধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিলেন। স্বয়ং মহাদেব রাজবাহন এবং মাতঙ্গকে একটি গুপ্ত নগরীতে যাইতে আদেশ দিয়াছিলেন এবং অভিজ্ঞানস্বরূপে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, এক স্থানে একটি স্ফটিকলিঙ্গ আছে, তাহার নিকটবর্ত্তী সুড়ঙ্গ দিয়া প্রবেশ করিতে হইবে। মহাদেব নিজে বলিতেছেন যে, "একটি স্ফটিকলিঙ্গ আছে"; যদি ঐটি মহাদেবের সহিত সম্পর্কিত হইতেন, তাহা হইলে নির্দ্দেশের ভাষা অন্যরূপ হইত। তাহার পর আবার যখন রাজবাহন এবং মাতঙ্গ সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলেন, তখন ঐ লিঙ্গের প্রতি কোন সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। আর্য্যপূজ্য হইলে অথবা মহাদেব হইলে, এ ব্যবহার হইত না। "পূজ্যপূজাব্যতিক্রমে" শ্রেয় বিঘ্নসঙ্কুল হয়; কিন্তু উভয়েরই ইষ্টসিদ্ধি হইল; এবং অর্দ্ধ-আর্য্য মাতঙ্গ "অসুরোত্তমনন্দিনী কালিন্দী"কে বিবাহ করিলেন। রামায়ণের সময়ে দেখিয়াছি যে, বৌদ্ধ শবরেরা সাধু হইলে সিদ্ধনাম পাইত। এই স্ফটিকলিঙ্গের উপাসকও সিদ্ধশবর বলিয়াই দণ্ডীর লেখা হইতে অনুমান হয়। দেখিতে পাওয়া গেল যে, সপ্তম শতাব্দীর প্রারব্ধ পর্য্যন্তও আর্য্যসমাজে লিঙ্গপূজা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। কিন্তু অনার্য্যজাতির মধ্যে যে লিঙ্গ প্রচলিত ছিল, তাহা বহুদিন হইতে আর্য্যেরা জানিতেন।

এখন অনার্য্যজাতির এই লিঙ্গদেবতার তত্ত্ব লওয়া যাউক। গোঁড়দিগের মধ্যে একটি পুরাতন এবং সর্ব্বত্রব্যাপী ঐতিহ্য প্রচলিত আছে যে, অতি প্রাচীনকালে তাহারা উত্তরদেশে বাস করিত, কিন্তু তাহারা এক সময়ে আর্য্যদিগের সহিত বিবাদে একটি পর্ব্বতগুহায় বন্দী হইয়া পড়িয়াছিল। তখন তাহাদের একজন ক্ষমতাশালী বীর পূর্ব্বপুরুষ প্রস্তরবাধা অপসারণপূর্ব্বক তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া দক্ষিণপ্রদেশে আনিয়াছিলেন। এই বীরপুরুষের নাম লিঙ্গো। লিঙ্গো বহু প্রাচীনকাল হইতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। গোঁড়েরা কখনও কোন মানুষের প্রতিকৃতি করিয়া লিঙ্গোকে পূজা করে নাই; গাছের তলায় একখানি পাথর রাখিয়া কুক্কুট বলি দিয়াই পূজা করিয়াছে। যে সময়ে আর্য্যেরা মধ্যপ্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন, তখন অন্যান্য দেবতার সঙ্গে মহাদেবের পূজাও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। গোঁড়দিগের প্রাচীন গানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা সেই সময়ে তাহাদের লিঙ্গোদেবকে প্রশংসা করিতে গিয়া তাঁহাকেই যথার্থ মহাদেব বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছে। কাপ্তেন্ ফর্সিতের গ্রন্থে এই সকল গান এবং লিঙ্গোর বিবরণ অনেক আছে।

কি ভাবে অনার্য্যদেবতা আর্য্যসমাজে প্রবেশ করিবার সময় নূতন নাম পাইতেন, তাহার দুএকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। গোঁড়বাবা নামে গোঁড়দিগের একজন সিদ্ধপুরুষ রাজিমে পূজিত হইতেন। জাজল্লদেবের সময় হইতে তিনি গোড়েশ্বর মহাদেব বলিয়া আর্য্যের পূজা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। যেমন করিয়া হউক, মহাদেব করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে, তাই এই

অর্থশূন্য গোড়েশ্বর নামের সৃষ্টি হইল। সম্বলপুরের রাজারা একটি অনার্য্য দেবীকে পূজা করিতেন; তাঁহার নাম ছিল সামলাই। এখন ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে সামলেশ্বরী কালী বলেন। কিন্তু কিছুতেই নামটা আর্য্য হইল না, এই দুঃখ; এত সাধুভাষার ভাণ করিয়াও কথাটার অর্থ হইল না, ইহাই কষ্টের কথা। যেখানে অর্থ হয় না, সেখানেও যখন মিলনের অনুরোধে এতটা টানাটানি, তখন একটু সুবিধা পাইলে ত কোন কথাই নাই। লিঙ্গোকে আর্য্য অভিধানের চাপে ফেলিয়া 'লিঙ্গ' করা বড়ই সহজ হইয়াছিল। কিন্তু একটি গোলের কথা আছে। লিঙ্গো না হয় মহাদেবের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া মহাদেব হইলেন, কিন্তু সত্যসত্যই যদি 'লিঙ্গ'-উপাস্য না থাকিত, তাহা হইলে মহাদেবকে লিঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিবার সুবিধা হইত না। এইপ্রকার কোন পূজা আর্য্য কিংবা অনার্য্য সমাজে প্রচলিত ছিল কি না, তাহার অনুসন্ধান করিতেছি।

এ পর্য্যন্ত অবরোহপ্রণালীতেই অনুসন্ধান করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এখানে উপাদানের অভাবে আরোহপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইতেছে। উৎকল, ওড্র এবং গণ্ডোয়ানা প্রদেশের অনার্য্যেরা যে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, এখনও কোন কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। খাঁটি ওড্রদেশে অর্থাৎ ওড়িষার গড়জাতমহলে এবং মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর-অঞ্চলে, কুম্ভপটিয়া নামে একটি ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে। ইহারা যে সকল গান গাহিয়া ভজন করে, সহসা তাহার কোন অর্থবোধ হয় না। ইহারা জাতি মানে না, দেবদেবী মানে না, তাহার উপর আবার ইহাদের গানে ব্রহ্মনিরূপণের কথা আছে। কৌতূহলী হইয়া এই ধর্ম্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। দেশীয় লোকেরা হয় বিদ্রূপ করিবার জন্য, না হয় তর্কে পরাজিত করিবার জন্য, ইহাদের সহিত তর্ক করিয়া থাকে; কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত অনুসন্ধান করিতে বড় কেহ প্রয়াস পায় না। এই কারণেই আমার প্রশ্নাদিতে ইহারা মনে করিয়াছিল যে, আমি হয় ত ইহাদের ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট; এবং সেই ভ্রান্ত বিশ্বাসেই ধর্ম্মের গুপ্তমত প্রকাশ করিয়াছিল। আমি ঠকাইবার ইচ্ছা না করিলেও, ইহারা প্রতারিত হইয়াছিল; কারণ দীক্ষার্থী ভিন্ন অন্য কেহ গুপ্তরহস্য জানিবার অধিকারী নহে। যাহা জানিয়াছি, তাহা সংক্ষেপত লিখিতেছি।

ইহাদের মধ্যে প্রথমসময়ে বস্ত্রপরিধান নিষিদ্ধ ছিল; পরে গুরুর আদেশে 'কুম্ভপট' বা গাছের বাকল পরিবার নিয়ম হয়। এইজন্যই নাম হইয়াছে কুম্ভপটিয়া। পরে আবার ইহাদের একজন গুরুর আদেশে গৈরিকবাস পরিবার নিয়ম হয়; এখন এই রীতিই চলিয়াছে। গৈরিকবসন বৌদ্ধদিগের সামগ্রী হইলেও, বহুকাল হইতেই হিন্দুসন্ন্যাসীরাও উহা গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ইহাদের এই রীতি বৌদ্ধপ্রথারই অনুযায়ী। ইহারা সূর্য্যাস্তের পর কিছু আহার করে না; এটা যে জৈনসম্প্রদায়ের রীতি, তাহা সকলেই জানেন। নগ্নতাও জৈনদিগের একটি সাম্প্রদায়িক বিশেষত্ব ছিল। কুম্ভপটিয়াদিগের প্রত্যেক ভজনের

গানে শূন্য-মহাশূন্যের কথা আছে। জৈন এবং বৌদ্ধেরাই চিরদিন শূন্যবাদ-শূর ও নাস্তিবাদ-শূর বলিয়া পরিচিত। ইহাদের ধর্ম্ম-তত্ত্বের প্রথম সূত্র এই যে, এই সংসার যে ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা জানা যায় না; ঈশ্বরের তত্ত্ব শূন্যে-মহাশূন্যে লুক্কায়িত। জীবের জননেন্দ্রিয় হইতেই সৃষ্টিপ্রবাহ চলিয়াছে; উহাই ব্রহ্ম। স্ত্রীপুরুষের পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণই মায়া; এইজন্যই নাকি উক্ত হইয়াছে যে, মায়াসৃষ্টি করিয়া ব্রহ্ম সৃষ্টিকার্য্য সাধন করিয়াছেন। মায়া যে ব্রহ্মের সৃষ্টি এবং ব্রহ্মে যে মায়া নাই, এ কথা বুঝাইবার জন্য যে সকল যুক্তি এবং দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত হইয়াছিল, শ্লীলতার অনুরোধে তাহা লিখিতে পারিলাম না। ইহারা বলে—এবং কথাটাও খুব ভাল—যে, ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য হইতেই সকল পাপের সৃষ্টি এবং সকল দুঃখের উৎপত্তি। যে উপায়ে উহা তিরোহিত হইতে পারে, তাহাই নির্ব্বাণসুখের সোপান। কিন্তু বাসনার চাঞ্চল্য নিবারণ করিবার জন্য এবং জীবন্মুক্তি-লাভের নিমিত্ত যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, নেপালের গুহ্য তান্ত্রিক অনুষ্ঠান এবং 'তারা'র পূজাও তাহার কাছে হার মানে। অশ্লীল অনুষ্ঠানগুলির কথা ছাড়িয়া দিয়া কুস্তপটিয়াদিগের ধর্ম্মের মূল কথা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যুক্ত জননেন্দ্রিয়ের ধ্যানই ব্রহ্মধ্যান। বাংলাদেশে এক-শ্রেণীর কর্ত্তাভজাভাঙা বাউলের দল আছে, তাহাদের দেহতত্ত্বের গানও এই সম্প্রদায়ের ভজনের অনুরূপ। নিগূঢ় অশ্লীল দেহতত্ত্ব আছে বলিয়া, তাহাদের গানেরও শব্দার্থ হইতে অর্থ হয় না।

কুস্তপটিয়াদিগের মধ্যে এই পরম্পরাগত ঐতিহ্য প্রচলিত যে, ইহাদের ধর্ম্মমত পুরীতে জগন্নাথসৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে। এই ঐতিহ্যে বিশ্বাস করিলে অনুমান করা যাইতে পারে যে, বহুদিন হইতে অনার্য্যদিগের শ্রেণী-বিশেষের মধ্যে এই যুক্তজননেন্দ্রিয়পূজা প্রচলিত আছে। লিঙ্গো-পূজা নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র হইত, কারণ সেটি মহাপুরুষের পূজা। শিবগৌরবযুক্ত লিঙ্গো হইতে লিঙ্গসৃষ্টি করিয়া এবং তাহার সহিত এই অনার্য্য যন্ত্র-পূজা মিলাইয়া, আর্য্যেরা অনায়াসেই নিত্য-সংযুক্ত হরপার্ব্বতীর বিশ্বসৃজনকারিণী শক্তির মাহাত্ম্য নূতনভাবে প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। ঋতুকালাদির বিশেষ মর্য্যাদাটা আর্য্যসমাজে যেভাবে প্রচলিত ছিল, এবং যেপ্রকার বিস্ময়ের সহিত ও রহস্যপূর্ণ করিয়া শুক্র-শোণিতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইত, তাহাতে মহাদেবের নামে এই নূতন চিহ্ন স্থাপনের সময় আর্য্যসমাজে কোন বাধা উপস্থিত না হইবারই কথা।

রাজিমে শিবগুপ্তাদির সময়ে যে লিঙ্গ-পূজা গৃহীত হইয়াছিল, তাহা সেখানকার শিবমন্দির হইতেই প্রমাণিত হয়। এই শিবগুপ্তদেব একসময়ে ত্রিকলিঙ্গাধিপতি ছিলেন। তাঁহারই সময়ে যে যযাতি-কেশরী উৎকলে রাজা হইয়াছিলেন, এ কথা তাঁহার নিজের লিপিতেই পাওয়া যায়। অনার্য্য-দিগের প্রভাব তখন উৎকলে প্রবল ছিল; এমন কি, জগন্নাথ পর্য্যন্ত শবরগৃহ হইতে আনীত বলিয়া হিন্দুদিগের নিজের ঘরেই প্রবাদ আছে। যযাতিপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গস্বরূপ

মহাদেব সর্ব্বপ্রথমে খাঁটি আর্য্যসমাজে অবতীর্ণ বলিয়া মনে হয়। এইজন্যই ভুবনেশ্বরের বিশেষত্ব। নহিলে ত কতশত স্থানে কত মহাদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিতে গিয়াছিল? এইজন্যই অন্য এক নিবন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহার অতিরিক্ত-প্রমাণস্বরূপে বলিতে পারি যে, লিঙ্গপূজা যখন ৮ম শতাব্দীর শেষ-ভাগের পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তে দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন যযাতি-কেশরী নবম শতাব্দীর প্রারম্ভের রাজা।

লিঙ্গস্বরূপ মহাদেব যে অনার্য্য দেবতা, তাহার আর একটি প্রমাণ দিতেছি। সম্বলপুরজেলার সর্ব্বত্র এবং উড়িষ্যার অনেক-স্থানে দেখিয়াছি যে, মহাদেবমন্দিরের পূজারীগণ অনার্য্য থানাপতি বা মালিজাতি। ব্রাহ্মণাদিজাতীয়েরা কোন বিশেষ পর্ব্বদিনে গিয়া পূজা এবং উৎসব করিয়া থাকেন; কিন্তু থানাপতিরাই বাঁধা পূজারী। যেখানে আর্য্যপ্রভাব বিশেষ বিস্তৃতিলাভ করে নাই, সেখানেই প্রাচীনপ্রথার যথার্থ স্বরূপ অবগত হইতে পারা যায়। আর্য্যকর্ত্তৃক গৃহীত হই-লেও, অনার্য্যপূজিত বলিয়াই হয় ত "অগ্রাহ্যং শিবনির্ম্মাল্যং" কথাটির সৃষ্টি হইয়াছিল। দেববিবাদে যে, কোন হিন্দু এত-বড় কথা বলিয়া ফেলিবেন, তাহা ত মনে হয় না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বসন্তযাপন।

এই মাঠের পারে শালবনের নূতন কচি-পাতার মধ্য দিয়া বসন্তের হাওয়া দিয়াছে।

অভিব্যক্তির ইতিহাসে মানুষের একটা অংশ ত গাছপালার সঙ্গে জড়ানো আছে। কোন এক সময়ে আমরা যে শাখামৃগ ছিলাম, আমাদের প্রকৃতিতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারও অনেক আগে কোনো এক আদিযুগে আমরা নিশ্চয়ই শাখী ছিলাম, তাহা কি ভুলিতে পারিয়াছি? সেই আদিকালের জনহীন মধ্যাহ্নে আমাদের ডালপালার মধ্যে বসন্তের বাতাস কাহাকেও কোন খবর না দিয়া যখন হঠাৎ হুহু করিয়া আসিয়া পড়িত, তখন কি আমরা প্রবন্ধ লিখিয়াছি, না, দেশের উপকার করিতে বাহির হইয়াছি? তখন আমরা সমস্ত দিন খাড়া দাঁড়াইয়া মূকের মত মূঢ়ের মত কাঁপিয়াছি—আমাদের সর্ব্বাঙ্গ ঝরঝর মর্‌মর্‌ করিয়া পাগলের মত গান গাহিয়াছে—আমাদের শিকড় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রশাখাগুলির কচি-ডগা পর্য্যন্ত রস-প্রবাহে ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হইয়া উঠি-য়াছে। সেই আদিকালের ফাল্গুন-চৈত্র এম্‌নিতর রসে ভরা আলস্যে এবং অর্থহীন প্রশ্রাপেই কাটিয়া যাইত। সেজন্য কাহারো কাছে কোন জবাবদিহি ছিল না।

যদি বল, অনুতাপের দিন তাহার পরে আসিত—বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের খরা চুপ করিয়া মাথা পাতিয়া লইতে হইত—সে কথা মানি।

যেদিনকার যাহা, সেদিনকার তাহা এম্‌নি করিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। রসের দিনে ভোগ, দাহের দিনে ধৈর্য্য যদি সহজে আশ্রয় করা যায়, তবে সান্ত্বনার বর্ষাধারা যখন দশদিক্ পূর্ণ করিয়া ঝরিতে আরম্ভ করে, তখন তাহা মজ্জায় মজ্জায় পুরাপুরি টানিয়া লইবার সামর্থ্য থাকে।

কিন্তু এ সব কথা বলিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না। লোকে সন্দেহ করিতে পারে, রূপক আশ্রয় করিয়া আমি উপদেশ দিতে বসিয়াছি। সন্দেহ একেবারেই অমূলক বলা যায় না। অভ্যাস খারাপ হইয়া গেছে। ছুটির দিনে অকাজের বেলাতেও কাজের ছাঁদ আপনি আসিয়া পড়ে। রবিবার দিন ইস্কুল বন্ধ, তবু সেদিন খেলিবার সময়ও পড়া-পড়া খেলি! এম্‌নি আশ্চর্য্য ভাল ছেলে!

আমি এই বলিতেছিলাম যে, অভিব্যক্তির শেষ কোঠায় আসিয়া পড়াতে মানুষের মধ্যে অনেক ভাগ ঘটিয়াছে। জড়ভাগ, উদ্ভিদ্‌ভাগ, পশুভাগ, বর্ব্বরভাগ, সভ্যভাগ, দেবভাগ ইত্যাদি। এই ভিন্ন ভিন্ন ভাগের একএকটা বিশেষ জন্মঋতু আছে। কোন্ ঋতুতে কোন্ ভাগ পড়ে, তাহা নির্ণয় করিবার ভার আমি লইব না। একটা সিদ্ধান্তকে শেষ পর্য্যন্ত মিলাইয়া দিব পণ করিলে বিস্তর মিথ্যা বলিতে হয়—বলিতে রাজি আছি; কিন্তু এত পরিশ্রম আজ পারিব না।

আজ, পড়িয়া-পড়িয়া, সমুখে চাহিয়া-চাহিয়া যেটুকু সহজে মনে আসিতেছে, সেইটুকুই লিখিতে বসিয়াছি।

দীর্ঘ শীতের পর আজ মধ্যাহ্নে প্রান্তরের মধ্যে নববসন্ত নিশ্বসিত হইয়া উঠিতেই নিজের মধ্যে মনুষ্যজীবনের ভারি একটা অসামঞ্জস্য অনুভব করিতেছি। বিপুলের সহিত, সমগ্রের সহিত তাহার সুর মিলিতেছে না। শীতকালে আমার উপরে পৃথিবীর যে সমস্ত তাগিদ্ ছিল, আজও ঠিক্ সেই সব তাগিদ্‌ই চলিতেছে। ঋতু বিচিত্র, কিন্তু কাজ সেই একই। মনটাকে ঋতুপরিবর্ত্তনের উপরে জয়ী করিয়া তাহাকে অসাড় করিয়া যেন মস্ত একটা কি বাহাদুরী আছে! মন মস্ত লোক—সে কি না পারে! সে দক্ষিণে হাওয়াকেও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া হন্‌হন্ করিয়া বড়বাজারে ছুটিয়া চলিয়া যাইতে পারে! পারে স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাই বলিয়াই কি সেটা তাহাকে করিতেই হইবে! তাহাতে দক্ষিণে বাতাস বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে না, কিন্তু ক্ষতিটা কাহার হইবে?

এই ত অল্পদিন হইল, আমাদের আমলকী-মউল ও শালের ডাল হইতে খস্‌খস্ করিয়া কেবলি পাতা খসিয়া পড়িতেছিল—ফাল্গুন দূরাগত পথিকের মত যেম্‌নি দ্বারের কাছে আসিয়া একটা হাঁক ছাড়িয়া বসিয়াছে মাত্র, অম্‌নি আমাদের বনশ্রেণী পাতাখসানর কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া একেবারে রাতারাতিই কিসলয় গজাইতে সুরু করিয়া দিয়াছে।

আমরা মানুষ, আমাদের সেটি হইবার জো নাই। বাহিরে চারিদিকেই যখন হাওয়া বদল, পাতা বদল, রং বদল, আমরা তখনও গরুর গাড়ির বাহনটার মত পশ্চাতে পুরাতনের ভারাক্রান্ত জের সমানভাবে

টানিয়া লইয়া একটানা রাস্তায় ধূলা উড়াইয়া চলিয়াছি। বাহক তখনো বেলড়ি লইয়া পাঁজরে ঠেলিতেছিল, এখনো সেই লড়ি!

হাতের কাছে পঞ্জিকা নাই—অনুমানে বোধ হইতেছে, আজ ফাল্গুনের প্রায় ১-ই কি ১৬ই হইবে—বসন্তলক্ষ্মী আজ ষোড়শী কিশোরী। কিন্তু তবু আজও হপ্তায় হপ্তায় খবরের কাগজ বাহির হইতেছে—পড়িয়া দেখি, আমাদের কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের হিতের জন্য আইন তৈরি করিতে সমানই ব্যস্ত এবং অপর পক্ষ তাহারই তন্নতন্ন বিচারে প্রবৃত্ত। বিশ্বজগতে এইগুলাই যে সর্ব্বোচ্চ ব্যাপার নয়—বড়লাট-ছোটলাট, সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের উৎকট ব্যস্ততাকে কিছুমাত্র গণ্য না করিয়া দক্ষিণসমুদ্রের তরঙ্গোৎসবসভা হইতে প্রতিবৎসরের সেই চিরন্তন বার্ত্তাবহ নবজীবনের আনন্দসমাচার লইয়া ধরাতলে অক্ষয় প্রাণের আশ্বাস নূতন করিয়া প্রচার করিতে বাহির হয়, এটা মানুষের পক্ষে কম কথা নয়, কিন্তু এ সব কথা ভাবিবার জন্য আমাদের ছুটি নাই।

সেকালে আমাদের মেঘ ডাকিলে অনধ্যায় ছিল,—বর্ষার সময় প্রবাসীরা বাড়ী ফিরিয়া আসিতেন। বাদ্‌লার দিনে যে পড়া যায় না, বা বর্ষার সময় বিদেশে কাজ করা অসম্ভব, এ কথা বলিতে পারি না—মানুষ স্বাধীন স্বতন্ত্র, মানুষ জড়প্রকৃতির আঁচলধরা নয়। কিন্তু জোর আছে বলিয়াই বিপুল প্রকৃতির সঙ্গে ক্রমাগত বিদ্রোহ করিয়াই চলিতে হইবে, এমন কি কথা আছে! বিশ্বের সহিত মানুষ নিজের কুটুম্বিতা স্বীকার করিলে, আকাশে নবনীলাঞ্জন মেঘোদয়ের খাতিরে পড়া বন্ধ ও কাজ বন্ধ করিলে, দক্ষিণে হাওয়ার প্রতি একটুখানি শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়া আইনের সমালোচনা বন্ধ রাখিলে মানুষ জগৎচরাচরের মধ্যে একটা বেসুরের মত বাজিতে থাকে না। পাঁজিতে তিথিবিশেষে বেগুন, শিম, কুষ্মাণ্ড নিষিদ্ধ আছে—আরো কতকগুলি নিষেধ থাকা দরকার,—কোন্ ঋতুতে খবরের কাগজ পড়া অবৈধ, কোন্ ঋতুতে আপিস্ কামাই না করা মহাপাতক, অরসিকের নিম্নবুদ্ধির উপর তাহা নির্ণয় করিবার ভার না দিয়া শাস্ত্রকারদের তাহা একেবারে বাঁধিয়া দেওয়া উচিত ছিল।

বসন্তের দিনে যে বিরহিণীর প্রাণ হাহা করে, এ কথা আমরা প্রাচীন কাব্যেই পড়িয়াছি—এখন এ কথা লিখিতে আমাদের সঙ্কোচ বোধ হয়, পাছে লোকে হাসে। প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের মনের সম্পর্ক আমরা এম্‌নি করিয়াই ছেদন করিয়াছি। বসন্তে সমস্ত বনে-উপবনে ফুল ফুটিবার সময় উপস্থিত হয়—তখন তাহাদের প্রাণের অজস্রতা; বিকাশের উৎসব। তখন আত্মদানের উচ্ছ্বাসে তরুলতা পাগল হইয়া উঠে—তখন তাহাদের হিসাবের বোধমাত্র থাকে না, যেখানে দুটা ফল ধরিবে, সেখানে পঁচিশটা মুকুল ধরাইয়া বসে। মানুষই কি কেবল এই অজস্রতার স্রোত রোধ করিবে? সে আপনাকে ফুটাইবে না, দুলাইবে না, দান করিতে চাহিবে না, কেবলি কি ঘর নিকাইবে, বাসন মাজিবে—ও যাহাদের সে বালাই নাই, তাহারা বেলা চারটে পর্য্যন্ত পশমের গলাবন্ধ বুনিবে? আমরা কি এতই

একান্ত মানুষ? আমরা কি বসন্তের নিগূঢ় রসসঞ্চার-বিকশিত তরুলতাপুষ্পপল্লবের কেহই নই? তাহারা যে আমাদের ঘরের আঙিনাকে ছায়ায় ঢাকিয়া, গন্ধে ভরিয়া, বাহু দিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহারা কি আমাদের এতই পর যে, তাহারা যখন ফুলে ফুটিয়া উঠিবে, আমরা তখন চাপকান পরিয়া আপিসে যাইব—কোনো অনির্ব্বচনীয় বেদনায় আমাদের হৃৎপিণ্ড তরুপল্লবের মত কাঁপিয়া উঠিবে না?

আমি ত আজ গাছপালার সঙ্গে বহু প্রাচীনকালের আত্মীয়তা স্বীকার করিব। ব্যস্ত হইয়া কাজ করিয়া বেড়ানই যে জীবনের অদ্বিতীয় সার্থকতা, এ কথা আজ আমি কিছুতেই মানিব না। আজ আমাদের সেই যুগান্তরের বড়দিদি বনলক্ষ্মীর ঘরে ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণ। সেখানে আজ তরুলতার সঙ্গে নিতান্ত ঘরের লোকের মত মিশিতে হইবে—আজ ছায়ায় পড়িয়া সমস্তদিন কাটিবে—মাটিকে আজ দুই হাত ছড়াইয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে—বসন্তের হাওয়া যখন বহিবে, তখন তাহার আনন্দকে যেন আমার বুকের পাঁজরগুলার মধ্য দিয়া অনায়াসে বৃহ করিয়া বহিয়া যাইতে দিই—সেখানে সে যেন এমনতর কোন ধ্বনি না জাগাইয়া তোলে, গাছপালারা যে ভাষা না বোঝে। এম্‌নি করিয়া চৈত্রের শেষপর্য্যন্ত মাটি, বাতাস ও আকাশের মধ্যে জীবনটাকে কাঁচা করিয়া সবুজ করিয়া ছড়াইয়া দিব—আলোতে ছায়াতে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিব।

কিন্তু, হায়, কোন কাজই বন্ধ হয় নাই—হিসাবের খাতা সমানই খোলা রহিয়াছে। নিয়মের কলের মধ্যে কর্ম্মের ফাঁদের মধ্যে পড়িয়া গেছি—এখন বসন্ত আসিলেই কি, আর গেলেই কি!

মনুষ্যসমাজের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, এ অবস্থাটা ঠিক নহে। ইহার সংশোধন দরকার। বিশ্বের সহিত স্বতন্ত্র বলিয়াই যে মানুষের গৌরব, তাহা নহে। মানুষের মধ্যে বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যই আছে বলিয়া মানুষ বড়! মানুষ জড়ের সহিত জড়, তরুলতার সঙ্গে তরুলতা, মৃগপক্ষীর সঙ্গে মৃগপক্ষী। প্রকৃতি-রাজবাড়ীর নানা মহলের নানা দরজাই তাহার কাছে খোলা। কিন্তু খোলা থাকিলে কি হইবে? এক এক ঋতুতে এক এক মহল হইতে যখন উৎসবের নিমন্ত্রণ আসে, তখন মানুষ যদি গ্রাহ্য না করিয়া আপন আড়তের গদিতেই পড়িয়া থাকে, তবে এমন বৃহৎ অধিকার সে কেন পাইল? পুরা মানুষ হইতে হইলে তাহাকে সবই হইতে হইবে, এ কথা না মনে করিয়া মানুষ মনুষ্যত্বকে বিশ্ববিদ্রোহের একটা সঙ্কীর্ণধ্বজাস্বরূপ খাড়া করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে কেন? কেন সে দম্ভ করিয়া বারবার এ কথা বলিতেছে, আমি জড় নহি, উদ্ভিদ্ নহি, পশু নহি, আমি মানুষ—আমি কেবল কাজ করি ও সমালোচনা করি, শাসন করি ও বিদ্রোহ করি! কেন সে এ কথা বলে না, আমি সমস্তই, সকলের সঙ্গেই আমার অবারিত যোগ আছে—স্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা আমার নহে!

হায় রে সমাজদাঁড়ের পাখি আকাশের নীল আজ বিরহিণীর চোখ-দুটির মত

স্বপ্নাবিষ্ট, পাতার সবুজ আজ তরুণীর কপোলের মত নবীন, বসন্তের বাতাস আজ মিলনের আগ্রহের মত চঞ্চল—তবু তোর পাখা-দুটা আজ বদ্ধ, তবু তোর পায়ে আজ কর্ম্মের শিকল ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজিতেছে—এই কি মানবজন্ম!

ঝর্‌ণাতলা।

আমাদের এই পল্লিখানি পাহাড় দিয়ে ঘেরা,
দেবদারুর কুঞ্জে ধেনু চরায় রাখালেরা।
কোথা হ'তে চৈত্রমাসে হাঁসের শ্রেণী উড়ে আসে
অগ্রাণেতে আকাশপথে যায় যে তারা কোথা
আমরা কিছুই জানিনেক সেই সুদূরের কথা।
আমরা জানি গ্রাম ক'খানি, চিনি দশটি গিরি,
মা ধরণী রাখেন মোদের কোলের মধ্যে ঘিরি।

সে ছিল ওই বনের ধারে ভুট্টাক্ষেতের পাশে
যেখানে ওই ছায়ার তলে জলটি ঝরে আসে।
ঝর্‌ণা হ'তে আন্‌তে বারি জুটত হোথা অনেক নারী,
উঠ্‌ত কত হাসির ধ্বনি তারি ঘরের দ্বারে,
সকাল-সাঁঝে আনাগোনা তারি পথের ধারে।
মিশ্‌ত কুলুকুলুধ্বনি তারি দিনের কাজে,
ঐ রাগিণী পথ হারাত তারি ঘুমের মাঝে!

সন্ধ্যাবেলায় সন্ন্যাসী এক বিপুল জটা শিরে
মেঘে-ঢাকা শিখর হ'তে নেমে এলেন ধীরে।
বিস্ময়েতে আমরা সবে শুধাই "তুমি কেগো হবে?"
বস্‌ল যোগী নিরুত্তরে নির্ঝরিণীর কূলে
নীরবে সেই ঘরের পানে স্থির নয়ন তুলে।
অজানা কোন্ অমঙ্গলে বক্ষ কাঁপে ডরে
রাত্রি হ'ল, ফিরে এলেম যে যার আপন ঘরে।

পরদিনে প্রভাত হ'ল দেবদারুর বনে,
ঝরণাতলায় আন্‌তে বারি জুটল নারীগণে।
দুয়ার খোলা দেখে আসি, নাই সে খুসি, নাই সে হাসি,
জলশূন্য কলসখানি গড়ায় গৃহতলে,
নিব-নিব প্রদীপটি সেই ঘরের কোণে জ্বলে।
কোথায় সে যে চলে গেল রাত না পোহাতেই,
শূন্যঘরের দ্বারের কাছে সন্ন্যাসীও নেই।

চৈত্রমাসে রৌদ্র বাড়ে বরফ গলে' পড়ে,—
ঝরণাতলায় বসে মোরা কাঁদি তাহার তরে।
আজিকে এই তৃষার দিনে কোথায় ফিরে নিঝর বিনে,
শুষ্ককলস ভরে' নিতে কোথায় পাবে ধারা!
কে জানে সে নিরুদ্দেশে কোথায় হ'ল হারা!
কোথাও কিছু আছে কিগো—শুধাই যারে-তারে,—
আমাদের এই আকাশ-ঢাকা দশপাহাড়ের পারে?

গ্রীষ্মরাতে বাতায়নে বাতাস হুহু করে,
বসে আছি প্রদীপ-নেবা তাহার শূন্যঘরে।
শুনি বসে দ্বারের কাছে ঝরণা যেন তারেই যাচে
বলে, "ওগো আজ্‌কে তোমার নাই কি কোন তৃষা,
জলে তোমার নাই প্রয়োজন এমন গ্রীষ্মনিশা?"
আমিও কেঁদে কেঁদে বলি—"হে অজ্ঞাতচারি,
তৃষ্ণা যদি হারাও তবু ভুলো না এই বারি!"

হেনকালে হঠাৎ যেন লাগ্‌ল চোখে ধাঁদা,
চারিদিকে চেয়ে দেখি নাই পাহাড়ের বাধা।
ঐ যে আসে কারে দেখি! আমাদের যে ছিল সে কি!
ওগো তুমি কেমন আছ, আছ মনের সুখে?
খোলা আকাশতলে হেথা ঘর কোথা কোন্ মুখে?
নাইক পাহাড়, কোনোখানে ঝরণা নাহি ঝরে,
তৃষ্ণা পেলে কোথায় যাবে বারিপানের তরে?

সে কহিল "যে ঝরণা বয় সেথা মোদের দ্বারে
নদী হয়ে সে-ই চলেচে হেথা উদার-ধারে।
সেই আকাশ এই পাহাড় ছেড়ে অসীমপানে গেছে বেড়ে,
সেই ধরারেই নাইক হেথা পাষাণ বাধা বেঁধে।"
"সবই আছে, আমরা ত নেই" কইনু তারে কেঁদে!
সে কহিল করুণ হেসে "আছ হৃদয়মূলে!"
স্বপন ভেঙে চেয়ে দেখি আছি ঝরণাকূলে!

অভিজ্ঞানশকুন্তলের অঙ্কান্তর্গত কালবিশ্লেষণ।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি অভিজ্ঞান-শকুন্তল-নামক নাটকের কালনির্ণয়রূপ সাধারণের ভীতিজনক ঐতিহাসিক তত্ত্বের অবতারণা করিতেছি না; অথবা শকুন্তলা-নাটকের সৌন্দর্য্যবিশ্লেষণরূপ পূর্ব্বপ্রচলিত সমালোচনা-ব্যাপারেও প্রবৃত্ত হই নাই। আমার আকাঙ্ক্ষা সামান্য, শক্তি অকিঞ্চিৎকর; সুতরাং ঔৎসুক্যনিবারণরূপ একটি ক্ষুদ্র কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না।

ইংরেজী কোন একখানা বিখ্যাত নাটক পড়িবার সময় তাহার অতিসংক্ষিপ্ত একটি কালবিশ্লেষণের (time analysis) প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ে; তখন শকুন্তলা-নাটকেরও ঐরূপ একটি কালবিশ্লেষণ করিবার জন্য আমার একটু আগ্রহ জন্মে, তাহারই ফলে বর্ত্তমান প্রবন্ধের উৎপত্তি। ইহাতে আমি শকুন্তলা-নাটকের এক অঙ্ক হইতে অন্য অঙ্কের ঘটনাবলী কতদিন অন্তর ঘটিয়াছিল এবং সম্পূর্ণ নাটকের কার্য্যাবলী শেষ হইতেই বা কতদিনের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহাই যতদূর বুঝিয়াছি, দেখাইতে চেষ্টা করিব। এরূপ সময়বিশ্লেষণ শকুন্তলা বুঝিবার পক্ষে বিশেষ কোন সাহায্য বা সুবিধা প্রদান করিবে না, ইহা নিশ্চিত; তবে বোধ হয় ঔৎসুক্যের একটুকু তৃপ্তিসাধন করিতে পারিবে।

শকুন্তলা-নাটক সর্ব্বপ্রথম কখন্ অভিনীত হয়, অথবা কখনও অভিনীত হইয়াছিল কি না, জানি না; কিন্তু যদি কখনও অভিনীত হইয়া থাকে, তবে গ্রীষ্মকালেই হইয়াছিল, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। শকুন্তলা-নাটকের প্রস্তাবনায় নটী সূত্রধারকে জিজ্ঞাসা করিতেছে :—

"অণন্তরকরণিজ্জং দাব অজ্জো আণবেদু।"

'অনন্তর কি কর্ত্তব্য, আর্য্য, আদেশ করুন।' সূত্রধার তদুত্তরে বলিতেছে :—

"কিমন্যদতঃ পরিষদঃ শ্রুতিপ্রসাদনতঃ। তদিমমেব তাবদচিরপ্রবৃত্তমুপভোগক্ষমং গ্রীষ্মসময়মধিকৃত্য গীয়তাম্।"

'এই সভার শ্রবণরঞ্জন ভিন্ন আর কি করিবে? অতএব এই অচিরপ্রবৃত্ত

উপভোগক্ষম গ্রীষ্মকালকেই অবলম্বন করিয়া গান কর।' গ্রীষ্মসময়ে যদি এই নাটক অভিনীত না হইয়া থাকে, তবে "অচিরপ্রবৃত্ত গ্রীষ্মসময় অবলম্বনে গান কর" ইহার সার্থকতা থাকে কোথায়?

গ্রীষ্মকালে শকুন্তলা সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হয়, এই উক্তিটি তর্কের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য ইহা নহে। তবে এখানে আমি এইটুকু বলিতে চাই যে, রাজা দুষ্যন্ত যে গ্রীষ্মকালে মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন এবং এই গ্রীষ্মকালেই যে শকুন্তলার সহিত তাঁহার প্রথম দেখাসাক্ষাৎ, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শকুন্তলার প্রথম অঙ্কে গ্রীষ্মঋতুর কোন বর্ণনা নাই, কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কে আছে। দ্বিতীয় অঙ্ক হইতে প্রথম অঙ্কের ঘটনাবলীর ব্যবধান একদিনমাত্র, সুতরাং প্রথমাঙ্কোক্ত ঘটনাবলীও গ্রীষ্মকালেই সংঘটিত হইয়াছিল। আমরা ক্রমে ইহা দেখাইতেছি।

রাজা যেদিন মৃগয়ায় বাহির হন, সেইদিনই সশিষ্য বৈখানসের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় মৃগহননব্যাপারে বাধাপ্রাপ্ত হন এবং মুনিপ্রমুখাৎ কণ্বাশ্রমের আতিথ্যসৎকারের ভার শকুন্তলার উপর আছে অবগত হইয়া তপোবন-অভিমুখে যাইয়া শকুন্তলার সাক্ষাৎলাভ করেন। রাজা এবং শকুন্তলার প্রথমদর্শনজনিত দৃষ্টিরাগ ও প্রেমসঞ্চার বর্ণনেই প্রথমাঙ্কের পরিসমাপ্তি; সুতরাং বিষ্কম্ভক ও প্রবেশকগুলিকে কোন অঙ্কান্তর্গত না ধরিলে, অন্যান্য অঙ্কেও যেমন একদিনের ঘটনা, প্রথমাঙ্কেও তেমনি একদিনেরই ঘটনা। দ্বিতীয় অঙ্কের সর্ব্বপ্রথমে বিদূষকের স্বগতবচনে প্রকাশ :—

"ভো দিট্ঠং এদস্স মঅআসীলস্স রণ্ণো বঅস্সভাবেণ নির্ব্বিণ্ণো হ্মি। অজ্জ মও অজ্জ বরাহো অজ্জ সদ্দূলো ত্তি মজ্ঝণ্ণে বি গিম্হবিরলপাঅচ্ছায়ায় বণরাইস্স আহিণ্ডিঅই অড়বীদো অড়বী।"

'হায় অদৃষ্ট! মৃগয়াশীল রাজার বয়স্য হইয়া ঐ মৃগ, ঐ বরাহ, ঐ শার্দ্দূল, এই করিয়া মধ্যাহ্নেও গ্রীষ্মবিরল পাদপচ্ছায়ায় বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতেছি।' 'মধ্যাহ্নে গ্রীষ্মবিরল পাদপচ্ছায়ায় বেড়াইয়া বেড়াইতেছি' ইহাতেই প্রকাশ, গ্রীষ্মকালে রাজা মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন। আবার দেখুন, বিদূষক বলিতেছে :—

"তদো গওস্স উবরি ণিওও সংবুত্তো। হিও কিল অম্হেহ্ণ ওহীণেহ্ণ তত্তহোদো মঅণুদারেণ অস্সমপদং পবিট্ঠস্স তাবস-কণ্ণআ সউন্তলা ণাম মম অধরদাএ দংশিদা।"

'এ যেন আবার গোদের উপর বৈজি গজাইয়াছে। গতকল্য আমরা একটু পশ্চাতে পড়িয়াছিলাম বলিয়া রাজা একাকী একটা মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে, আমার পোড়াকপাল, তাই শকুন্তলানাম্নী একটি তাপসকন্যাকে দেখিয়া আসিয়াছেন।' বিদূষকের এই "গত কল্য" উক্তিতেই প্রমাণ হইতেছে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী অঙ্কের ঘটনা হইতে দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনার অন্তর একদিনমাত্র এবং তজ্জন্যই প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় অঙ্কের ঘটনাই গ্রীষ্মকালে সংঘটিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অঙ্কে প্রকাশ, রাজা মুনিদিগের যজ্ঞরক্ষার্থ তপোবনে রহিলেন। কতদিন

এরূপ ছিলেন, নাটকে তাহার বিশেষ কোন উল্লেখ নাই। তবে তাঁহাকে অন্তত যে চারি-পাঁচ-দিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করিবার হেতু আছে। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষভাগে, রাজধানী হইতে করভকনামক দূত আসিয়া, রাজাকে চতুর্থদিনে হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া রাজমাতার উপবাসের পারণসময়ে উপস্থিত থাকিতে বলিতেছে। এদিকে রাজা ইতিপূর্ব্বে কেবলমাত্র সারথি সহ তপোবনে অবস্থান করিয়া যজ্ঞরক্ষার্থ ঋষিদের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন বলিয়া মাতার আদেশ পালন করিতে পারিতেছেন না। সুতরাং তিনি যে, দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনার যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, তাহার পরেও চার-পাঁচ-দিন বা তাহার অপেক্ষা কিছু অধিক দিন ছিলেন, এরূপ অনুমান বোধ হয় অমূলক হইবে না। দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনার পর দুষ্যন্ত তপোবনে চার-পাঁচ-দিন বা তাহার অতিরিক্ত যে কয়দিনই থাকুন না কেন, ঐ সময়েই শকুন্তলার সহিত তাঁহার পুনঃসাক্ষাৎ এবং গান্ধর্ব্ববিবাহাদি সম্পন্ন হয়।

তৃতীয় অঙ্কে আমরা দেখিতে পাই, বিরহকাতরা শকুন্তলার অত্যন্ত অসুস্থ শরীর। এই অসুস্থতার কারণসম্বন্ধে প্রিয়ংবদা, অনসূয়া এবং রাজার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। রাজা ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন না, গ্রীষ্মই শকুন্তলার অসুখের কারণ অথবা প্রেমই উহার কারণ। অবশেষে রাজা বলিলেন :—

"সমন্তাপঃ কামং মনসিজনিদাঘপ্রসরয়ো-
র্ন তু গ্রীষ্মস্যৈবং সুভগমপরাদ্ধং যুবতিষু॥"

'কন্দর্প এবং গ্রীষ্ম এ উভয়েরই তাপ তুল্য, কিন্তু যুবতিদিগের পক্ষে নিদাঘতাপ এরূপ রমণীয়তা উৎপাদন করিতে পারে না।' গ্রীষ্মকাল না হইলে গ্রীষ্মজনিত অসুস্থ শরীরের কথা রাজার কখনই মনে হইত না। অতএব দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনার পর চার-পাঁচ-দিন বা সপ্তাহের মধ্যেই তৃতীয় অঙ্কের ঘটনা পরিসমাপ্ত হইয়াছিল, এবং উল্লিখিত গ্রীষ্মই উক্ত অঙ্কেরও পরিসমাপ্তির কাল।

তৃতীয় অঙ্ক হইতে চতুর্থ অঙ্কের প্রারম্ভস্থিত বিষ্কম্ভকের অন্তর কত, তাহা স্থির করিয়া বলিবার উপায় নাই। এই বিষ্কম্ভকে সখীদ্বয়ের মুখে প্রকাশ, রাজা হস্তিনায় চলিয়া গিয়াছেন, শকুন্তলা সদাই শূন্যমনা,—অনুক্ষণ কেবল দুষ্যন্তের চিন্তা লইয়াই আছেন। এস্থলে শকুন্তলার এই অসহ্য বিরহবেদনা—এই তদগতচিত্ততা সদ্যপ্রবৃত্ত বলিয়াই মনে হয়।

তা ছাড়া আরও একটি কথা আছে। ষষ্ঠ অঙ্কে শকুন্তলা-বিরহ-কাতর দুষ্যন্ত অভিজ্ঞানস্বরূপে অঙ্গুরীয়কপ্রাপ্তির পর নষ্টস্মৃতি লাভ করিয়া বলিতেছেন :—

"পশ্চাদিমাং মুদ্রাং তদঙ্গুলৌ নিবেশয়তা ময়া প্রত্যভিহিতা—

"একৈকমত্র দিবসে দিবসে মদীয়ং
নামাক্ষরং গণয় গচ্ছতি যাবদন্তম্।
তাবৎ প্রিয়ে মদবরোধগৃহপ্রবেশং
নেতা জনস্তব সমীপমুপৈষ্যতীতি॥"

'তার পর প্রত্যুত্তরে এই অঙ্গুরীয়ক তাহার (শকুন্তলার) অঙ্গুলিতে পরাইতে পরাইতে বলিলাম—এই অঙ্গুরীয়কে আমার যে নামাক্ষর আছে, এক একটি দিনে তাহার

এক একটি গণনা করিও, যে দিন গণনা শেষ হইবে, সেই দিন আমার অন্তঃপুরগৃহে প্রবেশ করাইয়া লইবার যোগ্য-লোক তোমার নিকট উপস্থিত হইবে।'

রাজার নামাক্ষরসংখ্যা সাধারণদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে তিনের উপর নয়, তবে বৈয়াকরণের আণুবীক্ষণিক বিশ্লেষণে এবং তদুপরি আবার রাজার উপাধিমালার সংযোগ হইলে সংখ্যাবৃদ্ধি হইবে, সন্দেহ নাই। ফলে যাহাই হউক, রাজার কথা সত্য ধরিয়া লইলে, তিনি অতি অল্পদিন পরেই শকুন্তলার নিকট লোক পাঠাইবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন, ইহা নিশ্চিত। সখীদ্বয় এই বিদূষকে রাজা চলিয়া গিয়াছেন বলিতেছেন, কিন্তু তিনি শকুন্তলার জন্য লোক প্রেরণ করেন নাই বলিয়া চিন্তিত হন নাই; সুতরাং তৃতীয়াঙ্কস্থ অথবা তৎপরবর্ত্তী কোন ঘটনা হইতে এই বিদূষকের অন্তর খুব বেশী বলিয়া বোধ হয় না। তৃতীয় অঙ্কের ঘটনা এবং এই বিদূষকের আরম্ভ, ইহার মধ্যে সপ্তাহকাল অতীত হইয়াছিল অনুমান করিলেও, এই বিদূষকোক্ত ঘটনাও গ্রীষ্মকালেই শেষ হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে।

প্রথম অঙ্ক হইতে চতুর্থ অঙ্কের বিদূষকের ঘটনাবলীর কাল যে গ্রীষ্ম, তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু প্রকৃত চতুর্থ অঙ্কে আমরা অন্যকালে উপস্থিত হই। চতুর্থ অঙ্কের প্রারম্ভে আমরা জানিতে পারি, মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন এবং শিষ্যকে হোমবেলানির্ণয়ে আদেশ প্রদান করিয়াছেন। শিষ্য প্রত্যূষে উঠিয়া উষাসমাগমদর্শনে বলিতেছেন :—

"যাত্যেকতোঽস্তগিরিশিখরং পতিরোষধীনা-
মাবিষ্কৃতোঽরুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।"

"একদিকে ওষধিপতি অস্তশিখরে যাইতেছেন, অন্যদিকে অরুণকে অগ্রে লইয়া অর্ক প্রকাশিত হইতেছেন।'

পূর্ণিমা বা পূর্ণিমার অতি নিকটবর্ত্তী কাল ভিন্ন এইরূপ যুগপৎ সূর্য্যোদয় এবং চন্দ্রাস্ত হয় না, সুতরাং ইহা যে পূর্ণিমা বা তৎসন্নিহিত কোন কাল, তাহা একরূপ নিঃসন্দেহ। তার পর শিষ্য বলিতেছেন :—

"অন্তর্হিতে শশিনি সৈব কুমুদ্বতী মে
দৃষ্টিং ন নন্দয়তি সংস্মরণীয়শোভা।
ইষ্টপ্রবাসজনিতান্যবলাজনস্য
দুঃখানি নূনমতিমাত্রদুঃসহানি॥"

'কুমুদিনী সে-ই—কিন্তু চন্দ্রমা অস্তমিত, তাই তাহাকে দেখিয়া আমার সে দেখার-সুখ আর হইতেছে না;—তাহার সে সুষমা যে এখন স্মৃতির ভিতরেই দেখিতে হয়! বস্তুত, হৃদয় যাহাকে চায়, সে যদি প্রবাসে যায়, তবে অবলাজনের তাহাতে যে দুঃখের রাশি, সে দুঃখের রাশি নিশ্চয় সে অতি-দুঃখেই সহ্য করিয়া উঠিতে পারে।'

কুমুদিনীর উল্লেখেই ইহা যে গ্রীষ্ম নহে, তাহা বুঝা যাইতেছে। ইহা শরতের অথবা হেমন্তের প্রথমভাগের বর্ণনা। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত পূর্ণিমাও এই শারদীয় বা হৈমন্তিক পূর্ণিমা হইবে। এই পূর্ণিমাকে আমি বর্ষার পূর্ণিমা কেন বলিতেছি না, তাহা ক্রমে দেখাইতেছি।

চতুর্থ অঙ্কে আমরা জানিতে পারি, দুষ্মন্ত বহুদিন তপোবন ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শকুন্তলার কোন সংবাদ লন

নাই বলিয়া সখীদ্বয় চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন; কখনও ভাবিতেছেন, দুর্ব্বাসার অভিশাপই বুঝি রাজার এ বিস্মৃতির কারণ। তার পর যখন মহর্ষি কণ্ব সকল ব্যাপার অবগত হইয়া শকুন্তলাকে রাজভবনে পাঠাইতেছেন, তখন আকাশে শব্দ হইল :—

"রম্যান্তরঃ কমলিনীহরিতৈঃ সরোভি-
শ্ছায়াদ্রুমৈর্নিয়মিতার্কমযূখতাপঃ।
ভূয়াৎ কুশেশয়রজোমৃদুরেণুরস্যাঃ
শান্তানুকূলপবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ॥"

'এই শকুন্তলা যেন সেই পথ দিয়া যান,—যে পথটি মধ্যে-মধ্যে কমলিনীদলে হরিতবর্ণ সরোবরসমূহে অতি রমণীয়;—যে পথে ছায়াবৃক্ষেরা রবিরশ্মির তাপকে সংযমিত রাখিয়াছে;—ইঁহার পথে যেন কোন অমঙ্গল না হয়,—যেন কোন উপদ্রব না ঘটে;—ধূলিকণাসকল যেন পদ্মপরাগের ন্যায় কোমলস্পর্শ হইয়া উঠে,—সমীরণ যেন নিজের ঔদ্ধত্য ছাড়িয়া শান্ত ও অনুকূলভাবে প্রবাহিত হয়।'

এখানেও কমলিনীর উল্লেখে উহা যে বর্ষার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা নয়, তাহা দেখা যাইতেছে। কিন্তু একটা প্রসিদ্ধি আছে, শরৎকালে রবিতাপ তীক্ষ্ণ হয়। অতএব এখানে "অর্কময়ূখতাপ" কথাটির ব্যবহারে আমার ইহা শরৎ বা হেমন্তের প্রারম্ভিক রবিতাপ বলিয়াই বোধ হয়। এই কাল কেন বর্ষা নহে, তাহার আরও একটি প্রমাণ আছে, তাহা আমরা পরে দেখাইব; কিন্তু তৎপূর্ব্বে এস্থলে অন্য একটি আপত্তি উঠিতে পারে, তাহারও মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। কথাটা এই, যেস্থান হইতে আমরা আকাশবাণী উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার একটু পূর্ব্বেই কণ্বমুনি কোকিলের শব্দ শুনিতে পাইলেন, এইরূপ একটি কথা আছে। ইহাতে কেহ কেহ হয় ত অনুমান করিতে পারেন যে, এই কাল শরৎ না হইয়া হয় ত বসন্ত হইতে পারে। কিন্তু এ কথার উত্তর এই যে, কোকিল বসন্তের পাখী হইলেও বর্ষায় বা শরতে উহার রব কচিৎ শুনা না যায়, এমন নহে। তদ্ভিন্ন বসন্তের বিরুদ্ধে আরও একটা জবাব এই যে, পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলির কাল গ্রীষ্ম ধরিলে এবং চতুর্থ অঙ্কের অন্যান্য বর্ণনার যাথার্থ্য স্বীকার করিলে, ইহাকে বর্ষা বা শরৎ ভিন্ন অন্য কোন কাল বলিবার অবসর নাই। শকুন্তলা যদি বসন্তে রাজভবনাভিমুখে রওনা হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার বিবাহের পর প্রায় সংবৎসর পূর্ণ হইতে চলিয়াছে, বলিতে হয়; এরূপ অবস্থায় তিনি বোধ হয় আর আপন্নসত্ত্বা থাকিতে পারেন না। আর আপন্নসত্ত্বা থাকিলেও কণ্বমুনি বোধ হয় আসন্নপ্রসবা তনয়াকে পদব্রজে হস্তিনায় পাঠাইতে পারিতেন না। সুতরাং যে দিক্ দিয়াই দেখি না কেন, চতুর্থ অঙ্কের কাল বসন্ত বলিয়া বোধ হয় না। তা ছাড়া, উহাকে বর্ষা বলিয়াও মনে করিতে পারি না। কেন, তাহাও দেখান যাইতেছে।

চতুর্থ অঙ্কের কাল বুঝিতে হইলে পঞ্চম অঙ্কের সাহায্য আবশ্যক। কণ্বের আশ্রম হইতে হস্তিনাপুর বহুদিনের পথ, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। দ্বিতীয় অঙ্কে করভক তপোবনে যাইয়া রাজাকে চতুর্থ-

দিনে রাজভবনে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করায় উক্ত স্থানদ্বয়ের আনুমানিক দূরত্ব একরূপ বুঝা যাইতেছে। রথে গেলে উহা যে একদিনেরও পথ নয়, তাহারও যেন কতকটা আভাস পাওয়া যায়। এরূপ অবস্থায় শকুন্তলার তপোবন হইতে রাজধানীতে পহুঁছিতে দীর্ঘ দিন লাগিয়াছে, এমন বোধ হয় না। আমার অনুমান হয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কের অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়ের ব্যবধান দুই-তিন-দিনের অধিক নহে, এমন কি একদিনও হইতে পারে। সুতরাং চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কের ঘটনা একই ঋতুতে সংঘটিত হইয়াছিল।

পঞ্চম অঙ্কে অবগুণ্ঠনবতী শকুন্তলাকে দেখিয়া রাজা তাঁহাকে আপন্নসত্ত্বা বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন; সুতরাং পঞ্চম অঙ্ক হইতে তৃতীয় অঙ্কের ব্যবধান মাত্র দুইমাস অর্থাৎ তৃতীয় অঙ্কে গ্রীষ্মকালীন ঘটনা এবং পঞ্চম অঙ্কে বর্ষাকালীন ঘটনা, এরূপ বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। এই সকল কারণে অনুমান করি, তৃতীয় ও পঞ্চম অঙ্কের ব্যবধান তিনমাসেরও উপর, এমন কি, পাঁচ-ছয়-মাস পর্য্যন্তও হইতে পারে। তাহা হইলেই ইহা যে শরৎ বা হেমন্তের ঘটনা, তাহা একরূপ স্থির এবং চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কের কার্য্যাবলী একই কালের অন্তর্ব্বর্ত্তী।

চতুর্থ অঙ্কের কালনির্ণয়ে যেমন পঞ্চম অঙ্ক আবশ্যক, ষষ্ঠ অঙ্কের কালনিরূপণে তেমনি সপ্তম অঙ্কের প্রয়োজন। সপ্তম অঙ্কে রাজা দৈত্যজয় করিয়া ইন্দ্রভবন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন, পথে মারীচ-মুনির আশ্রমে বিরহক্লিষ্টা প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলা ও তৎপুত্র সর্ব্বদমনের সহিত সাক্ষাৎ। সর্ব্বদমন তখন সকল কথাই একরূপ বলিতে পারে এবং সিংহশাবক লইয়া খেলা করে, সুতরাং তখন তাহার বয়স তিন-চার বছরের কম বলিয়া অনুমান করা সঙ্গত হইবে না। সপ্তম অঙ্কের প্রথমভাগে রাজা মাতলিকে বলিতেছেন যে, এই ঘটনার পূর্ব্বদিনে মাত্র তিনি স্বর্গে গিয়াছিলেন—

"মাতলি অসুরসঙ্গহারোৎসুকেন পূর্ব্বেদ্যুর্দিবমধিরোহতা ন লক্ষিতঃ স্বর্গমার্গঃ।"

'মাতলি, অসুরবধের ঔৎসুক্যে গতকল্য আমি স্বর্গের পথ তেমন লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই।' ষষ্ঠ অঙ্কের শেষে রাজা দুষ্যন্তের স্বর্গগমনের বর্ণনা আছে, অতএব ষষ্ঠ ও সপ্তম অঙ্কের ব্যবধান একদিন মাত্র। ষষ্ঠ অঙ্কের ঘটনার কাল বসন্ত। উক্ত অঙ্কের প্রারম্ভে আমরা দেখিতে পাই, নববসন্তারম্ভে চেটীগণ আনন্দে অধীরা; কিন্তু রাজা শকুন্তলার বিরহে কাতর বলিয়া বসন্তোৎসব বারণ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং কঞ্চুকী চেটীদিগকে বসন্তোৎসবে মত্ত হইতে নিষেধ করিতেছে :—

"মা তাবদনাস্বাদ্যে। দেবেন প্রতিষিদ্ধে বসন্তোৎসবে ত্বমাম্রকলিকাভঙ্গং কিমারভসে।"

'হে অজ্ঞরমণি, ওরূপ করিও না; নরপতি বসন্তোৎসব নিষেধ করিয়াছেন, তথাপি আম্রকলিকাভঙ্গ আরম্ভ করিয়াছ কেন?' ষষ্ঠ অঙ্কের কাল বসন্ত হইলে, তাহার পরবর্ত্তী দিনের ঘটনা অর্থাৎ সপ্তম অঙ্কের ঘটনার কালও বসন্ত। এই সময়ে সর্ব্বদমনের বয়স চারিবৎসর ধরিয়া লইলে,

সপ্তম-অঙ্কোক্ত বসন্তের ঘটনা প্রথম-অঙ্কোক্ত গ্রীষ্ম হইতে পঞ্চম বর্ষে সংঘটিত হইয়াছিল। ষষ্ঠ-অঙ্কোক্ত চেটীদ্বয়, ধীবরের নিকট হইতে অভিজ্ঞানরূপ-অঙ্গুরীয়ক-প্রাপ্তির বিষয় অবগত ছিল না, আর উক্ত অঙ্কে রাজার শকুন্তলা-জনিত শোক অতি প্রবল হইয়াছিল, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং পঞ্চম অঙ্কের শেষ ও ষষ্ঠ অঙ্কের আরম্ভ, দুয়ের মাঝখানে যে প্রবেশক আছে, তাহার ঘটনা পঞ্চম বর্ষের বসন্তের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। শকুন্তলার ঘটনাবলীর পূর্ণকাল পাঁচবৎসর স্বীকার করিলে বলিতে হয়, অমর কবি এই পঞ্চবর্ষের ঘটনার মাত্র সাতটি চিত্র অঙ্কিত করিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

আমরা এক্ষণে প্রবন্ধের সার সঙ্কলন করিতেছি :—

১। প্রথম অঙ্কের ঘটনা একদিন স্থায়ী; কাল গ্রীষ্ম, প্রথম বর্ষ।

২। প্রথম অঙ্ক হইতে দ্বিতীয় অঙ্কের ব্যবধান একদিন, সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কে একই ঋতু এবং একই বর্ষের ঘটনা।

৩। তৃতীয় অঙ্কের ঘটনা দ্বিতীয়াঙ্কের ঘটনার পর সপ্তাহমধ্যে ঘটিয়াছিল। কাল প্রথম বর্ষের গ্রীষ্ম।

৪। চতুর্থ অঙ্কের বিষ্কম্ভকের ঘটনা তৃতীয় অঙ্কের ঘটনার পর সপ্তাহমধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়।

৫। চতুর্থ অঙ্কের ঘটনার কাল শরৎ কি হেমন্তের পূর্ণিমা অথবা পূর্ণিমার অতি নিকটবর্ত্তী কোনদিন।

৬। পঞ্চম অঙ্কের ঘটনা চতুর্থ অঙ্কের ঘটনার একদিন কি দুইদিন পরে ঘটে।

৭। পঞ্চম অঙ্কের শেষ ও ষষ্ঠ অঙ্কের আরম্ভ, উভয়ের মধ্যস্থিত প্রবেশকের কাল পঞ্চম বর্ষের বসন্তের অব্যবহিত পূর্ব্বে।

৮। ষষ্ঠ অঙ্কের ঘটনার কাল পঞ্চম বর্ষের বসন্ত।

৯। ষষ্ঠ অঙ্ক হইতে সপ্তম অঙ্কের ব্যবধান একদিন। কাল বসন্ত, পঞ্চম বর্ষ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন।

জনশূন্য পৃথিবী!

হে মহাকায় ধূর্জ্জটি, তোমার জটার ভারে স্তম্ভিত হইয়া আর কতকাল তুমি ঘুমাইয়া থাকিবে? একবার জাগো। বুদ্ধি বলিয়া যে একটা খাপছাড়া জিনিষের তাড়নায় কলের ধোঁয়ায়, গির্জ্জার চূড়ায়, সঙিনের থোঁচায়, কলমের আগায় তোমার ধরণী ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিয়াছে!—তুমি তোমার তিনটি রক্তনেত্র মেলিয়া এই পৃথিবীর চারিদিকে একবার তোমার ভাঙের রস ছাঁকিবার বিপুল বস্ত্রখণ্ডটি বুলাইয়া লও! সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাউক! আঃ! আমরা একবার মরিয়া যাই!

এস, আমরা সকলে মিলিয়া মরিয়া যাই। যে যেখানে আছ, স্ত্রীপুরুষ, বালকবালিকা সকলের ঘরবাড়ী ভাঙিয়া নদীতে ডুবাইয়া দিয়া, হাতা-বেড়ী জলে নিক্ষেপ করিয়া,

সব কৃতকর্ম্ম কর্ম্মনাশার জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া—এস, আমরা একদিন শ্রাবণের শেষরাত্রে বিলকুল নির্ম্মূল হইয়া মরিয়া, চিহ্নমাত্রে নিরুদ্দেশ হইয়া যাই। কেহ শোক করিবার না থাকুক, কেহ সান্ত্বনা দিবার না থাকুক, সংবাদপত্র ও তাহার খবর পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাউক—বিরাট্ তুহিন-স্তূপ যেখানে বিগলিত-কলেবরে মহানন্দে তরঙ্গ ফুলাইয়া চলিয়াছে, সেই উত্তরসমুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া—বিন্ধ্যাআন্দিস-ককেশস্-হিমালয়ে, গোবী-সাহারা-আরবে, উজ্জ্বলনীল মার্কিন্ পাম্পাসে, ভারতের শ্যামহরিৎ বনবিস্তারে,—দ্বীপ হইতে দ্বীপে,—অন্তরীপ হইতে অন্তরীপে—সমুদ্র ডিঙাইয়া, পর্ব্বত উৎরাইয়া—শম্ভুর বিরাট্ জনহীনতা এক শ্রাবণদিনে, কৃষ্ণপক্ষীয় শেষরাত্রে, মানুষের সমস্ত দুর্গ ভাঙিয়া, সমস্ত পরিখা ভরাট্ করিয়া ফেলিয়া আপনার বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া দিক্—সমস্ত অধিকার করিয়া লউক!

পৃথিবীর বিজনতার মধ্যে মানুষ কতটুকু স্থান জুড়িয়া আছে? ব্রিটিশ ভারতে চন্দননগর!—ততটুকুও নয়। মানুষ তাহার কর্ত্তা কর্ম্ম-ক্রিয়া-শৃঙ্খলিত ভাষায় কতটুকু আকাশকে মুখরিত করিয়াছে?—অতি সামান্য! মানুষদানব পরশুরামের মত কুড়ালি লইয়া, পাগলের মত তাহার চারিদিকে কোপাইতেছে—তবু এই অসীম বিজনতার মধ্যে যদি ইঙ্কিভোর পথ খুঁড়িয়া উঠিতে পারিল! হে বিরূপাক্ষ, তোমারি সঙ্গী বেতালগণ চারিদিকে পাহারা দিতেছে। উত্তরের আয়ত তুষারাসনে বিপুল শুভ্রকায় তোমার নন্দী স্তম্ভায়ন করিতে বসিয়াছে,—সমুদ্রের অতলতায় গুপ্ত থাকিয়া লক্ষলক্ষ যক্ষ নিঃশব্দে প্রবালমুক্তায় ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে, অন্ধকার-গিরিগুহায় বসিয়া কৃষ্ণকায় ভৃঙ্গী আপন-মনে শৃঙ্গবাদন করিতেছে; মরুভূমিতে তোমারি রক্তচন্দন-চর্চ্চিত রক্তচক্ষু পুরোহিত মৌন হইয়া বসিয়া আছে—এবং বনে বনে তোমারি গৌরীর তরুণী সখীগণ চাপল্যে, গীতে, খেলায়, বেদনায়, ঋতুৎসবে নিজ নিজ হৃদয়ের বিচিত্রতা বিকশিত করিতেছে। ইহারি মধ্যে স্থানে স্থানে ইটের উপর ইট তুলিয়া তাহার ফুকরে ফুকরে মানুষ আশ্রয় লইয়াছে! হে শম্ভু, একটিমাত্র আঙুলের আগায় তোমার ভাঙে-ভিজান বল্লখানি ধরিয়া, তুমি এক মুহূর্ত্তে সমস্ত লেপিয়া-মুছিয়া লইতে পার।

একটি প্রান্তরে একটি ভাঙা কুটীর। গৃহস্থ মরিয়া নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে, এখনো জীর্ণ গৃহটি দাঁড়াইয়া আছে। ভাঙা-ঘরগুলির উপরে ঋতুবৃষ্টি দুর্দ্দমবেগে হানিয়া আসিল! ঐ মেঘলবর্ষা যে তাহার লক্ষ জলতন্ত্রীতে বিদ্যুতের মেরজাপ মারিয়া সেতার বাজাইয়া আসিয়া ধরণীর বুকের মধ্যে প্রবেশ প্রার্থনা করিতেছে—ঐ ভাঙা কুটীরটাই তাহার একমাত্র বাধা। কে ছাড়িয়া গিয়াছে—কা'র স্মৃতি প্রাণে লইয়া এ গৃহ শীর্ণ হইয়া যাইতেছে!—বর্ষা এবং ধরণীর মিলনোৎসুক বক্ষ-দুটির মধ্যে একটা উদ্বেগের মত ঐ ঘরটা দাঁড়াইয়া আছে। উহাকে ভাঙিয়া সমান করিয়া দাও! সেইরূপ, সেই শ্রাবণরাত্রির প্রভাতে মানুষের চিহ্নমাত্র না থাকুক!

আর, ত্রিলোচন একবার মনে করিলে কতক্ষণই বা লাগে! একটি তরঙ্গ-অনুষ্ঠের আন্দোলনে ইংরাজী, ফরাসী, জর্ম্মাণ—মার্কিনি, জাপানী, রুষিয়ান্—সমস্ত জাহাজ টিপিয়া শেষ করা যায়! ভাঙে-ভিজান বল্লখানিতে একটি কণা শ্মশানভস্ম মাখাইয়া ঘর্ষণ করিয়া দিলে নিউইয়র্কের দশতলা-বারতলা বাড়ীগুলা ধরণীর কলঙ্করেখার মত তখনি মুছিয়া যায়, ধোঁয়াকালীভূষামাখা লণ্ডন, সোনার কালীতে ছাপান একখানি ছবির মত প্যারিস্, মুনিসিপালিটি-গবর্মেণ্টহাউস-সমেত নগরাধম কলিকাতা, বস্তুটির কোণে বিন্দুমাত্র কালিমাচিহ্ন রাখিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়! শম্ভুদেব, তরুলতিকার বিপুল শ্যামল-স্রোত এই সকল ইষ্টকপুঞ্জের গায়ে আসিয়া ঠেকিয়া ফিরিয়া গেছে—বাধা দূর হইলেই বনলক্ষ্মী দেখিতে দেখিতে ছায়ায়, গন্ধে, মর্ম্মরে, কূজনে-গুঞ্জনে তোমার বিজনগিরিবাসিনী পার্ব্বতীর নিভৃত বিহারস্থলী রচনা করিয়া দিবে! যাক্,—যাক্,—আবার সমস্ত সোনা-রূপা মাটির ভিতরে লুকাইয়া পড়ুক; যাক্,—যাক্,—কঠিন হীরক তাহার কৃষ্ণকায় ভ্রাতা অঙ্গারের সঙ্গে আবার একাসন গ্রহণ করিয়া ধরণী-মাতার বক্ষকোটরে নির্ব্বিশেষে লালিত হৌক—পৃথিবীর উপরে আর কোন জিনিষের কিছুমাত্র মূল্য না থাকুক। তার পরে মেঘাবরোধে সমস্ত ধরণী ব্যাপিয়া সুগম্ভীর শ্রাবণনিশা প্রসারিত হৌক এবং বর্ষাধারে সমস্ত ধৌত করিয়া নবারুণরঞ্জিত নবীন প্রভাতটিকে জাগ্রত পৃথিবীর মাথার উপরে পঞ্চাননের পঞ্চমুখের শৃঙ্গধ্বনিতে উদ্বোধিত করিয়া দিক্!

বিজনতায় ত আমাদের সব লইয়াছে! আদি পিতামহ মনু সেইখানেই গেছেন এবং মনুর শেষতম উত্তরপুরুষও সেইখানকারই যাত্রী—রামচন্দ্র সেইখানেই শরাসন ত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহার কপি-অক্ষৌহিণীর তুচ্ছতম পুচ্ছধারীটিও সেইখানেই তাহার দুর্দ্দম চাপল্য বিসর্জ্জন দিয়াছে। বিজনতার সহচরী নিদ্রা প্রতিদিন সন্ধ্যার ধূসর পালঙ্কে স্বর্ণাঞ্চল পাতিয়া দিয়া তাহার মদিরাবেশময় বাহুপাশে জনতার আবর্ত্ত হইতে আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে! তাই, এস,—সেই শ্রাবণরজনীতে ঘুমাইয়া আর যেন না উঠি। বাদলের দিনে যেমন "মেঘের অন্তরপথে অন্ধকার হ'তে অন্ধকারে" দিনটি চলিয়া যায়, এস, সেইরূপ আমরাও সেদিন নিদ্রার আড়াল ধরিয়া মৃত্যুর চিরবিজনতার মধ্যে বিলীন হইয়া যাই। এস সকলে মরি! মরি—কিন্তু—এ কি, সকলেই যে অবিশ্বাসে হাসিয়া উঠিতেছে? যেন আমি কতগুলি বৃথা গর্জ্জন করিলাম!—কেহ বা আমাকে 'হতভাগা' বলিয়া করুণা করিতেছে!—আমি কি বড় দুঃখে মরিতে চাহিতেছি? তাহা হইলে একা মরাটাই যেন বিবেচনার কাজ—আমি নিতান্ত অবিবেচক নহি। হাঃ! আমার মনের ভাবটা কেহ বুঝিতে পারিল না! তাই ত বলিতে যাইতেছিলাম 'মরি—কিন্তু'—ওইখানেই থামিয়া গেলাম। কিন্তু এবার শোন। মরি, কিন্তু আজ রাত্রে (কল্পনা কর, সেই শ্রাবণের শেষরাত্রি) আমি সেই 'দেয়াগরজনে' মুখর 'শাঙন'রজনীর রাধিকার মত সুখস্বপ্নে অধীর হইয়া বসিয়া আছি! আমি দেখিব

না বটে, কিন্তু ভাবিয়া ভাবিয়া মাতিয়া উঠিতেছি—কাল পৃথিবী কি সুন্দররূপ ধরিয়া দেখা দিবে। সমস্ত কলকারখানা, পোষ্ট-আফিস, জেলখানা, ইস্কুল, আফিস, রেলের রাস্তা সাফ হইয়া গেলে কাল প্রভাতে সমুদ্রপর্ব্বতবনমরুতুষারবিচিত্রা নবীনা কুমারী পৃথ্বী বৈকুণ্ঠধামের কোন দেবনন্দনের প্রণয়কুতূহলে আপনার নির্জ্জনবাসরে জাগরিত হইয়া উঠিয়া বসিবে! কোথায় গেল প্রকৃতির বাক্‌চেষ্টা বা মিথ্যা মুখরতা! কোথায় গেল প্রকৃতির বোধচেষ্টা বা সহস্র সিদ্ধান্তের আবর্জ্জনা! কোথায় গেল বাগীশ্বর বুদ্ধিমান্ মানুষ! পৃথিবী আবার তাহার মূঢ়তায় সতেজ, তাহার বর্ণবিলাসে স্বাধীন-সুন্দর! ধরণি, ধরণি, কোথায় তুই মাতা? কোথায় তুই লক্ষ সন্তানের পালন-বিব্রতা গম্ভীরা অপ্রগল্‌ভা কল্যাণী! আজ তুই তোর কর্ত্তব্যবিব্রত মাতৃজীবন ত্যাগ করিয়া একি প্রগল্‌ভা প্রণয়চঞ্চলার বেশে সাজিয়া বসিয়াছিস্!

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

ভ্রম।

গেছে সারা দীর্ঘদিন, গ্রীষ্ম নিদারুণ,
সন্ধ্যা দেখা দিল ধীরে প্রচ্ছায় করুণ,
তপ্ত গগনের ভালে; আছিনু বসিয়া
শ্রান্তদেহে একাকিনী, সহসা আসিয়া
শীতল পবনোচ্ছ্বাস ঘেরিল আমারে,
চমকি' কম্পিতহিয়া চাহিনু দুয়ারে
তুমি এলে ভাবি'! দেখিলাম শূন্যঘর,
বাহিরে সঘন মেঘে আঁধার অম্বর!

হতাশ।

আজিকে সান্ত্বনা আর নাহিক কোথায়
আকাশে বাতাসে কিম্বা শ্যামল ধরায়;—
বিমুখ হয়েছে আজি আপন অন্তর!
তুমি দয়া কর নাথ, করুণা-সাগর!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

আচার্য্য বসুর আর একটি আবিষ্কার।

ফোটোগ্রাফি।

ফোটোগ্রাফি একটি সম্পূর্ণ আধুনিক ব্যাপার। ঠিক এক শতাব্দী পূর্ব্বে বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ ডেভি ও ওয়েজউড্ আলোক-সাহায্যে পদার্থের নিখুঁৎ ছবি আঁকিবার সম্ভাবনা দেখিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে শত বৎসর উত্তীর্ণ না হইতে, ফোটোগ্রাফি আজকালকার একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অতি প্রয়োজনীয় বিদ্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বহুদূরবর্ত্তী গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থা ও গতিবিধি বৃহৎ দূরবীণ দিয়াও পরিদর্শন করা অসম্ভব। ফোটোগ্রাফি এই ব্যাপারে জ্যোতির্বিদ্‌গণকে দিব্যচক্ষু দান করিয়াছে। আজকাল পণ্ডিতগণ কেবল ফোটোগ্রাফির সাহায্যে অতীন্দ্রিয় গ্রহনক্ষত্রাদির ছবি তুলিয়া তাহাদের অবস্থান, গতিবিধি ও গঠনোপাদান পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতেছেন। জ্যোতিষ্ক-পরিদর্শন-ব্যাপারে স্পেক্‌ট্রোস্কোপ ও দূরবীণের ন্যায় ফোটোগ্রাফের ক্যামেরা প্রকৃতই একটা অপরিহার্য্য যন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ফোটোগ্রাফির খুব উন্নতি হইয়াছে সত্য এবং ইহার সাহায্যে জ্যোতির্বিদ্যা যে ক্রমেই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাও ঠিক, কিন্তু প্রদার্থের কোন্ বিশেষ ধর্ম্মে কেবল আলোকপাতদ্বারা চিত্র অঙ্কিত হইয়া পড়ে, তাহা আজও কেহ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। নানা পরীক্ষাদি করিয়া যে দুইএকজন আধুনিক পণ্ডিত এ সম্বন্ধে মতামত প্রচার করিয়াছেন, তাহা এত অসম্পূর্ণ যে, তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন চলে না। ভারতের গৌরব বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় প্রত্যক্ষ পরীক্ষাদি দ্বারা ফোটোগ্রাফ্‌তত্ত্বের পূর্ব্বপ্রচারিত মতবাদগুলির অসারতা দেখিতে পাইয়াছেন এবং বিষয়টীর মূল ব্যাপার কোথায়, তাহাও সম্প্রতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের আবিষ্কৃত ফোটোগ্রাফিবিদ্যা প্রাচ্য বিজ্ঞানবিদ্ আচার্য্য বসুর মৌলিক গবেষণায় পূর্ণতা লাভ করিতে চলিয়াছে।

ফোটোগ্রাফির নাম শুনিলেই, টিপয়ের উপরকার একটি কাচযুক্ত ক্ষুদ্র বাক্স ও তাহার মধ্যের সেই রাসায়নিক-পদার্থ-লেপিত কাচফলক আমাদের মনে পড়িয়া যায়। ব্যাপারটিও মোটামুটি তাই বটে। সেই ঢাকা বাক্সের সম্মুখস্থ স্থূলমধ্য কাচখণ্ডের মধ্য দিয়া বহিস্থ পদার্থের আলোকময় ছবি রাসায়নিক-পদার্থ-লেপিত কাচফলকে পড়িলেই, আলোকদ্বারা সেই কাচলিপ্ত পদার্থের কিএকটা পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। এই পরিবর্ত্তন এ সময়ে চোখে ধরা যায় না, এইজন্য সেটাকে স্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে কাচখানিকে কয়েকটি রাসায়নিক-পদার্থ-মিশ্র জলে ডুবাইবার ব্যবস্থা আছে। এই প্রক্রিয়ায় কাচের আলোক-সংযুক্ত অংশটার পরিবর্ত্তন স্থায়ী হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবিও ফুটিয়া উঠে। এই

কাচফলককে ফোটোগ্রাফির ভাষায় নিগেটিভ (negative) বলে। ফোটোগ্রাফারগণ এখন এই ছবি-অঙ্কিত কাচফলকের সাহায্যে রাসায়নিক কাগজের উপর যত-ইচ্ছা আলোছায়াময় ছবি মুদ্রিত করিয়া লইতে পারেন।

এই ত গেল সাধারণ ফোটো তুলিবার কথা। এতদ্ব্যতীত আরো কয়েকটি উপায়ে ছবি তুলিবার কথা আমরা জানি,—এগুলিতে সূর্য্যালোকসংস্পর্শের কোনই আবশ্যকতা দেখা যায় না। রন্‌জেনের বৈদ্যুতিক কিরণ এবং রাডিয়ম্ বা ইউরেনিয়মের রশ্মি কাচফলকে পড়িলে, ঠিক সূর্য্যকিরণপাতেরই কার্য্য করে। তা ছাড়া ফোটোগ্রাফের কাচে কোনপ্রকার বাহ্যিক আঘাত-অপঘাত বা বৈদ্যুতিক উত্তেজনা সুকৌশলে প্রয়োগ করিতে পারিলেও, একই ফল পাওয়া যায়।

পদার্থবিশেষের উপর আলোক বা অপর কোন বাহ্যশক্তি পতিত হইলে তদ্দ্বারা পদার্থের কি পরিবর্ত্তন ঘটে জিজ্ঞাসা করিলে, "পরিবর্ত্তনটা সম্পূর্ণ রাসায়নিক" বলিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ নিরস্ত হন। রাসায়নিক-পদার্থ-মিশ্র জলে ফোটোগ্রাফের কাচফলক ডুবাইলে, তাহার আলোকপ্রাপ্ত অংশ ও আচ্ছন্ন অংশের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ফুটিয়া উঠা যে একটা প্রত্যক্ষ রাসায়নিক ব্যাপার,তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ছবি ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব্বে কাচের যে অবস্থা থাকে, সেটাও কি রাসায়নিক ব্যাপার? এই অবস্থায় কাচলিপ্ত পদার্থে কোন বাহ্যিক পরিবর্ত্তনই ত দেখা যায় না, অথচ বহুকাল পূর্ব্বে আলোকে উন্মুক্ত থাকা হেতু কাচে যে একটু গূঢ় পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, রাসায়নিকমিশ্র জলে ডুবাইলে সেইটিকেই ত ফুটিয়া উঠিতে দেখি। পদার্থের কোন্ বিশেষ অবস্থায় সেই গূঢ় পরিবর্ত্তন হয় জিজ্ঞাসা করিলে, আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণের নিকট কোন সদুত্তরই পাওয়া যায় না। তা ছাড়া বাহ্য আঘাত ও বৈদ্যুত-তাড়নাদি দ্বারা যে গূঢ়ছবি অঙ্কিত হওয়ার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেও ইঁহাদিগকে নিরুত্তর থাকিতে দেখা যায়।

আচার্য্য বসু বলেন, ফোটোগ্রাফিক্ কাচের আলোকপাতিত অংশের যে পরিবর্ত্তনকে বৈজ্ঞানিকগণ কেবলমাত্র রাসায়নিক পরিবর্ত্তন বলিয়া আসিতেছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে একটা আণবিক পরিবর্ত্তন ব্যতীত আর কিছুই নয়। সূর্য্যালোকের উৎপাদক ঈথর-তরঙ্গ ফোটোগ্রাফের কাচের উপর পড়িয়া কাচলিপ্ত পদার্থে ধাক্কা দিতে থাকিলে, আলোকপাতিত অংশের অণুগুলি পূর্ব্বে যে-প্রকারে সজ্জিত ছিল, এখন আর সে-প্রকারে থাকিতে পারে না; কাজেই আলোকপ্রাপ্ত অংশের আণবিক-বিন্যাস অপরাংশের তুলনায় সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া দাঁড়ায়। আণবিক বিন্যাসের এই পার্থক্যটা সূক্ষ্ম অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যেও ধরা অসম্ভব। এইজন্য ফোটোগ্রাফের কাচের কোন্ অংশ আলোকে উন্মুক্ত থাকিয়া বিকৃত হইয়াছে এবং কোন্ অংশই বা অবিকৃত আছে, তাহা আমরা কেবল কাচ পরীক্ষা করিয়া ঠিক্ করিতে পারি না। কোন পদার্থের আণবিক-বিন্যাসের পরিবর্ত্তন ধরিতে হইলে, তাহার উপর অপর পদার্থের রাসায়নিক কার্য্য পরীক্ষা করা আবশ্যক। ফোটোগ্রাফের কাচ

রাসায়নিক-পদার্থ-মিশ্র জলে ডুবাইলে আমরা ইহার আলোকপ্রাপ্ত অংশটাকে যে অপর অংশ হইতে পৃথক্ হইয়া ফুটিতে দেখি, তাহা কেবল সেই ঈথরতরঙ্গজাত আণবিক বিকৃতির ফল। বাহ্য আঘাত ও বৈদ্যুতরশ্মি-সংস্পর্শ প্রভৃতি দ্বারা পদার্থের যে গূঢ় পরিবর্ত্তন হয়, তাহার কারণও বসুমহাশয়ের মতে আণবিক-বিন্যাসের বিকার ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আজকাল নূতন মতবাদের অভাব নাই। কোন একটি প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ-জিজ্ঞাসু হইয়া দাঁড়াইলে, শতশত মতবাদ দ্বারস্থ হইয়া অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির মাথা ঘুরাইয়া দেয়। কিন্তু এই মতবাদগুলির ইতিহাস খুঁজিলে প্রত্যেকটিরই মূলে নিছক্ অনুমান বা কোন-একটা আজ্‌গুবি কল্পনা ধরা পড়ে। বলা বাহুল্য, অধ্যাপক বসুর আবিষ্কারগুলি এইশ্রেণীভুক্ত নয়,—ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের নানা পণ্ডিতসম্মিলনীর সম্মুখে প্রদর্শিত পরীক্ষাদি দ্বারা তাঁহার প্রত্যেক উক্তির অভ্রান্ততা প্রতিপন্ন হইয়া গেছে এবং বৈদেশিক পণ্ডিতগণের শত কূটপ্রশ্নে অধ্যাপক বসুমহাশয়ের যুক্তিমীমাংসার অণুমাত্র স্খলন হয় নাই।

আলোক ও বৈদ্যুতরশ্মির তাড়না এবং বাহিরের আঘাতাদিতে পদার্থের যে আণবিক পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা ঠিক্ ধরিবার উপায় কি, এখন দেখা যাউক। বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের কার্য্য পরীক্ষা করিয়া আণবিক বিকার ধরিবার যে উপায়ের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা একটা নির্ভুল উপায়, সন্দেহ নাই, কিন্তু সকল স্থলে তাহার প্রয়োগ সম্ভবপর নয়। অধ্যাপক বসুমহাশয় আণবিক বিকার ধরিবার একটা অতিসহজ ও সূক্ষ্ম উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার বিশেষত্ব এই যে, এটিকে সকল স্থলেই সহজে কার্য্যোপযোগী করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। বসুমহাশয় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কোন পদার্থের এক অংশের আণবিক-বিন্যাস বাহ্যিক আঘাত-উত্তেজনায় বিকৃত হইয়া পড়িলে, পদার্থটির বিকৃত ও অবিকৃত অংশের মধ্যে একটা তড়িৎপ্রবাহ স্বতই চলাফেরা আরম্ভ করে। এই দুই অংশ তড়িন্মাপকযন্ত্র ও তারের দ্বারা সুকৌশলে সংযুক্ত করিয়া বৈদ্যুতিকপ্রবাহের পরিবর্ত্তন পরীক্ষা করিলে, পদার্থটির আণবিক-বিন্যাস কতদূর বিকৃত হইয়াছে বুঝা যায়। অধ্যাপক বসুমহাশয় ইহা ছাড়া বিদ্যুৎপরিচালনের বাধা-উৎপাদনকেও আণবিক বিকারের আর একটা লক্ষণস্বরূপ ধরিয়াছেন। মনে কর, একটি পদার্থের দুই প্রান্তে তার সংযুক্ত করিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চালানো হইতেছে। এখন যদি কোনপ্রকার বাহ্যিক আঘাত-অপঘাতে পদার্থের আণবিক-বিন্যাস ভঙ্গ করা যায়, তাহা হইলে বিদ্যুৎপ্রবাহটিকে স্পষ্ট মন্দীভূত হইতে দেখা যাইবে। উত্তেজনা-প্রাপ্তির পূর্ব্বে পদার্থের যে অণুগুলি বেশ লঘু ও সংযত অবস্থায় থাকিয়া বিদ্যুৎকে চলিবার পথ দিতেছিল, এখন তাহারাই বাহ্যিক আঘাতে স্থানে স্থানে জমাট বাঁধিয়া প্রবাহের গতিরোধ করিতে থাকিবে।

পাঠকগণের অনেকেই বোধ হয় জানেন, রসায়নবিদ্‌গণের নিকট গ্রাফাইট্, কয়লা ও হীরক, একই জিনিস। গ্রাফাইটের মধ্য

দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা কর, প্রবাহ অবাধে চলিতে থাকিবে। তার পর সেই প্রবাহকেই যদি হীরকের মধ্য দিয়া চালাও, তবে প্রবাহটিকে স্পষ্ট মন্দীভূত হইতে দেখিবে। গ্রাফাইটের অণুসকল নিয়মিত ও লঘুভাবে সজ্জিত থাকে, সেইজন্য ইহাতে বিদ্যুৎচালনার কোনও বাধা হয় না; কিন্তু হীরকের আণবিক-বিন্যাস জটিল, কাজেই ইহাদের অণুসকল প্রবাহপথে বাধা জন্মায়। এইপ্রকারে কেবল বৈদ্যুতিকপ্রবাহের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া, বসুমহাশয় নানা পদার্থের আভ্যন্তরীণ আণবিক অবস্থার পরিচয় জানিতে পারিয়াছেন, এবং এই প্রবাহপরিবর্ত্তনটা যে কেবল বিকৃত আণবিক-বিন্যাসের ফল, তাহাও তিনি পরীক্ষাসিদ্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা দেখাইয়াছেন। *

আলোক ও বৈদ্যুতিক রশ্মির সংঘাত বা বাহ্য আঘাত-উত্তেজনায় কতকগুলি পদার্থের যে আণবিক বিচলনের কথা বলা হইল, তাহা কেবল সেই সকল পদার্থেরই বিশেষ ধর্ম্ম নয়। অধ্যাপক বসু বাহ্য উত্তেজনায় পদার্থমাত্রেরই আণবিক-বিন্যাসের অল্পাধিক বিচলন দেখিতে পাইয়াছেন। আলোকরশ্মিপাতে ফোটোগ্রাফের কাচস্থিত ত্বক্‌টির আণবিক বিচলন অধিক হয়, তজ্জন্য আলোকের এই কার্য্যটি সহসা আমাদের নজরে পড়ে; কাজেই আমরা এটিকে ফোটোগ্রাফের কাচেরই একটা বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলি। একখণ্ড বাঁশের কঞ্চির দুই প্রান্ত ধরিয়া সেটাকে অল্প মোচড় দিয়া ছাড়িয়া দিলে, তাহার আকারের ক্ষণিক পরিবর্ত্তন হইয়া আবার তাহা সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আলোক বা বিদ্যুৎ রশ্মিপাতে সাধারণ পদার্থের যে আণবিক বিকার হয়, তাহাও কতকটা তদ্রূপ। যে কোন পদার্থে আলোক বা বৈদ্যুতিক রশ্মি পাত কর, তৎক্ষণাৎ তাহার আণবিক বিকার উপস্থিত হইবে; তার পর সেই রশ্মি রোধ কর, পূর্ব্বোক্ত কঞ্চির ন্যায় পদার্থটিও পূর্ব্বের আণবিক সহজ অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে। পাঠকগণ দেখিয়া থাকিবেন, মোচড়ের মাত্রা বৃদ্ধি করিলে, হাত ছাড়িয়া দিবামাত্র কঞ্চিটি পূর্ব্বাবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হয় না। বহুকাল ধনুকাকারে থাকিয়া সেটি ক্রমে সোজা হইয়া আসে। ফোটোগ্রাফের কাচত্বকের আণবিক বিকারকে এইপ্রকার সবলে মোচড়ান কঞ্চির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ঋজু অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে যেমন ইহাকে অনেকক্ষণ ধনুকাকারে বিকৃত থাকিতে দেখা যায়, ফোটোগ্রাফির কাচত্বকে আলোকময় ছবি পতিত হইলে তাহার আণবিক-বিন্যাসও সেইপ্রকার বহুকাল বিকৃত অবস্থায় থাকে এবং প্রচুর অবসর দিলে বক্র কঞ্চির ন্যায় কাচও যথাসময়ে স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হয়। † কঞ্চিটিকে চিরকাল

* অবিমিশ্র ফস্‌ফরসের যে দু'টি রূপান্তর দেখা যায়, তাহাও বিভিন্ন আণবিক-বিন্যাসের ফল।

† এ পর্য্যন্ত আমরা সকলেই জানিতাম, ফোটোগ্রাফের কাচের উপর একবার আলোকময় ছবি ফেলিলে, চিত্রটি কাচফলকে চির-অঙ্কিত হইয়া যায়, এবং যে কোন সময়ে সেটিকে নির্দ্দিষ্ট রাসায়নিক-পদার্থমিশ্র জলে ডুবাইলে পূর্ব্বের ছবি ফুটিয়া উঠে। অধ্যাপক বসুমহাশয়ের আবিষ্কার দ্বারা আমাদের এই বিশ্বাসের অমূলকতা প্রতিপন্ন হইয়া গেছে! ইনি বলেন,—কাচখণ্ডের বিকৃত অংশ প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য প্রচুর সময় দিলে, তাহাতে আর আলোকপাতের কোন লক্ষণই দেখা যায় না। এখন কাচটিকে শতবার সেই রাসায়নিকমিশ্র-জলে ডুবাও, ছবি কোনক্রমেই ফুটিবে না। অধ্যাপক বসুমহাশয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার এই সকল আবিষ্কারের সার্থকতা দেখাইয়াছেন।

ধনুকাকারে রাখিতে হইলে যেপ্রকার কৃত্রিম উপায়ের আবশ্যক হয়,—কাচপাতিত অদৃশ্য ছবিটি অণুর স্বাভাবিক অবস্থার পুনঃপ্রাপ্তির সহিত যাহাতে লোপ পাইয়া না যায়, তজ্জন্য কাচফলকটিকেও সেইপ্রকার রাসায়নিক-পদার্থ-মিশ্র জলে ডুবান আবশ্যক। এই উপায়ে স্থায়িভাবপ্রাপ্ত বক্র-কঞ্চির ন্যায়, কাচেরও আণবিক বিকৃতি চিরস্থায়ী হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবিখানিও ফুটিয়া উঠে।

পাঠকগণ বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন, মৃদু চাপ বা আঘাতাদি দ্বারা কোন জিনিসের আকার বিকৃত করিতে থাকিলে, প্রথমে সেটি সহজে এবং অল্পকালমধ্যে পূর্ব্বের আকার পুনঃপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু পরে চাপের মাত্রাবৃদ্ধি করিলে স্বাভাবিক অবস্থায় আসিতে তাহার অনেকটা সময় আবশ্যক হইয়া পড়ে। তার পরও আঘাত বা চাপ বৃদ্ধি কর, সেটা আর পূর্ব্বের অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে না,—বিকৃত অবস্থাতেই থাকিয়া যাইবে। একটা লোহার শিক্ লইয়া পরীক্ষা করিলে কথাটা সহজে বুঝা যাইবে। শিকের দুইপ্রান্ত ধরিয়া অল্প মোচড় দাও, সেটির আকার বিকৃত হইয়া পড়িবে এবং মোচড় রহিত করিবামাত্র স্প্রিংয়ের মত লাফাইয়া পূর্ব্বের আকার গ্রহণ করিবে। কিন্তু মোচড়ের বল ক্রমে বৃদ্ধি করিতে থাকিলে সেটি এত অল্পকালমধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারিবে না, এবং শেষে মোচড়ের মাত্রা অত্যন্ত বাড়াইলে চিরকালের জন্য সেটি বক্রাকারেই থাকিয়া যাইবে। এখন শিক্‌টিকে প্রকৃতিস্থ করিতে হইলে অপর বাহ্যশক্তিপ্রয়োগ আবশ্যক হইয়া পড়িবে।

লৌহশিকের ন্যায় পদার্থমাত্রেরই স্বাভাবিক-অবস্থা-পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টার একএকটা সীমা আছে। সেই চেষ্টার সীমা অতিক্রম করিয়া পদার্থের আকার বিকৃত করিলে, বিকার চিরস্থায়ী হইয়া যায়। অধ্যাপক বসুমহাশয় দেখিয়াছেন,—আলোকপাত বা বৈদ্যুতিক রশ্মি প্রভৃতি দ্বারা পদার্থের যে আণবিক বিকার হয়, তাহার অবস্থাও কতকটা তদ্রূপ। আণবিক বিকার প্রচুর হইলে, চরম চেষ্টা দ্বারাও কোন জিনিস তাহার স্বাভাবিক আণবিক-বিন্যাস আর ফিরিয়া পায় না। স্থায়িভাবে বক্র শিক্‌টিকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য যেমন তাপ বা বাহ্যবলপ্রয়োগের আবশ্যকতা দেখা যায়, স্বাভাবিক আণবিক অবস্থায় ফিরাইতে, ইহাতেও সেইপ্রকার তাপাদিপ্রদানের দরকার হইয়া পড়ে। একথও সাধারণ কাচের উপর একটি বৃত্ত বা চতুষ্কোণাকার ধাতুময় জিনিস রাখিয়া, সেটিকে বিদ্যুৎ-যুক্ত কর। ধাতু-অধিকৃত-স্থানস্থিত কাচের আণবিক বিন্যাস বিদ্যুৎপ্রভাবে বিকৃত হইয়া যাইবে। চক্ষু বা কোন যন্ত্রের সাহায্যে এই বিকার ধরা পড়িবে না বটে, কিন্তু কাচফলকটিকে জলীয় বাষ্পে উন্মুক্ত রাখিলে কাচের বিকৃত অংশে বাষ্প জমিয়া সেই ধাতবপদার্থের ছবি ফুটাইয়া তুলিবে। কাচের এই অদ্ভুত ধর্ম্মের স্থায়িত্ব ইহার আণবিক বিকারের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। প্রকৃতিস্থ হইবার নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতাকে অতিক্রম করিয়া আণবিক-বিন্যাস ভঙ্গ হইয়া থাকিলে, কাচফলকটি চিরকালই সেই অবস্থায় থাকিয়া যাইবে, তাপপ্রয়োগাদি বাহ্যশক্তির সাহায্য ব্যতীত সে কিছুতেই প্রকৃতিস্থ

হইতে পারিবে না। কিন্তু আণবিক-বিন্যাসের অল্প বিচলন হইয়া থাকিলে অল্পকালমধ্যেই সেটি পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

ধাতুচূর্ণের কোন দুই অংশে তার সংযুক্ত রাখিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালন করিলে, প্রবাহ অবাধে চলিতে থাকে। সেই চূর্ণে এখন বৈদ্যুতিক রশ্মিপাত কর, পূর্ব্বের প্রবল প্রবাহটিকে স্পষ্ট পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিবে। গুঁড়াগুলিকে একটু ঝাঁকাইয়া বা তাপ দিয়া লও; এখন আর ইহাতে প্রবাহ-গমনাগমনের কোন বাধাই দেখিবে না। ধাতুচূর্ণের এই বিশেষ ধর্ম্মটির উপরেই আজ-কালকার তারহীন টেলিগ্রাফির মূলভিত্তি প্রোথিত। কিন্তু বৈদ্যুতিকরশ্মিপাতে কি প্রকারে ধাতুচূর্ণের প্রবাহ-পরিচালন-ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি হয়, এপর্য্যন্ত তাহা কেহই ঠিক্ বলিতে পারেন নাই। অধ্যাপক বসুমহাশয় ইহার প্রকৃত ব্যাপার আবিষ্কার করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছেন। বসুমহাশয় দেখাইয়াছেন,—বৈদ্যুতিক রশ্মি দ্বারা ধাতু-চূর্ণের আণবিক-বিন্যাস বিকৃত হইয়া যায়, এজন্য তাহার মধ্য দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহবেগ পরিবর্ত্তিত হয়; কিন্তু গুঁড়াটা একটু ঝাঁকা-ইয়া লইলে বা গরম করিয়া রাখিলে, তাহার আণবিক অবস্থাটা স্বভাবে ফিরিয়া আসিবার সুযোগ পায়, কাজেই পূর্ব্বপ্রকারে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলিতে থাকে। অধ্যাপক বসুমহা-শয়ের মতে আলোকদ্বারা ফোটোগ্রাফের কাচে ছবি-অঙ্কন, এবং বৈদ্যুতিক রশ্মিদ্বারা ধাতুচূর্ণের প্রবাহপরিচালনশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি একই প্রাকৃতিক ব্যাপার। ফোটোগ্রাফি ও মার্কনির তারহীন টেলিগ্রাফি মূলে এক।

পাঠকগণ বোধ হয় জানেন, আলোকের পরিমাণ ও আলোকপ্রদানের কালের উপর ফোটোগ্রাফছবির ভালমন্দ অনেকটাই নির্ভর করে। ফোটোগ্রাফের যে কাচে যত নিয়মিত আলোক পড়ে এবং যেখানি যত নিয়মিত কাল ধরিয়া আলোকে উন্মুক্ত থাকে, তাহার ছবিও ততই সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিক হইয়া অঙ্কিত হয়। অস্থির আলোকে ছবি অস্পষ্ট হয়; তা' ছাড়া আলোকটা কখন ক্ষীণ এবং কখন উজ্জ্বল হইয়া আসিলেও ছবি ভাল উঠে না। আচার্য্য বসুমহাশয় বহু পরীক্ষাদি দ্বারা ফোটো-গ্রাফের কাচের উপর অস্থির আলোকের কার্য্যের অনেক রহস্য আবিষ্কার করিয়া-ছেন। এ আবিষ্কারটি কি, এখন দেখা যাউক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আলোকরশ্মি কাচের কোন অংশে পড়িলে, তদ্দ্বারা সেই স্থানের আণবিক-বিন্যাস ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু আলোকপাত হঠাৎ বন্ধ করিবা-মাত্র, সেই ভঙ্গ আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পায় না, বরং অণুসকল প্রাকৃতিক অবস্থার পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা আরম্ভ করে। এই সময়ে সেই একই অংশে আবার আলোক-রশ্মি পতিত হইলে, আণবিক-বিন্যাসের নূতন বিচলন আরম্ভ হয়। এই নূতন বিচলনটা যদি পূর্ব্বেকার বিচলনের দিকেই হয়, তবে আলোকপাতরাহিত্য দ্বারা স্বাভাবিক-অবস্থা-পুনঃপ্রাপ্তির জন্য অণুসকলের যে একটা গতি হইয়াছিল, সেটি নষ্ট হইয়া আণবিক-বিন্যাস বিষম জটিল হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবিও অস্পষ্ট হইয়া উঠে। নূতন-আলোক-পাত-জাত অণুর বিচলন পূর্ব্ববিচলনের প্রতিকূলে হইলেও ছবি অস্পষ্ট হয়। কারণ

এখানে নূতন বিচলনটা অণুসকলের স্বাভাবিক-অবস্থা-পুনঃপ্রাপ্তিরই সহায়তা করে; কাজেই যে আণবিক বিকার দ্বারা পূর্ব্বে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, সেটা আর এখন অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না।

একটা ছোটখাট উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা। রজ্জুবদ্ধ কোন একটি ভারিবস্তুর পরিদোলনকে আলোক-পাতজনিত অণুর বিচলনের সমান ধরা যাউক। এখানে সেই আবদ্ধ জিনিসটার চরম ঊর্দ্ধে উঠার পর নীচের দিকে নামিবার চেষ্টা, যেন আলোকপাত-রাহিত্য-হেতু অণুর স্বাভাবিক-অবস্থা-পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টার সমান হইল। এখন জিনিসটা দুলিতে দুলিতে চরম ঊর্দ্ধে উঠিয়া নামিতে আরম্ভ করিলে যদি সেটাকে আরো উপরে উঠাইবার বা নীচে নামাইবার জন্য একটা ধাক্কা দেওয়া যায়, তাহা হইলে জিনি-সটা যেমন উপরে উঠিতে বা নীচে নামিতে না পারিয়া এক বিকৃতগতিতে চলিতে থাকে, আলোক রহিত হওয়ার পর নূতন আলোক-পাত দ্বারা ফোটোগ্রাফ্‌কাচের অণুর যে বিচলন হয়, তাহাও কতকটা তদ্রূপ। পূর্ব্বের আলোক রহিত হইবামাত্র অণুসকল প্রকৃ-তিস্থ হইবার জন্য আলোকপাতজাত বিকৃত বিন্যাসের বিপরীতে সঞ্চলন আরম্ভ করে। এখন পুনরায় আলোকপাত হইবামাত্র একটা নূতন গতি আসিয়া ইহাতে যোগ দেয়, কাজেই সমবেত গতিতে কোন নিয়ম রক্ষিত না হওয়ায় আণবিক-বিন্যাসে গোলযোগ উপ-স্থিত হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবিও অস্পষ্ট অঙ্কিত হইয়া যায়। স্থির ও সমভাবে আগত আলোকপাত দ্বারা আণবিক বিচলন একই দিকে নিয়মিতভাবে হইয়া থাকে, কাজেই সেস্থলে আণবিক-বিন্যাসের কোন গোলযোগই হইতে পারে না এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবিও সুস্পষ্ট অঙ্কিত হইয়া পড়ে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, আলোকময় ছবির অবিকল চিত্র উঠাইয়া রাখিবার শক্তি যে কেবল ফোটোগ্রাফের কাচলিপ্ত পদার্থ-গুলিরই আছে, তাহা নয়। এই শক্তিটা জড়পদার্থমাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি,—জগ-তের পদার্থমাত্রেরই অণুসকল আলোক বা বিদ্যুৎশক্তির সংযোগে বিচলিত হইয়া থাকে; ফোটোগ্রাফের কাচস্থিত পদার্থের অণুসকলের বিচলন অধিক এবং চিত্রাঙ্কনপক্ষে উপযোগী, তাই সেটা হঠাৎ আমাদের নজরে পড়ে, এবং তাহাকে আমরা কেবল সেই সকল নির্দ্দিষ্ট পদার্থেরই বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়া ফেলি।

নানা বিচিত্র ও জটিল ঘটনার মধ্যে একটা সহজ ও প্রত্যক্ষ নিয়ম দেখানো, আচার্য্য বসুমহাশয়ের আবিষ্কারগুলির একটা বিশেষ ধর্ম্ম। জড়জগতের ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রত্যেক প্রাকৃতিক ব্যাপারের মধ্যে যে একটা বৃহৎ নিয়ম ও শৃঙ্খলা বর্ত্তমান আছে, তাহার মহিমা অধ্যাপকমহাশয়ের প্রত্যেক আবিষ্কার দ্বারাই প্রচারিত হইয়াছে। ফোটোগ্রাফিসম্বন্ধীয় আবিষ্কারেও তাঁহার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলির সেই অনন্যসুলভ বিশেষত্বটি পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইয়াছে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

বেলুচি-মুলুক।

পণ্যযাত্রী, পথিক ও পরিব্রাজকদিগের মধ্যে কেহ কেহ পেশাওয়ার অতিক্রম করিয়া আফ্‌গানপ্রদেশে গমন করে এবং তথা হইতে বেলুচিস্থানে পৌছিয়া থাকে; আবার কেহ কেহ বা করাচি-প্রান্তর অতিক্রম করিয়া সুপ্রসিদ্ধ সোলেমান-পর্ব্বতের উপর দিয়া সেখানে যায়। আফগানিস্থানের পথে অভ্রভেদী হিন্দুকুশ-গিরি অতিক্রম করিতে হয়। যে দিক্ দিয়াই হউক, পথিককে ভীষণ হইতে ভীষণতর দুইটি "পার্ব্বত্য-সন্ধি"র (Mountainous Pass) ভিতর দিয়া যাইতেই হইবে। ইহাদের একটির নাম গুম্‌আল্-পাস্ এবং অপরটি বিখ্যাত বোলান্-পাস্ (Pass)। আমি যখন বেলুচি-মুলুকে যাই, তখন সে দিকে রেল্‌ওয়ে-লাইন্ ছিল না; এখন কিন্তু সিন্দ্-পিশিন রেলওয়ে বোলান্-পাস্ ভেদ করিয়া গুল্-এ-ইশ্‌তান্ ছাড়াইয়া চমন্ (Chaman) পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। এখনও আর দেড়-ক্রোশ-পরিমিত রেলপথ পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া প্রস্তুত করিতে পারিলে, বেলুচিস্থানে যাতায়াত আরও সহজে সম্পন্ন হইতে পারিবে। বোলান্-পাস্ যে কি ভয়ানক, স্বচক্ষে যাঁহারা দেখেন নাই, তাঁহাদিগকে সে কথা বুঝাইয়া দেওয়া সুকঠিন। সে ভীষণ পথে কেবল সাহসী মুসলমানেরাই গতায়াত করিতে পারে। গুম্‌আল্-পাসের ভিতর দিয়া বহুসংখ্য পণ্যযাত্রী ভারতবর্ষের দিকে নানাবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে আইসে। এই সন্ধি-পথের পার্শ্বে জোব্ উপত্যকা (Zhob Valley)। জোবাইগণ এই পথের প্রহরী ও রক্ষাকর্ত্তা; কিন্তু সুবিধা পাইলে, আরব্যের বেদুইদিগের ন্যায়, ইহারা পথিকবর্গকে নিহত বা হৃতসর্ব্বস্ব করিতে কুণ্ঠিত হয় না। বোলান্-পাসের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৫ক্রোশ, উচ্চতা (চড়াই) প্রায় ছয়হাজার ফিট্। এই পার্ব্বত্য-সন্ধির প্রায় সমুদয় অংশে "বোলান্"নামক নদ প্রবাহিত, সময়ে সময়ে ইহাতে ভয়ানক বন্যা হইয়া থাকে। সোলেমান-গিরিরাজের যে অংশ সিয়া-কো-(কৃষ্ণপর্ব্বত)-নামে প্রখ্যাত, সেইখান হইতেই বোলান্-পাসের উৎপত্তি। এই পর্ব্বতমালা করাচির পশ্চিম প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে কোঃ-এ-বাবা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। প্রধান পর্ব্বতের উচ্চতা প্রায় ২৩হাজার ফিট্।

বেলুচিস্থানের পুরাকালীন ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন—ইহার প্রাচীন নরপতিবর্গের বিবরণ অতীতের তিমিরগর্ভে নিহিত।

পুরাকালে এই সকল প্রদেশ হিন্দুরাজার শাসনভুক্ত ছিল। আজিও আফ্‌গানিস্থানের পার্শ্বদেশে আফ্রিদি, কাফির, বারহুই প্রভৃতি জাতির মধ্যে হিন্দুত্বের লক্ষণ সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বেলুচিস্থানের দৈর্ঘ্য প্রায় তিনশত ক্রোশ এবং বিস্তার দুইশত ক্রোশের কিছু কম।

বেলুচি-মুলুকে অনেক নদনদী আছে, সময়ে সময়ে সেগুলিতে ভয়ানক বন্যা হয়। পশ্চিমদিকে মরুভূমিসকল গ্রীষ্মকালে এরূপ

উত্তপ্ত হয় যে, তাহা অতিক্রম করা অসম্ভব হইয়া উঠে। পবনবেগোত্থিত বালুকায় চারিদিক্ আচ্ছন্ন হইয়া পথিকের শ্বাসরোধের উপক্রম হয়, কালগ্রাসেও অনেকে পতিত হইতে থাকে। এদেশে যেমন অসহ্য গ্রীষ্ম, শীতও তেমনি হাড়ভাঙা। এইজন্যই বোধ হয় এখান এরূপ স্বাস্থ্যপ্রদ। ভারতবর্ষের সকলপ্রকার শস্য ও শাক্‌সব্‌জি এখানে পাওয়া যায়। এখানকার গন্দাবা-নামক স্থানটি অত্যন্ত উর্ব্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ। এদেশে শার্দ্দুল ও হায়েনার যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব। এখানকার শুষ্কফল, পশম, বনাত ও কম্বল সর্ব্বত্রই সমাদৃত।

সমগ্র বেলুচিস্থানের লোকসংখ্যা প্রায় ৫লক্ষ। অধিবাসীরা দেখিতে সুন্দর, বলবান্, সাহসী এবং দীর্ঘাকার। এদেশে দুধ ভারি সস্তা; লঙ্কা, মরীচ, পলাণ্ডু ও লশুনের ব্যবহারটা খুবই বেশি; সুরাপানের প্রথা একেবারেই নাই। এখানের অধিকাংশ গৃহই মাটির। এদেশে কৃষ্ণকায় উষ্ট্রের চর্ম্মে একপ্রকার তাঁবু তৈয়ারি হইয়া থাকে, সেগুলি অনেক গৃহস্থের গৃহের কার্য্য করে। দ্রুতগামী একটি উষ্ট্র, প্রচুর সুস্বাদু জল, খানকয়েক রোটি ও গোটাকত খেজুর দিয়া বেলুচিদিগকে যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই পাঠাইতে পার। ইহারা সুস্থ, সবল, কর্ম্মঠ, কষ্টসহিষ্ণু, শ্রমশীল ও অতিথিপ্রিয়। অতিথিকে ইহারা যথেষ্ট খাতিরযত্ন করিয়া থাকে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা সঙ্গীতপ্রিয় এবং বালকদের তীর-ধনু চালাইবার পটুতা প্রশংসনীয়। এদেশে এখনও ক্রীতদাসের ব্যবসা প্রচলিত আছে। স্ত্রীলোকেরা রূপবতী এবং তাহাদের পরিচ্ছদও সভ্যজনোচিত। অলঙ্কারপ্রিয়তা এদেশে ততটা প্রসরলাভ করিতে পারে নাই। তবে রমণীকুল ফুলের বড় পক্ষপাতী। পর্ব্বতের বিকট বন্ধুরতার ভিতরে—মরুভূমির অগ্নিদীপ্ত রুদ্রতার মধ্যে একটি ফুল উপহার পাইলে, সেই ফুলটি লইয়া উপহারদাতার প্রতি ইহারা হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার উৎস ছুটাইয়া দেয়। এখানে তরবারির বড় আদর। এজন্য তরবারি-পরিচালনে পুরুষেরা যেমন দক্ষ, বালক-বালিকা ও স্ত্রীলোকেরাও তেমনি নিপুণ। লেখাপড়ায় ইহাদের তেমন মনোযোগ দেখা যায় না। ইহারা বলিয়া থাকে, "একদিকে সমগ্র বোখারা বা বোগ্‌দাদের পাণ্ডিত্যে একাধিকার, আর একদিকে তরবারিবিদ্যায় আশানুরূপ দক্ষতা, উভয়ের মধ্যে শেষোক্তকেই আমরা অধিকতর শ্লাঘা ও সম্মানের বলিয়া মনে করি।"

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে বেলুচিরাজ মোরাব খাঁর সহিত বৃটিশরাজের সর্ব্বপ্রথম কলহ উপস্থিত হয়। তার পর ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্র অনুসারে ইংরেজ-সরকার বেলুচিস্থানের অধীশ্বরকে প্রতিবৎসর ৫০হাজার টাকা উপঢৌকন দিতে থাকেন। ১৮৭৬ অব্দের নূতন সন্ধিপত্রে ওই ৫০হাজারের পরিমাণ বাড়িয়া ১লক্ষ হইয়া উঠে, সেই ১লক্ষ আবার ১৮৮২ অব্দে ১লক্ষ ৩০হাজারে পরিণত হয়। বেলুচিস্থান রুশভল্লুকের ভারতপ্রবেশের একটি প্রধান পথ। সুতরাং ইশ্‌লামীয় জলবাহীর (ভিস্তির) চর্ম্মনির্ম্মিত জলাধারের (মোশকের) ন্যায়, উপঢৌকনের পরিমাণটা ক্রমশ বাড়িতে বাড়িতে ১৮৯৩ অব্দ হইতে ১লক্ষ ৫৫হাজারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বেলুচি-মুলুকের নরপতির শিক্ষিত সেনা ১৩শত, কিন্তু আবশ্যক হইলে একদিনেই তিনি ১২হাজার সৈন্য সমবেত করিতে পারেন। এখানে দেশশুদ্ধই বীরপুরুষ। স্বধর্ম্ম বা স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষার কথা উঠিলে প্রাণ দিতে লক্ষ লক্ষ নরনারী দৌড়িয়া আইসে। বেলুচিস্থানের বাদ্‌শাহের বার্ষিক আয় পাঁচলক্ষ টাকার অধিক নহে। আমাদের দেশের একজন বড় জমিদারের অপেক্ষাও বেলুচি-মুলুকের খাঁসাহেবের আয় অল্প, কিন্তু তবুও পুরাকাল হইতে তিনি স্বাধীন। খেলাতনগরে নরপতি বাস করেন, ইহাই বেলুচিস্থানের রাজধানী। সহরের চারিধারে প্রাচীর; দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে খাঁসাহেবের প্রাসাদ। য়ুরোপীয় লেখকেরা অনেকে মনে করেন, এক সময়ে হিন্দুরাজগণ এই প্রাসাদে অবস্থান করিয়া ভারতপ্রান্ত শাসন ও রক্ষা করিতেন। "The Palace is an imposing and antique structure, and probably the oldest building in Beluchistan, owing to its foundation by the Hindu kings who preceded the present Mahomedan dynasty."—*The Statesman's Year Book* for 1901, p. 167. খেলাতনগরে প্রায় ৩হাজার গৃহ আছে। বাড়ীগুলি অর্দ্ধদগ্ধ ইষ্টকে "গারা"র গাঁথুনি দ্বারা নির্ম্মিত। তাহার উপরে চূণকাম করাইবার প্রথাটা সর্ব্বত্র প্রচলিত। বাজারে সচরাচর সকলপ্রকার ব্যবহার্য্য সামগ্রী এবং নানান্তর ফলের সরবরাহ দেখিতে পাওয়া যায়। নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের প্রস্রবণ হইতে সুন্দর, শীতল, সুনির্ম্মল সলিলস্রোত প্রবাহিত হইয়া সহরের সর্ব্বত্র অধিবাসীদিগকে পানীয় জলের অভাব অনুভব করিতে দেয় না।

বেলুচিস্থানের কিয়দংশ এক্ষণে ইংরেজ গবর্মেণ্টের অধিকারভুক্ত। রুষীয় সম্রাটের আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করাই তাঁহাদের এরূপ অধিকারস্থাপনের উদ্দেশ্য। খোদা দাদখাঁর নামে যখন নরহত্যার অভিযোগ উপস্থিত হয়, বেলুচি-মুলুকের কিয়দংশ সেই সময়েই ইংরেজের শাসনাধীনে আসিয়া পড়ে।

বেলুচিস্থানের পার্শ্বস্থ কোয়েটা, সিবি, পিশিন্ এবং ছোট ছোট আরও দুই-একটি গ্রাম-নগর স্বাধীন-বেলুচিরাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক্ষণে বৃটিশ্-বেলুচিস্থান নামে পরিচিত হইয়াছে। কোয়েটা-নগরীতে ইংরেজের সেনাগণ ও প্রধান কর্ম্মচারী অবস্থান করেন। বৃটিশ্-বেলুচিস্থানে লুশ্‌বয়্‌লা নামে প্রকাণ্ড এক মুসলমানী জমিদারী আছে। ইহার জমিদারের নাম জাম্-আলি-খাঁ বাহাদুর। ইংরেজেরা 'সার' ও 'নাইট্' উপাধি দিয়া ইঁহাকে হস্তগত করিয়া রাখিয়াছেন। বৃটিশ্-বেলুচিস্থানের লোকসংখ্যা প্রায় দুইলক্ষ।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

সার সত্যের আলোচনা।

আছে এবং আছি'র অধিকারভেদ।

বিগত বারের প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছিলাম এই বলিয়া :—

"উপরে যে-ভাবের আছি এবং আছে'র প্রমাণ দেখানো হইল, তাহা কেবল এখন আছি এবং এখন আছে মাত্র; সুতরাং তাহা কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন। এতদ্ব্যতীত ঐ দুই পরিচ্ছিন্ন আছি এবং আছে'র সন্ধিস্থানে সমস্ত লইয়া যে এক আছি বিরাজমান, তাহাই সত্য-জগতের প্রবেশদ্বার।"

এখন দ্রষ্টব্য এই যে, সমস্তের আদি-অন্ত-মধ্য লইয়া সেই-যে সর্ব্বমূলাধার আমি আছি, তিনি সাধনের পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ—সকল বিষয়েই সিদ্ধ—সকল প্রকারেই সিদ্ধ—পরাকাষ্ঠা-সিদ্ধ—স্বতঃসিদ্ধ। পক্ষান্তরে, কাল-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন এই যে, আমি আছি, ইহাকে ক্রমাগতই সাধন দ্বারা বর্ত্তমান থাকিতে হইতেছে;—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বায়ু সেবন করিয়া, প্রহরে প্রহরে অন্নপানীয় সেবন করিয়া, নিরন্তর আলোক এবং উত্তাপ সেবন করিয়া প্রাণধারণ করিতে হইতেছে; অষ্টপ্রহর চলা-ফেরা বলা-কহা দেখা-শোনা করিয়া মনের পাথেয়-সম্বল যোগাইতে হইতেছে; বিচার-বিবেচনা এবং যুক্তি-পরিচালনা করিয়া বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিতে হইতেছে। এ আছি সকল বিষয়েই আছে'র নিকটে ঋণী;—আছে'র খাইয়া মানুষ, আছে'র কাঁধে ভর দিয়া দাঁড়ায়, আছে'র হাত ধরিয়া চলা-ফেরা করে। আছে'র বলেই আছি—অথচ যেন আপনার বলে আছি, এইরূপ একটা নাট্যাভিনয় চলিতেছে। দৈবাৎ কখনো রঙ্গভূমি হইতে আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইয়া, আমরা যখন আমাদের শরীরের বিসদৃশ সাজসজ্জার প্রতি চক্ষু নিবিষ্ট করি, তখন আমাদের চমক লাগে। ক্ষণপরে আবার যখন অধিকারীর ধমকের চোটে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া স্বাধীনতার উচ্চ-শিখরে উন্নত-মস্তকে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াই, তখন আমাদের মনে হয় যে, আছিই গোড়ার কথা—আছে তাহার একটা লেজুড় মাত্র; পক্ষান্তরে, যখন আমরা দৈব-দুর্ব্বিপাকে আক্রান্ত হইয়া স্বাধীনতার প্রতি আস্থাহীন হই, তখন আমাদের মনে হয় যে, আছেই গোড়ার কথা, আছি তাহার একটা লেজুড় মাত্র।

যাহাই হউক্ না কেন—আমরা স্বাধীনতায় ভর করি তো! কিসের জোরে ভর করি—সেইটিই এখন বিবেচ্য। শুধু কি কেবল গায়ের জোরে স্বাধীনতায় ভর করি? অথবা আর-কোনো-কিছু'র জোরে?

এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া যখন আমরা অন্তরে-বাহিরে চারিদিকে চাহিয়া দেখি, তখন আমরা দুই ক্ষেত্রে আপনার দুই-প্রকার বিপরীত ভাব দেখিতে পাই; বুদ্ধি-ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেখিতে পাই এবং ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে পরাধীনতা দেখিতে পাই।

বুদ্ধি-ক্ষেত্রে আছি'র স্ফূর্ত্তি।

ফরাসীস্ তত্ত্ববিৎ দে-কর্ত্তা'র উদীরিত

"Cogito (চিন্তয়ামি) ergo (অতঃ) sum (অস্মি)" "ভাবিতেছি অতএব আছি" আজিকের কালের বিদ্যার বাজারে সকলেরই জানা কথা। পরন্তু, আমাদের স্বদেশের পঞ্চদশী-গ্রন্থে, এবং সাংখ্যসার-নামক একখানি চটি সংস্কৃত পুস্তকে অবিকল উহারই দুইটি জুড়ি-বচন যে স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে—এ রহস্যটি অনেকেই জানেন না। দে-কর্ত্তা বলিয়াছেন "আমি আপন অস্তিত্বে সংশয় করিতে পারি না, কেন না, সংশয় করিলেই সংশয়কর্ত্তা যে আমি আপনি, তাহা সপ্রমাণ হইয়া সংশয় তৎক্ষণাৎ ঘুচিয়া যায়। ইহারই একটি জুড়ি-বাঁচা'র কথা এই যে, আমার "জিহ্বা নাই" এরূপ বাক্য আমি বলিতে পারি না; কেন না, "জিহ্বা নাই" বলিলেই প্রমাণ হয় যে, আমি জিহ্বা দ্বারা ঐ কথাটি উচ্চারণ করিলাম। পঞ্চদশীর গ্রন্থকার তাই বলেন যে—

জিহ্বা মেঽস্তি ন বেত্যুক্তির্জ্জাড্যে কেবলং যথা।
ন বুধ্যতে ময়া বোধো বোদ্ধব্য ইতি তাদৃশী॥

ইহার অর্থ এই যে—"আমার জিহ্বা আছে কি নাই" এ কথা যেমন হাস্যাস্পদ, "আমার জ্ঞান আছে কি না তাহা আমি জানি না" এ কথাও তদ্বৎ। পুনশ্চ দে-কর্ত্তা বলেন—"আমি চিন্তা করিতেছি" এইরূপ-জ্ঞানের বলেই আমার অস্তিত্ব সপ্রমাণ। সাংখ্যসার-প্রণেতা বলেন—

"দ্রষ্টা সামান্যতঃ সিদ্ধো জানেঽহমিতি ধীবলাৎ।"

ইহার অর্থ এই যে—"আমি জানিতেছি" এইরূপ বুদ্ধিবলে দ্রষ্টার অস্তিত্ব সাধারণত সপ্রমাণ। দে-কর্ত্তা বলেন—"ভাবিতেছি, অতএব আছি," সাংখ্যসার-প্রণেতা বলেন—"জানিতেছি, অতএব আছি"; ভাবার্থ একই।

প্রকৃত কথা এই যে, অতএবের সাঁড়াষী দিয়া 'ভাবিতেছি' হইতে 'আছি' টানিয়া বাহির করা যুক্তির একটা ভড়ং বই আর কিছুই না। যদি ভাবিতেছি এবং আছি'র মাঝখানে একটা রাস্তা-বন্দি করা নিতান্তই প্রয়োজন হয়, তবে তাহা একটিমাত্র অতএবের সোজা রাস্তা বাঁধিয়া দেওয়ার কর্ম্ম নহে; একটির জায়গায় উপর্য্যুপরি তিনটি অতএবের সিঁড়ি বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক :—স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক যে—

(১) ভাবনা জ্ঞানক্রিয়া,

অতএব

"ভাবিতেছি" বলিলেই বুঝায় যে, জ্ঞান কার্য্য করিতেছে।

(২) কার্য্য-মাত্রই শক্তিসাধ্য,

অতএব

"জ্ঞান কার্য্য করিতেছে" বলিলেই বুঝায় যে, তাহার মূলে ধীশক্তি আছে।

(৩) শক্তিমাত্রই সত্তাশ্রিত,

অতএব

"ধীশক্তি আছে" বলিলেই বুঝায় যে, ধীমান্ পুরুষ আছে—আমি আছি।

তুমি হয় তো বলিবে যে, "তোমার তিন অতএব স্যাক্‌রার ঠুক্‌ঠাক্, দে-কর্ত্তার এক অতএব কামারের এক ঘা:—এক অতএবেই বস্ আছে—তিন অতএব বহ্বাড়ম্বর!" ইহার উত্তর এই যে, কামারের এক ঘা খাটাইবার উপযুক্ত স্থান অনেক আছে—

দার্শনিক তত্ত্বের কাঁচা সোণার উপরে কেন এ দৌরাত্ম্য! ভূয়োদর্শনের লৌহপিণ্ডের উপরে অনুমান-হাতুড়ির এক ঘা প্রয়োগ করিয়া জগৎ-জোড়া বিশাল তত্ত্বসকল উদ্ভাবন করুন্—তাহাতে বারণ নাই। পরন্তু দার্শনিক তত্ত্বের হার গাঁথিতে হইলে সূক্ষ্ম যুক্তিসূত্রের—(অতএব-পরম্পরা'র) সঞ্চালন ব্যতিরেকে আর-কোনো উপায়ে তাহা সম্ভাবনীয় নহে—ইহা জানা উচিত। কথাটা হ'চ্চে এই :—

"আমি চিন্তা করিতেছি" বলিলে যেমন বুঝায় যে, আমিই চিন্তা করিতেছি সুতরাং আমি আছি; "আমি কার্য্য করিতেছি" বলিলেও তেমনি বুঝায় যে, আমিই কার্য্য করিতেছি সুতরাং আমি আছি; তা যদি বুঝায়—তবে কেন দে-কর্ত্তা "কার্য্য করিতেছি অতএব আছি" না বলিয়া "চিন্তা করিতেছি অতএব আছি" বলিলেন। আমি যে-কোনো কার্য্য করি, তাহাতেই যদি আমার অস্তিত্ব যথেষ্ট সপ্রমাণ হয়, তবে আমার আর-আর কার্য্যের মধ্য হইতে চিন্তা-কার্য্যটিকে বাছিয়া লইয়া সেই কার্য্যটিকেই কেবল আমার অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ বলিয়া ধার্য্য করিবার তাৎপর্য্য কি? তাহার বিশেষ একটি তাৎপর্য্য আছে; তাহা এই :—

আমার সকল কার্য্য শুদ্ধ যে কেবল আমার নিজের শক্তিতে কৃত হয়, তাহা নহে। মনে কর, আমি চন্দ্রোদয় দেখিতেছি। চন্দ্রের প্রতি তাকাইয়া চন্দ্রের প্রকাশ চক্ষুরিন্দ্রিয়ে অনুভব করিতেছি। চন্দ্রের প্রকাশ এক-প্রকার প্রভাব, আর আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ে প্রকাশের সেই যে অনুভূতি, তাহা সেই প্রভাবেরই অনুভাব। প্রতিধ্বনি যেমন ধ্বনির অনুক্রিয়া, অনুভাব তেমনি প্রভাবেরই অনুক্রিয়া। তবেই হইতেছে যে, চন্দ্রেরই শক্তিপ্রভাবে আমি চন্দ্রদর্শন করিতেছি—আমার নিজের শক্তিপ্রভাবে নহে। তাহার পরে, মনে কর, আমি বিছানায় পড়িয়া শুয়ে-শুয়ে চন্দ্র ভাবিতেছি। এখন আর চন্দ্রের প্রভাব আমার চক্ষুর উপরে কার্য্য করিতেছে না; এখন আমি তাই স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি যে, আমি আমার নিজের ধীশক্তির প্রভাবে চন্দ্র ধ্যান করিতেছি। অনুভাবের গোড়ায় যে অনু রহিয়াছে, তাহাকে চেন' নাই—সেটি সহজ পাত্র নহে। সেই অনুটাই ইঙ্গিতচ্ছলে জ্ঞাপন করিতেছে যে, অনুভাব তোমার আপন শক্তির প্রভাব নহে, তাহা অপর-কোনো বস্তুর প্রভাবের অনুক্রিয়া। কিন্তু এক্ষণে যখন আমি বিছানায় শুইয়া চন্দ্র ভাবিতেছি, তখন, অনুভাবনার অনু ঘুচিয়া গিয়াছে, আর, সেই-গতিকে আমার এক্ষণকার জ্ঞানক্রিয়া নিখুঁত ভাবনা-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এখন আমি অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, এ-যে আমার ভাবনা—এ ভাবনা অনুভাবনা নহে, এ ভাবনা প্রভাবনা; ইহা আমার নিজের ধীশক্তির প্রভাব-স্ফূর্ত্তি। এই যে একটি কথা যে, "ভাবনা-কার্য্যে আমাদের নিজের ধীশক্তির প্রভাব স্ফূর্ত্তি পায়, অতএব ভাবনা আমাদের নিজের অস্তিত্বের পরিচায়ক"—এ কথাটি দে-কর্ত্তা যদি-চ বলেন নাই—আমরাই কেবল বলিতেছি; কিন্তু ভাবে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, আমাদের ঐ কথাটি দে-কর্ত্তার মনোমধ্যে বিলক্ষণই আধিপত্য করিয়াছিল;

তবে কি না—তাঁহার নিয়োজিত একটিমাত্র অতএবের শরীরে এতাধিক বল নাই যে, তাঁহার ঐ প্রকৃত মন্তব্য-কথাটির গুরুভার স্কন্ধে বহন করে। আমরা যেরূপ উত্তরোত্তর-ক্রমে 'ভাবিতেছি' হইতে 'আছি'তে নাবিলাম—প্রথম অতএবে ভর দিয়া ভাবনা হইতে জ্ঞানে নাবিলাম, দ্বিতীয় অতএবে ভর দিয়া জ্ঞান হইতে ধীশক্তিতে নাবিলাম, তৃতীয় অতএবে ভর দিয়া ধীশক্তি হইতে ধীমান্ পুরুষের অস্তিত্বে নাবিলাম; এরূপ না করিলে (মন্তব্য-কথাটি খুলিয়া-খালিয়া না বলিলে) হয় এই :—"ভাবিতেছি অতএব আছি" "দেখিতেছি অতএব আছি" "নাচিতেছি অতএব আছি" ইত্যাকার সমস্ত কথারই মূল্য সমান হইয়া দাঁড়ায়, আর, সেই-গতিকে দে-কর্ত্তার মহাবাক্যটি সচ্ছিদ্র নৌকার ন্যায় জলমগ্ন হইয়া যায়।

প্রশ্ন উঠিয়াছিল এই যে, আমরা যখন স্বাধীনতায় ভর করিয়া দাঁড়াই, তখন কি গায়ের জোরে স্বাধীনতায় ভর করি—অথবা আর-কোনো-কিছুর জোরে? এখন দেখিতেছি যে, ধীশক্তির জোরে আমরা স্বাধীনতায় ভর করিয়া দাঁড়াই। আমি-আছি'র বোধ হইতে স্বাধীনতার ভাব আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে। আসিয়া পড়ে এইরূপে :—

আমার আপনার অস্তিত্ব আমার আপনারই ধীশক্তির প্রভাবে সমর্থিত হয়, তদ্ব্যতীত অপর-কোনো-কিছুর শক্তির প্রভাবে সমর্থিত হয় না—আমি-আছি'র সমর্থন-কার্য্য আমার আপনারই ধীশক্তির অধীন, তদ্ব্যতীত আর-কোনো-কিছুর অধীন নহে—সুতরাং আমি স্বাধীন।

এইরূপে আমরা স্বাধীনতায় ভর করিয়া দাঁড়াই বুদ্ধিক্ষেত্রে। কিন্তু তা ছাড়া—আর-এক ক্ষেত্র আছে;—সেটা হ'চ্চে ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্র। ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রেও আমরা পূর্ব্বের ন্যায় তিন অতএবের সিঁড়ি ভাঙিয়া—

কার্য্য হইতে শক্তিতে এবং শক্তি হইতে সত্তাতে অবতরণ করি। এবারকার সোপান-পদ্ধতি এইরূপ :—

(১) দর্শন ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া,

অতএব

"আমি দর্শন করিতেছি" বলিলেই বুঝায় যে, আলোকদ্বারা আমার চক্ষুরিন্দ্রিয় উপরক্ত হইতেছে।

(২) কার্য্যমাত্রই শক্তিসাধ্য,

অতএব

"আলোকদ্বারা আমার চক্ষুরিন্দ্রিয় উপরক্ত হইতেছে" বলিলেই বুঝায় যে, আলোকের উপরঞ্জনী শক্তি আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের উপরে কার্য্য করিতেছে।

(৩) শক্তিমাত্রই সত্তাশ্রিত,

অতএব

"আলোকের উপরঞ্জনী শক্তি কার্য্য করিতেছে" বলিলেই বুঝায় যে, আলোক-পদার্থ আছে।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে, দর্শনক্রিয়া আমার আপনারই ইন্দ্রিয়ক্রিয়া। আমার আপনার ক্রিয়াতে আমার আপনারই অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। অতএব ভাবনা-ক্রিয়াও যেমন, দর্শন-ক্রিয়াও তেমনি—দুইই শুধু কেবল আমার আপনার অস্তিত্বেরই সাক্ষ্য-প্রদান করে; তা বই, দৃষ্টবস্তুর অস্তিত্বের সাক্ষ্যপ্রদান করে না। স্বপ্নেতেও তো

আমরা আলোক দর্শন করি; কিন্তু তাহা তো আর বাস্তবিক আলোক নহে। ইহার উত্তর এই যে, ধ্বনি না থাকিলে যেমন প্রতিধ্বনি থাকিতে পারে না, জাগরিতাবস্থা না থাকিলে তেমনি স্বপ্নাবস্থা থাকিতে পারে না। স্বপ্নাবস্থা জাগরিতাবস্থারই প্রতিধ্বনি। ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনি উভয়ে যেমন নিরবচ্ছিন্ন কার্য্যকারণসূত্রে সংগ্রথিত, জাগরিতাবস্থার আলোকদর্শন এবং স্বপ্নাবস্থার আলোকদর্শন, এ দুইটি ব্যাপার তেমনিই নিরবচ্ছিন্ন কার্য্য-কারণসূত্রে সংগ্রথিত। মনে কর, একজন পাচকের হস্ত হইতে একটা লোহার হাতা দৈবক্রমে খসিয়া জ্বলন্ত উনানের ভিতরে পড়িয়া গেল। অগ্নি-সংযোগে হাতা এরূপ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল যে, পাচক তাহা তুলিয়া লইতে পারিল না। এরূপ অবস্থায় হাতাটি যে অগ্নির শক্তিপ্রভাবে উত্তপ্ত হইয়াছে—পাচকের এটা দেখা কথা। মনে কর, তাহার পরে, উনানে একঘটি জল ঢালিয়া অগ্নি সমূলে নির্ব্বাণ করিয়া ফ্যালা হইল; কিন্তু হাতাটা এখনো উত্তপ্ত। অগ্নি যদি-চ এখন নাই, তথাপি পাচককে হাতার উষ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, পাচক বলিবে যে, অগ্নির শক্তিপ্রভাবেই হাতাতে উত্তাপের সঞ্চার হইয়াছে। এ যেমন দেখা গেল, তেমনি, স্বপ্নদর্শকের চক্ষু এখন যদি-চ নিমীলিত, এবং সূর্য্য এখন যদি-চ অস্তমিত, কিন্তু সাত-আট ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহার চক্ষু উন্মীলিত ছিল এবং সূর্য্য আকাশে দীপ্তি পাইতেছিল। আর চক্ষুর সেই উন্মীলিত অবস্থায় তাহার গোলকের অভ্যন্তরে সূর্য্যালোক যেরূপ শক্তিসঞ্চার করিয়াছে, স্বপ্নের আলোক-দর্শন তাহারই অন্যতম প্রভাব-স্ফূর্ত্তি। ইহার প্রমাণ যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহা স্পষ্টই পড়িয়া আছে;—তাহা এই যে, স্বপ্ন-দর্শকের আলোক-দর্শন যখন তাহার নিজের ইচ্ছাধীন নহে, তখন তাহা-তেই প্রমাণ হইতেছে যে, কোনো-না-কোনো বহির্বস্তুর শক্তিপ্রভাবেই তাহা সংঘটিত হইতেছে। বলিলাম, "সূর্য্যের শক্তিপ্রভাবে স্বপ্নদর্শক আলোক দর্শন করিতেছে"; তাহা না বলিয়া বলিতে পারিতাম যে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৈজস-তন্তুর (Nerveএর) শক্তিপ্রভাবে স্বপ্নদর্শক আলোক দর্শন করিতেছে; দুই কথা একই কথা;—"নেপোলিয়নের সৈন্য যুদ্ধ জয় করিয়াছে" বলাও যা, আর, "নেপোলিয়ন যুদ্ধ জয় করিয়াছেন" বলাও তা—একই কথা। মরুভূমির বালুকার উত্তাপ এবং সূর্য্যের উত্তাপ, একই বস্তু। সূর্য্যালোকের প্রভাব যদি চাক্ষুষ তৈজস-তন্ততে কোনো-কালেই সংক্রামিত না হইত, তাহা হইলে স্বপ্নেও সূর্য্যালোকের দর্শনলাভ সম্ভাবনীয় হইত না। অতএব এটা স্থির যে, ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে আমরা (১) বহির্বস্তুর শক্তির প্রভাব, (২) তাহারই সত্তার প্রাচুর্ভাব এবং (৩) আমাদের নিজের স্বাধীনতার অভাব, তিনই একসঙ্গে অনুভব করি।

আমাদের গোড়া'র কথাটি এতক্ষণে সপ্রমাণ হইল; সে কথা এই যে, "আমরা দুই ক্ষেত্রে আপনার দুইপ্রকার বিপরীত ভাব দেখিতে পাই :—বুদ্ধিক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেখিতে পাই—ইন্দ্রিয়ক্ষেত্রে পরাধীনতা দেখিতে পাই।"

অতঃপর দেখিতে হইবে এই যে, বুদ্ধি-

ক্ষেত্রে আমরা স্বাধীনতা অনুভব করি বটে—কিন্তু কতক্ষণ? বুদ্ধি যতক্ষণ চলে—ততক্ষণ। কোনো-গতিকে যদি আমার বুদ্ধিক্রিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায় (যেমন ক্লোরোফর্ম্ম-সেবন-গতিকে) তাহা হইলে সেই সঙ্গে আমার স্বাধীনতাবোধও অন্তর্ধান করে—আছি-বোধও অন্তর্ধান করে। ফল কথা এই যে, আমি-আছি এই বোধ এবং সেই সঙ্গে আমার স্বাধীনতাবোধ, দুইই সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আমার নিজের বীশক্তির উপরেই নির্ভর করে—এ কথা সত্য। কিন্তু তা বলিয়া এটা ভুলিলে চলিবে না যে, পরোক্ষসম্বন্ধে তাহা বহির্বস্তুর অস্তিত্বের উপরে নির্ভর করে। সাক্ষাৎসম্বন্ধ হ'চ্চে বস্তুগুণের সম্বন্ধ; পরোক্ষসম্বন্ধ হ'চ্চে কার্য্যকারণের সম্বন্ধ। আর, সে দুই সম্বন্ধের গোড়া'র কথা হ'চ্চে সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞানের একাত্মভাব।

পূর্ব্বে দেখা হইয়াছে যে, সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান, পরস্পরের সহিত এরূপ হরিহরব্রহ্মাত্মা যে, সে তিন পদার্থ একপ্রকার তিনে এক একে তিন! ইহা হইতেই আসিতেছে এই যে, আমাদের জ্ঞান এক-দিকে সত্তার সহিত এবং আর-এক-দিকে শক্তির সহিত—দুয়েরই সহিত—ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়িত। কাজেই, জ্ঞানকে দুই কূল রক্ষা করিয়া চলিতে হয়—দুই দিকের দুইপ্রকার সম্বন্ধ সমান মানিয়া চলিতে হয়। এক-দিকের সম্বন্ধ হ'চ্চে সত্তা-ঘটিত বস্তুগুণের সম্বন্ধ; আর-এক-দিকের সম্বন্ধ হ'চ্চে শক্তি-ঘটিত কার্য্যকারণের সম্বন্ধ।

বস্তুগুণের দ্বার।

বস্তুগুণ-সম্বন্ধের দ্বার দিয়া আমি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, জ্ঞান আমারই একপ্রকার গুণ; তাহা আমাতেই উত্থান করে, আমাতেই বিলীন হয়; তাহা ঘোলো-আনা আমার নিজস্ব সম্পত্তি—তাহার অপর-কোনো অংশী নাই—সরিক নাই। আর, আমার আপনারই সেই জ্ঞানে আমার অস্তিত্ব সপ্রমাণ। আমার অস্তিত্বের দৃঢ়তা এবং বলবত্তা সাধন করিবার জন্য আমাকে অপর-কাহারো দ্বারস্থ হইতে হয় না; আমার অস্তিত্ব স্বাধীন অস্তিত্ব—আমি স্বাধীন।

কার্য্যকারণের দ্বার।

পক্ষান্তরে, কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের দ্বার দিয়া আমি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আমার জ্ঞান একপ্রকার কারণমূলক কার্য্য; তাহা আমার বীশক্তির স্ফূর্ত্তির উপরে নির্ভর করে; বীশক্তির স্ফূর্ত্তি চেতনাশক্তির উপরে নির্ভর করে; চেতনাস্ফূর্ত্তি প্রাণস্ফূর্ত্তির উপরে নির্ভর করে; প্রাণস্ফূর্ত্তি বহির্বস্তুর শক্তিস্ফূর্ত্তির উপরে নির্ভর করে।

স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা।

আমরা যখন জ্ঞানরূপ গুণের আধার-বস্তুর উপরে লক্ষ্য নিবিষ্ট করি, তখন স্বাধীনতা অনুভব করি; পক্ষান্তরে, যখন জ্ঞানরূপ কার্য্যের কারণের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করি, তখন পরাধীনতা অনুভব করি। আমি যদি পরাধীনতার হস্ত এড়াইবার জন্য বুদ্ধি-ক্ষেত্রের কৈলাসশিখরে স্বাধীনতায় ভর করিয়া নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকি, আর, মনে করি যে, কার্য্যকারণের সম্বন্ধ এখানে আমাকে হাত বাড়াইয়া নাগাল পাইবে না—তবে তাহা শুদ্ধকেবল মনে করা মাত্র। কেন না, আমি যতই কেন আপনাকে স্বাধীন

মনে করি না—নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য আমাকে বায়ুর আশ্রয়ে নির্ভর করিতে হইবেই; অন্ন-পানীয়ের জন্য মৃত্তিকা-জলের আশ্রয়ে নির্ভর করিতে হইবেই; আলোক-উত্তাপের জন্য অগ্নি-সূর্য্যের আশ্রয়ে নির্ভর করিতে হইবেই। তবে, এমন হইলে হইতে পারে যে, কোনো যোগসিদ্ধ পুরুষ দেবলোক-নিবাসীদিগের ন্যায় পৃথিবীর সঙ্গ ছাড়িয়া নূতন এক সূক্ষ্মতর জগতের সহিত বন্ধুতা পাতাইয়া সেখান হইতে সূক্ষ্ম-শরীরের উপাদান এবং প্রাণ-মন-বুদ্ধির উপজীবিকা তলে-তলে সংগ্রহ করেন। তাহা যদি হয়, তবে সে-সমস্ত উপাদান এবং উপজীবিকা'র জন্য যোগী পুরুষ পৃথিবীর নিকটে ঋণী না হইলেও নূতন-এক-তরো সূক্ষ্ম অপার্থিব রাজ্যের নিকটে অবশ্য বলিতে হইবে ঋণী। মনে কর, যেন পূর্ব্বে আমি কলিকাতায় বাস করিতাম—এক্ষণে হিমাচলে বাস করিতেছি। এক্ষণে আমাকে কলিকাতার আইন মানিয়া চলিতে হইতেছে না—ইহা সত্য। কলিকাতার যেন আইন মানিয়া চলিতে হইতেছে না—হিমাচলের তো আইন মানিয়া চলিতে হইতেছে! তার সাক্ষী—কলিকাতায় আমি খালি-গায়ে থাকিতাম, এখানে আমি আমার গায়ে সাতপুরু কম্বল জড়াইয়াও সন্তুষ্ট নহি। তেমনি কোনো যোগী পুরুষ যদি পৃথিবীরাজ্য হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া আর-এক উচ্চ রাজ্যে ভর্ত্তি হন, তবে সেই নূতন রাজ্যের নিয়মাবলী অবশ্যই তাঁহাকে মানিয়া চলিতে হইবে। প্রকৃত কথা যাহা, তাহা এই :—

এরূপ মহাপুরুষ কালে কালে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং করেনও, যাঁহারা আমাদের ন্যায় তমসাচ্ছন্ন ব্যক্তির তুলনায় সিদ্ধপুরুষ। কিন্তু আমাদের তুলনায় সিদ্ধপুরুষ স্বতন্ত্র, এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে সিদ্ধপুরুষ স্বতন্ত্র। প্রকৃত কথা এই যে, মনুষ্য সিদ্ধপুরুষ নহে—মনুষ্য সাধক পুরুষ। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, যোগসাধক যে-কোনো সিদ্ধি লাভ করিতে চেষ্টা করুন্ না কেন—সে সিদ্ধি পূর্ব্ব হইতেই আমাদের চক্ষের সমুখে অনেককাল হইয়া বসিয়া আছে। তুমি আকাশে উড়িতে ইচ্ছা করিতেছ—পতঙ্গ-বিহঙ্গ অনেককাল পূর্ব্ব হইতে আকাশে উড়িতেছে। তুমি ধোঁয়া-কলে জাহাজ চালাইতেছ—ধোঁয়া অপেক্ষা শতকোটিগুণ সূক্ষ্মাৎসূক্ষ্ম বাষ্পযোগে জীব-শরীর অনেককাল হইতে পৃথিবীতে চলা-ফেরা করিতেছে। যে-কোনো বিষয়েই তুমি সিদ্ধির অল্প একরত্তি আভাস অনেক সাধ্য-সাধনায় উপার্জ্জন করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেছ—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনেক পূর্ব্বে তাহা পুরামাত্রায় হইয়া বসিয়া আছে। তুমি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড—তোমার চতুর্দ্দিকে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের বৃহৎ সিদ্ধি তাহার চিরন্তন সম্পত্তি—তোমার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র সিদ্ধি সবে-মাত্র আজিকের নূতন আমদানি। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের বৃহৎ সিদ্ধি তোমার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র সিদ্ধিকে অনেককাল গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে। তুমি সাধনদ্বারা যত-কিছু শক্তি উপার্জ্জন করিতেছ, সমস্তই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড হইতে আসিতেছে; আর, যত-যত-প্রকার সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছ—সমস্তেরই পরাকাষ্ঠা আদর্শ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। অতএব

এটা স্থির যে, প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধপুরুষ একমাত্র অদ্বিতীয় সত্য—যিনি নিখিল বিশ্ব-ভুবনের আদি-অন্ত-মধ্য সমস্ত লইয়া এক-আমি-আছি-রূপে চির-বিরাজমান। আমরা যখন বলি যে, আমি বহির্বস্তুর অধীন—আছি আছে'র অধীন—তখন তাহার অর্থই এই যে, আমি ঐশী শক্তির অধীন। "ভারতবর্ষ ইংরাজসৈন্যের বশতাপন্ন" এ কথার অর্থই এই যে, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডাধিপের বশতাপন্ন। এ আমি-আছি একমাত্র অদ্বিতীয় আমি-আছি'র অধীন। কার্য্য-কারণ-হিসাবে অধীন; তত্রাচ, বস্তুগুণ-হিসাবে—জলের সহিত যেমন জলের ঐক্য, আছি'র সহিত তেমনি আছি'র ঐক্য রহিয়াছে; ঐক্য আছে বলিয়াই সমস্ত জগতের আত্মস্তব্যাপী পরাকাষ্ঠা সত্যকে আমরা "আছে" না বলিয়া "আছি" বলি। তা ছাড়া, আমরা যে দীন-হীন-পরাধীন হইয়াও স্বাধীনতার গোঁ কিছুতেই ছাড়ি না—তাহার কারণই ঐ; কি? না, সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বাত্মক চিরন্তন আছি'র সহিত অধীন জীবের এই কালাবচ্ছিন্ন আছি'র ঐক্য। কেন না, সমস্ত লইয়া এক অদ্বিতীয় সত্য যিনি চির-বিরাজমান, তাঁহার বাহিরে দ্বিতীয় কিছুই নাই; সুতরাং তাঁহার শক্তি বাহিরের অন্য-কোনো-কিছুর শক্তিদ্বারা প্রতিহত বা ব্যাহত হইতে পারে না—সুতরাং বাস্তবিক-হিসাবে তিনিই কেবল স্বাধীন। তবেই হইতেছে 'যে, কালাবচ্ছিন্ন সুতরাং পরাধীন এই যে আছি, এ আছি'র স্বাধীনতা অন্য-কোনো প্রকারেই সম্ভাবনীয় নহে—সওয়ায় চিরন্তন আছি'র সহিত ঐক্যের উপলব্ধি। আছি'র সহিত আছি'র ঐক্যই আমাদের একমাত্র স্বাধীনতা——অস্ফুট ঐক্য অস্ফুট স্বাধীনতা, পরিস্ফুট ঐক্য পরিস্ফুট স্বাধীনতা। বিষয়টি অতীব গুরুতর এবং গভীর। স্থান-সংক্ষেপের বাধ্যবাধকতায় শেষের কথাগুলি সাঁটে-সোঁটে ইঙ্গিত-ইষারায় অতীব সংক্ষেপে বলা হইল—বারান্তরে তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করিয়া বলা নিতান্তই আবশ্যক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাল্যদান।

সকালবেলায় শীত-শীত ছিল। দুপুরবেলায় বাতাসটি অল্প-একটু তাতিয়া উঠিয়া দক্ষিণ-দিক্ হইতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যতীন যে বারান্দায় বসিয়া ছিল, সেখান হইতে বাগানের এককোণে একদিকে একটি কাঁঠাল ও আর একদিকে একটি শিরীষ-গাছের মাঝখানের ফাঁক দিয়া বাহিরের মাঠ চোখে পড়ে। সেই শূন্যমাঠ ফাল্গুনের রৌদ্রে ধূধূ করিতেছিল। তাহারি এক-প্রান্ত দিয়া কাঁচা পথ চলিয়া গেছে—সেই পথ বাহিয়া বোঝাই-খালাস গোরুর গাড়ি মন্দগমনে গ্রামের দিকে ফিরিয়া চলিয়াছে—

গাড়োয়ান মাথায় গামছা ফেলিয়া অত্যন্ত বেকার-ভাবে গান গাহিতেছে।

এমন-সময় পশ্চাতে একটি সহাস্য নারী-কণ্ঠ বলিয়া উঠিল, "কি যতীন, পূর্ব্বজন্মের কারো কথা ভাবিতেছ বুঝি!"

যতীন কহিল, "কেন পটল, আমি এম্‌নিই কি হতভাগা যে, ভাবিতে হইলেই পূর্ব্বজন্ম লইয়া টান পাড়িতে হয়!"

আত্মীয়সমাজে 'পটল'নামে খ্যাত এই মেয়েটি বলিয়া উঠিল—"আর মিথ্যা বড়াই করিতে হইবে না। তোমার ইহজন্মের সব খবরই ত রাখি মশায়! ছিছি, এত বয়স হইল, তবু একটা সামান্য বৌও ঘরে আনিতে পারিলে না! আমাদের ঐ যে ধনা মালীটা, ওরও একটা বৌ আছে—তার সঙ্গে দুই-বেলা ঝগ্‌ড়া করিয়া সে পাড়াসুদ্ধ লোককে জানাইয়া দেয় যে, বৌ আছে বটে। আর তুমি যে মাঠের দিকে তাকাইয়া ভাণ করিতেছ যেন কার চাঁদমুখ ধ্যান করিতে বসিয়াছ—এ সমস্ত চালাকি আমি কি বুঝি না—ও কেবল লোক দেখাইবার ভড়ং মাত্র। দেখ যতীন, চেনা বামুনের পৈতের দরকার হয় না—আমাদের ঐ ধনাটা ত কোনদিন বিরহের ছুতা করিয়া মাঠের দিকে অমন তাকাইয়া থাকে না—ঋতি-বড় বিচ্ছেদের দিনেও গাছের তলায় নিড়ানি-হাতে উহাকে দিন কাটাইতে দেখিয়াছি—কিন্তু উহার চোখে ত অমন ঘোর-ঘোর ভাব দেখি নাই। আর তুমি মশায় সাতজন্ম বৌয়ের মুখ দেখিলে না—কেবল হাঁস্‌পাতালে মড়া কাটিয়া ও পড়া মুখস্থ করিয়া বয়স পার করিয়া দিলে! তুমি অমনতর দুপুর-বেলা আকাশের দিকে গদগদ হইয়া তাকাইয়া থাক কেন? না, এ সমস্ত বাজে চালাকি আমার ভাল লাগে না! আমার গা জ্বালা করে!"

যতীন হাতজোড় করিয়া কহিল—"থাক্ থাক্, আর নয়! আমাকে আর লজ্জা দিয়ো না! তোমাদের ধনাই ধন্য! উহারই আদর্শে আমি চলিতে চেষ্টা করিব! আর কথা নয়, কাল সকালে উঠিয়াই যে কাঠকুড়ানি মেয়ের মুখ দেখিব, তাহারই গলায় মালা দিব—ধিক্কার আমার আর সহ্য হইতেছে না!"

পটল। তবে এই কথা রহিল?

যতীন। হাঁ, রহিল!

পটল। তবে এস!

যতীন। কোথায় যাইব?

পটল। এসই না!

যতীন। না না, একটা কি দুষ্টুমি তোমার মাথায় আসিয়াছে। আমি এখন নড়িতেছি না!

পটল। আচ্ছা, তবে এইখানেই বোস!

বলিয়া সে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল!

পরিচয় দেওয়া যাক্। যতীন এবং পটলের বয়সের একদিনমাত্র তারতম্য। পটল যতীনের চেয়ে একদিনের বড় বলিয়া যতীন তাহার প্রতি কোনপ্রকার সামাজিক সম্মান দেখাইতে নারাজ। উভয়ে খুড়্‌তুত-জাঠ্‌তুত ভাইবোন। বরাবর একত্রে খেলা করিয়া আসিয়াছে। 'দিদি' বলে না বলিয়া পটল যতীনের নামে বাল্যকালে বাপ-খুড়োর কাছে অনেক নালিশ করিয়াছে, কিন্তু কোন শাসনবিধির দ্বারা কোন ফল পায় নাই—একটিমাত্র ছোট ভাইয়ের কাছেও তাহার পটল-নাম ঘুচিল না।

পটল দিব্য মোটাসোটা গোলগাল—প্রফুল্লতার রসে পরিপূর্ণ। তাহার কৌতুক-হাস্য দমন করিয়া রাখে, সমাজে এমন কোনো শক্তি ছিল না। শাশুড়ির কাছেও সে কোন-দিন গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিতে পারে নাই। প্রথম-প্রথম তা লইয়া অনেক কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু শেষকালে সকলকেই হার মানিয়া বলিতে হইল—ওর ঐ রকম! তার পরে এমন হইল যে, পটলের দুর্নিবার প্রফুল্লতার আঘাতে গুরুজনদের গাম্ভীর্য্য ধূলিসাৎ হইয়া গেল। পটল তাহার আশেপাশে কোনখানে মন ভার, মুখ ভার, দুশ্চিন্তা সহিতে পারিত না—অজস্র গল্প-হাসি-ঠাট্টায় তাহার চারিদিকের হাওয়া যেন বিদ্যুৎশক্তিতে বোঝাই হইয়া থাকিত।

পটলের স্বামী হরকুমারবাবু ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট্—বেহার-অঞ্চল হইতে বদলী হইয়া কলিকাতায় আব্‌কারি-বিভাগে স্থান পাইয়াছেন। প্লেগের ভয়ে বাসিতে একটি বাগান-বাড়ী ভাড়া লইয়া থাকেন, সেখান হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করেন। আব্‌কারি-পরিদর্শনে প্রায়ই তাঁহাকে মফস্বলে ফিরিতে হইবে বলিয়া দেশ হইতে মা এবং অন্য দুই-একজন আত্মীয়কে আনিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন-সময় ডাক্তারিতে নূতন উত্তীর্ণ পসার-প্রতিপত্তি-হীন যতীন বোনের নিমন্ত্রণে হস্তাখানেকের জন্য এখানে আসিয়াছে।

কলিকাতার গলি হইতে প্রথমদিন গাছ-পালার মধ্যে আসিয়া যতীন ছায়াময় নির্জ্জন বারান্দায় ফাল্গুন-মধ্যাহ্নের রসালস্যে আবিষ্ট হইয়া বসিয়া ছিল, এমন সময়ে পূর্ব্বকথিত সেই উপদ্রব আরম্ভ হইল। পটল চলিয়া গেলে আবার খানিকক্ষণের জন্য সে নিশ্চিন্ত হইয়া একটুখানি নড়িয়া-চড়িয়া বেশ আরাম করিয়া বসিল,—কাঠকুড়ানি মেয়ের প্রসঙ্গে ছেলে-বেলাকার রূপকথার অলিগলির মধ্যে তাহার মন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এমন-সময় আবার পটলের হাসিমাখা কণ্ঠের কাকলীতে সে চমকিয়া উঠিল।

পটল আর একটি মেয়ের হাত ধরিয়া সবেগে টানিয়া আনিয়া যতীনের সম্মুখে স্থাপন করিল—কহিল, "ও কুড়ানি!"

মেয়েটি কহিল—"কি দিদি!"

পটল। আমার এই ভাইটি কেমন দেখ্ দেখি!

মেয়েটি অসঙ্কোচে যতীনকে দেখিতে লাগিল। পটল কহিল—"কেমন, ভাল দেখিতে না?"

মেয়েটি গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"হাঁ, ভাল!"

যতীন লাল হইয়া চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল—"আঃ, পটল, কি ছেলেমানুষি করিতেছ!"

পটল। আমি ছেলেমানুষি করি, না, তুমি বুড়োমানুষি কর! তোমার বুঝি বয়সের গাছপাথর নাই!

যতীন পলায়ন করিল। পটল তাহার পিছনে পিছনে ছুটিতে ছুটিতে কহিল—"ও যতীন, তোমার ভয় নাই, তোমার ভয় নাই। এখনি তোমার মালা দিতে হইবে-না—ফাগুন-চৈত্রে লগ্ন নাই—এখনো হাতে সময় আছে!"

পটল যাহাকে কুড়ানি বলিয়া ডাকে, সেই মেয়েটি অবাক্ হইয়া রহিল। তাহার বয়স

ষোলো হইবে, শরীর ছিপ্‌ছিপে—মুখশ্রী-সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই, কেবল মুখে এই একটি অসামান্যতা আছে যে, দেখিলে যেন বনের হরিণের ভাব মনে আসে। কঠিন ভাষায় তাহাকে নির্ব্বুদ্ধি বলা যাইতেও পারে—কিন্তু তাহা বোকামি নহে—তাহা বুদ্ধি-বৃত্তির অপরিস্ফুরণমাত্র—তাহাতে কুড়ানির মুখের সৌন্দর্য্য নষ্ট না করিয়া বরঞ্চ একটি বিশিষ্টতা দিয়াছে!

সন্ধ্যাবেলায় হরকুমারবাবু কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া যতীনকে দেখিয়া কহিলেন—"এই যে যতীন আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে! তোমাকে একটু ডাক্তারি করিতে হইবে। পশ্চিমে থাকিতে দুর্ভিক্ষের সময় আমরা একটি মেয়েকে লইয়া মানুষ করিতেছি—পটল তাহাকে কুড়ানি বলিয়া ডাকে। উহার বাপ-মা এবং ঐ মেয়েটি আমাদের বাংলার কাছেই একটি গাছতলায় পড়িয়া ছিল। যখন খবর পাইয়া গেলাম, গিয়া দেখি, উহার বাপ-মা মরিয়াছে, মেয়েটির প্রাণটুকু আছে মাত্র। পটল তাহাকে অনেক যত্নে বাঁচাইয়াছে। উহার জাতের কথা কেহ জানে না—তাহা লইয়া কেহ আপত্তি করিলেই পটল বলে, 'ও ত দ্বিজ—একবার মরিয়া এবার আমাদের ঘরে জন্মিয়াছে—উহার সাবেক জাত কোথায় ঘুচিয়া গেছে।' প্রথমে মেয়েটি পটলকে মা বলিয়া ডাকিতে সুরু করিয়াছিল—পটল তাহাকে ধমক দিয়া বলিল—'খবরদার, আমাকে মা বলিস্ নে—আমাকে দিদি বলিস্!' পটল বলে, 'অত-বড় মেয়ে মা বলিলে নিজেকে বুড়ি বলিয়া মনে হইবে যে!' বোধ করি, সেই দুর্ভিক্ষের উপবাসে বা আর কোন কারণে উহার থাকিয়া-থাকিয়া শূলবেদনার মত হয়। ব্যাপারখানা কি, তোমাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। ওরে তুল্‌সি, কুড়ানিকে ডাকিয়া আন্ ত।"

কুড়ানি চুল বাঁধিতে বাঁধিতে অসম্পূর্ণ বেণী পিঠের উপরে দুলাইয়া হরকুমারবাবুর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার হরিণের মত চোখ-দুটি দুজনের উপর রাখিয়া চাহিয়া রহিল।

যতীন ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া হর-কুমার তাহাকে কহিলেন, "বৃথা সঙ্কোচ করিতেছ যতীন। উহাকে দেখিতে মস্ত ডাগর, কিন্তু কচি ডাবের মত উহার ভিতরে কেবল জল ছল্‌ছল্ করিতেছে—এখনো শাঁসের রেখামাত্র দেখা দেয় নাই। ও কিছুই বোঝে না—উহাকে তুমি নারী বলিয়া ভ্রম করিয়ো না—ও বনের হরিণী।"

যতীন তাহার ডাক্তারি কর্ত্তব্য সাধন করিতে লাগিল—কুড়ানি কিছুমাত্র কুণ্ঠা-প্রকাশ করিল না। যতীন কহিল—"শরীর-যন্ত্রের কোন বিকার ত বোঝা গেল না।"

পটল ফস্ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "হৃদয়যন্ত্রেও কোন বিকার ঘটে নাই। তার পরীক্ষা দেখিতে চাও?"—

বলিয়া কুড়ানির কাছে গিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিল—"ও কুড়ানি, আমার এই ভাইটিকে তোর পছন্দ হইয়াছে?"

কুড়ানি মাথা হেলাইয়া কহিল—"হাঁ!"

পটল কহিল, "আমার ভাইকে তুই বিয়ে করিবি?"

সে আবার মাথা হেলাইয়া কহিল—"হাঁ।"

পটল এবং হরকুমারবাবু হাসিয়া উঠিলেন। কুড়ানি কৌতুকের মর্ম্ম না বুঝিয়া তাঁহাদের অনুকরণে মুখখানি হাসিতে ভরিয়া চাহিয়া রহিল।

যতীন লাল হইয়া উঠিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল—"আঃ, পটল, তুমি বাড়াবাড়ি করিতেছ—ভারি অন্যায়! হরকুমারবাবু, আপনি পটলকে বড় বেশি প্রশ্রয় দিয়া থাকেন!"

হরকুমার কহিলেন—"নহিলে আমিও যে উঁহার কাছে প্রশ্রয় প্রত্যাশা করিতে পারি না। কিন্তু যতীন, কুড়ানিকে তুমি জান না বলিয়াই অত ব্যস্ত হইতেছ! তুমি লজ্জা করিয়া কুড়ানিকে-সুদ্ধ লজ্জা করিতে শিখাইবে দেখিতেছি। উহাকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল তুমি খাওয়াইয়ো না। সকলে উহাকে লইয়া কৌতুক করিয়াছে—তুমি যদি মাঝের থেকে গাম্ভীর্য্য দেখাও, তবে সেটা উহার পক্ষে একটা অসঙ্গত ব্যাপার হইবে।"

পটল। ঐজন্যই ত যতীনের সঙ্গে আমার কোনকালেই বনিল না—ছেলেবেলা থেকে কেবলি ঝগ্‌ড়া চলিতেছে—ও বড় গম্ভীর।

হরকুমার। ঝগ্‌ড়া করাটা বুঝি এম্‌নি করিয়া একেবারে অভ্যাস হইয়া গেছে—ভাই সরিয়া পড়িয়াছেন, এখন—

পটল। ফের মিথ্যা কথা! তোমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করিয়া সুখ নাই—আমি চেষ্টাও করি না।

হরকুমার। আমি গোড়াতেই হার মানিয়া যাই।

পটল। বড় কর্ম্মই কর! গোড়ায় হার না মানিয়া শেষে হার মানিলে কত খুসি হইতাম!

রাত্রে শোবার ঘরের জান্‌লা-দরজা খুলিয়া দিয়া যতীন অনেক কথা ভাবিল। যে মেয়ে আপনার বাপ-মাকে না খাইতে পাইয়া মরিতে দেখিয়াছে, তাহার জীবনের উপর কি ভীষণ ছায়া পড়িয়াছে! এই নিদারুণ ব্যাপারে সে কত-বড় হইয়া উঠিয়াছে—তাহাকে লইয়া কি কৌতুক করা যায়? বিধাতা দয়া করিয়া তাহার বুদ্ধিবৃত্তির উপরে একটা আবরণ ফেলিয়া দিয়াছেন—এই আবরণ যদি উঠিয়া যায়, তবে অদৃষ্টের রুদ্রলীলার কি ভীষণ চিহ্ন প্রকাশ হইয়া পড়ে! আজ মধ্যাহ্নে গাছের ফাঁক দিয়া যতীন যখন ফাল্গুনের আকাশ দেখিতেছিল, দূর হইতে কাঁঠাল-মুকুলের গন্ধ মৃদুতর হইয়া তাহার ঘ্রাণকে আবিষ্ট করিয়া ধরিতেছিল—তখন তাহার মনটা মাধুর্য্যের কুহেলিকায় সমস্ত জগৎটাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিয়াছিল—ঐ বুদ্ধিহীন বালিকা তাহার হরিণের মত চোখ-দুটি লইয়া সেই সোনালি কুহেলিকা অপসারিত করিয়া দিয়াছে—ফাল্গুনের এই কূজন-গুঞ্জন-মর্ম্মরের পশ্চাতে সংসারে যে ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর দুঃখকঠিন দেহ লইয়া বিরাট্ মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে, উদ্ঘাটিত যবনিকার শিল্পমাধুর্য্যের অন্তরালে সে দেখা দিল!

পরদিন সন্ধ্যার সময় কুড়ানির সেই বেদনা ধরিল। পটল তাড়াতাড়ি যতীনকে ডাকিয়া পাঠাইল। যতীন আসিয়া দেখিল, কষ্টে কুড়ানির হাতে-পায়ে খিল ধরিতেছে—শরীর আড়ষ্ট। যতীন ঔষধ আনিতে পাঠাইয়া বোতলে করিয়া গরম জল আনিতে

হুকুম করিল। পটল কহিল, "ভারি মস্ত ডাক্তার হইয়াছ, পায়ে একটু গরম তেল মালিশ করিয়া দাও না! দেখিতেছ না, পায়ের তেলো হিম হইয়া গেছে।"

যতীন রোগিণীর পায়ের তলায় গরম তেল সবেগে ঘষিয়া দিতে লাগিল। চিকিৎসা-ব্যাপারে রাত্রি অনেক হইল। হরকুমার কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বারবার কুড়ানির খবর লইতে লাগিলেন। যতীন বুঝিল, সন্ধ্যাবেলায় কর্ম্ম হইতে ফিরিয়া আসিয়া পটল-অভাবে হরকুমারের অচল হইয়া উঠিয়াছে—ঘনঘন কুড়ানির খবর লইবার তাৎপর্য্য তা-ই। যতীন কহিল—"হরকুমার-বাবু ছট্‌ফট্ করিতেছেন, তুমি যাও পটল!"

পটল কহিল—"পরের দোহাই দিবে বৈ কি! ছট্‌ফট্ কে করিতেছে, তা বুঝিয়াছি। আমি গেলেই এখন তুমি বাঁচ! এদিকে কথায় কথায় লজ্জায় মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠে—তোমার পেটে যে এত ছিল, তা কে বুঝিবে!"

যতীন। আচ্ছা, দোহাই তোমার, তুমি এইখানেই থাক। রক্ষা কর—তোমার মুখ বন্ধ হইলে বাঁচি। আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম—হরকুমারবাবু বোধ হয় শান্তিতে আছেন, এ-রকম সুযোগ তাঁর সর্ব্বদা ঘটে না!

কুড়ানি আরাম পাইয়া যখন চোখ খুলিল, পটল কহিল—"তোর চোখ খোলাইবার জন্য তোর বর যে আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া তোকে পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছে—আজ তাই বুঝি এত দেরি করিলি! ছিছি, ওঁর পায়ের ধূলা নে!"

কুড়ানি কর্ত্তব্যবোধে তৎক্ষণাৎ গম্ভীর-ভাবে যতীনের পায়ের ধূলা লইল। যতীন দ্রুতপদে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

তাহার পরদিন হইতে যতীনের উপরে রীতিমত উপদ্রব আরম্ভ হইল। যতীন খাইতে বসিয়াছে, এমন-সময় কুড়ানি আসিয়া অম্লানবদনে পাখা দিয়া তাহার মাছি তাড়াইতে প্রবৃত্ত হইল। যতীন ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "থাক্ থাক্, কাজ নাই।" কুড়ানি এই নিষেধে বিস্মিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া পশ্চাদ্‌বর্ত্তী ঘরের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল—তাহার পরে আবার পুনশ্চ পাখা দোলাইতে লাগিল। যতীন অন্তরালবর্ত্তিনীর উদ্দেশে বলিয়া উঠিল—"পটল, তুমি যদি এমন করিয়া আমাকে জ্বালাও, তবে আমি খাইব না—আমি এই উঠিলাম!"

বলিয়া, উঠিবার উপক্রম করিতেই কুড়ানি পাখা ফেলিয়া দিল। যতীন বালিকার বুদ্ধি-হীন মুখে তীব্র বেদনার রেখা দেখিতে পাইল; তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হইয়া সে পুনর্ব্বার বসিয়া পড়িল। কুড়ানি যে কিছু বোঝে না, সে যে লজ্জা পায় না, বেদনাবোধ করে না, এ কথা যতীনও বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আজ চকিতের মধ্যে দেখিল, সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে—এবং ব্যতিক্রম কখন্ হঠাৎ ঘটে, আগে হইতে তাহা কেহই বলিতে পারে না! কুড়ানি পাখা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে যতীন বারান্দায় বসিয়া আছে—গাছপালার মধ্যে কোকিল অত্যন্ত ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়াছে—আমের বোলের গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত—এমন-সময় সে দেখিল, কুড়ানি চায়ের পেয়ালা হাতে

লইয়া যেন একটু ইতস্তত করিতেছে। তাহার হরিণের মত চক্ষে একটা সকরুণ ভয় ছিল—সে চা লইয়া গেলে যতীন বিরক্ত হইবে কি না, ইহা যেন সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। যতীন ব্যথিত হইয়া উঠিয়া অগ্রসর হইয়া তাহার হাত হইতে পেয়ালা লইল। এই মানবজন্মের হরিণশিশুটিকে তুচ্ছ কারণে কি বেদনা দেওয়া যায়? যতীন যেম্‌নি পেয়ালা লইল, অম্‌নি দেখিল, বারান্দার অপরপ্রান্তে পটল সহসা আবির্ভূত হইয়া নিঃশব্দ হাস্যে যতীনকে কিল দেখাইল—ভাবটা এই যে, কেমন ধরা পড়িয়াছ!

সেইদিন সন্ধ্যার সময় যতীন একখানি ডাক্তারি কাগজ পড়িতেছিল, এমন-সময় ফুলের গন্ধে চকিত হইয়া উঠিয়া দেখিল, কুড়ানি বকুলের মালা হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। যতীন মনে মনে কহিল, "বড়ই বাড়াবাড়ি হইতেছে—পটলের এই নিষ্ঠুর আমোদে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয় না।" কুড়ানিকে বলিল, "ছিছি কুড়ানি, তোমাকে লইয়া তোমার দিদি আমোদ করিতেছেন, তুমি বুঝিতে পার না!"

কথা শেষ করিতে না করিতেই কুড়ানি ত্রস্ত-সঙ্কুচিত-ভাবে প্রস্থানের উপক্রম করিল। যতীন তখন তাড়াতাড়ি তাহাকে ডাকিয়া কহিল—"কুড়ানি, দেখি তোমার মালা দেখি।" বলিয়া মালাটি তাহার হাত হইতে লইল। কুড়ানির মুখে একটি আনন্দের উজ্জ্বলতা ফুটিয়া উঠিল। অন্তরাল হইতে সেই মুহূর্ত্তে একটি উচ্চহাস্যের উচ্ছ্বাসধ্বনি শুনা গেল।

পরদিন সকালে উপদ্রব করিবার জন্য পটল যতীনের ঘরে গিয়া দেখিল, ঘর শূন্য। একখানি কাগজে কেবল লেখা আছে—"পালাইলাম। শ্রীযতীন।"

"ও কুড়ানি, তোর বর যে পালাইল! তাহাকে রাখিতে পারিলি নে!" বলিয়া কুড়ানির বেণী ধরিয়া নাড়া দিয়া পটল ঘরকন্নার কাজে চলিয়া গেল।

কথাটা বুঝিতে কুড়ানির একটু সময় গেল। সে ছবির মত দাঁড়াইয়া স্থিরদৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে যতীনের ঘরে আসিয়া দেখিল, তাহার ঘর খালি। তার পূর্ব্বসন্ধ্যার উপহারের মালাটা টেবিলের উপর পড়িয়া আছে।

বসন্তের প্রাতঃকালটি স্নিগ্ধসুন্দর—রৌদ্রটি কম্পিত কৃষ্ণচূড়ার শাখার ভিতর দিয়া ছায়ার সহিত মিশিয়া বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কাঠবিড়ালি ল্যাজ পিঠে তুলিয়া ছুটাছুটি করিতেছে এবং সকল পাখী মিলিয়া নানাসুরে গান গাহিয়া তাহাদের বক্তব্য বিষয় কিছুতেই শেষ করিতে পারিতেছে না। পৃথিবীর এই কোণটুকুতে, এই খানিকটা ঘন-পল্লব, ছায়া এবং রৌদ্ররচিত জগৎখণ্ডের মধ্যে প্রাণের আনন্দ ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহারি মাঝখানে ঐ বুদ্ধিহীন বালিকা তাহার জীবনের, তাহার চারিদিকের, সঙ্গত কোন অর্থ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সমস্তই কঠিন প্রহেলিকা! কি হইল, কেন এমন হইল, তার পরে এই প্রভাত, এই গৃহ, এই যাহা-কিছু সমস্তই এমন একেবারে শূন্য হইয়া গেল কেন! যাহার বুঝিবার সামর্থ্য অল্প, তাহাকে হঠাৎ একদিন নিজ হৃদয়ের এই অতল বেদনার রহস্যগর্ভে কোন প্রদীপ হাতে না দিয়া কে নামাইয়া দিল? জগতের এই

সহজ-উচ্ছ্বসিত প্রাণের রাজ্যে, এই গাছপালা-মৃগপক্ষীর আত্মবিস্মৃত কলরবের মধ্যে কে তাহাকে আবার টানিয়া তুলিতে পারিবে?

পটল ঘরকন্নার কাজ সারিয়া কুড়ানির সন্ধান লইতে আসিয়া দেখিল, সে যতীনের পরিত্যক্ত ঘরে তাহার খাটের খুরা ধরিয়া মাটিতে পড়িয়া আছে—শূন্য শয্যাটাকে যেন পায়ে ধরিয়া সাধিতেছে। তাহার বুকের ভিতরে যে একটি সুধার পাত্র লুকান ছিল, সেইটে যেন শূন্যতার চরণে বৃথা আশ্বাসে উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিতেছে—ভূমিতলে পুঞ্জীভূত সেই স্খলিতকেশা লুণ্ঠিতবসনা নারী যেন নীরব একাগ্রতার ভাষায় বলিতেছে,—'লও, লও, আমাকে লও! ওগো, আমাকে লও!'

পটল বিস্মিত হইয়া কহিল—"ও কি হইতেছে কুড়ানি!"

কুড়ানি উঠিল না,—সে যেমন পড়িয়া ছিল, তেম্‌নি পড়িয়া রহিল। পটল কাছে আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতেই সে উচ্ছ্বসিত হইয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পটল তখন চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ও পোড়ারমুখি, সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্! মরিয়াছিস্!"

হরকুমারকে পটল কুড়ানির অবস্থা জানাইয়া কহিল—"একি বিপদ্ ঘটিল! তুমি কি করিতেছিলে, তুমি আমাকে কেন বারণ করিলে না?"

হরকুমার কহিল—"তোমাকে বারণ করা যে আমার কোনকালে অভ্যাস নাই। বারণ করিলেই কি ফল পাওয়া যাইত?"

পটল। তুমি কেমন স্বামী? আমি যদি ভুল করি, তুমি আমাকে জোর করিয়া থামাইতে পার না? আমাকে তুমি এ খেলা খেলিতে দিলে কেন?

এই বলিয়া সে ছুটিয়া গিয়া ভূপতিতা বালিকার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—"লক্ষ্মি বোন্ আমার, তোর কি বলিবার আছে, আমাকে খুলিয়া বল্!

হায়, কুড়ানির এমন কি ভাষা আছে যে, আপনার হৃদয়ের অব্যক্ত রহস্য সে কথা দিয়া বলিতে পারে! সে একটি অনির্ব্বচনীয় বেদনার উপর তাহার সমস্ত বুক দিয়া চাপিয়া পড়িয়া আছে—সে বেদনাটা কি, জগতে এমন আর কাহারো হয় কি না, তাহাকে লোকে কি বলিয়া থাকে, কুড়ানি তাহার কিছুই জানে না। সে কেবল কান্না দিয়া বলিতে পারে; মনের কথা জানাইবার তাহার আর কোন উপায় নাই।

পটল কহিল, "কুড়ানি, তোর দিদি বড় দুষ্ট,—কিন্তু তার কথা যে তুই এমন করিয়া বিশ্বাস করিবি, তা সে কখনো মনেও করে নি। তার কথা কেহ কখনো বিশ্বাস করে না—তুই এমন ভুল কেন করিলি? কুড়ানি, একবার মুখ তুলিয়া তোর দিদির মুখের দিকে চা'—তা'কে মাপ কর্!"

কিন্তু কুড়ানির মন তখন বিমুখ হইয়া গিয়াছিল—সে কোনমতেই পটলের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না—সে আরো জোর করিয়া হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া রহিল। সে ভাল করিয়া সমস্ত কথা না বুঝিয়াও একপ্রকার মূঢ়ভাবে পটলের প্রতি রাগ করিয়াছিল। পটল তখন ধীরে ধীরে বাহুপাশ খুলিয়া লইয়া উঠিয়া গেল—এবং জানালার ধারে পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া

ফাল্গুনের রৌদ্রচিক্কণ সুপারীগাছের পল্লব-শ্রেণীর দিকে চাহিয়া পটলের দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

পরদিন কুড়ানির আর দেখা পাওয়া গেল না। পটল তাহাকে আদর করিয়া ভাল ভাল গহনা এবং কাপড় দিয়া সাজাইত। নিজে সে এলোমেলো ছিল—নিজের সাজসম্বন্ধে তাহার কোন যত্ন ছিল না, কিন্তু সাজগোজের সমস্ত সখ কুড়ানির উপর দিয়াই সে মিটাইয়া লইত। বহুকালসঞ্চিত সেই সমস্ত বসনভূষণ কুড়ানির ঘরের মেজের উপর পড়িয়া আছে। তাহার হাতের বালাচুড়ি, নাসাগ্রের লঙ্গফুলটি পর্য্যন্ত সে খুলিয়া ফেলিয়া গেছে। তাহার পটলদিদির এতদিনের সমস্ত আদর সে যেন গা হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে!

হরকুমারবাবু কুড়ানির সন্ধানে পুলিসে খবর দিলেন। সেবারে প্লেগ্‌দমনের বিভীষিকায় এত লোক এত দিকে পলায়ন করিতেছিল যে, সেই সকল পলাতক দলের মধ্য হইতে একটি বিশেষ লোককে বাছিয়া লওয়া পুলিসের পক্ষে শক্ত হইল। হরকুমারবাবু দুইচারিবার ভুল লোকের সন্ধানে অনেক দুঃখ এবং লজ্জা পাইয়া কুড়ানির আশা পরিত্যাগ করিলেন। অজ্ঞাতের কোল হইতে তাঁহারা যাহাকে পাইয়াছিলেন, অজ্ঞাতের কোলের মধ্যেই সে আবার লুকাইয়া পড়িল।

যতীন বিশেষ চেষ্টা করিয়া সেবার প্লেগ্‌হাস্‌পাতালে ডাক্তারিপদ গ্রহণ করিয়াছিল। একদিন দুপুরবেলায় বাসায় আহার সারিয়া হাস্‌পাতালে আসিয়া সে শুনিল—হাস্‌পাতালের স্ত্রী-বিভাগে একটি নূতন রোগিণী আসিয়াছে। পুলিস তাহাকে পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছে।

যতীন তাহাকে দেখিতে গেল। মেয়েটির মুখের অধিকাংশ চাদরে ঢাকা ছিল। যতীন প্রথমেই তাহার হাত তুলিয়া লইয়া নাড়ি দেখিল। নাড়িতে জর অধিক নাই, কিন্তু দুর্ব্বলতা অত্যন্ত। তখন পরীক্ষার জন্য মুখের চাদর সরাইয়া দেখিল, সেই কুড়ানি।

ইতিমধ্যে পটলের কাছ হইতে যতীন কুড়ানির সমস্ত বিবরণ জানিয়াছিল। অব্যক্ত হৃদয়ভাবের দ্বারা ছায়াচ্ছন্ন তাহার সেই হরিণ-চক্ষু-দুটি কাজের অবকাশে যতীনের ধ্যানদৃষ্টির উপরে কেবলি অশ্রুহীন কাতরতা বিকীর্ণ করিয়াছে। আজ সেই রোগনিমীলিত চক্ষুর সুদীর্ঘ পল্লব কুড়ানির শীর্ণ কপোলের উপরে কালিমার রেখা টানিয়াছে—দেখিবামাত্র যতীনের বুকের ভিতরটা হঠাৎ কে যেন চাপিয়া ধরিল। এই একটি মেয়েকে বিধাতা এত যত্নে ফুলের মত সুকুমার করিয়া গড়িয়া দুর্ভিক্ষ হইতে মারীর মধ্যে ভাসাইয়া দিলেন কেন? আজ এই যে পেলব প্রাণটি ক্লিষ্ট হইয়া বিছানার উপরে পড়িয়া আছে, ইহার এই অল্প কয়দিনের আয়ুর মধ্যে এত বিপদের আঘাত—এত বেদনার ভার সহিল কি করিয়া, ধরিল কোথায়? যতীনই বা ইহার জীবনের মাঝখানে তৃতীয় আর-একটি সঙ্কটের মত কোথা হইতে আসিয়া জড়াইয়া পড়িল? রুদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস যতীনের বক্ষদ্বারে আঘাত করিতে লাগিল—কিন্তু সেই আঘাতের তাড়নায় তাহার হৃদয়ের তারে একটা সুখের মীড়ও বাজিয়া উঠিল। যে ভালবাসা জগতে দুর্লভ, যতীন তাহা না চাহিতেই ফাল্গুনের একটি